উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

মাঘ ১৩৭৭

৭৩তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা ৩
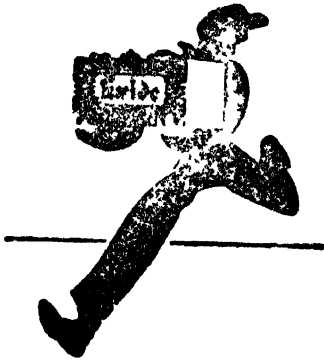
উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৭৩তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৭৭ হইতে পৌষ, ১৩৭৮)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
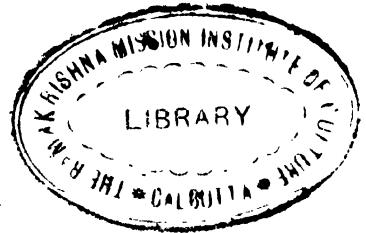
উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

বার্ষিক মূল্য ৮৲ প্রতি সংখ্যা ৭৫ প.

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ, ১৩৭৭ হইতে পৌষ, ১৩৭৮)

আশ্রম
ধূপ

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সন্ন্যাসীর গীতি—১৪শ সংস্করণ। স্বামীজী-রচিত 'Song of the Sannyasin'-নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ০'২০।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৫ম সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০'৪০, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৩৫।

সরল রাজযোগ—৫ম সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি. বুলের বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ০'৫০।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্ধিত সংস্করণ। প্রায় ১০৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামীজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজানো হইয়াছে। পরিচয়- এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবি-সংবলিত। প্রতি ভাগ মূল্য ৪'৫০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৫৲।

ভারতে বিবেকানন্দ—১৪শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৫৯৯ পৃষ্ঠা; মূল্য ৫৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৪'৫০।

দেববাণী—৯ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান'-নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন, ঐগুলির একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'৮০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৪র্থ সংস্করণ। শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১'৭৫।

বাণীসঞ্চয়ন—১ম সংস্করণ। যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র রচনাবলী হইতে বিভিন্ন বিষয়ে সুনির্বাচিত উপদেশাবলী। স্বামীজীর বাস্ট-সংবলিত সুন্দর প্রচ্ছদপট। পৃষ্ঠা ৩১২; মূল্য ৩'২৫।

কথোপকথন—৭ম সংস্করণ। স্বামীজীর ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'১৫।

মদীয় আচার্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত; ১১শ সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামীজীর বিবৃতি। মূল্য ০'৭৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৬৫।

ভারতীয় নারী—১২শ সংস্করণ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে নারী-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির একত্র সমাবেশ। ভারতীয় নারীর শিক্ষা, মহান্ আদর্শ, পাশ্চাত্য নারীদের সহিত পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা। স্বামীজীর মনোরম ছবি-সংবলিত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি ১২০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'৫০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'৩৫।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(পূর্বকাণ্ড — ১৩শ সংস্করণ; উত্তরকাণ্ড—১১শ সংস্করণ)। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। স্বামী বিবেকানন্দজীর মতামত অল্প কথায় জানিবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। স্বামীজীর জীবিতকালে তাঁহার সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দেশীয় আচার-নীতি, দর্শন-বিজ্ঞানাদি এবং ধর্ম ও সমাজগত সমস্যামূলক নানা বিষয়ের বিশদ আলোচনা। সরস ও হৃদয়গ্রাহী এই সব বর্ণনা সত্যিই আনন্দদায়ক। বর্তমান যুগের বহু সমস্যার আদর্শানুগ সমাধানও ইহাতে পাওয়া যাইবে। জীবনতত্ত্ব বিষয়ে এই পুস্তকদ্বয় অমূল্য রত্নের সন্ধান দিবে। ২২০ ও ২১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি কাণ্ড ২'২৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৬শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্যগণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট, ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালকদিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান্ করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে; মূল্য ৩'০০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ২'৭০।

প্রাপ্তিস্থান:—**উদ্বোধন কার্যালয়**, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন-প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৫ম সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। এই পুস্তক-পাঠে চরিত-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ১·২৫।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৫ম সংস্করণ; আচার্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲।

রামানুজ-চরিত—স্বামী প্রেমেশানন্দ-প্রণীত। যে-সকল মহাপুরুষের চরিত্র-প্রভাবে ভারতের জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, আচার্য রামানুজ তাঁহাদের অন্যতম। সুললিত সহজ ভাষায় লিখিত। মূল্য ০·৭৫।

শিব ও বুদ্ধ—৭ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা-প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ০·৬৫।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সবিস্তার ধারাবাহিক জীবনী। মূল্য—৩·০০।

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৭ম সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। মূল্য ২·৫০।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। মূল্য—৫·৫০।

শিবানন্দ-বাণী—২য় ভাগ—৩য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। মূল্য—২·৫০।

শ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রণীত, ৩য় সংস্করণ, ২৫৮ পৃষ্ঠা। শ্রীসম্প্রদায়ে প্রচলিত আচার্য রামানুজের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত। আচার্যের জীবদ্দশায় ক্ষোদিত প্রতিমূর্তির ছবি এই গ্রন্থে আছে। মূল্য ৩৲। উঃ গ্রাঃ পক্ষে ২·৭৫।

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ-প্রণীত। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, সেবাব্রতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের পথিকৃৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের ধারাবাহিক জীবনী। ডিমাই সাইজ, ৩১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲।

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-প্রণীত। ১১শ সংস্করণ। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ২·০০।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত)। অতুলনীয়-সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত গোপালের মা-র আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ৫০ পয়সা।

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। ২য় সংস্করণ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলীর সমাবেশ; নিজ জীবনের কঠোর ত্যাগ-তপস্যার কথার অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গীতে পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। মূল্য—৪·০০।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-প্রণীত। বাল্যাবধি বেদান্তী এই মহারাজের জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী-পাঠে চমৎকৃত হইবেন। ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩·৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত একত্র এই প্রথম প্রকাশিত হইল। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগের মূল্য—৫·৫০।

ভগবানলাভের পথ: স্বামী বীরেশ্বরানন্দ-প্রণীত। আধ্যাত্মিকজীবন-গঠন ও -পুষ্টি সাধনে পরম সহায়ক, নিত্যসঙ্গী করিবার উপযোগী। পৃষ্ঠা ৮০; মূল্য—পচাত্তর পয়সা।

দিব্য বাণী

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি।
সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি।

—বাজসনেয় সংহিতা, ১৯।৯

তেজ তুমি, তেজ দাও ; বীর্য তুমি, কর বীর্যবান!
ওজঃ তুমি, ওজঃ দাও ; বল তুমি, কর বলীয়ান!
অন্যায় সহ না তুমি, অন্যায়-বিদ্রোহী কর মোরে!
সহ-রূপী! শক্তি দাও দুঃখ কষ্ট সব সহিবারে!

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের নববর্ষ

শ্রীভগবানের কৃপায় বর্তমান বর্ষের মাঘ মাসে 'উদ্বোধন' ৭৩-তম বর্ষে পদার্পণ করিল। স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রবর্তিত এই পত্রিকাখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ (১৪ই জানুআরি, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ)। অতীতের ন্যায় বর্তমান বর্ষেও ইহার 'ব্যক্তিত্ব' বজায় রাখিয়া চলার জন্য আমরা সকলেরই সহায়তা ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।

বর্তমান সমস্যা

উদ্বোধনের প্রথম সংখ্যাতে স্বামী বিবেকানন্দ 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা'*-শীর্ষক প্রবন্ধে পত্রিকাটির যে জীবনোদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছিলেন, সুদীর্ঘকাল ধরিয়া উদ্বোধন সে জীবনোদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী রহিয়াছে। মাঝখানে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, স্বদেশে উদ্ভূত ও বিদেশাগত জাতীয় জীবনাদর্শের অনুকূল ও প্রতিকূল বহুবিধ ভাবের তরঙ্গ জাতির বুকে আঘাত করিয়াছে, কিন্তু ৭২ বৎসর পূর্বে যে পরিস্থিতিতে স্বামী বিবেকানন্দ জাতির কল্যাণসাধনব্রতে তৎকালে বিশেষভাবে আত্মনিয়োগের পথ 'উদ্বোধন'কে দেখাইয়াছিলেন, আজিও সে পথে চলিয়া তাহার সেবার প্রয়োজন সমভাবে বিদ্যমান। উদ্বোধনের সেবাব্রতের, যুগাবতারের ভাব, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবরাশি শুধু ভারতে কেন সমগ্র জগতেই সর্বজনের নিকট পরিবেশনের প্রয়োজন অতি দূর ভবিষ্যতেও সমভাবেই থাকিবে সন্দেহ নাই। কারণ নবযুগে মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের জন্যই এই ভাবরাশির আবির্ভাব। কিন্তু আমরা যে কথাটি বলিতে চাহিতেছি, গভীর বেদনার সহিত যাহা বলিতে হইতেছে, তাহা হইল অন্য কথা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নিজ সংস্কৃতিতে আস্থাহীন, পরানুকরণপ্রিয়, পরাধীন যে জাতিকে জাগাইয়া তৎকালে যে বিষয়ে স্বামীজী তাহাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছিলেন, কিছুদিন সে বিষয়ে সজাগ হইয়া উঠিয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পর জাতির চিন্তাপ্রবণতা আবার সেই পূর্বাবস্থাতেই ফিরিয়া গিয়াছে। ঈশ্বর-বিশ্বাস, সত্য, সংযম, ত্যাগ ও সেবা প্রভৃতি জাতীয় আদর্শকে আঁকড়াইয়া জনসেবার কাজে নামিবার কথা আবার আমরা ভুলিয়াছি। যুগযুগ-আগত এদেশের নিজস্ব সংস্কৃতিতে পূর্ণ আস্থাবান থাকিয়াই বিদেশের আদর্শগুলির মধ্যে যাহা কল্যাণকর সেগুলিকে গ্রহণ করিবার কথা তিনি বলিয়াছিলেন। কিন্তু আবার দেখা যাইতেছে, নিজস্ব সংস্কৃতিকে কার্যতঃ উপেক্ষা করিয়া, কোথাও বা প্রকাশ্যেই বিসর্জন দিয়া সেই "পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা," সেই "ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা," সেই "লজ্জাকর কাপুরুষতা" সহায়েই "উচ্চাধিকার" লাভ করিবার প্রবণতা প্রকট। স্বদেশের যে বীর সন্ন্যাসী, যে স্বদেশপ্রেমিক দরিদ্র

* 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'য় এটি 'বর্তমান সমস্যা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

নিপীড়িত জনগণের প্রতি সহানুভূতিতে "রক্ত অশ্রুপাত" করিয়া গেলেন, তাহাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া জীবনপাত করিলেন, সমাজসেবার জন্য নিজ পরিকল্পনা জানাইয়া তাহাদের সহিত একাত্মানুভূতিতে এতদূর পর্যন্ত বলিলেন, "যদি আমার কথা তোমরা না শুন, এমন কি যদি আমাকে পদাঘাত করিয়া ভারতভূমি হইতে তাড়াইয়াও দাও, তথাপি আমি তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিব,—আমরা ডুবিতেছি।...যদি ডুবিতে হয় তবে আমরা যেন সকলে একসঙ্গে ডুবি"—আজ আমরা তাঁহার চিন্তারাশির দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইবারও প্রয়োজন অনুভব করিতেছি না, আদর্শের জন্য বিদেশের দিকে চাহিয়া আছি! অথচ, তাঁহার ভাব লইয়াই জাতি জাগিয়াছিল, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে তাঁহারই ভাবানুপ্রাণিত হইয়া বরেণ্য দেশসেবকগণ আমাদের দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করিয়াছেন, এবং বর্তমান জগতে একমাত্র তাঁহারই চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন অথচ আদর্শের সংঘর্ষে বিভ্রান্ত মানবসমাজের সকল সমস্যার সমাধানের পথেই তীব্র আলোকসম্পাত করিতে সক্ষম।

আমরা কি আবার "অন্ধ" হইয়া গেলাম যে দেখিতেই পাই না, অথবা "বিকৃতমস্তিষ্ক" হইলাম যে দেখিয়াও দেখি না? আমাদের, বিশেষ করিয়া একদল যুবকের দৃষ্টির এই অস্বচ্ছতার জন্য আমরাই দায়ী। স্বদেশের চিরন্তন সংস্কৃতির প্রতি যে অন্ধ বা বিকৃত দৃষ্টির আবরণ আজ ইহাদের মনকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, সে আবরণ স্বাধীন ভারতই সেখানে চাপাইয়া দিয়াছে বলা যায়। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হইবার কোন সুযোগই তাহাদের দেওয়া হয় নাই। বিদেশের সর্ববিধ ভাবধারা দেশে আসিবেই, তাহা আসা বাঞ্ছনীয়ও, স্বামীজী তাহার আসার পথ অবারিত রাখিতেই বলিয়া গিয়াছেন—"নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ।" কিন্তু ইহার সহিত যাহা অতি অবশ্য করণীয় বলিয়াছেন—"ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আ-সাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা দেখিতে ও জানিতে পারে"—তাহার জন্য কোন ব্যবস্থাই আমরা দীর্ঘকাল করি নাই—না জীবন ও আচরণের মাধ্যমে, না শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে। নেতাজী মহাত্মাজী প্রভৃতির পর রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতীয় সংস্কৃতিকে জীবনে ও আচরণে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা আর হয় নাই বলিলেই চলে, মাত্র কথায় ও কতকগুলি প্রাণহীন অনুষ্ঠানমাত্রে উহা পর্যবসিত হইয়াছে; জীবনে, আচরণে ও দেশের সমস্যাসমাধান-প্রচেষ্টার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই মূলতঃ বিদেশকেই অনুকরণ করা হইতেছে। ফলে দীর্ঘকাল পূর্বে স্বামীজী যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিতে উদ্যতপ্রায়,---"ভয় হয় পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয় পাছে অসাধ্য অসম্ভব ও মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই!"

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের যে অবস্থা, তাহাতে সত্যই ভয় হয় বুঝি দয়া, ধর্ম, ভালবাসা, বিশ্বাস প্রভৃতির সহিত আমরা আমাদের নিজস্ব সবকিছুকেই হারাইতে বসিয়াছি; ঘৃণা, বিদ্বেষ,

আত্ম-সংঘর্ষ, নির্বিচার হত্যা, শিক্ষাব্যবস্থার বিপর্যয়প্রচেষ্টা প্রভৃতির অবারিত প্রসার সত্যই বুঝি আমাদের মনুষ্যত্বটুকুও মুছিয়া দিতেছে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহসটুকুও কাড়িয়া লইতেছে। অপরদিকে, এতকালের অনুকরণ-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিদেশের কোন সদ্‌গুণে আমরা ভূষিত হইয়াছি বলিয়াও তো মনে হয় না। আজ শঙ্কা জাগে, সত্যই আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইতে চলিয়াছি।

কিন্তু তাহা কখনও হইতে পারে না। ভারত তাহার নিজস্বতা লইয়া উন্নত হইয়া উঠিবেই, "বাহিরের কোন শক্তিই আর তাহাকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না"---ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ এ আশ্বাসবাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। ভারতের নিপীড়িত দরিদ্র জনগণের সুদিন আসিতেছে, একথাও ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ধর্মকে বাদ দিয়া ভারতে কিছু চলিবে না, ইহাও বলিয়া গিয়াছেন। আমরা যেন না ভুলি, তাঁহার এই সব উক্তির পিছনে কেবল অগাধ জ্ঞান ও অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিই কার্যকরী ছিল না, ছিল ঋষির অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ---ভবিষ্যকে দেখিয়াই তিনি কথাগুলি বলিয়াছেন (একদিন তাঁহার গুরুভ্রাতাদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, ভারতের আগামী কয়েকশত বৎসরের ইতিহাস তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল)। ইহা ঘটিবেই, ভারত তাহার নিজস্ব সংস্কৃতিকে আঁকড়াইয়া আধ্যাত্মিকতাকে জাতীয় জীবনে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ও ধরিয়া রাখিয়াই জনগণের সর্ববিধ দুঃখমোচন করিবে, দেশের সব সমস্যারই সমাধান করিবে। আমরা যদি আজ বিদেশের অনুকরণে, নিজস্ব সংস্কৃতিকে নিজস্ব আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া জীবনে রূপায়িত করিবার প্রচেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া, জড়বাদকে আশ্রয় করিয়া বিদেশের পদ্ধতি লইয়া জনগণের দুঃখনিবারণ-কল্পে অগ্রসর হই, তাহাতে আমাদের সকলেরই দুর্দশা বাড়িবে বই কমিবে না। এসত্ত্বেও কল্যাণ আসিবে, কিন্তু কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের মতো হয়তো দুই পুরুষের ধ্বংসের পর তৃতীয় পুরুষে ভারত নিজস্বতাকে আঁকড়াইয়া সর্বজনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথ ধরিবে।

এখনো সময় আছে। আমরা দেখিলাম, স্বামীজী বহু পূর্বে জাতির তৎকালীন সমস্যা সমাধানের জন্য যে প্রধান সমস্যাটিকে পূর্বে সমাধান করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার সমাধান জাতি এখনো করিয়া উঠিতে পারে নাই—আমরা মাত্র ভারতীয় প্রাচীন আদর্শকে ধরিয়া জাতির উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইব, না উহা ত্যাগ করিয়া বিদেশী আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাহা করিতে নামিব? দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন উহার কোনটিই নয়, উভয়ের মিলন ঘটাইতে হইবে। জাগতিক উন্নতির জন্য বিদেশের কল্যাণকর সব কিছুই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু ভারতের চিরন্তন আদর্শ আধ্যাত্মিকতাকে, দেবজীবনকে, ঈশ্বরবিশ্বাস, সংযম, ত্যাগ, সেবা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ গুণগুলিকে বর্জন করিয়া নহে, সেগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াই। বিদেশের যে কল্যাণকর আদর্শগুলি আমরা গ্রহণ করিব, সেগুলিকেও নিজেদের উপযোগী করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। বিদেশে আবিষ্কৃত বা বিদেশী প্রথায় প্রস্তুত কোন পুষ্টিকর খাদ্য শরীরের পুষ্টি ও সবলতার জন্য গ্রহণ করা নিশ্চয়ই অবাঞ্ছিত নয়, কিন্তু বিদেশীর মতো টেবিলে বসিয়া কাঁটা-চামচ দিয়া উহা না খাইলে দেহ পুষ্ট হইবে না, একথা বলা প্রলাপবাক্য মাত্র।

সাময়িক বিপর্যয়ের যে মেঘ আজ ভারতের

ভাগ্যগগনে পুঞ্জীভূত, তাহাকে সরাইতে হইলে আর কালবিলম্ব না করিয়া আমাদের এই আদর্শের মিলনসাধনে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহার জন্য বৌদ্ধিক আলোচনা ও শিক্ষার মাধ্যমে ভাবসম্প্রসারণের বিশেষ প্রয়োজন অনস্বীকার্য, কিন্তু ততোধিক প্রয়োজন জীবনে উহা রূপায়িত করিয়া দেখানো। সাম্যের আদর্শ আজ বিশ্বমানবজীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে; অবশ্য স্থানবিশেষে মাত্রার কম-বেশী। ইহাকে আমাদের বরণ করিয়া লইতে হইবে, কিন্তু জড়বাদের উপর নয়, আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর। সাম্যের আদর্শ ভারতে নূতন নয়; বরং বলা যায়, সাম্যের উচ্চ আদর্শ ভারতের মতো জগতে এখনো কোথাও নাই। কিন্তু আমাদের জীবনে যত অসাম্য, জগতের আর কোথাও তত অসাম্যও নাই। জীবনকে আমাদের যথার্থ ধর্ম-ভিত্তিক, আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক করিয়া তুলিতে হইবে, এবং সেই আধ্যাত্মিক শক্তিকে সঞ্চারিত করিতে হইবে রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই। একাজে এখনই আমাদের নামিতে হইবে ভারতকে, মানবতাকে বাঁচাই-বার জন্য। বিদেশে আজ সাম্যস্থাপনের একটি কাঠামো নির্মিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা প্রাণহীন, যন্ত্রচালিত। সেই যান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রাণকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—মাটির প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহা করিতে হইবে আমাদেরই। সেরূপ করিবার শক্তি আমাদেরই আছে। "আধুনিক ভারতবাসী আর্যকুলের গৌরব নহেন" সত্য কথা, কিন্তু চেষ্টা করিলে সে গৌরবের অধিকারী হইবার শক্তি আমাদের আছে। যথার্থ ধর্মজীবনে এত অধঃপতন সত্ত্বেও আমাদের প্রত্যেকের অস্থিমজ্জার সহিত এই আধ্যাত্মিকতা প্রচ্ছন্নভাবে জড়িত রহিয়াছে—"ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারত-বাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃক সম্পত্তি বিদ্যমান। যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনঃস্ফুরণ হইবে।" আমাদের প্রয়োজন শুধু নির্ভীক হইয়া কাজে লাগা।

মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথপ্রদর্শনই উদ্বোধনের জীবনব্রত। কিন্তু তাহার ক্ষেত্র সীমিত। এই সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যে থাকিয়াই শ্রীভগবানের কৃপায় সে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া জাগপ্রদীপের মতো রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবশিখাকে সমুজ্জ্বল রাখিয়া জাতির যথাসাধ্য সেবা করিয়া আসিয়াছে। আজ নববর্ষারম্ভে শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, মানবপ্রেমিক স্বচ্ছদৃষ্টি চিন্তাশীল স্বদেশবাসিগণের সহায়তায় আমরা এই শিখাটিকে যেন ভবিষ্যতেও সদা-সমুজ্জ্বল রাখিতে পারি।

"চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

গীতার বাণী

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'গীতা' 'গীতা' বারবার বললে 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। এইটাই গীতার সার কথা। গীতায় সব উপদেশই ত্যাগের উপদেশ। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একথা বলেননি যে, ত্যাগ বলতে সকলকেই ঘরবাড়ী ছেড়ে বনে গিয়ে সন্ন্যাসী হতে হবে। সন্ন্যাস বা গার্হস্থ্য আশ্রম, আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সকলকেই ত্যাগকে জীবনের মূলমন্ত্র করে নিতে হবে,—এই হল সার কথা। সংসারকে নিজের ভোগের জন্য নয়, কিন্তু কতকগুলি কর্তব্যসাধনের মাধ্যমে মন শুদ্ধ করে ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবার উপায়রূপে গ্রহণ করতে হবে; গার্হস্থ্য ধর্মে ত্যাগের স্থান এখানেই। সংসারে আছি বলে এই আসল কথা ভুলে সংসারকে যদি শুধু ভোগের স্থান বলে গ্রহণ করি, তাহলে ভুল করা হবে।

গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রই আমাদের ভগবানলাভের পথ দেখায়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যতক্ষণ তোমার জ্ঞান না হচ্ছে ততক্ষণ শাস্ত্রের কথা মেনে চল। কোন্‌টা করা উচিত, কোন্‌টা অনুচিত, শাস্ত্রের কাছে তা জেনে নাও। জ্ঞানলাভ হলে তখন অবশ্য আলাদা কথা—তখন আর কোন রকম বিধি-নিষেধের বাঁধন থাকবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন বলেছেন, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগের কথাই বেশী করে বলেছেন।

গীতার পটভূমিতে দেখি রণাঙ্গনে কৃষ্ণার্জুন রথে আসীন, দু'পাশে দু'দলের সৈন্য যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে অর্জুনকে বিপক্ষস্থ আত্মীয়স্বজন ও সৈন্যদের হত্যা করতে হবে। এদের হত্যা করে যে রাজ্য লাভ হবে, তা এদের রক্তমাখা। একথা ভেবে অর্জুনের মন দারুণ বিষাদে ভরে গেল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, এভাবে রাজ্য পেয়ে লাভ কি? এ যুদ্ধ আমি করব না। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে বোঝালেন, 'তোমার নিজের ভোগের জন্য নয়, ক্ষত্রিয় হিসাবে তোমার একটা কর্তব্য আছে, সেই কর্তব্যের অনুরোধে তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে।' আরো নানা রকম যুক্তি দিয়ে বোঝালেন যে, আদর্শ ক্ষত্রিয় হিসাবে অর্জুনের এ-যুদ্ধ করাই উচিত। তারপর যে আত্মজ্ঞানের অভাবে অর্জুনের এই বিভ্রম, সেই আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিলেন গীতায়—আত্মা জন্মায়ও না, মরেও না, কেউ কাউকে হত্যা করতে পারে না, কারো দ্বারা হতও হয় না, ইত্যাদি। এই আত্মার জ্ঞান লাভ করার জন্য অর্জুনকে তিনি কর্মযোগের উপদেশ দিলেন।

তাঁকে বললেন যে, নিষ্কামভাবে কর্ম করতে হবে। মনে কোন ফলাকাঙ্ক্ষা রেখে কাজ করলে সে কর্ম বন্ধনের কারণ হয়; কিন্তু আমরা যদি নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারি, তাহলে কোন কর্মই আমাদের বন্ধনের কারণ হবে না; নিষ্কামভাবে কর্তব্য কর্ম সাধনের মাধ্যমেই আমরা ভগবানলাভ করতে পারব, স্থিতপ্রজ্ঞ হতে পারব। স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থাটা কি, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তা কয়েকটি শ্লোকে

বলেছেন। বলেছেন, এটা ব্রাহ্মী স্থিতি; বলেছেন, এ অবস্থা লাভ করলে মানুষ আর মোহগ্রস্ত হয় না, আর তার পুনর্জন্ম হয় না—"নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি। স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥"

কর্মযোগ-অবলম্বনে যাঁরা ভগবান লাভ করতে চান, তাঁদের এভাবে নিষ্কাম হয়ে কর্ম করার সাধনা করতে হয়। গীতায় কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ—চারটি যোগের কথাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন। অনেকেরই ধারণা কর্মযোগ একটা আলাদা পথ নয়; কর্মযোগ অবলম্বনে চলতে চলতে চিত্তশুদ্ধি হয়—তখন আমরা জ্ঞানযোগের অধিকারী হই এবং জ্ঞানযোগের সাধনায় ভগবানলাভ করতে পারি। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা কিছু বলেছেন, তাতে তো সেরকম মনে হয় না। জ্ঞানযোগের মতোই কর্মযোগও হল ভগবানলাভের একটা স্বতন্ত্র পথ। জ্ঞানযোগ আমাদের যে লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে, কর্মযোগও পৌঁছে দেবে সেই একই লক্ষ্যে—'যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।' একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যায় দুটো প্রায় একই। কেমন করে এক?—কর্মযোগের সাধনপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, আত্মস্থ হয়ে কাজ করে যাও; ভাববে দেহ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি, যা প্রকৃতির অন্তর্গত, তাদেরই দ্বারা কাজ হচ্ছে, আমি কিছু করছি না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেমন খাওয়া, পরা, শোয়া, চলা প্রভৃতি দেহধারণের জন্য যা প্রয়োজন তা সব করেও মনে করেন আমি কিছুই করছি না, আমা থেকে আলাদা যে প্রকৃতি সেই-ই সব কাজ করছে,—তুমিও সেই ভাবে অনাসক্ত হয়ে কর্তব্য কর্ম করার চেষ্টা করবে। তাতে, ভাবে ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠিত হলে বুঝতে পারবে যে, জ্ঞান ও কর্ম পৃথক নয়। "সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি, ন পণ্ডিতাঃ"—অজ্ঞান ব্যক্তিই বলে যে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ পৃথক, জ্ঞানীরা কখনো তা বলেন না। ঠিক ভাব নিয়ে কাজ করলে যে-সব কাজ তুমি করছো, সেই কাজের ভেতর দিয়েই তুমি ভগবান লাভ করতে পারবে। শ্রীকৃষ্ণ এভাবেই উপদেশ দিয়েছেন

তারপর ধ্যানযোগের কথা। ধ্যানযোগের কথায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, মনটাকে স্থির করতে হবে। সাধনা করে মনকে যদি ভগবানের চিন্তায় সম্পূর্ণ স্থির করতে পার, তাহলেই ভগবান লাভ হবে। কেমন স্থির?—একটা পাত্র থেকে আর একটা পাত্রে তেল ঢালার সময় সে তেলের ধারা যেমন নিরবচ্ছিন্ন হয়, চিন্তার ধারাকে তেমনি নিরবচ্ছিন্নভাবে ভগবানের দিকে প্রবাহিত করতে হবে। যেখানে বায়ুপ্রবাহ নেই সেখানে দীপশিখা যেমন নিষ্কম্প থাকে, মনকে তেমনি নিষ্কম্প করতে হবে—"যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে।" মন এ-রকম একাগ্র হলেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করবে।

এখন, মনকে স্থির করা যায় কেমন করে? অর্জুন সেকথা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি তো মন স্থির করার কথা বলছো, কিন্তু মনকে নিজের বশে আনাই তো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, একথা ঠিক—মনকে ধীর স্থির একাগ্র করা বড় শক্ত ব্যাপার। তবে তা করা যায়—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চঞ্চল মনকে স্থির করা সম্ভব। যোগসূত্রে পতঞ্জলিও এই কথাই বলেছেন—'অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।' অভ্যাস

কি ?—প্রত্যহ ধ্যান করার, মনকে ভগবচ্চিন্তায় স্থির করার চেষ্টা করতে হবে ; যখন ধ্যান করতে বসবে, মন তোমার যদি বিচলিত হয়, ভগবানের চিন্তা ছেড়ে অন্য চিন্তায় চলে যায়, তাহলে সেখান থেকে মনকে ধরে নিয়ে এসে তোমার ইষ্টচিন্তায় আবার বসাতে হবে। এভাবে বার বার চেষ্টা করতে করতে মন তোমার আয়ত্তে আসবে। বৈরাগ্য মানে মন থেকে কামনা-বাসনা ত্যাগ করা। কামনা-বাসনাই মনকে চঞ্চল করে। এগুলি মনের মধ্যেই থাকে—বুদ্‌বুদের মতো মনের গভীরতা থেকে ওপরে উঠে এগুলি যখন তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে পড়ে, তখন মনটা ভারী চঞ্চল হয়ে যায়। কিন্তু আমরা যদি বৈরাগ্য অবলম্বন করে বিচার করি, তাহলে এই সব বাসনা-কামনার বুদ্‌বুদগুলিকে মনের ওপরে আসার আগেই রোধ করতে পারি ; তাহলে আর মন অত অস্থির হয় না, অনেকটা শান্ত হয়ে আসে। এভাবে মন শান্ত আর শুদ্ধ হলে অন্তরস্থ ভগবানের দর্শনলাভ হয়—যেমন শ্রীশ্রীঠাকুর উপমা দিতেন, পুকুরের জল খুব পরিষ্কার হলে আর জলে ঢেউ না খেললে পুকুরের তলা পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। মনকে অশান্ত করার, মানস-সায়রে তরঙ্গ তোলার কারণ হল বাসনা-কামনা ; এগুলি মনকে অশুদ্ধ করারও কারণ। বাসনা-কামনাহীন মনে, শুদ্ধ স্থির মনে আত্মদর্শন হয়। এটা করা খুব শক্ত ঠিক কথা, কিন্তু অভ্যাস আর বৈরাগ্য সহায়েই মনকে স্থির করতে হবে ; এইটাই একমাত্র উপায়, অন্য উপায় আর কিছু নেই, কোন শর্টকাট নেই। আমাদের একটু কষ্ট-স্বীকারই করতে হবে—অন্য কোন উপায় নেই।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগের কথায় বলেছেন, ভগবানে বিশ্বাসী হয়ে আমরা সবসময় ভগবানের চিন্তায় মন একাগ্র করার চেষ্টা করলে ভগবানলাভ করতে পারব। তিনি বলেছেন, যদি তা না পার—যদি আমাতে সব মন একাগ্র করতে না পার—তাহলে অভ্যাসের দ্বারা চেষ্টা কর ; সেটাও যদি না পার তাহলে আমার জন্য কাজকর্ম কর ; তা-ও যদি না পার তাহলে আমাকে আশ্রয় করে সব কর্মফল ত্যাগ কর। তাহলেই তোমার মুক্তি হয়ে যাবে। ভগবান তাঁকে লাভ করার পথ এত সহজ করে দিয়েছেন, আমরা এটুকুও যদি না করতে পারি, তাহলে তা হবে খুবই দুঃখের বিষয়।

জ্ঞানমার্গের কথা, আত্মা-অনাত্মা বিচার সহায়ে ভগবানলাভের কথাও তিনি ঠিক এভাবেই বুঝিয়ে বলেছেন।

যে পথ ধরেই আমরা অগ্রসর হই না কেন, আমাদের লক্ষ্য হল 'আমি'-'আমার'-বোধ রূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবান লাভ করা।

সব ধর্মের ভিতরই এই চারটে পথ, চারটে যোগ আছে। সমস্ত ধর্ম এখানে এক। বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্নরূপ আরাধনা ও ভগবানের বিভিন্ন প্রতীক থাকতে পারে, সেগুলির অনুষ্ঠান-পদ্ধতিও বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু মূল সাধনা সব ধর্মেই এক, কেননা সব ধর্মেরই সাধনপথ এই চারিটি যোগের অন্তর্গত। এগুলি ছাড়া ভগবানলাভের অন্য পথ নাই। এই যোগগুলির এক বা একাধিক, বা সবগুলির সহায়ে যে 'আমি'-'আমার'-বোধ রূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, সে-ই ধন্য। 'আমি'-'আমার'-বোধই আমাদের সকল দুঃখের কারণ, এই বোধই আমাদের ভগবানলাভের পথের বাধা।

জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি প্রভৃতি সব পথই আমাদের নিজের কথা ভুলে ভগবানের কথাই চিন্তা করতে শেখায়, কোন না কোন ভাবে। যেমন ভক্তিপথে ভগবানের সেবা করতে করতে আমরা নিজেকে ভুলে যাই। এভাবে 'আমি'-'আমার' বন্ধন কেটে গিয়ে ভগবদ্দর্শন হয়। প্রত্যেক ধর্মই এই চারটির মধ্যে এক বা একাধিক পথের নির্দেশ দিয়েছে। খৃষ্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, হিন্দুধর্মের বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায় ভক্তিদ্বারাই ভগবানলাভের পথ দেখিয়েছেন। আবার বৌদ্ধধর্ম ধ্যান ও বিচার সহায়ে জ্ঞানলাভ করার কথা বলেছেন। এভাবে খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে বিভিন্ন ধর্মে ভগবানলাভের যে-সব পথ দেখানো হয়েছে, তা জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ প্রভৃতি চারটি যোগেরই অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য কার ধর্ম বড়, এ নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়ার কোন মানেই হয় না। সেটা অজ্ঞানেরই পরিচায়ক। সব ধর্মই মানুষের মুক্তি ঘোষণা করছে, আর মুক্তি-লাভের জন্য এই চারটের ভেতর থেকেই কোন না কোন পথ বেছে দিচ্ছে।

এখন একটা কথা উঠতে পারে যে, কেন তিনি অর্জুনকে উপদেশ দেবার জন্য এতদিন অপেক্ষা করলেন? সুযোগের তো অভাব ছিল না—কতদিন তো দুজন একত্র থাকতেন, একসাথে চলতেন, খেতেন, বসতেন। সে-সব সময় উপদেশ না দিয়ে যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এসব উপদেশ দিলেন কেন? এর উত্তর হচ্ছে, এর আগে অর্জুনের এসব জানবার ইচ্ছা ছিল না, মুমুক্ষুত্বের ভাব ছিল না। জানার জন্য যার তীব্র ইচ্ছা নেই, তাকে উপদেশ দিলে সে উপদেশ তার কাছে গ্রহণ-যোগ্য হয় না। সে অবস্থায় উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। সেজন্য উপদেশ দেবার ইচ্ছা পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের থাকলেও উপযুক্ত সুযোগ আসেনি। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর উপদেশ চাইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন যে, বলার সময় হয়েছে।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবার—শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়ে সবশেষে অর্জুনকে বলছেন, 'তোমাকে যা বলার সব বললাম; এখন তুমি নিজের ইচ্ছামতো যা ভাল মনে হয় তাই কর।'—অর্জুনকে কোন বন্ধনের মধ্যে, কোন বাধ্য-বাধকতার ভেতর রাখছেন না; তাঁকে স্বাধীনতা দিচ্ছেন। গুরু কখনই শিষ্যকে বেঁধে রাখেন না; কারণ, স্বাধীনতাই হচ্ছে একমাত্র জিনিস যাতে আমাদের উন্নতি হতে পারে। 'Freedom is the first condition of growth.'

তারপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যা সব বললাম মন দিয়ে সব শুনেছ তো? তোমার মোহ কেটে গেছে তো?' অর্জুন বললেন, 'হাঁ, তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হয়ে গেছে, আমি স্বরূপের স্মৃতিলাভ করেছি, আমার সব সন্দেহ চলে গেছে, এখন তুমি যা বলছো তাই-ই করবো।"

তারপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে-সব উপদেশ দিয়েছেন তা শুধু অর্জুনের জন্য নয়, আমাদের জন্যও। অর্জুনকে তিনি বলেছেন, "মামনুস্মর, যুধ্য চ"—আমার কথা সর্বদাই চিন্তা কর, আবার যুদ্ধও কর, যুদ্ধের সময়ও সর্বদা আমাকে স্মরণ করবে। অত বড় একটা যুদ্ধের যিনি commander-in-chief, তাঁকে

বলছেন—সর্বদা আমাকে স্মরণ করবে। এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে বলেই তো শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে এ উপদেশ দিলেন। আর অর্জুনের পক্ষে এটা সম্ভব হয়েওছিল। আমরাও কি আমাদের জীবনের সব কাজ এভাবে, শ্রীভগবানকে সর্বদা স্মরণ করে করতে পারি না? চেষ্টা করলে আমরা সবাই তা করতে পারি।

এই উপদেশটি বা গীতার যে-কোন একটি উপদেশ মেনে আমরা যদি চলতে পারি, তাতেই আমরা মুক্ত হয়ে যাব; অবশ্য শ্রদ্ধার সঙ্গে তা করতে হবে—'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।' শ্রদ্ধা না থাকলে ধর্মকর্ম কিছুই হয় না।

এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, গীতোক্ত ত্যাগের কথা কেবল সন্ন্যাসীর জন্য নয়, সর্বসাধারণের জন্যই। অর্জুন উপলক্ষ্য মাত্র—"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"*

"টাকায় কিছু হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না—ভালবাসায় সব হয়। চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।"

"আপনার উপর বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।...সেই বিশ্বাসবলে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও...নিজের উপর বিশ্বাস রাখ...বিশ্বাস কর যে, অনন্তশক্তি আমাদের মধ্যে বর্তমান। তোমরা সমগ্র ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে।"

"অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না। যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে।"

"পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

* পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭০ তারিখে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন।

দেহি বীর্যম্

শ্রীসুধীরকুমার কর

বিবেকানন্দ! বন্দে ত্বাং মহানন্দং হি নিত্যশঃ।
জগতো বন্দ্যদেবস্ত্বমনিন্দ্যরূপঃ শঙ্করঃ ॥
শিবসেবারতা নিত্যং মাতা তে ভুবনেশ্বরী।
তৎপ্রীত্যা প্রীণিতঃ শম্ভুঃ স্বয়ং ভূতো হি তৎসুতঃ।
জন্মতঃ শিবসেবায়াং ততো হি ত্বং রতো মুদা।
শিবোঽহমিতি মন্ত্রস্তে নিত্যসাধ্যো হি বাল্যতঃ ॥
অভীর্নিত্যং মহাতেজা মহাবীর্যবলান্বিতঃ।
বীরেশ্বরো নরেন্দ্রস্ত্বং নরাণাং বীরনায়কঃ ॥
মহাসাধনয়া হি ত্বমাদিত আত্মনো জয়ী।
অতো হি বিজিতং বিশ্বং ত্বয়া বীর্যেণ কৃৎস্নশঃ ॥
দেহি বীর্যং মহাবীর দেহি শক্তিং চ চিত্তরঃ।
ভবতো বীর্যমাসাদ্য বন্দিষ্যে বিশ্বমাতৃকাম্ ॥

হে বিবেকানন্দ! তোমাকে মহানন্দে নিত্য বন্দনা করি তুমি জগতের বন্দনীয় দেবতা, তুমি অনিন্দ্যসুন্দর শঙ্কর। তোমার মাতা ভুবনেশ্বরী নিত্য শিবসেবায় নিরতা ছিলেন; তাঁহার প্রীতিতে প্রীত হইয়া স্বয়ং শম্ভু তাঁহার পুত্ররূপ ধারণ করিলেন। তুমি তাই জন্ম হইতেই শিবারাধনায় আনন্দে নিযুক্ত; বাল্য হইতেই "শিবোঽহম্" মন্ত্র তোমার নিত্য উপাস্য। তুমি নিত্যকালই নির্ভীক, মহাতেজস্বী, মহাবীর্যবান এবং মহাবলে বলীয়ান। তুমি বীরেশ্বর, তুমি নরেন্দ্র, তুমি নরকুলের বীর নায়ক। তুমি সর্বাগ্রে মহাসাধনায় আত্মজয় করিলে, তাই তোমার বীর্যদ্বারা তুমি হইলে পূর্ণরূপে বিশ্বজয়ী। হে মহাবীর, আমাকে বীর্য দাও, আমার চিত্তে শক্তি দান কর; তোমার নিকট হইতে বীর্য লাভ করিয়া আমি বিশ্বজননীর বন্দনা করিব।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কুসুমকোমল! এসেছিলে তুমি বলিতে সবারে ভালোবেসে
মায়ের কৃপার অলোককাহিনী—সাধু মহাজন আলো হেসে
কেমনে সে-কৃপা করে অকৃপণধারে বর্ষণ বরদানে
কৃতার্থ করি' সাধকে—যে ধরি' ধ্যান প্রেমময়, লভি' প্রাণে
শান্তিময়ার আনন্দ দিশা চিরসুন্দর বন্দনায়
মায়ের চরণতীর্থে ক্লান্ত জীবনতরী ভিড়াতে চায়।

প্রসবি' শাবকে আকাশেই কোথা যায় হোমাপাখী- কে বা জানে?
নিম্নের টানে মহাবেগে পড়ে সদ্যোজাতক ধরাপানে:
পতনের মুখে চমকি' সে দেখে—জননী গগন বহুদূরে,
শিলাকঙ্করে হবে মুহূর্তে চূর্ণ—উছলি' 'মা-মা'-সুরে
হয় সে উধাও ঊর্ধ্ব-পানে. সে মাটির কোলের শিশু তো নয়,
সে যে অসীমাশী, তাই গায়: "জয় নীলিমা-করুণাময়ীর জয়!"

ঠাকুর তাঁহার "মানসপুত্র" উপাধি তোমায় দিয়ে প্রেমে
কহিতেন: "তুমি নিত্যসিদ্ধ, জীবন্মুক্ত এলে নেমে
মৃন্ময়ীবুকে হে জন্মযোগী. জগন্মাতার শিশু চারণ,
আসন্ন নবারুণের জ্যোতির উড়ায়ে হিরণ্ময় কেতন
গাহিতে: 'পোহাবে নিশা রে, মিটিবে তৃষা তারিণীর গান গেয়ে'
এ-বাণী করিতে প্রচার ভূলোকে এলে দ্যুলোকের তরী বেয়ে।"

বিনম্র তুমি গাহিলে: "মায়ের দাস আমি এ-বসুন্ধরায়
যা কিছু আমার সবি দান মা-র—ফিরে সঁপি তাঁর কমল পায়।
গঙ্গাপূজা তো গঙ্গাজলেই—কে না জানে? মা-র কাছে যা পাই
তাঁরি পায়ে দিয়ে অঞ্জলি আমি ধন্য নিজেরে গণি সদাই।
তাঁর সমুদ্রে আমি বুদ্বুদ—নানা রঙে নেচে চলি সুখে,
জীবনে রঙিন মায়ের অধীন, মরণেও তাঁর গলি বুকে।
হৃদয়তন্ত্রী তাঁরি হাতে ওঠে বেজে কত রাগে নিরবসান!
যখনই মিলাই তাঁর সুরে সুর—ওঠে ঝঙ্কারি' কত না তান!

শুধু হায় যেই আমার 'আমি' সে-বীণাটি বাজায়—কাঁপে না আর
সুরেলা ভক্তিগমক—বেসুরা বাজে প্রতি তার হাতে আমার।"
শ্যামা মা-র মাঝে নিরখিলে শ্যামে, ব্রজের দুলাল রাখালরাজ!
অসি বাঁশি হ'ল করে শ্যামলের, শিরে শিখিচূড়া, মোহন সাজ।

যেথা তুমি যেতে দিতে দীনতার এ-মহাদীক্ষা জনে জনে,
তোমাকে প্রণাম করি' তারা তব মন্ত্র জপিত মনে মনে:

"যা কিছু আমার আছে আপনার—সব দিয়ে করি মায়ে বরণ,
নর্মে—তাঁহার সাধি ফুলহাসি, কর্মে—তাঁহার প্রেমার্চন।
যা কিছুই করি নিখুঁত হোক—সে যতই কেন নগণ্য হোক,
ধনমান যেন চাই না—মায়ের চরণ ছুঁয়ে সে ধন্য হোক।
'আমি নই—তুমি' এই সুরই আজ উঠুক মা, বেজে নিরন্ত,
বুকের বীণার এ মূর্ছ'নায় ছেয়ে যাক দিক-দিগন্ত।"

তোমারি ছন্দে পরমানন্দে আজ তব গুণগাণ করি
'মা-মা' ডাকে যার লভিত অপারে পার কত শত প্রাণতরী।

"ভাবের তরঙ্গ দূরকে নিকটে বাঁধিয়া রাখে।…ভাব না আসিলে স্বার্থকে তাড়াইতে পারে না।"

"শুধু কর্ম করলেই হবে না। ভগবদ্ভাব আশ্রয় করে কর্ম করতে হবে।"

"তীব্র কর্ম কর, আর নাম কর। সব কর্মের ভিতর কর দেখি তাঁর নাম। এই নামের চাকা সব কাজের মধ্যে ঘুরবে, তবে তো? করে দেখ, একদম সব জ্বালা ঘুচে যাবে।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

হিমালয়ের চিঠি

পথিক

আজ ১৬ই অক্টোবর, ১৯৭০।

হিমালয়ের কুমায়ুন অঞ্চল দিয়ে হেঁটে চলেছি। পথ কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই। কোথাও বা জঙ্গলাকীর্ণ; আবার কোথাও বা খরস্রোতা পার্বত্য নদী তরতর করে বয়ে চলেছে। যাচ্ছিলাম এক পাহাড়ী বৃদ্ধকে দেখতে—মাইল চারেক হেঁটে। বৃদ্ধের বয়স এখন ৯৩। নাম শ্রীমোহনলাল শা। স্বামীজীকে তিনি চারবার দেখেছিলেন।

তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর বললাম: স্বামীজীর কথা কিছু বলুন।

বৃদ্ধ বলে চললেন আবেগের সঙ্গে তাঁর সেই প্রিয় কথাগুলি।

দেখুন, স্বামীজীকে আমি ৪ বার দেখেছি। প্রথম দেখি ১৮৯০ সালে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে। আমি তখন আলমোড়ায় থাকতাম। লালা বদ্রী শা-র ছোট ভাই ছিল আমার বন্ধু। আর একটু আত্মীয়তাও ছিল। স্বামীজী তাঁদের বাড়ীতেই উঠেছিলেন। আমার স্বামীজীকে দেখে মনে হয়েছিল ইনি বুদ্ধদেব। কী অপূর্ব চেহারা!

তারপর স্বামীজীকে দেখি ১৮৯৭ সালে আলমোড়ায়। তিনি তখন আমেরিকা থেকে ফিরে আলমোড়ায় আসছিলেন। আমরা ২ মাইল এগিয়ে গিয়ে procession করে নিয়ে এলাম। কী ধূমধাম হয়েছিল! আর কত লোক! বদ্রী শা-র বাড়ীর সামনে বাজারের ভিতর meeting হয়। স্বামীজী উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু কোন কথা এখন আর মনে নেই।

তারপর স্বামীজী আসেন ১৮৯৮ সালে অর্থাৎ পরের বছর। তখন স্বামীজী থাকতেন Thompson House-এ এবং নিবেদিতা প্রভৃতি থাকতেন Oakley House-এ। একদিন স্বামী স্বরূপানন্দজী আমাকে বললেন, 'তুমি মায়াবতীতে আমাদের সঙ্গে যাবে?' আমি বললাম, 'কাল আপনাকে বলব।' তার পরদিন আবার তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম যে, আমি যাবার জন্য তৈরী। ব্যস্, মিঃ সেভিয়ার, মাদার সেভিয়ার ও স্বরূপানন্দজীর সঙ্গে চলে এলাম মায়াবতী।

মায়াবতীতে তখন চায়ের বাগান ছিল। আমরা চা কি করে শুকোয় দেখেছি। ঐ বাড়ী সব ঠিকঠাক করা হল। স্বামী বিরজানন্দজী উপরে ঠাকুরের পূজার ঘর তৈরি করলেন। ফুল দিয়ে সাজান হ'ত। তারপর ১৯০১ সালে স্বামীজী মায়াবতী এসে ঠাকুরপূজা বন্ধ করে দিলেন।*

স্বামীজী মায়াবতী আসছেন। স্বরূপানন্দজী আমাকে বললেন, 'স্বামীজী তো আসছেন; কিন্তু স্বামীজীকে কি খাওয়ান যাবে? দেখ তো কিছু যোগাড় করতে পার কি

* স্বামীজী ঠাকুরঘর দেখিয়া ম্যাডাম সেভিয়ার ও স্বামী স্বরূপানন্দকে খুব তিরস্কার করেন, কারণ অদ্বৈত আশ্রমে শুধু অদ্বৈত ভাবের চর্চা হইবার কথা ছিল, পূজাদি নয়। অবশ্য স্বামীজী তখনই উহা তুলিয়া দিতে বলেন নাই; তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া পরে উহা উঠাইয়া দেওয়া হয়।—সঃ

না।' তখন শীতকাল। দারুণ শীত। আমি চললাম দূরে এক পাহাড়ী গ্রামে। যোগাড় করলাম থোড়, কাচকলা ও আরও কয়েকটা সামগ্রী। নিজেকেই ঐ সব জিনিস রান্নার জন্য কেটে গুছিয়ে দিতে হল।

স্বামীজী এলেন। বিরজানন্দ মহারাজ সঙ্গে ছিলেন। প্রথম দুদিন স্বামীজী মায়াবতী আশ্রমের দোতলায় ছিলেন। তারপর দেখলেন খুব শীত। তখন নীচে fireplace-এর কাছে এসে শুতেন।

আমি তখন খুব ব্যস্ত। আশ্রমের নীচের তলায় পিছনের দিকে ছিল প্রেস। Prabuddha Bharat পত্রিকার সব article আমাকে compose করতে হ'ত। স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ বেশী পাইনি। তাঁকে ঘিরে সব বড় বড় লোক বসে থাকত। একদিন দেখি তিনি হলের মধ্যে পায়চারি করছেন আর জোরের সঙ্গে কী-সব বলছেন; আর মাদার সেভিয়ার প্রভৃতি সব চুপচাপ বসে শুনছেন।

স্বামীজী তখন মায়াবতীতে দুটো article লেখেন—একটা হল 'The Aryans and the Tamilians' আর একটা Theosophist-দের উপর। প্রবন্ধ দুটি compose করে আমি proof নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালুম। তিনি নিয়ে দেখতে লাগলেন।

কী অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম বৃদ্ধের জীবনে! রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বৃদ্ধের দুই শতাব্দী জড়ানো সম্পর্ক। কত সাধুর পুণ্যস্মৃতি সেই পাহাড়ী বৃদ্ধের বুকের পরতে পরতে রয়েছে। আমি তাঁকে বেলুড় মঠের দুজন প্রাচীন সন্ন্যাসীর কথা বললাম যে, তাঁরা আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেন। কারণ মায়াবতীতে তাঁরা প্রথম যুগে দীর্ঘকাল ছিলেন। তাঁদের নাম শোনামাত্র বৃদ্ধের চোখ ছলছল করে উঠল। আবেগভরে বললেন, 'তাঁরা আমার অন্তরের—।'

বৃদ্ধ চিরকুমার। এক বৃদ্ধা আত্মীয়া দেখাশোনা করেন। এক সন্ন্যাসী তাঁকে উপহার দিয়েছেন একটা ঘড়ি। সেটা হাতে বাঁধা। ময়লা কোটটির ভিতর দিয়ে বৃদ্ধের ঘড়ির ব্যাণ্ডটা চকচক করছিল। আর একজন সন্ন্যাসী দিয়েছেন একখান তুলসী রামায়ণ। বৃদ্ধ তাঁর কথাও বলতে লাগলেন

বিবেকানন্দের যা কিছু সব তাঁর কাছে পবিত্র। অদ্ভুত বিবেকানন্দ-প্রেমিক! বলছিলেন, 'দেখুন, আজ একখানা "ধর্মযুগ" (হিন্দী পত্রিকা) কিনেছি ৮০ পয়সা খরচ করে। এতে স্বামীজীর ছবি বেরিয়েছে কন্যাকুমারিকার দৃশ্যসহ। আমি এটা পড়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের লাইব্রেরীতে পাঠিয়ে দেবো।'

আমার প্রশ্ন ছিল বহু। কিন্তু বৃদ্ধ খুব কাশছিলেন। পকেট থেকে কয়েকটা লজেন্স বের করে দিলাম। বালকের মত খুশী হয়ে নিয়ে চুষতে লাগলেন। আমরা নিয়ে গিছলাম কিছু পাহাড়ী মিঠাই—সুজি, ময়দা ও খোয়াক্ষীরের তৈরী। আমাদের হাত থেকে নিয়ে খুশী মনে খেতে লাগলেন। বৃদ্ধ বলছিলেন, 'ভাই, খিদে পায় না। দাঁতও খারাপ হয়ে এসেছে। খুব কাশি হচ্ছে।' দাঁতের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল যে ৯৩ বছর বয়সে দাঁত খারাপ হওয়াটা দোষের বিষয় কি? যাহোক মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম বৃদ্ধের কোন অসুবিধা দেখলে এগিয়ে পড়েন। তাঁর জন্য মাসিক টাকা বরাদ্দ আছে। আশ্রমের ম্যানেজার মহারাজ কাশির ঔষধের ব্যবস্থা করে দিলেন।

বৃদ্ধের আর একটা অসুবিধা শুনলাম—'ভাই, শীত আসছে। কিছু কাঠকয়লা চাই।' হিমালয়ের ঐ দারুণ শীতে যোয়ানদেরই হাত পা না সেঁকলে রক্ত জমে যায়। বৃদ্ধের কা কথা! ম্যানেজার মহারাজ ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আশ্রম থেকে কয়লা পাঠিয়ে দিলেন।

পরিষ্কার বাংলা বলেন তিনি। ঐরূপ পরিষ্কার বাংলা বাঙ্গালীদের মুখেও শোনা যায় না। স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা তিনি অনুরাগের সঙ্গে পড়েন।

তারপর বৃদ্ধ বলছিলেন, 'দেখুন, গতকাল রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছি। মায়াবতী আশ্রমে ঠাকুরের পূজা হচ্ছে। আমি ঘণ্টা বাজাচ্ছি। তারপর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। তাই, ঠাকুর আর কতদিন রাখবেন তিনিই জানেন।' তাঁর প্রাণের কথা আমাদের প্রাণকেও নাড়া দিচ্ছিল। বেশ মিষ্টি লাগছিল তাঁর কথাগুলি।

বৃদ্ধের শেষ ইচ্ছা বলছিলেন ম্যানেজার মহারাজের কাছে: 'আমি মরে গেলে আমাকে মায়াবতীতে নিয়ে যাবেন। মায়াবতী নদীর ধারে যেখানে স্বামীজীর শিষ্য বিমলানন্দজীকে দাহ করা হয়েছিল, সেখানে দাহ করবেন।' স্বামীজীর মায়াবতীর প্রতি কী দুর্নিবার আকর্ষণ!

৯৩ বছর বয়সে মুখে হাসি ধরে রাখা চারটিখানি কথা নয়। গায়ের চামড়া কুঁচকে আসছে। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। পায়ে উলের মোজা। বৃদ্ধ যখন স্বামীজীর কথা বলছিলেন মুখখানি ছিল হাসিতে ভরা। দেড়-দু ঘণ্টার মধ্যে কোন বিষাদের চিহ্ন দেখলাম না তাঁর মুখে। ছিল না কোন হাহুতাশ বা কোন অতৃপ্তি। সদাতৃপ্ত বৃদ্ধ প্রথমেই ঘর থেকে বেরিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন সাধুদের। আর বিদায়ের বেলায় প্রণামের পরিবর্তে কোলাকুলি হল।

পথিক আবার তার সেই আঁকা-বাঁকা, চড়াই-উৎরাই-এর পথ ধরল। যে পথ হিমালয়ের বুকের ওপর দিয়ে চলে গেছে দূরে, বহুদূরে—সেই অন্তহীন অদ্বৈতের পানে।

এ কি খেলা

অনপেক্ষ

আমায় নিয়ে একি খেলা
ওগো প্রভু তোমার ;
বারে বারে ভাসাই ভেলা
অকূল যে পাথার !
জাগে শঙ্কা, নামে আঁধার—
তবু জানি, জানি,
তুমিই চির কর্ণধার হে
সর্বশঙ্কা হানি'
আসবে শেষে, মধুর হেসে—
কোলে টেনে তোমার
নেবেই তুলে ভালবেসে
বলবে, 'তুমি আমার !'

প্রিয় ওগো, ছিলাম সদাই
ছিলাম তোমার কাছে ;
ছিলে তুমি অনুক্ষণই
আমার হৃদি মাঝে।
পড়ত যদি দৃষ্টি,
যদি নত হ'ত চোখ
দেখতে পেতাম, আমার মাঝেই
স্থিত বিশ্বলোক,
দেখতে পেতাম, চিরদিনই
আমার 'আমি' আছে
তোমার সাথে মিশে কিম্বা
তোমার অতি কাছে।

স্বামীজীর ভাবশিষ্য নেতাজী

শুকুমার দত্ত

স্বামীজী ও নেতাজী। ভারতবর্ষের দুই মহান চরিত্র। দুইজনেই আধ্যাত্মিক-চেতনা-সম্পন্ন পুরুষ। দুইজনের চিন্তায় সাদৃশ্য—তীব্র স্বদেশপ্রেম। সেই প্রেম শুধু চিন্তার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, তার জলন্ত প্রকাশ হয়েছিল কর্মের ক্ষেত্রে। জাতিধর্মনির্বিশেষে দুইজনেই সমভাবে ডাক দিয়েছেন দেশবাসীকে, শুনিয়েছেন ত্যাগের মন্ত্র। দুই জন দুই পথ দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু লক্ষ্য সেই এক—ভারতমাতার সেবা। একজন সেই সেবার বীজ বপন করে মানুষকে ভালবাসতে শেখালেন, দেশকে মা-জ্ঞান করতে বললেন, কাপুরুষতাকে দূরে ফেলে দিয়ে সোঽহং শিবোঽহং ধ্বনিতে ভারতাত্মাকে মহিমান্বিত করলেন,—অপরজন সেই ধ্বনি অনুসরণ করে দেশমাতার বীর সেবকরূপে নিজেকে প্রকাশিত করলেন। দুইজনেই মুক্তির পূজারী—সকল রকম বন্ধন থেকে মুক্তির; আত্মার অনন্ত শক্তিতে বিশ্বাসী উভয়েই। বন্ধন-অসহিষ্ণু এই দুই জনেই কর্মযোগী।

স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই দুই মহাপুরুষের চরিত্র আলোচনা করে আমরা জানতে পারি, সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের প্রভাব দ্বারা কি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কৈশোরকালে বিচিত্র ভাবদ্বন্দ্বে সুভাষচন্দ্র যখন বিব্রত, বিভিন্ন সমস্যায় তাঁর মন যখন অশান্ত, সেই সময় "হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই যেন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলাম। আমাদের এক আত্মীয় (সুহৃৎচন্দ্র মিত্র) নতুন কটকে এসেছিলেন। আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকতেন। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর ঘরে বসে বই ঘাঁটছি হঠাৎ নজরে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলোর উপর। কয়েক পাতা উল্টেই বুঝতে পারলাম এই জিনিসই আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম। বইগুলো বাড়ী নিয়ে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার হৃদয়-মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল, আমি তাঁর বই নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলাম। আমাকে সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁর চিঠিপত্র এবং বক্তৃতা। তাঁর লেখা থেকেই তাঁর আদর্শের মূল সুরটি আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' মানবজাতির সেবা এবং আত্মার মুক্তি—এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ।"[১] পনেরো বছরেরও কম বয়সে সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দের আদর্শকে নিজ জীবনে গ্রহণ করলেন। বিবেকানন্দের প্রভাব সুভাষের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। ওই বয়সে স্বামীজীকে সম্পূর্ণভাবে বুঝবার ক্ষমতা সুভাষচন্দ্রের ছিল না, "কিন্তু কয়েকটি জিনিস একেবারে গোড়া থেকেই আমার মনে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে আমার কাছে বিবেকানন্দ ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তাঁর মধ্যে আমার মনের অসংখ্য জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম। …এখন স্বামী বিবেকানন্দের পথই আমি বেছে নিলাম।"[২]

---

১ ভারতপথিক। সুভাষচন্দ্র বসু। পৃষ্ঠা ৪২-৪৩

২ ভারতপথিক। সুভাষচন্দ্র বসু। পৃষ্ঠা ৪৪

জীবনের সেই পরম সন্ধিক্ষণে নেতাজী স্বামীজীর আদর্শকে নিজ জীবনে গ্রহণ করলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জনসেবা অপরিহার্য। বিবেকানন্দের জনসেবা তথা দরিদ্রনারায়ণের সেবায় সুভাষচন্দ্র আত্ম-নিয়োগ করলেন –কারণ 'দরিদ্রের মধ্যে দিয়ে ভগবান আমাদের কাছে আসেন, কাজেই দরিদ্রের সেবা মানেই ভগবানের সেবা।' ভিক্ষুক, ফকির, সাধু-সন্ন্যাসী সকলের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চর্চা, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গ-আলোচনা একই সঙ্গে চলতে লাগল। তারপর একদিন বাড়ীর কাউকে না জানিয়ে বৈরাগ্যবশতঃ সুভাষচন্দ্র ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। সন্ন্যাসীর বেশে তীর্থ পরিভ্রমণ করতে গিয়ে দেখলেন দেশবাসীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন রূপ, ধর্মের গোঁড়ামি, জাতিভেদের প্রখরতা। সুভাষচন্দ্র বুঝলেন এর মূল কারণ হচ্ছে পরাধীনতা। তাই সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জন করা,—নিজের মুক্তির চিন্তা এখন থাক। দেশের লোককে আগে মনের দিক থেকে তৈরি করতে হবে। দেশবাসীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে, আর এর জন্য প্রথম কাজই হচ্ছে ইংরেজদের অধীনতাপাশ ছিন্ন করা। বিপ্লবী হতে হবে, হতে হবে স্বাধীনতার অক্লান্ত যোদ্ধা। তাই নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। সুতরাং আর সময় নষ্ট নয়। ঘরে ফিরে এলেন সুভাষচন্দ্র। কাউকে না জানিয়ে যেমন হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছিলেন, বাড়ীর সকলকে চমকে দিয়ে আকস্মিকভাবেই ঘরে ফিরলেন। ওই সময় স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব সুভাষচন্দ্রের জীবনে কত তীব্র আকার ধারণ করেছিল, কৈশোরে এই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই তা বোঝা যায়।

যদিও পরবর্তী জীবনে সুভাষচন্দ্রকে আমরা একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ ও স্বাধীনতার অক্লান্ত যোদ্ধা, মহান সৈনিক ও আদর্শ দেশপ্রেমিক হিসেবে দেখি কিন্তু তাঁর এই দেশকে ভালবাসার পিছনে ছিল এক সুগভীর প্রেরণা, সে প্রেরণা আধ্যাত্মিক প্রেরণা যা তিনি পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের আদর্শ গ্রহণ করে। রাজনীতির আবর্তে প্রবেশ করলেও সুভাষচন্দ্রের এই অধ্যাত্মসত্তা এতটুকু ম্লান হয়নি। সুভাষের অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীদিলীপ রায় লিখেছেন "সুভাষকে আমি ব্যক্তিগতভাবে বরেণ্যতম মনে করি এইজন্য যে, রাজনীতির আখড়ায় এ যুগে ভারতের যত মহাজন অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে এক শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া সুভাষের অধ্যাত্মসত্তাই ভারতের আত্মার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ; ভারতের অধ্যাত্মসত্তার অন্তরের রূপ তার শিবনেত্রে যে ভাবে ফুটে উঠেছিল, রাজনৈতিকদের মধ্যে আর কারুর নেত্রেই ভারতের সে রূপটি ফুটে ওঠেনি।"* সুভাষের মধ্যে যে পবিত্রতা, ভাবভঙ্গীতে যে সমাহিত গাম্ভীর্যের দীপ্তি—সেই দীপ্তির মূলে ছিল আবাল্য সংযম, একনিষ্ঠ তপস্যার তেজ ও নিষ্ঠা। তাঁর প্রিয় বই ছিল ভগিনী নিবেদিতার "The Master as I saw Him." স্বামীজীর দেশপ্রেম সম্পর্কে বলছেন নিবেদিতা, "There was one thing however, deep in the Master's nature, that he himself never knew how to adjust. This was his love of his country and his resentment of her suffering. Throughout those years in which I

* স্মৃতিচারণ। দিলীপকুমার রায়। পৃষ্ঠা ৩৬৬

saw him almost daily, the thought of India was to him like the air he breathed···he was born a lover, and the queen of his adoration was his motherland."[৪] বেদান্ত-প্রচারক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের স্বদেশের প্রতি কি তীব্র, কি গভীর ভালবাসা! নেতাজীর দেশপ্রেম বুঝতে হলে স্বামীজীর ভারত-ভক্তির গভীরতা জানতে হবে। স্বামীজীর সেই পবিত্র স্বদেশমন্ত্র—"হে ভারত, ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই! বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"[৫] স্বামীজী আরও বলেছিলেন, "ভারতের ধূলিকণা আমার নিকট পবিত্র।" নেতাজীর দেশপ্রেমও ছিল এইরকম গভীর। দেশের দুঃখকে তিনি নিজের দুঃখ বলে গ্রহণ করেছিলেন। অনুভব করেছিলেন পরাধীনতার মর্মজ্বালা। "Freedom, freedom is the song of the soul"—স্বামীজীর এই বাণীর আলোকে সুভাষচন্দ্রের হৃদয়াগ্নি প্রজ্বলিত। মানুষকে যাবতীয় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া স্বাধীনতা পাবার আর অন্য কোনো রাস্তা নেই—এই ভাব নিয়ে তখন চারদিকে বিপ্লবীদের যে প্রশংসনীয় কর্মধারা এগিয়ে চলেছে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি সেই দিকে। এইসব বিপ্লবীরা কিন্তু একটু অন্য ধরনের। এঁরা দেশকে মা-জ্ঞান করেন। গীতার বাণীর আলোকে এঁদের প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত, এঁরা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। আর বিবেকানন্দ! বিবেকানন্দই এঁদের শক্তির উৎস। বিপ্লবীদের প্রায় প্রত্যেকের নিকটই পাওয়া যেত স্বামীজীর বই—'কর্মযোগ' 'রাজযোগ', 'বীরবাণী', প্রেরণামূলক চিঠি-পত্রাদি 'পত্রাবলী'। সুতরাং সবার আগে বিবেকানন্দ। তাই সুভাষচন্দ্র সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছাকে সংযত করে গ্রহণ করেছিলেন সৈনিক-জীবন—কারণ বিপ্লব ছাড়া পথ নেই। আই. সি. এস. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে ইংরেজদের দাসত্বের পদ ত্যাগ করে ঝাঁপ দিলেন রাজনৈতিক কর্মসাগরে—স্বাধীনতা আন্দোলনের মহাযজ্ঞে। যে সুভাষচন্দ্র কৈশোরে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, আজ তাঁর এ পরিবর্তন কেন? তার উত্তরে বলছেন তিনি, "····· সন্ন্যাসী হতে পারা ত গৌরবের কথা, আমার কথা হচ্ছে আগে সৈনিক, পরে সন্ন্যাসী। কী বলছেন বিবেকানন্দ! বলছেন, 'আগে রজঃশক্তিকে উদ্দীপন কর্, তারপর পর জীবনে মুক্তিলাভের কথা তাদের বল্। আগে ভিতরের শক্তিকে জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করা, উত্তম অশন বসন, উত্তম ভোগ আগে করতে শিখুক, তারপর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি

---

৪ The Master as I saw Him.—Sister Nivedita. (Complete Works of Sister Nivedita Birth Centenary Publication, Vol I, p 45.)

৫ বর্তমান ভারত। স্বামী বিবেকানন্দ

করে মুক্ত হতে পারবে তা বলে দে।"[৬] এই যে 'ভিতরের শক্তিকে জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের উপর দাঁড় করা'—এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরাধীন দেশের পক্ষে প্রাথমিক কাজই হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জন করা। তবেই দেশবাসীর মধ্যে আসবে আত্মবিশ্বাস। আর তখনই সম্ভব হবে অসাধ্য-সাধন। তাই দীক্ষা নিতে হবে অভীঃ মন্ত্রে। কারণ, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। তাই হতে হবে দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী আর সেইজন্য প্রয়োজন ব্রহ্মচর্য-অবলম্বন। শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠলে তবেই পাওয়া যাবে পরম ঈপ্সিতকে। "সুভাষও আমরণ ছিল শক্তিসাধক। কৈশোরে গঙ্গা-জলে নেমে আবৃত্তি করত বিবেকানন্দের 'Kali the Mother'—

"Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in destruction's dance
To him the Mother comes."[৭]

—এইভাবে স্বামীজীর ভাবের আলোকে নেতাজী-চরিত্রের সার্থক বিকাশ পরিণতি লাভ করেছে।

সমালোচক মোহিতলালের উক্তি,—"বিবেকানন্দ-জীবনের জীবন্ত ভাষ্যরূপে আজ আমরা নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে দেখিতেছি।··· স্বামীজীও ঠিক যে কারণে দেশপ্রেমিক, নেতাজী সুভাষচন্দ্রও কি ঠিক তাহাই নহেন? নেতাজীর দেশপ্রেমে জাতিধর্মনির্বিশেষে যে এক অপূর্ব 'ভারতীয়তা'-বোধ আমরা দেখিয়াছি—দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, স্বামীজীর সেই দেশপ্রেম-মন্ত্রই নেতাজীর সাধনায় বাস্তবে পরিণত হইয়াছে।[৮] বাস্তবিক, স্বদেশের প্রতি নেতাজীর তীব্র ভালবাসা, নেতাজীর ত্যাগ, নেতাজীর দৃঢ় কর্মশক্তি এই সকল লক্ষণই স্বামীজীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মোহিতলালের মতে, "নেতাজী যে এক অর্থে স্বামীজীর মানস-পুত্র তাহাতে সন্দেহ নাই; একজনের হৃদয়ে যাহা বীজরূপে ছিল, আরেকজনের জীবনে তাহাই বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান বা মুক্তি-তত্ত্বকেও গৌণ করিয়া যে সাক্ষাৎ স্বামীজীর অন্তরে একটি প্রবল শক্তিরূপে বিরাজ করিত, নেতাজীও সেই মুক্তিকে অন্তরে লাভ করিয়াছিলেন—দুইজনের প্রেমও সেই মুক্ত প্রাণের পরার্থপ্রীতি।"[৯] সত্যই মোহিত-লালের দৃষ্টি কত গভীর, কত তাৎপর্যপূর্ণ! সুভাষচন্দ্রের চরিত্রবিশ্লেষণে তাঁর এই সুগভীর স্বচ্ছ বিশ্লেষণের মূল্য অপরিসীম।

সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটেছিল, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা বলতে আরম্ভ করলে যিনি আত্মহারা হয়ে উঠতেন, সন্ন্যাস-জীবনকে যিনি পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, ভারতবর্ষ যাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় দেশ, সেই সুভাষচন্দ্র যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করে ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন, তাহলেও আমরা তাঁর মধ্যে বিবেকানন্দের প্রতিচ্ছবিই দেখতে পেতাম।

নেতাজীও তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে, বক্তৃতায় বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যেসকল উক্তি করেছেন, তা থেকে বোঝা যায় বিবেকানন্দের আদর্শে তিনি কি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত! এক

৬ কেম্ব্রিজে দিলীপ রায়ের সঙ্গে সুভাষের কথোপ-কথন।

৭ স্মৃতিচারণ। দিলীপকুমার রায়। পৃষ্ঠা ৩৬৭

৮ বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। মোহিতলাল মজুমদার। পৃষ্ঠা ১৪৩

৯ বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। মোহিতলাল মজুমদার। পৃষ্ঠা ১৪৪

জায়গায় তিনি লিখছেন, "বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমি আত্মহারা হয়ে যাই। স্বামীজী ছিলেন পৌরুষসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ—তিনি ছিলেন মনে প্রাণে সংগ্রামী, সেইজন্য তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে গেলেও সেই মহাপুরুষের বিষয় কিছু বলা হবে না, এমনি ছিলেন তিনি মহৎ এমনি ছিল তাঁর চরিত্র—যেমন মহান, তেমনি জটিল।...আজ তিনি জীবিত থাকলে আমি তাঁর চরণেই আশ্রয় নিতাম।"[১০] নেতাজী তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে জনসাধারণকে, বিশেষ করে তরুণদের স্বামীজীর গ্রন্থ পাঠ করতে বলছেন। তাঁর মতে, "চরিত্রগঠনের জন্য 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য আমি কল্পনা করিতে পারি না।" অপর এক জায়গায় তিনি লিখছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ।...আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ তাঁহাকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম। যাহা হউক, যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব—এ কথা বলাই বাহুল্য।"[১১] স্বামীজীর বাণীর আলোকে সুভাষচন্দ্রের চরিত্র আমরা আলোচনা করেছি। এরপর নেতাজীর উপরি-উক্ত এই বাণী থেকে বলা যায় না কি নেতাজী স্বামীজীর অন্যতম ভাবশিষ্য?

পরিশেষে নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস যিনি রচনা করেছেন, যিনি স্বামীজীর বাণীর আলোকে ভারতাত্মাকে প্রেমময় দৃষ্টিতে দেখতে শিখিয়েছেন, যাঁর চরিত্রে অধ্যাত্মসত্তার পূর্ণবিকাশ আমরা লক্ষ্য করি, যাঁর জীবন ভারতের আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক ক্ষত্রিয় আদর্শকে, ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রবীর্যের সমন্বিত রূপকে, শ্রীরামচন্দ্র-শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত মহাবীর-ভীম-অর্জুনাদিকে স্মরণ-পথে এনে দেয়,—যিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধের অক্লান্ত যোদ্ধা, সেই বীরশ্রেষ্ঠ নেতাজীকে আমি অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করি। আর প্রাণের প্রণাম জানাই সেই নেতার নেতা বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে, যাঁর অনুপ্রেরণায় নেতাজী-চরিত্রের পুণ্য উন্মেষ, স্বাধীন বিকাশ ও সার্থক পরিণতি রূপলাভ করেছে।

১০ ৬ই মে ১৯৩২, সিওনি (মধ্যপ্রদেশ) জেল থেকে লেখা। বিশ্ববিবেক। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শঙ্কর। পৃষ্ঠা ১৮৭

১১ ৬ই মার্চ ১৯৩৬, উদ্বোধন-সম্পাদককে লিখিত

"চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।"
"আপনার উপর বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস—ইহাই উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী আদিনাথানন্দ

শ্রুতি যে বলিয়াছেন,—'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—তাহার অর্থ ব্রহ্মসত্তাতিরিক্ত নানা বস্তুর সত্তা নাই। যেমন, বৃক্ষ ও তাহার শাখা। সমুদ্র ও তাহার ঢেউ। সমকালীন সবই আছে। অথচ 'বহুশাখা'র জ্ঞান বৃক্ষ-সত্তাকে বাদ দিয়া হয় না!

'গুণ ও গুণী' সম্বন্ধ ধরা যাক। 'গুণ' একটি দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া আছে। দ্রব্য বা বস্তুকে চিনিতে হইলে 'গুণের মাধ্যমে চিনিতে হইবে'।

ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ শ্রুতি বলিয়াছেন—'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম'—এই গুণত্রয় যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া আছে তিনিই 'পরম ব্রহ্ম'—'নারায়ণ'। আমরা গুণকে অস্বীকার করিয়া কোন বস্তুর কল্পনা করিতে পারি না। 'গুণকে' মিথ্যাজ্ঞানকল্পিত বলিলে 'বস্তুকে' উড়াইয়া দেওয়া হয়। কারণ 'গুণ ও গুণীর' সম্বন্ধ 'অপৃথকসিদ্ধি' ন্যায়সম্মত।

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।' (তৈত্তি: উ: ২।১।৩)

ইত্যত্রাপি সমানাধিকরণ্যস্যানেকবিশেষণ-বিশিষ্টে কার্যাভিধানব্যুৎপত্ত্যা। ন নির্বিশেষ-বস্তুসিদ্ধিঃ।

[ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানও অনন্ত। তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সহিত সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত বাদের সমাধিক বৃত্তির দ্বারা বুঝাইতেছে যে, ব্রহ্ম অনেক বিশেষণবিশিষ্ট—অদ্বয় ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ হইতেছে না।]

ইহা বলা হইয়াছে, 'বহুত্ব' ব্রহ্মে কল্পিত হইয়াছে।

যদপ্যুচ্যতে—নির্বিশেষে স্বয়ংপ্রকাশে বস্তুনি দোষপরিকল্পিতমীশেশিতব্যাদ্যনন্তবিকল্পং সর্বং জগৎ। দোষশ্চ স্বরূপ-তিরোধান-বিবিধ-বিচিত্রবিক্ষেপকরী সদসদনির্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যা। সা চাবশ্যাভ্যুপগমনীয়া; 'অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ' (ছান্দোঃ উঃ ৮।৩।২) ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ, ব্রহ্মণঃ তত্ত্বমস্যাদিবাক্য-সামানাধিকরণ্যাবগত-জীবৈক্যানুপপত্ত্যা চ। সা তু ন সতী, ভ্রান্তি-বাধয়োরযোগাৎ। নাপ্যসতী, খ্যাতি-বাধয়োশ্চাযোগাৎ। অতঃ কোটিদ্বয়-বিনির্মুক্তেয়মবিদ্যেতি তত্ত্ববিদঃ। (শ্রীভাষ্য, ১।১৬)

[স্বয়ংপ্রকাশ নির্বিশেষ বস্তু ব্রহ্মে দোষ-বশতঃ এই ভ্রমকল্পনা। এই দোষটি হইতেছে 'অবিদ্যা'। এই অবিদ্যারূপ দোষ ব্রহ্মস্বরূপের আচ্ছাদক এবং বিবিধ বিক্ষেপের সৃষ্টিকর্ত্রী। ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে, অতএব ইহা অনির্বচনীয়। ইহা অনাদি। 'মিথ্যা কল্পনায় বিপরীতভাবপ্রাপ্তা' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে এই 'অবিদ্যার' অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীব এবং ব্রহ্মের যে একত্বের নির্দেশ আছে তাহার সার্থকতা থাকে না। কেবল সামানাধি-করণ্যবৃত্তির দ্বারা বিরুদ্ধধর্মাবলম্বী জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্যসাধন সম্ভবপর নহে।

এই অবিদ্যা 'সৎ পদার্থ' হইতে পারে না। কারণ যদি সৎ হইত তাহা হইলে তাহার প্রতীতি-ভ্রান্তি এবং বাধা এই বিভিন্ন অবস্থার যোগ্যতা হইতে পারিত না। এই অবিদ্যা 'অসৎ'ও হইতে পারে না। কারণ যে বস্তু

অসৎ তাহার অস্তিত্ব বা প্রতীতি কোন কালেই হইতে পারে না। এই হেতু তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, এই অবিদ্যা এক অনির্বচনীয় বস্তু।]

অদ্বৈতবাদীর উক্ত প্রকার 'অবিদ্যা' কল্পনার বিরুদ্ধে শ্রীরামানুজ অবিদ্যা বিষয়ে সপ্তপ্রকার অনুপপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রশ্ন এই যে এই কল্পনার মূল কি? কল্পনার কর্তা কে? কল্পিত বস্তুর জ্ঞান কাহার?

শ্রীশঙ্করমতে 'বহুত্ব' ব্রহ্মে অবস্থান করে না, কারণ 'পূর্ণ'—নিষ্কলং, নিরঞ্জনং, অপাপবিদ্ধং। তবে বহুত্বজ্ঞান কি জীবের 'মিথ্যা-প্রত্যয়রূপ'? তাহা হইলে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন হইতে পারে না। ব্রহ্ম ও জীব বিভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন হইবেন।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে শ্রীরামানুজ বলিতেছেন, জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভূত। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলিতেছেন—

'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'। (২।৬)

[সেই সকলের সৃষ্টি করিয়া সেই সকলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন।]

কিন্তু ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বাধীন সত্তা ইহার (জীবের) নাই। সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গরাশি। সমুদ্রসত্তা হইতে তরঙ্গ কখনই বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

ইহা বলা হয় বহুত্ব কল্পিত। ইহা যদি জীবাত্মার কল্পনা হয়, তবে বলিতে হয় ইহা 'শ্রুতিবিরুদ্ধ'।

শ্রুতি বলিতেছেন,—'স ঐক্ষত লোকানু-সৃজা ইতি।' (ঐঃ উঃ ১।১।১)

[তিনি সঙ্কল্প করিলেন—আমি লোকসকল সৃজন করিব।]

ইহার পর জীবাত্মার সৃষ্টি। তাহা হইলে ব্রহ্মের ঈক্ষণপ্রসূত বহুত্ব এই সৃষ্ট জীবের কল্পনাপ্রসূত বলা যায় না।

অবিদ্যা নাপি ব্রহ্মাশ্রিতা, তস্য স্বয়ংপ্রকাশ-জ্ঞানরূপত্বেনাবিদ্যাবিরোধিত্বাৎ। (শ্রীভাষ্য ১।১।১)

[ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াও এই অবিদ্যা ভ্রম উৎপাদন করিতে পারে না, কারণ তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু এবং জ্ঞানস্বরূপ বস্তু। অতএব এই অবিদ্যারূপী অজ্ঞান জ্ঞানের নিকট থাকিতেই পারে না। ব্রহ্ম অবিদ্যার বিরোধী।]

অতঃপর শ্রীনাথমুনির মত উদ্ধৃত করিয়া শ্রীরামানুজ নিজপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।

'জ্ঞানরূপং পরং ব্রহ্ম তন্নিবর্ত্যং মৃষাত্মকম্।
অজ্ঞানঞ্চেৎ তিরস্কুর্যাৎ কঃ প্রভুস্তন্নিবর্তনে॥
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি চেজ্‌জ্ঞানমজ্ঞানস্য নিবর্তকম্।
ব্রহ্মবৎ তৎপ্রকাশত্বাৎ তদপি হ্যনিবর্তকম্॥
জ্ঞানং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানমস্তি চেৎ স্যাৎ প্রমেয়তা।
ব্রহ্মণোঽনুভূতিত্বং ত্বদুক্ত্যৈব প্রসজ্যতে?'

(নাথমুনি-সূক্তি)

পূর্বপক্ষ বলিতেছেন:

'জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্ম' ইতি জ্ঞানং তস্যা অবিদ্যায়া বাধকম্, ন স্বরূপভূতং জ্ঞানমিতি চেৎ। (শ্রীভাষ্য ১।১।১)

উত্তর:—

ন, উভয়োরপি ব্রহ্মস্বরূপপ্রকাশত্বে সতি, অন্যতরস্য অবিদ্যাবিরোধিত্বমন্যতরস্য নেতি বিশেষানবগমাৎ। এতদুক্তং ভবতি - 'জ্ঞান-স্বরূপং ব্রহ্ম' ইত্যনেন জ্ঞানেন ব্রহ্মণি যঃ স্বভাবোঽবগম্যতে, স ব্রহ্মণঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বেন স্বয়মেব প্রকাশত ইত্যবিদ্যা-বিরোধিত্বে ন কশ্চিদ্বিশেষঃ স্বরূপতদ্বিষয়জ্ঞানয়োরিতি। (১।১।১) [পরব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ এবং মিথ্যাত্মক অজ্ঞানরূপী অবিদ্যা তাঁহার নিবর্তনীয় বস্তু

অবিদ্যা যদি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকেই আবৃত করে তবে আর কেই বা সেই অবিদ্যার আবরণ নিবৃত্ত করিবে? যদি বলেন 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ'—এই জ্ঞানই অবিদ্যারূপী জ্ঞানের নিবর্তক; তথাপি এই জ্ঞানও তো নিবর্তক হইতে পারে না, কারণ এই জ্ঞানও তো স্বরূপজ্ঞানের ন্যায় প্রকাশরূপী, অর্থাৎ যদি প্রকাশরূপী ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানই অবিদ্যারূপী-অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিতে না পারে তবে তো ঐ জ্ঞানও অবিদ্যা নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। যদি বলেন, ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানিলে তখন ব্রহ্ম-বিষয়ক অজ্ঞানটি নিবৃত্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে তো ব্রহ্মবস্তু প্রমেয় বা জ্ঞেয় বস্তু হইয়া পড়ে। অতএব তখন তো ব্রহ্ম আর অনুভূতি-মাত্র অজ্ঞেয় অপ্রমেয় কেবল জ্ঞানস্বরূপ থাকে না।

পূর্বপক্ষ—'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ'—এই জ্ঞানই অবিদ্যার নিবর্তক, কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞানটি নিবর্তক নহে।

উত্তর—উভয় প্রকার জ্ঞানই যখন প্রকাশত্বে সমান, তখন একটি অজ্ঞানবিরোধী অপরটি নহে, এইরূপ প্রভেদের বিষয় তো বুঝা যায় না। উভয় জ্ঞানই যখন প্রকাশস্বভাব, তখন উভয়ের প্রকাশধর্মটি সমান, অতএব তখন তো অবিদ্যারূপী অজ্ঞানের নিবারণ-বিষয়ে উভয় জ্ঞানের মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য দেখা যায় না।]

* সামান্যাধিকরণ্য—ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযোজ্য বিভিন্ন শব্দের যে একই অর্থে ব্যবহার।

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

মুক্তি দিতে এসেছ হে পতিত-পাবন
'দয়াল' নামের খ্যাতি বাড়াতে আপন
পতিতে তরায়ে। সে তো আমি চাহি নাই;
স্বর্গ-অপবর্গ সব- ভোগের বালাই
প্রার্থনীয় নহে মোর। দিতে যদি হয়
তোমাতে সুদৃঢ় ভক্তি দাও দয়াময়।
দাও বিশ্বমানবের সেবা-অধিকার।
সকল জীবের মাঝে দেখিয়া তোমার
অস্তিত্ব বিরাজমান, তাহাদের হিতে
আমার আমিকে যেন পারি ঢেলে দিতে
জন্ম জন্মান্তর ভরে। মনে যেন রয়
'জীবসেবা করিলেই শিবসেবা হয়।'

সমাজবাদ ও ধর্ম

ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী

সমাজবাদ এখন খুব জনপ্রিয়। অনেকেরই ধারণা, প্রগতিবাদী হতে গেলেই সমাজবাদী হওয়া দরকার; যে সমাজবাদী নয় সে প্রগতিবাদীও নয়। তাদের আরও ধারণা, ধর্ম প্রগতিবিরোধী ব্যাপার এবং যারা ধর্ম চর্চা বা চর্যা করেন তারা প্রতিক্রিয়াশীল। ধর্ম সমাজবাদবিরোধীও বটে। প্রখ্যাত সমাজবাদী কার্ল মার্ক্সের কথা—'ধর্ম জনগণের পক্ষে অহিফেনস্বরূপ'।'

আমরা এই প্রবন্ধে সমাজবাদ ও ধর্মের প্রকৃতি নির্দেশ করে সমাজবাদ ও ধর্মের বিরোধিতার কথা এবং ধর্মবিষয়ে মার্ক্সের বক্তব্য কতটা যুক্তিযুক্ত, তা আলোচনা করবো।

সমাজবাদ সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি বিষয়ক একটি মতবাদ। সমাজবাদ সমাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের গুরুত্ব ও প্রাধান্য বেশী বলে মনে করে। সমাজবাদীদের মতে সমাজের উন্নতি ও প্রগতির জন্যই ব্যক্তির অস্তিত্ব; ব্যক্তির জন্য সমাজ নয়, সমাজের জন্যই ব্যক্তি। ব্যক্তিকে নিছক জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য আহার, বাসস্থান ও বস্ত্রের জন্য এবং ভালভাবে জীবনযাপনের পক্ষে অপরিহার্য ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য একান্তভাবেই সমাজের ওপর নির্ভর করতে হয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং মনুষ্যত্বের গরিমা ও মহিমা সমাজে বাস না করলে বিকশিত ও প্রকাশিত হ'তে পারে না।

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সমাজবাদ ব্যক্তির ওপর রাষ্ট্রের প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করে। সমাজবাদীরা আশঙ্কা করেন, ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা যদি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত না করে তবে জনগণের স্বার্থ বিপন্ন হবে এবং তাদের কল্যাণও ব্যাহত হবে। এজন্য তাঁরা বলেন, ব্যক্তির শিক্ষাদীক্ষা, কার্যকলাপ সব কিছুই রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

সমাজবাদ রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে সাম্য ও ঐক্যের আদর্শ প্রচার করে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সকলেই সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন, এটাই প্রত্যাশিত। সমাজবাদীদের মতে রাষ্ট্রে সাম্যস্থাপনের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন অর্থনৈতিক সমতা। সেজন্য সমাজবাদীরা অর্থনৈতিক সাম্যের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সমাজে যাতে কোনপ্রকার ধন-বৈষম্য না থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা সমর্থন করেন। সমাজবাদীরা তা করেন না। তাঁরা বলেন, অবাধ প্রতিযোগিতা ধনীদের আরও ধনী করে এবং দরিদ্রদের সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে দেয়। ফলে ধনী ও নির্ধনের পার্থক্য দুস্তর হয় এবং ধনীরা ক্রমশঃ শোষক এবং নির্ধনেরা শোষিত শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই সম্ভাবনা প্রতিরোধের জন্য সমাজবাদীরা যে পরিকল্পনা করেন তাতে শিল্প, সম্পত্তি ও খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা বা অধিকার স্বীকার করেন না, সবকিছুই রাষ্ট্রায়ত্ত এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন হবে, একথা ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে উৎপাদনের

উপাদানগুলো রাষ্ট্রাধীন হ'লে উৎপন্ন দ্রব্য জনকল্যাণে প্রযুক্ত হ'বে এবং অর্জিত ধন সুসমভাবে সকলের মধ্যে বণ্টিত হ'বে, এই প্রত্যাশা। সমাজবাদের লক্ষ্য হ'ল এক শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টি করা—যে সমাজে ধনী-দরিদ্র, প্রভু-ভৃত্য, শাসক-শাসিত এবং শোষক-শোষিতের সম্পর্ক বলে কিছু থাকবে না, সকলেই সমান সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয়ে মৈত্রী, সাম্য ও ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হ'বে।

অসাম্যই বিভেদ ও অনৈক্যের কারণ। সমাজবাদীরা বলেন, সমাজে অসাম্য দূর হ'য়ে যখন সাম্য প্রতিষ্ঠিত হ'বে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সমাজে অনৈক্যের আর কোন কারণ থাকবে না, ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হ'বে পারস্পরিক মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে।

ওপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল, সমাজবাদের মূলকথা সাম্য ও ঐক্য। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো যে, সমাজ-বাদের নানা রূপ রয়েছে মার্কস্-প্রচারিত সমাজবাদ তাদের মধ্যে একটি। কিন্তু মার্কস্‌বাদ ছাড়াও আরও অনেক সমাজবাদ আছে। সমাজবাদের বিভিন্ন রূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় Joad-লিখিত 'Introduction to Modern Political Theory' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

মার্কস্-প্রচারিত সমাজবাদ ভয়ঙ্করভাবে ধর্ম[১] বিরোধী। মার্কস্ ধর্মকে জনগণের পক্ষে আফিং বলে উল্লেখ করেছেন।[২] আফিং খেলে মানুষ যেমন নেশাগ্রস্ত হয় এবং তার স্বাভাবিক বুদ্ধি লোপ পায়, ধর্মেও নেশা আছে এবং তার ফলে মানুষের বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। স্বচ্ছ দৃষ্টি, অনাবিল বুদ্ধি প্রভৃতি সবই মানুষ হারিয়ে ফেলে এবং ফলে অদ্ভুত ও উদ্ভট ধারণার বশবর্তী হয়ে অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় সব কিছু বিধিলিপি বলে মনে করে। ধর্মের নামে জগতে যত অত্যাচার, শোষণ ও রক্তপাত সংঘটিত হয়েছে অন্য কোন ভাবে তা হয়নি। ঈশ্বর ও ধর্মের কল্পনা সুবিধাবাদী ধনিক-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। ধনীরা দরিদ্রদের নিপীড়নের জন্য ঈশ্বর ও ধর্মের সৃষ্টি করেছে। প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগে রহস্যময়ী প্রকৃতির সম্মুখে মানুষ ছিল অসহায়, ভীত ও সন্ত্রস্ত। ভীত মানুষ রহস্য ব্যাখ্যা করতে না পেরে ঈশ্বরের ধারণা করেছে এবং নিজের অক্ষমতা ও অকিঞ্চিৎকরতার জন্য প্রার্থনা করেছে এই ঈশ্বরের কাছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে ধর্মের।

মার্কস্ বলেন, বিজ্ঞানের উন্নতি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসারের ফলে জগতে রহস্য ক্রমেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আজকের দিনে রহস্যের ব্যাখ্যার জন্য আর রহস্যময় ঈশ্বর মানবার দরকার নেই। আর ঈশ্বরের কল্পনাই ত অলীক ও অসার। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিজ্ঞানসম্মতভাবে কেউ প্রমাণ করতে পারে না। জড় থেকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে

১ এখানে ধর্ম বলতে religion বোঝান হয়েছে। বস্তুতঃ আমরা যাকে ধর্ম বলি তা religion-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। Religion জীবনের একটি অংশ, কিন্তু ধর্ম জীবনের অংশ নয়, পরন্তু সমগ্র জীবন।

২ 'Religion is the soul of the oppressed creature, the heart of a heartless world, the spirit of conditions utterly unspiritual. It is the opium of the poor'. (Marx).

এই বিশ্বের অভিব্যক্তির অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। সুতরাং অযথা কোন রহস্য, অতিপ্রাকৃত সত্তা প্রভৃতি মানার প্রয়োজন নেই। ভয় থেকে যে ধর্মের সৃষ্টি তার মূলেই আছে ভয় দেখিয়ে শোষণের পরিকল্পনা। মানুষ যত বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসম্পন্ন হবে তত তারা ভয় জয় করবে এবং ধর্ম ও ঈশ্বর দুয়েরই প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। ধর্ম মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদ সৃষ্টি করে মানুষে মানুষে সাম্য ও ঐক্য উপলব্ধির অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। সমাজবাদের ভিত্তি সাম্য ও ঐক্য ব'লে এবং ধর্ম সাম্য ও ঐক্য দুয়েরই বিরোধী ব'লে ধর্ম সমাজবাদবিরোধী।

মার্কস্ এবং মার্কস্‌বাদীরা ঈশ্বর ও ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগের যে দীর্ঘ তালিকা পেশ করেছেন আমরা এবার তার যৌক্তিকতা আলোচনা করবো। মার্কসের মতে অজ্ঞতা, ভয় ও রহস্য থেকেই ধর্ম ও ঈশ্বরের ধারণার উদ্ভব। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞতা, ভয় ও রহস্য যখন থাকবে না, তখন ধর্ম ও ঈশ্বরের স্বাভাবিক মৃত্যু হ'বে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির চরম অবস্থায় আধুনিক বিশ্বে একথার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক কালে মানুষ চাঁদের পৃষ্ঠে পদার্পণ করেছে, একথা যেমন সত্য, আবার নিরাপদ চন্দ্রাভিযানের জন্য মানুষ গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা করেছে, এও তেমনি সত্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং ধর্মাচরণ একসঙ্গেই চলছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত আমেরিকার লোকেরা বেদান্তের সর্বজনীন ভাবে আকৃষ্ট হচ্ছেন, এতেই বোঝা যাচ্ছে ধর্ম ও ঈশ্বরের ধারণা অজ্ঞতা, ভয় ও রহস্য আশ্রয় করেই দাঁড়িয়ে নেই। বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের যদি সত্যই বিরোধ থাকতো তবে নিউটন, গেলিলিও, কোপারনিকাস প্রভৃতি যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিকেরা ধর্মবিশ্বাসী হতেন না। এই প্রসঙ্গে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেনের রয়েল সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে যে সমীক্ষা করা হয়েছিল তা খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রশ্ন ছিল—আধ্যাত্মিক জগৎ বলে কিছু আছে কি? উত্তরে ১২১ জন বলেছিলেন 'হ্যাঁ', ১৩ জন 'না' এবং ৬৬ জন হ্যাঁ বা না নিশ্চয় করে কিছু বলেননি।[১]

ধর্মের ইতিহাস যদি আলোচনা করা যায় তবে দেখা যাবে যে, আদিম অনুন্নত ধর্মে অজ্ঞতা, ভয় ও রহস্যের যে স্থানই থাক না কেন, উন্নত ধর্মে জ্ঞান প্রেম ও নিঃস্বার্থ কর্মেরই প্রাধান্য। ঈশ্বরের যথার্থ প্রকৃতি প্রকৃষ্টরূপে জেনে সমস্ত মানুষ তাঁরই সন্তান—এই উপলব্ধির ভিত্তিতে ঈশ্বরকে পিতা এবং তাঁর সমস্ত সন্তানকে ভাই বলে মনে করা, তাঁদের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম প্রদর্শন এবং এই প্রেমের জন্য ঈশ্বর ও তাঁর সন্তানের তুষ্টির মানসে নিঃস্বার্থ কর্ম—এসব সমস্ত উন্নত ধর্মেই স্বীকৃত। ঈশ্বরে ভয় নয়, প্রেম; তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞতা নয়, পরিপূর্ণ জ্ঞান; কোন রহস্যের মধ্যে আত্মগোপন নয়, পরিপূর্ণতার কাছে সচেতনভাবে সজ্ঞানে আত্মসমর্পণই উন্নত ধর্মের মূল কথা।

মার্কস্ বলেন, ধর্মের কেন্দ্রে ঈশ্বর এবং ঈশ্বর একটি অলীক কল্পনা; কারণ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। এই অভিযোগের

১ Karl A. Kneller: Christianity and the Leaders of Modern Science (London: Herder, 1911) এবং C. L. Drawbridge, editor, The Religions of Scientists (London; Ernest Benn, 1932)—এই দুইটি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

উত্তরে বলা যায়, ধর্ম পৃথিবীতে একটি নয় অনেক, এবং সমস্ত ধর্মের কেন্দ্রেই ঈশ্বর নেই। বৌদ্ধধর্ম ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরব, অথচ প্রেম, মৈত্রী, অহিংসা প্রভৃতি উচ্চ আদর্শের উদ্গাতারূপে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা অপরিসীম। কোঁতে মানবধর্ম নামে যা প্রচার করেছিলেন তাতে ঈশ্বরের স্থান নেই। জৈনধর্মে তীর্থঙ্কর ভিন্ন কোন ঈশ্বরের কথা বলা হয়নি। তবে একথা ঠিক যে, অধিকাংশ ধর্মেই ঈশ্বরের স্বীকৃতি রয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, মার্কস্ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না বলে মন্তব্য করেছেন, কিন্তু তিনি কি ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন? ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব দুই-ই যদি প্রমাণ না করা যায় তবে এমনও ত বলা যেতে পারে যে, ঈশ্বর (যুক্তি দ্বারা) প্রমাণের বিষয়ই নন।

মার্কস্ প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেন এবং যেহেতু সাধারণতঃ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই বলে মনে করেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য—প্রত্যক্ষই যে একমাত্র প্রমাণ, একথা মার্কস্ জানলেন কি করে? প্রত্যক্ষ করে ত 'প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ' একথা জানা যায় না। আসলে এটা তাঁর একটি বিশ্বাস। তা হ'লে অন্য লোক যদি অন্য বিষয়ে (যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে) বিশ্বাস পোষণ করেন, তবে তাঁর কি বলবার থাকতে পারে?

তাছাড়া ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, একথাই বা মার্কস্ জানলেন কি করে। ধর্মের ক্ষেত্রে অনেক মহাপুরুষই ত ঈশ্বর দর্শন করেছেন বলে শোনা যায়। বিজ্ঞানী যখন বলেন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিশেষ পরিমাণে মিশ্রিত করলে জল হয়, তখন সাধারণ লোক তা প্রত্যক্ষ করতে পারে না বলে ত স্বীকার করতে নাও চাইতে পারে। কিন্তু, এটা কি কোন যুক্তি হল? বিজ্ঞানী অবিশ্বাসীদের পরীক্ষাগারে নিয়ে গিয়ে কি ক'রে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থেকে জল হয় তা দেখিতে দিতে পারেন। তখন আর অবিশ্বাস করার উপায় থাকে না। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানীরা সেইরকম ঈশ্বরদর্শনের পদ্ধতি দিয়ে গেছেন, সেভাবে চললে তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যাবে একথা জোর দিয়ে বলে গেছেন। তাঁদের কথামত চলে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষও করেছেন বহুজন। ঈশ্বর দর্শন করেছেন এমন লোকের কাছে গেলে তিনিও ঈশ্বর দেখিয়ে দিতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে ঈশ্বর দেখিয়েছিলেন। তখন আর তিনি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করা যায় না, একথা বলতে পারেননি। এ কাহিনী সকলেরই জানা আছে। অবশ্য যোগ্যতা অর্জন করা চাই; সে কথা তো পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানের সত্য যাচাই করার ক্ষেত্রেও সমভাবে সত্য।

আরও কথা ঈশ্বর বলতে আমরা বুঝবো কি? যদি কেউ মহাত্মা গান্ধীর মত বলেন, সত্যই ঈশ্বর, তবে এই ঈশ্বরকে অস্বীকার করার উপায় আছে কি? সতে ইতি সত্যম্ যার নিজেরই থাকবার অধিকার আছে, তাই সত্য। এই সত্যের অস্তিত্বের অধিকার কেড়ে নেবে কে?

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, আত্মাই ঈশ্বর। ঈশ্বরে অবিশ্বাস মানে আত্মাকে বা নিজেকে অবিশ্বাস। কিন্তু নিজেকে অবিশ্বাস করা যায় কি? নিজেকে অবিশ্বাস করতে হলে অবিশ্বাসকারী হিসেবে নিজেকে ত আগেই মেনে নিতে হবে। সুতরাং আত্মাবিশ্বাস অসম্ভব। ফলে আত্মারূপী ঈশ্বরে অবিশ্বাসও সম্ভব নয়!

মার্কস্ ইতিহাস থেকে অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, ধর্মের নামে কিভাবে শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়ন করা হয়েছে এবং এর থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন—ধর্ম শোষণ ও নিপীড়নের হাতিয়ার। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইতিহাস আলোচনা করলে ধর্মের নামে শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়নের যেমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তেমনি আবার এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেখানে ধর্ম সমাজের উন্নতি, প্রগতি এবং কল্যাণের সহায়ক হয়েছে। মার্কস্ শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়নের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছেন, কিন্তু, উন্নতি, প্রগতি ও কল্যাণের দৃষ্টান্ত উপেক্ষা করেছেন। এভাবে তিনি তর্কবিজ্ঞানের অনিরীক্ষণ-দোষে দুষ্ট হয়েছেন। কোন বিষয়ের কতকগুলো দিক দেখলে এবং অন্য কতগুলো দিক না দেখলে অনিরীক্ষণ-দোষের উদ্ভব হয়। V. A. Demant বলেছেন, [১] সভ্যতার অগ্রগতির নিয়ামক শক্তি একপ্রকারের আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি এবং ঐতিহাসিক Toynbee-র [২] মতে এই অতৃপ্তির ক্রমাবসান ভবিষ্যতের দুর্বিপাকের ইঙ্গিত বহন করে আনছে। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকেরা তাঁদের সমসাময়িক সমাজ থেকে কুসংস্কার, অজ্ঞতা প্রভৃতি দূর করেছেন, একথা ঐতিহাসিক সত্য। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষেরা নানাবিধ সংস্কার সাধন করে দেশ ও জাতির উন্নতি বিধান করেছেন এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে প্রচুর। সুতরাং ধর্মের ভাল দিকটা না দেখার পক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে আরও কথা, ধর্মের নামে বিভিন্ন সময়ে যে অন্যায় অত্যাচার ও শোষণ সাধিত হয়েছে তার জন্য ধর্মই কি দায়ী? না, দায়ী সেই সমস্ত স্বার্থপর ব্যক্তি যাঁরা ধর্মকে এভাবে অত্যাচারের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেছেন- আমাদের মনে হয়, এজন্য ধর্মকে দায়ী করে লাভ নেই। একটি উপমা দিয়ে বক্তব্য পরিষ্কার করা যেতে পারে। বিজ্ঞান মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, আবার সেই বিজ্ঞানের সাহায্যেই এমন নানাবিধ ভয়াবহ মারণাস্ত্র নির্মিত হয়েছে যাতে বিশ্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা বিজ্ঞানকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারি কি? আসলে দোষী ত তারাই যারা বিজ্ঞানকে অপকর্মের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেছে। যে আগুন সন্ধ্যাদীপ হয়ে জ্বলে, মানুষকে আলো দেয়, সেই আগুনই ত আবার ব্যবহারের ব্যতিক্রমের জন্য ঘরবাড়ী পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে। এজন্য আগুনকে দোষ দিয়ে লাভ কি?

মার্কস্ ধর্মের নামে ধনীরা দরিদ্রদের নিপীড়ন করেছে, একথা বলেছেন, কিন্তু কত ধনী ধর্মের জন্য যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য গ্রহণ করেছেন, তার উল্লেখ করেননি! এ কেমন কথা? তা ছাড়া অবিশ্বাসীদের শত অত্যাচার সত্ত্বেও কোন কোন ধর্মপ্রবক্তা যে প্রেম ও মৈত্রীর কথাই বলে গেছেন, একথাও

১ 'The impulse that makes civilization is a kind of spiritual restlessness seeking to fashion the structure of life that will satisfy the craving'—Demant: Religion and the Decline of Capitalism (1952), P 174.

২ A. J. Toynbee—A Study of History, Abridgement by D D. Somervell, P 487.

মার্কস্ বলেননি। অথচ পাষণ্ড জগাই-মাধাই -এর আক্রমণে রক্তাক্তদেহ চৈতন্যদেবের উক্তি —'মেরেছিস মেরেছিস কলসির কাণা, তা বলে কি প্রেম দেব না?' মানুষ কি সহজে ভুলতে পারে? ধর্ম আসলে প্রেম, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি মানুষের উচ্চতর বৃত্তির অনুশীলনের উপরই গুরুত্ব দেয়। ধর্মের নামে পাষণ্ডেরাই নানাবিধ অত্যাচার করে। মার্কস্ ধর্মের ব্যভিচারটাই লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু ধর্মের স্বরূপের দিকে দৃষ্টি দেননি।

মার্কস্ আরও বলেছেন, ধর্ম আমাদের দৃষ্টি এই জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে পরলোকে নিবদ্ধ করে এবং ফলে আমরা ভীরু, নিশ্চেষ্ট এবং নানাবিধ অযৌক্তিক অসাম্য নীরবে বিধিলিপি বলে গ্রহণ করে নিরুপায় হয়ে বসে থাকি। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য, ধর্ম জীবনকে সামগ্রিক দৃষ্টি থেকে দেখে। আমাদের জীবনে অর্থ, কাম প্রভৃতি সকলের প্রয়োজনীয়তাই আমাদের ধর্মে স্বীকৃত। কিন্তু অর্থ বা কামই সব, একথা ধর্ম বলেনা। অর্থ বা কাম ধর্মবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হবে, ধর্ম আবার মোক্ষলাভেচ্ছায় সার্থকতা লাভ করবে, এমন কথাই আমাদের দেশ বলে। জগতে থেকে জগৎকে তুচ্ছ করার শিক্ষা আমাদের শাস্ত্র দেয় না, বরং ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বা ন্যায়নীতি অনুসারে জীবনযাপন করার নির্দেশই শাস্ত্র দিয়ে থাকে। এই বোধ থাকলে মানুষ অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণ করতে পারে না। এই বোধ নেই বলেই ত যত অনাচার ও অশান্তি। যারা যথার্থ ধার্মিক তারা কখনই অন্যায় করতে পারে না। ধর্মের নামে যত অন্যায় হয় সবই ভণ্ডদের কাজ। ভণ্ডদের কাজ দিয়ে ধর্মের বিচার করলে ধর্মের প্রতি সুবিচার করা হয়না।

ধর্ম মানুষকে ভীরু, নিশ্চেষ্ট বা নিরুপায় করেনা, বরং তা মানুষের মনে আত্মপ্রত্যয়, সোৎসাহ কর্মপ্রবণতা ও বলিষ্ঠ আশাবাদ এনে দেয়। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের একটি মন্তব্য আমাদের মনে আসে। হিটলারের আমলে জার্মানীতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং নিষ্ঠুরভাবে সত্য নির্বাসিত হয়েছিল, আইনস্টাইন তখন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র এবং লেখকদের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এদের কারো কাছ থেকেই কোন সমর্থন বা সাহায্য পাননি। একমাত্র চার্চই তখন আইনস্টাইনকে সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছিল। আইন্স্টাইন চার্চের এই নির্ভয় ভূমিকার কথা অত্যন্ত প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এতদিন আমি চার্চের নিন্দা করেছি, কিন্তু আজ আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে তার প্রশংসা করি'।* এই কাহিনীর মধ্যে দিয়ে ধর্ম আমাদের চিত্তে যে ভয়হীনতা ও বলিষ্ঠতা এনে দেয় তা-ই বোঝাতে চাই। ধর্মের জন্য নির্ভয় চিত্তে মানুষ কত নির্যাতন সহ্য করেছে, তার হিসেব নেই। শিখদের ইতিহাস এ

*'Being a lover of freedom, when revolution came to Germany, I looked to the University to defend it, knowing that they had always boasted of their devotion to the cause of truth; but no, the universities were immediately silenced. Then I looked to the great editors of the newspapers whose flaming editorials in days gone by had proclaimed the love of freedom; but they too, like the universities were silenced. Then I looked to the individual writers

জাতীয় বীরত্বের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় একটি কাহিনী প্রকাশ করেছেন 'বন্দী বীর' কবিতায়।

ধার্মিকেরা বিশ্বাস করেন, সমস্ত কাজেরই ফলপ্রাপ্তি অনিবার্য। এই বিশ্বাস তাঁদের সৎকর্মে উৎসাহিত করে। কারণ, তাঁরা জানেন, সৎকর্ম করলে তার সুফল নিশ্চয়ই পাবেন। অদৃষ্টবাদের নিহিতার্থ এই নয় যে, আমার জীবন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমার নেই। অদৃষ্টবাদের মূল কথা—আমার অদৃষ্ট আমারই সৃষ্টি। খারাপ কাজ করে যদি আমি দুরদৃষ্ট সৃষ্টি করে থাকি তবে তার জন্য ত আমি দায়ী। প্রারব্ধ ভোগের পর সৎকর্ম করে আমি শুভাদৃষ্ট সৃষ্টি করতে সক্ষম। সুতরাং নৈরাশ্যের কোন কারণ নেই, বরং আশায় বুক বাঁধবারই সঙ্গত যুক্তি আছে।

ধর্ম যে মানুষের মনে সুস্থ সমতার ভাব এনে দেয়, একথা মনোবিজ্ঞানী যাঙ্ (Jung) স্বীকার করেছেন।[১] তিনি বলেছেন, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের চিকিৎসক-জীবনে যারা তাকে দেখাতে এসেছেন তাদের মধ্যে যাদের বয়স ৩৫ বৎসরের ওপরে তাদের মধ্যে একজনও নেই যার মানসিক অসঙ্গতির কারণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব নয়। তিনি আরও বলেছেন, তাদের কেউই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী না হ'য়ে সুস্থ হ'তে পারেনি (None has been really healed who did not regain his religious outlook)। ধর্ম প্রসঙ্গে যাঙের কথা আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। মানসিক বিপর্যয়-রোধের জন্য ধর্মের প্রয়োজনীয়তা যাঙ্ স্বীকার করেছেন আমরা এই স্বীকৃতির মধ্যে ধর্মের একটি অতি প্রয়োজনীয় অবদানের উল্লেখ পাচ্ছি। আর্থিক অশান্তিই মানুষের জীবনের একমাত্র অশান্তি নয়। তাই যদি হ'ত তবে ধনীরা সব সময়েই শান্তিতে থাকতো। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 'ধনীরা শান্তিতে আছে'—এই ধারণা যে কত ভুল তাই প্রমাণ করে। ধর্মবোধ বা আধ্যাত্মিক চিন্তা মানুষের মনে শান্তি এনে দেয়। যার ধর্মবোধ নেই তারই জীবনে নানাবিধ অশান্তি বাসা বাঁধে এবং ফলে কখন কখন মানসিক সাম্য নষ্ট হয়, এমন কি উন্মত্ততাও আসে।

মার্কস্ আরও বলেছেন, জড় থেকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে এই বিশ্বের অভিব্যক্তির অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। আমরা একথা যুক্তিপূর্ণ বলে মনে করি না। এই বিশ্ব কতগুলো বিশৃঙ্খল বস্তুর সমাহার মাত্র নয়, এতে

---

who, as literary guides of Germany, had written much and often concerning the place of freedom in modern life ; but they too were mute.

Only the church stood squarely across the path of Hitler's campaign for suppressing truth, I never had any special interest in the church before, but now I feel great affection and admiration because the church alone has had the courage and persistence to stand for intellectual truth and moral freedom. I am forced to confess that what I only despised I now praise unreservedly.'—Quoted in the Examiner (Nov 30, 1949), Vol. 91, n. 48, p 755.

১ C. G. Jung : Modern Man in Search of a Soul, p 264

শৃঙ্খলা আছে, সৌন্দর্যও আছে। এই পারিপাট্যের পশ্চাতে কোন পরিকল্পনা রয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই একথা আমাদের মনে আসে। পরিকল্পনা অচেতন জড়ের কর্ম নয়, কোন সচেতন সত্তার পক্ষেই এই পরিকল্পনা সম্ভব। সুতরাং এই বিশ্বের পশ্চাতে একটি সচেতন সত্তার অবস্থিতি কল্পনা করা অযৌক্তিক নয়। প্রখ্যাত প্রত্যক্ষবাদী হিউম, অত্যন্ত যুক্তিবাদী রাসেলও এই কল্পনা উদ্ভট বলে উড়িয়ে দিতে পারেননি।[১] তা ছাড়া চৈতন্যের অস্তিত্ব আগে থেকে স্বীকার না করে নিলে জড়কে জড় বা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বলেই বা জানা যাবে কি করে? জড় বা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ কিছু নয়। চৈতন্য বা বুদ্ধি দিয়েই তাদের আমরা প্রতিষ্ঠিত করি। তাই যদি হয়, তবে জড় বা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির পূর্বেই ত চৈতন্যের অস্তিত্ব আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। আর তা যদি করতে হয় তবে যে মার্কস্ চৈতন্যের অস্তিত্বই জড়ের দ্বারা সিদ্ধ করতে চান তাঁর কথা মানা যায় না।

মার্কস্ বলেছেন, ধর্ম মানুষে মানুষে অসাম্য ও অনৈক্যের সৃষ্টি করে। মার্কস্-বাদীরা বলেন, সমাজবাদের মূল কথা সাম্য ও ঐক্য, ধর্ম সাম্য ও ঐক্য বিরোধী বলে সমাজবাদবিরোধী। এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা আলোচনা করা দরকার।

আমরা এই প্রবন্ধে ধর্ম বলতে 'Religion' বোঝাচ্ছি। আমাদের দেশে ধর্ম শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় 'Religion' শব্দটি তার সমার্থক নয়, একথা আমরা পূর্বেই একটি পাদটীকায় উল্লেখ করেছি। মার্কস্ এবং মার্কস্‌বাদীদের সমালোচনা Religion-এর বিরুদ্ধে। সেজন্য আমরা এবার Religion -এর তাৎপর্য নির্ণয় করে দেখাবো যে তা সাম্য ও ঐক্যবিরোধী ত নয়ই, বরং সাম্য ও ঐক্যের একমাত্র যুক্তিপূর্ণ ভিত্তি।

'Religion' শব্দটির উদ্ভব 'Religere' শব্দ থেকে। 'Religere' শব্দের অর্থ বন্ধন। প্রশ্ন উঠবে—Religion কেমন বন্ধন? Religion সাধারণতঃ ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের প্রেমের বন্ধন বোঝায়। আমরা আবার Religion কথাটির পরিবর্তে 'ধর্ম' শব্দটিই ব্যবহার করছি। অধিকাংশ ধর্মের ক্ষেত্রেই ঈশ্বরকে মানুষের পিতা বলে স্বীকার করা হয়। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরকে বলেন 'স্বর্গস্থিত পিতা' (Heavenly Father), আমাদের ধর্মেও 'নোঽসি পিতা' বলে ঈশ্বরকে আমাদের পিতা বলে স্বীকার করা হয়েছে। পিতার সঙ্গে সন্তানের যে সম্বন্ধ তা প্রেম ও প্রীতির মধুর সম্পর্ক। অধিকাংশ ধর্মে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে সন্তান মানুষের এই মধুর সম্পর্কই স্বীকার করা হয়। যেহেতু ঈশ্বর আমাদের সকলেরই পিতা, সেজন্য আমরা সমস্ত মানুষই একই পিতার সন্তানরূপে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ।[২]

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে—ধর্ম দ্বিবিধ বন্ধন বোঝায়। একদিকে তা পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে সন্তান মানুষের বন্ধন, অন্য দিকে আবার একই পিতার সন্তান হিসেবে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃবন্ধন বোঝায়। এই যদি হয় ধর্মের প্রকৃতি, তবে ধর্ম মানুষে মানুষে

১ Waterhouse : The Philosophical Approach to Religion, ৯: পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২ Brotherhood of Man under the Fatherhood of God—Gisbert : Fundamentals-of Sociology, ২১৫ পৃঃ।

অসাম্য বা অনৈক্য বোঝাবে কি করে? ধর্ম ত বলে,—সমস্ত মানুষই ভাই ভাই, কারণ সমস্ত মানুষই একই পিতার সন্তান। ধর্মের এই বোধ আসলে মানুষে মানুষে সাম্য ও ঐক্যই সূচনা করে। সাম্য এই জন্য যে, একই পিতার সন্তানেরা পিতার কাছে সবাই সমান। ধর্মের দৃষ্টিতে এই সংসার পিতা-ঈশ্বরের সৃষ্ট সম্পদ। পিতার সম্পত্তিতে সমস্ত সন্তানেরই যেমন সমান অধিকার, তেমনি ঈশ্বরের সৃষ্ট সম্পদে এই দুনিয়ার ভোগদখলের অধিকার সন্তান হিসেবে সমস্ত মানুষেরই সমান। ধর্মের এই দৃষ্টিভঙ্গীতে মানুষের সাম্য বা সমান অধিকার যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্য কোন্ ভাবে তা হবে? রক্তের বন্ধন যত কঠিন ও দৃঢ়, অন্য কোন বন্ধন তত কঠিন ও দৃঢ় নয়। সমস্ত মানুষই যদি একই পিতা-ঈশ্বরের সন্তান হয় তবে তাদের মধ্যে রক্তের বন্ধনের মতই কঠিন বন্ধন বর্তমান। এই বন্ধন তাদের মধ্যে যেমন ঐক্য এনে দেবে অন্য কোন ভাবে তেমন ঐক্য-বন্ধন কি সম্ভব? সুতরাং সমাজবাদের ভিত্তি সাম্য ও ঐক্য ধর্মের দৃষ্টিতে যত সহজলভ্য, অন্য দৃষ্টিতে তত নয়। সেজন্যই আমরা বলি ধর্ম সমাজবাদ-বিরোধী নয়, সমাজবাদের যথার্থ ভিত্তি।

অবশ্য অনেকে বলবেন—ধর্মের যদি এই তাৎপর্য, তবে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এত কলহ কেন? একই ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্গত মানুষদের মধ্যেও বা এত ভেদ কেন? আমরা বলবো এজন্য দায়ী ধর্ম নয়, না বুঝে যাঁরা অন্ধের মত ধর্মাচরণ করছেন বলে গর্ব করেন, দায়ী তাঁরা। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, না বোঝা এবং ভুল বোঝা এসব মিলে এক অনাসৃষ্টি করেছে। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষার প্রসার, ধর্মের তাৎপর্য বোঝা ও বোঝানো। বাড়ীতে দেশলাই বাক্স থাকলে কোন অবোধ বালক তা থেকে কাঠি নিয়ে প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য পুড়িয়ে দিতে পারে বলে কোন বুদ্ধিমান লোক দেশলাই বাক্স ছুঁড়ে ফেলে দেবেন কি? না, বালককে দেশলাই বাক্সের ব্যবহার ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিয়ে এমন কাজ না করার নির্দেশ দেবেন? বাক্সই ফেলে দিলে আগুন ধরানো যাবে না, ফলে সাধারণ গৃহস্থের ঘরে হাঁড়িই চড়বে না। ধর্ম সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। অনেক অবোধ ধর্মের অপব্যবহার করে, তার প্রতিবিধান ধর্মবর্জনে নয়, ধর্মের যথার্থ স্বরূপ ও ব্যবহার-ব্যাখ্যানে ও তা গ্রহণে। তা ছাড়া মানবপ্রেমিক, ন্যায়পরায়ণ ও সৎ, যথার্থ ধার্মিক ব্যক্তি সমাজে অনেকই আছেন। আমরা তাঁদেরই বা দেখবো না কেন?

আমাদের দেশে 'ধর্ম' শব্দটির একটি বৃহত্তর ও মহত্তর দ্যোতনা আছে। 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন্' প্রত্যয় যোগ করে ধর্ম শব্দটি নিষ্পন্ন ধর্ম শব্দটির ধাতুগত অর্থ—যা ধারণ করে। অর্থাৎ, যা আমাদের ধারণ করে আছে, তাই আমাদের ধর্ম। ধর্ম শ্বাসপ্রশ্বাসের মত স্বাভাবিক ব্যাপার। শ্বাসপ্রশ্বাস ছাড়া যেমন আমরা বাঁচতে পারি না, ধর্ম ছাড়াও তেমনি আমাদের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। সেজন্যই আমাদের দেশে ধর্ম সমস্ত জীবনকে বেষ্টন করে আছে বলে মনে করা হয়। ধর্ম শুধু আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক নয়, ধর্ম আমাদের সমগ্র জীবন। সেজন্যই আমাদের দেশে সমগ্র জীবনযাত্রাই ধর্মচর্যার অঙ্গ। এই দিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের পক্ষে ধর্ম পরিত্যাগ করা অসম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—'আমি আমার নিজের বা অপর কাহারও ধর্ম সম্বন্ধে মতামতকে ধর্ম

বলিতেছি না। যে ভাবধারা পশুকে মানুষে এবং মানুষকে দেবতায় পরিণত করে, তাহাই ধর্ম। ধর্ম—মত বা সূত্রে নাই, অথবা বুদ্ধিপ্রসূত তর্কবিতর্কেও নাই। ইহাই জীবন, ইহাই হওয়া—ইহাই অপরোক্ষানুভূতি। অপরোক্ষানুভূতিই প্রকৃত ধর্ম। এই ধর্মের অনুভূতি যাঁর হয় তিনি নিজেকে সকলের মধ্যে দেখেন এবং সকলকে দেখেন নিজের মধ্যে। ফলে যে সাম্য ও ঐক্যের সৃষ্টি হয় তা বাহ্যিক বা কোন বাধ্যতামূলক ব্যাপার নয়, একান্তভাবেই আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। এই সাম্য ও ঐক্য স্বাভাবিক বলেই স্থায়ী। যথার্থ সমাজবাদ বা সাম্যবাদ এভাবেই গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু মার্ক্স্ যেভাবে সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন তা আমাদের মতে কখনই স্থায়ী সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কেন পারে না, তাই বলছি।

মার্কসের মতে মানুষ উৎপাদন-ব্যবস্থার সৃষ্টি, ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্বার্থপর। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন মহত্তর ও বৃহত্তর প্রেরণা তাদের অনুপ্রাণিত করে না। সেইজন্যই তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। শ্রেণী-সংগ্রাম এই ভাবেই সৃষ্ট হয়। পুঁজিপতিদের স্বার্থ ও শ্রমিকদের স্বার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফলে এই দুই শ্রেণীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এরই নাম শ্রেণী-সংগ্রাম। স্বার্থপর মানুষ স্বাভাবিকভাবে স্বার্থ পরিত্যাগ করতে পারে না। সেজন্য পুঁজিপতিরা স্বেচ্ছায় নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন করে শ্রমিকদের স্বার্থোদ্ধার করবে, এ আশা শুধু দুরাশা নয়, অসম্ভব কল্পনা। মার্ক্স্ তাই বলেন, পুঁজিপতিদের হাত থেকে শ্রমিকদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে। এজন্য তিনি দুনিয়ার সমস্ত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান করেছেন।[১] তিনি বলেন, রক্তাক্ত বিপ্লবীদের মধ্য দিয়েই শ্রমিকেরা পুঁজিপতিদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সাম্য ও ঐক্যের ভিত্তিতে সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সমাজবাদী রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার অন্য কোন উপায় নেই। তবে এই সমাজবাদী রাষ্ট্রই সমাজবাদের চরম আদর্শ নয়। সমাজবাদের আদর্শ সাম্যবাদী সমাজ (communistic society)। এই সমাজে রাষ্ট্র থাকবে না, কারণ তখন বলপ্রয়োগের কোন প্রয়োজনই হবে না, আর বলপ্রয়োগের জন্যই রাষ্ট্রের দরকার। সাম্যবাদী সমাজে মানুষ স্বভাবতই ন্যায়পরায়ণ হবে এবং তারা স্বেচ্ছায় সকলের সমান অধিকার স্বীকার করে নেবে। তাদের মধ্যে কোন কলহ বা দ্বন্দ্ব থাকবে না। মানুষ সুখে, শান্তিতে ও স্বস্তিতে জীবন যাপন করবে।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে—মানুষ যদি উৎপাদন-ব্যবস্থার সৃষ্টি ব'লে স্বরূপতঃ স্বার্থপর হয় তবে সাম্যবাদী সমাজে হঠাৎ তারা সকলের সমান অধিকার স্বীকার করে নেবে কেন? তারা স্বাভাবিকভাবে ন্যায়পরায়ণই বা হবে কেন? সমাজবাদী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের ভয়ে মানুষ সকলের সমান অধিকার স্বীকার করে নিতে পারে, কিন্তু সাম্যবাদী সমাজে যখন রাষ্ট্রই থাকবে না, তখন রাষ্ট্রের ভয়ও থাকবে না বলে স্বেচ্ছায় মানুষ স্বার্থ বিসর্জন করে সকলের সমান অধিকার মানবে কেন? স্বার্থপর মানুষের কাছে এ-প্রত্যাশা অসঙ্গত নয় কি? যদি স্বীকার করা যায় যে, মানুষ স্বরূপতঃ সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও মানবপ্রেমিক তবেই সাম্যবাদী

---

১ 'Working men of all countries unite'—Communist Manifesto

সমাজে মার্কস্-কথিত মানুষের ব্যবহার ব্যাখ্যা করা যাবে। নইলে সাম্যবাদী সমাজে মার্কস্-কথিত মানুষের ব্যবহার একটা অসম্ভব কল্পনা বলে মেনে নিতে হবে। আর যদি মানুষকে স্বরূপতঃ সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও মানবপ্রেমিক বলেই মনে করা হয় তবে শ্রেণীসংগ্রাম, রক্তাক্ত বিপ্লব এসবই বা সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হবে কেন? স্বরূপতঃ সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও মানবপ্রেমিক মানুষ অন্যায়-ভাবে যে শোষণ ও অত্যাচার করছে তা তাদের বুঝিয়ে বললে তারা তা ত্যাগ করবে না কেন? আর শেষ পর্যন্ত মানুষ স্বরূপতঃ সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও মানবপ্রেমিক, একথা যদি মার্কস্ মেনে নিতেই বাধ্য হন তবে ধর্মের ভিত্তি ছাড়া তিনি মানুষের এই স্বরূপ ব্যাখ্যা করবেন কি করে? কোন জড়বাদীই মানুষকে দেহসর্বস্ব না বলে স্বরূপতঃ সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও মানবপ্রেমিক বলতে পারেন না। জড়বাদী মার্কস্ এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবেন কি করে?

আরও কথা, মার্কস্‌বাদ শ্রমিক ভিন্ন অন্য শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রশ্রয় দেয়। ফলে মার্কস্‌বাদে যে সাম্যবাদের কথা বলা হয় তা কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর সাম্য স্বীকার করে। এ-মতে সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সাম্য স্বীকৃত নয়। এই দিক থেকে এ-মতবাদ আংশিক সাম্যবাদমাত্র।

সাম্যবাদ বা সমাজবাদ মানুষে মানুষে ঐক্যেও বিশ্বাস করে। কিন্তু মার্কসবাদ বিভিন্ন শ্রেণীর অনতিক্রম্য অনৈক্যের কথা স্বীকার করে শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শ প্রচার করে। তা হ'লে মার্কস্‌বাদ কেমন সাম্যবাদ বা সমাজবাদ? আসলে মার্কস্ যে সাম্য ও ঐক্যের কথা বলেন তা শ্রমিকশ্রেণীর সাম্য ও ঐক্য, অন্যান্য শ্রেণীর নয়। সুতরাং মার্কস্-প্রচারিত সাম্যবাদ আংশিক সাম্যবাদ মাত্র।

সাম্যবাদ একপ্রকার মানবতাবাদও বটে। এই মতে মানুষে মানুষে প্রেম ও প্রীতির সম্পর্ক স্বীকার করা হয়। কিন্তু, মার্কস্‌বাদ শ্রেণী-সংগ্রামের কথা বলে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রেম ও প্রীতির পরিবর্তে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে মার্কসবাদকে যথার্থ মানবতাবাদ বলা যায় কি?

কোন বিশেষ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শুধু নয়, সমস্ত মানুষের মধ্যে সাম্য, ঐক্য ও প্রেমের কথা ধর্ম প্রচার করে। এবিষয় আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। এইদিক থেকে দেখতে গেলে ধর্মের ভিত্তিতে যে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে সমস্ত মানুষের সাম্য ও ঐক্য স্বীকৃত বলে তা পরিপূর্ণ সমাজবাদ হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের ভিত্তিতে এমনি এক পরিপূর্ণ সমাজবাদের কথা বলেছেন। আমরা অন্য প্রবন্ধে এই নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি।

বহির্বিশ্বে প্রাণসন্ধান

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

আমাদের দেশে বেদ পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে পৃথিবী ছাড়া অন্য নানা 'লোকের' এবং মানুষ ব্যতীত অপর নানা স্তরের বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব আদৌ কষ্টকল্পনা নয়। হিন্দু-শাস্ত্র পড়িতে গেলে বিভিন্ন 'লোক' ও মনুষ্যেতর বহুবিধ প্রাণীর কথা একপ্রকার ধরিয়াই লইতে হয়। হিন্দুমন এ বিষয়ে সাধারণতঃ কোনও প্রশ্ন তুলে না। ইহার একটি কারণ বোধ করি এই যে, হিন্দুজাতির ধর্ম ও দর্শন অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনাদি ও অনন্ত। সৃষ্টিবৈচিত্র্যের সীমা পরিসীমা নাই।

অনন্ত শক্তিমান পরমেশ্বর অনন্ত দেশ-কালে অসংখ্য বস্তু ও ঘটনা গড়িয়া ও ভাঙ্গিয়া চলিতেছেন। অতএব ভগরান পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও প্রাণসৃষ্টি করেন নাই বা করিতে পারেন না ইহা বলিতে গেলে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীতে ভগবানকেই খাটো করা হয়।

পৃথিবী ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও গ্রহ-উপগ্রহে প্রাণ থাকিতে পারে না, এতদিন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ইহাই এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল। কখনো কখনো কোনও বৈজ্ঞানিক ইহার বিপরীত কথা যে বলেন নাই তাহা নয়, তবে তাঁহাদের মত যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অভাবে বিদগ্ধসমাজে আমল পায় না। লেবরেটরীর প্রমাণ ছাড়া কোনও সিদ্ধান্তকে বিজ্ঞানের আভিজাত্য তো দেওয়া যায় না। যাহা হউক আমরা এখন এমন এক সময়ে বাস করিতেছি যাহাকে মনীষীরা বলিতেছেন আকাশ-যুগ (space age)। অনন্ত আকাশ-মণ্ডলে একটার পর একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়া চলিয়াছে। মানুষের মন এখন ক্রমাগত পৃথিবী হইতে উঠিয়া উর্ধ্বে উর্ধ্বতরে উড়িতে উন্মুখ। এমন সময়ে আকাশের কোনও কাহিনীকে ঠাকুরমার গল্প বলিয়া আর ব্যঙ্গ করিবার মনোভাব কাহারও বড় নাই। যতই আজগুবী মনে হউক কোনও সিদ্ধান্তকে প্রাচীন হিন্দুদের মতো 'তা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই অসম্ভব নয়' ভাবিয়া সম্মান দিবার ঝোঁকই আজকাল পরিলক্ষিত।

সম্প্রতি বহির্বিশ্বে প্রাণ সম্বন্ধে দুইজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সহিত জনৈক সাংবাদিকের একটি কথোপকথন একটি আমেরিকান পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। একজন হইলেন ম্যাঞ্চেষ্টার (ইংলণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতি-বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ডক্টর জেনেক কোপাল (Zdenek Kopal) এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি আমাদের সৌরমণ্ডলের নবম এবং দূরতম গ্রহ প্লুটোর* আবিষ্কর্তা অধ্যাপক ডক্টর ক্লাইড

* প্লুটোর আবিষ্কারের পূর্বে নেপচুনই ছিল দূরতম গ্রহ। নেপচুনের পরে আরও একটি গ্রহ যে আছে ইহা সুবিখ্যাত আমেরিকান জ্যোতির্বিদ পার্সিভাল লাওয়েল (Percival Lowell) (১৮৫৫-১৯ ৬) এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৯৩০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী টমবো প্লুটোকে আবিষ্কার করেন। সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব ৯৩ মিলিয়ন মাইল। নেপচুনের ২৭৯০ মিলিয়ন মাইল এবং প্লুটোর ৩৬৭০ মিলিয়ন মাইল। প্লুটোর আয়তন পৃথিবীর $\frac{১}{১০}$ ভাগ। ওজনও পৃথিবীর তুলনায় $\frac{১}{১০}$ ভাগ। উহার ঔজ্জ্বল্য অত্যন্ত ক্ষীণ - জ্যোতি-বিদ্যার পরিভাষায় ১৫তম মানের। (15th magnitude)

টমবো (Clyde Tombaugh)। টমবো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউমেক্সিকো জ্যোতি-বিদ্যার অধ্যাপক।

উভয় বৈজ্ঞানিকই বলেন যে, আমাদের তারকা-বিশ্বে (যাহা Milky Way নামে পরিচিত) অন্ততঃ এক বিলিয়ন (একশত কোটি) এমন গ্রহ আছে যেখানে প্রাণধারণের উপযোগী পরিবেশ বর্তমান। খুব সম্ভবতঃ এই গ্রহসমুহের মধ্যে ১ লক্ষ গ্রহে প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন জীব বাস করে। ডক্টর কোপাল বলেন, এই সব গ্রহবাসীর বুদ্ধি ও জীবনধারা পৃথিবীর মানুষের অপেক্ষা এত বেশী উন্নত যে, আমরা যদি তাহাদিগের সহিত সংযোগস্থাপনের চেষ্টা করি (বৈজ্ঞানিক সিগন্যাল প্রভৃতি দ্বারা) তো তাহারা আমাদিগকে গ্রাহ্যই করিবে না। আমাদিগের চেষ্টাচরিত্রকে তাহারা কীট-পতঙ্গের চেষ্টার চেয়ে বেশী স্থান দিবে না। এমনও হইতে পারে যে আমরা যেমন বিরক্তি-কর আরসোলাকে পিষিয়া মারি, পৃথিবীর মানুষজাতিকে তাহারা ঐভাবে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারে। অথবা আমরা যেমন আমাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় গিনি-পিগ্ ব্যবহার করি আমাদিগকে তাহাদের কোনও উন্নত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাহারা ঐরূপ কাজে লাগাইতে পারে। অতএব অন্য গ্রহে যাহারা আছে তাহাদের সহিত সংযোগস্থাপনের চেষ্টা না করাই আমাদের পক্ষে কল্যাণকর।

অধ্যাপক টমবো বলেন, উর্দ্ধতর কোনও গ্রহের অধিবাসীরা যদি তাহাদের গ্রহে জন-সংখ্যার ভিড় দেখিয়া আমাদের পৃথিবীতে উপনিবেশ স্থাপন করিতে চায় তো উহা আমাদের পক্ষে মারাত্মক হইবে, কেননা তাহাদের সহিত আমরা পারিয়া উঠিব না। বহির্বিশ্বে সম্ভবতঃ এমন সব গ্রহ আছে যেখানে মানুষের সভ্যতার চেয়ে লক্ষ লক্ষ বৎসরের পুরাতন সভ্যতা বর্তমান। আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না এমন সব জ্ঞান-বিজ্ঞান উহাদের বাসিন্দাদের অধিগত। দূর আকাশে রেডিও সিগ্ন্যাল পাঠাইয়া উহাদের প্রত্যুত্তর আদায়ের চেষ্টা না করাই শ্রেয়ঃ। ডক্টর কোপালের মতে কোনও সিগ্ন্যাল আমরা যদি কখনো শুনিতে পাই উহার উত্তর দিবার চেষ্টাও অনুচিত।

অধ্যাপক টমবো বলেন, আমরা যখন রেডিও আবিষ্কার করিলাম তখনই আমাদের বিপদের সূত্রপাত হইয়াছে। রেডিও তরঙ্গের কিছু কিছু বহির্বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সব উন্নত গ্রহবাসীরা একদিন আমাদের অস্তিত্ব ধরিয়া ফেলিবে। লুকাইবার উপায় নাই।

রেডিও তরঙ্গ আলোক তরঙ্গের গতি-বেগেই চলে—অর্থাৎ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। ১৯২০ সালে যে সব রেডিও তরঙ্গ পৃথিবী হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে উহাদের কিছু কিছু এখন অত্যন্ত প্রখর ধীসম্পন্ন জীবের আবাসস্থল কোনও কোনও গ্রহে পৌঁছিয়া থাকিবে। তাহারা আমাদের অস্তিত্ব জানিয়া ফেলিয়াছে এবং যদি ইচ্ছা করে তো পৃথিবীতে তাহাদের একটি অভিযান পাঠাইতে পারে। অবশ্য ঐ পার্টির আমাদের ধরাধামে পৌঁছিতে কয়েক শতাব্দী লাগিয়া যাইবে।

কেমন করিয়া তাহারা এতদিন বাঁচিয়া থাকিবে? ডক্টর টমবো বলেন, একটি উপায় হইল অভিযাত্রীদের তীব্র ঠাণ্ডায় জমাইয়া (deep-freeze) পাঠানো। তাহাদের প্রাণ-বৃত্তি শত শত বৎসর নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবে। পরে যখন উহারা পৃথিবীতে পৌঁছিবে তখন তাহাদের যানের বরফ আপনাআপনি গলিয়া যাইবে এবং তাহারা 'জাগিয়া' উঠিবে। ডক্টর কোপালের মতে এইসব অতি-মেধাবী গ্রহবাসী আমাদের সভ্যতাকে তাহাদের জীবন-ধারার পরিপন্থী মনে করিলে অতি সহজে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারে।

বৈজ্ঞানিকের মুখে এইসব ভবিষ্যদ্বাণী শুনিলে মজাও লাগে, আবার বুকও কাঁপে!

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

নব্য জীবনবেদের কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

ঘ। উদারচিত্তবৃত্তি

উদারচিত্তবৃত্তি যুক্তিসিদ্ধতার স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত। বেদান্তের বাণী হ'ল: ঈশ্বর এক কিন্তু বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাঁকে ডাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে। এই মহান তত্ত্ব—প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে নিজ নিজ দেবতার স্বরূপ নিয়ে সংঘর্ষের অবসান ঘটিয়েছিল, তারপর জাতির ধমনীতে প্রবেশ করে ভারতবাসীকে করে তুলেছিল সকল ধর্মের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। ফলে ভারত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল সর্ব-ধর্মসংস্কৃতির মিলনভূমি বা তীর্থক্ষেত্র। সমন্বয়ের দরুন ধর্মসংঘাত কখনও এদেশে গুরুতর আকার ধারণ করেনি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সংঘর্ষ সকল সময়ই ছিল উপরিতলগত। অন্তত এদেশের জনসাধারণ ভগবান বুদ্ধকে কখনও নূতন ধর্মের প্রবর্তক বলে মনে করেনি। তাদের মতে, বুদ্ধদেব এক নূতন বাণী ও প্রত্যাদেশ জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রচার করেছিলেন মাত্র; এবং তিনি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের মতই অন্যতম অবতার। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, হিন্দুরা বিদ্রোহী হিন্দু-সন্তান শাক্যমুনিকে বিষ্ণুর (এপর্যন্ত) শেষ অবতার বলেই মনে করে।

ধর্ম সম্বন্ধে উদার নীতি বেশ খানিকটা ভেঙে পড়বার উপক্রম করেছিল মুসলমানরা যখন এদেশে প্রথম এসে তরবারির মাধ্যমে তাদের ধর্মমতকে চালিয়ে দেবার প্রচেষ্টা করেছিল। কিন্তু বেশীদিন যেতে না যেতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন একদল সমন্বয়কারী সত্যদ্রষ্টা যাঁরা জনপ্রিয় একেশ্বরবাদের প্রচার করে ভাঙনকে রুদ্ধ ক'রতে সমর্থ হন এঁদের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবীর ঘোষণা করেন: "ঈশ্বর একই, দ্বিতীয় বলে কেউ নেই। রাম খোদা শক্তি শিব সবই এক…।"[১] আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই ঐক্যসাধন-প্রচেষ্টাকে ভারতের তপশ্চর্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে[২] এবং কবীরের দর্শনকে বলা হয়েছে ভারত-পন্থ বা ভারতের ধর্মাচরণের পথ। আবার যুগলানন্দকে অনুসরণ করে এই পন্থের অনুসরণকারীদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে ভারত-পথিক বলে।[৩]

ঙ। মানবতা

অবশ্য বেদান্তের যে বৈশিষ্ট্যের উপর স্বামী বিবেকানন্দ সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হ'লো আশাবাদ, বা আরও সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, মানবতার বাণী। মানুষের মধ্যে যে ঐশী শক্তি সুপ্ত আছে, বেদান্তের এই বাণী সাধারণ মানুষকে এমন একটা পবিত্রতা ও মর্যাদা দান করে যা অন্য কোন ধর্মে দেখতে পাওয়া যায় না।[৪] বেদান্ত শক্তি ও আশার মন্ত্র; এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় হ'লো যে, মানুষই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা,

১ K. M. Panikkar : A Survey of Indian History

২ ক্ষিতিমোহন সেন : ভারতের সংস্কৃতি

৩ রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে 'ভারত-পথিক' আখ্যা দিয়েছেন।

৪ Sarma : Renaissance of Hinduism, op. cit.

এবং যতই ক্ষুদ্র দুর্বল বা অধঃপতিত হোক না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার অপরিমেয় সম্ভাবনাকে উপলব্ধি ক'রতে সমর্থ।[৫] বেদান্ত আরও বলে যে দুর্বলতা ছাড়া পাপ ব'লে আর কিছু নেই। সুতরাং কারও জন্যে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করার কথা ওঠে না। যা ক'রতে হবে তা হ'লো সাহসিকতা পৌরুষ আত্মনির্ভরশীলতা এবং শক্তির মন্ত্রের মাধ্যমে প্রত্যেককে আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর করে দেওয়া। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—উপনিষদের এই বাণী বারবার শোনাতে হবে। তবে ব্যক্তি যদি নিজে পাপবোধ দ্বারা পীড়িত হয় তবে তার পরিত্রাণের মাধ্যম হ'লো 'কর্ম'।

নয়া বেদান্তের এই আশাবাদ বা মানবতার বাণী ভারতীয় রেনেশাঁর দিক দিয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এর মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে সন্ধান পাওয়া যায় রেনেশাঁর মূল লক্ষণের। ঐতিহাসিক বস্তুনিচয় হিসাবে (as a hitorical category) রেনেশাঁর কেন্দ্রবিন্দু হ'লো মানবতা। নয়া বেদান্তের মত আর কোথাও মানবতা বা মানুষের আত্মশক্তির বিকাশের সম্ভাবনাকে এমন দৃঢ় ও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হ'য়েছে কি? পুনরভ্যুদীয়মান ইতালী এই বাণী শুনেছিল পুনরুদ্ধৃত গ্রীক ও রোমক সাহিত্য-দর্শন থেকে। আর পুনরভ্যুদীয়মান ভারত শুনলে নয়া বেদান্ত থেকে। ফলে রচিত হ'লো আমাদের রেনেশাঁর ভাবাদর্শগত (ideological) এবং দার্শনিক বুনিয়াদ। মস্কোর Institute of Asian Studies-এর ডক্টর ওয়াই চেলীশেভের মতে, স্বামী বিবেকানন্দ মুক্তি-সম্পর্কিত ধারণাগুলিকে পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্যের রূপদান করে ফলিত নীতি হিসাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছিলেন।[৬] এই বুনিয়াদের উপরই ভিত্তি করে পরে গান্ধীজী ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক নির্দেশ করেছিলেন, এবং শ্রীঅরবিন্দ গড়ে তুলেছিলেন তাঁর 'কর্মযোগীর আদর্শ।'

ধর্ম ও মানবতা

যুক্তিবাদীদের অনেকে হয়ত ধর্ম ও মানবতার এই সম্পর্কের উপর ভ্রূকুটি করবেন। হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন: রেনেশাঁ বলতে যখন ধর্মীয় প্রভাবের হ্রাস বোঝায় তখন ধর্ম ও মানবতার মধ্যে এই রকম সম্পর্ক নির্দেশ করা কি পশ্চাৎগতির লক্ষণ নয়? এই ধরনের প্রশ্ন রেনেশাঁ সম্বন্ধে অপরিস্ফুট এবং ফলে বেশ কিছুটা ভ্রান্ত ধারণারই সূচক মাত্র। আমরা দেখছি যে রেনেশাঁ বলতে বোঝায় যুক্তি, চেতনা ও সত্তার সম্পূর্ণ মুক্তি। এই তিনটি উপাদানের প্রত্যেকটির মুক্তির জন্যই সেই রকম ধ্যানধারণার প্রয়োজন যা মূল্যদানের কথা চিন্তা না ক'রেই সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত থাকতে পারে।[৭] অতএব বলা হয়, প্রত্যেক অভিযানই ধর্মীয় অনুষ্ঠান মাত্র। সমাজজীবনকে যদি অন্যতম যৌথ নৈতিক ব্যবস্থা (a collective ethical enterprise) ব'লে বর্ণনা করা হয় তবে এর রূপায়ণে ধর্মের ভূমিকা অনুধাবন করা মোটেই কঠিন নয়। এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টে ধর্মকে প্রধানতম লোকায়ত আচার ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। রিপোর্টে আরও

---

৫ C. P. Ramaswami Aiyar : Swami Vivekananda and his Gospel of Strength, Vedanta Keshari, April '53

৬ C. V. (Centenary Volume)

৭ Relland : Prophets of the New India

বলা হয়েছে : "প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হ'লেন সেই মন্ত্রেরই উদ্‌গাতা সমাজ যার শ্বাসরোধ ক'রতে চায় এবং সেই আদর্শেরই উপাসক যার প্রচারে কর্ণপাত ক'রতে সমাজ সম্পূর্ণই অনিচ্ছুক।"[৮] শুধু এই নয়; প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মানুষের অন্তঃশক্তির বিকাশসাধনের জন্য কোন নূতন আলোক, উপাদান বা ব্যবস্থাকেই প্রত্যাখান করে না।

এখানে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীন। তাঁর মতে, কোন কাজই লৌকায়ত নয়; সকল কাজই আরাধনা পূজার্চনার অন্তর্ভুক্ত।[৯] অথবা ভগিনী নিবেদিতার ভাষায় বলা যায়, "If the many and the One be indeed the same reality, then it is not all modes of worship alone, but equally all modes of work, all modes of struggle, all modes of creation, which are paths of realisation. No distinction, henceforth, between sacred and secular. To labour is to pray. Life is itself religion."[১০]

এই চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞানের যুগে, চোখ-ধাঁধানো কৃত্রিম আলোর যুগে আমাদের পক্ষে এই ধরনের উক্তির তাৎপর্য অনুধাবন করা সত্যই কঠিন। এই আলো, এই বিলাস-উপচার যতই নয়নমুগ্ধকর, মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, মাত্র শান্ত চন্দ্রিমা থেকেই অশান্ত বিক্ষুব্ধ হৃদয় সান্ত্বনা লাভ করতে পারে। এই বস্তুবাদী সভ্যতা মরুদেশে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় সুখসন্ধানী শান্তিকামী মানুষকে প্রলুব্ধ ক'রে দিগ্‌ভ্রান্ত করে মাত্র। তারপর হঠাৎ একদিন দেখে যে সে শ্মশানের দ্বারদেশে উপস্থিত – কোথায় বা শান্তি কোথায় বা সুখ! আলোর নীচেই যে অন্ধকার; বস্তুবাদী সভ্যতা যতই আমাদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে সমর্থ হয় ততই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের অধঃপতন ঘটতে থাকে। এই কারণে স্বামীজী আমাদের বর্তমান সমাজজীবনকে সেই রকম হাসির ছটা ব'লে বর্ণনা করেছেন যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে বিলাপের সুর। "প্রকৃতপক্ষে এর পরিসমাপ্তি ঘটে বিলাপের ধ্বনিতে। যত কিছু কৌতুক চপলতা সবই উপরিতলগত। প্রকৃতপক্ষে এই জীবন বিষাদের ভারে ভারাক্রান্ত।"[১১] ম্যাকসমূলার প্রশ্ন করেছেন : "আমরা ষ্টীম গ্যাস ও বৈদ্যুতিক শক্তির মাধ্যমে দেহটাকে যথাসম্ভব আরামে রাখার ব্যবস্থাই করেছি সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা কি সেই প্রাচীন পরিবেশের হিন্দুদের চেয়ে জীবনে বেশী সুখী হতে পেরেছি?"[১২] না, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, দৈহিক আরামের মধ্যে সে সুখ নেই। একমাত্র সত্যের সন্ধানে অভিযানই—la magista—the greatest thing—উপলব্ধির জন্য অভিযানই আমাদের দিগ্‌ভ্রান্তি থেকে রক্ষা ক'রতে পারে। এই হ'লো ভারতের নিজস্ব জীবনদর্শন, এবং আমাদের জীবনীশক্তি কেন্দ্রীভূত হ'য়ে রয়েছে ধর্মের মধ্যেই।[১৩]

---

৮ কমিশনটিকে সভাপতির নামানুসারে 'রাধাকৃষ্ণন কমিশন'ও বলা হয়; পত্রাংক ২৯৭-৯৮

৯ C. W. V (complete works) also C. V. P. 238

১০ Preface to the C. W.; also Aggrerssive Hinduism

১১ The Master, op. cit.

১২ Heritage of India

১৩ The Mission of the Vedanta (C. W. III)

প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবশ্য এই শেষ নয়। স্বামীজী বিশ্বাস ক'রতেন যে সর্বক্ষেত্রে মানবজাতির ক্রমবিকাশে যে শক্তি এ-পর্যন্ত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা হ'লো ধর্ম, এবং তাঁর এ বিশ্বাসও ছিল যে ভবিষ্যতেও এর ব্যতিক্রম ঘটবে না। ব্যাপারটা হ'লো, স্বামীজীর মধ্যে ধর্মপ্রাণতা এবং আধ্যাত্মিকতা অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশেছিল এবং এর দরুনই তাঁর পক্ষে ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছিল যে "সভ্যতা মানুষের অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র।"[১৪] সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ অবশ্য এখানেই থামেননি। তিনি ভবিষ্যকালের সমাজবিবর্তনে ধর্ম কি ভূমিকা গ্রহণ ক'রবে সে সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট আভাষ দিয়ে গেছেন। ভগিনী নিবেদিতা লিখছেন: "In his consciousness, the ancient light of the mood in which man comes face to face with God might shine, but it shone on all those questions and those puzzles which are present to the thinkers and workers of the modern world."[১৫] এই অভূতপূর্ব সমন্বয়ের ফলে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শন, যাকে ডক্টর চেলীশেভ 'নব মানবতা' (new humanism) বলে অভিহিত করেছেন,[১৬] ভারতের নবজীবনের সাহিত্য ও অন্যান্য আন্দোলনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও চিন্তাধারার উপরও এর প্রভাব বিশেষ কম নয়।[১৭]

১৪ C. W. VI (1956 Edn.) P. 308

১৫ The Master. op. cit.

১৬ C. V.

১৭ Ibid, Dr. Suniti Kr. Chatterjee's article; also Sister Christine's memoirs

চ। গণতান্ত্রিকতা

গণতন্ত্র অন্যতম সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ যার প্রকৃতি পরিচয়ে রাষ্ট্রদার্শনিকদের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সকলেই এ-বিষয়ে একমত যে আদর্শটির মৌল উপাদান সংখ্যায় মাত্র দুটি: স্বাধীনতা ও সাম্য।[১৮] সুতরাং এ দুটি উপাদান যে সমাজদর্শনেরই প্রতিপাদ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত তাকেই গণতান্ত্রিকতার দ্যোতক বলে ধরা যায়। এরূপ অন্যতম সমাজদর্শন হ'লো স্বামী বিবেকানন্দের 'নয়া বেদান্ত'। স্বাধীনতা ও সাম্যের উপলব্ধি এই জীবনদর্শনেরও লক্ষ্য বিষয়ভুক্ত।

'নয়া বেদান্ত'-কল্পিত স্বাধীনতা বলতে বোঝায় সত্তার মুক্তি। এর ভিত্তি হ'লো উপনিষদ ও গীতা।[১৯] উপনিষদকে স্বামীজী শক্তির আকর বলে বর্ণনা করে বলেছেন "Therein lies the strength enough to invigorate the whole world; the whole world can be vivified, made strong, energised, through them···Freedom, physical freedom, mental freedom and spiritual freedom are the watchwords of the Upanisads."[২০] তারপর আরও বলেছেন পৃথিবীর সমগ্র ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে একমাত্র উপ-

১৮ Barker: Greek Political Theory (Plato and his Predecessors)

১৯ এ ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ ১০৯০ থেকে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত Thomas a Kempis-এর বিখ্যাত গ্রন্থ Imitation of Christ থেকেও কিছুটা অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। স্বামীজী বিভিন্ন প্রসঙ্গে গ্রন্থখানির উল্লেখ করেছেন।

২০ Vedanta in its Application to Indian Life (C. W. III)

নিষদই পাপ থেকে পরিত্রাণের কথা (salvation) কথা বলে না, বলে মুক্তির (freedom) কথা—"Be free from the bonds of nature, be free from weakness."

প্রায়ই একই সুরে গীতার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, "ঐ বিস্ময়কর কবিতা যার মধ্যে দুর্বলতা পৌরুষহীনতার কণামাত্রও নেই।" তাঁর মতে, "সম্পূর্ণ উপনিষদের সারাংশ পাওয়া যাবে গীতার মধ্যেই।"[২১]

সাম্যের নীতি অদ্বৈতবাদের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত। অভিজ্ঞতা থেকেও সাম্যনীতির পূর্ণ সমর্থন মেলে—দেখা যায় যে, সকল অমঙ্গল উদ্ভূত হয় সাম্যনীতিতে অনাস্থার দরুন এবং মঙ্গল প্রসূত হয় সাম্যনীতিতে বিশ্বাস থেকে। এই হ'লো বেদান্তের মহান আদর্শ।[২২] স্বামীজীর বক্তব্য হ'লো তাঁর সমগ্র শিক্ষা বেদান্তপ্রতিপাদিত এই মহৎ সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

ভূয়োদর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতা ও সাম্য নয়া বেদান্তের ন্যায় সম্প্রসারণাভিমুখী জীবনদর্শনের (growth-oriented philosophy of life) অপরিহার্য উপাদান হতে বাধ্য, কারণ 'স্বাধীনতাই সম্প্রসারণের প্রধান সর্ত' এবং প্রকৃত স্বাধীনতা ও সাম্য—মর্যাদা ও সুযোগের সমতার অর্থে সাম্য—সম্পূর্ণ অভিন্ন।

ছ। কার্যোপযোগিতা

ধর্মবিশ্বাস, দর্শন বা ভাবাদর্শের কার্যোপযোগিতা বা কর্মে পরিণতির সম্ভাবনা থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। কিন্তু যে দর্শন ভবিষ্যৎ সমাজ-বিকাশের গতিপথ নির্দেশের দাবি রাখে সেই দর্শনের পক্ষে কার্যোপযোগী বা কর্মে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনাপূর্ণ না হ'লে চলে না। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নিজের বক্তব্য হ'লো, কোন ধর্ম যদি যে কোন অবস্থায় মানুষকে সহায়তা ক'রতে সমর্থ না হয় তবে সেই ধর্মের বিশেষ মূল্য নেই; ধর্ম তখন মাত্র কয়েকজনের জন্য তত্ত্বেই আবদ্ধ থেকে যায়—কর্মে পরিণত হয় না। মানুষের প্রয়োজন মেটাতে হ'লে ধর্মকে সর্বাবস্থায় মানুষকে সহায়তা করবার উপযোগী হ'তে হবে।[২৩] অতএব, স্বামীজীর সমস্যা ছিল, কি করে বেদান্তকে প্রাণবন্ত ও কার্যে পরিণত করা যায়। স্বামী রঙ্গনাথানন্দকে অনুসরণ করে বলা যায়, তাঁর পরিব্রাজক জীবনে যে সমস্যা স্বামী বিবেকানন্দকে বিশেষ ভাবে প্রপীড়িত করেছিল, তা হলো—কি ক'রে বেদান্তকে কার্যে রূপায়িত করা যায়, কি করে পরমার্থ ও ব্যবহারের মধ্যে—আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জীবনের মধ্যে ব্যবধান মোচনের জন্য সেতুরচনা করা যায়।[২৪]

এই সমস্যার সমাধান তিনি ঠিক বেদান্তে পাননি, পেয়েছিলেন গীতার কর্মযোগের আদর্শে। বেদান্ত বলে, কর্মহীনতাই আত্মিক জীবনের মৌল বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বেদান্তদর্শনে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিকে যে শুধু তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকেই চূর্ণ ক'রতে হবে তা নয়, তার ব্যবহারিক জীবনকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে

২১ Nivedita: Notes of some Wanderings with Swami Vivekananda in the Himalayas. প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে Farquhar 'গীতাকে' 'Layman's 'Upanishad' বলে অভিহিত করেছেন।

২২ The Mission of Vedanta, above

২৩ Practical Vedanta 1

২৪ The Ramakrishna Mission—its Ideals and Activities

হবে।[২৫] অপরদিকে গীতার আদর্শ হ'লো 'কর্ম' ; যার দ্বারা বোঝায় লোকহিতৈষিতার জন্য বিসর্জন নয়, মানুষের সেবার জন্য ঈশ্বর-সমীপে সর্বস্ব-সমর্পণ···কারণ মানুষই ঈশ্বরের ভাবমূর্তি।[২৬] অতএব, ধর্মকর্ম ও লোকায়ত কার্যের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। কর্মসম্পাদন প্রার্থনারই সামিল। সমগ্র জীবনযাত্রাই ধর্ম।

কর্মের এই আদর্শ যে মাত্র লোকায়ত জীবনদর্শন ও ইন্দ্রিয়সুখের আকাজ্ক্ষা থেকেই মুক্ত করে তা নয়, মানুষকে অহংভাবের মোহ থেকেও পরিত্রাণ করে। অন্যভাবে বলা যায়, গীতার কর্মযোগ হলো অহংভাবকে—অস্তিত্বকে বিসর্জন দেওয়ার আহ্বান। অহং-ভাবকে বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তি তার স্বজাতির—মানবজাতির সেবায় অগ্রসর হয়। এই কর্ম তীর্থযাত্রারই সামিল, সুতরাং 'মানুষের ধর্ম'। এই কারণে স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ভগবান বুদ্ধ হলেন আদর্শ কর্মযোগী।[২৭]

অতএব, অহংভাবকে পরিত্যাগের মাধ্যমে মানুষের সেবায় নিজেকে উদ্বুদ্ধ করাই বেদান্তকে কর্মে পরিণত করে নব্যরূপ প্রদান করে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ কোন নূতন বাণী নয়—গীতাপ্রতিপাদ্য অন্যতম সত্যনীতির পুনরুদ্ধার মাত্র। কিন্তু এই পুনরুদ্ধার-কার্যও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এবং স্বামী বিবেকানন্দ এই কার্য সম্পাদন করেছিলেন আমাদের জাতীয় জীবনের এমন এক মুহূর্তে যখন এর প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দু চিন্তাগিরির শিখরদেশ বেদান্তের[২৮] এই নব্য রূপ গ্রহণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বিষয়টির আরও কিছুটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ভিন্নজাতীয় উপাদানসমন্বিত আমাদের নবজীবনের সভ্যতা স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ছিল তাঁর মনোময় আদর্শের চেয়ে অনেক হীন। তাঁর পূর্বসূরিগণ বিশুদ্ধিকরণের (purification) দিকে যতটা দৃষ্টি দিয়েছিলেন সম্প্রসারণের দিকে ততটা দৃষ্টি দেননি। স্বামীজী কিন্তু প্রধানত সম্প্রসারণেরই দার্শনিক উদ্গাতা। ঐতিহাসিক চেতনা ও ভূয়োদর্শনগত অভিজ্ঞতা তাঁর মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল যে, রেনেশাঁর তাৎপর্যকে জাতীয় জীবনে উপলব্ধি ক'রতে হ'লে তিনটি করণীয় বিষয়ের সুষ্ঠু সম্পাদন প্রয়োজন। প্রথমত, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্থাপন ক'রতে হবে। তৃতীয়তঃ, সাধারণ মানুষের সমস্যাকে কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ক'রতে হবে। গীতার কর্মযোগের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন এই তিনটি আবশ্যিক কর্মসম্পাদনের সূত্র। কর্মযোগ সমাজকে সংহত রাখবার তত্ত্ব নয়, সমাজকে গতিশীল ও সম্প্রসারিত করবার মৌলিক মন্ত্র।

এই মন্ত্রপ্রচার কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছিল তার বিচার আমরা পরে ক'রব, তবে এখানে বলা প্রয়োজন যে, স্বামীজীর সময় থেকে আমাদের রেনেশাঁর তিনটি ধারাই—যথা, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন, জাতীয় আন্দোলন ও সাহিত্য আন্দোলন—উপরি-উক্ত তিনটি সমস্যা বা কর্তব্যকে সম্মুখে রেখে প্রবাহিত হয়েছিল—বিশেষত সাধারণ মানুষের সমস্যা ছিল প্রত্যেকটি আন্দোলনের কর্মসূচীভুক্ত অন্যতম প্রধান বিষয়।　　(ক্রমশঃ)

২৫ Farquhar : The Crown of Hinduism, op. cit.

২৬ Swami Prabhavananda : Spiritul Heritage

২৭ Karma-Yoga

২৮ Farquhar, above.

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ঃ 'শিক্ষা'

পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

কার্ল মার্কস, হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা

'বর্তমান ভারত'—গ্রন্থের শেষদিকে এসে স্বামীজী বিশ্বের ইতিহাসে আসন্ন শূদ্রযুগের কথা ঘোষণা করেছেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লেখা স্পেন্সারের 'শিক্ষা'-গ্রন্থে সাধারণ মানুষের ইতিহাস তথা সামাজিক ইতিহাসের প্রতি যে আগ্রহের উদাহরণ পাই, তারও আগে কার্ল মার্কসের কালজয়ী রচনা Communist manifesto (সাম্যবাদী ঘোষণা) ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত ও ১৮৫০-এ ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে। স্বামীজীর যখন চার বছর বয়স, তখন মার্কসের শ্রেষ্ঠ রচনা দাস ক্যাপিটাল (Das Capital) গ্রন্থের প্রকাশকাল (১৮৬৭)। পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রমশক্তির অভ্যুত্থানের সপক্ষে এত বড়ো ঘোষণা এর আগে আর কখনো হয়নি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আগে মার্কসের ব্যাপক প্রভাব দেখা দেয়নি। স্বামীজীর রচনায় কোথাও মার্কস-এঙ্গেলসের মতবাদের উল্লেখ নেই। তবু যে যে ক্ষেত্রে মার্কসের সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাসূত্রের মিল আছে সংক্ষেপে তা লক্ষণীয়।

হেগেলের 'ইতিহাসের দর্শন' গ্রন্থে পৃথিবীর ইতিহাসকে বিভিন্ন দেশ ও জাতির আপন বৈশিষ্ট্যের বিকাশরূপে দেখবার প্রয়াস।[১] মার্কস এই বিভিন্নজাতীয় বৈশিষ্ট্যের বদলে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের কথা ভেবেছেন। তাঁর মতে পৃথিবীর ইতিহাস মূলতঃ শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক বিবর্তনের দ্বারা নির্ণীত।[২] স্বামীজী অর্থনৈতিক বা সমাজনৈতিক "অভাবের পূরণ" সম্বন্ধে সচেতন হলেও ভারতের ইতিহাসে ধর্ম-কেন্দ্রিক বিবর্তনই বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। ধর্মই তাঁর দৃষ্টিতে ভারতে সমাজচেতনার প্রতিভূ। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এ চার যুগের প্রত্যেকটির অবসান ও পরেরটির সূচনায় যে অবশ্যম্ভাবী সংঘাত তিনি লক্ষ্য করেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য।

'বর্তমান ভারতে' স্বামীজী এ বিষয়ে তিনবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমতঃ পুরোহিত যুগের আলোচনার শেষে—"শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পারে, সে সমাজ-শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"[৩]

ভারতের ইতিহাসে রাজর্ষি জনক, শাক্যসিংহ বুদ্ধ বা জিন মহাবীর—এঁরা ব্রাহ্মণের করতলগত বিদ্যার সর্বত্র বিস্তারের জন্য অগ্রসর

১ Philosophy of History : Hegel তুলনীয় : 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে স্বামীজীর দৃষ্টিতে হিন্দু, ফরাসী ও ইংরেজ সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য-নির্ণয়।

২ Cmmunist Manifesto : Marx—'The history of all hither-to existing society is the history of class struggles,'

৩, বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৫

হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-সংগ্রামের নিরসন করেছেন জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ 'গীতায়'।

রাজশক্তির পরে আসে বৈশ্যশক্তির যুগ। স্বামীজী সে প্রসঙ্গে দ্বিতীয়বার শ্রেণীসংঘাতের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। "বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য—যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য; একথা মনে থাকে না—গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত।

প্রজাসমষ্টির কেন্দ্রস্বরূপ রাজা অতি শীঘ্রই ভুলিয়া যান যে, তাঁহাতে শক্তিসঞ্চয় কেবল 'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুম্।' বেণ রাজার ন্যায় তিনি সর্বদেবত্বের আরোপ আপনাতে করিয়া অপর পুরুষে কেবল হীন মনুষ্যত্ব-মাত্র দেখেন!··· যদি সমাজ নির্বীর্য হয়, নীরবে সহ্য করে, রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং শীঘ্রই বীর্যবান অন্য জাতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয়। যেথায় সমাজ-শরীর বলবান, শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি—অতি দূরে নিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রব্য-বিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।"[৪]

উদ্ধৃত অংশটির শেষদিকে সুস্পষ্টভাবেই ফরাসী বিপ্লবের ইঙ্গিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজ আমলে বৈশ্যযুগ দেখা দিলেও য়ুরোপে বৈশ্যযুগ ঊনবিংশ শতাব্দীতেই সঞ্চারিত। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে তো রাজশক্তি অনেকদিন থেকেই বৈশ্যশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু শুধু ফরাসী বিপ্লবের কথাই স্বামীজী এক্ষেত্রে ভেবেছেন, তা নাও হতে পারে! হয়তো তুলনামূলকভাবে ভারতে ইংরেজরাজশক্তি সম্বন্ধেও তাঁর ওই বক্তব্য—"সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন। কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগযুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থ-পরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।"[৫]

বৈশ্যযুগের অবসানে শূদ্র-যুগের আবির্ভাব সম্বন্ধে আভাসদানপ্রসঙ্গে স্বামীজী তৃতীয়বার শ্রেণীসংঘাতের প্রশ্ন তুলেছিলেন—"সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে তত পরিমাণে তাহা দুর্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা—যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ছল, বল, কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরি-গৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্য-শক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়া, প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়া-পুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থ সিদ্ধ করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই স্থানে এই শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।"[৬]

৪ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৮-২৩৯

[৫/৬] ...ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪২-২৪৩

১৮৪৮-এ 'সাম্যবাদী ঘোষণা' পুস্তিকায় মার্কস ঘোষণা করেছিলেন—"সারা য়ুরোপে এক ধূমকেতু সমুদ্গত—সাম্যবাদের ধূমকেতু।" 'A spectre is haunting Europe—the spectre of Communism'. উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বিবেকানন্দ ক্রান্তদর্শী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন—"তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রত্বের প্রাধান্য হইবে …শূদ্রধর্মকর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।"[৭] এই সঙ্গে মনে করুন হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে ইতিহাসের লক্ষ্য—"The only history that is of practical value, is what may be called Descriptive Sociology. And the highest office the historian can discharge, is that so narrating the lives of nations, as to furnish materials for a comparative Sociology and for the subsequent determination of the ultimate laws to which social phenomenon conforms."[৮] "The thing it really concerns us to know is the natural history of society".[৯]

"বিবিধ সময়ে সমাজের বিবিধ পরিবর্তনও কার্যকারণসম্বন্ধের সহিত যথাক্রমে প্রদর্শিত হওয়া উচিত। অতএব প্রতীতি হইতেছে যে, এই প্রকার ইতিহাসই বাস্তবিক ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বের যথার্থ সহচর।"[১০] "বাস্তবিক ইতিহাস সমাজের জীবন-বৃত্তান্ত।"[১১]

স্পেন্সার যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিহাসের অন্তর্নিহিত সমাজতত্ত্ব অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন, মার্কস তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই সমাজতত্ত্বের এক সূত্রনির্ধারণ আরো আগেই করেছেন। এখন বিচার্য—মার্কস ও স্পেন্সারের এই সূত্রনির্ধারণ-প্রচেষ্টা কতদূর ইতিহাসসঙ্গত।

কালানুক্রমিক বিচারে হেগেল, মার্কস, স্পেন্সার ও বিবেকানন্দ—এঁরা সবাই সভ্যতার ক্রমবিবর্তনকে বিশেষ এক দার্শনিক সূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছেন। পূর্বগামী চিন্তানায়কদের দ্বারা স্বামীজীর ইতিহাসদৃষ্টি অনেকটা সহায়তা পেয়েছে এমন মনে করা চলে। কিন্তু বিভিন্ন যুগের ইতিহাসে যে শ্রেণীসংঘাত অনিবার্য, এমন কোন সিদ্ধান্ত স্বামীজী করেননি। বরং মেরী হেলকে লেখা তাঁর ১৮৯৬-এর ১লা নভেম্বরের পত্রে স্বামীজী স্বপ্ন দেখেছেন সব শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ গুণের সমন্বয়ে এক আদর্শ রাষ্ট্রের—"If it is possible to form a state in which the knowledge of the priesthood, the culture of the military, the distributive spirit of the commercial and the ideal of equality of the last can be kept intact, minus their evils, it will be an ideal state."[১২] "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ্যযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।"[১৩]

৭ তদেব : পৃ: ২৪১

৮, ৯ Education : Spenser : 1st Edn. p36 ; 34

১০, ১১ শিক্ষা ও স্পেন্সার : স্বামী বিবেকানন্দ-অনূদিত : বসুমতী সংস্করণ : পৃ: ৭২-৭৩

১২ Complete Works of S. Vivekananda : Vol, VI : Centenary Edition.

১৩ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড দ্রষ্টব্য

পূর্ব পূর্ব যুগের আরম্ভ ও অবসানের ইতিহাস বিবেচনা করলে শূদ্রশক্তির আধিপত্যেরও একদা অবসান হওয়া আশ্চর্য নয়। মার্কস সর্বহারার একাধিনায়কত্বের পরেই যে সুখস্বর্গের কল্পনা করেছেন, তার কিছু মূল্য স্বীকার করেই বলা যায় যে, সমাজে প্রত্যেক শ্রেণীরই নিজস্ব ভূমিকা আছে। পরস্পরের সহযোগিতার দ্বারা যদি শোষণমুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা বা স্বামীজীর পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রকে বাস্তবে পরিণত করা যায়, তাহলে ঘৃণা ও দ্বন্দ্বের বদলে প্রেম ও সহযোগিতার ভিত্তিতে স্থায়ী সাম্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে। সর্বহারাদের প্রতি গভীর মমতাবোধসত্ত্বেও যে বিদ্বেষের মনস্তত্ত্বে মার্কস তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম আজ সুস্পষ্ট। অর্থনৈতিক সাম্য যদি আত্মোপলব্ধির সাম্যে বিধৃত না হয়, তাহলে সাম্যের আদর্শ যে শতধা খণ্ডিত হয়ে যেতে পারে, আজকের পৃথিবীতে তাঁর উদাহরণ অজস্র।

(ক্রমশঃ)

জীবন-সঙ্গীত

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

আমার অন্তরে বাহিরে গানে গানে প্রভু
তোমারে খুঁজে বেড়াই
বেদনার মাঝে কভু এ পরাণে
তোমারি পরশ পাই।
তোমার বাঁশরী ডাকে যে আমায়
নিতি নব কত ভাবের ধারায়
অসীমে সসীম কভু বা মেশাও
ভাবাতীত সত্তায়।
বহু রূপে তব লীলার প্রকাশ
বিশ্বভুবন জুড়ে
তাই নিয়ে আমি ভুলিয়া রয়েছি,
তাই কি রয়েছ দূরে?
অরূপ, তোমার ভাষাহীন সুরে
হৃদয় আমার দেবে নাকি পুরে?
কাণ্ডারী ওগো চির-পথ সাথী
রূপে ও অরূপে তাই
আজো, তোমারে খুঁজে বেড়াই

আচার্য যদুনাথের পিতৃস্নেহমধুর রূপ

শ্রীমতী বীণা বাগচী*

ছোটবেলায় আমার পিতামহের মুখে আচার্য যদুনাথের কথা প্রথম শুনি। কলকাতার হিন্দু হোষ্টেলে একই ঘরে আমার পিতামহ যদুনাথের সঙ্গে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেছেন।

কলকাতায় কলেজে পড়বার জন্য মফঃস্বল শহর থেকে বেথুন হোষ্টেলে এসে ভর্তি হ'লাম। যেদিন আমি বেথুন হোষ্টেলে গেলাম তার পরের দিনই আর একটি মেয়ে দার্জিলিং থেকে এল। তাকে দেখে সবাই কানাকানি করতে লাগল—স্যর যদুনাথের মেয়ে! আমি সেই শৈলপ্রবাস থেকে নবাগতা মেয়েটির দিকে অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম—যে স্যর যদুনাথের কথা আমার পিতামহের মুখে এত শুনেছি, তাঁরই মেয়েকে শুধু দেখা নয়—তার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ব—একঘরে থাকব—এ তো কখনও ভাবিনি আগে! মনে যেমন বিস্ময়, তেমনি খুশি।

ধীরে ধীরে অল্প সময়ের মধ্যে আচার্য যদুনাথের মেয়ে রমার সহিত আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। আমার পিতামহ পত্রের মাধ্যমে আমার কাছ থেকে যখন সব কিছু জানতে পারলেন তাঁর ভারী আনন্দ হ'ল। আমার পিতামহ লিখলেন—"পূর্বজন্মের অনেক সৌভাগ্য বলে আচার্য যদুনাথের মত আদর্শ মনীষাকে সতীর্থ হিসাবে পেয়েছিলাম। 'বাপ কী বেটি, সিপাহী কী ঘোড়ী, কুছ্ নহী তো থোড়া থোড়া।"

তখন আচার্য যদুনাথ দার্জিলিংএ থাকতেন। নিয়মিত রমাকে হোষ্টেলে চিঠি লিখতেন। বাবার চিঠি রমাকে সবচেয়ে বেশী আনন্দ, উৎসাহ ও প্রেরণা দিত—এইটুকু দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছি। বাবার চিঠি এলেই আমি রমাকে দেখে বুঝতে পারতাম—খুশি যেন ওর চোখে মুখে উপ্‌ছে প'ড়ত! বাবার চিঠি আমাকে দিয়ে না পড়ানো পর্যন্ত তার যেন পরিতৃপ্তি হত না। পত্রের মাধ্যমে তিনি সন্তানের মনে এমন একটা আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেন। একটি ছোট্ট শিশুকে মা যেমন করে প্রথম হাত ধরে ধরে চলতে শেখায়, হাঁটতে শেখায়—অসহায় শিশুর মনে বল যোগায়, সাহস যোগায়—আমি আছি, তুমি পড়বে না—নিশ্চিন্ত মনে চলতে থাক।

সবচেয়ে আশ্চর্য হতাম এতরকম কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি কন্যার সবকিছুতে মনোযোগ দিতেন, আগ্রহ দেখাতেন, পথ নির্দেশ করতেন।

যদুনাথের সন্তানদের মধ্যে রমা ছিল সবচেয়ে ছোট। রমাকে যে চিঠি লিখতেন সেগুলো দেখে মনে হত যেন তিনি একটি ছোট্ট মেয়েকে চিঠি লিখছেন, যে প্রথম বাবা মাকে ছেড়ে কলকাতায় এসেছে। চিঠিগুলিতে এমন একটা গভীর স্নেহ ও দরদের সৌরভ প্রচ্ছন্ন থাকত! কনিষ্ঠা কন্যাকে লিখিত যদুনাথের পত্রাবলীর মধ্যে দেখেছি এক অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, সহৃদয়, বন্ধুপ্রতিম পিতাকে—যিনি একাধারে মা ও বাবা দুই-ই ছিলেন।

* মহিলা বিচারক, কিশোর আদালত

যখন চিঠি লিখতেন তখন বাড়ীর খুঁটিনাটি সব খবরই তাতে থাকত। চিঠি পড়ে মনে হ'ত যেন অত্যন্ত আদরের দুলালীর সামনে বসে কথা বলছেন।

তাঁর লেখা কোনও কোনও চিঠির অংশ-বিশেষ স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে। লাইন কয়েকটি নীচে উদ্ধৃত করলাম। "ডিকেন্স ও টমাস হার্ডির বইগুলি এক এক করিয়া সব পড়িবে। প্রতিদিন কিছুটা সময় বাহিরের বই পড়িবার জন্য রাখিবে। যদিও তুমি বিজ্ঞানের ছাত্রী, ইংরাজীকে অবহেলা করিও না। লেখার অভ্যাস খুব করিবে।"

আর একটি চিঠিতে লিখলেন—"মনে রাখিও পরীক্ষা পাশই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কতটুকু শিখিলে, কতটুকু প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করিলে সেইটাই আসল। পরীক্ষা পাশের জন্য শরীরের ওপর অত্যাচার করিবে না। সর্বদা মনে রাখিবে আগে শরীর স্বাস্থ্য, তারপর পরীক্ষা পাশ। তুমি পত্রে সর্বপ্রথম তোমার শরীরের কথা লিখিবে। আমাদের জন্য চিন্তা করিয়া কোনও রকম মন খারাপ করিবে না। খুব প্রফুল্ল থাকিবে। পূজার ছুটি তো আসিয়া পড়িল।…"আরেকটি পত্রের কয়েকটি লাইন—

"আমিষ তুমি একেবারেই পছন্দ কর না। দুধ ঠিকমত খাইতেছ ত'? পড়াশুনায় শরীরের ক্ষয় হয়। কাহাকেও দিয়া রোজ দুইটি করিয়া বাগবাজারের রসগোল্লা আনাইয়া খাইবে। তাহাতে ছানা খাওয়ার কাজ হইবে।…"

"নৈরাশ্যকে একেবারেই প্রশ্রয় দিও না। নৈরাশ্য আত্মোন্নতির পথে এক বিশেষ বাধা বলিয়া জানিবে।"

কোনও পারিবারিক প্রয়োজনে আচার্য যদুনাথ দার্জিলিং পাহাড় থেকে কলকাতায় নেমে এসেছেন এবং সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীটে বাড়ী ভাড়া করে থাকছেন। নিরভিমান, নিরহঙ্কার, পোশাকে-আশাকে অত্যন্ত সাদাসিধে আচার্য যদুনাথ একদিন বই কিনতে কলেজ স্ট্রীট যাচ্ছেন। রাস্তায় হঠাৎ কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে যান। একটি রিক্সাওয়ালা দেখতে পেয়ে কাছেই একটি বইয়ের দোকানে খবর দেয়। বইয়ের দোকানের মালিক গিয়ে দেখেন এই ভদ্রলোক অন্য কেউ নন—আমাদের দেশের গৌরব আচার্য যদুনাথ মহানগরীর ধূলিমলিন রাজপথে পড়ে আছেন। উত্থান-ক্ষমতা নেই। তারপর যা যা করণীয় বইয়ের দোকানের প্রোপ্রাইটার করলেন। এই পড়ে যাওয়ার ফলে যদুনাথকে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিলো। কিন্তু এমন তাঁর ধৈর্য, স্থৈর্য ও সহনশীলতা যে বাড়ীর লোকদের তিনি বুঝতেই দিতেন না যে, তাঁর এত বড় একটা দুর্ঘটনা হয়েছে! আত্মীয়-পরিজনরা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলে যদুনাথ তাঁদের আশ্বাস দিতেন। শয্যাশায়ী অবস্থায় বইয়ের পর বই পড়ে যাচ্ছেন—দর্শকদের সঙ্গে গভীরচিন্তাতত্ত্বপূর্ণ আলোচনায় কখনও কখনও মগ্ন! কি অদ্ভুত তাঁর মনের জোর!

যদুনাথের ছোট মেয়ে রমা, আমার সতীর্থা ও বান্ধবীর সঙ্গে মাঝে মাঝে ওদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছি। রমা বলল—'এস বাবার সঙ্গে একটু দেখা করবে।' আচার্য যদু-নাথের ঘর ত' নয় একটা লাইব্রেরী! দেওয়াল দেখা যাচ্ছে না—শুধু বই! মহা-সমুদ্রকূলে জ্ঞানতপস্বী যদুনাথ তন্ময় হয়ে জ্ঞানের নুড়ি কুড়িয়েই চলেছেন! কোনও দিকে যেন খেয়াল নেই। মনে হ'ল এ ত' নিছক বইয়ের পাতা ওল্টানো নয়—এ যেন তাঁর ধ্যান!

প্রণাম করলাম। একটু হেসে মাথায় পিঠে সস্নেহ হস্তের স্পর্শ দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। ব্যস্! নিমেষের মধ্যে আবার বইয়ের পাতায় ডুবে গেলেন। মনটাকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে ভরে নিয়ে তাঁর ঘর থেকে বেরোলাম। সেদিন ছিল সরস্বতী-পূজো। সরস্বতীর বরপুত্রের দর্শন এমন অভাবনীয় ভাবে এই শুভদিনে হবে ভাবতেও পারিনি। মনে হ'ল পুণ্য শ্রীপঞ্চমী আজ আমার জীবনে সার্থক হ'ল!

যার মধ্যে সত্যিকারের জ্ঞান-পিপাসা লক্ষ্য করতেন তাকে আচার্য যদুনাথ কত উৎসাহিত করতেন! যদুনাথের কনিষ্ঠা কন্যা রমা বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্রী ছিল। রমার বড় ইচ্ছে তার নিজের ছোট্ট একটি ল্যাবরেটরি হয়। যদুনাথ জানতে পেরেই রমার সে বাসনা পূর্ণ করলেন। সব সময় নানান ভাবে রমাকে খুব উৎসাহিত করতেন—প্রেরণা জোগাতেন—যখন যে-বই সে চেয়েছে—সময় সময় নিজে গিয়ে তা কিনে এনে দিয়েছেন। রমাকে আচার্য যদুনাথ প্রায়ই বলতেন ও লিখতেন—"শুধু পরীক্ষা-পাশের পড়া করলে হবে না, একটু গান, একটু বাজনা এবং খেলা-ধূলো শিখতে হবে।"

যে সময় সংসার থেকে অবসরগ্রহণের কথা, বিধাতার অমোঘ বিধানে তাঁকে সেই সময় সংসারের গুরুদায়িত্বভার নতুন করে নিতে হয়েছে। তিনি জানতেন রমার বহুদিনকার সাধ সে বিলেতে যাবে D. Sc. ক'রতে। পরম স্নেহশীল পিতা যদুনাথ অধীর হয়ে উঠলেন আদরের দুলালীর বহু দিনের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার জন্য। পারিবারিক বিপর্যয় দেখে রমা দ্বিধা করতে লাগল। পাছে নৈরাশ্যের বেদনায় কন্যার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, আচার্য যদুনাথ তাকে বুঝতেই দিলেন না যে, অপ্রত্যাশিত দুর্যোগ তাঁকে নানান দিক দিয়ে বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে। উপরন্তু মেয়েকে তিনি হাসিমুখে উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে লাগলেন। দেখেছিলাম সেদিন অসাধারণ 'মানুষ যদুনাথকে'। কন্যার কাছে পিতা যদুনাথ ছিলেন শক্তি, উৎসাহ ও প্রেরণার প্রতীক। সন্তানের জীবনে পিতার প্রভাব যে কতখানি কাজ করে তা নিজে চোখে দেখেছি—আমার কাছে তা পুঁথিগত বুলি নয়। যখনই কন্যার কোমল মন কোনও কারণে নৈরাশ্য ও অবসাদের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে আসত, পিতা যদুনাথের স্নেহসিক্ত প্রভাব সূর্যের মতন কাজ করত।

জ্ঞানাকাশে এক উজ্জ্বল মহাজ্যোতিষ্ক-রূপে তাঁকে সুধীসমাজের সবাই দেখেছেন। কিন্তু অন্তরঙ্গ মানুষ যদুনাথের পরিচয় কজন পেয়েছেন জানি না। গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিভারে নত হয়ে আজকের দিনে বারবার খুঁজে বেড়াই সেই সহানুভূতিশীল, স্নেহপরায়ণ সখা-প্রতিম, পরম দরদী পিতা ও অভিভাবক যদুনাথকে আর আকুল হয়ে প্রার্থনা করি—তোমার বিদেহী আত্মার কল্যাণময় প্রভাব ও স্নেহের ফল্গুধারা আজকে আমাদের বাংলাদেশের বিপর্যয়ের দিনে বিভ্রান্ত, বিপথগামী কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের ব্যর্থতার গ্লানিতে তপ্ত, রুক্ষ ও রূঢ় মনের জ্বালাকে স্নিগ্ধ করুক, শীতল করুক, উৎসাহের দ্বারা উদ্দীপ্ত করুক, প্রেরণার দ্বারা সঞ্জীবিত করুক!

সমালোচনা

শ্রীম-দর্শন (ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধন), শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ শ্রীম-র কথামৃত (ষষ্ঠ ভাগ)— গ্রন্থকার ও প্রকাশক: স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। পরিবেশক: জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ৩০৯; মূল্য পাঁচ টাকা।

'শ্রীম-দর্শন' — শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকার শ্রীম অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয় বা পরমভক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে দর্শন, অথবা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার কথোপকথন ও ঈশ্বর-প্রসঙ্গ শুনিয়া মনে যে চিন্তাধারা প্রবাহিত হইয়াছে তাহার উপস্থাপন—উভয়ের কোন্‌টি বুঝায়? গ্রন্থখানি পাঠ করিলে দুই প্রকার ধারণাই হইতে পারে। ঠিকভাবে দেখিলে উভয় দিক দিয়াই গ্রন্থের নামকরণটি সার্থক।

ইতঃপূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থখানির পাঁচটি খণ্ডই ভক্ত পাঠকগণের নিকট যে সমাদর লাভ করিয়াছে, বর্তমান ষষ্ঠ খণ্ডের প্রকাশই তাহা প্রমাণ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাষ্টার মহাশয়কে উপদেশ দিয়াছিলেন—ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন ও নির্জন বাস, ইহা শ্রীম ঠিক ঠিক পালন করিয়াছিলেন। তিনি সংসারের কোলাহল হইতে দূরে নির্জনে গিয়া মাঝে মাঝে অতিবাহিত করিতেন এবং সর্বদা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করিতেন।

আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার নিবেদন করিয়াছেন: "শ্রীম-দর্শনের ষষ্ঠ ভাগ শ্রীম-র জীবনের এই অধ্যায়টি—দিবানিশি ঈশ্বর-গুণগানকীর্তনের বার্তা বহন করে। আর সাংসারিক লোকদিগকে নির্বাক উপদেশ দেয়— বার আনা মন দিয়ে ঈশ্বরের চিন্তা কর। আর চারি আনা মন দিয়ে অন্য সব কাজ কর। তাহা হইলে আনন্দে 'জলন্তকুণ্ডে' শান্তিতে থাকিতে পারিবে; অন্তে পরমানন্দ লাভ করিবে।"

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থের প্রত্যেক ভাগের প্রারম্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ এই শ্লোক:

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥" ১০।৩১।৯

—তোমার কথামৃত সন্তপ্তদিগের জীবন-স্বরূপ, তত্ত্বদর্শিগণ কর্তৃক স্তুত, শ্রবণমঙ্গল, শ্রীবৃদ্ধিকর ও শান্তিদায়ক। যাঁহারা ভূতলে ভগবানের 'কথামৃত' বিতরণ করেন তাঁহারা বহুদাতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দাতা।

'শ্রীম-দর্শন' পাঠ করিলে পাঠকের এই ধারণাই দৃঢ় হইবে যে, মাষ্টার মহাশয় সর্বদা অনলসভাবে ভগবানের 'কথামৃত' বিলাইয়াছেন এবং তিনি যে শ্রেষ্ঠ দাতা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যুগশঙ্খ—বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির পত্রিকা, পঞ্চদশ বর্ষ (১৯৬৯)। বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, মালদহ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৬৯।

এবারের এই বার্ষিক পত্রিকাটিতে গান্ধীজীর সম্বন্ধে ছাত্রদের ৪টি রচনাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যান্য লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'পরমাশ্চর্য পরমাণু', 'দেখে এলাম অমরকণ্টক', 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও নবযুগপ্রবর্তন'। 'বিদ্যামন্দির সংবাদ-পরিক্রমা'য় সারা বৎসরের কর্মধারা বিজ্ঞাপিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ : গত ৪ঠা পৌষ, ১৩৭৭ (২০. ১২. ৭০) রবিবার পুণ্য কৃষ্ণা সপ্তমীতে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সারদাদেবীর অষ্টাদশোত্তরশততম শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইয়াছিল।

প্রত্যূষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে মঙ্গলারতির পর শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে মঙ্গলারতি ও বেদপাঠ দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভ হয়। তৎপরে ভজন, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও হোমাদি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের উভয় মন্দিরেই বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। নাটমন্দিরে বেলা ৯টা হইতে ১০টা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ এবং বেলা ১০টা হইতে ১২টা কালীকীর্তন হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো কেন্দ্র হইতে আগত স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ সভাপতিত্ব করেন। স্বামী বুধানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ ও সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে সুচিন্তিত ও সময়োপযোগী ভাষণ দেন।

সভাপতির ভাষণে স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ইংরেজীতে বলেন : দীর্ঘ ২২ বৎসর কাল তাঁহার আমেরিকায় থাকাকালে তিনি অনুভব করিয়াছেন কিভাবে শ্রীশ্রীমায়ের মহিমা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাঁহার শক্তিকে লীলাসহায়িকারূপে। বর্তমানে হিংসাবিষে জর্জরিত জগতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর বাণীর যথাযথ অনুশীলন দ্বারা প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন।

স্বামী বুধানন্দও ইংরেজীতে বলেন। তিনি বলেন, জগতের অধ্যাত্ম-ইতিহাসে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন অতীব বিস্ময়কর। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের ঘটনাবলী উদ্ধৃত করিয়া বক্তা দেখান 'রামকৃষ্ণজয়দায়িনী মা'- এই উক্তিটির তাৎপর্য কত গভীর ও ব্যাপক! শ্রীশ্রীমা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী।

স্বামী নিরাময়ানন্দ বাংলায় ভাষণ দেন। তিনি বলেন : বর্তমান যুগ যেন মাতৃহারা যুগ। অনাথ অসহায় হইয়া লোকে শক্তি ও শান্তি প্রার্থনা করিতেছে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে—ভগবানের মাতৃশক্তির কাছে। একটি পল্লীবালিকা কিভাবে বিশ্বজননীতে পরিণত হন, বক্তার মনোজ্ঞ ভাষণে তাহা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে আরাত্রিকের পর শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে আরতি হয়। সন্ধ্যারতির পর নাটমন্দিরে ভজন হইয়াছিল।

সারাদিনে পঞ্চাশ হাজার ভক্ত নরনারী বেলুড় মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় ১২,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে বসাইয়া অন্নপ্রসাদ দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী : কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর যে বাড়ীতে (১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩) পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা

সারদাদেবীর জীবনের শেষ একাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল, বহুপুণ্যস্মৃতিবিজড়িত সেই ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ ১১৮তম জন্মোৎসব গত ৪ঠা পৌষ (২০.১২.৭০) রবিবার বিশেষ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে সুসম্পন্ন হয়।

মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচার পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ, হোম, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-পাঠ, ভজন, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী-আলোচনা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

বেলা দশটা হইতে এগারটা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। সন্ধ্যায় আরতি ও ভজনের পর স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন আলোচনা করেন। রাত্রে বিশেষ ভজনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

ভোর হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসেন। আবহাওয়া ভাল থাকায় ও ছুটির দিন হওয়ায় ভক্তসমাগম ভালই হইয়াছিল; সারাদিনে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত নরনারী সমবেত হন। সমাগত সকলেই হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সারাদিন পূজা পাঠ ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ও ভক্তসমাগমে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী আনন্দমুখর ছিল।

কল্পতরু উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে—গত ১লা জানুআরি সারাদিন মহাসমারোহের মধ্য দিয়া কল্পতরু-উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি, 'রসরঙ্গে'র সভ্যগণ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, শ্রীসবিতাব্রত দত্তের ভক্তিমূলক সঙ্গীত, গ্রে স্ট্রীট কালীকীর্তন সম্প্রদায় কর্তৃক কালীকীর্তন, শ্রীবংশীধারী চক্রবর্তী ও সম্প্রদায় কর্তৃক পদাবলীকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক রামায়ণগান ও স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যার পর স্বামী সন্তোষানন্দজীর সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা—স্বামী মহানন্দ ও অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার।

তাঁহারা কাশীপুর উদ্যানবাটিতে কল্পতরু দিবসের ঘটনার বিবৃতি দিয়া বলেন যে শ্রীভগবানের কৃপা সমভাবেই সর্বদা রহিয়াছে, আমরা সামান্য চেষ্টা করিলেই উহার স্পর্শ পাইব। বর্তমান তমিস্রা কাটাইতে হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া, ভগবান সকলের অন্তরেই রহিয়াছেন এই বোধে সজাগ থাকিয়া আমাদের সমদর্শী হইতে হইবে, শ্রীভগবানের সেবাজ্ঞানে সকলকেই সহায়তা করিতে হইবে, আধ্যাত্মিক শক্তিকে সামাজিক শক্তিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। সভাপতি মহারাজ এই শুভ-দিনে সকলের অন্তর শুভভাব-রূপ রত্নরাজিতে পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া সভার কাজ শেষ করেন।

ভোর হইতেই উদ্যানবাটীতে লোকসমাগম শুরু হইয়াছিল এবং রাত্রি পর্যন্ত সমভাবে চলিয়াছিল। প্রায় বিশ হাজার লোক এই দিন এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করিতে সমাগত হইয়াছিলেন। সকাল ৫॥টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত হাতে হাতে সকলকেই প্রসাদ দেওয়া হয়।

কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে—প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও ১লা জানুয়ারি 'কল্পতরু দিবস' মহানন্দে প্রতিপালিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম ও ভজনাদি উৎসবের অঙ্গ ছিল। সারাদিন ধরিয়াই লোকসমাগম হইতে থাকে। প্রসাদ হাতে হাতে বিতরিত হইয়াছিল।

কার্যবিবরণী

পাটনা (রামকৃষ্ণ অ্যাভিনিউ, পাটনা ৪) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের এপ্রিল ১৯৬৯ হইতে মার্চ ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে পাটনায় রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আশ্রমটি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। এই আশ্রমের ৪৮তম বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে।

পাটনা কেন্দ্রের কার্যাবলী প্রধানতঃ ত্রিধারায় পরিচালিত : (১) শিক্ষা ও সংস্কৃতি, (২) চিকিৎসা, (৩) ধর্ম।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের ছাত্রাবাসে (কেবল মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য) ২৪জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে ১২ জন বিনাখরচে থাকিবার সুযোগ লাভ করে এবং ৩ জন আংশিক খরচ দেয়। আশ্রমের বিদ্যার্থিগণ বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়াছিল সকলেই কৃতকার্য হয়; একজন এম-এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

স্বামী তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৮,৩৬৮; আলোচ্য বর্ষে ১৯০ খানি নূতন বই সংযোজিত হইয়াছে। পাঠাগারে ৯টি দৈনিক ও ৯৬ খানি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগার হইতে পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকসংখ্যা ১০,৮৪১। গড়ে পাঠকগণের দৈনিক উপস্থিতি ৫৮।

আলোচ্য বর্ষে নানা স্থানে ও আশ্রমে ধর্মালোচনার জন্য ২৬১টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট বক্তাগণ কর্তৃক আশ্রমে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। গীতা-ক্লাস নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আশ্রম-পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয়বিধ চিকিৎসা-ব্যবস্থাই আছে। আলোচ্য বর্ষে অ্যালোপ্যাথিক বিভাগে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ৭৭,৭৪০ (নূতন ৯,০৩৮)। হোমিও-প্যাথিক বিভাগে মোট ৭৯,৫৫০ জন রোগী চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ৫,৯০৩।

মাঙ্গালোর (মঙ্গলাদেবী রোড, মাঙ্গালোর ১, দক্ষিণ কানাড়া) রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দের (এপ্রিল হইতে মার্চ) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

মাঙ্গালোরে রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে এবং মিশনের কাজ শুরু হয় ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে।

বালকাশ্রমে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণ বিনা-খরচে আহার ও বাসস্থানের সুযোগ লাভ করে। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে স্কুলের ৪২ (১২+৩০) জন এবং কলেজের ৯ জন বিদ্যার্থী ছিল। এই ৫১ জন ছাত্রের সকলেরই সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আশ্রম কর্তৃক বহন করা হইয়াছিল। বালকগণের শারীরিক মানসিক নৈতিক সর্ববিধ উন্নতিসাধনের জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুসহস্রনাম, ললিতসহস্রনাম প্রভৃতি ধর্মপুস্তক হইতে আবৃত্তি এবং ভজন-সঙ্গীত বিদ্যার্থিগণকে শিখানো হইয়া থাকে।

স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রোগগ্রস্ত দরিদ্র জনসাধারণের সেবাকল্পে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক মাঙ্গালোরে অ্যালো-প্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়

প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এই চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে জাতিধর্মনির্বিশেষে আর্তনারায়ণের সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ২৯,৩৬৩, তন্মধ্যে নূতন রোগী ৬,৭৪২।

নিউ দিল্লী: রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সাধারণভাবে এই কেন্দ্রের সূচনা হয় এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহা নিজস্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির ও বিরাট লেকচার-হল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই কেন্দ্র কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, একটি ফ্রি টি. বি. ক্লিনিক, একটি আউটডোর হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী ও সারদা-মন্দির পরিচালিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত ধর্মালোচনা ও সাময়িক বক্তৃতাদির মাধ্যমে আশ্রমে এবং আশ্রমের বাহিরে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব প্রচারিত হইয়াছে।

রামচরিতমানস (তুলসী-রামায়ণ) অবলম্বনে হিন্দীতে ৫১টি আলোচনা হয়।

গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা (শিশুবিভাগ সহ) মোট ২১,৫৪৪। আলোচ্য বর্ষে ১,৫১৪ খানি নূতন পুস্তক সংযোজিত হইয়াছে। পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তকসংখ্যা ১৯,০৩২। পাঠাগারে ১৪টি সংবাদপত্র ও ১৪৫টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। পাঠাগারে গড়ে দৈনিক পাঠকসংখ্যা ৬৮৭।

গ্রন্থাগারের বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রবিভাগটি ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করা হয়। এখানে ৩,৩৩৭ খানি পুস্তক রাখা হইয়াছে। দৈনিক গড়ে ১০৭ জন বিদ্যার্থী পড়াশুনা করে। আলোচ্য বর্ষে ৫২০ জন ছাত্রছাত্রী এই গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যবহার করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে যক্ষ্মা-ক্লিনিকে (আর্যসমাজ রোড, ক্যারলবাগে অবস্থিত) বহির্বিভাগে মোট ২,৬৫১ (১,১৪,১৫৩ পুনরাবৃত্ত) জন রোগী চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ১,৫৪৫। অন্তর্বিভাগের পর্যবেক্ষণ ওয়ার্ডে ২২৪ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

আউটডোর হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীতে আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৫৬,৮৮৫, তন্মধ্যে নূতন রোগী ৬,৩১১।

সারদা মহিলা-সমিতির উদ্যোগে প্রতি রবিবার সারদা মন্দিরে ৬ হইতে ১৪ বৎসরের বালকবালিকাদের ভজন, সঙ্গীত, প্রার্থনাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাদের নৈতিক ও শারীরিক উন্নতিসাধনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। আলোচ্য বর্ষে এই ক্লাসে গড়ে ৪০টি বালকবালিকা যোগদান করিয়াছিল। সারদা মহিলা-সমিতির সেবা- ও কৃষ্টিমূলক কার্যাদিও সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব, গুরু নানক, তুলসীদাস, আচার্য রামানুজ ও আচার্য শঙ্করের জন্মদিন সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর ১০৮তম জন্মোৎসব উপলক্ষে আবৃত্তি-ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় ১,৮৭৭ জন অংশ গ্রহণ করিয়াছিল; উহাদের মধ্যে কৃতকার্য প্রতিযোগীদিগকে ৮৬৯'৫০ টাকা মূল্যের ১৭৬টি পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৩৫তম শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষে নারায়ণসেবা-দিবসে খাইবার পাস মার্কেটের নিকটস্থ শিশুভবনের ২০০টি শিশুকে এবং অন্ধ-বিদ্যালয়ের ১০০টি বিদ্যার্থীকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করানো হইয়াছিল।

উৎসব-সংবাদ

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ভক্তগণের উদ্যোগে গত ৭ই নভেম্বর শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী-পূজা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উপস্থিত সর্বশ্রেণীর নরনারীর মধ্যে পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ধর্মালোচনার পর সন্ধ্যায় 'চণ্ডীচিন্তা' গ্রন্থ অবলম্বনে স্থানীয় শিল্পিগণ একটি গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। সভান্তে আশ্রমের সভাপতি বীর বাহাদুর বিনোদলাল ভদ্র সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিবিধ সংবাদ

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে (১৫১ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা) এ বছর দুটি আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটিতে (২৫ ও ২৬ ভাদ্র) আলোচ্য বিষয় ছিল 'ধর্ম ও সমাজবাদ' এবং দ্বিতীয়টিতে (২৭শে অগ্রহায়ণ) 'স্বামী বিবেকানন্দের সমাজবাদী কার্যসূচী'। সভায় পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে ডঃ নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার, ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ, শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শক্তি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আলোচনায় অংশ-গ্রহণ করেন।

উৎসব-সংবাদ

কিষনগঞ্জ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রমে গত ২০শে ডিসেম্বর জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদা-দেবীর শুভ জন্মতিথি উৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, হোম, অগণিত ভক্তকে খিচুড়িপ্রসাদ-বিতরণ, এবং সন্ধ্যায় মাতৃনামকীর্তন প্রভৃতি নিষ্ঠা এবং আনন্দের সহিত সুসম্পন্ন করা হয়।

দোমড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২০শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের ১১৮তম জন্মোৎসব প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, নারায়ণসেবা প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হইয়াছে। প্রায় এক হাজার ব্যক্তি দুপুরে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর শ্যামাসঙ্গীত ও 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'পাঠ হয়।

পরলোকে দয়াময়ী দেবী

পাটনা কদমকুঁয়া 'মুখার্জী' পরিবারের শ্রীকালীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পত্নী দয়াময়ী দেবী গত ২রা ডিসেম্বর, ১৯৭০ রাত্রি ১০-৪৫ মিনিটে ইষ্টনাম করিতে করিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। তাঁহার এই ভবনে স্বামী শিবানন্দ মহারাজ ১৩ই ফেব্রুআরি, ১৯২৮ শুভাগমন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা ও পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্য করিয়াছিলেন।

আমরা তাঁহার আত্মার পরম শান্তি কামনা করি।

পরলোকে রমেন্দ্রনাথ বসু

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সহকারী সেক্রেটারী এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব (শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত)'-গ্রন্থ-প্রণেতা ৺ডাঃ শশিভূষণ ঘোষ মহাশয়ের দৌহিত্র রমেন্দ্রনাথ বসু (মচু-বাবু) ৬৩ বৎসর বয়সে গত ৮ই অক্টোবর, ১৯৭০ সকাল ৬ ঘটিকার সময় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের শেষ পঞ্চবৎসরাধিক কাল তিনি জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরে স্থায়িভাবে বসবাস করিয়া আশ্রমের দায়িত্বপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং অকৃতদার ছিলেন। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

দাঙ্গা "বন্ধ" অভিযানে নামুন

দিব্য বাণী

মনসো বিষয়ো দেব রূপং তে নির্গুণং পরম্।
কথং দৃশ্যং ভবেদ্দেব দৃশ্যাভাবে ভজেৎ কথম্।
অতস্ত্ববাবতারেষু রূপাণি নিপুণা ভুবি।
ভজন্তি বুদ্ধিসম্পন্নাস্তরন্ত্যেব ভবার্ণবম্॥

-লঘুভাগবতামৃত

পরম নির্গুণ স্বরূপ তব প্রভু,
মনে কি ধরা যায়? তাহা কি দেখা যায়?
অদেখা যাহা তার ভজনা হয় কভু?
হইয়া অবতার ধরাতে আসো তাই।
সে-রূপরাশি'পরে সঁপিয়া সারা মন
ভজনা করি যত মুক্তিকামী জন
এ ভব-অর্ণব হাসিয়া তরি যায়।

"যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্য চৌদ্দপোয়া হয়ে লীলা করতে আসেন। তাঁকে নররূপে পেলে তবে ত ভক্তেরা ভাই-ভগ্নী, বাপ-মা, সন্তানের মত স্নেহ করতে পারবে!"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

"নরদেব দেব জয় জয় নরদেব
শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং
দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গং
সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং
যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥১

অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং
প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তং
কর্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং
যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যং
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব ॥২"
—স্বামী বিবেকানন্দ

"নরদেব! প্রভু, তোমারি হউক জয়!
শক্তিসাগর-সম্ভূত তুমি ঊর্মি
প্রেম-হিল্লোলে প্রেমময়, লীলাময়!
সংশয়রাক্ষস-নাশে তুমি উদ্যত মহা-অস্ত্র!
ভবরোগহারি! শরণ লইনু
শ্রীগুরু, তোমারি পায়!
নরদেব! প্রভু তোমারি হউক জয়!১

সমাহিত তব চিত্ত হে দেব, অদ্বয়-মহাতত্ত্বে
আবৃত সদা ভকতিবসনে, প্রোজ্জ্বল, মধুময়!
লোককল্যাণ-নিরত সদাই
অদ্ভুত তব কর্ম।
ভবরোগহারি! শরণ লইনু
শ্রীগুরু, তোমারি পায়!
নরদেব! প্রভু, তোমারি হউক জয়!"

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ

ভগবানলাভ বা জ্ঞানলাভ যে জাগতিক কোন কিছু লাভ করিবার মতো বাহিরের কিছু পাওয়া নয়, যাহা আমাদের আছে সেই সম্বন্ধেই সজাগ হওয়া, তাহাই প্রত্যক্ষ করা মাত্র, একথা অতি সহজ ভাষায় উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ: লণ্ঠনের শিখাটি সব সময় উজ্জ্বল রহিয়াছে, কিন্তু চিমনিতে কালি পড়িবার জন্য উহা দেখা যাইতেছে না। চিমনিতে কালি যত জমিতে থাকে শিখার আলোক তত নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হইতে থাকে; কালি খুব বেশী জমিলে শিখাটিকে দেখাই যায় না। অথচ শিখাটি সর্বদা সমভাবেই জ্বলিতেছে! ঐ শিখাটিই যেন ভগবান বা আমাদের স্বরূপ, উহার আলোক যেন শুদ্ধ চৈতন্য যাহা আমাদের চিত্তরূপ, মনবুদ্ধিরূপ চিমনির ভিতর দিয়া বাহির হইতেছে। চিত্ত মলিন রহিয়াছে, চিত্তের উপর মলিনতা জমিয়াছে বলিয়াই আমরা আমাদের সকলেরই অন্তরস্থ এই ভগবানকে, বা আমাদের নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। ভগবানলাভ বা জ্ঞানলাভের জন্য যাহা কিছু সাধনা, তাহার সব কিছুরই একমাত্র লক্ষ্য চিত্তের এই মালিন্যটুকু অপসারিত করা। তাহা হইলেই আমাদের অন্তরস্থ ভগবান প্রত্যক্ষ হইবেন, বা স্বরূপের উপলব্ধি হইবে।

চিত্তের এই মলিনতা দূর করিবার উপায় কি? একমাত্র উপায় ভগবচ্চিন্তায় বা নিজের স্বরূপচিন্তায় মনকে একাগ্র করা। আর সে পথের একমাত্র বাধা বিষয় (ইন্দ্রিয়ের বিষয়)। আমরা তো অনেকেই ভগবানলাভ করিতে

চাই, ভগবানের চিন্তায় মনকে স্থির করিবার চেষ্টাও করি, কিন্তু দেখা যায় উহাকে সেখানে বেশীক্ষণ স্থির রাখা যায় না, বারবার বিষয়-চিন্তা উহাকে ভগবৎ-পাদপদ্ম হইতে সরাইয়া লয়। ভগবচ্চিন্তাপ্রবাহে বাধাদানে বিষয়-চিন্তা যে কতখানি শক্তিশালী, রাণী রাসমণির মতো উচ্চ অধিকারীর জীবনের একটি ঘটনাই তাহা প্রমাণ করে। রাণী রাসমণিকে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব জগদম্বার অষ্ট সখীর একজন বলিয়াছেন। তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ভবতারিণীর মন্দিরে বসিয়া ইষ্টচিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছেন; তাঁহার ইচ্ছামত নিকটে বসিয়া যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের নামগান করিতেছেন। হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখিলেন রাণী রাসমণির মন ভগবচ্চিন্তা হইতে সরিয়া বিষয়ের কথা চিন্তা করিতেছে। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব মন দেখিতে পাইতেন, স্বমুখে বহুবার সেকথা বলিয়াছেন। তিনি অবশ্য তৎক্ষণাৎ রাসমণিকে সে বিষয়ে সজাগ করিয়া দিলেন। আমরা নিজেদের মন পর্যবেক্ষণ করিলেই মনের উপর বিষয়ের এই প্রভাব দেখিতে পাই, ইহার জন্য কোন দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই; ঘটনাটি উদ্ধৃত করা শুধু এই জন্য যে, এমন উচ্চ অধি-কারীর ক্ষেত্রেও, এমন পরিবেশে এমন লোকের সান্নিধ্যেও উহার প্রভাব ক্রিয়াশীল। এই ঘটনা হইতেই আমরা অনুমান করিতে পারি, মহীয়সী কুন্তীদেবী কেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ। রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গে-বৌঘমুদন্বতি" (ভাগবত, ১।৮।৪২)॥ গঙ্গা যেমন পথের সব বাধা ঠেলিয়া অবিরাম গতিতে সাগরের পানে প্রবাহিত হয়, আমার চিন্তার ধারাও যেন সেইরূপ বিষয়রূপ বাধায় রুদ্ধ না হইয়া তোমার প্রতি অবিরাম প্রবাহিত হইতে থাকে

বিষয়চিন্তাই ভগবচ্চিন্তার বাধা, কারণ বিষয় ছাড়া আনন্দ লাভ করা যায় ইহা আমাদের মন জানে না; আনন্দের সন্ধান ছাড়া সে থাকিতেও পারে না; আর সেজন্যই কোন বিষয়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন কিছু—তাহার প্রয়োজন হয়ই, সর্বদা বিষয়ের চিন্তাই সে করিতে চায়। এই চাওয়ার নামই বাসনা—আনন্দলাভের আশায় বিষয়-ভোগেচ্ছা। বাসনার জন্যই বিষয়চিন্তা, আবার বিষয়চিন্তা ও বিষয়ভোগ বাসনার কারণ। তাই এ দুটি মূলতঃ একই কথা। ভগবচ্চিন্তা হইতে বাসনাই যে মনকে বিষয়চিন্তায় টানিয়া আনে, সে বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি সুন্দর উপমা দিয়াছেন। কামারপুকুর অঞ্চলে অধিকাংশ ঘরই মাটির দেওয়াল দিয়া গড়া। এই দেওয়ালে মাঝে মাঝে কুলুঙ্গি রাখা হয়, গর্তও থাকে; সেখানে কখনো কখনো নেউল বাস করে। ছেলেরা কখনো কখনো নেউল ধরিয়া তাহার লেজে ঢিল বাঁধিয়া দেয়। ঐ অবস্থায় ঢিল লইয়াই নেউল নিজের গর্তে উঠিয়া যায়; কিন্তু বেশীক্ষণ সেখানে থাকিতে পারে না, ঢিলের ভারে নীচে নামিয়া আসে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, আমাদের বাসনাই যেন এই ঢিল; বাসনাসক্ত মন ভগবচ্চিন্তায় রত হইলেও বেশীক্ষণ সেখানে থাকিতে পারে না, বাসনা তাহাকে সেখান হইতে বিষয়-চিন্তায় নামাইয়া আনে।

এই বিষয়চিন্তা বা তাহার মূল বাসনাই আমাদের চিত্তরূপ চিমনিতে পড়া কালি, যাহা আমাদের অন্তরস্থ ভগবানকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অবিরাম ভগবচ্চিন্তার পথের এই বাধাটিকে দূর করিবার উপায় কি?

সব চেয়ে সহজ উপায় হইল তাঁহার নাম

করা, তাঁহার নাম জপ, নাম কীর্তন প্রভৃতি করা। তন্ত্র তাই নামজপের উপর খুব জোর দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন ভগবানের নামকীর্তনই চিত্তের মলিনতা মুছিয়া দেয়,—বিষয়-নিরপেক্ষ আনন্দের আস্বাদ দিয়া বিষয়চিন্তার, বাসনার বিলুপ্তি ঘটায়—ইহা 'চেতোদর্পণমার্জনং' 'আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্'। উচ্চাঙ্গের অসীম আনন্দের আস্বাদ পাইলে মনে নিম্নাঙ্গের স্বল্প আনন্দলাভের ইচ্ছা স্বতই লুপ্ত হইবে, তাহাকে কিছু বলিতে হইবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই নানাভাবে বারে বারে ভগবল্লাভেচ্ছুদের ভগবানের নাম করিবার কথা বলিতেছেন—'সকাল-সন্ধ্যায় সব কাজ ছেড়ে তাঁর নাম করবে।' বলিতেছেন, অন্যসময়ও সব কাজের মধ্যেই তাঁহার নামের ছাপ মনে ফেলিবে—তাঁহার কাজ করিতেছি, তাঁহারই সেবা করিতেছি, তিনি যেমন করাইতেছেন তেমনি করিতেছি ইত্যাদি যে কোন ভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিবে। গীতায় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কথাই বলিয়াছেন, 'মামনুস্মর যুধ্য চ।' ইতিবাচক পথে চল, তাঁহার নাম কর, তাঁহার চিন্তা কর, সব ঠিক হইয়া যাইবে। কি করিয়া মনের ময়লা কাটাইব, মনে কত ময়লা জমিয়াছে,—ইত্যাদি নেতিবাচক কোন চিন্তা করিয়া মনকে জর্জরিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই; স্বামীজীর ভাষায়, Forget your past bad deeds; forget your past good deeds; be Azad, be free. "আগে যা খারাপ কাজ করেছ, তার কথা ভুলে যাও, আগে ভাল কাজ যা করেছ তার কথাও ভুলে যাও—আজাদ হও, মুক্ত হও।" কতখানি ময়লাই বা মনে জমিয়াছে, কতদিন ধরিয়াই বা জমিতেছে? গীতায় শ্রীকৃষ্ণরূপে যিনি আমাদের পরম আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছিলেন, 'অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি'—'যদি তুমি সব পাপীর চেয়েও বেশী পাপিষ্ঠ হও, তথাপি এই স্বরূপজ্ঞানের নৌকায় চড়িয়া সে পাপসাগরের পারে যাইবে'—তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে এবারে আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন: আলো জ্বলিলে হাজার বছরের অন্ধকার ঘর তৎক্ষণাৎ আলোকিত হইয়া যায়—হাজার বছরের জমাট অন্ধকার এক নিমেষেই চলিয়া যায়, একটু একটু করিয়া যায় না। এ আলো জ্ঞানের, ভগবানলাভের। বলিয়াছেন, 'পূব দিকে এগিয়ে গেলে পশ্চিম আপনি পিছিয়ে পড়ে'—তাঁর নামের ছাপ মনে যত পড়ে, বিষয়চিন্তা, বাসনা আপনি তত কমিয়া আসে। কাম দূরীভূত হয় কিভাবে, স্বামী যোগানন্দের (তখন যোগীন্দ্রনাথ) এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'সকাল-সন্ধ্যায় হাততালি দিয়ে হরিনাম করবি।' যোগীন্দ্রনাথ সেদিন দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে একজন হঠযোগী সাধুর নানারূপ দৈহিক প্রক্রিয়া সদ্য দেখিয়া আসিয়াছেন; তিনি ভাবিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে হঠযোগের কোন প্রক্রিয়ার বা ঐ ধরনের কোন কথা, পশ্চিমকে দূরে সরাইবার কোন প্রচেষ্টার কথা বলিবেন—'একটা আসন টাসন বলিয়া দিবেন, বা হরীতকী বা অন্য কিছু খাইতে বলিবেন, বা প্রাণায়ামের কোন ক্রিয়া শিখাইয়া দিবেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু সেদিক দিয়াই যাইলেন না, পূব দিকে আগাইয়া যাইবার কথাই বলিলেন—'হরিনাম করবি'। যোগীন্দ্রনাথ সেদিন ভাবিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব হঠযোগীদের ঐসব প্রক্রিয়া কিছু

জানেন না বলিয়াই এরূপ বলিলেন। কথাটি মনঃপূত না হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন বলিয়াই কিছুদিন তাঁহার কথামত সকাল সন্ধ্যায় হাততালি দিয়া হরিনাম করিলেন। ফল পাইলেন কিন্তু আশাতিরিক্ত। মণিমোহন মল্লিক উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হইয়া পুত্রের দেহের সংকার করিবার পরই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ছুটিয়া আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মনের উপর হইতে এই সদ্য শোকের ঘন আবরণ সরাইবার জন্য মায়া, সংসারের অনিত্যতা, 'এ সংসারে কে কাহার' ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশদানের দিকে মোটেই যাইলেন না, উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাল ঠুকিয়া ভজন করিতে শুরু করিলেন—সরাসরি ভগবদ্ভাবের গভীর ছাপ ফেলিতে লাগিলেন তাঁহার চিত্তে। তাহাতেই কাজ হইল, শোকের তীব্রতা কমিয়া গেল। পরে অপার সহানুভূতি লইয়া তাঁহাকে নানাভাবে বলিলেন যে জীবনে এসব শোক-তাপ বিপুলভাবে মনকে আন্দোলিত করে, কিন্তু তাহার প্রভাব কমাইবার একমাত্র পথ—ইতিবাচক পথ—ভগবচ্চিন্তা। মণিমোহন শেষে বলিলেন, 'এই জন্যই তো আপনার কাছে ছুটে এলুম, বুঝলুম এ জ্বালা আর কেউ শান্ত করতে পারবে না।'

সুখের সময়, দুঃখের সময়, সব সময়েই মনকে এসবের কারণ যে 'বিষয়' তাহা হইতে সরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায় ভগবচ্চিন্তা।

এই ভগবচ্চিন্তার নিয়মিত অভ্যাসের ফলে মন বিষয়নিরপেক্ষ আনন্দে নিষিক্ত হইয়া বিষয়রূপ বাধাকে অগ্রাহ্য করিয়া সর্বক্ষণ ভগবানের দিকে চিন্তার ধারা প্রবাহিত করিবার শক্তি ক্রমশঃ অর্জন করে, পরিশেষে সব বাধা ঠেলিয়া অবিরাম অখণ্ড ধারায় তাঁহারই দিকে ধাবিত হইয়া ভগবানলাভ বা স্বরূপ-উপলব্ধি করিয়া ধন্য হয়। এই প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হয় শ্রীভগবানের কাছে ইহার জন্য প্রার্থনা করিলে। এই প্রার্থনা আমাদের ঈশ্বরের শুধু সাকার রূপ দর্শনে নয়, নির্গুণ ব্রহ্মোপলব্ধিতে, স্বরূপ-উপলব্ধিতেও সহায়ক হইবে। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা, 'যাঁর নিত্য, তাঁরই লীলা' 'যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী'—সগুণ ব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্ম পৃথক সত্তা নন।

যিনি মনবুদ্ধির অগোচর, অরূপ, নির্গুণ সত্তা, তিনিই আমাদের মনবুদ্ধির গোচর হইয়া নররূপ ধরিয়া নামরূপের রাজ্যে রামকৃষ্ণরূপে আসিয়াছিলেন যাহাতে মন অবিরাম তাঁহার কথা চিন্তা করিয়া, তাঁহার রূপের ধ্যান করিয়া সর্ববিধ কালিমামুক্ত হইয়া তাঁহাকে শুদ্ধ হৃদয়-মধ্যে দর্শন করিয়া বা তাঁহাকেই নিজ স্বরূপরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হয়। আজ ফাল্গুনের পুণ্য প্রভাতে তাঁহার নিকট কুন্তীদেবীর ভাষাতেই প্রার্থনা করি :

'ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি॥'

—'বাধায় না রুদ্ধ হয়ে গঙ্গা যথা বহি চলে
অন্তহীন সাগরের পানে
অবিরাম অখণ্ড ধারায়,
আমার চিন্তার ধারা সেইমতো যেন,
বিষয়ে না রুদ্ধ হয়ে
তোমার চরণ পানে অবিরাম ধায়।'

শ্রীরামকৃষ্ণস্মরণম্

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ*

নমঃ শ্রীরামকৃষ্ণায় সর্বমঙ্গলহেতবে। সর্বসিদ্ধিপ্রদাত্রে চ মূর্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১

লীলাবতারঃ শ্রীরামকৃষ্ণঃ শেষযুগে হরিঃ। কলেজ্জীবান্ সমুদ্ধর্তুং বৈকুণ্ঠাদ্বসুধাতলে ॥ ২

এষ মাতরি চন্দ্রায়াং ব্রাহ্মণ্যাং ভগবান্ স্বয়ং। ব্রহ্মজ্ঞস্য ব্রাহ্মণস্য পিতুঃ শ্রীক্ষুদি-রামতঃ ॥ ৩

প্রাদুর্ভূতঃ কর্মকারপুষ্করিণ্যাং সনাতনঃ। স্বর্ণগৌরঃ শুভ্রবস্ত্রো ভূষাণাদিবিবর্জিতঃ ॥ ৪

কামিনীকাঞ্চনত্যাগী কালিকাসাধনে রতঃ। পৃথিব্যাং সন্তি যে ধর্মাস্তেষাং যে ধর্ম-যাজকাঃ ॥ ৫

তৎসর্বমতমাশ্রিত্য তত্তৎসিদ্ধিমবাপ্তবান্। কালিকাপুত্ররূপোঽসৌ নির্বিকল্পসমাধি-মান্ ॥ ৬

জগদম্বাস্তন্যপায়ী স্বসুতং জননী যথা। কৃপয়া কালিকাদেব্যাঃ স্বস্য সাধনশক্তিতঃ ॥ ৭

সাধারণকন্যকেব কালীপ্রত্যক্ষতাং গতা। প্রায়েণৈবং সাধনায়াং গতা দ্বাদশবৎসরাঃ ॥ ৮

ততঃ সিদ্ধস্বরূপেণ স্বধাম্নি দক্ষিণেশ্বরে। বিরাজিতঃ স্বীয়াং লীলাং পার্ষদানা-মদর্শয়ৎ ॥ ৯

উক্তং শ্রীরামকৃষ্ণেণ যৎ কথামৃতমুত্তমং। ভূর্লোকস্থা জনাস্তেন জানন্তি মধুসূদনম্ ॥ ১০

ঈদৃগ্ যুগাবতারেষু নৈকস্মিন্নপি দৃশ্যতে। কেবলং শ্রীরামকৃষ্ণে সর্বকারণকারণে ॥ ১১

দৃশ্যতে শ্রীরাসমণ্যা মন্দিরাভ্যন্তরে তদা। স্ত্রীবালবালিশানাঞ্চ যদ্বাক্যমমৃতায়তে ॥ ১২

অত্যন্তাসজ্জনেভ্যোঽপি যদ্দত্তং ঠাকুরেণ হি। তেনানুভূতং তৈঃ সর্বৈস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ১৩

সর্বত্র সর্বভাবেন সর্বজাতিষু সর্বদা ॥
সাধুসজ্জনসন্ন্যাসিসংসারিব্রহ্মচারিভিঃ ॥ ১৪
সুপূজিতো রামকৃষ্ণঃ পৃথিব্যাং সর্বমানবৈঃ।
তেন সর্বযুগশ্রেষ্ঠোঽবতারোঽয়ং ভবেৎ ধ্রুবম্ ॥ ১৫
দন্তে বিধৃত্য তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বোত্তমাঙ্গনতমেতদহং ব্রবীমি।
ভো ভ্রাতরঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
শ্রীরামকৃষ্ণচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥ ১৬
শ্রীরামকৃষ্ণচরণানুরাগাৎ প্রাপ্নুবন্তি যৎ।
সর্বে ভবন্তঃ শৃণ্বন্তু সাবধানমিদং বচঃ ॥ ১৭

---

*'শ্রীরামকৃষ্ণভাগবতম্'—গ্রন্থ-প্রণেতা। ইনি বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়াছেন।

মুক্তির্নাপি সুখায়তে বিবুধপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালকুণ্ডলীচয়ঃ প্রোৎখাতদন্তায়তে।
পৃথ্বী পূর্ণসুখায়তে বিধিসুরেশাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতস্তং রামকৃষ্ণং ভজ ॥ ১৮
সম্পূজ্য তদ্ভক্তবর্গান্ পৃথিব্যাং সর্বসজ্জনাঃ
ভজন্তু ভক্তিভাবেন রামকৃষ্ণপদাম্বুজম্ ॥ ১৯
নরনারীসমীপে মে গলবস্ত্রকৃতাঞ্জলেঃ।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দরস্য দ্বিজস্যেদং নিবেদনম্ ॥ ২০

সর্বমঙ্গলহেতু সর্বসিদ্ধিপ্রদাতা সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি। ১

কলিযুগের জীবগণকে (ভগবদ্‌ভক্তি দান করিয়া) উদ্ধার করিবার জন্য লীলাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিজধাম বৈকুণ্ঠ হইতে এই ধরণীতে কামারপুকুর গ্রামে আবির্ভূত হইয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম তাঁহার পিতা, চন্দ্রামণি মাতা। তাঁহার দেহ গৌরবর্ণ, শুভ্রবাসভূষিত, অলঙ্কারাদিবর্জিত। ২, ৩, ৪

তিনি কামকাঞ্চনত্যাগী, কালিকামাতার সাধনায় রত। পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম ও যে সব ধর্মযাজক আছেন, সেইসব ধর্মমত গ্রহণ করিয়া, সেই সব ধর্মাচার্যগণকর্তৃক প্রদর্শিত বিভিন্ন পথে সাধন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মে যে যে ভাবে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় বলিয়া উদ্দিষ্ট আছে সেই সেই ভাবেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি নিজেকে কালিকার পুত্র বলিয়া জানিতেন, আবার নির্বিকল্প সমাধিমান্‌ও ছিলেন। ৫, ৬

গর্ভধারিণী জননী নিজ সন্তানকে স্তন্যপান করান ; শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট কালিকামাতা ঠিক সেইরূপই ছিলেন , সাধারণ স্ত্রীলোককে যেভাবে দেখা যায়, কালিকামাতাকে শ্রীরামকৃষ্ণ সেরূপ স্পষ্টভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজ সাধনার শক্তিতে এবং কালিকার কৃপায় ইহা সম্ভব হইয়াছিল। প্রায় দ্বাদশবর্ষের উধ্বর্কাল তিনি সাধন করিয়াছিলেন। ৭, ৮

সাধনায় সিদ্ধ হইয়া নিজধাম দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানপূর্বক পারিষদবর্গকে তিনি নিজলীলা প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। ৯

এবং সেই সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যে সকল উত্তম কথামৃত বলিয়াছিলেন আজ পর্যন্ত সেই সকল কথামৃতের অনুশীলন করিয়া ভক্তবর্গ ভগবানের যথার্থ তত্ত্ব বা স্বরূপ অবগত হইতেছেন। ১০

যুগাবতারগণের মধ্যে অন্য অবতারে এরূপ সহজ সুলভ ধর্মপথ পরিদৃষ্ট হয় না, কেবলমাত্র সর্বকারণের কারণস্বরূপ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেই দেখা যায়। ১১

ঠাকুরের সেই সকল কথা স্ত্রীলোক বালক বা মূর্খের নিকটেও অমৃতের মতো আস্বাদিত হইয়া থাকে। এবং সেই সময় সেই সকল কথা রাণী রাসমণির কালীবাড়াতেই হইয়াছিল। ১২

এবং অত্যন্ত অসদাচারীকেও লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের শুদ্ধি ও ভগবৎকৃপালাভের জন্য যে সব উপদেশ দিতেন, সেই সকল কথার অনুশীলন করিয়া সেই সকল মহাপাপীও বিষ্ণুর পদ প্রত্যক্ষ করিতেন। ১৩

এজন্যই পৃথিবীতে সর্বত্র সাধু সজ্জন সন্ন্যাসী সংসারী ব্রহ্মচারী সকল লোক সর্বসময়ে সর্বভাবে ভগবান রামকৃষ্ণদেবের পূজা করেন। অতএব ভগবান রামকৃষ্ণদেবই যে সর্বযুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবতার, এবিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ১৪, ১৫

আমি দাঁতে কুটা লইয়া মস্তক নত করিয়া তোমাদের পদধারণ পূর্বক বলিতেছি যে, হে ভাইসকল, তোমরা সর্বপ্রকার জাগতিক ভোগ বিসর্জন দিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে ভক্তি কর। যদি বল এরূপ ভক্তির ফল কি?—তবে অবহিত চিত্তে শোন—১৬, ১৭

যাঁহারা ঠাকুরের কিঞ্চিৎ করুণাকটাক্ষ পাইয়াছেন তাঁহাদের নিকটে মুক্তিও সুখের জন্য হয় নাই; স্বর্গ একটি আকাশকুসুমের মত অলীক পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, অত্যন্ত দুঃখদ ইন্দ্রিয়রূপ কালসর্পসকলের বিষদন্ত ভগ্ন হয়, ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বহুযুগযুগান্ত জীবিত থাকিলেও উঁহাদিগকে ক্ষণজীবী বলিয়া বোধ হয়; ইহলোকে বা পরলোকে যেখানেই থাক না কেন সেই স্থানেই সর্বদা পূর্ণভাবে পূর্ণানন্দ অনুভব করে—অর্থাৎ মৃত্যুর পরও আনন্দময় দেহে ঠাকুরের কৃপালাভে সমর্থ হয়। অতএব পৃথিবীর সব সজ্জন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দকে, দানমানাদি দ্বারা পূজা করিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই ভজন বা উপাসনা করিবে—দ্বিজ রামেন্দ্রসুন্দর গলবস্ত্র হইয়া করজোড়ে ইহাই নিবেদন করিতেছেন। ১৮, ১৯, ২০

"দুখ মে বাজ পড়ু"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সুখে আমার বজ্র হানো,
দুঃখে রাখো মগ্ন!
বাঁশরি নয়, এবার আনো
খড়্গ তোমার নগ্ন!
আর পারিনে, ক্লান্ত পাখা!
কোথায় বনস্পতির শাখা?
অহঙ্কারের রথের চাকা
ধূলায় আজি ভগ্ন!

ভেঙেছে মোর সাধের বাসা!
সামনে আঁধার রাত্রি!
তুষার-ঝড়ে সর্বনাশা
চল্‌ছি একা যাত্রী!
এসো মা সারদামণি
পূর্ণব্রহ্মসনাতনী!
কমল-পায়ে দিনরজনী
চিত্ত রাখো লগ্ন।

স্বামী শিবানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণভরসা

Chilkapeta House,
Almora P. O , Kumaon,
U. P.
17.9'.13

প্রিয় অ—

অনেক দিন তোমার সংবাদ পাই নাই। কেমন আছ? দামোদরের বন্যায় তোমাদের গ্রামের বোধ হয় যথেষ্ট হানি হইয়াছে। দেশের সমস্ত খবর লিখিবে। এবার জগদম্বা কি ভীষণ মূর্তি বঙ্গদেশে দেখাইতেছেন; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে অভয়া মূর্তিও দেখাইতেছেন। গভর্ণমেণ্ট খুব দয়া দেখাইতেছেন! দেশের বহু সহৃদয় লোক যুবা বৃদ্ধ অনেকেই বন্যাপীড়িতদের সেবার জন্য তৎপর হইয়াছেন, ইহা দেশের খুব শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। মিশন হইতেও কিছু কিছু চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু অর্থের বিস্তর প্রয়োজন; মা দয়াময়ীরূপে দয়াও করিতেছেন।

আমি গত জুন মাসের ১৬ই হইতে এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের এক ভক্ত, কথামৃতে যাঁর নাম পল্টু বলিয়া উল্লিখিত আছে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র—বয়স ১৯ বৎসর—অত্যন্ত কঠিন রোগাক্রান্ত হওয়ায় পরিবর্তনের জন্য গত এপ্রিল মাস হইতে আছেন; একাকী এই দূর দেশে পীড়িত ছেলে লইয়া দিনরাত্রি কেবল ঐ চিন্তায় থাকিয়া তাঁর মন অত্যন্ত খারাপ হয়; সেইজন্য কনখল হইতে আমায় ডাকিয়া আনিয়াছেন। এখানে প্রত্যহ দুই বেলাই প্রভুর বিষয় কথাবার্তা, পাঠ, ভাগবত-গীতাদি পাঠ, স্তোত্রপাঠ, ভজন ইত্যাদি করা হয়; এ সকলেতে তাঁদের মন অনেকটা শান্তিতে আছে। ছেলেটিও বড় ভক্ত, সে ঐ সকল বড়ই ভালবাসে এবং উহাতে তার মন বড় আনন্দে থাকে। ছেলেটি পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল আছে। মহিমবাবু এখন কোথায় ও কেমন আছেন জানি না, কনখলে জুন মাসে দেখা হইয়াছিল, কয়েকজন ৺পুরীনিবাসী বাঙ্গালী ভক্তদের সঙ্গে ৺বদরিকাশ্রম দর্শনে যান, পরে সকলেই পেটের অসুখ লইয়া আসেন এবং ৺কাশী যান—এই পর্যন্ত সংবাদ জানি, পরে আর অধিক বলিতে পারি না। তুমি কিছু সংবাদ পেয়েছ কি?

তোমার নিজের এবং দেশের সমস্ত সংবাদ সহ পত্র শীঘ্র লিখিও। তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও প্রীতি জানিবে। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

প্রথম স্বর ঃ প্রথম সাড়া

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি বালকের জীবনে ব্যাপারটি ঘটেছিল। ব্যাপারটিই উল্লেখ্য, বালকটি নয়। এরকম ঘটনা সকলের জীবনেই ঘটতে পারে। ঘটছেও অহরহ। এর মধ্যে কোন রহস্য বা বৈশিষ্ট্য নেই। সেদিনের সেই বালক আজ যৌবনপ্রান্তে উপনীত। তার ভালো লাগে স্মৃতির চলচ্চিত্রে সেই ছবিটি মাঝে মাঝে দেখতে।

তার বাবা কাজ করতেন রেলে। তখন থাকতেন পশ্চিমবাংলার পশ্চিম প্রান্তের একটি ছোট শহরের শেষ সীমায়। তাদের বাংলোর পরেই ছিল কয়েকটি বড় বড় গাছ। তারপর ধু-ধু মাঠ। তারপর দামোদরের চড়া।

তাদের বাড়িতে লোক ছিল না বেশি। বাবা বেরিয়ে যেতেন কাজে। দুপুরবেলা তার ছোট বোনকে নিয়ে তার মা বিশ্রাম করতেন। গরমের জন্য সারা বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ থাকত। চারদিক নীরব। বিজলী পাখা চলার শব্দ আর দামোদরের চড়ায় বাতাসের হাহাকার, দুই মিলিয়ে কেমন যেন একটা মন-উদাস-করে-দেওয়া পরিবেশ।

একটি নির্জন ঘরে ছেলেটি একটি বইয়ের আলমারি খুলে বসত। কেউ তাকে বারণ করত না। সে একটি একটি করে বই নিয়ে দেখত, নাড়ত চাড়ত, ছবি দেখত, কখনও বা পড়ত দু-একটি পংক্তি, আবার রেখে দিত। এই ছিল তার সারা দুপুরের খেলা। বইগুলির মধ্যে কিছু ছিল তার বাবার ইনজিনিয়ারিং-এর বই। কিছু ছিল তার মায়ের গানের বই। আর কিছু ছিল নানা ধরনের বই।

একদিন সে একপাশে যত্ন করে রাখা চারখানি বইয়ের একটি তুলে নিল। তার বাবা তাকে বলেছেলেন যে বইগুলি তাঁর বাবা, অর্থাৎ ছেলেটির ঠাকুরদা কিনেছিলেন। (সে বড় হয়ে বুঝেছিল যে, আসলে সেটি একটি বইয়ের চারটি খণ্ড। পঞ্চম খণ্ডটি তার ঠাকুরদার জীবনকালে প্রকাশিত হয়নি। সে নিজেই সেটি সংগ্রহ করে 'সেট'-টি সম্পূর্ণ করে)। ঝকঝকে গাঢ় সবুজ সিলকের কাপড়ে বাঁধাই। সোনার জলে নাম লেখা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'।

মলাট ওলটাতেই তার চোখে পড়ল একজনের একটি ছবি। ছবিটি তার চেনা। এঁরই একটি ছবি সে দেখেছে তার মায়ের একটি তাকে। সেই তাকটিতে থাকে—একটি শাঁখ, গঙ্গাজলের একটি কমণ্ডলু, একটি স্তবের বই, একটি গণেশমূর্তি, কয়েকটি দেবদেবীর পট আর এই ছবিটি। কার ছবি সে জানে না। মাকেও জিজ্ঞাসা করেনি কোনদিন। কেন জিজ্ঞাসা করেনি সে কারণটি বড় মজার। ছবি কার, নাম না জানলেও তার কেমন যেন মনে হ'ত যাঁর ছবি তিনি তার খুব আপনজন। মা-বাবার মতোই, কিংবা তার থেকেই বেশি আপন। আপনজনের পরিচয় আপনা থেকেই জানা যায়। কেউ জানিয়ে দেয় না। তাকে কেউ কি কোনদিন বলে দিয়েছে, 'এই তোমার মা'। তেমন ইনিও। চেনা ঠিকই, নামটি জানা নেই। তার মায়েরও যে একটা নাম আছে সে কিছুদিন আগেও জানত না। তার বোনটা তো এখনও জানে না। তাতে কি

এসে যায়?

ধীরে ধীরে সে বইটির পাতা উলটিয়ে যায়। …শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীপাদপদ্মভরসা।… শ্রীশ্রীমার পত্র…ঠাকুর ও বিবিধ তত্ত্ব (এ সবের মানে সে বোঝে না কিছুই)।…দুটি ছবি—কাশীপুর বাগান আর বলরামবাটী…দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ি। (ছবিগুলো কিন্তু ভালো।)…প্রথম ভাগ উপক্রমণিকা…কালীবাড়ি ও উদ্যান… তাড়াতাড়ি পাতা উলটে চলে। আবার কয়েকটি ছবি—চার জনের। সে চিনতে পারে শুধু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। এঁর বর্ণ-পরিচয় সে পড়েছে। তারপর 'অনেকগুলি ভক্তদের চেহারা'। আবার পাতা ওলটায়।… প্রথম দর্শন…।…পাতা ওলটায়। দ্বিতীয় দর্শন …তৃতীয় দর্শন…চতুর্থ দর্শন…বালক পাতা ওলটায়। নিতান্তই ছেলেখেলা তার।

সে কিন্তু ইতিমধ্যে দুটো কথা আন্দাজে ধরে ফেলেছে। একটি হ'ল যাঁর ছবি দেখে তার আপনজন বলে মনে হয়, তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। আর তাঁকেই বলা হচ্ছে ঠাকুর। ঠাকুর তাঁকে ডাকবার নাম। যেমন মাকে 'মা' বলে সে ডাকে। আর মায়ের যেমন একটা ভালো নাম আছে তেমনই তাঁর ভালো নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। এটা আবিষ্কার করে তার খুব আনন্দ হয়।

বইটা সে নাড়ছে-চাড়ছে। বুঝছে না তবু ভালো লাগছে। হঠাৎ কী হয় একটা জায়গা সে বানান করে করে পড়তে শুরু করে। এলোপাথাড়ি ভাবে। মধ্যে মাঝে লাইন বাদ দিয়ে। কী যেন একটা তাকে টানে।

> "মাস্টার ঠাকুরের গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছেন। যেন মন্ত্রমুগ্ধ সর্প। এক্ষণে সঙ্কুচিতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আর কি গান হবে?" ঠাকুর চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না, আজ আর গান হবে না।" এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল, তখনই বলিলেন, "তবে তুমি এক কর্ম কোরো। আমি বলরামের বাড়ি কলকাতায় যাব, তুমি যেও. সেখানে গান হবে।"
>
> মাষ্টার। যে আজ্ঞা।……
>
> "এইরূপ কথাবার্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সদর ফটক পর্যন্ত আসিয়া আবার কি মনে পড়িল, তখনই ফিরিলেন। আবার নাটমন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া উপস্থিত।…
>
> "শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)। আবার যে ফিরে এলে? মাষ্টার। আজ্ঞা, বোধহয় বড় মানুষের বাড়ি—যেতে দিবে কিনা; তাই যাব না ভাবছি। এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।
>
> "শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো, তা কেন? তুমি আমার নাম করবে। বলবে তাঁর কাছে যাব, তাহলেই—কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে।…
>
> মাষ্টার 'যে আজ্ঞা' বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।"

বালকটির স্মৃতি থেকে আর সব ঝরে গেল। ভ্রমরগুঞ্জনের মতো মনে অনুরণিত হতে লাগল—"তুমি আমার নাম করবে। বলবে তাঁর কাছে যাব, তাহলেই কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে।…তুমি আমার নাম করবে। বলবে তাঁর কাছে যাব,…তুমি আমার নাম করবে…তুমি আমার নাম করবে।" নির্জন দুপুর। দামোদরের চড়ায় বাতাসের হাহাকার! বালক-মনের নানা

বিমূর্ত ভাবনার মাঝে মাঝে বেজে চলল সেই স্বর : 'তুমি আমার নাম করবে।'

জীবনের বাঁকে বাঁকে, স্মৃতি-বিস্মৃতির আলো-আঁধারে, ভালোয়-মন্দে মেশানো পথ চলার মাঝে ধ্রুবপদের মতো থেকে থেকে জানান দিয়ে গিয়েছে সেই স্বর : 'তুমি আমার নাম করবে।'

তারপর অনেক পথচলা। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতায় সঞ্চরণ। মিলেছে এই প্রত্যয় যে, তাঁর নাম করলে, তাঁর কাছে যাব বললে, মেলেই মেলে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার লোক। কাছে যাওয়া হয়ত অন্তবিহীন পথ কিন্তু তার সূচনার নামই তো দীক্ষা। কিন্তু এসব পরের কথা। সে-দিনের সেই বালক উত্তর-জীবনে বুঝেছে, নিতান্তই ঠাকুরের কৃপায় এক পরম ক্ষণে তার প্রাণে পৌঁছেছিল ঠাকুরের প্রথম স্বর। তার বালকহৃদয় যে অভিভূত হয়েছিল সেটাই সেই স্বরে তার প্রথম সাড়া। আজও ঠাকুরের কাছে তার প্রার্থনা—ঠাকুর, তোমার 'কথামৃত'র কতটুকুই বা বুঝি, কীই বা বুঝি। তুমি শুধু কৃপা করে আমার জীবনে-মরণে, স্মৃতিতে-সংস্কারে অক্ষয় রেখো তোমার একটি কথা, "তুমি আমার নাম করবে।"

নির্বাসনা

(গান)

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

নিজের পূজাই করি আমি, মা তোমার প্রতিমা গড়ে।
তাই কি তুমি দাও না দেখা, খুঁজে মরি অন্ধকারে॥
বিষয়-লালসে গো মা
কাঁদি আমি বলে মা, মা ;
ভক্তি কি তাই দিলে না মা ?
জীবনটা যায় হাহাকারে॥

তোমা ছাড়া যা কিছু চাই
পেলেও সে-সবই হারাই,
শূন্য হাতে ফিরি মা তাই
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে।
মাগো, তুমি মুখ তুলে চাও
বিষয়-বাসনা ঘুচাও
দেখা দিয়ে জীবন জুড়াও,
থাকো আমার পরাণ ভরে॥

ডাক্তারের চিকিৎসা

শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু

ডাক্তার রোজ আসেন রোগী দেখতে। ঔষধ দেওয়া পথ্যাপথ্যের বিধান দেওয়া এবং আনুষঙ্গিক বিধি-ব্যবস্থাদি যা করণীয় সবই করা হয়ে যায় তবুও রোগীর শয্যাপার্শ্ব থেকে ডাক্তারের উঠবার নাম নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শেষ হয়ে যায়। পাশে যাঁরা থাকেন তাঁরা বুঝতে পারেন ডাক্তারের রোগ দেখা শেষ হয়েছে কিন্তু রোগীকে দেখা তখনো শেষ হয়নি। একজন একদিন বলেই ফেললেন—

"আপনি এখানে তিন চার ঘণ্টা রয়েছেন ; কই, রোগীদের চিকিৎসা করতে যাবেন না ?"

ডাক্তার—আর ডাক্তারী আর রোগী! যে পরমহংস হয়েছে, আমার সব গেল !"[১]

ক্যান্সার রোগাক্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে চিকিৎসা করতে এসে যে ডাক্তার এমন সরল আনন্দের খেদোক্তি করেছিলেন তিনি কত বড় ডাক্তার, কতখানি তাঁর ব্যক্তিত্ব, কি তাঁর প্রখর মনীষা—তা এই প্রসঙ্গে একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

সুমেরুবৎ অটল গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। অবিন্যস্ত শুভ্র কেশ। শ্মশ্রুবিহীন কঠোর মুখের দুপাশ দিয়ে মোটা সাদা গোঁফজোড়া চোয়াল পর্যন্ত প্রসারিত। প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল দীর্ঘায়ত চোখ থেকে প্রতিভার দ্যুতি ঠিকরে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ডাক্তার সরকার ছিলেন ভারতবর্ষের এক দিক্‌পাল চিকিৎসক।

উদ্যত খড়্গের মত এমনি ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রবলতা যে চেনা অচেনা সকলেই এই মানুষটি থেকে একটু অলিখিত দূরত্ব সর্বদাই বজায় রেখে চলতেন—এমন কি তাঁর পুত্র পরিজন আত্মীয় স্বজন পর্যন্ত।[২] তাঁর স্পষ্ট কথায় অনেকে ভয় পেতেন। তাঁর সঙ্কল্পের কঠোরতাকে অনেকে একগুঁয়েমি বলে ভুল বুঝতেন। "সরল অন্তরাধারে দয়া বলবান [অথচ] রসনা কর্কশ বড়, বাক্য যেন বাণ।"[২ক] কৈশোরে ছাত্রাবস্থায় যখন তিনি বুঝলেন যে বিজ্ঞানের যুগ এগিয়ে আসছে, তখনই বিজ্ঞানশিক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি হিন্দু কলেজ ছেড়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। হিন্দু কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিঃ স্যাটক্লিফ্‌ ও অন্যান্য অধ্যাপকবর্গ চেয়েছিলেন যে সকলের স্নেহভাজন এই অসামান্য মেধাবী ছাত্রটি তাঁদের কলেজ থেকেই শিক্ষা সমাপ্ত করুক। কিন্তু বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ এবং তাঁর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা কোনো বাধা মানলো না। হিন্দু কলেজের অধ্যাপকবর্গের অনুরোধ উপেক্ষা করে, তাঁদের মনে অসন্তোষ ঘটিয়ে তিনি মেডিক্যাল কলেজে এসে ভর্তি হলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালীন ভারতবর্ষে একমাত্র মেডিক্যাল কলেজেই বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ ছিল।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তাঁর দক্ষতা ছাত্রাবস্থা থেকেই প্রমাণিত হয়। যখন তিনি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখনই পঞ্চমবার্ষিক শ্রেণীর উপযোগী দুরূহ প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়ে চক্ষুরোগের অধ্যাপক ডঃ আর্চারকে এমন মুগ্ধ করেন যে, ডঃ আর্চারের আগ্রহে প্রত্যহ এই

১ পৃষ্ঠা ২২১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ

২ পৃঃ ২৫৪, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ

ছাত্রটিকে তাঁর [ডঃ আর্চারের] ক্লিনিকে উপস্থিত থাকতে হত। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রী এম. ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর প্রতিভা এমনই স্বীকৃতি লাভ করে যে খাস ব্রিটিশ চিকিৎসকমণ্ডলীর জগৎবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান British Medical Association-এর যে শাখা তখন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় তিনিই তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিণ্ডিকেটের সদস্য এবং Calcutta Journal of Medicine-এর প্রতিষ্ঠাতা। কয়েক বৎসর এ্যালোপ্যাথিতে সুদক্ষ চিকিৎসক হিসাবে চিকিৎসা করার পর তাঁর জীবনে এক নূতন পথের সূচনা ঘটে। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন হোমিওপ্যাথিতে আকৃষ্ট হয়। এবার তিনি বন্ধুগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, ধিক্কৃত এবং চিকিৎসক সমাজ কর্তৃক অপাঙক্তেয় বলে গণ্য হলেন। গতানুগতিক জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের লোভ বা রক্ষণশীলতার ভ্রূকুটি—এর কোনোটিই তাঁর দুর্দমনীয় মনকে অবনত করতে পারেনি। তিনি নূতনের পরীক্ষায় মেতে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত এই দৃঢ়চেতা কঠোর সংগ্রামী মানুষটি হোমিওপ্যাথিতেও সুচিকিৎসক হিসাবে ভারতব্যাপী খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন।

আসলে কিন্তু ডঃ সরকার মনেপ্রাণে ছিলেন বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ পূজারী। বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসায় ভরপুর ছিল তাঁর মন। এই বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসা তাঁকে যৌবনে চিকিৎসা-জগতে টেনে নিয়ে এসেছিল আবার এই অনুসন্ধিৎসা-ই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-অনুশীলনের কাজে শ্রেষ্ঠ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে। দিক্পাল চিকিৎসক তিনি ছিলেন বটে কিন্তু সেই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়—তিনিই ছিলেন ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞান-অনুশীলনের পুরোধা এবং পথিকৃৎ। Indian Association for the Cultivation of Science, যেখানে আচার্য জগদীশ, স্যর নীলরতন, ডঃ গিরিশ বোস, ডঃ কে. এস. কৃষ্ণান, ডঃ মেঘনাদ সাহা প্রমুখ ভারতের প্রথিতযশা জ্ঞানতপস্বীরা বিজ্ঞানের দিগন্ত-উন্মোচনের সাধনায় সমবেত হয়েছিলেন এবং যেখানে গবেষণার সুযোগ পেয়ে স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, সেই সুবিখ্যাত বিজ্ঞানপীঠের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনিই ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ—এর অকুণ্ঠ সেবক। প্রবল বাধা বিঘ্ন প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তিনি আজীবন এর সেবা করেছেন পরমনিষ্ঠায় সযত্নে এবং বিনা বেতনে—সে এক চমকপ্রদ ইতিহাস! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার লিখেছেন—"বিজ্ঞতর বৈজ্ঞানিক মার্জিতাগ্রগণ্য।

ধনে গুণে যশে কাজে সাধারণে মান্য॥"[২ক]

এ হেন বিজ্ঞানপ্রেমিক একদা এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে চিকিৎসক হিসাবে যখন ঠাকুর দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধিতে আক্রান্ত। ইতিপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে কতই না বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম ঘটেছে। তার মধ্যে কেহ ছিলেন সংসার-সমস্যায় উৎপীড়িত জীবনপথের উদ্‌ভ্রান্ত পথিক, কেহ শান্তিলোভাতুর সাধারণ মানুষ, কেহ ইউনিভার্সিটির উচ্চডিগ্রীধারী প্রথিতনামা পণ্ডিত, কেহ আধ্যাত্মিক জগতের জিজ্ঞাসু সাধক, কেহ লব্ধপ্রতিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ দার্শনিক কেহ বা পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত,

---

২ক পৃঃ ৫৮৮, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, অ্যাডভোকেট। কিন্তু নরেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে ডঃ সরকারের আগমন সকলের থেকে পৃথক একটা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কেননা তৎকালীন ভারতবর্ষে ডঃ সরকার ছিলেন জাগ্রত বিজ্ঞানবুদ্ধির শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। ইতিহাস-বিধাতার অলক্ষ্য ইঙ্গিতেই কি আধুনিক বিজ্ঞানের এই প্রতিভূ প্রেরিত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে—একেবারে মুখোমুখি হয়ে যাচাই করে নিতে আর একজনকে যিনি ভারতবর্ষের পাঁচহাজার বছরের আধ্যাত্মিক সাধনার জীবন্ত বিগ্রহরূপে আবির্ভূত ?

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ডঃ সরকার শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে আগমন করেন। এরও কয়েক মাস পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহে রোগের সূত্রপাত। ডঃ সরকার যখন চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন তখন রোগের প্রাবল্য সাংঘাতিক। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী এবং শিষ্যবৃন্দ বিষণ্ণ এবং শঙ্কিত।

যে কুসুমকোমল পবিত্র দেহ তাঁদের একান্ত যত্নের ধন, যাকে আশ্রয় করে প্রকটিত হয়েছে কত-ই না অলৌকিক ভাগবত লীলা তাঁদেরই চক্ষের সম্মুখে, উত্থিত হয়েছে নানা ভাবতরঙ্গ—সেই দেবদেহ দারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত, বিষম যন্ত্রণায় জর্জরিত, এই দৃশ্য তাঁদের পক্ষে একান্ত মর্মান্তিক। নিরুপায় হতভাগ্য শিষ্যমণ্ডলী "একান্তে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে।"[৩] কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বিকার। লীলাপ্রসঙ্গে এই সময়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়ে স্বামী সারদানন্দজী লিখেছেন, "কি অদ্ভুত দেহবুদ্ধির অভাব! কি অপূর্ব অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান! তখন ছয় মাসকাল ধরিয়া ঠাকুরের নিত্য আহার বোধ হয় চারি পাঁচ ছটাক বার্লিমাত্র, সেই অবস্থায় জগন্মাতা যাই বলিয়াছেন, 'এই যে এত মুখে খাচ্ছিস,' অমনি, কি কুকর্ম করিয়াছি, এই একটা ক্ষুদ্র শরীরকে 'আমি' বলিয়াছি—মনে করিয়া ঠাকুর লজ্জায় হেঁটমুখ ও নিরুত্তর রহিলেন! পাঠক! এ ভাব কি একটুও কল্পনায় আনিতে পার? কি অদ্ভুত ঠাকুরের সঙ্গে দেখাই না আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে! জ্ঞান ভক্তি যোগ কর্ম, পুরাণ নবীন সকল প্রকার ধর্মভাবের কি অদৃষ্টপূর্ব সামঞ্জস্যই না তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি!"[৪] সেই অদৃষ্টপূর্ব সামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করবার জন্যই বোধ হয় ইতিহাস-বিধাতার ইঙ্গিতে নব্য বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ সেদিন এই ভাবমহাসাগরের তীরে এসে উপনীত হয়েছিলেন।

ডঃ সরকার দেখতে পেলেন দলে দলে লোক আসছে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে—যেন আনন্দের হাট বসেছে! (রোগযন্ত্রণায় কখনো কখনো তিনি বালকের ন্যায় কাতর হলেও পরক্ষণেই) ঈশ্বরীয় ভাবোচ্ছ্বাসে তিনি উদ্বেলিত—আনন্দ-শিহরণে প্রেম-পুলকে উন্মত্ত। চিকিৎসক হিসাবে ডঃ সরকার বুঝিয়াছিলেন এমন ভাব-বিহ্বলতা এবং অধিক বাক্যালাপ শ্রীরামকৃষ্ণের রোগজীর্ণ দেহের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। ডাক্তার ঈশ্বরীয় ভাবাবেশ পছন্দ করতেন না বা এতে তাঁর কোনো বিশ্বাসও ছিল না। তাই তিনি প্রথমেই নির্দেশ দিয়েছেন ভাবসংবরণ করতে এবং বেশী কথা না বলতে। কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশমত চলবার চেষ্টা করেও শ্রীরামকৃষ্ণ

৩ ২৩২ পৃঃ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ

৪ পৃঃ ৭৪, গুরুভাব, পূর্বার্ধ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

বারবার তার বিপরীত কাজই করে বসছিলেন। "কারণ হাড়মাসের খাঁচা বলিয়া চিরকাল অবজ্ঞা করিয়া যে শরীর হইতে তিনি মন উঠাইয়া লইয়াছেন, সাধারণ মানবের ন্যায় তাহাকে পুনরায় বহুমূল্য জ্ঞান করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইতেছেন না। ভগবৎপ্রসঙ্গ উঠিলেই শরীর ও শরীররক্ষার কথা ভুলিয়া পূর্বের ন্যায় উহাতে যোগদানপূর্বক বারংবার সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেছেন।"[৫]

একদিনের ঘটনা। সেদিন বৈকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে গিরিশ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ, মাষ্টার মহাশয়, শ্যাম বসু প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত। ডাক্তার সরকার এসে পরীক্ষা করে ঔষধের ব্যবস্থা দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠবার উদ্যোগ করছিলেন, ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত শুরু হল। তখন ডঃ সরকার মাষ্টার মহাশয়কে ধীরে ধীরে যা বললেন তার অর্থ হল এই যে, এ গান এখন ঠাকুরের পক্ষে ভাল নয়। "ভাব হলে অনর্থ হতে পারে। It is dangerous to him." মাষ্টার মশায় ঠাকুরকে ডাক্তারের আশঙ্কার কথা জানাতে-ই তিনি অপরাধী এক শিশুর মত ডাক্তারের মুখপানে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে করজোড়ে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে বলতে লাগলেন—"না, না, কেন ভাব হবে, কেন ভাব হবে—" কথা শেষ হল না, বলতে বলতেই সেই অমানবীয় সরল শিশু ধীরে ধীরে ভাবমহাসাগরের কোন্ অতলে যেন তলিয়ে গেলেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সেই অতল মহাদেশের কোনো খবর ছিল না। তাই ডঃ সরকার হতবুদ্ধি হয়ে নিরুপায় দর্শকের মত সেই সাগরতীরে দাঁড়িয়ে কত কী-ই না ভাবতে লাগলেন। কথামৃতে তখনকার বর্ণনা রয়েছে—"শরীর স্পন্দহীন, নয়ন স্থির! অবাক্! কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট, বাহ্যশূন্য, মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত সমস্তই অন্তর্মুখ! আর সে মানুষ নয়! নরেন্দ্রের মধুর কণ্ঠে মধুর গান চলিতেছে—শুনিতে শুনিতে ডাক্তার অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়া উঠিলেন, আহা, আহা!...গান সমাপ্ত হইল।

তখন পণ্ডিত ও মূর্খের—বালক ও বৃদ্ধের—পুরুষ ও স্ত্রীর, আপামর সাধারণের সেই মনোমুগ্ধকরী কথা হইতে লাগিল। সভাশুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ। সকলেই সেই মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। এখন সেই কঠিন পীড়া কোথায়? মুখ এখনো যেন ফুল্ল অরবিন্দ—যেন ঐশ্বরিক জ্যোতি বহির্গত হইতেছে। তখন তিনি ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "লজ্জা ত্যাগ কর; ঈশ্বরের নাম করবে—তাতে আবার লজ্জা কি? লজ্জা, ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়। আমি এত বড় লোক—আমি হরি হরি বলে নাচবো? বড় বড় লোক একথা শুনলে আমায় কি বলবে? যদি বলে ওহে ডাক্তারটা হরি হরি বলে নেচেছে! লজ্জার কথা! এ সব ভাব ত্যাগ কর।

ডাক্তার—আমার ওদিক দিয়ে যাওয়া নাই, লোকে কি বলবে তার তোয়াক্কা রাখি না।"[৬]

চারিত্রিক দৃঢ়তায় ডঃ সরকার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগোত্রীয়, একথা কারো অবিদিত ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরও তা জানতেন। তাই তিনি মৃদু হেসে বললেন, "উটি তোমার খুব আছে।"

আর একদিন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে

---

৫ পৃঃ ১৬৫, সাধকভাব, অষ্টম অধ্যায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ

৬ পৃঃ ২৪৭, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ

উপবিষ্ট গিরিশ ঘোষ সেদিন ডঃ সরকারকে জিজ্ঞাসা করলেন: "আচ্ছা মশায়, এ রকম কি আপনার হয়? এখানে আসবো না আসবো না করছি, যেন কে টেনে আনে—আমার নাকি হয়েছে, তাই বলছি।" ডাক্তার সরকার সেদিন উত্তরে বলেছিলেন, "তা এমন বোধ হয় না। তবে হৃদয়ের কথা হৃদয়-ই জানে।"[৭]

কিন্তু ডাক্তার সরকার তাঁর হৃদয়ের কথা আর বেশীদিন হৃদয়ে গোপন করে রাখতে পারেননি। আধ ঘণ্টার জন্য রোগীকে দেখতে এসে তাঁর ছ-সাত ঘণ্টা পর্যন্ত কেটে গিয়েছে। গৃহে প্রত্যাগত হয়ে রোগীর সংবাদ-প্রতীক্ষায় পথের দিকে চেয়ে বসে ভেবেছেন কেমন আছেন—কি হোলো। শুধু তাই নয়—রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়াতে রাত তিনটে থেকে জেগে শয্যায় বসে একান্তে ভেবেছেন,—মন চলে গিয়েছে দূরে শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে—উদ্বেগাকুল হৃদয়ে চিন্তা জেগেছে, ঠাণ্ডা লাগলো বুঝি। সকাল সাতটায় তাঁর চেম্বারে যখন বন্ধুসমাগম হয়েছে, তাদের কাছে নিজমুখে বলেছেন—"রাত তিনটে থেকে পরমহংসের ভাবনা আরম্ভ হয়েছে—ঘুম নাই, এখনো পরমহংস চলছে।"[৮] তারপর মাষ্টার মহাশয় গিয়ে যখন জিজ্ঞাসা করেছেন, "আজ ব্যারামের কি ব্যবস্থা হবে?" তখন কঠোর গাম্ভীর্যের আবরণ একেবারে স্খলিত হয়ে অবুঝ হৃদয়ের সেই গোপন কথাটা বেরিয়ে পড়েছে—"বন্দোবস্ত আমার মাথা আর মুণ্ডু। আজ আবার যেতে হবে, আর কি বন্দোবস্ত!" আরো বলেছেন—"তোমরা জান না যে আমার কত টাকা রোজ লোকসান হচ্ছে—দু-তিন জায়গায় রোজ যেতে সময় হয় না।"[৯] কিন্তু এও সব নয়। দেখা যায় ডঃ সরকারের মধ্য থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী সেই ডাক্তার ধীরে ধীরে কোথায় উধাও হয়েছেন আর তার জায়গায় আবির্ভূত হয়েছেন এক সেবাপরায়ণ মোহিত-হৃদয় ভক্ত যিনি শ্রীরামকৃষ্ণে নিবেদিতপ্রাণ নরেন, গিরিশ, মাষ্টারমশায় এবং অন্যান্য ভক্তদের কাছে অকপটে বলতে পেরেছিলেন—"দেখ, আমি তোমাদেরই রইলুম। ব্যারামের জন্য যদি মনে কর, তাহলে নয়। তবে আপনার লোক বলে যদি মনে কর তাহলে আমি তোমাদের।"[১০]

"পরম যতন সহ উঁহারে দেখিব।
যতবার আবশ্যক আপনি আসিব॥
সুহৃদের মত তেঁহ বলিলেন পিছে।
ইহাতে নিজের মোর বহু স্বার্থ আছে॥
গূঢ় কথা বড় কথা কহিলা ডাক্তার।
লক্ষ কোটি নমস্কার চরণে তাঁহার॥
বহু দূরদর্শিতার ভাব এ কথায়।
ডাক্তার—ডাক্তার নহে, জনৈক লীলায়॥"[১০ক]

তাই ডাক্তার হিসাবে যিনি শাসন করে বলেছেন, "যে অসুখ তোমার হয়েছে, লোকেদের সঙ্গে কথা কওয়া চলবে না"—তিনিই আবার মুগ্ধ হৃদয়ে ভক্তের দাবী জানিয়ে বলেছেন, "তবে আমি যখন আসবো, কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবে।"[১১]

তবে একবার নয়, দুবার নয় ডাক্তারকে বহুবারই আসতে হয়েছিল আপনার প্রয়োজনে—কেননা তাঁর নিজের কথায়, "ইহাতে নিজের মোর বহু স্বার্থ আছে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি-

, পৃষ্ঠা ২৬৬, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪র্থ ভাগ
, „ ২২৩, „ „ ১ম ভাগ

৯, ১০, পৃষ্ঠা ২২৫, ২২১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ
১০ক পৃ: ৫৮৭, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি
১১ " ২২১ „ কথামৃত, ১ম ভাগ

-প্রণেতা পূজ্যপাদ অক্ষয়কুমার সেন মহাশয় একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন যা থেকে স্রেফ মানুষ হিসাবেও শ্রীরামকৃষ্ণের উদারতা এবং তাঁর প্রতি ডাক্তার সরকারের প্রবল আকর্ষণের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কলকাতা শহরের অধিবাসী জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি তখন শ্রীরামকৃষ্ণের নিন্দায় পঞ্চমুখ। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্বেষ তাঁর এমনি প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, শুধুমাত্র এজন্যই তিনি শহরে নামকরা ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। পুঁথিকার শ্রীযুক্ত সেন মহাশয়ের হৃদয়েও তিনি এক গভীর আন্দোলনের সঞ্চার করেন। কেননা তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না এটা কি করে সম্ভব। মানুষের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ, স্বার্থশূন্য, সর্বত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশংসা না হয় নাই হোক—কিন্তু তাই বলে তাঁর নিন্দা! তাই পুঁথিকার খেদের সঙ্গে বলেছেন,

"বুঝিতে নারিনু মন সে মন কেমন মন
রসনা চালনে যার সাধ,
প্রভু অকলঙ্ক শশী, গুণযুত রাশি রাশি
তাঁহার করিতে নিন্দাবাদ!"[১১ক]

যাই হোক, সেই নিন্দুকের শিশুপুত্র একদা কঠিন দুঃসাধ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়। শয্যাশায়ী বালক অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। অভিজ্ঞ সব ডাক্তার-কবিরাজের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও রোগ-উপশমের কোনো চিহ্ন ছিল না। সুখসমারোহপূর্ণ গৃহে আসন্ন মৃত্যুশোকের করাল ছায়া ঘনিয়ে আসে। হতাশা-বিষাদে হাহাকার জেগে ওঠে সকলের মনে। প্রাণপ্রিয় শিশুপুত্রকে বাঁচাবার তাগিদে এই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্বেষী সেদিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের গৃহে ছুটে আসেন, অবিলম্বে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে। এদিকে ডাক্তার সরকার তখন অন্য রোগী দেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর ব্যাধি নিয়ে নিরন্তর চিন্তা। নূতন করে পাঁচশত টাকার ডাক্তারী বই কিনে তন্ন তন্ন করে খুঁজছেন রোগ-নিরাময়ের উপায়, —গবেষণা করছেন রোগের নিদান। ভদ্রলোক যখন ডাক্তার সরকারের গৃহে উপস্থিত হলেন তখন তিনি পীড়িত শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখবার জন্য সবেমাত্র গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন। পুঁথিকার বলছেন, "এখন ডাক্তার হেথা, প্রভুর সূতায় গাঁথা।" তাই

"অন্য রোগী দেখিবার প্রয়াস না হয় আর
কত লোক যায় ফিরে ফিরে।
যদি কেহ দেখা পায় দুনো দাম দিতে চায়
তথাপিহ স্বীকার না করে।
নিন্দুক কাতর স্বরে ডাক্তারে কাকুতি করে
যাইবারে তাহার ভবনে,
ডাক্তার না শুনি তায় চড়ি গাড়ী উভরায়
উপনীত প্রভুর সদনে॥"[১১খ]

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের যে সূতায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল গাঁথা ছিলেন সেই সূতার প্রান্ত বুঝি কথঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়ে সেদিন পুত্রবিচ্ছেদ-শঙ্কাতুর নিন্দুককেও সকলের অলক্ষ্যে আকর্ষণ করলো। কেননা ডাক্তার সরকারের বিমুখতায়

"নিন্দুকের প্রাণ ফাটে গাড়ীর পশ্চাতে ছুটে
ঊর্ধ্বশ্বাসে আকুল পরাণ।"[১১গ]

ডাক্তার সরকারের ফিটনের পিছনে ছুটতে ছুটতে নিতান্ত আকস্মিকভাবে তিনি সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে উপনীত হলেন।

শুষ্ক বিষণ্ণ মুখ। ভয়বেদনায় অবসন্ন দেহকে কোনোমতে টেনে নিয়ে নিশ্চল

১১ক পৃঃ ৬০৯, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি

১১খ, ১১গ পৃঃ ৬১০, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি

পাথরের মত দাঁড়ালেন শ্যামপুকুরে সেই দোতলার কক্ষমধ্যে যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ কালান্তক রোগে শয্যাশায়ী। জিজ্ঞাসা করে শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝলেন রোগগ্রস্ত পুত্রের মৃত্যুশঙ্কা-ভীত এক অসহায় পিতা সম্মুখে দণ্ডায়মান। অমনি স্বর্গের গোপন মন্দাকিনী বাইরে লোক-চক্ষুগোচরে প্রবাহিত হল। প্রাণঘাতী ক্যান্সারের দারুণ যন্ত্রণা অকিঞ্চিৎকর হয়ে একপাশে পড়ে রইলো। অসহায় পিতার হয়ে সজল নয়নে মিনতি করে ডাক্তার সরকারকে বলতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—ওগো আমার বয়স হয়েছে "আমি এত বয়োধিকে" —আর এমন কিছুই নয়, "গলদেশে সামান্য বেদন," কিন্তু সেই সুকুমার বালক—তার

"যাতনা অনুপমেয় সে যে শিশু অল্পবয়:
নাহি জানি কত কষ্ট পায়।"[১১ঘ]

পীড়িত শিশুর রোগযন্ত্রণা এবং তার অসহায় পিতার হৃদয়বেদনা মুহূর্তে শ্রীরাম-কৃষ্ণকে এমনি বিচলিত করে তোলে যে তিনি আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বারবার ডাক্তারকে অনুরোধ করতে লাগলেন অবিলম্বে সেই শিশুর চিকিৎসার ভারগ্রহণ করতে। নিন্দুক সেদিন সচক্ষে দেখলেন অন্তহীন অহেতুকী দয়া অশ্রুধারায় শ্রীরামকৃষ্ণের দুনয়ন দিয়ে অঝোরে গড়িয়ে পড়ছে। তিনিও স্থির থাকতে পারেননি। সুকোমল প্রেমস্পর্শে পাষাণ বিদীর্ণ হল। অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ডাক্তার সরকারের চিকিৎসায় সেই ব্যক্তির পুত্র নিরাময় হয়েছিল কিনা তার বিবরণ দিয়ে পুঁথিকার ঘটনাটি সম্পূর্ণ করেন-নি। তবে এরপর যা বলা আছে তা থেকে এই অসম্পূর্ণতার কারণ সহজেই প্রণিধানযোগ্য। পুঁথিকার বলছেন যে, নিজের চোখে ব্যাপার-স্যাপার দেখে এমনি হয়েছে যে বিশেষ বিস্তারিত করে কিছু বলবার আর সাধ্য নেই, কেননা বলবে যে রসনা তার বাক্‌শক্তি—"নয়ন হরিল একেবারে।" তাই "সাধ্য নাই বর্ণিবার, অবাক হইয়া বসে দেখি।"[১১ঙ]

যাই হোক, উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল রোগ চিকিৎসা-সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংসর্গে এসে নিজেই প্রবল-ভাবে চিকিৎসিত হতে থাকেন। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বিজ্ঞানিসুলভ মর্মসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে বহির্জগতের বিজ্ঞানসাধক স্যার মাইকেল ফ্যারাডের মত অন্তর্জগতের সত্যসাধনায় নিরত এক মহাবৈজ্ঞানিক এই শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্তঃপ্রকৃতির ল্যাবোরেটরীতে গূঢ় রহস্যের গবেষণায় নিমগ্ন। বন্ধুদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা বলতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকের পরিভাষা ব্যবহার করে বলেছেন, "A child of Nature"—বই পড়লে এ ব্যক্তির এতো জ্ঞান হোতে না। Faraday communed with Nature. প্রকৃতিকে Faraday নিজে দর্শন করতো, তাই অত scientific truth আবিষ্কার করতে পেরেছিল। বই-পড়া বিদ্যে হলে অতো হোতো না[১২]...এই যে ইনি (পরমহংসদেব) যা বলেন তা অত অন্তরে লাগে কেন? এঁর সব ধর্ম দেখা আছে—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব—এ সব ইনি নিজে করে দেখেছেন। মধুকর নানা ফুলে বসে মধু সঞ্চয় করলে তবেই চাকটি বেশ হয়।[১৩]

কিন্তু দেখা যায় জ্ঞানপথের পথিক ডঃ

১১ঘ, ১১ঙ পৃঃ ৬১০, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি

১২ পৃঃ ২১৭, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ
১৩ „ ২৭৮ „ ৪র্থ ভাগ

সরকার বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি দিয়ে কিছুতেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধির ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও ঈশ্বর-আলাপনে শ্রীরামকৃষ্ণ মুহুর্মুহুঃ ভাবাবিষ্ট হতেন। তাঁর সুকোমল অঙ্গে ভাগবত ভাব-বৈচিত্র্য এমনি অনায়াসে স্বাভাবিকভাবে বিকসিত হয়ে উঠতো যে প্রত্যক্ষদর্শীরা অবাক হয়ে ভাবতেন—এও কি সম্ভব! যে যোগিজন-বাঞ্ছিত দিব্যভাব দীর্ঘদিনের অনলস সাধনায় কদাচিৎ কাহারও জীবনে উপস্থিত হয় বলে শাস্ত্রকারেরা নির্দেশ করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে তার প্রকাশ ছিল এত সহজ এত স্বাভাবিক যে কোনো হিসাব নিকাশের অঙ্কে তাকে মেলানো সম্ভব ছিল না। যে আনন্দ, যে প্রেম, যে বিরহকাতর ব্যাকুলতা, যে পবিত্র অলৌকিক মধুর ভাবরাশি একদা প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল তাই আবার দীর্ঘ দিবস অন্তে দক্ষিণেশ্বরে মূর্ত হয়ে উঠলো মানুষের চোখের সামনে। শ্রীরামকৃষ্ণ জগজ্জননীর সঙ্গে কথা কইতেন। তাঁর সকল আনন্দ-বেদনা, সকল সন্দেহ, সকল সমস্যা তিনি মা ভবতারিণীকে নিবেদন করে তাঁর কাছ থেকে সমাধান চেয়ে আনতেন। যে মূর্তি আমাদের কাছে কঠিন প্রাণহীন প্রস্তরের স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়—মানুষ প্রত্যক্ষ দেখেছে শ্রীরামকৃষ্ণ তার কাছে ছুটে গিয়েছেন অহরহ নানা আবদার, নানা প্রশ্ন নিয়ে; যেমন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে শিশু তার মায়ের কাছে ছুটে যায়—তার গলা জড়িয়ে ধ'রে কান্নাহাসির দোলায় দুলতে থাকে। দেহ-অবসানের পূর্বে নিদারুণ রোগযন্ত্রণাকে ছাপিয়ে উঠতো তাঁর ঈশ্বরীয় ভাব-বিহ্বলতা—কোন অনির্দেশ্য অনির্বাচ্য জগতের সুকোমল সৌন্দর্য ফুটে উঠতো রোগ-জীর্ণ মুখখানিতে। কি সেই দিব্য অবস্থা কে জানে! আধুনিক বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার পরম কৌতূহলভরে সে অবস্থা লক্ষ্য করেছেন। সেই পুরাতন প্রশ্ন তাঁর মনেও উদিত হয়েছে—"এ কি ভান? পাগলামি? মাথার খেয়াল? Hallucination বা ঐ জাতীয় কিছু?" কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুতেই পরাঙ্মুখ বা পশ্চাৎপদ ছিলেন না। বস্তুতঃ সত্যকে বাজিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বস্ব পণ করতে যারা প্রস্তুত তিনি চির জীবন এমন মানুষের-ই সন্ধান করেছেন। তাঁর জীবনীপাঠে দেখা যায় এই নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ চাইতেন তাঁর জীবনে উপলব্ধ সত্যকে সকলে যাচাই করে বাজিয়ে নিক। তাই আধুনিক বিজ্ঞানের পূজারী সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার সরকার অবাধে বারবার তাঁর জীবন-লক্ষণহীন, স্পন্দহীন দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করেছেন। ডাক্তার সরকারের সহযোগী ডাক্তার দোকড়ি দিব্যপ্রভায় সমুজ্জ্বল শ্রীরামকৃষ্ণের মুখখানি বাম হাতের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে স্থির নিষ্পলক চোখের মধ্যে ডান হাতের শক্ত আঙুল প্রবেশ করিয়ে re-action পরীক্ষা করেছেন।[১৪] সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের বাহ্য-চেতনাশূন্য দিব্য দেহকে নিয়ে সেদিন যে এমনি এক স্থূল নিষ্ঠুর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেকথা স্মরণ করে আজ হয়ত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাবান নরনারীর হৃদয় ব্যথিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এরও প্রয়োজন ছিল। বিংশ-শতাব্দীর জড়বাদী অসহিষ্ণু পৃথিবী এক প্রচণ্ড দাবী নিয়ে সম্মুখে অগ্রসরমান। তার মনে

১৪ পৃঃ ২৪০, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫ম ভাগ ৩৩০, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১২শ অধ্যায়, ২য় পাদ, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ

কত না সন্দেহ, কত অবিশ্বাস, কতই না সংশয়াকুল জিজ্ঞাসা! জিজ্ঞাসা-নিরসনের জন্য, অবিশ্বাসী হৃদয়ের কৌতূহল-চরিতার্থের জন্য রোগজীর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিমুখে, অসীম ধৈর্যে অনন্ত কৃপাপরবশ হয়ে এমন হৃদয়-বিদারক পরীক্ষার সম্মুখীন হতেও কুণ্ঠিত হন নাই। Physiology-র তত্ত্ব, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির চাতুর্য সব দিয়ে মিলিয়ে রহস্য-উন্মোচনের এক দুরন্ত চেষ্টা হয়েছিল সেদিন সর্বসমক্ষে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো তত্ত্বই টেকেনি, কোনো হিসাব-ই মেলেনি। অথচ চোখে দেখা প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করবারও উপায় ছিল না। তাই রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে।

শেষে একদিন সেই রহস্যসন্ধানী বিজ্ঞান-সাধককে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই সোজাসুজি বললেন —"তুমি আমার অবস্থা কি মনে কর? যদি ঢং মনে কর তাহলে তোমার সায়েন্স মায়েন্স সব ছাই পড়েছ"।[১৫] পরম পণ্ডিত ডঃ সরকার নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন সরল গ্রাম্য ভাষায় উচ্চারিত এই অনাড়ম্বর বাক্যটি কোনো কূট যুক্তিবিচারের সিদ্ধান্ত নয়। জড় বিজ্ঞানের এলাকা পেরিয়ে যে অনন্ত অধ্যাত্ম-লোক অসীম অব্যক্তে প্রসারিত সেই অপরিচিত অপরিমিত জগতের এক দুঃসাহসী অভিযাত্রী এক অনন্য অধিকারের সুরে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা ঘোষণা করেছেন। সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানের এমনি জোর, তাঁর নিজ জীবনে পরীক্ষিত নিঃসন্দিগ্ধ সত্যের এমনি তেজ যে, তা অপর কোনো মতামত বা কোনো তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। জড়-বিজ্ঞানের পরীক্ষাপদ্ধতি দিয়ে সেই সত্যকে মেলানো এখনো সম্ভব হয়নি—হয়ত সম্ভব নয় —কিন্তু প্রত্যক্ষ শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্মুখে রেখে সেই সত্যকে স্বীকার না করে উপায় কি? তাই আধুনিক বিজ্ঞানের মুখ্য প্রবক্তা সেদিন দ্বিধাহীন চিত্তে বলেছিলেন—

"যদি ঢং মনে করি তাহলে কি এত আসি।"[১৬]

১৫, ১৬ পৃ: ২৪০, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ

প্রার্থনা

শ্রীকানাইলাল সামন্ত

ঐ চরণে ক্ষিপ্ত এ প্রাণ লিপ্ত কর, লিপ্ত কর;
ঐ নামে মোর হৃদয়খানি সিক্ত কর, সিক্ত কর;
নম্র নত চিত্ত ভরি'
নিত্য যেন তোমায় স্মরি,
তোমায় ছাড়া জীবন আমার তিক্ত কর, তিক্ত কর।
জীবনস্রোত তোমার পানেই চালাও সোজা,
সকল কাজই হয় যেন মোর তোমায় খোঁজা।
জাগিয়ে তৃষা তোমার তরে
আমার সারা বক্ষ 'পরে—
কৃপাধারায় তৃষার মরু সিক্ত কর, সিক্ত কর।

যোগবাসিষ্ঠসারঃ

[অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ]

প্রাক্‌-কথন

'যোগবাসিষ্ঠ' বেদান্তসাধননিষ্ঠ মহাত্মগণের অতি প্রিয় গ্রন্থ। অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত তাঁহারা এই গ্রন্থের পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও মনন করিয়া থাকেন।···

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একটি সত্তাবিহীন বিরাট প্রতিভাস বা প্রতীতি মাত্র। এক শুদ্ধ চৈতন্যই, ব্রহ্মই সর্বকালে সর্বরূপে স্বমহিমায় বিরাজিত।—ইহাই যোগবাসিষ্ঠের সার কথা।···

মূল এই তত্ত্বই শ্রীবসিষ্ঠ বহুবিধ আখ্যায়িকা ও উপদেশ সহায়ে যোগবাসিষ্ঠ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। গুরু শ্রীবসিষ্ঠদেব বক্তা, পরমবৈরাগ্যবান্ রঘুবংশতিলক শ্রীরামচন্দ্র শ্রোতা। বাঞ্ছিততীর্থভ্রমণান্তে গৃহপ্রত্যাগত শ্রীরামচন্দ্রের চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে; সংসারের অসারতা, দুঃখস্বরূপতা ও ক্ষণভঙ্গুরত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল হইয়াছেন। কোন ভোগ্যপদার্থই তাঁহার নিকট রুচিকর বলিয়া বোধ হইতেছে না, তিনি মৌনাবলম্বন করিয়াই কালক্ষেপ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও মহারাজ দশরথের অনুরোধে কুলগুরু শ্রীবসিষ্টদেব প্রিয়শিষ্য শ্রীরামচন্দ্রকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং যে উপদেশ-লাভান্তে শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইয়াছিল, তাহাই 'যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণ' নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ ছয়টি প্রকরণে বিভক্ত—বৈরাগ্য-, মুমুক্ষা-, উৎপত্তি-, স্থিতি-, উপশম- ও নির্বাণ-প্রকরণ।···

জীবন্মুক্তি-বিবেক, পঞ্চদশী, বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী, শিব-সংহিতা, রামগীতা প্রভৃতি বেদান্ত-গ্রন্থে যোগবাসিষ্ঠের বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এতএব অদ্বৈতবেদান্তে যোগবাসিষ্ঠের স্থান অতি উচ্চে, একথা অনস্বীকার্য।···

মূল গ্রন্থের আকার বিরাট, শ্লোকসংখ্যা ৩২ হাজার। ইহা হইতে আহৃত ছয় হাজার শ্লোকবিশিষ্ট 'লঘুযোগবাসিষ্ঠ' নির্ণয়সাগর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কোন অখ্যাতনামা বিদ্বান্ কেবল দার্শনিকসিদ্ধান্তপূর্ণ শ্লোকসমূহ চয়ন করিয়া আরও সংক্ষেপে 'যোগবাসিষ্ঠসারঃ' নামক ছোট একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া মুমুক্ষুগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।···

মূল গ্রন্থ হইতে সযত্নে অতি সূক্ষ্ম বিচারসহ সুন্দর শ্লোকসমূহ চয়ন করিয়া গ্রন্থকার এই 'যোগবাসিষ্টসারঃ' গ্রন্থটিকে দশটি প্রকরণে বিভক্ত করিয়াছেন—বৈরাগ্য-, জগৎমিথ্যাত্ব-, তত্ত্বজ্ঞান-, মনোলয়-, বাসনোপশম-, আত্মমনন-, শুদ্ধিনিরূপণ-, আত্মার্চন-, আত্মনিরূপণ- ও শূন্যাশূন্যপদ-প্রকরণ।···

ইহা সিদ্ধান্তগ্রন্থ, প্রক্রিয়াগ্রন্থ নহে।

অনুবাদে সর্বত্র মহীধরকৃত টীকার অনুসরণ করা হইয়াছে।

বৈরাগ্যপ্রকরণ

'যোগবাসিষ্ঠসারঃ' নামক গ্রন্থরচনার প্রারম্ভে গ্রন্থকার গ্রন্থপ্রতিপাদ্য ইষ্টদেবতাপ্রণামরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন :

দিক্‌কালাদ্যনবচ্ছিন্নানন্তচিন্মাত্রমূর্তয়ে।
স্বানুভূত্যেকমানায় নমঃ শান্তায় তেজসে ॥ ১

অনুবাদ : দিক্‌দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদরহিত অনন্ত চৈতন্যমাত্রবিগ্রহ একমাত্র স্বানুভবরূপ প্রমাণবেদ্য সর্বগুণাতীত পরব্রহ্মকে আমি প্রণাম করি।

মঙ্গলাচরণের পর গ্রন্থকার এই শাস্ত্রগ্রন্থের অধিকারী কে, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন :

অহং বদ্ধো বিমুক্তঃ স্যামিতি যস্যাস্তি নিশ্চয়ঃ।
নাত্যন্তমজ্ঞো নো তজ্‌জ্ঞঃ সোঽস্মিংচ্ছাস্ত্রেঽধিকারবান্ ॥ ২

আমি সংসারবন্ধনে বদ্ধ হইয়া আছি এবং এই বন্ধনদশা হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি—যিনি এই প্রকার দৃঢ়সংকল্পবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত অজ্ঞও নহেন, তত্ত্বজ্ঞও নহেন, তিনিই এই শাস্ত্রে অধিকারী।

যাবন্নানুগ্রহঃ সাক্ষাজ্জায়তে পরমেশ্বরাৎ।
তাবন্ন সদ্‌গুরুং কশ্চিৎ সচ্ছাস্ত্রং বাপি নো লভেৎ ॥ ৩

যতদিন পর্যন্ত পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ কৃপালাভ না হয়, ততদিন কেহ সদ্‌গুরু অথবা সৎ-শাস্ত্রের (বেদান্তের) আশ্রয় লাভ করিতে পারে না।

মহানুভাবসম্পর্কাৎ সংসারার্ণবলংঘনে।
যুক্তিঃ সংপ্রাপ্যতে রাম দৃঢ়া নৌরিব নাবিকাৎ ॥ ৪

শ্রীবসিষ্ঠজী বলিতেছেন—'হে রাম, যেমন নাবিকের নিকট হইতেই সাগরতরণোপযোগী নৌকা লাভ হইয়া থাকে, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট হইতে (তাঁহার সেবা দ্বারা) সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপায় জানা যায়।'

সংসারদীর্ঘরোগস্য সুবিচারমহৌষধম্।
কোঽহং কস্য চ সংসারো বিবেকেন বিলীয়তে ॥ ৫

আমি কে, এই সংসারবন্ধনই বা কাহার—এইরূপ দৃঢ় বিচারই সংসাররূপ দীর্ঘ রোগের মহৌষধ। কারণ বিচার দ্বারাই এই সংসার-ভ্রান্তি দূর হইয়া থাকে।

যস্মিন্ দেশে হি তত্ত্বজ্ঞো নাস্তি সজ্জনপাদপঃ।
সফলঃ শীতলচ্ছায়ো ন তত্র দিবসং বসেৎ ॥ ৬

যে দেশে ফলবান্ শীতলছায়াযুক্ত, তত্ত্বজ্ঞসজ্জনরূপ বৃক্ষের অভাব, সে স্থানে (মুমুক্ষু) একদিনও অবস্থান করিবে না।

সদা সন্তোঽভিগন্তব্যা যদ্যপ্যুপাদিশন্তি ন।
যা হি স্বৈরকথাস্তেষামুপদেশা ভবন্তি তাঃ ॥ ৭

সৎপুরুষগণ যদি উপদেশ প্রদান নাও করেন তথাপি সর্বদা তাঁহাদের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাদের সেবা করা উচিত। কারণ তাঁহাদের স্বেচ্ছাকথাও (সাধারণ বাক্যালাপও) উপদেশ-রূপই হইয়া থাকে।

শূন্যমাপূর্ণতামেতি মৃত্যুরপ্যমৃতায়তে।
আপৎসংপদিবাভাতি বিদ্বজ্জনসমাগমাৎ ॥ ৮

সাধুসঙ্গে শূন্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় মৃত্যু অমৃতসমান হইয়া যায়, এবং দুঃখও সুখরূপে প্রতীত হয়। ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মে বস্তুতঃ শূন্য, মৃত্যু ও দুঃখের একান্ত অভাব।

জ্ঞানিনামপি চিত্তং চেৎ কেবলাত্মসুখোদিতম্।
সত্ত্বাঃ সংসারদুঃখার্তাঃ কং যান্তি শরণং তদা ॥ ৯

জ্ঞানিগণের চিত্ত যদি কেবল আত্মানন্দলাভেই সমুৎসুক থাকে, তবে সংসারদুঃখসন্তপ্ত জীবগণ (একটু শান্তিলাভের আশায়) কাহার শরণ লইবে? অতএব জ্ঞানিগণ সদা পরোপকার-পরায়ণ হইয়া থাকেন—ইহাই ভাবার্থ।

তজ্জ্ঞানং স চ শাস্ত্রার্থস্তদ্বিজ্ঞানমখণ্ডিতম্।
সচ্ছিষ্যায় বিরক্তায় সাধো যদুপদিশ্যতে ॥ ১০

হে স্বধর্মচারিন্! বৈরাগ্যবান্ সৎশিষ্যকে গুরু যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাই জ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রার্থ এবং তাহাই অখণ্ড অনুভব।

উপদেশক্রমো রাম ব্যবস্থামাত্রপালনম্।
জ্ঞপ্তেস্তু কারণং শুদ্ধং শিষ্যপ্রজ্ঞৈব কেবলা ॥ ১১

শ্রীবসিষ্ঠ বলিতেছেন, 'হে রাম, গুরুর শিষ্যকে উপদেশ-প্রদান-রীতি কেবল মর্যাদা-পালন মাত্র। কিন্তু একমাত্র শিষ্যের প্রজ্ঞাই (বিচারকুশল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিই) জ্ঞানের অবিমিশ্র কারণ।'

ন শাস্ত্রৈর্নাপি গুরুণা দৃশ্যতে পরমেশ্বরঃ।
দৃশ্যতে স্বাত্মনৈবাত্মা স্বয়া সত্ত্বস্থয়া ধিয়া ॥ ১২

বহুশাস্ত্রাভ্যাস বা গুরুকরণের দ্বারাই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয় না। সাধক নিজের সত্ত্বগুণসমাবিষ্ট বুদ্ধি সহায়ে নিজেই তত্ত্বোপলব্ধি করিয়া থাকেন। মননপরায়ণ ব্যক্তিই আত্মোপলব্ধি করিয়া থাকেন—ইহাই ভাবার্থ।

সর্বাপ্যেব কলা জন্তোরনভ্যাসেন নশ্যতি।
ইয়ং জ্ঞানকলাত্যন্তা সকৃজ্জাতাভিবর্ধতে ॥ ১৩

মনুষ্যের সর্ব সামর্থ্য অভ্যাসের অভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, এই জ্ঞানকলা কিন্তু একবার উৎপন্ন হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়।

স্বকণ্ঠেঽপি স্থিতং বস্তু যথা ন প্রাপ্যতে ভ্রমাৎ।
ভ্রমান্তে প্রাপ্যতে তদ্বদাত্মাঽপি গুরুবাক্যতঃ ॥ ১৪

যেরূপ স্বকণ্ঠে স্থিত হইলেও কোন বস্তু (হার বা মণি আদি) ভ্রমবশতঃ অপ্রাপ্ত বলিয়া মনে হয় এবং ভ্রম অপগত হইলে পুনর্লব্ধ বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ (নিত্যলব্ধ) আত্মা (ভ্রান্তিবশতঃ অপ্রাপ্ত বলিয়া মনে হইলেও) গুরূপদেশে (ভ্রমবিয়োগে পুনঃপ্রাপ্তরূপে প্রতীত হন)। সুতরাং উপদেশের জন্য গুরুর শরণ লওয়া কর্তব্য।

স্বস্বরূপমজানন্ বৈ জনোঽয়ং দৈববর্জিতঃ।
বিষয়ে তু সুখং বেত্তি পশ্চাৎপাকে বিষান্নবৎ ॥ ১৫

ভাগ্যবঞ্চিত জীব নিজের স্বরূপকে না জানিয়া বিষমিশ্রিত ও পরিণামে দুঃখপ্রদ জীর্ণ অন্নের ন্যায় বিষয়েতেই সুখজ্ঞান করিয়া থাকে। অথবা, নিজের স্বরূপ যে ব্যক্তি জানে না সে নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্য ; কারণ সে পরিণামে দুঃখপ্রদ (এমন কি মৃত্যুপ্রদ) বিষমিশ্রিত অন্নতুল্য বিষয় ভোগ করিয়া সুখ পাইতে চায়। (বিষমিশ্রিত অন্ন খাইলে তৎকালে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় বটে, শেষে কিন্তু প্রাণসংশয় হয় ; সেইরূপ বিষয়ভোগ করিবার সময় সুখ হইলেও পরিণামে উহা নানা দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। অতএব বিষয়ভোগী নিশ্চয়ই ভাগ্যহীন।)

বুধ্বাঽপ্যত্যন্তবৈরস্যং যঃ পদার্থেষু দুর্মতিঃ।
বধ্নাতি ভাবনাং ভুয়ো নরো নাসৌ স গর্দভঃ ॥ ১৬

বিষয়ের অত্যন্ত বিরসতা জানিয়াও সে দুর্মতি পুনরায় সেই বিষয়ে আসক্ত হয়, সে ব্যক্তি মনুষ্যপদবাচ্য নহে, সে গর্দভবিশেষ। (অর্থাৎ তখন সে আচরণে বিচারবিবেকহীন পশুরই সমান।)

যৎকিঞ্চিদপি সংকল্পাৎ নরো দুঃখে নিমজ্জতি।
ন কিঞ্চিদপি সংকল্পাৎ সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ১৭

অল্পমাত্র বিষয়চিন্তা দ্বারাও মনুষ্য দুঃখে নিমগ্ন হইয়া থাকে। বিষয়চিন্তার অভাবে তাহার অক্ষয় সুখ লাভ হয়।

যথা স্বপ্নে মুহূর্তে স্যাৎ সংবৎসরশতভ্রমঃ।
তথা মায়াবিলাসোঽয়ং জায়তে জাগ্রতি ভ্রমঃ ॥ ১৮

এক মুহূর্তকালের মধ্যে স্বপ্নে যেমন শতসংবৎসরের ভ্রম হয়, জাগ্রদ্‌দৃষ্ট এই সংসারও সেইরূপ মায়ার বিলাস ও মিথ্যা ভ্রমমাত্র।

যোঽন্তঃশীতলয়া বুদ্ধ্যা রাগদ্বেষবিমুক্তয়া।
সাক্ষিবৎ পশ্যতীদং হি জীবিতং তস্য শোভতে ॥ ১৯

রাগদ্বেষরহিত হইয়া শান্তচিত্তে যিনি এই জগৎকে সাক্ষীর ন্যায় দর্শন করেন, তাঁহারই জীবন ধন্য।

যেন সম্যক্‌পরিজ্ঞাতং হেয়োপাদেয়মুঝতা।
চিত্তস্যান্তে স্থিতং চিত্তং জীবিতং তস্য শোভতে ॥ ২০

ত্যাজ্যগ্রাহ্যভাবনারহিত হইয়া যিনি বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্যকে সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারই জীবন সফল।

হৃদয়াকাশমাত্রস্য বিনাশো দেহনাশতঃ।

ব্যর্থং ভূতানি শোচন্তি নষ্ট আত্মেতি শংকয়া॥ ২১

দেহনাশ হইলে হৃদয়াবচ্ছিন্ন আকাশেরই নাশ হয়, (মহাকাশের নাশ হয় না। তদ্রূপ দেহনাশে) আত্মার বিনাশ হইল এইরূপ শঙ্কা করিয়া প্রাণিগণ বৃথাই শোক করিয়া থাকে।

ঘটাদিষু প্রণষ্টেষু যথাকাশমখণ্ডিতম্।

তথা দেহেষু নষ্টেষু দেহী নিত্যমলেপকঃ॥ ২২

ঘটাদি পদার্থ বিনষ্ট হইলে আকাশ যেমন অখণ্ডিতই থাকিয়া যায়, দেহাদি বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও তদ্রূপ আত্মা নিত্য ও নির্লিপ্তই থাকেন।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচন।

জগদ্-বিবর্তরূপেণ কেবলং ব্রহ্ম জৃম্ভতে॥ ২৩

কোন কিছু কখন কোথাও বস্তুতঃ উৎপন্ন হয় না, বিনষ্টও হয় না। জগৎ-বিবর্তরূপে একমাত্র ব্রহ্মই সদা বিরাজমান।

আকাশাদপি বিস্তীর্ণঃ শুদ্ধঃ সূক্ষ্মোঽব্যয়ঃ শিবঃ।

অয়মাত্মা কথং রাম জায়তে ম্রিয়তেঽথবা॥ ২৪

শ্রীবসিষ্ঠ বলিতেছেন—'হে রামচন্দ্র! আকাশ হইতেও ব্যাপক, শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, অব্যয় ও মঙ্গলময় এই আত্মা কি প্রকারে জাত বা মৃত হইতে পারেন? অর্থাৎ পারেন না। (দেশ-কালাদি পরিচ্ছেদরহিত আত্মার জন্ম ও নাশ সম্ভব নহে—ইহাই অর্থ)।

সর্বমেকমিদং শান্তমাদিমধ্যান্তবর্জিতম্।

ভাবাভাববিনির্মুক্তমিতি জ্ঞাত্বা সুখী ভব॥ ২৫

দৃশ্যমান এই জগৎ আদি-মধ্য-অন্ত-রহিত, ভাব-অভাব-অতীত, শান্ত, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে—এইরূপ জানিয়া সুখী হও।

বরং শরাবহস্তস্য চাণ্ডালাগারবীথিষু।

ভিক্ষার্থমটনং রাম ন মৌর্খ্যহতজীবিতম্॥ ২৬

শ্রীবসিষ্ঠ বলিতেছেন—'হে রামচন্দ্র! মৃৎপাত্র হস্তে চণ্ডালগৃহমার্গে ভিক্ষার্থে ভ্রমণও শ্রেয়স্কর, তথাপি মূর্খতাকবলিত জ্ঞানবিহীন জীবন কখনও কাম্য নহে।

ন ব্যাধির্ন বিষং নাপত্তথান্যদ্বাপি ভূতলে।

দুঃখায় স্বশরীরোত্থং মৌর্খ্যমেতদ্ যথা নৃণাম্॥ ২৭

পৃথিবীতে ব্যাধি, বিষ, আপদ্ বা অন্য কিছুই পুরুষের এত দুঃখদায়ক হয় না, স্বদেহভব বহির্মুখীনতা যেরূপ হইয়া থাকে।

'যোগবসিষ্ঠসারঃ' গ্রন্থের বৈরাগ্যপ্রকরণ নামক প্রথম প্রকরণ সমাপ্ত। (ক্রমশঃ)

ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি-সংবাদ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

৩

ডাঃ বারোজ এবং ধর্মমহাসভার কর্তৃপক্ষীয়দের এই ধরনের কথাবার্তা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মমহলে স্বভাবতঃই বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, বিশেষতঃ যাঁরা ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে উদ্দীপনা খুবই প্রত্যাশিত। প্রথমতঃ নববিধানের কর্ণধারদের অন্যতম প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ধর্মমহাসভার উপদেষ্টা সমিতির সদস্য হয়েছেন। দশ বৎসর পূর্বে আমেরিকা ভ্রমণ ক'রে, এবং 'ওরিয়েন্টাল ক্রাইস্ট' গ্রন্থ লিখে তিনি সেখানে যশোলাভ করেছেন। খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অতিরিক্ত পক্ষপাত খ্রীস্টান মিশনারীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগকে সহজতর করে তুলেছিল, এবং খ্রীস্টধর্মের আশ্রয়ে সর্ব ধর্মের সম্মিলন প্রস্তাবে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল কেশবচন্দ্র সেন-প্রবর্তিত নববিধানের আদর্শ ধর্মমহাসভায় পূর্তিলাভ করবে। নববিধান সম্প্রদায়ের পক্ষেও ধর্মমহাসভা-উদ্ভূত উদ্দীপনা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মধর্মের এবং কেশবচন্দ্রের প্রভাব তখন বাঙালী সমাজে ক্ষীয়মাণ। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে হিন্দু-সমাজে নূতন জীবনোন্মেষের সূচনা দেখা দিয়েছে—তার তরঙ্গ আঘাত করছে ব্রাহ্মসমাজকে, বিশেষতঃ কেশবপন্থী নববিধানকে। সুতরাং লুপ্ত আশার উদ্ধারের পক্ষে ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠানকে তাঁরা বিশেষ সহায়ক মনে করেছিলেন, যেহেতু সেখানে প্রতাপচন্দ্রকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, এবং নববিধানের আদর্শের সঙ্গে ধর্মমহাসভার ঘোষিত উদ্দেশ্যের ঐক্য আছে।

বৌদ্ধ ধর্মপাল ও তাঁর দলীয় ব্যক্তিগণের উৎসাহের কারণও বোধগম্য। ভারতে উদ্ভূত অথচ জন্মভূমি থেকে উৎখাত বৌদ্ধধর্ম এই সময়ে ভারতে স্থানগ্রহণে সচেষ্ট হয়—ধর্মপাল সেই চেষ্টার নায়কত্ব গ্রহণ করেছিলেন—কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি ধর্মপালের কার্যবাহন। ধর্মপাল ও তাঁর সমর্থকেরা মনে করেছিলেন, ধর্মমহাসভায় তাঁর উপস্থিতি ভারতে বৌদ্ধ পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক হবে। তাছাড়া দেখা যায়, যখন নূতন কোনো আন্দোলন আরম্ভ করা হয় তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সর্ববিষয়ে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেন, প্রচারের কোনো সুযোগেই অবহেলা দেখান না, আর—প্রচারের সুবিধার পক্ষে ধর্মমহাসভা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মঞ্চ অন্য কী হতে পারে?

বৌদ্ধ, এই পরিচয় ছাড়া ধর্মপালের আর একটি পরিচয় ছিল—তিনি একই সঙ্গে থিয়জফিস্ট। ভারতে থিয়জফিস্ট আন্দোলন তখন কাগজপত্রে বিশেষ প্রবল—শিক্ষিত মহলে তার কিছু প্রভাবও ছড়িয়েছে। থিয়জফিস্ট দলে হিন্দু, বৌদ্ধ অনেক সম্প্রদায়ই ছিল। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কর্নেল অলকট ছিলেন বৌদ্ধ। স্বতই বৌদ্ধ ধর্মপালের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতি ছিল (যা পরে অবশ্য ভেঙে যায়)। থিয়জফি মত আবার গুপ্ত বৌদ্ধমতের সঙ্গে

আত্মিক সম্পর্কে যুক্ত—বৌদ্ধমতের গোপন কেন্দ্রভূমি রহস্যময় তিব্বতের 'মহাত্মা'দের উপর নির্ভর করে থিয়জফি দাঁড়িয়েছিল। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মপালের পক্ষে থিয়জফিস্ট হওয়া আশ্চর্য নয়। থিয়জফিস্ট সম্প্রদায়ও ধর্মমহাসভায় উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। নববিধান যেমন দাবি করেছিল তাদের আদর্শেই ধর্মমহাসভা আহূত, ঠিক একই দাবি ছিল থিয়জফিস্টদের, যারা বলত থিয়জফির মধ্যে সর্বধর্মের সমন্বয় ঘটেছে। থিয়জফিস্টরা ধর্মমহাসভায় যোগ দেওয়া ছাড়া ঐ সময়ে চিকাগোয় নিজস্ব পৃথক সমাবেশ ঘটিয়েছিল। অ্যানী বেশান্ত ও জি. এন. চক্রবর্তী ধর্মমহাসভায় থিয়জফিস্টদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

ধর্মপালের সঙ্গে থিয়জফিক্যাল সোসাইটির সম্পর্কের কিছু সংবাদ এখন দেওয়া যায়, পরেও এ প্রসঙ্গ আসবে। থিয়জফিক্যাল সোসাইটির কর্তা কর্নেল অলকট আবার মহাবোধি সোসাইটিরও কর্তা ছিলেন। ঐ সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট তখন এইচ. সুমঙ্গল, জেনারেল সেক্রেটারী এইচ. ধর্মপাল, এবং ডিরেক্টর জেনারেল কর্নেল অলকট।[১] বৌদ্ধধর্মপ্রচারে নিজ উৎসাহের কথা অলকট জানিয়েছিলেন থিয়জফিক্যাল সোসাইটির সপ্তদশ বার্ষিক সম্মেলনে :[২]

'বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে আমার কাজের যে সম্ভাবনা দেখছি, তাতে গত ডিসেম্বর মাসের চেয়েও বেশী উৎসাহ পাচ্ছি আমি। শ্রীসুমঙ্গল, মহানায়ক এবং এইচ. ধর্মপালের সঙ্গে আমি বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবন ও প্রচারের জন্য একটি বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নেমেছি! অবশ্য থিওজফিক্যাল সোসাইটি সমষ্টিগতভাবে এর জন্য দায়ী নয়, বৌদ্ধধর্মের জন্য যা করছি তা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার।'

ধর্মমহাসভার ব্যাপারে মহাবোধি সোসাইটির বিশেষ উৎসাহ থাকলেও তার দ্বারা ভারতবর্ষে কোনো তরঙ্গের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু কিছু ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছিল নববিধান সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের অংশগ্রহণে। ধর্মমহাসভাকে প্রবল উৎসাহে তাঁরা কেন বরণ

১ মহাবোধি সোসাইটির পক্ষে কর্নেল অলকটের কাজ করার অধিকারপত্র মহাবোধির ফেব্রুআরি, ১৮৯৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল :

এই বিজ্ঞপ্তির তলায় এইচ. ধর্মপাল ও এইচ. সুমঙ্গলের স্বাক্ষর ছিল।

"This is to certify that Colonel H. S. Olcott, Honorary Director-General of this Society is fully authorised to treat with all public authorities and private persons whatsoever for the transfer into the custody of this Society, as agent of several Buddhist nations, of the Indian shrines regarded as sacred by Buddhists, and for all other things connected with the work of this Society, and we do hereby grant to the said Col. Olcott whatsoever powers he may need in the premises."

২ I feel even more encouraged with the prospects before me in my Buddhist field of work than I did last December. With Sri Sumangala, Mahanayaka, and H. Dharmapala, I am engaged in a great scheme of Buddhist revival and propaganda, for which, of course, the T. S. (Theosophical Society) is not responsible as a body…I am doing my Buddhist work as a private individual,

করেছিলেন সে কথা আগেই বলেছি; সেটা ছিল অনেকটাই আত্মসংরক্ষণের তাগিদ। সে যাই হোক, পরাধীন জাতির একজন মানুষ ধর্মমহাসভার মত বৃহৎ ব্যাপারের উপদেষ্টা পরিষদে মর্যাদার সঙ্গে গৃহীত হয়েছেন, এতে অবশ্যই কিছু পরিমাণে সাধারণ আনন্দের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে, নববিধানীদের খ্রীস্টধর্মপ্রীতি অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখতেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তো তাদের এই খ্রীস্টধর্মাসক্তির ঘোরতর বিরোধী ছিল, এবং খ্রীস্টানদের বহু প্রশস্তির মূল্যে মজুমদারের ঐ সম্মানপ্রাপ্তি—এমন সন্দেহ থাকাও আশ্চর্য নয়। সে যাই হোক, ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখাগুলি একত্র হয়ে মজুমদারকে অভিনন্দিত করেছিল। এমনকি 'হিন্দু পুনরুত্থানের' অন্যতম নায়ক বিখ্যাত বাঙলা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এ বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

এখানে আমরা মিনিস্টারে ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্যের গুণগান করে, তার সঙ্গে নববিধানের আদর্শের ঐক্য দেখিয়ে যে সব সম্পাদকীয় বেরিয়েছিল, তার কিছু কিছু উপস্থিত করব। প্রতাপচন্দ্রের আমেরিকাগমনের উপরে দীর্ঘ সব সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। ৯ই এপ্রিল সংখ্যায় ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্থন জানাবার পরে লেখা হয়:[৩]

'এ ব্যাপারে আমরা বিশ্ববিধাতা ঈশ্বরের অদ্ভুত কর্মের দ্রষ্টা মাত্র; আধুনিক যুগে নব বিধান স্থাপনে ব্যস্ত তিনি। এ ধরনের একটা ধর্মমহাসভা কেউ ডাকতে পারবে, পঁচিশ বছর আগে তা চিন্তারও অতীত ছিল। এ থেকেই এ মহাসত্যটি উপলব্ধ হয়—"মানুষের কাছে যা অসাধ্য, ঈশ্বর তা করতে পারেন।" আমরা যে বিধানের অন্তর্ভুক্ত, ধর্মমহাসভার কল্পনা সে বিধানের পরিপূর্তিরই সূচনা করছে। আমরা যে বিধানের অন্তর্ভুক্ত, তা যে ভগবদ্-বিধান, এ কথাই প্রমাণ ক'রে এই ঘটনা আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করছে, আমাদের আশা ও আনন্দ বর্ধিত করছে।'

ধর্মমহাসভা যে নববিধানের নবতম বিধান তা মিনিস্টারে এইকালে বহুবার লেখা হবে। পত্রিকাটির পৃষ্ঠাগুলি এইকালে ধর্মোৎসাহে পূর্ণ। ৩০শে এপ্রিল এতে The Chicago Exhibition and the New Dispensation-শীর্ষক যে সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রকাশিত তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি:[৪]

'এই ধর্মমহাসভা ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করবে—যে ধর্মে সব ধর্মই বিদ্যমান

---

৩ We look upon this affair as the wonderful working of the God of providence Who is so busy now to establish the New Dispensation in the present age. A quarter of a century back, who would dream that such a Parliament would be held by any one. This certainly is an instance of the realisation of the great truth; What is impossible with man is possible with God. The idea of the Parliament of Religions is an earnest of a state of things the object of which is the fulfilment of the Dispensation to which we are called. It confirms our faith, increases our hope and intensifies our joy in finding that the faith to which we have been called is divine.

৪ *It will be the beginning of a new era in the history of religion—the first instance of the acceptation by men of that universal religion in which there are all*

প্রাপ্ত হতে চলেছে। যে কেশবচন্দ্র সেন বিশবছরেরও আগে ইউরোপের প্রতি এশিয়ার বাণী ঘোষণা করেছিলেন, তিনি আজ স্থূলদেহে নেই, আজ সুদূর পাশ্চাত্যে তাঁর সে বাণী বহন করার যোগ্যতম ব্যক্তি কে? নববিধানের সর্ববাদিসম্মতিক্রমে প্রতাপচন্দ্রই সেই সুযোগ্য ব্যক্তি।]…

উপদেষ্টা-সমিতির সভ্য পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই মনোনীত হয়েছেন, তাঁদের মোট সংখ্যা ৩,০০০; ভারত থেকে যাঁরা মনোনীত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হিন্দুপত্রিকার সম্পাদক জি. এস. আয়ার, বোম্বাই-এর বি. বি. নাগরকার এবং কলিকাতার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারী ধর্মপাল এবং বোম্বাই-এর জৈন সম্প্রদায়ের হাই প্রিষ্ট মুনি আত্মারামজীর সঙ্গেও সমিতি যোগাযোগ রেখেছেন।'

৩০শে এপ্রিলের সম্পাদকীয়ের শেষাংশে প্রতাপচন্দ্রের মিশন সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছিল, তা আরও বিস্তারিতভাবে লিখিত হল ২৫শে জুনের সম্পাদকীয়তে। প্রতাপচন্দ্রের আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে এটি লেখা হয়। লেখাটির মধ্যে যথার্থই প্রাণের উত্তাপ এবং বলিষ্ঠ আশা ফুটে উঠেছিল, এবং ধর্মসমন্বয়ের প্রেরণার দ্বারা তা স্পন্দিত ছিল। ধর্মমহাসভার মর্মসত্য লেখাটিতে প্রকাশ পেয়েছিল। গোড়ায় প্রতাপচন্দ্র কী গুরুদায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছেন; এশিয়াবাসী হিসাবে ধর্মদানের কী বিরাট ভূমিকা তাঁকে নিতে হবে তা বলা হয়েছিল। ভারতের প্রাণ ধর্মে, সেই ধর্মই ভারত দেবে জগৎকে, প্রতাপচন্দ্র তারই বাহক, তাঁর পাণ্ডিত্য বেশী না থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মাচার্যদের শক্তি তাঁর উপরে ভর করেছে—এসব কথা উত্তপ্ত ভাষায় লেখা হয়েছিল। শেষে বলা হয়:[৮]

'অপর ধর্মের সত্য সম্বন্ধে বলার সময় সবসময়ই তিনি নববিধানের সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত ধর্মসমন্বয়ের ভিত্তিতেই তা বলবেন।

'যীশুখৃষ্টের কথা তাঁকে বলতে হবে, এবং দেখাতে হবে যে তাঁর মধ্যে সবই একীভূত হয়েছে। যীশুর অন্যতম প্রধান শিষ্য পল এই একত্বের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভবিষ্যতে সে ভিত্তির ওপর ধর্মসমন্বয়ের মহাসৌধ-নির্মাণের কাজ পূর্বনির্ধারিত ছিল নববিধানের যাজকের জন্য।' (ক্রমশঃ)

৮ Whenever he will speak of truths of other religions he will speak of them from the standpoint of harmony of all religions as has been revealed in the new Gospel of the New Dispensation.

He will have to speak of Christ and show that all things have been made one in Him. The apostle Paul has laid the foundation of this unity and it was reserved to the Apostle of the New Dispensation to follow his footsteps and complete the great edifice of religious unity.

শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী আদিনাথানন্দ

৬

পূর্ব প্রবন্ধে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে শ্রুতি-বাক্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিলে জগৎ ও জীবের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করা যায় না।

আচার্য বলিতেছেন—

'অতঃ শাস্ত্রেষু ন নির্বিশেষবস্তুপ্রতিপাদনমস্তি। নাপ্যর্থজাতস্য ভ্রান্তত্বপ্রতিপাদনম্। নাপি চিদচিদীশ্বরাণাম্ স্বরূপভেদনিষেধঃ।' শ্রীভাষ্য ১।১৫

"শাস্ত্রে কোথাও ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব (নিগুর্ণত্ব) প্রতিপাদিত হয় নাই। জাগতিক পদার্থের ভ্রান্তত্ব (মিথ্যাত্ব)-ও প্রতিপাদিত হয় নাই। চিৎ, অচিৎ, ঈশ্বর—এই তত্ত্বত্রয় যে স্বরূপতঃ ব্রহ্মসত্তা হইতে পৃথক্ সে বিষয়েও কোথাও নিষেধ করা হয় নাই।"

শ্রীরামানুজাচার্যমতানুসারে অদ্বৈতবাদিগণ সম্মুখে-প্রসারিত বহুত্বের ও বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অধ্যাস বা অবিদ্যাখ্য তত্ত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই অবিদ্যাখ্য তত্ত্বের বিরুদ্ধে সপ্তবিধ অনুপপত্তি উপস্থিত হয়। যথা—আশ্রয় অনুপপত্তি, তিরোধান অনুপপত্তি, স্বরূপ অনুপপত্তি, অনির্বচনীয় অনুপপত্তি, প্রমাণ অনুপপত্তি, নিবর্তক অনুপপত্তি, নিবৃত্তি অনুপপত্তি।

ভারতীয় দার্শনিকগণ প্রপঞ্চাতীত একটি চরম চিন্ময় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। জীব ও জগৎপ্রপঞ্চের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহারা ন্যায়তঃ সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, নৈসর্গিক দৃষ্ট প্রপঞ্চ ঐ চিন্ময় সত্তাকে আশ্রয় করিয়া অস্তিত্ববান হইয়াছে। তাই ইহাকে অধ্যস্ত বলা হয়। এই অধ্যাস প্রাচীনমতে পঞ্চ প্রকার :—

'আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
তথাঽনির্বচনীয়খ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতি-
পঞ্চকম্ ॥'

তন্মধ্যে আত্মখ্যাতি সৌত্রান্তিক, বৈভাসিক ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত। অসৎখ্যাতি শূন্যবাদী বৌদ্ধের, অখ্যাতি প্রভাকরের মত। অন্যথাখ্যাতি ন্যায় ও বৈশেষিক মত। আর অনির্বচনীয়খ্যাতি অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তমত (শ্রীশঙ্কর-প্রতিপাদিত)।

শ্রীরামানুজাচার্য তাঁহার স্বরচিত শ্রীভাষ্যে অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ যেভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাই এই প্রবন্ধে বিবৃত হইবে।

অদ্বৈতমতাবলম্বিগণ অনির্বচনীয় খ্যাতি বলিতে কি বোঝেন তাহা প্রথম জানা দরকার। এই মতে সমস্ত পদার্থই চৈতন্যে অধ্যস্ত। রজ্জু-সর্পের উদাহরণ দিয়া ব্রহ্মে অধ্যস্ত জীব ও জগৎ-প্রপঞ্চের স্বরূপ বোঝান হইয়াছে। রজ্জু অধিষ্ঠান চৈতন্যে অধ্যস্ত। এই রজ্জু-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের উপর একটি অনির্বচনীয় সর্পের মিথ্যা প্রতীতি। এই যে সর্পজ্ঞান ইহাকে অনির্বচনীয় বলা ব্যতীত উপায় নাই। কারণ এই সর্পজ্ঞান সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎও নহে। এই জন্য এই সর্পজ্ঞান মিথ্যা বলিতে হয়। অধ্যস্ত সর্প যদি সৎ হইত তবে রজ্জুর জ্ঞানে উহা বাধিত হইত না। যদি অসৎ হইত তবে বন্ধ্যাপুত্রবৎ উহা কখনও দৃষ্টিগোচর হইত না; এবং ইহার 'অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব' থাকিত না। এই জ্ঞানকে সদসৎ বলা যায় না। কারণ এক বস্তু সম-

কালীন সৎ ও অসৎ গুণযুক্ত হইতে পারে না। আবার এই সর্প অন্যথাখ্যাতিবাদানুসারে অন্য দেশে থাকিতে পারে না। অথবা আত্মখ্যাতি-মতানুযায়ী জীববুদ্ধিতে আছে, তাহাও বলা যায় না। কারণ সম্মুখবর্তী রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি সাক্ষাৎ অনুভবসিদ্ধ। তাই সিদ্ধান্ত পক্ষ বলিতেছেন—সর্পজ্ঞান একটি অনির্বচনীয় সত্তাবিশিষ্ট। যেহেতু কোন যুক্তিসিদ্ধ শ্রেণীবিভাগ (category) দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নহে।

উক্ত উদাহরণ অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন যে, ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে অবিদ্যারূপ দোষবশতঃ জগৎপ্রপঞ্চের অধ্যাস হয়। আর অনাদিরূপে অবস্থিত পূর্ব পূর্ব মিথ্যা জগৎ-প্রপঞ্চের জ্ঞান-বাচ্য সংস্কারই উক্ত রজ্জুতে সর্পাধ্যাসের ন্যায় ব্রহ্মে জগদধ্যাসকালে সহকারী কারণ হয়। ইহা সৃষ্টিদৃষ্টিবাদের মত। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ অনুসারে স্থায়ী অবিদ্যারূপ দোষবশতঃ সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞান জীবরূপে প্রতিভাত ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে তৎকালেই যুগপৎ প্রতিভাত হয়। স্বপ্নই ইহার দৃষ্টান্ত। স্বপ্নকালে যেমন মনে হয় যে, 'গিরিসমুদ্রাদিসমন্বিত জগৎ বহুকাল হইতেই বর্তমান আছে,' বস্তুতঃ কিন্তু তাহা স্বপ্নকালেই উৎপন্ন হয় এবং স্বপ্নভঙ্গেই বাধিত হয়। প্রকৃত দৃষ্টিসৃষ্টিবাদও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহাই সংক্ষেপে অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ।

নব্য ন্যায়ের মতে রজ্জুতে যখন সর্পের ভ্রম হয় তখন প্রথমতঃ 'ইদম্' (ইহা) এইরূপে প্রথম রজ্জুর সামান্য জ্ঞান হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দোষ-বশতঃ রজ্জুত্ববিশিষ্ট রজ্জুর জ্ঞান হয় না। 'ইদম্' এইরূপ সামান্য জ্ঞান হইবার পর বিশেষ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। অতঃপর রজ্জুর সহিত সর্পের সাদৃশ্য থাকে বলিয়া সাদৃশ্যজ্ঞানই উদ্বোধক হইয়া বল্মীকাদি স্থলে পূর্বানুভূত যে সর্প সেই সর্পসংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করে। অনন্তর পূর্বদৃষ্ট সেই সত্য সর্পের স্মৃতি হয়। এই স্মৃতি-জ্ঞানই সন্নিকর্ষ হইয়া বল্মীকাদিস্থিত সত্য সর্পের প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপাদন করে। এই প্রকার যে সন্নিকর্ষ তাহাকে ন্যায় বৈশেষিক মতে জ্ঞান-লক্ষণা নামক অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলা হয়।

এই অলৌকিক সন্নিকর্ষবলে দৃষ্ট ঐ সত্য সর্পের ধর্ম যে সর্পত্ব, পূর্বোক্ত বিশেষ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য 'ইদম্' পদ-বাচ্য রজ্জুতে সমবায় সম্বন্ধে বিশেষণরূপে তাহার ভান হয়; এবং 'এই সর্প'- এই প্রকার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়।

বিজ্ঞানবাদিগণের আত্মখ্যাতিবাদ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ইহারা বলেন—একমাত্র আন্তর বিজ্ঞান বা বুদ্ধি নামক বস্তুই আছে। তদ্ব্যতিরিক্ত বহির্দেশে কোন বস্তুরই সত্তা নাই। এই বিজ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ কিন্তু বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক। প্রত্যক্ষীভূত রূপরসাদিবিশিষ্ট বাহ্য জগৎ পরমার্থতঃ বাহ্য নহে। সমস্তই আন্তর বিজ্ঞান মাত্র। অন্তরেই তাহার প্রতীতি হয়। বস্তুতঃ অন্তর বা বাহ্যবস্তু বলিয়া যাহা কিছু আমরা ব্যবহার করি তাহা আমাদের বুদ্ধি বা বিজ্ঞানেরই আকার মাত্র। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ বাহিরে আছে মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ সবই অন্তরে থাকে।

এই আত্মখ্যাতিবাদ আচার্য শঙ্করমতাব-লম্বিগণ মানিয়া লইতে পারেন নাই। ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য এই মতবাদের দোষ প্রদর্শন করিয়া নির্বিশেষ অবাধিত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মসত্তার প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং জগৎ-প্রপঞ্চের বহির্দেশে অনুভূত জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়া ঐ প্রসঙ্গে অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

এইসব খ্যাতিবাদ সম্বন্ধে শ্রীরামানুজা-চার্যের বক্তব্য পরবর্তী প্রবন্ধগুলিতে আলোচিত হইবে। (ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ঃ 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

কার্ল মার্কস, হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, হেগেলের ইতিহাসদর্শনে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারণাকে মার্কস্ শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করেছেন। স্বভাবতঃই 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো' বা 'সাম্যবাদী ঘোষণা'—পুস্তিকায় মার্কস্ এর ফলে পৃথিবীর ইতিহাসকে বিভিন্ন শ্রেণীর অবশ্যম্ভাবী সংগ্রামরূপে দেখে শেষ অবধি বুর্জোয়া ও প্রোলিতারিয়েত (পরশ্রমজীবী ও শ্রমজীবী) এ দুয়ের সংঘাতে ইতিহাসের বিবর্তনের চূড়ান্ত নির্দেশ দেখতে পেয়েছেন। শ্রমজীবিশক্তি ইতিহাসের অধিনায়কত্ব লাভ করলে এই দ্বন্দ্বের চরম নিরসন হবে এবং সেই সাম্যবাদী শোষণমুক্ত সমাজে মানুষের পার্থিব কল্যাণের সমস্ত বাধা অপসারিত হবে—এ বিষয়ে মার্কস্ নিঃসন্দেহ। অপার্থিব বা আধ্যাত্মিক কল্যাণকে মার্কস্ সুবিধাভোগী শ্রেণীর চতুর কল্পনামাত্র মনে করতেন। সুতরাং তাঁর দৃষ্টিতে অর্থ নৈতিক বিবর্তনের উপর নির্ভরশীল জড়বাদী সমাজ-ব্যাখ্যাই বৈজ্ঞানিক। হেগেলের মতবাদ থেকে সব আধ্যাত্মিক "কুয়াশা" দূরীকরণই তাঁর লক্ষ্য।

'বর্তমান ভারতে' স্বামীজী যেভাবে ইতিহাসের যুগবিভাগ করেছেন, তার সঙ্গে মার্কসের চিন্তাধারার তুলনামূলক বিচারে সুবিধার জন্য 'সাম্যবাদী ঘোষণা'—পুস্তিকার ইংরেজী সংস্করণের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি—In ancient Rome we have patricians, knights, plebians, and slaves ; in the Middle ages there were feudal lords, vassals, guild masters, journeymen, apprentices and serfs ; in almost all of these classes, again, subordinate gradations.[১]

শোষক ও শোষিতের দল পৃথিবীর ইতিহাস জুড়ে কখনো প্রকাশ্যে কখনো গুপ্ত-ভাবে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে লিপ্ত। এ সংগ্রাম কখনো সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর সাধন করেছে, কখনো বা বিবদমান দু'পক্ষকেই ধ্বংস করেছে। তবে এ সংগ্রাম চিরকালই পৃথিবীতে ঘটে আসছে—এই ছিল মার্কসের অভিমত।[২] শ্রেণীসংগ্রামের চরমপরিণতিতে সাম্যবাদী যুগে মানুষের সর্বাত্মক উন্নতির মূলে

---

১ The Communist Manifesto : Marx-Engels : Pelican Edition. 1970 p. 80

এক্ষেত্রে স্মরণীয়, এই ঘোষণাটির মূল পরিকল্পনা ও রচনা মার্কসের পরবর্তীকালে মার্কস্ ও এঙ্গেলস্—দুই বন্ধুর নামে প্রকাশিত। প্রাসঙ্গিকবোধে একটু বিস্তৃতভাবে ঘোষণাপত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি—"আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। ভূতপূর্ব ঐতিহাসিক যুগগুলিতে প্রায় সর্বত্র আমরা দেখি সমাজে বিভিন্ন বর্গের একটা জটিল বিন্যাস, সামাজিক পদ-মর্যাদার নানাবিধ ধাপ। প্রাচীন রোমে ছিল প্যাট্রিশিয়ান, যোদ্ধা, প্লিবিয়ান এবং ক্রীতদাসেরা। মধ্যযুগে ছিল সামন্ত প্রভু, অনু-সামন্ত, গিলড-কর্তা, কারিগর, শিক্ষানবিশ কারিগর এবং ভূমিদাস। এই সব শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে আবার আভ্যন্তরীণ স্তরভেদ।"

(প্রগতিপ্রকাশন, মস্কো থেকে প্রকাশিত, ১৯৬৮ সংস্করণের অনুবাদ)

অর্থনৈতিক সমবণ্টন ও প্রয়োজনানুরূপ আর্থিক অধিকার। মার্কস্ ও এঙ্গেলস মনে করতেন যে, তাঁদের সমকালীন যুগে শ্রেণীসংগ্রাম সরলীকৃত হয়ে বুর্জোয়া এবং প্রোলিতারিয়েত এই দুই দলের সংগ্রামে পর্যবসিত।

"সাম্যবাদী ঘোষণা" পুস্তিকায় অর্থনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাসকে একীকৃত করে মার্কস্ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, পরবর্তীকালে সে সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারা আরো যুক্তিমূলক সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়। "ক্রিটিক অফ পলিটিকাল ইকনমি" ("রাজনৈতিক অর্থনীতির বিচার")-গ্রন্থের ভূমিকায় মার্কস্ সভ্যতার বিবর্তন-বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন—"In the social production which men carry on they enter into definite relations that are indispensable and interdependent of their will ; these relations of production correspond to a definite stage of development of their material powers of production. The sum-total of these relations of production constitutes the economic structure of society—the real foundation on which rise legal and political superstructures and to which correspond definite forms of social consciousness. The mode of production in material life determines the general character of the social, political and spiritual processes of life. It is not the consciousness of men that determines their existence, but on the contrary, their social existence determined their consciousness." "সামাজিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে মানুষ এমন কতকগুলি সম্বন্ধে এসে উপনীত হয়, যা তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার পক্ষে অপরিহার্য ও পরস্পর-সম্বন্ধের উপরে নির্ভরশীল। এই সম্বন্ধগুলি তাদের বস্তুগত উৎপাদনশক্তির উন্নয়নের একটি বিশেষ ধাপ তৈরি করতে সাহায্য করে। উৎপাদনের এই মিলিত শক্তিগুলিই সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সৃষ্টি করে—যে বনিয়াদের ভিত্তিতে আইনগত ও রাজনীতিগত অন্যান্য ধাপগুলি গড়ে ওঠে, আবার এদেরই উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে সমাজের নির্দিষ্ট আদর্শচেতনা। জীবনের বস্তুগত উৎপাদনের পদ্ধতির উপরেই সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ধারাগুলি গড়ে ওঠে। মানুষের চৈতন্য তার অস্তিত্বের নিয়ামক নয়, বরং উল্টো করে বলা যায়, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চৈতন্যের নিয়ামক।"[৩]

সুতরাং মার্কসের মতে আমাদের সভ্যতার উপরিতলার যা সামগ্রী—সামাজিক আদর্শ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, এমন কি আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা—এ সমস্তই সমাজের উৎপাদনশক্তির উপর নির্ভরশীল। বস্তুগত প্রয়োজনের ভিত্তিতেই সভ্যতার যা কিছু বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত মার্কস্ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আমাদের বস্তুগত প্রয়োজনই চৈতন্যশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে, চৈতন্য কখনো বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করে না।

মানব-চেতনার ইতিহাসে বস্তুগত নির্ভরতার মূল্য স্বীকার করেও প্রশ্ন করা যায়,

২ Communist Manifesto : Marx

৩ Critique of Political Theory ; Preface : Eng. Trans. by N. I. Stone : pp 11. দ্রষ্টব্য : A History of Political Theory : Sabine

বস্তুকে নিয়ন্ত্রণের এই বুদ্ধি মানুষ পেল কি করে? পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার তারতম্য নির্ধারিত হয় বস্তুর উপরে নিয়ন্ত্রণের তারতম্যের দ্বারা। আধুনিককালে যে-সব জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে, তাঁদের দেশের বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, আধ্যাত্মিকতা—এসব কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে মানুষেরই মন। সে মন একদিকে যেমন মারণাস্ত্র তৈরি করে, আর একদিকে তেমনি বিশ্বকল্যাণে আত্মদানের আহ্বান জানায়। বস্তুর আধিপত্য থেকে মানুষের আধিপত্যে আসার সাধনাই বিজ্ঞানের জন্ম-ইতিহাস, আবার মানবচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশে মানুষেরই মধ্যে অনন্ত শক্তির নিহিত ভাণ্ডার উপলব্ধিতে বেদান্তের আবির্ভাব। সুতরাং বিজ্ঞান ও বেদান্তের শুভ সম্মেলনে যে নূতন সভ্যতার সৃষ্টি, তাতেই মানব-সভ্যতার পরিপূর্ণতা সম্ভব।

বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পাঠকেরা এ বিষয়ে স্বামীজীর তথা ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার বক্তব্য এইভাবে লক্ষ্য করতে পারেন—"একটা কথা বুঝে দেখ। মানুষে আইন করে, না আইনে মানুষ করে? মানুষে টাকা উপায় করে, না টাকা মানুষ করতে পারে? মানুষে নাম-যশ করে, না নাম-যশে মানুষ করে?"[৪]

দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যপরিক্রমাকালে স্বামীজী য়ুরোপ ও ভারতের নেতৃত্বশক্তির তুলনামূলক আলোচনাকালে মন্তব্য করেছেন—"ও তোমার 'পার্লামেণ্ট' দেখলুম, 'সেনেট' দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান পুরুষরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল। তবে ভারতবর্ষে শক্তিমান পুরুষ কে? না—ধর্মবীর। তাঁরা আমাদের সমাজকে চালান। তাঁরাই সমাজে রীতি-নীতি বদলাবার দরকার হ'লে বদলে দেন। আমরা চুপ করে শুনি আর করি। তবে এতে তোমার বাড়ার ভাগ ঐ মেজরিটি ভোট প্রভৃতির হাঙ্গামাগুলো নেই, এই মাত্র।

"অবশ্য ভোট ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের যে একটা শিক্ষা হয়, সেটা আমরা পাই না, কিন্তু রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নেই। সে ঘুষের ধুম, সে দিনে ডাকাতি, যা পাশ্চাত্যদেশে হয়, রামচন্দ্র! যদি ভেতরের কথা দেখতে তো মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে।"[৫]

ভারতীয় নেতৃত্বে এই ধর্মচেতনার আন্তরিকতার উদাহরণরূপে আধুনিককালে মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের কথা স্মরণীয়। কিন্তু ধর্মচিন্তার বিকৃতরূপ সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষবিষে সমাজ, দেশ ও জাতির কী সমূহ ক্ষতি হতে পারে তাও আমাদের অজানা নয়। বাস্তবিক ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণপ্রয়াস অনেক সময় সুফলের চেয়ে কুফলই এনেছে। তাই ধর্মীয় নেতৃত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মূল পার্থক্য স্মরণে রেখে এ বিষয়ে অগ্রসর হ'তে হ'বে।

পাশ্চাত্যে গণতন্ত্রী শাসনপদ্ধতির যে স্বরূপ স্বামীজী উন্মোচন করেছেন, তার সঙ্গে তুলনা-মূলক বিচারে আজকের সাম্যবাদী দেশগুলিতে জনগণের নাম করে যে-সব দলনেতা সমস্ত দেশের শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখছেন, তাঁদের ভূমিকাও বিশেষভাবে বিচার্য। বস্তু-কেন্দ্রিক জীবনদর্শন ক্ষমতার প্রলোভনকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না ব'লেই সাম্যবাদী

৪, ৫ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : পৃঃ ১৬২-১৬১

দেশগুলির নেতৃবৃন্দের মধ্যে ক্ষমতালাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এত তীব্র এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলভোগী হয় লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ—যারা রাজনীতির দাবাখেলায় 'বড়ে' হিসাবে অন্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় পরিচালিত। ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বৈশ্যদাসত্বের জায়গায় এখন দলতান্ত্রিক সাম্যবাদের সর্বগ্রাসী ক্ষমতামত্ত নেতৃত্বের দাসত্ব।

পৃথিবীর ইতিহাসে পুরোহিত, রাজা, বণিক বা শ্রমিক—যে কেউ সর্বসাধারণের অধিকারকে নিজের ব্যক্তিগত বা দলগত অধিকারে পরিণত করতে চাইবে, তারই ভবিষ্যৎ পতন অবশ্যম্ভাবী। মার্কস্ শ্রমজীবীদের প্রতি তাঁর অপরিমেয় সহানুভূতিতে একথা ভুলে গিয়েছিলেন যে, শুধুমাত্র কায়িক শ্রমই সভ্যতার ধারক ও বাহক নয়। নেতৃত্ব, বিবেচনা, আদর্শবাদ—এ সব কিছুই কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই। মার্কস্ নিজেও কি মৌলিক অর্থে শ্রমজীবী? পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবিরূপেই তাঁর স্থান। চলমান সভ্যতার ইতিহাসে কোনো বুদ্ধিজীবীর মস্তিষ্কসঞ্জাত দর্শনই শেষ দর্শন নয়। শ্রমিকশক্তির নেতৃত্ব সম্বন্ধে অতিরিক্ত আস্থাপরায়ণ মার্কস্ বোধ হয় ভেবে দেখেননি যে, এই শ্রমিকদের নাম করেই একদল শক্তিমান দেশ ও জাতির নবদাসত্ব সৃষ্টি করতে পারে। একহিসাবে এই নবপ্রভুরা আরও মারাত্মক এই জন্য যে, এঁদের প্রভাব কেবল স্বদেশেই আবদ্ধ নয়, গোটা পৃথিবীর মানুষকেও সম্মোহিত করতে পারে। পৃথিবীর শ্রমিকদের নাম করে বিশেষ বিশেষ দেশের দলপতিরা সবচেয়ে বড়ো একনায়কত্বের অধিকারী হতে চান। স্বভাবতঃই সাম্যবাদী দেশগুলির ভিতরেই এই একনায়কত্বের বিরোধী মনোভাব দেখা দিয়েছে—ক্রমে তা ইতিহাসের নিয়মেই প্রসারিত হ'বে।

হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থে ইতিহাসের লক্ষ্য হিসাবে যে সমাজতত্ত্বের কথা ঘোষণা করেছেন, তার সঙ্গে মার্কসের গণসচেতনতার কিছুটা মিল রয়েছে। দু'জনেই সমাজের উচ্চশিখরের পরিবর্তে মূল ভিত্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৬] কিন্তু সমাজ-ইতিহাসের বিবর্তনে মার্কস্ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে প্রায় বিসর্জন দিয়েছেন। স্পেন্সারের লক্ষ্য সমাজ-ইতিহাসের বিবর্তনে ব্যক্তির চরম বিকাশ।[৭] (ক্রমশঃ)

---

৬ "যথার্থ ইতিহাস অতি অল্পসংখ্যক পুস্তকেই পাওয়া যায়। পূর্বে প্রজারা রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে অতি অল্পই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইত। অতএব ঐতিহাসিকেরা তাহাদের প্রায় কোন প্রসঙ্গই করিতেন না। আধুনিক প্রজাদের ক্ষমতা দিন দিন পরিবর্ধিত হইতেছে। লোকে প্রজারাই রাজ্যের সর্বস্ব, একথা ক্রমে বুঝিতেছে, সুতরাং আধুনিক ইতিহাসে ক্রমে ক্রমে তাহারা স্থান পাইতেছে। বাস্তবিক, ইতিহাস সমাজের জীবনবৃত্তান্ত।"—স্বামী বিবেকানন্দ-অনূদিত হার্বার্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন' (শিক্ষা'): ইংরেজী মূল প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৩৪; বাংলা অনুবাদ: বসুমতী প্রকাশিত 'শিক্ষা' [শশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত সংস্করণ] পৃঃ ৩২ দ্রঃ

৭ Man versus the State : Spencer :

বর্তমান যুগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীসুরথনাথ সরকার

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও জীবন আলোচনা করি আমরা। কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হয়ে যায় এখানেই, পাথরের দেয়ালে কোন দাগ লাগে না। একটু পরেই ভেসে যাই গতানুগতিকতার নিত্যস্রোতে। ভুলে যাই সব কথা। সে জন্যেই বুঝি শিয়রে শমন এসে দাঁড়িয়েছে। আজ সত্যি আমাদের ঘোর দুর্দিন। আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন, মন দ্বিধাগ্রস্ত ও সংশয়াকুল। দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা সেটা বুঝতেও পারছিনে। আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন গভীর আত্মবিশ্লেষণের এবং সে বিশ্লেষণে যা ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য বলে মনে হবে, তা কাজে করার। শুধু চীৎকার ক'রে কোন ফল হবে না।

আজ দেশের তথাকথিত নেতারা উচ্চতর রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। দল আর উপদলের কোন্দলে নানা অশান্তি এবং তাতে প্রভূত শক্তি ও জীবনের অপচয় ঘটছে। যুবশক্তি আজ দিশেহারা। কে তাদের সঠিক পথের সন্ধান দেবে? আমরা প্রায় সবাই ভাবের ঘরে চুরি করতে ব্যস্ত। ত্যাগতপস্যাবিহীন হয়ে, আদর্শজীবনহীন হয়ে কেবল নীতিকথার আড়ালে আত্মরক্ষার প্রয়াসী। ফলে আমরা সাহস হারিয়ে সন্ত্রস্ত; এ সবই ঘোর তমোগুণের লক্ষণ। অথচ একেই নবজাগরণের নাম দিয়ে আমরা আত্মপ্রসাদলাভের চেষ্টা করছি।

মানুষ আজ বিজ্ঞানবলে অসাধ্য সাধন করছে। বাহ্যজগৎ-জয়ের পথে সে অনেকদূর এগিয়েছে। মহাশূন্যে চলছে মানুষের আনাগোনা। কিন্তু অন্তর্জগতে মানুষ হয়ে পড়ছে দেউলিয়া। আমরা চাঁদে পৌঁছেছি কিন্তু মাটির পৃথিবীকে ভুলতে বসেছি। আমাদের জাতীয়তাবোধ নেই, অথচ আন্তর্জাতিকতার নামে মাতামাতি করি। আমরা প্রতিবেশীকে ভালবাসতে পারি না, অথচ বিশ্বপ্রেমের কথা বলি। এ যুগের সব কিছুতেই যেন খাপছাড়া বাড়াবাড়ি। বুদ্ধির অতিরিক্ত প্রয়োগে হৃদয়-বৃত্তি শুকিয়ে যাচ্ছে, উভয়ের সামঞ্জস্যের কোন চেষ্টা নেই। এখানেই প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতার, যাকে যুগোপযোগিরূপে তুলে ধরে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কথাটা শুনলে অনেকেই মুখ ঘোরাবেন, জানি। তবু বিষয়টি নিয়ে একটু ভেবে দেখতে দোষ কি?

বর্তমান সমাজের লক্ষ্য কি? আদর্শ যাই হোক, বোধ হয় বলা যায়, বর্তমান সমাজ তথা সভ্যতার লক্ষ্য দেহসর্বস্বতা। দেহের চাহিদা মেটানোই যেখানে প্রধান, সেখানে ঈশ্বর, পরলোক এ সব গৌণ। বরং ধর্ম মানুষকে আফিং-এর মতই ঘুম পাড়াবার বস্তু—এ চিন্তায় প্রভাবিত লোকের সংখ্যাই আজ বেশী—অন্ততঃ কার্যক্ষেত্রে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সভ্যতার অগ্রগমন হচ্ছে না কেন? কেন হানাহানি, দ্বেষ, ঘৃণা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে? এর উত্তর খুঁজবার আগে আরো একটা কথা ভেবে দেখা দরকার। আমাদের অনেকেরই ধারণা বর্তমান যুগে বিজ্ঞানই মানুষকে ধর্ম-বিমুখ করেছে। কথাটা অর্ধ সত্য। আসলে যুগোপযোগী ধর্ম—যা বিজ্ঞানের সত্যবিরোধী নয়, যা সাম্যের বিরোধী নয়, বরং বিজ্ঞানের চেয়ে সত্যসন্ধানের পথে আরো বেশী অগ্রগামী

এবং সাম্যস্থাপনে অধিকতর সহায়ক—তাঁরা খুঁজে পান না। ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও গুণ্ডামি দেখে দেখে লোকের ধর্মের প্রতি বীতস্পৃহ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বর্তমান বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতার যুগে আধুনিক সভ্যতার অবদান দিয়ে 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর' এটা যেমন আশা করা বৃথা, তেমনি প্রাচীন তপোবনের মানসিকতাকে বাদও দেওয়া চলে না। শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন—নবাবী আমলে বাদশাহী মুদ্রা চলে না। তাই যুগোপযোগী ধর্মের প্রচার প্রয়োজন। এ যুগে ধর্মের রূপ হবে বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিমূলক এবং জনকল্যাণকর। ধর্মের মূল সত্য চিরদিনই তাই, তাকে উপস্থাপিত করতে হবে নবযুগের চিন্তার আধারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই-ই করে গেছেন—বিশ্বজীবনে তাকে প্রয়োগ করার বিস্তারিত বিধি দিয়েছেন বিবেকানন্দ। সে ধর্ম হল যা মানুষকে মানুষ করে, তাকে দেবত্বে উন্নীত করে এবং যা সবরকম দুর্বলতা দূর করে। সে ধর্মের অবস্থান শুধু দেবালয়ে নয়, অরণ্যের নির্জনতায় নয়, চলমান জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। রাষ্ট্রে, সমাজে, বিদ্যায়তনে, ক্ষেত-খামারে, কলকারখানায় সর্বত্রই তার অনুস্যূতি। শুধু পরকালের নয়, ইহলোকেরও উন্নতির মন্ত্র এতে নিহিত। সে ধর্ম মানুষের মনুষ্যত্ব, চরিত্র ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশে সহায়তা করে, অভীঃমন্ত্রে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। যে অপার স্বাধীনতার, প্রচণ্ড নির্ভীকতার, উত্তুঙ্গ মনুষ্যত্বের বিকাশ ও প্রসারসাধন দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঘটেছিল, জগতে তার তুলনা বিরল। অথচ সবই ঘটেছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে। আধুনিক চিন্তার অবিশ্বাস, সংশয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি সব কিছুরই তীক্ষ্ণ ছুরিকা দিয়ে চিরে চিরে বিশ্লেষণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে বিকশিত সেই ধর্মকে যাচাই করে নেওয়া হয়েছিল সেখানে। সব দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রচারিত ধর্ম সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক, যুক্তিমূলক এবং এ যুগের উপযোগী।

আমাদের বর্তমান দুঃখদুর্দশার কারণ হিসেবে অবশ্য নানা মুনি নানা মত ব্যক্ত করছেন। কেউ অর্থনীতিকে, কেউ বা সমাজনীতিকে, কেউ বা রাষ্ট্রনীতিকে এর জন্য দায়ী করছেন। একটা জিনিস আজ দেখা যাচ্ছে, মতের জোরের চেয়ে গায়ের জোরে আদর্শ-প্রচারের প্রচেষ্টাই বেশী। প্রত্যেকেরই যেন ভাব, "আমার মত এবং নেতৃত্বে যদি শান্তি না আসে তবে অমন শান্তিতে দরকার নেই।" ফলে এই সর্বনাশা সংঘাতের উদ্ভব।

মানুষের জীবনের দুটি ধারা—ভোগ এবং ত্যাগ। তা ছাড়া দেহের ও মনের দু রকম ক্ষুধা রয়েছে। এই উভয়ের অসামঞ্জস্য দূর করতে হবে। পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যায়—দুদিকে দুটি বিপরীত ছবি। একদিকে দারিদ্র্য ও রিক্ততা; অপর দিকে ঐশ্বর্যের ঘটা। অথচ কোন দিকেই শান্তি নাই। যারা রিক্ত তারা ঈশ্বরকে রুটিরূপে দেখতে চাইবে এটা স্বাভাবিক। যারা প্রাচুর্যে ভরপূর তারা কিভাবে সময় কাটাবে বুঝতে পারছে না। তা হলে দেখতে হবে মানুষ কী চায়। কী চায় সে তা জানে না। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা এ বিষয়ে ভেবেছিলেন। তাঁরা বলেন —মানুষ চায় সৎ, চিৎ, আনন্দ। মানুষ কামনা করে অক্ষয় সত্তা, পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং অফুরন্ত আনন্দ। তা কিভাবে পাওয়া যেতে পারে তার উত্তরে তাঁরা বলেছেন "আত্মানং

বিদ্ধি"। নিজেকে জান, আত্মজ্ঞান লাভ কর—সব জানা ও পাওয়ার শেষ হবে। আমাদের বর্তমান সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজার সময় কেন্দ্রে রাখতে হবে এই সত্যকেই।

আমাদের চেষ্টা হবে সব কিছুকে আত্ম-বিকাশের অনুকূল পথে চালিয়ে নেবার। শিক্ষায়, দীক্ষায়, কার্যে সর্বত্র জাতীয় ভাবধারার বিকাশ চাই। মানুষকে সবার উপরে রাখতে হবে; তবে তাকে দেহমাত্র ভেবে নয়, আসল মানুষটিকে চিনে তাকে। মানুষ ঠিক হলেই সমাজ ঠিক হবে। মানুষ যত উন্নত হবে, সমাজও হবে তত উন্নত।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শনই বস্তুতঃ ভাবী মানব-সমাজের চিরন্তন শান্তির উৎস। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়েছেন সেই পথ, যেখানে ত্যাগই পাথেয়, বৈরাগ্যই সহায় এবং আন্তরিকতাই একমাত্র উপায়। "সর্বভূতে ব্রহ্ম-বোধ"—এ শুধু কথার কথা নয়, তাঁর কাছে এ ছিল নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করা সত্য। তাঁর "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"-র মধ্যেই নিহিত রয়েছে আধুনিক সমস্যার সমাধান।

আজ জড়শক্তির চাপে ধর্মগত প্রাণ ক্ষীণ-প্রায়। মানুষের প্রত্যয় শিথিল। আত্ম-প্রত্যয় নেই, ভগবদ্‌বিশ্বাস তো দূরের কথা। সর্বগ্রাসী এক অস্থিরতা মানুষকে পেয়ে বসেছে, জানি না কিভাবে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। তবে ঠাকুরের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী যাঁরা তাঁদের নিষ্ঠাভরে এগিয়ে যেতে হবে। এ দুর্যোগের অবসান হবেই। আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণপূজা সার্থক হবে যদি আমরা তাঁর পবিত্র দিব্য জীবনের অনুধ্যান করে নিজ নিজ জীবনে যথাসাধ্য তা রূপায়িত করতে পারি। জীবনে তাঁর আদর্শের রূপায়ণই বর্তমান যুগের সমস্যা-সমাধানের পথ। যাদের নিয়ে সমস্যা, সেই মানুষ যদি 'মানুষ' না হয়, জাগতিক উন্নতি যতই হোক না, সমস্যা কোনদিন মিটবে না।

"সকলকে সমানভাবে ভালবাসার নাম দয়া।"

"সব দেশের সব ধর্মের সব লোককে ভালবাসা—এটি দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

নব্য জীবনবেদের কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুহীনতার সংকেত ঃ

নববেদান্ত আর একভাবে ব্যক্তির ও সমাজের জন্য দ্বন্দ্বসংঘাতের মীমাংসা দ্বারা সমাজসম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত করে। তা হলো মৃত্যুহীনতার সংকেত-জ্ঞাপনের মাধ্যমে। বেদান্ত বলে, আত্মা অবিনশ্বর। সুতরাং আতঙ্কিত হয়ে ভোগকার্য সম্পন্ন করবার তৎপরতার প্রয়োজন নেই। পূর্ণতর জীবনের অভিযানে সকল দৈহিক সুখ, ক্ষুদ্র স্বার্থপ্রণোদিত সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিতে হবে।[২৯] সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই তত্ত্বের তাৎপর্য হ'লো 'ত্যাগ ও সেবা'র (renunciation and service) মাধ্যমে সম্প্রসারণের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, এবং সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় ত্যাগ ও সেবাকে সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য (mutual and social aid) বলে বর্ণনা করা যায়।

নব্যবেদান্ত সম্বন্ধে সংশয়বাদ

অভিযোগকারীরা এইরকম প্রশ্ন করে থাকেন : "নব্যবেদান্তের ব্যাখ্যায় হিন্দুধর্মের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে স্বামী বিবেকানন্দ কি অন্যান্য ধর্মোপাসকদের খানিকটা উপেক্ষা করেননি, এবং ফলে কিছুটা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেননি ?" আপাতদৃষ্টিতে অভিযোগটি গ্রাহ্য হলেও যখন নব্যবেদান্তের বাণী ও জীবনদর্শনের পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয় তখন অভিযোগটির যৌক্তিকতা বা সত্যতার ক্ষীণতম রূপও বজায় থাকে না। বেদান্ত-উপাসক হিসাবে স্বামীজী অবশ্যই হিন্দু ছিলেন। কিন্তু মাত্র হিন্দুদের জন্যই তিনি বেদান্ত প্রচার করেননি। আরও সুস্পষ্টভাবে ব'লতে গেলে, 'বেদান্ত' শব্দটি দ্বারা তিনি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম (communal religion) নির্দেশ করেননি। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র বেদান্তই ভবিষ্যতে মানবজাতির চিন্তাশীল অংশের ধর্ম বলে পরিগণিত হবার যোগ্য। বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ ব্যাখ্যা করবার সময় স্বামীজী ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি এমন এক ধর্ম প্রচার করতে চান, যা হবে সকলের কাছে সমভাবে গ্রহণীয়, যা হবে সমভাবে দার্শনিক তত্ত্বের, ভাবাবেগের, ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানের এবং কার্যোপযোগিতার দ্যোতক। এবং এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলেন যে, একমাত্র বেদান্তই উল্লিখিত গুণসমন্বিত; সুতরাং একমাত্র বেদান্তই বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম বা 'ধর্মের বিজ্ঞান' (science of religion)[৩০] বলে লক্ষ্য হ'তে পারে। উপরন্তু তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এবং এ বিষয়ে স্বীকার করতে মোটেই তাঁর কুণ্ঠা ছিল না যে, ব্যবহারিক জীবনে হিন্দুদের চেয়ে ইসলামধর্মাবলম্বীরাই বেদান্তকে বেশী উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছে। সাম্যবাণী-প্রচারক হিসাবে ইসলামধর্মের

২৯ Nivedita : Sociological Aspects of the Vedanta Philosophy

৩০ The Mission of the Vedanta

প্রবর্তক হজরত মহম্মদের উপর তঁার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। এখানে মুসলমান বন্ধুকে লেখা পূর্বোল্লিখিত পত্রটি থেকে আরও কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। স্বামীজী লিখেছিলেন:

"Whether we call it Vedantism or any other ism, the truth is that Advaitism is the last word of religion and thought and the only position from which we can look upon all religions and sects with love. We believe it is the religion of future enlightened humanity. The Hindus may get the credit of arriving at it earlier than other races, they being an older race than the Hebrew and the Arab; yet practical Advaitism which looks upon and behaves towards all mankind as one's own soul, was never developed among the Hindus.

"On the other hand, our experience is that if any religion apppoached towords equality in an appreciable manner, it is Islam and Islam alone. Therefore I am firmly persuaded that without the help of practical Islam, theories of Vedantism, however fine and wonderful they may be, are entirely valueless to the vast mass of mankind⋯."

অতএব স্বামীজীর মতে, ভারতের দুইটি প্রধান ধর্মমতের সমন্বয় ও ধর্মসম্প্রদায়ের মিলনের পন্থা হ'লো হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবনে বেদান্তের বাণী—সাম্য ও ঐক্যের প্রতিফলনের ব্যবস্থা করা এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের পশ্চাতে নিহিত নীতির তাৎপর্য তুলে ধরা। ঐ একই চিঠিতে এ-বিষয়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন: "For our motherland a junction of two great systems, Hinduism and Islam—Vedanta brain and Islam body—is the only hope." এই সমন্বয়, এই মিলন যে ঘটবে এ-বিষয়ে তঁার আশাও ছিল সমভাবে প্রবল। তাই পত্রখানির উপসংহার করেছেন এই বলে: "I see in my mind's eye the future perfect India rising out of this chaos and strife glorious and invincible, Vedanta brain and Islam body."[৩১]

শুধু পত্রালাপরূপেই নয়, কর্মক্ষেত্রেও স্বামীজী সর্বদা এই সমন্বয়ের পথ অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু যীশুখৃষ্টের মত [৩২] তঁারও সেবাধর্মে (religion of service) সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার লেশমাত্র নেই। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আশ্রমে মুসলমান বালকদেরও আশ্রয় দিতে হবে। প্রাচীন প্রথার দিকে তাকিয়ে তাদের জন্য আলাদা রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন মাত্র। মুসলমানদের পৃথক রাখার বিরুদ্ধে তঁার ছিল জীবনব্যাপী জেহাদ। অমরনাথ থেকে ফেরার পথে তিনি মুসলমান পাচক নিয়োগ করতে যাচ্ছিলেন। শেষপর্যন্ত যখন দেখলেন যে, তাতে অন্য তীর্থযাত্রীরা ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, মাত্র তখনই তিনি ব্রাহ্মণ পাচকের নিয়োগে স্বীকৃত হন। [৩৩] ভগিনী নিবেদিতা-

---

৩১ Supra

৩২ Luke 10,30-37

৩৩ Nivedita: Notes of Some Wanderings

প্রদত্ত বিবরণী থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, শিখভূমি পঞ্চনদীর দেশে—যে দেশের লোক তাঁর মধ্যে গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের এক বিরল সমাবেশ লক্ষ্য করেছিল, তিনি প্রকাশ্যেই মুসলমানদের হাতে খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন।[৩৪] ঐ বিবরণী থেকেই আবার জানা যায় যে, স্বামীজী যখন ভারতের অতীত ঐশ্বর্যের বর্ণনা করতেন তখন তিনি হিন্দুদের মত মুসলমানদের অবদানের উপর সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করতেন।[৩৫] পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় যে স্বামীজী নিজে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি তাঁর কর্তব্যভার রাজা রামমোহনের জীবন থেকে গৃহীত যে তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে স্থাপিত করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হলো হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতি সমানুরাগ (the love that embraced the Mussalman equally with the Hindu.)[৩৬]

অতএব, স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় চেতনাকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক খাতে প্রচারিত করেছিলেন—এই অভিযোগ বেদান্তের বাণীর ভ্রান্ত ব্যাখ্যারই ফল। একথা সত্য যে স্বামীজী কোন ধর্মসার-প্রচার বা জোড়াতালির ভিত্তিতে ধর্মসমন্বয়ের প্রচেষ্টা করেননি। সত্যসন্ধানই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। সত্য বলতে তিনি বুঝেছিলেন বহুত্বের মধ্যে ঐক্য—যে ঐক্যকে উপলব্ধি করতে হবে বহুকে অতিক্রম করে। প্রেমপূর্ণ সেবার দ্বারা মানুষকে তার আত্মার উদ্বোধনে সহায়তা করেই এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনয়ন করেন তাঁরা নয়াবেদান্তের এই শিক্ষাকেই উপেক্ষা করেন কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, ধর্মসারপ্রচার ক্ষণস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে মাত্র; ফলে এই পথকে সত্যের পথ বলে গ্রহণ করা চলে না। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য যাঁর ছিল নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত সেই গান্ধীজীও খিলাফত আন্দোলনের পর বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। খিলাফত আন্দোলনের উৎসব স্তিমিত হ'তে না হতেই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধলে সম্প্রদায় দুটির পুনর্মিলনের প্রচেষ্টায় গান্ধীজী একুশ দিনের অনশনব্রতে ব্রতী হন। অনশনকালে তিনি তাঁর Young India পত্রিকায় নিম্নোক্ত মন্তব্যটি করেন:

"I believe in the absolute oneness of God and therefore also of humanity. What though we have many bodies? We have but one soul. The rays of the sun are many through refraction. But they have the same source."[৩৭]

মাত্র এই বিশ্বাসের প্রচারই আধ্যাত্মিকতাকে উদ্দীপ্ত করে একত্বের পথ প্রস্তুত করতে পারে, এবং এ বিশ্বাস হলো বেদান্ত-পূজারীর বিশ্বাস যা জন্মগ্রহণ করে প্রত্যক্ষানুভূত জ্ঞান থেকে। অতএব, হিন্দু-মুসলমান-মিলন-যজ্ঞের সর্বপ্রধান পুরোহিত শেষপর্যন্ত বেদান্তেরই আশ্রয় গ্রহণ করলেন। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবপ্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্তী সময়ে

৩৪ The Master

৩৫ Ibid: also Reminiscences of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Admirers

৩৬ Nivedita: Notes of Some Wanderings

৩৭ Young India II, 421

তিনি অদ্বৈতবাদের শিক্ষাই প্রচার করেছিলেন, যদিও বা সুস্পষ্টভাবে বেদান্ত বা অদ্বৈতবাদের উল্লেখ করেননি।

সংশয়বাদপ্রভাবান্বিত ব্যক্তি এখানে নয়া বেদান্তের আর একটি বিরুদ্ধ সমালোচনার অবতারণা করতে পারেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করতে পারেন যে, যেহেতু 'বেদান্ত' নামটি এক বিশেষ ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেইহেতু স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে বেদান্তের পরিবর্তে অন্য কোন নাম ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত ছিল।

এই সমালোচনার সম্যক উত্তর দিয়েছেন ম্যারী লুই বার্ক (Marie Louise Burke)। 'বেদান্ত' নামটি ব্যবহারের সপক্ষে তিনি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি নির্দেশ করেছেন।[৩৮] প্রথমতঃ, তাঁর মতে বেদান্ত কতকগুলি মৌল ধর্মনীতির সমন্বয় মাত্র, এবং সমন্বিত ধর্মনীতিগুলিকে তিনি 'মানবজাতির ধর্ম' (religion of mankind) বলে বর্ণনা করেছেন। এই ধর্মনীতিগুলি বহুপূর্বেই নির্দিষ্ট হয়েছিল এবং সমষ্টিগতরূপে হাজার হাজার বছর ধরে 'বেদান্ত' নামেই পরিচিত ছিল। সুতরাং নূতন নামে ডাকা সম্ভব হলেও বোধ হয় ঠিক সমীচীন ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, কোন বিশেষ নামের পরিচয় ব্যতিরেকে নীতিগুলি তত্ত্ব বা ধারণার আকারেই প্রবর্তিত থাকত, এবং অস্পষ্টতাহেতু কালক্রমে তাদের বিকৃতিও ঘটত। সুতরাং নামকরণের মাধ্যমে তিনি নীতিগুলির বিশুদ্ধ রূপ বজায় রাখতে চেয়েছিলেন।

তৃতীয়তঃ, বিশুদ্ধরূপে নীতিগুলি হলো স্বয়ংসম্পূর্ণ. সুতরাং বেদান্তে দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে আচার-অনুষ্ঠানের আশ্রয় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। ফলে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-অবলম্বন বা পরিহার—উভয় পথেই লোকে বেদান্তাশ্রয়ী হ'তে পারে—কেবল প্রয়োজন বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিকে কার্যে পরিণত করা।

ব্যাপারটা হলো যে, শাস্ত্রজ্ঞান এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্বামী বিবেকানন্দকে অদ্বৈতবাদে দীক্ষিত করেছিল। এই বিশ্বাস তাঁর জীবন-বেদে পরিণত হয় পরিব্রাজক-জীবনে। ভারতীয় জীবনের ঐক্য সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করার পর শিকাগোর ধর্মসভায় তিনি যে 'মন্থর গতিতে রূপগ্রহণকারী মানব-ঐক্যের মহান আদর্শের'[৩৯] সন্ধান পেয়েছিলেন তা তাঁর অদ্বৈতবিশ্বাসকে দৃঢ়তর করে তোলে। ধর্মসভায় তখন তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বা প্রাচীন ও আধুনিক—এই দুই ভাবধারার সংযোগস্থল। তখন থেকে তাঁর ধর্মবিশ্বাস অদ্বৈতবেদান্ত পরিপূর্ণতার দাবি করতে থাকে এবং এই দাবিপূরণে তিনি বিশ্বমানবের আদর্শ-প্রচারের ব্রতই দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করেন।

স্বামীজীর এই অবদান পুনরুজ্জীবন ও নূতন সৃজন উভয়েরই দ্যোতক। পুনরুদ্ধার-কার্য হলো ভারতের শাশ্বত বাণীর পুনরুদ্ধার করা এবং সৃজনকার্য হলো পুনরুদ্ধৃত সত্যকে সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রে প্রসারিত করা। সুতরাং নয়া বেদান্ত পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকতার সমন্বিত ফল এবং এ দুটিই হলো রেনেশাঁর মৌল উপাদান। যদি বলা হয়, নয়া বেদান্ত ত' আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয়নি,

৩৮ Swami Vivekananda in America: New Discoveries

৩৯ Nivedita: Our Master and His Message; also Preface; to C. W.

তার উত্তর হ'লো যে, সত্যের পথ দুষ্কর কিন্তু মানুষ চায় সমস্যার সহজ সমাধানের জন্য পাকা ও সংক্ষিপ্ত সড়ক।

ঐক্যবোধ ও সামাজিক ন্যায়

বেদান্তাশ্রয়ী ব্যক্তি সত্যের পূজারী; তাঁর দৃষ্টি নিঃস্ব ও অবহেলিতের উপর নিবদ্ধ হতে বাধ্য। কারণ সমাজে নিঃস্ব ও অবহেলিতের অস্তিত্ব তাঁর কাছে ঐক্যনীতির অস্বীকার ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব, সমাজ-ব্যবস্থায় অন্যায় নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হবার প্রয়োজন নেই, মানুষ মানুষকে কি করে ভুলেছে তা নিয়ে দুঃখ করাও নিরর্থক। ঐক্যনীতিকে স্বীকার করে নিলে সকলকে আত্মীয়তার যোগ-সূত্রে গাঁথবার প্রচেষ্টা করতেই হবে। তখন আর নিঃস্ব ও অবহেলিতের মুক্তির জন্য নূতন কোন পথের সন্ধান করতে হবে না।

রাজা রামমোহনের সময় থেকেই সম্পদ ও সুযোগের ন্যায্য বণ্টনের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠার নীতি ঘোষিত হয়ে আসছিল, কিন্তু প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বুনিয়াদ গড়ে ওঠেনি। বিদ্যাসাগর দরিদ্রের জন্য অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। কেশবচন্দ্র শোষিত জনগণের পক্ষ সমর্থন করে 'বড় লোকদের'[৪০] অভিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় জীবনদর্শন ছিল না যা ব্যক্তিকে দরিদ্র, অত্যাচারিত ও অবহেলিতের উদ্ধারকার্যে ব্রতী করতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের নয়া বেদান্ত ভাবজগতে শুধু শূন্যস্থানই পূর্ণ করেনি, অন্যতম শাশ্বত সত্যের সন্ধানও দিয়েছিল—কেন প্রতিবাসীকে নিজের মত ভালবাসতে হবে তত্ত্বের দিক দিয়ে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছিল। চেতনার মুক্তির জন্য বাণী বা নির্দেশ তখনই পূর্ণরূপ ধারণ করে যখন ঐ বাণী বা নির্দেশ আধ্যাত্মিক নীতি ও যুক্তিবাদের যুগ্ম বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রত্যয়ের বাণী

পুনরভ্যুদীয়মান ভারতের কাছে এই বাণী ছিল শুধু মুক্তির নয়, প্রত্যয়েরও মন্ত্র। মুক্তি-অন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বামীজীর পূর্বে জননেতৃবৃন্দের সকলেই মোটামুটি বিদ্রোহের ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউই জনগণের মধ্যে মুক্তি-সাধনায় অপরিহার্য আত্মপ্রত্যয় সঞ্চারিত ক'রতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের নিজের ছিল অনন্যসাধারণ আত্মপ্রত্যয়, কিন্তু সেই প্রত্যয়বলে অপরকে অনুপ্রাণিত ক'রতে তিনি সমর্থ হননি। বহুদিন পরে (১৮৯৬) দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষের সময় লোকমান্য তিলক দরিদ্র কৃষকদের গবাদি পশু বেচে খাজনা না মিটিয়ে দুর্ভিক্ষত্রাণ আইন অনুসারে খাজনা মকুব এবং ত্রাণ দাবি ক'রতে উপদেশ দিয়েছিলেন।[৪১] কিন্তু তাদের বোঝাতে সমর্থ হননি যে, তারা অধিকারবলে তাদের দাবি আদায় করে নিতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে মানবতার বাণী ছিল অসম্পূর্ণ এবং এবং স্বামীজীই প্রত্যয়-মন্ত্রের মাধ্যমে একে সম্পূর্ণ ক'রে তোলেন। জোশেফাইন ম্যাকলাউড ঠিকই বলেছেন যে, অপরের মধ্যে সাহসিকতার সঞ্চারই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের শক্তির প্রধান দিক।[৪২]

বিখ্যাত মার্কিন মহিলা কবি এলা হুইলার উইলকক্স (Ella Wheeler Wilcox) তাঁর

৪০ 'বড়লোক' প্রবন্ধ সমাচারে প্রকাশিত।

৪১ R. C. Majumdar: History of Freedom Movement—I

৪২ Reminiscences of Swami Vivekananda

স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, স্বামীজীর একটিমাত্র বক্তৃতা শোনবার পর তিনি আবার জীবনে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার জন্য প্রয়োজনীয় নূতন সাহস, নূতন আশা, নূতন শক্তি এবং নূতন ভাবে আত্মপ্রত্যয় লাভ করেছিলেন।[৪৩] এই সাহস আশা শক্তি ও প্রত্যয়ের বাণীই স্বামীজী ছড়িয়ে গেছেন তাঁর বক্তৃতায়, কথোপকথনে, পত্রাবলীতে ও বিভিন্ন রচনায়। প্রত্যয়- ও সাহসিকতা-সমন্বিত হ'য়ে মুক্তির মন্ত্র ও বিদ্রোহের ভাষা নির্দিষ্টলক্ষ্যাভিমুখী ও জনপ্রিয় হ'য়ে উঠে। অবশ্য সাধারণের কাছে স্বামীজীর ভাষাও সকল সময় সুজ্ঞেয় ছিল না। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু যায় আসেনি, কারণ তাদের এই ধারণাই জন্মেছিল যে, তিনি তাদের কথাই বলছেন এবং তাদেরই মুক্তির সঠিক পথ নির্দেশ করছেন। আদর্শ সমাজজীবনের যে রূপ তিনি তাদের সামনে ব্যাখ্যা করেছিলেন তাকে তারা বাস্তব বলেই গ্রহণ করেছিল, যদিও বা ঠিক কি ব্যাখ্যা করেছিলেন সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ক'রতে পারেনি।[৪৪] এর ফলে একদিকে নেতৃবৃন্দ ও সংস্কারকগণ এবং অপরদিকে জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধান সংকুচিত হয়ে জাতীয় ঐক্যের বুনিয়াদ সুদৃঢ় হয়েছিল এবং এই বুনিয়াদের উপরই গড়ে উঠেছিল পরবর্তী সময়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলন। এই কারণে স্বামী বিবেকানন্দকে 'ভারতের নূতন জাতীয়তাবাদের' (New Indian Nationalism) পথিকৃৎ আখ্যা দেওয়া হয়, যে সম্মানের দাবি অবশ্য আরও অনেকের পক্ষে করা হয়।[৪৫]

৪৩ Life of Swami Vivekananda

৪৪ বিনয়কুমার সরকার: নয়া বাংলার গোড়াপত্তন। অধ্যাপক সরকারের ভাষায়, "তারা শুধু দেখেছিল বিবেকানন্দের বাঘা চোখ।..."

সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার

ঐক্য-অন্দোলনের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক দর্শনের মধ্যেই নিহিত। এককথায় একে 'ধর্মীয় সংস্কৃতি' (religious culture) ব'লে অভিহিত করা হয়।

ইয়োরোপীয়েরা আমাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাই বলুক না কেন, অভিজ্ঞতাপ্রসূত ধর্মচেতনায় সাধারণ হিন্দু অন্য কোন দেশের সাধারণ লোকের পশ্চাতে ছিল না। তবুও কিন্তু খ্রীষ্টানদের আক্রমণের কিছুদিন পরে অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল বিশেষ অসন্তোষজনক। অবনতি যে কতটা ঘটেছিল তা বোঝাবার জন্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের Keshab Chunder Sen and His Times গ্রন্থ থেকে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করছি:

"The ancient scriptures of the country, the famous records of the spiritual experiences of the greatmen of the numerous Hindu sects, had long since been discredited. The Vedas and Upanishads were sealed books. All that we knew of the immortal Mahabharata, Ramayana, of the Bhagavata and the Gita, were from execrable translations into popular Bengali which no respectable youngman was supposed to read. The whole religious literature of ancient India presented

৪৫ Nehru: Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda

an endless void."

এরূপ ক্ষেত্রে মেকলের সেই উদ্ধৃত উক্তি যে 'a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia'[৪৬] মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। হিন্দুদের পক্ষে নিজেদের ধর্মীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অতি অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে খৃষ্টধর্ম-প্রচারকদের সম্মুখীন হওয়া সহজ ছিল না। উপরন্তু, সর্বধর্মে সমদৃষ্টির প্রাথমিক স্তর হলো নিজস্ব ধর্মের প্রতি আস্থা এবং যার জন্যে প্রয়োজন হলো নিজস্ব ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়। পরিশেষে, সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন-প্রচেষ্টা মুক্তি-আন্দোলনেরই একটা দিক।

রাজা রামমোহন এই দিকেও কার্য শুরু করেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রচেষ্টাকে আন্দোলনের রূপ দিতে পারেননি। অবশ্য সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রলে তা করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। রামমোহনের পর বাংলাদেশে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী আন্দোলন এবং মাদ্রাজে Hindu Tract Society (১৮৮৭) এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কার্য করেছিল।[৪৭] বাংলাদেশের গৌড়ীয় সমাজের নামও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে।[৪৮]

৪৬ As quoted by K. M. Panikkar in his 'The Foundation of New India'

৪৭ Chirol, op. cit.

৪৮ N. Sinha: Freedom Movement in Bengal—Who is Who

তত্ত্ববোধিনীর অবদান গুরুত্বপূর্ণ হলেও আন্দোলনটি মোটেই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তত্ত্ববোধিনীর পর এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন কিছুটা উল্লেখযোগ্য কার্য করে। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আয়ু ছিল আরও স্বল্প। উপরন্তু, তত্ত্ববোধিনী ও বঙ্গদর্শন আন্দোলন উভয়ই ছিল বঙ্গদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। Hindu Tract Society-র কার্যক্ষেত্রও ছিল অনুরূপ সংকীর্ণ। প্রকৃতপক্ষে থিওজফিক্যাল সোসাইটিই এই পুনরুদ্ধারকার্যে সম্প্রসারিত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু অলৌকিকতার প্রতি আকর্ষণ এবং পাশ্চাত্য ধরনধারণ থিওজফিক্যাল সোসাইটির আন্দোলনের মান অনেকটা হ্রাস করে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বেদের পুনরুদ্ধার করেছিলেন সত্য, কিন্তু পুনরুদ্ধৃত বেদে প্রদত্ত ব্যাখ্যা ছিল তাঁর নিজস্ব। 'সত্যার্থপ্রকাশ' তাঁর নিজস্ব অভিমত এতটা বহন ক'রছে যে একে ঠিক বেদের পুনরুদ্ধার ব'লে গণ্য করা যায় না।

এ ব্যাপারে সত্যকার আন্দোলন শুরু করেন স্বামী বিবেকানন্দ। আমেরিকায় অবস্থানকালেই স্বামীজী মাদ্রাজ থেকে 'ব্রহ্মবাদিন্' (Brahmabadin) পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তারপর ভারতে ফিরে এসে প্রকাশ শুরু করেন ইংরাজীতে 'প্রবুদ্ধ ভারতের' (Prabuddha Bharata) এবং বাংলায় 'উদ্বোধনের'। পত্রপত্রিকার প্রকাশ ছাড়াও বিভিন্ন শাস্ত্রের নিয়মিত পঠন-পাঠন হ'য়ে দাঁড়ায় তাঁর সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের নিয়মিত কার্য।

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীর মোটামুটি অভিমত ছিল যে, মূলশাস্ত্রগ্রন্থপাঠ অপ্রয়োজনীয়, সংক্ষিপ্তাকারে মোটামুটি অনুবাদ পাঠ করাই যথেষ্ট। স্বামী বিবেকানন্দ এ-বিষয়ে মেটেই তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁর ভিন্ন মতের কারণ কি—এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন: মূল শাস্ত্রের আলোচনা কুসংস্কার দূর ক'রবে। অবশ্য মূলশাস্ত্রপাঠ সম্বন্ধে স্বামীজীর নির্দেশের এই একমাত্র কারণ ছিল না। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল যে, অনুবাদের মাধ্যমে শাস্ত্রপাঠে জ্ঞানার্জন সম্ভব হলেও সংস্কৃতিমান হওয়া সম্ভব নয়। বুদ্ধদেব রামানুজ শ্রীচৈতন্য কবীরের আন্দোলনের ফলে জ্ঞানের প্রসার ঘটেছিল, কিন্তু সংস্কৃতির বুনিয়াদ পোক্ত হয়নি, এবং 'it is culture that withstands shocks, not a mass of knowledge.[৪৯]

সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়েও সংস্কৃত সাহিত্যের পর্যালোচনার সার্থকতা আছে। ম্যাকসমুলার বলেন, সভ্যতার সূত্রপাতে যদি জীবনধারার কথা জানতে হয় তবে গ্রীক ও রোমক সাহিত্যের মত বৈদিক যুগের সাহিত্যের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে।[৫০] মনিয়ার উইলি-য়ামস্ (M. Monier Williams) সংস্কৃত-সাহিত্য-আলোচনার তাৎপর্য আরও বিশদ-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন: শুধু অতীতের অনুসন্ধানের জন্যই নয়, ধর্ম সাহিত্য বিজ্ঞান সবকিছুর ভবিষ্যৎ উন্নয়নকার্যে সংস্কৃত-সাহিত্যের আলোচনা সম্পূর্ণ অপরিহার্য।[৫১] শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, আত্মহত্যার জন্য একটি নরুণ বা ছুঁচই যথেষ্ট, কিন্তু অপরকে হত্যা করতে হলে ঢাল-তলোয়ারের প্রয়োজন হয়। নিজের ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ব্যতিরেকে হিন্দুধর্মের সারবত্তা লোককে কি করে বোঝানো যাবে, কি করেই বা এই ধর্মকে আধুনিক যুগের প্রয়োজনোপযোগী ক'রে তোলা যাবে? আর এ-কাজ সম্পন্ন না হ'লে বেদান্তকে বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম বলে প্রচার করা সম্ভবই বা হবে কি করে? আবার ধর্মশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার ব্যতিরেকে জাতীয় ইতিহাসের (national history) মূল উপাদানই বা পাওয়া যাবে কোথা থেকে? এ-ব্যাপারে স্বামীজীর দৃঢ় অভিমত ছিল যে, নিজস্ব ইতিহাস না থাকলে জাতির কিছুই থাকে না। জাতীয় ইতিহাস জাতির জীবনের লক্ষণ এবং সম্প্রসারণের সর্ত।[৫২] সুতরাং জাতিকে তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সচেতন ক'রতে হবে এবং অজ্ঞ যাজক-সম্প্রদায়কে অপসারিত করবার জন্য একদল আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষক সৃষ্টি ক'রতে হবে। জনগণ যখন অগ্রসর হচ্ছে তখন যাজকদেরও অগ্রসর হতে হবে।[৫৩] ক্রমশঃ

৪৯ The Future of India (C.W. III)
৫০ Heritage of India, op. cit.
৫১ Hinduism
৫২ C. W. V.
৫৩ Universal Religion (C. W. II)

সমালোচনা

নিরঞ্জনা নদীর ঢেউ : জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরী; ৪২, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ ; পৃ: ৭৫ ; মূল্য : দু' টাকা।

এই ভারতে একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব জন্মেছিলেন-- তিনি শাক্যসিংহ বুদ্ধ। নিজেকে তিনি আর সবার মতোই মানুষ বলে ভাবতেন এবং বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক মানুষই সাধনার দ্বারা বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। বুদ্ধজীবনের অনুপ্রেরণায় কত শত নর-নারী সুদূর অতীত থেকে সাম্প্রতিক কাল অবধি নির্বাণের আকাঙ্ক্ষায় ও জগৎকল্যাণের প্রেরণায় জীবন উৎসর্গ করেছেন।

অধ্যাপক শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী বুদ্ধ-সমকালীন ভারতের কয়েকটি কিশোর-কিশোরী-জীবনে ভগবান বুদ্ধের বাণী ও প্রেরণা কী অভাবনীয় রূপান্তর এনে দিয়েছিল তার সুন্দর কয়টি উদাহরণ 'নিরঞ্জনা নদীর ঢেউ' বইখানিতে সাজিয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধজীবনের ত্যাগ, প্রেম, সেবা, জ্ঞান এই কিশোর প্রাণের শিশিরবিন্দুগুলিতে নানা রঙে ঝলমল করে উঠেছে। কাহিনীর ভাষায় জড়িয়ে আছে অমেয় প্রেম ও করুণার কোমল স্পর্শ।

জননী মদালসার কথা আমরা স্বামী বিবেকানন্দের রচনায় জানতে পেরেছি। পুত্রকে দোলনায় দোল দিতে দিতে তিনি বলতেন, তুমিই নিরঞ্জন, তুমিই ব্রহ্ম! যে জনক-জননীরা তাঁদের সন্তানদের বুদ্ধজীবনের আদর্শে গড়ে তুলতে চান, তাঁরা সানন্দে এই বইটি তাদের হাতে তুলে দিতে পারেন। সবচেয়ে উপকৃত হবেন নিজেরা পড়লে।—**শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ**

শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতা—জ্ঞানভিক্ষু। প্রকাশক : শ্রীযুগলকিশোর দাস, ৩৭।১ আই. আর. বেলিসিয়স লেন, হাওড়া প্রাপ্তিস্থান : সিণ্ডিকেট, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২ ১৪০, মূল্য দুই টাকা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীগুলি এত সহজ সরল যে, বালকেরাও বুঝিতে পারে। শাস্ত্রের অতি দুর্বোধ্য বিষয়ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে' সর্বজনবোধ্যরূপে পরিবেশিত। 'কথামৃতের' কতকগুলি সুনির্বাচিত বাণী আলোচ্য গ্রন্থে আঠারোটি অধ্যায়ে—সংসারাশ্রম, ত্যাগ, ব্যাকুলতা প্রভৃতি শিরোনামে ছন্দোবদ্ধ কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। ছোটরাও এই কবিতাগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারে, তাহাতে তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনে প্রচুর লাভবান হইবে। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতা'—পুস্তকের এই নামকরণটি উপযুক্তই হইয়াছে।

কবিতার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী পাঠ করিয়া আমরা যেরূপ আনন্দ পাইলাম, আশা করি সেইরূপ আনন্দ পাঠকগণের অনেকেই পাইবেন। সব কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর ভাবটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। নমুনাস্বরূপ দুইটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইল :

(১) 'সেব্য ও সেবক ভাবে কর রে সংসার,
তিনি প্রভু আর তুমি সেবক তাঁহার॥'

(২) 'ভক্তের নাহিকো জাতি যদি শুদ্ধ হন,
ভক্তিতেই শুদ্ধ হয় দেহ-আত্মা-মন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ৫ই মাঘ (১৯. ১. ৭১) মঙ্গলবার পুণ্য কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ ১০৯তম জন্মোৎসব প্রভূত আনন্দ সহকারে বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মঙ্গলারতি, বেদ হইতে আবৃত্তি, ভজন, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, কঠোপনিষৎ-পাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামীজীর মন্দিরে এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরে পূজা-হোমাদি হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে পাঁচ হাজার ভক্ত হাতে হাতে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্ণে স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ইংরেজীতে এবং সভাপতি মহারাজ ও শ্রীঅমিয়-কুমার মজুমদার বাংলায় স্বামীজীর ভাবধারা-অবলম্বনে ভাষণ দেন।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেন, 'স্বামীজী যে ভারতকে ভালবেসেছেন তা হ'ল অধ্যাত্ম ভারত—ভারত ও সত্য তাঁর কাছে অপৃথক। সেই ভারতেরই পুনরুজ্জীবন তিনি চেয়েছেন। তাঁর মানবতাবাদের বৈশিষ্ট্য—মানুষের দেবত্ব এবং জীবনের আধ্যাত্মিক রূপ। জাতির উন্নতির জন্য তিনি তাই সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন ধর্মের। ধর্ম ছাড়া ক্ষমতার অপব্যবহার রুখবে কে? জাগতিক উন্নতির জন্য সব কিছুই আমাদের করতে হবে, রাষ্ট্র সমাজকে উন্নত করতে হবে, কিন্তু ধর্মকে আঁকড়ে থেকে। তিনি বলেছেন রাজনীতির জন্য যদি আমরা ধর্মকে বিসর্জন দিই, তাহলে ভারতের মৃত্যু অবধারিত।'

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বলেন, 'স্বামীজী বলেছেন, শঙ্করের বুদ্ধি এবং বুদ্ধের হৃদয়ের বিকাশ চাই একাধারে; স্বামীজীর নিজের জীবনে তাই ঘটেছিল। আমরা এতদিন কেবল বুদ্ধি দিয়েই স্বামীজীকে বিচার ক'রে এসেছি। এখনো অনেকে বলে থাকেন, স্বামীজীর সমাজ-চিন্তাই মুখ্য, আধ্যাত্মিকতা গৌণ, প্রক্ষিপ্ত! একথা অসত্য। স্বামীজীর সমাজচিন্তা ও আধ্যাত্মিকতা একত্র বিজড়িত। সব কিছুই একটি চেতন সত্তার, ব্রহ্মের বিকাশ—এই সত্যোপলব্ধির দিকে সকলকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই স্বামীজীর সব কিছুর লক্ষ্য। স্বামীজী যে পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন তা হল শিক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণের ধর্মভাবকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাদের হৃত ব্যক্তিত্বকে ফিরিয়ে আনা। এভাবে 'মানুষ' তৈরী হলে বাকী সব আপনা আপনি হয়ে যাবে।'

স্বামী গম্ভীরানন্দ সভাপতির ভাষণে বলেন, 'গণজাগরণের প্রয়োজনীয়তার কথা সবার আগে স্বামীজীই আমাদের বলেছেন। কেবল নিজের মুক্তির জন্য নয়, সকলের কল্যাণসাধনের জন্য সমাজের সকলেই যাতে ভগবান-লাভের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, সেই পথই তিনি দেখিয়ে গেছেন। ধর্মাচরণের দুটি রূপ—একটি হল "জগৎ মিথ্যা" জেনে সমগ্র জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সত্যোপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়া, অপরটি হল "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" জেনে, সমগ্র জগৎই তাঁর প্রকাশ এই সত্যকে অবলম্বন করে ভগবানলাভের দিকে অগ্রসর হওয়া। স্বামীজী দ্বিতীয় ভাবটিকে

অবলম্বন করে কেবল সন্ন্যাসীর জন্য নয়, সমাজের সকলেরই জন্য সত্যলাভের যে পথ দেখিয়ে গেছেন, ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেবাই সে পথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবদ্‌ভাবে বিভোর থাকতেন কিন্তু সমাজসেবা সম্বন্ধেও বহু কথা তিনি বলেছেন ; শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা তাঁরই ; আমরা সাম্যের কথা মুখে বলি কিন্তু আচরণে আমাদের দারুণ অসাম্য—সমাজের এই রূপ তিনি উদাহরণ দিয়ে স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন। ভগবদ্‌ভাবাশ্রয়ের মাধ্যমেই যে সব মানুষকে সমানভাবে ভালবাসা সম্ভব সেকথাও তিনি বলে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সব বাণীই, ধর্মের ইতিবাচক রূপই প্রচার করেছেন স্বামীজী—ঈশ্বরজ্ঞানে মানবসেবার মাধ্যমেই সমাজের যথার্থ কল্যাণকামী মানুষ গড়ে উঠবে। এটি না হলে কোন ব্যবস্থায়, কোন আইনের সহায়তায় যথার্থ সাম্য, যথার্থ মানবপ্রেম, সমাজের যথার্থ কল্যাণ আনা সম্ভব নয়। তাঁর কথা—'আইন মানুষ গড়ে না, মানুষই আইন গড়ে।'

স্বামী সারদানন্দজীর জন্মোৎসব

উদ্বোধন ভবনে—শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গত ১৭ই পৌষ, ১৩৭৭ (২.১.৭১) শনিবার শুভ শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের পুণ্য জন্মোৎসব বিশেষ আনন্দ সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে ও পার্শ্ববর্তী কক্ষে তাঁহার প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন, জীবনী-আলোচনা প্রভৃতি উৎসবের প্রতিটি অঙ্গ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

বেলা ১০টা হইতে ১১টা স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও আলোচনা করেন।

সন্ধ্যারতির পর স্বামী নিরাময়ানন্দ পূজ্যপাদ মহারাজের পুণ্য জীবন আলোচনা করেন।

বহু সাধু ও ভক্তের সমাগমে এবং পূজাপাঠ ও ভজনাদিতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী সারা দিন আনন্দমুখর থাকে। রাত্রেও অনেক ভক্ত আসিয়াছিলেন। সমাগত ভক্তবৃন্দকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্প্রসারণ

পাটনা আশ্রমে গত ১৯শে জানুআরি, ১৯৭১ বিহার সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনার দাতব্য চিকিৎসালয়ের (Charitable Dispensary) নবনির্মিত সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন করেন।

কার্যবিবরণী

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী ও উদ্বোধন কার্যালয়) :

১৯৭০ খৃষ্টাব্দের কর্মধারা নিম্নরূপ :

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের নিত্য সেবা-পূজাদি যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব এবং শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব যথাবিধি উদ্‌যাপন করা হয়।

ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে বিশেষ পূজাদি, কালীপূজার রাত্রে প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালীপূজা এবং শিবরাত্রিতে সারারাত্রি শিবপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ক্রীস্‌মাস ইভ্‌, শঙ্কর-পঞ্চমী, বুদ্ধপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পুণ্য দিনে অবতার ও মহাপুরুষগণের জীবনী ও বাণী পঠিত ও আলোচিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী

সন্তানগণের পুণ্য জন্মতিথিগুলিও অনুরূপভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষটি ছিল 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৭২তম বর্ষ। পত্রিকাটি প্রতি মাসে যথারীতি প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্তমানে গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ২,১৪৮। আলোচ্য বর্ষে পঠিত পুস্তকসংখ্যা ২,৬৮২।

প্রকাশন-বিভাগ হইতে এই বৎসর একখানি নূতন পুস্তক 'স্বামীজীর আহ্বান' প্রকাশিত হইয়াছে এবং ১৬ খানি পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে উদ্বোধনের সাধুকর্মিগণ এখানে এবং বাহিরে বিভিন্ন স্থানে যথাক্রমে ৩১০টি ক্লাস ও ৮৬টি বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা-প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব

জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব গত ২.১.৭১ শনিবার মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে মহানন্দে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে মঙ্গলাচরণে চিন্ময় মিশনের সভ্যগণ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করেন। ৫টা ৪৫ মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ জামসেদপুর-সাকচিতে ছাত্রাবাসের নবনির্মিত দ্বিতলভবনের উদ্বোধন করেন। ৬টায় সভারম্ভ হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রী পি. অনন্ত, জেনারেল ম্যানেজার, টিসকো লি., জামসেদপুর। স্বাগত-ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির সম্পাদক স্বামী আদিনাথানন্দজী। সাকচি-স্থিত সারদামণি উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। অধ্যাপক সত্যদেব ওঝা হিন্দীতে, অধ্যাপক শিবদাস মুখোপাধ্যায় বাংলায় এবং স্বামী চন্দ্রানন্দ ও সভাপতি মহোদয় সময়োপযোগী ভাষণ দেন। শ্রীসন্তোষ কর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীবিভূতি কর কর্তৃক সমাপ্তি-সঙ্গীত গীত হইলে পর সভার কার্য শেষ হয়। সভান্তে শ্রীপঙ্কজকুমার সিংহের 'লীলাগীতি' উপভোগ্য হইয়াছিল।

১৯২৫ খৃঃ টাটা ইস্পাত কারখানার কর্তৃপক্ষ জামসেদপুরের উত্তর সীমানায় সুবর্ণরেখা নদীতীরে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটিকে একখণ্ড ভূমি দান করেন। কয়েকজন কর্মী এই স্থানে একটি কুটিরে বাস করিয়া সোসাইটির কার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ক্রমে ১৯৪২ খৃঃ বাংলার দুর্ভিক্ষের অব্যবহিত পরে, এই স্থানে দুঃস্থ ও অনাথ বালকদিগের জন্য একটি বাসস্থান নির্মাণ করা হয়। উক্ত ব্যবস্থাই পরবর্তীকালে একটি ছাত্রাবাসে পরিণত হয়। বর্তমান দ্বিতল অট্টালিকায় ৭০ জন ছাত্রের জন্য উপযুক্ত আবাসের সঙ্কুলান হইবে। ভবিষ্যতে ত্রিতল করিয়া ১০০ জন আবাসিকের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রহিয়াছে। বিহারের গ্রামাঞ্চলের বালকদিগকেই ছাত্রাবাসে ভরতি করা হয়। এখানে থাকার ভাড়া বা বিজলীবাতি ইত্যাদির কোনও খরচ দিতে হয় না সুতরাং এই ছাত্রাবাস সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকের উপযুক্ত।

১৯২০ খৃঃ ৫ই ডিসেম্বর একটি সমিতি গঠন করিয়া যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে উহার নাম বিবেকানন্দ সোসাইটি রাখা হয়। ১৯২৪ খৃঃ এই সোসাইটি রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনাধীনে হস্তান্তরিত করা হয়। ১৯২৩ খৃঃ ২০শে নভেম্বর সোসাইটির প্রথম

ভিত্তি স্থাপন করেন শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী। শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীও এই সোসাইটিতে কিছুকাল বাস করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে সোসাইটির পরিচালনাধীনে ১১টি (তন্মধ্যে ৫টি উচ্চমাধ্যমিক) বিদ্যালয় রহিয়াছে।

উৎসব-সংবাদ

মোরাবাদী (রাঁচি) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২০শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জন্মতিথি-উৎসব পালন করা হয়। মঙ্গলারতি, ভজন, পূজা ও পাঠ শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি, আদিবাসী ও মুসলমান ভক্তদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়। পাঁচশতাধিক ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে অবতার যীশুর জন্ম-তিথি উদ্‌যাপিত হয়। নাটমন্দিরে ক্রীশ্চান, হিন্দু, মুসলমান ও আদিবাসী ভক্ত-সমাবেশে ফাদার বোগার্ট, ফাদার মিন্‌জ ও স্বামী যুক্তানন্দ বড়দিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। স্বামী বাগীশানন্দ বাইবেল থেকে কিছু অংশ পাঠ করেন। উপস্থিত ফাদার, ব্রাদার ও অন্যান্য ভক্তেরা সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যীশুকে বন্দনা করেন। ব্রাদারেরা সমাপ্তি-সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন। উপস্থিত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

স্বামী গোপেশ্বরানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি, গত ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৭০ ভোর ৪টা ২০ মিনিটের সময় স্বামী গোপেশ্বরানন্দ কোয়াল-পাড়া স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে (Health Centre) দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ৭৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল। গত ১১ই ডিসেম্বর বারাণসী হইতে তিনি জয়রামবাটী আসেন, সেখানে কয়েকমাস থাকিবেন বলিয়া। গত ১৫ই ডিসেম্বর তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন, ইহার ফলে তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

স্বামী গোপেশ্বরানন্দ ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। তিনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯২৫ হইতে ১৯৪৮ পর্যন্ত তিনি হবিগঞ্জ আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তৎপরে করিমগঞ্জ আশ্রমের অধ্যক্ষ হন এবং ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাঁথি আশ্রম পরিচালনা করেন। হবিগঞ্জে তিনি অনুন্নত চর্মকার সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিসাধনের জন্য প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছিলেন।

তাঁহার আত্মা মাতৃচরণে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে বিবেকানন্দ রোডস্থিত বিবেকানন্দ স্মৃতি-মন্দিরে গত ৭ই ফেব্রুআরি স্বামী বিবেকানন্দের ১০৯-তম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতি ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করিবার পরে সোসাইটির প্রেসিডেন্ট স্বামী নিরাময়ানন্দ তাঁহার স্বাগত ভাষণে সোসাইটির ইতিহাস ও উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। সম্পাদক শ্রীপ্রকাশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বার্ষিক কার্যবিবরণীতে বহুমুখী কার্যাবলীর কথা উল্লেখ করেন। অধ্যাপিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য স্বামীজীর জীবপ্রেম ও দেশপ্রেমের কথা বলিবার পর অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী স্বামীজীর জীবনদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, এখন দেশের প্রয়োজন স্বামীজীর আদর্শ ও বাণী অনুধ্যান করা। সভাপতির ভাষণে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'স্বামীজী চেয়েছিলেন দেশের মৃত্তিকায় ও মানুষের হৃদয়ে ভারতের প্রাচীন মহিমাকে নবীন মূর্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। নিজের অন্তরে যে দেবতার সাক্ষাৎ তিনি লাভ করেছিলেন, সর্ব জীবের মধ্যে তাঁকেই দেখেছিলেন তিনি। শিবজ্ঞানে জীবসেবাই তাঁর প্রবর্তিত নব যুগের ধর্ম।' স্বামীজীর স্মৃতি-মন্দির-নির্মাণ সম্পূর্ণ করা সম্বন্ধে তিনি বলেন—এই সৎ ও প্রয়োজনীয় কার্য আশু সাধিত হয়, ইহাই তাঁহার কামনা।

পরিশেষে বারাণসী কালীকীর্তন সম্মিলনী শ্রীরামকৃষ্ণলীলামাহাত্ম্য কীর্তন করেন।

বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে গত ২৪শে ডিসেম্বর (৮ই পৌষ) হইতে ২৭শে পর্যন্ত চারিদিন পূজা, পাঠ, ধর্মসভা, শোভা-যাত্রা, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামী শিবানন্দের ১১৫-তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

প্রথম দিন পূর্বাহ্ণে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর জীবনী ও উপদেশ আলোচনা করেন। বিকালে ব্রহ্মচারী দেবদাসের গীতাপাঠ ও রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের ছাত্রবৃন্দের রামনাম-সংকীর্তনের পর ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী ভূতেশানন্দ ও স্বামী বুধানন্দ মহাপুরুষ মহারাজের জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন এবং শ্রীঅনন্ত মুখার্জি শিবানন্দ গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। দ্বিতীয় দিন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন; পরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং গীতাতত্ত্ব পরিবেশিত হয়। তৃতীয় দিন শ্রীবিনয় সেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ সাহা ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং পরে কবিকীর্তন এবং মহিষমর্দিনী পালাকীর্তন পরিবেশিত হয়। চতুর্থ দিন প্রাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভৃতির প্রতিকৃতিসহ একটি বিরাট শোভাযাত্রা ভজন ও কীর্তন সহ বারাসত শহরের কয়েকটি প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করে। মধ্যাহ্নে শ্রীগোবিন্দ অধিকারী ও সম্প্রদায় তর্জাগান, বাউল শ্রীপূর্ণদাস বাউল ও দেহতত্ত্ব সঙ্গীত পরিবেশন এবং শ্রীকিরণ ঘোষাল কথামৃত

ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে ধর্মসভায় সম্পাদক কর্তৃক রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের বার্ষিক কার্য-বিবরণীপাঠের পর সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী শিবেশ্বরানন্দ ও ব্রঃ অব্যয়চৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পিগণ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রায় চৌদ্দ হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আঁটপুর: স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি আঁটপুরে ৭ই ডিসেম্বর তাঁহার জন্মতিথি-উৎসব, এবং এই উপলক্ষে ২৪শে হইতে ২৭শে ডিসেম্বর চারিদিন ধরিয়া বিশেষ পূজা, পাঠ, ধর্মালোচনা, রামায়ণগান, দুইদিন যাত্রাভিনয়, ভজন, পালাকীর্তন, শোভাযাত্রা ও চলচ্চিত্র-প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ (সভাপতি), স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-জীবনী আলোচনা করেন।

২৫শে ডিসেম্বর ধর্মসভায় স্বামী ভূতেশানন্দ (সভাপতি) স্বামী বুধানন্দ, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার এবং স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ভাষণ দান করেন।

শ্রী সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, মিলন নাট্য সমাজ,রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম, রথীন ঘোষ ও সম্প্রদায়, রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির প্রভৃতি সঙ্গীত ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

শেষদিনে ১৮।১৯ হাজার (সর্বমোট বাইশ হাজার) নরনারী বসিয়া প্রসাদ ধারণ করেন।

সুরবিতান: গত ২০শে ডিসেম্বর খিদিরপুরে ৮৩, মনসাতলা লেনে সংগীতালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সুরবিতান এক নিষ্ঠাপূর্ণ ঘরোয়া অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীসারদামাতার আবির্ভাব-দিবস পালন করে। সংস্থার ছাত্রীবৃন্দ 'মাতৃবন্দনা' শীর্ষক ভক্তিমূলক সংগীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমার উদ্দেশ্যে তাঁদের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সংস্থাধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্র বসু শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

পরলোকে সুশীলকুমার সরকার

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য সুশীলকুমার সরকার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ১৩ই জানুআরি রাত্রে কলিকাতায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করেন।

যশোহর জেলার পাজিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; পরে ব্যবসায় উপলক্ষে সম্বলপুর যাইয়া সেখানেই স্থায়িভাবে বসবাস করিতেন। বহু সাধু তাঁহার এই সম্বলপুরের বাড়ীতে গিয়াছেন।

শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

ভ্রমসংশোধন

'উদ্বোধন' পৌষ ১৩৭৭, পৃঃ ৬৫৫ ১ম কলমের ২য় লাইনে 'ব্রহ্মকলা' স্থলে 'ব্রহ্মকণা' এবং ২য় কলমের ১৮শ লাইনে 'অর্থ, ক্রিয়াকারিত্ব' স্থলে 'অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব' পড়িবেন।

দিব্য বাণী

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্॥
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্॥

—শ্রীচৈতন্যদেব

ধুয়ে মুছে সর্ব ক্লেদ প্রভাব যাহার করে
হৃদয়-দর্পণটিরে শুদ্ধ, অমলিন,
ভব-মহাদাবাগ্নিরে করে নির্বাপণ,
পরমকল্যাণাকর মুক্তি-শ্বেতশতদলে
ঢালে যাহা সুবিমল চন্দ্রের কিরণ,
সর্বত্র বিজয় তার, সদা জয়যুক্ত সেই
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্তন॥

পরাবিদ্যা-বধূটির জীবনস্বরূপ যাহা,
কর্ণপুটে পশিলে যে মধুবরিষণ
আনন্দের পারাবার উদ্বেলিত হয়ে ওঠে,
আনে প্রতিপদে পূর্ণামৃত-আস্বাদন,
সিনান করায় চির-শান্তি-নীরে সর্বজীবে,
চিরজয়ী সেই কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্তন॥

কথাপ্রসঙ্গে

চিন্তা ও সংস্কার

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, ইহা করিও না, উহা করিও না, ইত্যাদি উপদেশ দিবার লোকের অভাব নাই, কিন্তু কার্যকালে কি উপায়ে মানুষ এসব না করিয়া পারিবে, তাহার কথা বলিয়া দিবার লোক বিরল। মনের অবচেতন স্তর হইতে চেতন স্তরে ভাসিয়া উঠিয়া কোন খারাপ চিন্তা যখন মানুষের সমগ্র মন জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়ে, এবং উহাকে দখল করিয়া লয়, তখন উহার বশবর্তী হইয়া চলা অন্যায় বা অকল্যাণকর জানিলেও মানুষের করিবার আর কিছু থাকে না। ঐ চিন্তা-কবলিত মন তখন দেহযন্ত্রকে দিয়া নিজের যাহা ভাল লাগে তাহাই করাইয়া লয়। স্বামীজী বলিয়াছেন, এ অসহায় অবস্থা হইতে বাঁচিবার উপায় কি, মানুষকে তাহাই শেখানো প্রয়োজন এবং এরূপ শিক্ষাদাতাই বিরল। বলিয়াছেন, এ শিক্ষা হইল মনকে একাগ্র করিবার শিক্ষা। একাগ্রতার সাধনাই মনকে সবলতা দিতে পারে। কোন চিন্তা প্রবল আকার লইয়াই অবচেতন স্তর হইতে উঠে না বা চেতন স্তরে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই সবল হয় না। উহা ক্ষীণাকারে মনের চেতন স্তরে উঠিয়া সেখানে ক্রমবর্ধমান হইতে হইতে শেষে সারা মন দখল করিয়া বসে। যেমন উদাহরণ দিয়াছেন, কোন সরোবরের তলদেশ হইতে একটি বুদ্‌বুদ যখন উঠে, ছোট আকারেই উঠে; জলের উপরিতলে আসিয়া সেটি ফাটিয়া পড়ে এবং একটি ছোট তরঙ্গের সৃষ্টি করে। তরঙ্গটি ক্রমে বিস্তৃত হইয়া সমগ্র সরোবর ছাইয়া ফেলে। আমাদের চিন্তাও যেন প্রথমে ঐ বুদ্‌বুদ-আকারেই আসে। আমরা যদি চেতন মনকে সর্বদা সচ্চিন্তায় ভরাইয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে অবচেতন হইতে কোন অসচ্চিন্তা উপরে আসিবার অবকাশই পায় না। অথবা যদি চেতন স্তরে উঠিবার আগে বুদ্‌বুদ-আকারে থাকাকালীনই চিন্তাটি সম্বন্ধে সজাগ হইতে ও সেটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারি, তাহা হইলেও কাজটি সহজ হয়। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায়, মনের সাধারণ অবস্থায় এ-দুটির কোনটিই করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; বিশেষ করিয়া শেষেরটি করা; কারণ মন অনেকখানি উন্নত হইয়া সূক্ষ্মদর্শী হইবার পূর্বে চিন্তার বীজাকার রূপ যে কি তাহা সে জানিতেই পারে না। যোগীরা তাহা পারেন। শুধু নিজের মনের নয়, অপরের মনের ভিতরও অবচেতন হইতে উঠিবার মুখেই এই বীজাকার চিন্তাকে দেখিতে পান—যাহা তখনো চিন্তাকারে, তরঙ্গাকারে পরিণত হয় নাই, যাহার মনে উঠিতেছে সে নিজেও যখন কিছু টের পায় নাই। দক্ষিণেশ্বরের একটি ছোট ঘটনা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ (তখন রাখালচন্দ্র) সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে রহিয়াছেন। একদিন তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'আয়, তোর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিই—তোর মনে একটা খারাপ চিন্তা আসছে দেখলাম।' 'আসছে' মানে সে আসা সম্বন্ধে রাখালচন্দ্র তখনো নিজে কিছুই টের পান নাই—বুদ্‌বুদাকারে চিন্তাটি সবে মাত্র অবচেতন স্তর হইতে উঠিতেছে। এভাবে এ অবস্থায় চিন্তাটি সম্বন্ধে সজাগ হইতে ও সেটিকে

দাবাইয়া দিতে না পারিলেও মনের চেতন স্তরে আসিয়া যখন সেটি সবে ক্ষুদ্র তরঙ্গাকারে ফাটিয়া পড়ে, যখন আমরা সে চিন্তাটি সম্বন্ধে প্রথম সজাগ হই, তখন কিন্তু ইচ্ছা করিলে সে অবস্থায় সেটিকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারি। স্বামীজী এরূপ করিবার উপায়ও বলিয়া গিয়াছেন—তৎক্ষণাৎ মনকে সচ্চিন্তায় ব্যাপৃত করা। সাধারণ মনে সদসৎ কোন চিন্তাই বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, আমরা ইচ্ছা করিয়া সেটিকে পুষিয়া না রাখিলে; মনে অসচ্চিন্তা উঠিয়াছে টের পাইবামাত্র কিছুক্ষণ জোর করিয়া সচ্চিন্তা করিলেই, উহার স্থায়িত্বের স্বাভাবিক সময়টুকু কাটাইয়া দিলেই উহা চলিয়া যায়। মনে দৃঢ়বদ্ধ কোন চিন্তার ছাপ মুছিয়া ফেলিবারও ইহাই একমাত্র উপায়—ক্রমাগত মনে ইহার বিপরীত চিন্তার ছাপ ফেলা। একই চিন্তা বা অনুভূতির ছাপ মনে বারবার পড়িতে থাকিলে সে ছাপ গভীর, গভীরতর হইয়া ক্রমে অভ্যাসে ও শেষে সংস্কারে পরিণত হয় বলিয়াই সে চিন্তা আবার আসিলে আমরা নিজেকে উহার নিকট অসহায় বলিয়া মনে করি। কিন্তু আমরাই যখন উহার স্রষ্টা, আমরা বারবার শুভচিন্তার ছাপ মনে ফেলিয়া শুভসংস্কারই বা সৃষ্টি করিতে পরিব না কেন? স্বামীজী বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই পারিব, না পারিবার কোন যুক্তি, কোন কারণ নাই, এবং অশুভ চিন্তা ও অশুভ সংস্কারকে বিনষ্ট করিয়া দেবজীবন গঠন করিবার উহাই একমাত্র উপায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

১

কারণ সব সময় না দেখাইলেও অবতারগণ, আচার্যগণ সকলেই মনের উপর এই শুভচিন্তার ছাপ ফেলিবার উপরই জোর দিয়া যান সর্বাধিক। বহু উপায়ে ইহা করা যায়। তবে সর্বসাধারণের জন্য সহজতম পথ হইল শ্রীভগবানকে কোন মূর্তিবিশিষ্ট ভাবিয়া, তাঁহাকে ভালবাসিয়া তাঁহার যে রূপ যে নাম আমাদের ভাল লাগে সেই নামে সেই রূপে চিন্তাকে রঞ্জিত করিয়া তোলা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী হইয়াও সেজন্য সর্ব-সাধারণের নিকট প্রচার করিয়া গিয়াছেন ভক্তি, জোর দিয়াছেন নামসংকীর্তনের উপর।

অবশ্য ইহার সহিত আরো যে জিনিসটির প্রয়োজন, সংযমের চেষ্টা, অন্যান্য ধর্মগুরুদের মতো সেটির উপরও তিনি জোর দিয়াছেন। শুভচিন্তার ছাপ মনে ফেলিয়া চলিয়াছি ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য সময় অশুভ চিন্তার ছাপ যদি আরো বেশী করিয়া ফেলিয়া চলি, মনের মালিন্য যেটুকু মুছিলাম, তাহার চেয়েও বেশী মালিন্য যদি মনের উপর লেপিয়া দিই, তাহা হইলে লাভ হইবে কি? শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, জমিতে জলসেচ করিতেছি, কিন্তু আলের গর্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি না,—সব জল তো সেদিক দিয়াই বাহির হইয়া যাইবে। মহাভারতে আছে, শুক্রাচার্য বলিতেছেন, তপস্যাদি করিয়া যে ফললাভ হয়, কামক্রোধাদি বশীভূত না থাকিলে তাহারাই সে ফল নষ্ট করিয়া দেয়।

শ্রীচৈতন্য নিজজীবনে একদিকে যেমন ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, অপর-দিকে তেমনি রাখিয়া গিয়াছেন সে পরাভক্তির সুদৃঢ় ভিত্তি সংযমের অনন্য দৃষ্টান্ত। অদ্বৈতভাব ছিল তাঁহার অন্তরের জিনিস, নিজের জন্য; সর্বসাধারণের জন্য তিনি বাহিরে দেখাইয়া গিয়াছেন অপরূপ ঈশ্বর-প্রেমোন্মত্ততা—যাহার বিকাশ ঘটিয়াছিল একদা শ্রীরাধার জীবনে, সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বিশ্বম্ভর মিশ্র, শচীমাতার নিমাই, নদীয়ার চাঁদ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন নবদ্বীপে, জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে। সেদিন ফাল্গুনীপূর্ণিমা, সন্ধ্যাকাল। শচীমাতার এই সুদর্শন দুলালটি প্রতিবেশী সকলেরই আকর্ষণের বস্তু ছিলেন সত্য, কিন্তু একটু বড় হইলে দেখা গেল, যাহাকে শান্তশিষ্ট ছেলে বলে তা তিনি মোটেই নন, এমনকি কখনো কখনো তাঁহার দুরন্তপনা আপাতদৃষ্টিতে গুরুতর অপরাধ বলিয়াও মনে হইত। পাড়ায় পাড়ায় চুরি করিয়া খাওয়া, বাসনপত্র ভাঙা—এসব না হয় বোঝা যায়; কিন্তু তাঁহার দুরন্তপনা সীমা ছাড়াইয়া যাইত কখনো কখনো—কখনো বা তিনি দেবতাকে নিবেদন করিবার জন্য সজ্জিত ফুলমালা নিজের গলায় পরিয়া বসিলেন, কখনো বা গৃহাগত অতিথিকে চোখ বুজিয়া দেবোদ্দেশ্যে অন্নাদি নিবেদন করিতে দেখিয়া সেই সুযোগে ভোগের থালা হইতে অন্ন তুলিয়া লইয়া নিজেই খাইতে লাগিলেন! এমনি অনেক ঘটনা। তবু তাঁহাকে ভাল লাগিত সকলেরই।

এ ভাললাগার কারণ কি, তখন হয়তো কেহ তাহা খুঁজিয়া পাইতেন না; খোঁজেই বা কে? আমাদের হৃদয়ের ভালবাসা যাহার কণামাত্রের বিকাশ, সেই প্রেমের সাগরই যে মানুষ হইয়া আসিয়াছেন, তাহা আর তখন ধারণা করিবে কে? সে কথা জানাজানি হইল অনেক পরে।

নিমাই বড় হইলেন, লেখাপড়া শিখিলেন, মস্ত বড় পণ্ডিত হইয়া টোল খুলিলেন নবদ্বীপে। বিবাহও করিলেন দুইবার—প্রথমে লক্ষ্মীদেবীকে, পরে সর্পদংশনে তাঁহার অকাল প্রয়াণ ঘটিলে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে। এ পর্যন্ত মোটামুটি 'সংসার'-এর সঙ্গে একরকম মানাইয়া চলিতেছিলেন।

তারপরই বিরাট পরিবর্তন আসিল, গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্মে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিয়া সেখান হইতে প্রেমিক মহাপুরুষ ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা লইয়া ফিরিবার পর। তখন হইতেই বাহিরের লোকের চোখে আগের মানুষটি একেবারে পাল্টাইয়া গেলেন। হরিপ্রেমের উত্তাল তরঙ্গকে হৃদয়াভ্যন্তরে আর তিনি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, হৃদয়ের কিনারা ছাপাইয়া হাসিতে কান্নায় নামগানে কীর্তনে তাহা উপচাইয়া পড়িল চারিদিকে, শ্রীহরির পরমধামের দিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল অগণিত হৃদয়কে, জগাই-মাধাই-এর মতো ঘোর পাষণ্ডকেও। টোল উঠিয়া গেল। কে আর পড়াইবে তখন? নিমাই তো তখন পাঠ দিতেছেন হরিপ্রেমের।

তাহার পর আসিল আরো পরিবর্তন। সংসারে থাকাই আর সম্ভব হইল না। নবদ্বীপের এ আনন্দের হাট ভাঙিয়া বৃহত্তর প্রয়োজনের তাগিদে নিমাই গৃহত্যাগ করিলেন নিজের প্রয়োজনে নয়, লোকশিক্ষার প্রয়োজনে, ভগবানলাভের জন্য সর্বস্বত্যাগের আদর্শ দেখাইতে। কাটোয়া আসিয়া সন্ন্যাস লইলেন কেশব ভারতীর কাছে। নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তারপর চলিলেন বৃন্দাবন অভিমুখে; [illegible]ত নিত্যানন্দ তাঁহাকে ভুলাইয়া আনিলেন শান্তিপুরে—অদ্বৈত মহাপ্রভুর কাছে। সেখান হইতে যান নীলাচলে। লীলার প্রথম চব্বিশ বছরের মধ্যেই ঘটিল এসব। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,

'চব্বিশ বৎসর শেষ যেই চৈত্রমাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥'

নীলাচলেই তাঁহার সন্ন্যাসজীবন, লীলার

বাকী চব্বিশ বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। মধ্যে সেখান হইতেই তিনি দাক্ষিণাত্য ও শ্রীবৃন্দাবন ঘুরিয়া আসেন।

৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সন্ন্যাসী ছিলেন। সন্ন্যাস জ্ঞানের পথ, ভগবানের সঙ্গে নিজের স্বরূপের অভেদত্ব উপলব্ধির পথ। সে অভেদত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও তিনি ভক্তির প্লাবন ছুটাইয়াছেন। ইহা কিরূপে হইল, তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন বহু গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী ভক্ত; জ্ঞানকে যেমন অনেকে ভক্তি অপেক্ষা বড় করিয়া দেখাইতে চান, তাঁহাদের অনেকে তেমনি দেখাইয়াছেন ভক্তিকে জ্ঞানের চেয়ে বড় করিয়া। কিন্তু মনে হয়, আজ ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন আমাদের আর নাই; শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি যে একই জিনিস তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা এযুগে পাইয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণে।

চৈতন্যদেবের কথা ভাবিলে মনে হয়, জ্ঞান-সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ যেন ভক্তি-চন্দ্রিমার শীতলতামণ্ডিত হইয়া ধরণীর বুকে নামিয়া গৌরাঙ্গমূর্তি ধারণ করিয়াছিল। যেন অরূপ-সায়রে কৃপামলয়ের আন্দোলনে উত্থিত একটি লীলা-উর্মি নিখিলের মাধুরীমণ্ডিত রূপ ধারণ করিয়া ধরার ঘাটে আসিয়া প্রেমের তরী বাঁধিয়াছিল। কলুষনাশিনী শঙ্খধবলধারা জাহ্নবীই যেন নিশ্চল হইয়া এ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, মানুষের দ্বারে দ্বারে যাইয়া তাহাদের কলুষ নাশ করিবার জন্য। মনে ভাসে সেই দেবদুর্লভ ছবি—শ্রীহরির ধ্যানে ক্ষণে ক্ষণে তিনি লীলার গণ্ডী ছাড়াইয়া সচ্চিদানন্দ-সাগরে তাঁহার সহিত মিশিয়া একীভূত হইতেছেন; আবার পরক্ষণেই সে সাগরকূলে ফিরিয়া আসিতেছেন একটি অতি শুদ্ধ মন-বুদ্ধির অতি ক্ষীণ অতি স্বচ্ছ আবরণে আবৃত হইয়া, যাহার ভিতর দিয়া তাঁহার সে প্রকাশ আমরা কখনো দেখিতেছি ঈশ্বররূপে, কখনো বা তাঁহার ভক্ত-রূপে; সে সাগরতীরে দাঁড়াইয়া যখন তিনি প্রেমে নয়ন উন্মীলিত করিতেছেন, তখন সে অহেতুক-করুণার দৃষ্টিপাতে সমীপাগত সকলের মনে প্রেমের তুফান ছুটিতেছে। মনে ভাসে, হরিপ্রেমে আপনহারা হইয়া তিনি পথ চলিতেছেন, দু-নয়নে অবিরল প্রেমাশ্রু ঝরিতেছে; যেখানে তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিতেছে সেখানেই হরিনাম-সুধা যেন মূর্তি ধারণ করিতেছে, আনন্দ লুটাইয়া পড়িতেছে চারিদিকে, স্পর্শ করিতেছে পতিত কাঙাল সবারই হৃদয়; যে কাঙাল মন এই স্থূল জগতের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় সামান্য একটু আনন্দের আশায়, সেও তখন রাজরাজেশ্বর হইয়া যাইতেছে অফুরন্ত আনন্দের উৎসকে স্থূলরূপে সম্মুখে এবং সূক্ষ্ম-রূপে আপনারই হৃদয়কমলে পাইয়া।

সঙ্গে সঙ্গে মনে ভাসিতেছে, এই হরিপ্রেম-বিহ্বলতা হালকা ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র নয়, ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় সংযম। সংযমের প্রচেষ্টা ছাড়া কেবল কীর্তনাদির দ্বারা মনকে পূর্ণ একাগ্র করা দুষ্কর; আবার একাগ্রতার সাধনা ছাড়া সংযমের শক্তিও আসে না। অসংযত জীবনে অত্যধিক নামসংকীর্তন বরং ক্ষতিও করিতে পারে—কীর্তনাদির ফলে মন তখন যতখানি উপরে উঠে, সংযমের বাঁধ সুউচ্চ না থাকিলে কীর্তনানন্দের পরে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণের জন্য বাহ্য জগৎ হইতে অনুরূপ আনন্দ আহরণের ভ্রান্ত আশায় সে-মন ততখানি নীচেও নামিয়া যাইতে পারে। ভগবানলাভের পথে এদুটি তাই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ভারতীয়

সভ্যতার, ভারতীয়তার ভিত্তিই এই সংযম ও একাগ্রতা, যাহার সাধনায় মানুষ পশুভাব হইতে যথার্থ মনুষ্যত্বের ভাবে, এবং সেখান হইতে দেবভাবে নিজেকে উন্নীত করিতে পারে, যুক্তি-অনুমানের অস্পষ্ট কুয়াশার আবরণ ভেদ করিয়া প্রত্যক্ষের অত্যুজ্জ্বল-কিরণোদ্ভাসিত ঈশ্বরাস্তিত্বের, নিজ নিত্যানন্দময় দেবস্বরূপতার নিঃসংশয়তায় উপনীত হইতে পারে। সংযম ও একাগ্রতার সাধনাকে ভারতীয়তার ভিত্তি বলার অর্থ এই যে, এ সাধনা কেবল সন্ন্যাসীদের জন্য নয়; গার্হস্থ্য জীবনেও ইহার প্রয়োজন সমভাবেই, যাহার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে গার্হস্থ্য আশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন গৃহস্থের আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য। সর্বত্যাগীর সংখ্যা আর কয়জন? জাতি তো প্রধানতঃ গৃহস্থদের লইয়াই; তাঁহাদের জীবনের মান-উন্নয়নই তো জাতীয় জীবনের মান-উন্নয়ন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, যেদিন হইতে ভারত বিবাহিত জীবনে সংযম-অভ্যাসের কথা ভুলিয়াছে, সেদিন হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে ভারতের যাহা কিছু বরণীয়, যাহা কিছু মহান, তাহা সবই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব-স্মরণে আজ তাঁহার চরণে প্রার্থনা করি, আমরা সকলেই যেন তাঁহার প্রদর্শিত সংযম-অভ্যাস ও শ্রীভগবৎ-স্মরণের মাধ্যমে জীবনকে উন্নত করিয়া সমগ্র জাতির মধ্যে ভারতীয়তাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে কৃতসংকল্প হই। ইহাই তাঁহার চরণে শ্রেষ্ঠ অঞ্জলিপ্রদান হইবে—আমাদের স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই তিনি আসিয়াছিলেন; একাজের জন্য যুগে যুগে যিনি আসেন, তিনিই আসিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্য-রূপে। শ্রীরূপ-গোস্বামীর ভাষায় প্রণাম জানাই তাঁহার চরণে:

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"
—'পরম বদান্য যিনি কৃষ্ণপ্রেমদাতা
নমি সেই অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-চরণে
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামে আসিলা যে ধরাধামে
উজলিয়া দশদিশি গৌরাঙ্গ-কিরণে।'

আলো দাও জ্যোতির্ময়

শ্রীশান্তশীল দাশ

তোমার অনেক আলো, তুমি জ্যোতির্ময়;
একটু আলোক তুমি দাও না আমায়;
কত না আঁধার ঘন যেদিকে তাকাই
আমি যে পাই না পথ কেঁদে কেঁদে মরি,
হতাশা ও নিরাশার জাল বুনে চলি
সে গভীর অন্ধকারে। নানা বিভীষিকা
দেখি আর কী আতঙ্ক! একে একে সব
স্বপ্নগুলি ভেঙে যায়, লাগে কী দুঃসহ।
আমি যে পারি না আর হে আলোকনাথ,
আমাকে দেখাও পথ, ছিন্ন করে দাও
এই আঁধারের জাল; এ ঘন নিরাশা
ভেদ করে দেখা দিক প্রসন্ন আলোক;
মুমূর্ষু জীবন থেকে বেঁচে উঠি আমি,
বেঁচে উঠি আর চলি জীবনের পথে।

শ্রীসারদাস্তোত্রম্

ব্রহ্মচারী বাদল

ওঁ হ্রীং বিশুদ্ধাং প্রকৃতিস্বরূপাং
আধারভূতাং জগদাদিশক্তিম্।
দয়াস্বরূপাং জগদাম্বিকাং বৈ
শ্রীসারদাং ত্বাং প্রণমামি নিত্যম্ ॥১

সাংখ্যৈশ্চ বেদৈরপি সর্বশাস্ত্রৈঃ
জ্ঞেয়া ন মাতা পরমাসি মায়া।
তব প্রসাদাদ্বিদিতা ভবেস্ত্বং
প্রসীদ দেবেশি গতিস্ত্বমেকা ॥ ২ ॥

রক্তাম্বরা ত্বং জগদম্বিকা বৈ
ত্বং বেদমূর্তির্ভুবি বিশ্বধাত্রী।
সৃষ্টেঃ স্থিতেশ্চ প্রলয়স্য কর্ত্রী
পদাম্বুজং মে তব দেহি মাতঃ ॥ ৩ ॥

দাত্রীং জনেভ্যো ভববন্ধমুক্তিম্
অনন্তবীর্যাং শশিসূর্যনেত্রাম্।
আব্রহ্মলোকা প্রণমন্তি যাং তাং
নমাম্যহং সারদসারদাম্বাম্ ॥ ৪ ॥

দেবীং হি শম্ভোঃ পরমস্য বিষ্ণোঃ
প্রিয়াং চ সীতাং রঘুনন্দনস্য।
শ্রীসারদাং বা অবতারমুখ্য
শ্রীরামকৃষ্ণস্য নমামি ভূয়ঃ ॥ ৫ ॥

বৈষ্যক্তস্ত সিদ্ধা স্তব শক্তিমন্ত্রং
তেজোময়ং যং হি তপোভিরুগ্রৈঃ।
তমেব নৃণাং ভব মোক্ষসেতুং
জানে তু নাহং শরণাগতস্তে ॥ ৬ ॥

নক্তন্দিবং যদ্ যতয়োঽপি দেবাঃ
সিদ্ধাদিসঙ্ঘাস্তব পাদপদ্মম্।
ধ্যায়ন্তি গায়ন্তি নমন্তি নিত্যং
দিব্যং পদং তদ্বিনয়েন যাচে ॥ ৭ ॥

মোহান্ধকারেঽতি মমত্বগর্তে
ভ্রষ্টোঽস্মি মাতঃ পরিপাহি মাং ত্বম্।
শ্রীরামকৃষ্ণপ্রকৃতিস্বরূপে
শ্রীসারদে ত্বাং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

দেবি প্রসীদ প্রণতার্তিহন্ত্রি
প্রসীদ মাতঃ পরমেশ্বরি ত্বম্।
প্রসীদ দেবেশি সদা প্রসীদ
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি নস্ত্বম্ ॥ ৯ ॥

ওঁ দুস্তরার্ণবসংসারে নৃণামেকা গতির্হি যা।
তস্যৈ তু সারদাদেব্যৈ শিবায়ৈ চ
নমো নমঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ হ্রীং বাচ্যা বিশুদ্ধা প্রকৃতিস্বরূপা আধারভূতা, জগতের আদি শক্তি, জগদাম্বিকা দয়াস্বরূপা সারদাদেবি! তোমাকে নিত্য প্রণাম করি।১

তুমি পরমা মায়া প্রকৃতি, মা, তুমি সাংখ্য বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের দ্বারাও জ্ঞেয়া নও। তোমার কৃপাতেই কেবল তোমাকে জানা যায়। হে দেবেশি, তুমিই একমাত্র গতি, তুমি প্রসন্না হও। ২

তুমিই পৃথিবীতে রক্তাম্বরা জগদম্বিকা, তুমি বেদমূর্তি এবং তুমিই আবার বিশ্বধাত্রী, তুমিই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্রী। তোমার পাদপদ্ম কামনা করি।৩

যিনি জনগণের ভববন্ধনের মুক্তিদাত্রী, যিনি অনন্তবীর্যা, যাঁর নেত্রদ্বয় চন্দ্র ও সূর্য, ব্রহ্মাদি লোকসমূহ যাঁহাকে প্রণতি জানায়, আমি সেই জ্ঞানদায়িনী মাতা সারদাদেবীকে প্রণাম করি। ৪

যিনি শিবের দুর্গা, বিষ্ণুর বিষ্ণুপ্রিয়া; রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের সীতা, তিনিই অবতার-শ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীসারদা; তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। ৫

উগ্র তপস্যার দ্বারা সিদ্ধগণ তোমার যে তেজোময় শক্তিমন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন, যাহা সমস্ত জীবের এই সংসার হইতে মুক্তির সেতুস্বরূপ, তাহাও আমি জানি না, আমি কেবল তোমারই শরণাগত। ৬

দেব, মুনিঋষ্যাদি সিদ্ধগণ তোমার যে পাদপদ্মকে নিত্য ধ্যান ও স্তব করেন, সেখানে প্রণতি জানান, সেই দিব্য পাদপদ্মই আমি কাতরভাবে প্রার্থনা করি। ৭

মমতারূপ গর্তে মোহরূপ অন্ধকারে আমি মগ্ন; মা, তুমি ইহা হইতে আমাকে উদ্ধার কর। শ্রীরামকৃষ্ণশক্তিরূপা মা সারদা, আমি তোমার শরণ প্রার্থনা করি। ৮

হে দেবি, হে আশ্রিতের আর্তিহরণকারিণি, তুমি প্রসন্না হও। হে মাতঃ পরমেশ্বরি, তুমি প্রসন্না হও। হে দেবেশি, তুমি সর্বদা প্রসন্না থাক। হে বিশ্বেশ্বরি, তুমি প্রসন্না হও, আমাদিকে রক্ষা কর। ৯

দুস্তর সাগরের ন্যায় এই সংসারে যিনি জীবের একমাত্র গতি, সেই মঙ্গলময়ী সারদা-দেবীকে প্রণাম করি। ওঁ।১০

চরৈবেতি

[গান : ভৈরব-তেওরা]

শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়

ভৈরব রবে ডাকো জগজনে, আর কি ঘুমানো সাজে ?
কতই না ক্লেশ দহিছে জগৎ, সে যাতনা বুকে বাজে।
আমার আমার করিয়ে পাগল
হু'স নে কো আর ভাঙ্‌রে আগল,
তোমার আমার সব একাকার
যার হৃদে প্রেম রাজে॥
চরৈবেতি চরৈবেতি এগিয়ে চলার গান,
অভয় মন্ত্রে হৃদয় তন্ত্রী জাগিয়ে তোলে প্রাণ।
বিবেকদীপ্ত জাগ্রত শত সিংহশিশুর দল
প্রেহ্যভীহিধ্বস্কুহি হাঁকে কম্পিত হিমাচল।
তমসাসাগরে উত্থিত ওই আশার সূর্য দেখ,
যুব-অবতার ফুৎকারে তার অভয় তূর্য বাজে॥

শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী আদিনাথানন্দ

৭

পূর্বের প্রবন্ধে অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদের বক্তব্য কি তাহা আলোচিত হইয়াছে। নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদ উপস্থাপনকালে অজ্ঞানপ্রসূত জগৎপ্রপঞ্চের ও জীবের ব্যাখ্যা করিতে হইলে জীবজগৎকে অনির্বচনীয়সত্তাযুক্ত বলা ছাড়া অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণের উপায় নাই। শ্রীরামানুজাচার্যের মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ। ইহা পূর্ব প্রবন্ধে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে শ্রীরামানুজাচার্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদ যুক্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন; প্রসিদ্ধ 'মায়াবাদ' খণ্ডন করিয়াছেন বলা যায়।

১। অবিদ্যানামক একটি অনির্বচনীয় বস্তুকল্পনার বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি—আশ্রয় অনুপপত্তি। প্রথম প্রশ্ন করিতেছেন—'সা হি কিমাশ্রিত্য ভ্রমং জনয়তি? ইতি বক্তব্যম্। ন তাবজ্জীবমাশ্রিত্য; অবিদ্যাপরিকল্পিতত্বাজ্জীবভাবস্য। নাপি ব্রহ্মাশ্রিত্য, তস্য স্বয়ংপ্রকাশ-জ্ঞানরূপত্বেনাবিদ্যা-বিরোধিত্বাৎ।'

(শ্রীভাষ্য—৯৬)

[এই অবিদ্যা কাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে? তাহা বলা কর্তব্য। জীবকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে তাহা আপনারা বলিতে পারেন না। কারণ. আপনাদের মতে ব্রহ্মে অবিদ্যার কল্পনার ফলেই তো জীবভাবের উৎপত্তি। ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াও এই অবিদ্যা ভ্রম উৎপাদন করিতে পারে না, কারণ তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু এবং জ্ঞান-স্বরূপ বস্তু। অবিদ্যা হইতেছে অজ্ঞান, অতএব এই অবিদ্যারূপী অজ্ঞান জ্ঞানের নিকটে থাকিতেই পারে না (যেমন অন্ধকার আলোকের নিকট থাকিতে পারে না।) অতএব (জ্ঞানস্বরূপ) ব্রহ্ম অবিদ্যার বিরোধী। সুতরাং অবিদ্যা তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না।]

২। দ্বিতীয় প্রশ্ন—'কিঞ্চ, অবিদ্যয়া প্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্ম তিরোহিতমিতি বদতা স্বরূপনাশ এবোক্তঃ স্যাৎ।' (শ্রীভাষ্য—৯৭) [একমাত্র প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্ম অবিদ্যার দ্বারা আবৃত অর্থাৎ তিরোহিতই হয়, একথা যদি আপনারা বলেন, তখন তো প্রকারান্তরে ব্রহ্মের স্বরূপনাশই আপনাদের স্বীকার করিতে হয়।]

৩। তৃতীয় প্রশ্ন এই যে—'অপি চ, নির্বিষয়া নিরাশ্রয়া স্বপ্রকাশেয়মনুভূতিঃ স্বাশ্রয়-দোষবশাদনন্তাশ্রয়মনন্তবিষয়মাত্মানমনুভবতীতি।'

(ঐ—৯৮)

[আপনারা বলিয়া থাকেন, স্বপ্রকাশ (জ্ঞানস্বরূপ) এই অনুভূতি (জ্ঞান) স্বয়ং নির্বিষয় এবং নিরাশ্রয় বস্তু হইয়াও কেবল নিজ আশ্রয়ে অবিদ্যারূপ দোষ আসিয়া পড়ে বলিয়াই তাহার (ভ্রমবশতঃ) আপনার অনন্ত আশ্রয় এবং (জ্ঞাতারূপে) অনন্ত বিষয়ের প্রতীতি আসিয়া থাকে।]

শ্রীরামানুজ এই বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন: উক্ত আশ্রয়-দোষটি কি পারমার্থিক অথবা অপারমার্থিক?

ইহা পারমার্থিক সত্য বলিতে পারেন না। কারণ, ইহা স্বীকার করিলে অদ্বৈতহানি হইবে। কারণ ব্রহ্মসত্তার সঙ্গে পারমার্থিক

সত্তাযুক্ত স্বরূপভূত অন্য একটি অজ্ঞাননামক সত্তার স্থিতি স্বীকার করিতে হয়! ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বও অপ্রমাণিত হয়।

এই ব্রহ্মাশ্রিত অবিদ্যাকে অপারমার্থিক বলিলে এই অপারমার্থিক ভ্রম উপস্থিত হইবার অন্য কোন কারণ মূলে থাকা দরকার। এই-রূপে 'অনবস্থাদোষ' আসিয়া পড়ে। যুক্তির ধারা এইরূপ—দ্রষ্টা, দৃশ্য বস্তু হইতেছে দৃশিরূপ ব্রহ্মে অবিদ্যারূপ দোষের জন্য। এই অবিদ্যার মূলে অন্য কোন দোষ কল্পিত হওয়ার প্রয়োজন। পুনরায় এই কল্পিত দোষের মূলে আর একটি দোষ কল্পনা করিতে হয়। এইভাবে অনবস্থা-দোষ আসিয়া পড়ে।

৪। চতুর্থ প্রশ্ন এই যে—যদি অদ্বৈত-বাদিগণ বলেন এই অবিদ্যা অনির্বচনীয় বস্তু —অর্থাৎ অবিদ্যা সৎও নহে, অসৎও নহে; অন্য ভাষায় এই অবিদ্যাকে 'আছে' এই ভাষায় প্রমাণ করা যায় না; 'নাই' এই ভাষায়ও প্রমাণ করা যায় না। ইহা সদসৎ-বিলক্ষণ একটি বস্তু। ইহার কাজ ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করা ও তারপর জগৎ-প্রপঞ্চরূপ 'বিক্ষেপ' সৃষ্টি করা। এই শক্তিপ্রভাবে অদ্বৈত-সত্তা ব্রহ্ম বহুরূপে প্রতিভাত হইতেছেন।

শ্রীরামানুজ এই অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদকে নিরসন করিয়াছেন। তিনি শ্রীভাষ্যে বলিতেছেন:—

'অনির্বচনীয়ত্বং চ কিমভিপ্রেতম্?...এত-দুক্তম্ ভবতি—সর্বং হি বস্তুজাতং প্রতীতি-ব্যবস্থাপ্যম্, সর্বা চ প্রতীতিঃ সদসদাকারা, সদসদাকারায়াস্তু প্রতীতেঃ সদসদ্বিলক্ষণং বিষয় ইত্যভ্যুপগম্যমানে সর্বং সর্বপ্রতীতের্বিষয়ঃ স্যাদিতি।' (ঐ ৯৯) [জগতে সমস্ত বস্তুরই তত্ত্বং প্রতীতি অনুযায়ী নিরূপণ করিতে হয়। প্রতীতি মাত্রই 'সৎ' অর্থাৎ 'আছে' অথবা অসৎ বা 'নাই' এই আকারে হইয়া থাকে। এখন যদি বস্তুর অস্তিত্ব-নাস্তিত্বরূপ প্রতীতি বা প্রমাণের দ্বারা সদসদ্-বিলক্ষণ বস্তুকেও প্রমাণিত করিতে হয় তাহা হইলে তো সমস্ত বস্তু সমস্ত প্রতীতির বিষয় হইতে পারে।]

৫। পঞ্চম প্রশ্ন এই — অদ্বৈতবাদিগণ 'অবিদ্যাকে' ভাববস্তু বলিয়া স্বীকার করেন এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের দ্বারা উহা উপস্থাপিত করেন:

'অবিদ্যা'র ভাবরূপত্বের বিরুদ্ধে শ্রীরামানুজাচার্যের প্রশ্ন নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) যখন সাক্ষী-চৈতন্যের (অনুভবিতা আত্মার) স্বভাবই হইতেছে বস্তুর যথার্থ-স্বরূপ অনুভব করা এবং প্রকাশ করা তখন অজ্ঞান (অবিদ্যা) ভাবরূপী হইলেও তাহা যখন অসত্য বা মিথ্যাবস্তু (আপনাদের মতে) তখন সাক্ষী-চৈতন্যের সহিত এই অজ্ঞানের বিরোধ

(খ) দেখুন, 'আমি অজ্ঞ' এই কথাটিতে অহং বস্তু বা 'আমি' হইতেছে অজ্ঞানের আশ্রয় এবং 'আমি আমাকে জানি না' এই কথাটিতে 'আমি জানি না' এই প্রকার প্রতীতিতে বা জ্ঞানে 'অজ্ঞানবান আমি' হইতেছে বিষয়। সুতরাং উক্ত বাক্যে অহং বা আত্মা হইতেছে অজ্ঞানের বিষয় ও আশ্রয়। অতএব অজ্ঞানের বিষয় বলিয়া অজ্ঞানের ব্যাবর্তক। আবার আশ্রিত অজ্ঞানটি হইতেছে আত্মার বিশেষণ, কারণ 'আমি অজ্ঞ' শব্দটির অর্থ হইতেছে 'অজ্ঞানবান আমি' বা 'অজ্ঞানবিশিষ্ট আমি' —আত্মা হইতেছে তাহার বিশেষ বা আশ্রয়। এবং অজ্ঞান হইতেছে আত্মার আশ্রিত। এখন বলুন, 'আমি অজ্ঞ' বলিলে আত্মার এই অজ্ঞতার জ্ঞান আদৌ থাকে কি থাকে না? যদি বলেন জ্ঞান থাকে তাহা হইলে এই

আত্মজ্ঞানে বিনাশ্য এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা সেই আত্মাতে কিরূপে থাকিতে পারে? যদি বলেন জ্ঞান থাকে না, তাহা হইলে 'অহম্' পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত এই অজ্ঞান অর্থাৎ আশ্রয় ও বিষয়-ব্যাপারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। কোন বিষয়ে বা কোন স্থানে অজ্ঞান হইল, তাহা না জানিলে কোন অজ্ঞানের প্রতীতি হইতে পারে কি প্রকারে?

৬। ষষ্ঠ প্রশ্ন এই যে, নিত্যমুক্ত, স্বয়ং-প্রকাশ অনুভবস্বরূপ, একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম-বস্তুর অজ্ঞানানুভব সম্ভব কি করিয়া হয়?

যদি বলেন—ব্রহ্ম স্ব-অনুভবস্বরূপ, অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হইলেও যখন তাঁহার এই স্বরূপ-প্রকাশটি তিরোহিত হয় তখনই তিনি অজ্ঞান অনুভব করেন। তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করি—এই স্বরূপ-তিরোধান মানে কি? যদি প্রকাশ-স্বরূপটি অপ্রকাশিত থাকার নাম 'স্বরূপ-তিরোধান' তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—নিজ অনুভব বা প্রকাশই যাঁহার স্বরূপ তাঁহার স্বরূপ আবার অপ্রকাশিত থাকিবে কি প্রকারে?

আরও জিজ্ঞাসা করি, যদি বলেন ব্রহ্ম অজ্ঞানকর্তৃক আবৃত না হইয়া অজ্ঞানানুভব করিতে পারেন তবে ইহা বলা যায় তাঁর অজ্ঞানের কার্যরূপী জগৎপ্রপঞ্চের অনুভব করিতে সেই ভাবে পারা সম্ভবপর হইতে পারে তাহা হইলে 'অবিদ্যা নামক' আবরণী শক্তি মনিবার কি প্রয়োজন আছে?

অন্য প্রশ্ন এই যে, এই 'অবিদ্যার অনুভব' কি স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক? যদি স্বাভাবিক হয় তবে সব সময়ে এই অজ্ঞানানুভব হইবে এবং মুক্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না।

যদি বলেন, এই অজ্ঞানানুভব ব্রহ্মবস্তু হইতে হয় না, অন্য বস্তু হইতে হয়, তবে বলুন সেই বস্তুটি কি? যদি বলেন, ইহা অন্য একটি অজ্ঞান, এই অনুভাব্য অজ্ঞান হইতে পৃথক আর একটি অজ্ঞান উক্ত অনুভাব্য অজ্ঞানের অনুভূতির কারণ, তাহা হইলে 'অনবস্থা' দোষ সংঘটিত হয়। (ক্রমশঃ)

শরণাগত

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

এই জীবনের পাত্রখানি
নীল গরলে পূর্ণ ক'রে
রাখলে তুমি, হে রুদ্রাণী
ভাগ্যহত মোর অধরে।
শুনেছি মা জন্মাবধি
দয়ার তব নাই অবধি!
এই পেয়ালা চাস্ মা যদি
অধর হ'তে যাক না স'রে।

ক্ষম আমার ভীরু মনের
দুর্বলতা, মা ভবানী!
সব কিছুতেই এই ভুবনের
তোমার পদচিহ্ন জানি।
এস মা সারদামণি!
নমোঽস্তু তে নারায়ণী
মৃত্যুরে মা তুচ্ছ গণি,
আছি চরণ-তরি ধ'রে

শ্রীশ্রীসরস্বতী

স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ

মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীশ্রীসরস্বতীর পূজা বহুল প্রচলিত। কিন্তু এই প্রথা কতদিনের, দেবী সরস্বতীর আদি কোথায় কবে, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এইজন্যই কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস।

ভারতবর্ষে ধর্মাদি ব্যাপারে বেদই প্রাচীনতম প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ। বেদের অপর নাম শ্রুতি। এই শ্রৌত প্রমাণ ভিন্ন ধর্মাচরণ নিখিল ভারতীয় সমাজে অচল। বেদের মতে শক্তি প্রাচীনা হইলেও নিত্য নবীনা। পুরাণাদিতেও এই মতবাদের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি বর্তমান :

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥
দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥

তিনি নিত্যা, জন্মমৃত্যুরহিতা, আবার দেবগণের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত যুগে যুগে বহু প্রকারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহার এইরূপ আবির্ভাবসমূহকেই সাধকেরা 'তিনি এইরূপে উৎপন্না হইয়া থাকেন' বলিয়া থাকেন। সেই মহামায়া নিত্যা, সর্বজ্ঞা, সর্বশক্তিসম্পন্না, সেইজন্য বিভিন্ন সাধকের বিভিন্ন সাধনার ফলে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন লীলাবিগ্রহের বিবরণী শাস্ত্রাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। যুগে যুগে এই অপূর্ব লীলাবিলাসের ধ্যানে, লব্ধপ্রজ্ঞ বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন—"নব রে নব নিতুই নব, যখনই হেরি তখনই নব।"

ঋগ্‌বেদে সরস্বতী কোথাও নদী, কোথাও বা দেবনদীরূপে বর্ণিতা। আবার পূষা, ইন্দ্র, মরুৎগণের সহিত দেবীরূপেও সরস্বতীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ ভাগে বাক্‌রূপে এবং পরবর্তী কালে বাকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে আমরা সরস্বতীর বর্ণনা পাইয়া থাকি। ঋগ্‌বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলে উনপঞ্চাশত্তম সূক্তে ষোড়শ ঋকে সরস্বতী মাতৃগণের, নদীগণের ও দেবগণের শ্রেষ্ঠা বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন।

তাহা সত্ত্বেও, উত্তরকালে মনু সরস্বতীকে নদী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই নদী ব্রহ্মাবর্তের (বিঠুর) একতর সীমা কুরুক্ষেত্রে অন্তর্হিত হইয়া প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে মিলিতা হইয়াছেন। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর এই মিলনক্ষেত্রকে বহুযুগ ধরিয়া ভারতবর্ষ মহাতীর্থরূপে হৃদয়ের পূজা দিয়া আসিতেছে—"সঃ তীর্থরাজো জয়তু প্রয়াগঃ।" এই সরস্বতী প্রভাসক্ষেত্রে সমুদ্রে মিলিতা হইয়াছেন। সমুদ্র এবং সরস্বতীর মিলনক্ষেত্র প্রভাসভূমি তাই মহাতীর্থ। ভারতের পঞ্চ মহাতীর্থের মধ্যে প্রভাস অন্যতম। কোন পুণ্যকর্ম-অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে এই তীর্থসমূহ স্মরণ করার বিধি অদ্যাপি প্রচলিত আছে—"কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করানি চ'...ইত্যাদি।

ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ। সুতরাং নদীকে মা বলা কিছুই অশোভন নহে। বিশেষতঃ গঙ্গাদি পুণ্য নদীকে দেবীরূপে কল্পনা ভারতবর্ষের একটি বিশেষ অবদান। যুগে যুগে বহু সাধক গঙ্গাদিকে দেবীরূপে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে ভগবান

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাসহচর স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী ত্রিবেণী দেবীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। জগৎকারণ ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। সুতরাং লোককল্যাণকল্পে তাঁহার পক্ষে নদীরূপ ধারণ করা কিছুই অসম্ভব নহে। এইজন্যই সরস্বতী নদী দেবনদী এবং সর্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিতা হইয়া থাকেন। এই পূজা কত প্রাচীন সে কথা নির্ণয় করা খুবই শক্ত। প্রাচীন বৈদিক যুগে প্রজ্বলিত হুতাশনে হব্যাদি আহুতি দেওয়াই ক্রিয়াকাণ্ডের প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হইত। বেদের উপনিষদ্ ভাগে অবশ্য ধ্যান-ধারণাদির কথা বিশেষভাবেই পাওয়া যায়। কালবশে বৌদ্ধ প্লাবনের ফলে প্রাচীন বৈদিক রীতিনীতি বৌদ্ধভাবে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর সম্রাট পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ অনুষ্ঠান প্রাচীন বৈদিক রীতিনীতির পুনঃ প্রবর্তনের নিদর্শন হইলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু ইহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না। তাহার মন বেদাদি-বর্ণিত দেবদেবীর চাক্ষুষ দর্শন কামনা করিয়াই পরবর্তীকালে মূর্ত্যাদিতে উপাসনার প্রচলন করিয়াছে। খুব সম্ভব গুপ্তযুগে এবংবিধ মূর্তির ও মন্দিরাদির বহুল প্রচলন আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষের অসংখ্য মন্দিরে শ্রীভগবানের অসংখ্য মূর্তি। কোথাও দেব, কোথাও বা দেবীরূপে তাঁহার পূজা। দেবীরূপে বা মাতৃরূপে শ্রীভগবানের উপাসনা ভারতবর্ষেরই নিজস্ব আধ্যাত্মিক সম্পদ। তিনিই একাধারে মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, বিদ্যা, সম্পদ সবই।

শ্রীশ্রীসরস্বতীর দেবীরূপে উল্লেখ পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে বহুল উল্লেখ আছে। পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সর্বপ্রকারে শ্রুতির অনুগামী, একথা বলাই বাহুল্য। রামায়ণের বালকাণ্ডে ব্রহ্মা বাল্মীকিকে বলিতেছেন: "মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী।" "হে ব্রহ্মন্, আমার ইচ্ছাতেই স্বয়ং সরস্বতী তোমাকে এই প্রবৃত্তি দিয়াছেন।" সুতরাং শ্রীশ্রীসরস্বতী এখানে আর নদী নহেন, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সকলের মা। ভাগবতের মতে ইনি ব্রহ্মার কন্যা। "বাচং দুহিতরং স্বয়ম্ভোঃ।" ইনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নাম বাক্, বাণী, ভারতী। পুরাণাদিতে "গীর্গোর্বাগ্‌ভারতী ত্বং কবিবৃষরসনাসিদ্ধিদা সিদ্ধবিদ্যা" ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যত্র সরস্বতী দুর্গারূপেও বর্ণিতা হইয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভ-নিশুম্ভ কর্তৃক পরাজিত দেবগণের স্তবে প্রীতা হইয়া যে গৌরীমূর্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তিনি সাক্ষাৎ মহাসরস্বতী, এই কথা লোকপ্রসিদ্ধ। দেবীমাহাত্ম্যে উত্তর চরিত্র পাঠের প্রারম্ভে এই চরিত্রের ঋষি, ছন্দ এবং প্রয়োগাদি ব্যপদেশে একটি মন্ত্রপাঠের বিধান আছে: "ওঁ অস্য শ্রীউত্তরচরিত্রস্য রুদ্র ঋষিঃ, মহাসরস্বতী দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ভীমা শক্তিঃ, ভ্রামরী বীজম্, সূর্যস্তত্ত্বম্, সামবেদঃ স্বরূপম্। মহাসরস্বতীপ্রীত্যর্থং (কামার্থে) উত্তরচরিত্রজপে বিনিয়োগঃ।" ইষ্টলাভে পরিতৃপ্ত দেবগণ মহাদেবীর স্তবপ্রসঙ্গে তাঁহাকে সরস্বতীরূপেও প্রণাম করিয়াছেন:

"মেধে সরস্বতী বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

দেবি, আপনি মেধা, বাগ্দেবী, সর্বশ্রেষ্ঠা, সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী, দেবশক্তি এবং ঈশ্বরী। আপনি প্রসন্না হউন; নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীভগবান অর্জুনকে রণজয়ের নিমিত্ত শ্রীশ্রীদুর্গাস্তবগানে

অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন। অর্জুনকৃত এই স্তবেও ও সরস্বতী অভেদরূপেই বর্ণিতা হইয়াছেন: "স্বাহাকারঃ স্বধা চৈব, কলা কাষ্ঠা সরস্বতী।" অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সেই মহাশক্তিই যুগে যুগে সাধকের অভীষ্ট ফল প্রদানের নিমিত্ত নানা প্রকার লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়া সাধককুলকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গের কুলমণি শ্রীরঘুনন্দন শ্রীসরস্বতীপূজার বিধি, নিয়ম, মন্ত্র ইত্যাদির ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। গোবিন্দানন্দ প্রমুখ কোন কোন মনীষী ইহাকে গৌড়াচার বলিয়া ইহার শাস্ত্রীয় গৌরব অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহা মোটেই যুক্তিসহ নহে। শতপথ ব্রাহ্মণে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্রাহ্মণদের অন্যত্র পলায়ন এবং পলায়নপর কোন ব্রাহ্মণের সম্মুখে মূর্তিমতী সরস্বতীর আবির্ভাব এবং বেদরক্ষার অনুজ্ঞা কোনমতেই গৌড়ীয় ব্যাপার নহে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ে উল্লেখিত সরস্বতী-যজ্ঞের অনুষ্ঠানও এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে সন্দেহ নাই—"ভূপ, সরস্বতীমিষ্টিং করোমি বচনাৎ তব।" পিতৃশাপে মূক নাগরাজদুহিতা নন্দা এই যজ্ঞের ফলে পুনরায় বাক্‌শক্তিলাভে কৃতার্থা হইয়াছিলেন। তুলসীদাস-কৃত 'রামচরিতমানসের' প্রারম্ভেই সরস্বতীর বন্দনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: "বর্ণানাং অর্থ-সঙ্ঘানাং রসানাং ছন্দসামপি। মঙ্গলানাং চ কর্তারৌ বন্দে বাণীবিনায়কৌ॥" বর্ণ, অর্থ, রস, ছন্দ এবং মঙ্গলের অধিকর্তা বাণী এবং বিনায়ককে (গণেশকে) বন্দনা করি। মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে 'লঘু-সন্দেশপদা' সরস্বতীর উল্লেখ করিয়াছেন। আবার কিরাতার্জুনীয়মের অমর কবি ভারবি সরস্বতীকে 'প্রসন্নগম্ভীরপদা' বলিয়াছেন। সুবিখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ রঘুবংশের ২য় সর্গের টীকাপ্রণয়নকালে সরস্বতীর বন্দনা করিয়া এই মহৎ কার্য আরম্ভ করিয়াছেন:

"আশাসু রাশীভবদঙ্গবল্লী-
ভাসৈবদাসাকৃতদুগ্ধসিন্ধুম্।
মন্দস্মিতৈর্নিন্দিতশারদেন্দুং
বন্দেঽরবিন্দাসন সুন্দরি ত্বাম্"॥

এইস্থলে দেবী সরস্বতী নারায়ণের ঘরণী অন্যত্রও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়:

"সা মে বসতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী।
মুরারিবল্লভা দেবী সর্বশুক্লা সরস্বতী॥"

খ্রীষ্টীয় দশম শতকে বিষ্ণুশর্মা দুর্বিনীত রাজপুত্রদিগকে সুশিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে সরস্বতীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন:

"সরস্বতীবিনোদনং করিষ্যামি।"

ভারতেতর দেশেও কাব্য ইত্যাদিতে অধিষ্ঠাত্রী একজন দেবীর সন্ধান আমরা পাইয়া থাকি। মহাকবি মিলটন 'Paradise Lost' প্রণয়নকালে 'Muse' নামক একজন দেবীর পরিকল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মহৎ আশা, এই দেবীর প্রসাদে তিনি এখন কাব্য প্রণয়ন করিবেন যাহা ইতিপূর্বে ছন্দে বা গদ্যে কেহই প্রণয়ন করিতে পারেন নাই: "Unattempted yet in prose or rhymes," ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীমধুসূদন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হইয়াও কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে ভুলেন নাই; কেন না তাঁহার ধর্মমত যাহাই হউক না কেন. তিনি ভারতবাসী এবং ভারতীর বরপুত্র, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই—

"সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাহু
চলি যবে গেলা স্বর্গপুরে অকালে,
কহ, হে দেবি,
অমৃতভাষিণি, কোন্ বীরবরে বরি,
সেনাপতিপদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকুলনিধি॥"

রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনী সরস্বতীর বন্দনাগানে উচ্ছ্বসিত। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় তিনি বাল্মীকিকে "বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দবাণে বিদ্ধ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আবার 'পুরস্কার' কবিতায়—

"থাকো হৃদাসনে জননী ভারতী
তোমার চরণে প্রাণের আরতি
চাহি না চাহিতে আর কারো প্রতি
রাখি না কাহারো আশা।" ইত্যাদি

'মধুরাদপি মধুর' কাব্যকলার কথা কে না জানে?

অতএব একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, সর্বদেশের সর্বকালের মনীষিচিত্ত-মন্দিরে দেবী বাগ্‌বাদিনীর স্বর্ণসিংহাসন অচল অটল সুমেরুবৎ প্রতিষ্ঠিত। সেই সিংহাসন-পরিগতা মহাদেবী যে আমাদের আদি জননী! তাঁহাকে সর্বদাই আমরা নিকটে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি বলিয়াই ত এবংবিধ পূজাদি, আত্মবৎ সেবাদির প্রথা। যে সমস্ত ভাগ্যবান সাধক শ্রীশ্রী৺জগদম্বার কৃপায় ভক্তি-প্রেমের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের পূজা তিনি প্রত্যক্ষভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। দক্ষিণেশ্বরের দেব-দেউলে পূজারত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ কালীন দর্শনাদি যে এ বিষয়ে বর্তমান যুগের অকাট্যতম প্রমাণ, একথা আর বলিতে হইবে না।

কোন সময়ে প্রতিমাদির পরিবর্তে পুস্তকাদিতেই এই দেবীপূজা প্রচলিত ছিল। তাহার কিঞ্চিৎ আভাস অদ্যাপি বর্তমান। সরস্বতীর পূজার সময়ে পুস্তকাদি পূজার বিধানও আছে। ভক্তকবি রামপ্রসাদের ভাষায়—"মা আমার পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে ভাব তারে।"

শীতের কুহেলির অবসানে প্রকৃতিতে নব-বসন্ত-সমাগম মানুষের প্রাণে উল্লাসের সঞ্চার করিয়া থাকে। তাই সেই উল্লাস ও আনন্দের প্রারম্ভেই সদানন্দময়ী মায়ের পূজার বিধান, কেন না ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে উৎসব ও আনন্দের তিনিই যে সনাতন উৎস। তিনি সকলের হৃদয়ে সর্বদা বিদ্যমানা; এই বোধে বোধ হইলেই পরমানন্দ লাভ হয়। তাঁহার অপার করুণায় আমাদের শুভবুদ্ধির উদয় হউক; আমরা তাঁহাকেই সারাৎসার জানিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হই—ইহাই আমাদের আকুল প্রার্থনা—

"দুর্গমের দুঃখহর, জগতের জড়ত্বের নাশ কর, তুমি মহাবাণী, হোক বিশ্বে পূর্ণ পরকাশ দীপ্ত তব হাস। সিদ্ধির প্রসূতি তুমি, ঋদ্ধি আরাধিতা, হে অপরাজিতা।"

ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি
নমোঽস্তুতে॥

ওঁ তৎ সৎ ওম্

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

নব্য জীবনবেদের কথা

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

হিন্দুধর্মবিশ্বাসে বিপ্লব

হিন্দুদের বিশ্বাস অনুসারে জীবনের চরম লক্ষ্য মোক্ষের পথ ত্রিবিধ: জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম। এই তিনটি পথের মধ্যে কর্মের পথ বা কর্মযোগকে খানিকটা হেয় চক্ষে দেখা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু মোক্ষসাধনের পন্থা হিসেবে অন্য সব পথের সহিত কর্মকে সমপ্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর দ্ব্যর্থহীন অভিমত হলো: অজ্ঞ ব্যক্তিরাই বলে থাকে যে কর্ম ও জ্ঞান পরস্পর থেকে পৃথক, জ্ঞানীরা নয়। আমাদের প্রত্যেকটি সাধনমার্গ—কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ—একক ও প্রত্যক্ষভাবে মোক্ষলাভে সহায়তা ক'রতে পারে। অতএব, তাঁর নিজের ভাষায়, "Although a man has not attained a single system of philosophy, although he does not believe in any God and never has believed, although he has not prayed even once in his whole life, if the simple power of good actions has brought him to the state where he is ready to give up his life and all for others, he has arrived at the same point which the religious man will come through his prayers and the philosopher through his knowledge."[৫৪]

সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এই তত্ত্ব হলো মানুষের মর্যাদার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি—দুর্বল অধঃপতিত মানুষের সম্মুখে আশাবাদের উজ্জ্বল আলোক। তত্ত্বটি আবার সাম্যের এবং ফলে, ঐক্যের বিশ্ববাণী। গণতন্ত্রের দার্শনিক তত্ত্বের জন্য আর কোন উপাদানের প্রয়োজন আছে কি?

কিন্তু পূর্বেই বলেছি যে তত্ত্বটি হিন্দুর পরম্পরাগত চিন্তাধারার বিরোধী। তত্ত্বটি আবার খৃষ্টানদের ধারণারও পরিপন্থী, কারণ খৃষ্টীয় তত্ত্ব অনুসারে শুধু কর্মই পর্যাপ্ত নয়, ভক্তিও প্রয়োজন। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশকে এই দুই ধর্মেরই ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে বর্ণনা করা যায়। স্বামীজী দেখিয়েছেন, ধর্মশাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যার দরুনই এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, কর্মযোগের মাধ্যমে মোক্ষলাভ দুরূহ বা অসম্ভব। গীতায় মোক্ষকে 'ব্রহ্মনির্বাণ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ব্রহ্মনির্বাণকে খৃষ্টানদের 'attaining the Kingdom of Heaven within'—এর সঙ্গে তুলনা করা যায়।[৫৫] স্বার্থত্যাগ ও অহংভাব-ত্যাগের দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ ক'রতে সমর্থ হলে ব্যক্তি কর্মবহুল জীবনের মধ্যে থেকেও এই অবস্থায় উপনীত

৫৪ Karma-Yoga, Ch VI

৫৫ Swami Prabhavananda: Spriritual Heritage, op cit.

হতে পারে। উপনিষদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা যখন প্রচার করা হচ্ছিল তখন সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী আধুনিক যুগে আবার স্বামী বিবেকানন্দ-মুখ থেকে শুনতে পাওয়া গেল। এ কেবল হিন্দুধর্মবিশ্বাসে বিপ্লব নয়, গণতন্ত্র, আধুনিকতা এবং সমাজের গতিশীলতারও সহায়ক। এই কারণে চিন্তাবিদ্ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার স্বামীজীর সমাজদর্শনকে 'সমাজের গতিশীলতার গীতা' (Gita of Social mobility) আখ্যা দিয়েছেন।[৫৬]

বিশ্বমানবের আহ্বান

পরিশেষে নব্য বেদান্তে বিশ্বামানবের আহ্বানের উল্লেখ ক'রে এই নিবন্ধের শেষ ক'রব। আমাদের রেনেশাঁয় বিশ্বজনীনতার প্রথম ছাপ এঁকেছিলেন রাজা রামমোহন; স্বামী বিবেকানন্দ তাকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলেন। এবং তখন থেকে আমাদের নবজীবন তার দেহে এই নামাবলী বহন করে চলছে। মনীষী রোমাঁ রোলাঁ স্বামী বিবেকানন্দের এই অবদানকে উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের মানবজাতির 'ঐক্য আন্দোলনের' (human unity movement) সুন্দরতম বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করেছেন।[৫৭]

মানবজাতির এই ঐক্য আন্দোলনের শুরু থেকেই আলোচনা করা যাক। ১৮৩১ সালে রাজা রামমোহন ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সে যাবার ব্যবস্থা করার পর জানতে পারেন যে এর জন্য ইংল্যাণ্ডস্থিত ফরাসী রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে অনুমতিপত্র নিতে হবে, এবং রাষ্ট্রদূত তাঁর সম্পর্কে সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করে তবেই অনুমতিপত্র দেবেন। তখন তিনি ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে একখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য পত্র লেখেন যা থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করছি :

"It is now generally admitted that not religion only but unbiased common sense as well as the accurate deductions of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations, and tribes are only branches. Hence enlightened men in all countries must feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all inpediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race."

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে লেখা হলেও পত্রখানি বিশ্বজনীনতার সুরে ভরপুর। ডি. এম. শর্মার মতে, এ হলো আমাদের উপনিষদের বিশ্বজনীনতাকে উপলব্ধি ও পরিপূর্ণ করবার প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস

রামমোহনের আরব্ধ কার্য তাঁর উত্তরসূরিগণ ঐকান্তিকার সঙ্গেই সম্পাদনের প্রচেষ্টা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শনে পাঠকগণকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনোৎসবে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৬০] কিন্তু তার সমসাময়িক সমাজনেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এক সময় খৃষ্টধর্মের দিকে এতটা ঝুঁকে পড়েছিলেন যে. মিলনগীতির সুর

৫৬ Creative India

৫৭ op. cit.

৫৮ Collet : the Life and Letters of Raja Rammohan Ray

৫৯ Renaissance of Hinduism, op. cit.

৬০ রবীন্দ্রনাথ : পূর্ব ও পশ্চিম

একরকম শোনাই যাচ্ছিল না। সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যাবার আগেই অবশ্য বিচারপতি রানাডে একে ঐকতানের অন্তর্ভুক্ত করেন। ভারতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে রানাডের কল্পনা সুদূরপ্রসারী হলেও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বিশ্বমানবের উপর। তাঁর মতে, বিশ্বের সকল জাতির সমবায়ে এক মহান ও পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার প্রতিষ্ঠাই হল ভারতের আদিষ্ট কর্তব্যভার, এবং তাঁর আশা ছিল যে ভারত এই কর্তব্য সম্পাদন করবেই।[৬১]

এই আশাকেই পূর্ণতররূপে উপস্থাপিত করেন স্বামী বিবেকানন্দ। এর জন্যে তিনি হিন্দুধর্মকে খৃষ্টধর্ম ও ইসলামের মত aggressive করে তুলতে চেয়েছিলেন যাতে হিন্দুধর্মবিশ্বাস সমস্ত আধুনিক অভিব্যক্তিকে স্বাগত জানিয়ে অঙ্গীভূত করে নিতে পারে।[৬২] স্বামীজীর কাছে এই কার্য ছিল বেদান্তের বিস্তারকার্য মাত্র—বৃহত্তর ঐক্যের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ মাত্র। ফলে স্বামীজীর পক্ষে 'উত্তরোত্তর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন হওয়া' [৬৩] স্বাভাবিকই ছিল!

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রোলাঁ স্বামীজীর এই অবদানকে আমাদের মানবজাতির ঐক্য আন্দোলনের সুন্দরতম বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করেছেন। একে প্রধানতম বৈশিষ্ট্যও বলা যায়। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে রেনেশাঁর তাৎপর্য হলো মানুষকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যে, যেন এই পৃথিবী সকল দিক দিয়ে মানুষের বসবাসযোগ্য হয়। ব্যক্তির মধ্যে বিশ্বমানবের প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তবেই এই ব্যবস্থা সম্ভব। অতএব, বিশ্বমানবের আদর্শ মানবতার চূড়ান্ত রূপ।

এই বিশ্বমানবের বাণী প্রচার করেই রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী নতুন যুগের দার্শনিক-রূপে বিশ্ব-পরিচিতি লাভ করেছেন, এবং আমাদের ধর্ম-আন্দোলনগুলির বিশ্বশ্রদ্ধার মূলেও আছে এই বিশ্বমানবতা।

বিশ্বমানবতার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো: যে ব্যক্তি নিজের মুক্তি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে কোন কিছুই তার ভালবাসার পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করতে পারে না। নিজের মধ্যে ঐক্যসাধন করেছে বলে সে অপরকেও ঐ লক্ষ্যসাধনে প্রণোদিত করে। ফলে আদর্শ ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে পূর্ণাঙ্গ সমাজ-ব্যবস্থা।[৬৪]

এই জীবনদর্শন ঐক্যের আহ্বান ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং এই আহ্বান বারবার ধ্বনিত হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের নয়া বেদান্তে। ভারতীয় রেনেশাঁর পটভূমিকায় এই আহ্বান হলো বিশ্বের অগ্রগতির সঙ্গে সংযুক্ত করার আহ্বান মাত্র। (ক্রমশঃ)

৬১ Social Conference Address at Satara

৬২ My Master, op. cit.; also Aggressive Hinduism

৬৩ Discovery of India

৬৪ Radhakrishnan: An Idealist View of Life

ভগিনী ক্রিশ্চিন

ব্রহ্মচারী শ্যামল

সন্ধানশেষে পরশপাথর

ডেট্রয়েট। ১৭ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৪। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরপূর্বদিকের এই শহরটিতে গতানুগতিকতার ধারা পালটে গিয়েছিল এক নূতন ব্যক্তির আগমনে—দূর ভারতবর্ষ থেকে আগত এক হিন্দু সন্ন্যাসী—স্বামী বিবেকানন্দ। বড় বড় পত্রিকাতে বিস্তৃত আলোচনা চলল এই বৈদ্যুতিক ব্যক্তিত্বটিকে নিয়ে। মিশিগানের ভূতপূর্ব গভর্নরের স্ত্রী মিসেস্ বাগলির বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন নবাগত এই সন্ন্যাসী। সুধী-গুণগ্রাহীদের ঔৎসুক্য ক্রমাগতই বেড়ে চলেছিল এঁকে নিয়ে আর তার সাথে বেড়ে চলেছিল এই "সাইক্লোনিক হিন্দুর" বিরুদ্ধে গোঁড়া খ্রীস্টান পাদরীদের সরব নিন্দার ঘনঘটা। সেই শীতে ডেট্রয়েট শহরে ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন আরও অনেকে। কিন্তু গতানুগতিক নিষ্প্রাণ এই বক্তৃতাগুলি সত্যানুসন্ধিৎসুদের নতুন কিছুই দিতে পারেনি, বরং এনেছিল চিরাচরিত হতাশার পুনরাবৃত্তি।

এমনিই এক সময়ে ১৭ই ফেব্রুআরি ১৮৯৪-এর অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায় এক "আশাবাদী" শ্রোতা মিসেস্ ফাঙ্কি নিয়ে এসেছিলেন আর একজন সহযাত্রীকে—ক্রিশ্চিন্ গ্রিন্‌স্টাইডেল। অনেকটা অনিচ্ছুক এবং সন্দিগ্ধ হয়েই এসেছিলেন সেদিন ক্রিশ্চিন ইউনিটেরিয়ান চার্চের দোরগোড়ায় অপরিচিত হিন্দুসন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনতে। এসেছিলেন শুধু ফাঙ্কির অনুরোধে যিনি বিশ্বাস করতেন এভাবেই খেপার মত খুঁজে খুঁজে হয়ত কোনদিন বা পাওয়া যাবে পরশপাথর।

জীবনের কত বড় একটা নবদিগন্তের দর্শন যে সেদিন পেতে যাচ্ছিলেন এবং এই নতুন দিগ্‌দর্শন যে তাঁর জীবনে কত বড় আমূল এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে যাচ্ছিল তার সামান্যতম আভাসও স্বামীজীর দর্শনের আগে ক্রিশ্চিনের মনে ওঠেনি। সেদিন বক্তৃতার বিষয় ছিল "মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব"—যে দেবত্বের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী বিবেকানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন। "নরেন্দ্রকে আমি আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি", বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

ভাষণ শুরু হবার কয়েক মুহূর্ত মধ্যেই গভীর অনুভূতির ভাবরাজ্যে ডুবে গিয়েছিলেন সেদিনকার এই দুই শ্রোতা—ফাঙ্কি আর ক্রিশ্চিন। ক্রিশ্চিনের ভাষাতেই তাঁর দীর্ঘ অনুভূতির কিছুটা তুলে ধরছি—"নিঃসন্দেহে পূর্বের অগণিত জন্মজন্মান্তরেও আমরা এত বড় একটা পদক্ষেপ কখনো নিইনি। কারণ বিবেকানন্দকে পাঁচ মিনিট শোনার আগেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম সেই পরশপাথরের সন্ধানই পেয়েছি যা আমরা এতদিন ধরে খুঁজছিলাম। এক নিঃশ্বাসে দুজনেই বলে উঠেছিলাম, 'ভাগ্যিস এসেছিলাম!'[১]

ধার্মিক লোক শীর্ণকায় হয় এইতো সবাই জানতো। কিন্তু শক্তিমান আধ্যাত্মিক পুরুষের কথা কে কবে শুনেছিল? এই অদ্ভুত ব্যক্তিটির কাছ থেকে শক্তির যে বিচ্ছুরণ হচ্ছিল

১ Reminiscences of S. Vivekananda

তাঁর তুলনায় সকলকেই অতি ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর মানসিক ব্যক্তিত্বটাই প্রথম বিরাটের সাড়া জাগিয়েছিল আমাদের মধ্যে...আমরা অনুভব করেছিলাম এরকম একটি মন সাধারণের এমনকি প্রতিভাশালী ব্যক্তিদেরও বহু ঊর্ধ্বে, এর প্রকৃতিটাই স্বতন্ত্র ধরনের। এই মনের ধারণাগুলি এত স্বচ্ছ, এত শক্তিশালী এবং এত ঊর্ধ্বজাগতিক প্রতিভাত হয়েছিল যে, আমাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না এই সব ভাব কোন একটি সীমায়িত মানুষের অন্তর থেকে আসতে পারে।"[২]

ক্রিশ্চিনের জীবনস্মৃতি থেকে আমরা জানতে পারি সেদিনের প্রথম বক্তৃতায় স্বামীজী কত বহুবিচিত্র সুরে ও কথায় কখনও হাসি, কখনও গভীর চিন্তা, কখনও আশা, কখনও উচ্চতম আদর্শবাদ এবং কখনও গভীরতর হৃদয়াবেগ ও করুণ সুরে বারবার ব্যক্ত করেছিলেন ভারতীয় আধ্যাত্মিক সভ্যতার চূড়ান্ত বাণীটি—মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব। স্বীয়-গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সিংহ আর মেষ-শাবকের গল্পটিও বলেছিলেন। ক্রিশ্চিন আর ফাঙ্কি অভিভূত আনন্দে শুনেছিলেন "মানুষ ভ্রমবশতঃ দরিদ্রের বেশে চিরদিন হেঁটে চলেছে স্বর্ণখনির ওপর দিয়ে।" তাঁর দেবত্বকে ধীরে ধীরে জানতে হয় না, ক্রমে ক্রমে বিকাশও করতে হয় না, তা একটি চিরন্তন সত্য এবং চিরদিনই বর্তমান। শুধু অনুভব করলেই হল। অনুভূতির তীব্রতায় ঋষিকণ্ঠ সেদিন ফেটে পড়েছিল শ্রোতাদের অন্তর উদ্ভাসিত করে উপনিষদের বাণী নিয়ে—"তত্ত্বমসি" আর "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"। সেদিন ইউনিটেরিয়ান চার্চের প্লাটফর্ম থেকে ক্রিশ্চিন যা শুনেছিলেন তা শুধু বক্তৃতা নয়, দর্শনচর্চা নয়, মননশীলতা নয়, বুদ্ধির প্রাখর্যও নয়। ক্রিশ্চিনের ভাষায় তা হ'ল "a trumpet-call to awake. One felt one never knew what music was until one heard that marvellous voice." 'জাগরণের তূর্যনিনাদ। সে অমৃতস্যন্দী কণ্ঠস্বর শোনার আগে সঙ্গীত কাকে বলে তা যে অজানা থেকে যায়,—তা অনুভব না করে পারে না কেউ।' "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—কবিমুখনিঃসৃত এই দেবভাষা সেদিন তাঁদের অন্তরকে জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ-সুখ আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বহু ঊর্ধ্বে এক "purer and rarer atmosphere, his own radiant atmosphere"-এ, 'পবিত্রতর দুর্লভতর পরিবেশে, তাঁর সান্নিধ্যের আনন্দ-ভাস্বর পরিবেশে' তুলে নিয়েছিল। যেখান থেকে বক্তৃতাশেষে ফিরে এসে দুজনেই অনুভব করেছিলেন "was it possible to hear and feel this and ever be the same again ?"[৩] 'এ শোনার পরও, এরূপ অনুভূতির পরও কি আগের মতোই থাকা যায়?'

সে অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায় ইউনিটেরিয়ান চার্চের অগণিত শ্রোতার মধ্যে বিবেকানন্দের দেববাণীর কি প্রভাব পড়েছিল আজ প্রায় ৮০ বছরের ব্যবধানে তা সঠিক জানা সম্ভব নয়। তবে ডেট্রয়েট নগরীতে সংবর্ধনার কথা আমরা কিছু পাই সমসাময়িক সংবাদপত্র-মারফত। মিশনারীরা হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে যে-পরিমাণ দলবদ্ধ বিরোধিতা ও সুপরিকল্পিত আক্রমণ করেছিল তা মেরী লুই বার্ক "Climax at Detroit and the warrior Prophet"

২ Reminiscences of S. Vivekananda p. 160-61

৩ Reminiscences p. 162

ইত্যাদি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অদ্ভুত রকমের অজ্ঞ এবং কুসংস্কারগ্রস্ত শ্রোতৃবৃন্দ স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, প্রচলিত হিন্দুপ্রথা অনুযায়ী তাঁর মা তাঁকে কুমীরের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন কিনা, ভারতীয়েরা বিধবা পোড়ায় কিনা; অথবা জগন্নাথের রথের তলায় ইচ্ছে করে প্রাণবিসর্জন করে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন। সহজেই অনুমেয় যে, সেদিনের বহু শ্রোতার মাঝখান থেকে ক্রিশ্চিনের মতো স্বামীজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীর উদ্ভব বিবেকানন্দ-জীবনের এক অভিনব আবিষ্কার।

ক্রিশ্চিনের জন্ম জার্মানীর নুরেনবুর্গ শহরে ১৮৬৬ সালের ১৭ই আগস্ট। কান্ট-হেগেল-স্পিনোজার দেশের রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল গভীরমননশীল এবং সত্যানুসন্ধী এই চরিত্রটির ধমনীতে। দার্শনিক চিন্তাশক্তি ছিল ক্রিশ্চিনের জন্মগত উত্তরাধিকার। তিন বছর বয়সে শিশু ক্রিশ্চিনকে নিয়ে পিতামাতা সুদূর জার্মানী ছেড়ে চলে এসেছিলেন আমেরিকার ডেট্রয়েট নগরীতে স্থায়ী বসবাসের জন্য। পিতা ফ্রেডারিক গ্রীনস্টাইডেল ছিলেন একজন জার্মান পণ্ডিত। তাঁর চরিত্রে ছিল উদারতা ও স্বাধীন চিন্তার প্রাচুর্য এবং তার সঙ্গে বাস্তব পৃথিবীর সহিত পরিচয়ের অভাব। তাই সন্তানদের জন্য কিছু রেখে যেতে পারেননি। মাত্র সতের বৎসর বয়সে যেদিন পিতাকে হারিয়েছিলেন, সেদিন থেকে প্রায় দীর্ঘ ২০ বছর তাঁকে কঠোর জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পিতা কিছুই রেখে যেতে পারেননি। দুঃখিনী মা আর পাঁচটি ছোট বোনের অন্নবস্ত্রের সংস্থানের কার্য যুক্তরাষ্ট্রের মত জীবনযাত্রার উচ্চ মানের দেশে যে কতখানি দুঃসাধ্য কর্ম তা আমরা অনেকেই ধারণা করতে পারব না। ক্রিশ্চিন ছিলেন জন্মগত শিক্ষয়িত্রীও বটে, যার পরিচয় উত্তরজীবনে আমরা বিস্তৃতভাবে পাব। ক্রিশ্চিন শিক্ষয়িত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ডেট্রয়েট ফ্রি পাবলিক স্কুলে। আর তার সঙ্গে যুঝে-ছিলেন পারিবারিক দারিদ্র্যের অসহনীয় জ্বালার বিরুদ্ধে। বিধাতার এই কঠোর বিধান নিতান্ত অল্পবয়সেই ক্রিশ্চিনের জীবনে এনেছিল দুটি ভাবের সমন্বয়। একটি সাংসারিক আনন্দের প্রতি অনাসক্তি আর একটি সংসারের পরপারে কোন মহাজীবনের জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা। চরম দুঃখের দিনেও ধর্মকে ক্রিশ্চিন ছাড়েননি। কিন্তু সেদিনকার নিষ্প্রাণ বাক্‌সর্বস্ব শতধা-বিভক্ত ক্রিশ্চান চার্চের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন এই নারী। ডেট্রয়েটের প্রথম ক্রিশ্চান সায়েন্টিস্ট দলের সদস্য হয়ে-ছিলেন ক্রিশ্চিন। কিন্তু সেখানেও মেলেনি জীবনসমস্যার সমাধান। উত্তরকালে জীবন-সায়াহ্নে স্বামীজীর দৈব-সান্নিধ্যের উল্লেখ করে ক্রিশ্চিন বলেছিলেন, "সকলেই তাঁকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল, নানা সমস্যার উত্তর জেনে নিয়েছিল। আমার কিন্তু স্বামীজীকে এই কষ্ট দেবার কথা মনেই ওঠেনি। সেই জ্যোতির্ময় সান্নিধ্যে এসেই সব সন্দেহের অবসান হয়েছিল। তাঁর বক্তৃতার প্রথম ক'টি বাক্য শোনার পরে সবসময়েই মনে হত এ শুধু শোনা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতি।"[৫] এই বিশ্বাস-অবিশ্বাস, হতাশা-উদ্দীপনার টানাপোড়েনের মধ্যে অনেকটা ঈশ্বরের সান্নিধ্যের মতোই নেমে এসেছিলেন যুগর্ষি বিবেকানন্দ। আবাল্যের জীবনসমস্যার সমাধান খুঁজে পেলেন ক্রিশ্চিন।

প্রাচ্যদেশীয় অর্থে 'গুরু' কাকে বলে

৫ Prabuddha Bharata, 1930, p. 421

জানতেন না এই পাশ্চাত্য নারী। কিন্তু প্রথম দর্শনেই ক্রিশ্চিন এই অপরিজ্ঞাত ভারতীয় ঋষির পায়ে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। প্রথম বক্তৃতার অনুভূতির গভীরতায় ক্রিশ্চিন অনেকটা দিব্যভাবেই অনুভব করেছিলেন, "যদিও এই ভাবগুলি অত্যাশ্চর্য এবং এই বিস্ময়কর বক্তার অন্তর থেকে বিচ্ছুরিত অতীন্দ্রিয় এক সত্তা (intangible something) দৈবভাবেই আমাদের স্পর্শ করেছিল, তবুও মনে হয়েছিল এসব আশ্চর্যভাবেই আমার পূর্বপরিচিত। নিজের অজ্ঞাতসারেই বলে উঠেছিলাম, 'পূর্বে কোথাও না কোথাও আমি জেনেছি এই ব্যক্তিত্বটিকে।' সূর্যরশ্মিঘনীভূত আলোর মত এক স্বর্ণাভ রক্তিম আভায় স্বামীজী সেদিন ফেটে পড়েছিলেন আমাদের ওপরে।"

"রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য"—ক্রিশ্চিনের মনে সেদিন পূর্বজন্মজন্মান্তরের অস্ফুট স্মৃতির কতখানি উদিত হয়েছিল তা বলা দুঃসাধ্য। তবে উত্তরকালের বিবেকানন্দগতপ্রাণ এই মহীয়সী নারীর ত্যাগ আর সাধনোজ্জ্বল জীবন দেখে প্রথম দর্শনের এই স্মৃতি অভ্রান্ত বলেই মনে হয়। স্বামীজীর সেবারের ডেট্রয়েটের প্রতিটি বক্তৃতাতে গিয়েছিলেন ক্রিশ্চিন আর তাঁর আশাবাদী বন্ধু ফাঙ্কি। সাগ্রহে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন আরও দশজনকে। বলেছিলেন, "এসো। এই আশ্চর্য বক্তার কথা শোনো। এরকম আমরা কখনও আগে শুনিনি।"

সেবার স্বামীজীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়নি কারও। ধূমকেতুর মত বক্তৃতাসফর শেষ করে মাত্র কয়েকদিন পরেই ২৩শে ফেব্রুআরি, ১৮৯৪ স্বামীজী চলে গিয়েছিলেন ডেট্রয়েট শহর ছেড়ে। পেছনে ফেলে গিয়েছিলেন দুই অপরিচিত ভাবী শিষ্যকে। ক্রিশ্চিন আশা ছাড়েননি, ফাঙ্কিও। কোন এক অজ্ঞাত প্রেরণায় দু'জনেই বিশ্বাস করতেন—"কোনওখানে, কোনওভাবে গুরুদেব আমাদের আবার তাঁর দৈবসান্নিধ্যে শিক্ষা দেবেন।"[৬]

সহস্রদ্বীপোদ্যানের স্বর্গীয় দিনগুলি

মুমুক্ষু প্রাণের এ আশা কল্পনাতীতভাবেই সফল হয়েছিল অচিরে। জনসমাকীর্ণ ডেট্রয়েটের পরিবর্তে সেণ্ট লরেন্স নদীর ওপরে নির্জন বনমধ্যস্থ জনকোলাহল থেকে বহু দূরে সহস্রদ্বীপোদ্যানের শান্তিময় আবহাওয়ায় স্বামীজীকে পেয়েছিলেন ক্রিশ্চিন আর ফাঙ্কি। ক্রমাগত বক্তৃতা করে ক্লান্ত হয়েছিলেন স্বামীজী, আর অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছিলেন এ রকম বক্তৃতাসফর করে পাশ্চাত্যের বুকে বেদান্তের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে কতগুলি পবিত্র জীবনে উচ্চতম বেদান্ত-সত্যগুলিকে অনুপ্রবিষ্ট করাতে হবে। এ ভাবে গড়ে ওঠা কয়েকটি চরিত্রই দৃঢ়ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠা করবে বেদান্তধর্মকে। স্বামীজী খুঁজছিলেন কয়েকটি অনুরাগী পবিত্র জীবন আর একটি উপযুক্ত স্থান। দুটোই এসেছিল। মিস্ ডাচার নামে স্বামীজীর এক অনুরাগী সহস্রদ্বীপোদ্যানে তাঁর বাড়ীটি সাজিয়ে গুছিয়ে স্বামীজীকে আহ্বান করলেন বেদান্ত শিক্ষা দিবার জন্য, আর নিষ্ঠাবান ভক্তরাও এসেছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন, "যারা তিন শ' মাইল পাড়ি দিয়ে এই নির্জন আশ্রম-পরিবেশে আসতে পারে তারাই আমার শিষ্য হবার উপযুক্ত।"[৭]

---

৬ Reminiscences, p. 165

৭ Reminiscences p. 126

তিন শ' নয়, সাত শ' মাইল দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ভাবী গুরুর পদপ্রান্তে এসে পড়েছিলেন দুই শিষ্যা, ক্রিশ্চিন আর ফাঙ্কি। কেউ ডাকেনি, খবরও কেউ দেয়নি, শুধু শুনেছিলেন স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যানে চলে এসেছেন। এসেছিলেন ১৮৯৫ খ্রীঃ ১৩ই জুন এক বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রিতে, অজানা পার্বত্য পথে। দুজনেই আগ্রহে অধীর, সংশয়ের দোলায় দোদুল্যমান। প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। সন্ধান করে জানলেন মিস ডাচার নামে জনৈকা ভদ্রমহিলার বাড়ীতে এক অদ্ভুতদর্শন ব্যক্তি এসেছেন। দুজনেই বুঝলেন ঠিকানা মিলেছে। দ্বারপ্রান্তে যখন এসে পৌঁছালেন ওপরে শোনা গেল স্বামীজীর সেই কণ্ঠস্বর যা ডেট্রয়েটের সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যায় মহাজীবনের ডাক দিয়েছিল। অভূতপূর্ব আবেগে দুজনেই কাঁপছিলেন, শুনতে পাচ্ছিলেন নিজেদের হৃদস্পন্দন।

জন্মান্তরের গুরুসান্নিধ্য। দর্শনমাত্রেই পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে বসে পড়েছিলেন দুজনে। গভীর আবেগে ক্রিশ্চিন বলেছিলেন, "আজ ভগবান যীশু পৃথিবীতে স্থূল শরীরে থাকলে আমরা যেভাবে তাঁর কাছে শিক্ষা নিতে আসতাম, আপনার কাছে সে আশা করেই এসেছি।" বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "হায়, যদি যীশুর মতই আমিও এখনই তোমাদের মুক্ত করে দিতে পারতাম!" উত্তরকালে এই দুই মহাপ্রাণ শিষ্যার সম্বন্ধে বলতেন স্বামীজী, "শত শত মাইল অতিক্রম করে আমাকে খুঁজতে এসেছিল এরা, আর এরা এসেছিল এক বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রে।"

যে বারজন মার্কিন নরনারী সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর কাছে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র ক্রিশ্চিনকেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন ভবিষ্যতে ভারতের সেবিকা হিসাবে। দীক্ষার পূর্বদিন স্বামীজী মানসনেত্রে ক্রিশ্চিনের ভবিষ্যৎ ভারত-জীবনের পূর্ণ ছবি দেখেছিলেন এবং অবিশ্বাস্য ভাবেই তাকে জানিয়েছিলেন অনাগত দিনের ইতিহাস—ভারতে কোথায়, কিভাবে, কতদিন তার জীবন কাটবে। মানস নেত্রে দেখেছিলেন এই মহীয়সী নারীই হবে ভারতের বেদীতে বিবেকানন্দের প্রথম উৎসর্গকৃত ফুল আর এই সেবার ফলশ্রুতি হিসাবে এই জীবনেই ক্রিশ্চিনের তৃতীয় নয়ন অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবে, তাও দেখেছিলেন গুরু বিবেকানন্দ।[৮] মহামায়ার কাজের জন্য পুণ্যভূমির বেদীতে স্বামীজী দিলেন পাশ্চাত্যের একটি পবিত্রতম জীবন। সহস্রদ্বীপোদ্যান। ১৮৯৫।

সহস্রদ্বীপোদ্যানের সাতটি সপ্তাহ স্বামীজীর স্বল্পায়ু জীবনের একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। নিউইয়র্কের প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততা আর নানা বাধাবিপত্তির বেড়াজাল চিরমুক্ত সন্ন্যাসী-মনটিকে করে তুলেছিল শান্ত ও মুক্তজীবনের জন্য লালায়িত। সহস্রদ্বীপোদ্যানে যে মানুষটি এসেছিলেন তিনি "cyclonic Hindu" নন, "warrior prophet" নন, বৈদুতিক বক্তা নন, বরং ঠিক তার বিপরীত—আজন্ম ধ্যানসিদ্ধ ঋষি, করুণাময় বুদ্ধহৃদয়, মায়ামুক্ত নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক, তরুতলবাসী সন্ন্যাসী, যাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হল—মুক্তি। এখানেই তিনি লিখেছিলেন মুক্তির মহাসঙ্গীত—Song of the Sannyasin। উত্তরকালে এই দিনগুলির কথা স্মরণ করে[৯] স্বামীজী বলতেন, *পাশ্চাত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কেটেছিল এই ধ্যানক্ষেত্রে।*

৮ Prabnddha Bharata, 1930 p.421
৯ Reminiscences, p. 165

সেণ্টলরেন্স নদীর ওপরে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ। অধিকাংশই নির্জন বনানীসংকুল। দূরদিকচক্রবাল-বিসর্পিত অসীম আকাশ, অখণ্ড স্তব্ধতা। এরই মাঝখানে সবচেয়ে বড় দ্বীপটি হল সহস্রদ্বীপোদ্যান। খাড়া পাহাড়ের ওপর আশ্রম-পরিবেশে বাড়ীটি অবস্থিত। সকাল সন্ধ্যা বিকেল রাত্রি স্বামীজী সকলকে ভরিয়ে রাখতেন এক অখণ্ড আধ্যাত্মিক ভাবের নেশায়। শরীরধারণের নিতান্ত প্রয়োজন-গুলোর বাইরে সেই সাতটি সপ্তাহ ধরে বিবেকানন্দগতপ্রাণ শিষ্যেরা একটি বস্তুই অনুভব করেছিলেন—ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য।

সাধারণতঃ সকলকে নিয়ে স্বামীজী বসতেন সন্ধ্যার পরে। বক্তৃতা করতেন না। গভীর ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে কথা বলে যেতেন, সে সব স্বর্গীয় বাণী জনৈকা শিষ্যা মিস ওয়াল্ডো অথবা সিস্টার হরিদাসী অমূল্য Inspired Talks (দেববাণী) নামক বইটিতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সে বৈদ্যুতিক বাণীর স্পর্শে শিষ্যদের মন উঠে যেত এক ঊর্ধ্বজাগতিক রাজ্যে। আবার কখনও সব ভাষা নীরব হয়ে ডুবে যেত ধ্যানের গভীরতায়। স্বামীজী ডুবে যেতেন গভীর ধ্যানে। সে মহামৌন ধ্যান কখন চলত মধ্যরাত্রি কিংবা শেষরাত্রি পর্যন্ত। স্বামীজী যেন আবার তাঁর নিজস্ব ধ্যানসমাধির জগৎকে ফিরে পেয়েছিলেন সহস্র-দ্বীপোদ্যানের মৌনমহান নিঃশব্দ অরণ্যের গভীরতায়। তাই পাশ্চাত্যে থাকাকালীন এখানেই প্রথম স্বামীজী সমাধিমগ্ন হন, যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন মিসেস্ ফাঙ্কি তাঁর স্মৃতিকথায়। ধ্যানস্তিমিত স্বামীজীর সান্নিধ্যে শিষ্যরাও ডুবে যেতেন গভীর ধ্যানে। কোন কোন দিন ধ্যান সুদীর্ঘ হোতো না। স্বামীজী আবার সুরু করতেন দেববাণী। অদ্ভুত আকর্ষণ সে সব কথার। দৈবপ্রেরণার উন্মাদনায় কতদিন সারারাত কেটে গিয়েছে, ভোরের আলো এসেছে। শিষ্যরা বুঝতেও পারেননি স্বামীজী কি ভাবে, কেমন করে তাঁদের নিয়ে গিয়েছিলেন জগদতীত এক রাজ্যে যেখান থেকে প্রাত্যহিক জগতে নেমে আসাটা ছিল এক বেদনাময় অনুভূতি।

সহস্রদ্বীপোদ্যানের দিনগুলিই ক্রিশ্চিনের জীবনের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অধ্যায়। স্বামীজীর স্বল্পায়ু দেবদুর্লভ জীবনেও এই সাতটি সপ্তাহ এক অবিস্মরণীয় সময়। মর্মস্পর্শী ভাষায় ক্রিশ্চিন এই অবিস্মরণীয় দিনগুলিকে বর্ণনা করেছেন। সপ্তর্ষির একজন, অখণ্ডের ঘরের অধিকারী জগতের সমস্ত মায়িক বন্ধনকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এখানে গেয়েছেন মুক্তির মহাসঙ্গীত—The Song of the Sannyasin, যে মুক্তির আনন্দে 'গণ্ডারবৎ' বিহার করতেন এই আজন্ম ধ্যানসিদ্ধ কৌপীনবান সন্ন্যাসী, অসীম করুণায় সেই মুক্তির অমৃতধারা বয়ে এনে দিতে চেয়েছিলেন মুষ্টিমেয় এই কয়েকটি মুমুক্ষুর জীবনে। মর্মস্পর্শী সুরে কখনও বলতেন 'Ah, if I could only set you free with a touch'—'হায়, যদি কেবলমাত্র স্পর্শ দিয়েই তোমাদের মুক্ত করে দিতে পারতাম।'[১০] আবার পর মুহূর্তেই পিঞ্জরমুক্ত কেশরীর মতো যখন শিষ্যদের উদ্বুদ্ধ করতেন "This indecent clinging to life" 'জীবনের প্রতি এই ঘৃণ্য আসক্তি' এই বলে, তাদের দৃষ্টির সম্মুখে ক্ষণকালের জন্য সরে যেত সমস্ত মায়িক বন্ধন; উদ্ভাসিত হত মুক্তির নবদিগন্ত। "সাবধান! মায়া সবচেয়ে বড় ছলনা, মুক্ত হও। কত শত-বার আমরা এই মুক্তিকে বিকিয়ে দিয়েছি

---

১০ Reminiscences, p. 165

চিনির পুতুলের আকর্ষণে। আর নয়, এই অমূল্য সম্পদকে বিকিয়ে দিয়ো না কতগুলো ভ্রান্তির পিছনে ছুটে"—বলতে বলতে উন্মত্ত হয়ে যেতেন আত্মস্বরূপ বিবেকানন্দ, অগ্নিবর্ষণকারী দৃষ্টি নিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করে উন্মত্তের মত ছুটে যেতেন শিষ্যদের একজনের কাছে আর চীৎকার করে ফেটে পড়তেন—"মনে রেখো ঈশ্বরই একমাত্র সত্য", "উন্মত্তের মত", ক্রিশ্চিন লিখেছেন, "কিন্তু ঈশ্বরের জন্য, উন্মত্ত।"

কি পেয়েছিলেন ক্রিশ্চিন এই অবিস্মরণীয় দিনগুলির মধ্যে? তিনি কি আভাস পেয়েছিলেন মুক্তস্বরূপের? তিনি অনুভব করেছিলেন ঊর্ধ্বদৈহিক আত্মাকে? অথবা তিনি কি আস্বাদ পেয়েছিলেন সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত নির্বাণশান্তির? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে নিজের জীবনের একটি আধ্যাত্মিক অনুভূতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "জগতের কোন ভাষায় কোন শব্দের দ্বারা এই ভাব বর্ণনা করা যাবে না। কারণ এর মধ্যে জাগতিক কিছুই নেই। শুধু নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতা আর স্তব্ধতা। এই কি নির্বাণশান্তি? জীবনের জটিল প্রবাহ আর ঘূর্ণিবাত্যা এই প্রথম সম্পূর্ণ স্তব্ধতায় ডুবে গেল। এতে নেই কোন আবেগ, নেই আশা, নেই ভয়, আনন্দ অথবা দুঃখ। না না, নেতি নেতি। কখনও আর এত গভীর শান্তি অনুভব করিনি। সুগভীর শান্তির নিদ্রায় ডুবে গেলাম।"[১১] (ক্রমশঃ)

---

১১ Prabuddha Bharata, 1930, p. 420

আত্মদান

শ্রীদুঃখারাম বটব্যাল

জগৎ মাঝে তোমায় ভুলে
ঘুরছি আমি দিবস যামী,
চলার পথের শেষে আমার
আসবে না কি প্রভু, তুমি?

আপন হতেও আপন হয়ে
থাকবে কদিন বলো দূরে,
আসতে তোমায় হবেই যে গো
দয়াল প্রভু, হৃদয়পুরে।

অহমিকার অমানিশার
আড়ালখানি নিজেই গড়ি'
এপারে তার অন্ধকারে
তোমায় বৃথা খুঁজে মরি।

কাটবে জানি অমানিশা
ক্ষণিকেরই আত্মদানে
আলোয় ভরা জীবনখানি
মিশবে তোমার শ্রীচরণে!

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ঃ 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

কার্ল মার্কস, হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনা

ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ চিরকালই অনেক পরিমাণে সমাজের অর্থনৈতিক বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। মার্কস্ ও এঙ্গেলস উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ঐতিহাসিক তত্ত্বকে সংগ্রামের অস্ত্রে পরিণত করতে চেয়ে ঘোষণা করেছিলেন—"...You reproach us with intending to do away with your property. Precisely so ; that is just what we intend.

From the moment when labour can no longer be converted into capital, money, or rent, into a social power capable of being monopolized, i. e, from the moment when individual property can no longer be transformed into bourgeois property, into capital, from that moment, you say, individuality vanishes.

You must, therefore, confess that by 'individual' you mean no other person than the bourgeois, than the middleclass owner of property. This person must indeed be, swept out of the way, and made impossible."[১]

বুর্জোয়া বা ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থসম্পদের ভিত্তিতে যে অধিকার বৈষম্য, মার্কস্ ও এঙ্গেলস তাকে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করতেন। এই সমাজে যথার্থ ব্যক্তিস্বাধীনতা কখনও সম্ভব নয়। "The abolition of bourgeois individuality, bourgeois independence, and bourgeois freedom is undoubtedly aimed at."[২]

প্রচলিত আইনপদ্ধতি, শিক্ষা, পরিবারপ্রথা, সমাজে নারীর স্থান—এসব কিছু সম্বন্ধেই বুর্জোয়া বা ধনতান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন বিকাশকে মার্কস্ ও এঙ্গেলস চিরন্তন কোনো

১ "আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের অভিযোগ এই যে, আপনাদের সম্পত্তির উচ্ছেদ আমরা চাই। ঠিক কথা, আমাদের সংকল্প ঠিক তাই। মানুষের পরিশ্রমকে আর যখন পুঁজি, মুদ্রা অথবা খাজনায় পরিণত করা চলে না, একচেটিয়া কর্তৃত্বের মুঠির আয়ত্তাধীন একটা সামাজিক শক্তিতে পরিণত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে—অর্থাৎ যখন নিজস্ব মালিকানা আর বুর্জোয়া মালিকানায় পুঁজিতে পরিণত হতে পারে না, তখনি আপনারা বলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শেষ হয়ে গেল। তাহলে স্বীকার করুন যে, 'ব্যক্তি' বলতে বুর্জোয়া ছাড়া, শুধু মধ্যশ্রেণীর সম্পত্তির মালিক ছাড়া আর কোনো লোক বোঝায় না। এহেন ব্যক্তিকে অবশ্যই ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। তার অস্তিত্ব পর্যন্ত অসম্ভব করে তুলতে হবে।" The Communist Manifesto : p 89-99, Pelican Edition, 1970 দ্রঃ

২ "বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ব, বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্য, বুর্জোয়া স্বাধীনতার উচ্ছেদই যে আমাদের লক্ষ্য তাতে সন্দেহ নেই।" The Communist manifesto : p 98, Pelican Edition, 1970 দ্রঃ

আদর্শের বদলে অর্থ নৈতিক ক্রমবিকাশের স্তর হিসাবেই দেখেছেন। তাঁদের চিন্তাধারা অনুযায়ী একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আমরা যাকে ব্যক্তিস্বাধীনতা বলি, আসলে তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অল্প কিছু সম্পদভোগী মানুষের স্বাধীনতা। যারা অন্যের সম্পদের জন্য নিজেদের শ্রম বিক্রী করতে বাধ্য হ'ন তারা সেই শ্রমের বিনিময়ে যৎসামান্যই মূল্য পান, এবং সেই মূল্যে তথাকথিত 'স্বাধীনতা'র অতি সামান্যই ভোগ করেন।

এক্ষেত্রে 'বর্তমান ভারতে' স্বামীজীর উপমা স্মরণীয়—"অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গের"—"মধুসঞ্চয়" থেকে যথাকালে বৈশ্যকর্তৃক "মধু নিষ্কাশন।"[৩] 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে সভ্যতার ক্রমবিকাশে বৈশ্য ও শূদ্রের স্থান-প্রসঙ্গে স্বামীজীর সরস মন্তব্য—"একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগল—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি ক'রে। একদল সেই সব ভোগ্যদ্রব্য রক্ষা করতে লাগল। সকলে মিলে মিশে সেই সব বিনিময় করতে লাগলো, আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ-জায়গার জিনিসটা ও-জায়গায় নিয়ে যাবার বেতনস্বরূপ সমস্ত জিনিসের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলে। একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষ করলে, সে পেলে ঘোড়ার ডিম; যে পাহারা দিলে, সে জুলুম ক'রে কতকটা আগ ভাগ নিলে। অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে ম'লো!! পাহারা-ওয়ালার নাম হ'ল রাজা, মুটের নাম হ'ল সওদাগর। এ দু-দল কাজ করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগলো। যে জিনিস তৈরি করতে লাগলো, সে পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান' ডাকতে লাগলো।"[৪]

ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা-য়ুরোপ-পরিক্রমার ফলে স্বামীজীর সচেতনমানসে যে আসন্ন গণজাগরণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, সে সম্বন্ধে তাঁর নানা উক্তির মধ্য থেকে স্বামি-শিষ্য-সংবাদে বিধৃত একটি সাবধানবাণী এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"এই যে চাষাভুষো, মুচি-মুদ্দাফরাশ—এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা আমাদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ ক'রে যাচ্ছে, দেশের ধনধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে! Capital (মূলধন) তাদের হাতে গিয়ে পড়ছে—তোদের মতো তাদের অভাবের জন্য তাড়না নেই।... তোরা এই সব সহিষ্ণু নীচ জাতদের ওপর এতদিন অত্যাচার করেছিস, এখন এরা তার প্রতিশোধ নেবে আর তোরা 'হা চাকরি, জো চাকরি' ক'রে ক'রে লোপ পেয়ে যাবি।"[৫]

"...এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্র জাতেরা ছোট জাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতর জাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্র জাতদের কল্যাণ।

তাই তো বলি, তোরা এই mass (জনসাধারণ)-এর ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয়, তাতে লেগে যা। এদের বুঝিয়ে বলগে, "তোমরা আমাদের ভাই, শরীরের একাঙ্গ;

৩ "বর্তমান ভারত": বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৩৯
৪ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২০৩-২০৪
৫ স্বামিশিষ্যসংবাদ : বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : পৃঃ ১০৭

আমরা তোমাদের ভালবাসি, ঘৃণা করি না।" তোদের এই sympathy (সহানুভূতি) পেলে এরা শত গুণ উৎসাহে কার্যতৎপর হবে।"৬

সুতরাং স্বামীজীর দৃষ্টিতে শোষিত জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার দ্বারা ভবিষ্যৎ গণজাগরণে সহায়তাই আমাদের কর্তব্য। কিন্তু এই একাত্মতা বা সহমর্মিতার অভাবে যে শ্রেণীশত্রুতার সৃষ্টি, মার্কস্ তাকেই সংগ্রামের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। স্বামীজী এই সংগ্রাম সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়ে সময় থাকতে তথাকথিত উচ্চবর্ণের উদ্দেশে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্বন্ধে স্বামীজীর কি বক্তব্য? ভারতীয় ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে স্বামীজী অবশ্যই মনে করতেন যে, সমাজের স্বার্থেই ব্যক্তির স্বার্থ। 'বর্তমান ভারতে'র শেষ অনুচ্ছেদে স্বামীজী আধুনিক ভারতবাসীকে মনে করিয়ে দিয়েছেন—"ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!"৭

ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে স্বামীজীর এ আহ্বান আমাদের জাতীয় নেতারা কতখানি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলা কঠিন। বিদেশীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শ্রমশক্তির উন্নয়ন সম্বন্ধে যদি আমরা যথাকালে সচেতন হতাম, তাহলে বর্তমানকালে শ্রেণীসংগ্রামের পরিবর্তে স্বেচ্ছায় শ্রেণীগত আধিপত্য-বিসর্জনের দ্বারা শ্রমিক-কৃষকের সহমর্মিতালাভ আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'ত।

আধ্যাত্মিক দিক থেকে মানুষের 'ব্যক্তিত্ব'-সংরক্ষণের আগ্রহকে স্বামীজী তুলনা করেছেন বৃষ্টিবিন্দুর স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে। একদা একটি বৃষ্টিবিন্দু ব্যাকুল হয়ে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা ভাবছিল। বিশাল সমুদ্র তাকে বুকে নিয়ে বললো, তুমি আর আমি কি আলাদা? আমার থেকেই তো তোমার সৃষ্টি। আমার মধ্যে মিলিয়ে যাওয়াতেই তোমার সার্থকতা।

কিন্তু তথাকথিত বুর্জোয়া বা ধনতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শে ভুল থাকলেও প্রতিটি মানুষের স্বভাব ও সংস্কারগত প্রবণতায় পার্থক্য তো থাকবেই। শ্রেষ্ঠ সমাজের কাজ ব্যক্তিত্বের স্ফুরণে সেই বাধাটি অপসৃত করা। এদিক থেকে আসন্ন শূদ্রসভ্যতার ভূমিকা সম্বন্ধে কিন্তু স্বামীজীর ধারণা অন্যরকম। শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত পত্রটিতে স্বামীজী অভিমত প্রকাশ করেছেন—"সর্বশেষে শূদ্র-যুগের আবির্ভাব হবে—এ যুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো সংস্কৃতির অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, সমাজে অসাধারণ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে।

যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ্য যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণশক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ এ সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায়

৬ তদেব, পৃঃ ১০৮
৭ বর্তমান ভারত : বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৪৯

থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ কি সম্ভব ?

বস্তুতঃ প্রথম তিনটির পালা শেষ হয়েছে--এবার শেষটির সময়। শূদ্রযুগ আসবেই আসবে—এ কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।"[৮]

সংস্কৃতির দিক থেকে বিচার করলে অসাধারণ প্রতিভার সংখ্যা কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ যে ব্যক্তিত্বের সংকোচন তাতে সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারা অন্যান্য বর্ণের লোপসাধন স্বামীজীর লক্ষ্য নয়, সব শ্রেণীর গুণগত সমন্বয় ও অধিকার-সাম্যই স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত। তা সম্ভব কি না, সে প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, শূদ্রপ্রাধান্যের যুগও একদা কল্পনার রাজ্যেই ছিল। স্বামীজীর ওই প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যৎ ভারতই দেবে।

ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পেন্সারের চিন্তাধারার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা এক্ষেত্রে প্রয়োজন। ডারুইনের 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নীতির প্রভাবে স্পেন্সার সমাজকে একটি সর্বাবয়বসম্পন্ন সত্তা মনে করতেন। এই সমাজে যারা রুগ্ন দরিদ্র, মূর্খ তাদের কিছু পরিমাণে সহায়তা করার কথা তিনি ভাবলেও যারা দেহে মনে অন্যদের চেয়ে উপযুক্ত তারাই যে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করবে এতে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। এমন কি তিনি মনে করতেন যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যেন কোনো কারণেই "যোগ্যজনে"র প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়।[৯]

প্রাণিদেহের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমাজ-দেহের ক্রমবিকাশের ঐক্য দেখিয়ে শেষ অবধি অবশ্য স্পেন্সারও মেনেছেন যে, এক একটি ব্যক্তির পৃথক পৃথক সত্তার সমন্বয়েই সমাজের সৃষ্টি। প্রাণিদেহের মতো কোনো একটি মাত্র প্রাণকেন্দ্রের উপর সমাজ নির্ভরশীল নয়। আর প্রাণিদেহের মতো সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধও নয়। ফলে ব্যক্তির বিকাশকেই স্পেন্সার সমাজের লক্ষ্য মনে করেছেন --"Society exists for the benefit of its members, not its members for the benefit of the society."[১০] "সামাজিকদের কল্যাণের জন্য সমাজের অস্তিত্ব, সমাজের উপকারের জন্য ব্যক্তি নয়।"

অবশ্য সর্বাবয়বসম্পন্ন প্রাণীদের সঙ্গে তুলনা করলে সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের স্বাধীনতার প্রশ্নই ওঠে না। স্পেন্সার প্রাণিদেহের সঙ্গে যেখানে সমাজের অমিল—অর্থাৎ সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য—সেইদিক থেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর জোর দিয়েছেন। অপরপক্ষে প্রাণিদেহের সঙ্গে তুলনায় সমাজের বিকাশপ্রসঙ্গে স্পেন্সার যা বলেছেন তাও স্মরণীয়—প্রথমত: প্রাণিদেহের উদ্ভব, বিকাশ ও বিনাশের মতো সমাজেরও ক্রমবিবর্তন হতে থাকে। শ্রমজীবীরা সমাজের প্রাথমিক উপকরণ ; ব্যবসায়িশ্রেণী অনেকটা শিরা-উপ-শিরার মতো ; আর মস্তিষ্কের (brain) স্থান

৮ বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : পৃঃ ৩০১-৩০২ ; প্রথম তিনটি যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য।

৯, ১১ **The man versus the State, Social Statics, Principles of Sociology : Spencer** দ্রষ্টব্য। ১০, **Principles of Sociology : Spencer**

গ্রহণ করেন বুদ্ধিজীবীরা। দ্বিতীয়তঃ আদি যুগের প্রাণিদেহ থেকে আধুনিক যুগের প্রণিদেহের বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতির মতো সমাজও জটিল ও বহুগুণিত হতে থাকে। সমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গ পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সেইসঙ্গে কোনো একটি অঙ্গের অতিবৃদ্ধি অপর অঙ্গের দুর্বলতার কারণ হয়। যেমন ধরুন, জমিদারী প্রথার বিস্তারে অসংখ্য ভূমিহীন চাষীর উদ্ভব। তৃতীয়তঃ অ্যামিবা থেকে মানব অবধি বিবর্তনের মতো সমাজশরীরেরও বিবর্তন হতে থাকে। আদিম মানবগোষ্ঠি থেকে ধীরে ধীরে দেখা দেয় ক্ষত্রিয়শক্তিপ্রধান রাষ্ট্রব্যবস্থা, ক্ষত্রিয়শক্তি প্রধান রাষ্ট্রের স্থান গ্রহণ করে যন্ত্রযুগের সভ্যতা। এই যন্ত্রযুগেই অর্থাৎ স্পেন্সারের স্বকালেই স্পেন্সার ব্যক্তিস্বাধীনতার সবচেয়ে বেশী সুযোগ দেখতে পেয়েছেন।[১১] স্বামীজীর দৃষ্টিতে এই যন্ত্রযুগই বৈশ্যযুগ।

সমাজ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার দ্বন্দ্বে মার্কস্ ও বিবেকানন্দ যেমন সংগ্রাম বা সমীকরণের দ্বারা সমাধানপ্রার্থী, স্পেন্সার তা ন'ন। তাঁর মতে ব্যক্তির চরম স্বাধীনতাই রাষ্ট্র ও সমাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু ব্যক্তির এই স্বাধীনতার আদর্শও যে শেষ অবধি রাষ্ট্র ও সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে সেকথা স্পেন্সার হয়তো ততটা ভেবে দেখেননি। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা স্পেন্সারের মতবাদকে একালের সমালোচকদের কাছে প্রায় অস্বীকৃতির পর্যায়ে এনে ফেলেছে। কিন্তু আধুনিক কালেও ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সমাজের সাম্য—এ দুই প্রান্ত কেমনভাবে মিলিত হ'বে সে সম্বন্ধে চিন্তাশীলদের মনে সংশয় থেকে যায়। তথাকথিত ধনিকসমাজের "ব্যক্তি-স্বাধীনতা"র আদর্শ বদলালেও শ্রমিকসমাজের "ব্যক্তিস্বাধীনতা"র নিজস্ব মানদণ্ড এখনও পাওয়া যায়নি। হয়তো কালে শ্রমিক বা শূদ্র কথাটির সংজ্ঞা নিয়েই প্রশ্ন উঠবে। যাঁরা শ্রমজীবী, তাঁরা কেবল কায়িক শ্রমই করবেন, এমন কোনো কথা নেই। কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক বা সাধক—আন্তরিক হ'লে এক হিসাবে সবাই শ্রমিক। কোনো সভ্যতাই কেবলমাত্র কায়িক শ্রমে গড়ে ওঠে না। সুতরাং অর্থনৈতিক সাম্যের বনিয়াদে যখন সমাজের সব মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ জাগরণ হবে, তখনই শূদ্রপ্রাধান্যের সার্থকতা।

সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক প্রসঙ্গে স্পেন্সার তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থে 'ইতিহাস' সম্বন্ধে আলোচনা-কালে মন্তব্য করেছেন—"সমাজ কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি, অতএব সমাজের কার্য ঐ জনসমষ্টির কার্য, সুতরাং তাহা ধারণা করিতে হইলে ব্যক্তিগত কার্য যে যে নিয়মে সমাহিত হইতেছে, তাহার শরীর ও মন যে-সকল নিয়মাধীন, তাহাদের দ্বারা পরিচালিত। অতএব দেখা গেল, মনুষ্যকার্যের এই চতুর্থ ভাগও বিজ্ঞান দ্বারা শাসিত। ইতিহাসের অত্যল্প ভাগই মনুষ্যের কোন কার্যকারী হয়

এবং তাহারও আবার সদ্ব্যবহার হয় না।"[১৩]

বিজ্ঞানের যে দুটি শাখাসম্বন্ধে জ্ঞান স্পেন্সার অত্যাবশ্যক মনে করেছিলেন, তারা biology ("জীবনতত্ত্ব") এবং psychology ("মনোবিজ্ঞান")। আধুনিক কালে কেউ কেউ গণিতবিদ্যাকেও যুক্ত করতে চেয়েছেন। সে যাই হোক, বিজ্ঞানের সর্বময় প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত স্পেন্সার ইতিহাসকে মূলতঃ সমাজবিজ্ঞানরূপেই দেখেছেন। সেইসঙ্গে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্য জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে বলেছেন। এক্ষেত্রে সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর ধারণা যে প্রথম থেকেই একটু স্ববিরোধী তা মনে হ'তে পারে। সমাজকে একটি সমগ্র সত্ত্বা হিসাবে দেখেও ব্যক্তির স্বাধিকার সম্বন্ধে ধারণায় তিনি প্রথম জীবন থেকেই সচেতন। (ক্রমশঃ)

১৩ হার্বার্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন' ("শিক্ষা"): স্বামী বিবেকানন্দ অনূদিত : পৃঃ ৩৩-৩৪ বসুমতী-প্রকাশিত শশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত সংস্করণ। কৌতূহলী পাঠকের জন্য স্বামীজীর এই সংক্ষেপিত অনুবাদের মূল ইংরেজী থেকে একটু বিস্তৃত উদ্ধৃতি – But now mark, that even supposing an adequate stock of this truly valuable historical knowledge has been acquired, it is of comparatively little use without the key. And the key is to be found only in Science. In the absence of the generalizations of biology and psychology, rational interpretation of social phenomenon is impossible Only in proportion as men draw certain rule, empirical inferences respecting human nature, are they enabled to understand even the simplest facts of social life as, for instance, the relation between supply and demand. And if the most elementary truths of sociology cannot be reached until some knowledge is obtained of how men generally think, feel, and act under given circumstances, then it is manifest that there can be nothing like a wide comprehension of sociology, unless through a competent acquaintance with man in all his faculties, bodily and mental. Consider the matter in the abstract, and this conclusion is self-evident. Thus :—Society is made of individuals ; all that is done in society is done by the combined actions of individuals ; and therefore, in individual actions only can be found the solutions of social phenomena. But the actions of individuals depend on the laws of their natures ; and their actions cannot be understood until these laws are understood. These laws, however, when reduced to their simplest expressions, prove to be corollaries from the laws of body and mind in general. Hence it follows, that biology and pychology are indispensable as interpreters of Sociology···Thus, then, for the regulation of this fourth division of human activities, we are as before, dependent on Science. Of the knowledge commonly imparted in educational courses, very little is of service for guiding a man in his conduct as a citizen. Only a small part of the history he reads is of practical value ; and of this small part he is not prepared to make proper use.'"— Education : Herbert Spencer : Ist Edn : pp 36-37

ভারতে ধর্মমহাসভার প্রস্তুতি-সংবাদ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

ধর্মমহাসভায় সর্বধর্মের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে শান্তি ও মিলনের বাণী প্রচার করবেন, এমনই মহান স্বপ্নে আচ্ছন্ন ছিলেন এঁরা, এঁদের কিছুটা স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল একটি সংবাদে—প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায় এই মহাসভায় যোগদান করছে না। সে বিষয়ে ২রা জুলাই এই পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হয়। ধর্মমহাসভার প্রস্তাবিত রূপ সম্বন্ধে যে-সমস্ত সমালোচনা করা হয়েছিল, তাদের বিষয়ে আলোচনা ছিল ঐ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। পৃথিবীর ধর্মমতসমূহের মহিমা সম্বন্ধে যে উদার মনোভাব মিনিস্টার-সম্পাদক পূর্বের রচনাগুলিতে দেখিয়েছিলেন, তাকে সমালোচনার মুখে কিছুটা সংকুচিত করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের স্বীকার করতে হয়েছিল ; অতি বিশুদ্ধ খ্রীস্টীয় যাজকেরা ভারতের নববিধান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একই মঞ্চে বসতে পারেন, তাতে ক্ষতি নেই, তাই বলে যে-সব মতকে ধর্ম বলা ধর্মদ্রোহিতা (যেমন কোনো কোনো হিন্দুধর্মশাখা), তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাসনে বসা ওদের পক্ষে সত্যিই সম্ভব নয়। মিনিস্টারের সম্পাদক মহাশয় এতৎসত্ত্বেও ক্যানটারবেরীর আর্চবিশপ কর্তৃক ধর্মমহাসভা-বর্জনকে সমর্থন করতে পারেননি, কারণ রক্ষণশীল রোমান ক্যাথলিকেরা তো যোগদান করছে! সম্পাদক মহাশয়ের বিস্ময় স্বাভাবিক এবং আমাদের বিশ্বাস, ধর্মচিন্তা করার সময়ে তিনি রাজনীতি-চিন্তা একেবারে ত্যাগ করেছিলেন, যাকে অবশ্য ইংলণ্ডের প্রোটেস্টান্ট চার্চের কর্তারা ত্যাগ করতে পারেননি। ধর্মীয় কারণে নয়, রাজনৈতিক কারণেই পরাধীন দেশের মানুষের সঙ্গে একাসনে বসতে রাজি ছিলেন না ক্যানটারবেরীর আর্চবিশপ। ইংলণ্ডের রাজাই যে ইংলণ্ডের চার্চের প্রভু, একথা সর্বজ্ঞাত রাজনৈতিক সত্য। আমেরিকা ভারতের প্রভু নয়, সুতরাং সে ভারতবাসীকে ডাক দিতে পারে ; রোমান ক্যাথলিকেরাও ভারতের রাজনৈতিক প্রভু নয় ; কিন্তু প্রোটেস্টান্ট ইংলণ্ডকে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ধর্মের ব্যাপারেও গা বাঁচিয়ে চলতে হয়। মিনিস্টারের সম্পাদকের মনে ওসব সম্বন্ধে চিন্তা না উঠতে পারে, কারণ তাঁর ও তাঁর দলভুক্তদের মতে ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্য 'ঈশ্বরবিধান' (divine dispensation), এবং রাজানুগত্যকে তাঁরা ধর্মনীতি বলেই মনে করতেন ('Loyalty is one of the creeds of the New Dispensation', U.M. May 18, 1902)।

২রা জুলাইয়ের উক্ত সম্পাদকীয়ের কিছু কিছু অংশ এবার উদ্ধৃত করছি। গোড়ায় ক্যানটারবেরীর আর্চবিশপের অসহযোগিতার সংবাদে বিস্ময় ও হতাশা :[৭]

[৭] We are sorry to find that the progress of the arrangements as regards the details connected with the Chicago Religious Conference, hostilities are being shown to it from certain influential quarters. We understand that the Archbishop of Canterbury has withdrawn his sympathy from the new movement. The influence of His Grace's change of opinion will no doubt

'আমরা জেনে দুঃখিত হলাম, কোন কোন প্রভাবশালী সংস্থা থেকে চিকাগো ধর্মমহাসভা সংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যবস্থাগুলি ঠিক করে ফেলার অগ্রগতিতে বিরোধিতা করা হচ্ছে। আমরা জেনেছি, এই নব্য আন্দোলনের প্রতি ক্যাণ্টারবারীর আর্চ-বিশপের সহানুভূতি আর নেই। তাঁর এই মতপরিবর্তনের প্রভাবে মহাসভার স্বার্থ কিছুটা ব্যাহত হবে সন্দেহ নেই; কিন্তু আশ্চর্য লাগছে—রক্ষণশীল রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক চার্চগুলি যখন এই মহাসভাকে তাঁদের সমর্থন জানাতে আপত্তির কোন কারণ দেখছেন না, তখন সেগুলির তুলনায় কম রক্ষণশীল ইংলণ্ডের চার্চের প্রধান ধর্মযাজক ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি দেখানো বন্ধ করাকে সমীচীন বলে স্থির করলেন কি করে!

তিনি বলেছেন, বহু সৎ খৃষ্টান আছেন যাঁরা নববিধানের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং যাঁরা নববিধানের উদারতার তারিফও করেন।...আমাদের আচার্যদের সঙ্গে একমঞ্চে দাঁড়াতে তাঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁরা বলেন, ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য ত্রুটিপূর্ণ বলেই মনে হয়।...এমন কতকগুলি নৈতিক বিষয়ে ঘৃণ্য ধর্মসম্প্রদায়ের লোককে ধর্মমহাসভায় নিমন্ত্রণ করা হয়েছে যাঁদের মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও জীবন-রীতিকে ধর্ম বললে পবিত্র 'ধর্ম' কথাটিকেই অপবিত্র করা হয়। ক্যাণ্টারবারীর আর্চ-বিশপ বা ঐ স্তরের কোন মহামান্য ব্যক্তিকে এরকম কারো সঙ্গে, যেমন মরমন-সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক, অথবা সঙ্গত কারণেই ঘৃণ্য বলে বিবেচিত হয় এরূপ হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন প্রতিনিধির সঙ্গে একই মঞ্চে বসতে বলাটা খুব অযৌক্তিক এবং বেশ একটু বাড়াবাড়ি নয় কি?'

মিনিস্টারের সম্পাদক খ্রীষ্টান ভদ্রলোকের উপরের কথাগুলি মেনে না নিয়ে পারেননি, 'ঘৃণ্য সম্প্রদায়গুলিকে ঐ মহান সম্মেলনে' ঠাঁই দিলে যে খুবই অমঙ্গল ঘটতে পারে, সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত সম্পাদক মহাশয়ের ছিল না, তিনি ধর্মমহাসভার বিরুদ্ধে উত্থাপিত আরও কিছু অভিযোগকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন; যেমন, যে কোনো লোকই মহাসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে 'নীতিহীন, উদ্ভট বা শয়তানী বক্তব্য উচ্চারণ করতে পারে', 'ধর্মমহাসভা উত্তম, মধ্যম ও মন্দ ধর্মের সাজানো বাজার', ইত্যাদি। এসবই সত্য, তাহলেও ধর্মমহাসভার প্রতি সহানুভূতি প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত নয়, কারণ সেখানে ধরা পড়বে ভালর সঙ্গে মন্দের তফাত, আলোক দূর করে দেবে অন্ধকার,

---

injure, to some extent, the interests of the Conference, though it is rather strange to find that while the heads of the more orthodox Roman Catholic and Greek Churches do not find any objection to lend their supports to it, the Primate of the comparatively less orthodox Church of England should think fit to cease to sympathise with its object.

He said there are many good Christians who sympathise with the object of the New Dispensation, its catholicity they appreciate..... They have no objection to stand on the same platform with our ministers; but they say the object of the Parliament of Religions is rather anomalous .... Invitations have been issued to some such depraved bodies of religious men that it would be blasphemy to apply the sacred name of religion to their opinions, practices and modes of living. Is it not highly absurd and greatly outrageous to ask the Archbishop of Canterbery or such other dignitaries to sit on the same platform with, for instance, the Mormon highpriest or the representatives of such Hindu sects as are justly looked upon with hatred and indignation?...

শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে সব কিছুই খ্রীষ্টে গিয়ে মিলেছে। রচনার শেষে খ্রীষ্টানদের কাছে চরম আত্মনিবেদন :[৮]

'আমরা যতটা বুঝেছি, ধর্মমহাসভা জুরির মতো কাজ করবে—যে যা বলবে সবই শুনবে, কিন্তু সভায় যে সব মত বিবৃত হবে তা সবই স্বীকার করে নেবে না। জুরিদের মতোই ভুল জবানবন্দী, সঠিক জবানবন্দী সবই শুনবে, কিন্তু রায় দেবার অধিকার রাখবে নিজের হাতে।...মিথ্যা থেকে সত্যকে, অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতাকে, অজ্ঞানান্ধকার থেকে জ্ঞানালোককে পৃথক করবে সে। আমাদের বিশ্বাস, তার কাজ হবে সব ধর্মসম্প্রদায়ের ভেতর থেকে সর্ববিধ পবিত্রতা, সত্য ও জ্ঞানালোক আহরণ করে সেগুলিকে একসঙ্গে মিলিয়ে ধর্মের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া; তথাকথিত খৃষ্টান সম্প্রদায়গুলি ও পৃথিবীর পৌত্তলিক সম্প্রদায়গুলি থেকে খৃষ্টানধর্ম-বিরোধী ভাবগুলি বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ খৃষ্টানভাবগুলিকে একত্র মিলিত করা, যা হবে, সেণ্ট পলের অপরূপ ভাষায়, "যীশুখৃষ্টে সব কিছুর সমন্বয়সাধন"।'

৩১শে মে, ১৮৯৩ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকার উদ্দেশ্যে জাহাজে ওঠেন, তখন তাঁকে বিদায় দিতে জাহাজঘাটায় অল্প কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁর যাত্রাসংবাদ সংবাদপত্রে উঠেছিল কিনা জানি না, অন্ততঃ পূর্বভারত ও পশ্চিম ভারতের উল্লেখযোগ্য কোনো সংবাদপত্রে ওঠেনি, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। আমেরিকায় পৌঁছে বিবেকানন্দকে কি জাতীয় আর্থিক ও অন্যবিধ দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়েছিল, তাও বিবেকানন্দের জীবনীপাঠকের জানা আছে। ধর্মমহাসভার পূর্বে আমেরিকায় তাঁর গতিবিধি, বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়, 'অখ্যাত' মানুষটির প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের তৎকালীন স্বীকৃতির রূপ অনবদ্যভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন শ্রীমতী মেরী লুই বার্ক। তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ এখন সুপরিচিত। কিন্তু বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভায় যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসের কোনো ব্যক্তি নন ; এমন কি যে-পর্যন্ত না তাঁর সাফল্যের সংবাদ ভারতে প্রচারিত হচ্ছে, সে অবধি তিনি অজ্ঞাত-পরিচয়। ভারতবর্ষের অপর প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে কিন্তু সে কথা বলা চলবে না। তাঁদের অনেকেই সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত, অনেকের পিছনেই সম্প্রদায়ের ও সংবাদপত্রের সমর্থন আছে। সুতরাং তাঁরা কখন যাত্রা করলেন, কবে পৌঁছলেন, কিভাবে গৃহীত হলেন—সে সব সংবাদ অনেক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেই সকল সংবাদের মধ্যে 'বিবেকানন্দ' নাম কোথাও নেই, থাকার কথাও নয়, কারণ ইতিহাসের মঞ্চে নায়কের

৮ The function of the Parliament of Religions, as we understand it to be, is that of a jury which shall hear all sides of the question, but will not accept all the views enunciated in the Assembly. Like a jury it will hear false depositions and true depositions but it will reserve judgment for itself..... It will dissociate truth from untruth, purity from impurity, light from darkness. Its business will, we trust, be the fusion of all types of purity, truth and light in all systems of faith into one integral whole ; the expurgation of Anti-Christian elements from the so-called Christian and heathen creeds of the world and the amalgamation of the pure Christian residuum left. It will be, as has been beautifully said by St. Paul, the reconciliation of all things in Christ.

নাটকীয় প্রবেশের ভাগ্য নিয়ে তিনি এসেছিলেন। বর্তমানে আমরা ধর্মমহাসভারম্ভের পূর্বে ভারতীয় প্রতিনিধিদের কিছু কিছু গতিবিধির প্রকাশিত সংবাদের উল্লেখ করব।

২৫ শে আগস্ট তারিখে লিখিত 'লণ্ডন লেটার' যা মারহাট্টা পত্রিকায় ১৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছিল, তার শেষাংশে ভারতীয় প্রতিনিধিদের লণ্ডন থেকে আমেরিকা যাত্রার কথা আছে: ৯

'বিশ্বমেলার ধর্মসভার অধিবেশন আরম্ভ হবে ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে। কলকাতার বাবু পি. সি. মজুমদার, বম্বের বি. বি. নাগরকার এবং কলম্বোর ধর্মপাল আগামী কাল চিকাগো যাত্রা করবেন; শ্রীমজুমদার যাবেন লিভারপুল থেকে "আম্ব্রিয়া" জাহাজে, এবং বাকী দুজন সাদাম্পটন থেকে "প্যারিস" জাহাজে।'

আমেরিকায় পৌঁছানোর পরে এবং ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে ভারতীয় প্রতিনিধিগণের কিছু কিছু সংবাদ মহাবোধিতে বেরিয়েছিল। তাতে দেখি ধর্মপাল ও চক্রবর্তীকে (জি. এন. চক্রবর্তী, থিয়জফি প্রতিনিধি) থিয়জফিক্যাল সোসাইটি অফিসে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল, সেখানে তাঁরা বক্তৃতাদি করেছিলেন।১০

৯ .The Religious Congress of the great World's Fair begins its sittings on the 11th of September. Babu P. C. Mazumdar of Calcutta, Mr. B. B. Nagarkar of Bombay, and Mr. Dharmapala of Colombo sail for Chicago to-morrow. The first by the Umbria from Liverpool and the last two by the Paris from Southampton.

১০ The rooms of the Aryan Theosophical Society, No. 144, Madison Avenue, were crowded last night by members of the Society, who welcomed to this country Professor Ganendra Nath Chakravarti, a highcaste Brahmin of Allahabad, the capital of the North-West provinces, Hindustan, and Hevavitarana Dharmapala, a Buddhist member of the Theosophical Society. Both are on the way to Chicago to attend the World's Fair Congress of Religions. Hevavitarana Dharmapala goes to Chicago by invitation of the general fair officials. Professor Chakravarti goes by invitation of the Theosophical Society, and he will represent his country at the Theosophical Societies Congress.....

The private secretary to the Rev. Dr. Henry Barrows...assisted by a number of ministers, met the voyagers at the docks, and escorted them to the fifth Avenue, Brunswick, Waldort and other hotels.

Among the more distinguished of visitors are H. Dharmapala of Calcutta, ...whose patron is Lozang-Thub-Dan-Gyatcho, Grand Lama of Thibet; Protap Chunder Mozoomdar, the champion of Hindoo monotheism, and one of the brainiest men in all India ; B. B. Nagarkar of Bombay, Minister of the Brahmo-Somaj, established by Rajah Ram Mohon, sixty three years ago ; Professor Minas Tcherza of Kings College, London, the Armenian delegate to the Berlin Congress upon whose head the Sultan of Turkey has set a price ; Virchand A. Gandhi, "the hero, like the moon", a delegate from the Jain Society of India ; Ganendra Nath Chakravarti of Allahabad, India ; Annie Besant, Miss Muller, and other Theosophists, the Rev. G. F. Pentecost, of England, and some with pronounceable and more with unpronounceable names.....

Virchand A. Gandhi said, he believed he was the first member of the Jain Society that had been allowed to visit outside of India within two thousand years. "It is a tenet of our order", he continued, "that should a member break bread with Englishmen he shall be excommunicated. The

'এরিয়ান থিওজফিক্যাল সোসাইটির ১৪৪ নং ম্যাডিসন এভেনিউ-স্থিত ঘরগুলিতে গত রাত্রে সোসাইটির সভ্যগণের ভিড় জমেছিল, তাঁরা স্বাগত জানাতে এসেছিলেন হিন্দুস্থানের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের রাজধানী এলাহাবাদ শহরের উচ্চবংশজাত ব্রাহ্মণ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে এবং থিওজফিক্যাল সোসাইটির বৌদ্ধ সভ্য হেওয়াবিতারণে ধর্মপালকে। এঁরা আমেরিকায় এসেছেন, বিশ্বমেলার ধর্মমহাসভায় যোগদান করার জন্য চিকাগো যাচ্ছেন। হেওয়াবিতারণে ধর্মপাল যাচ্ছেন সাধারণ মেলার কর্তৃপক্ষের নিমন্ত্রণে। অধ্যাপক চক্রবর্তী যাচ্ছেন থিওজফিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে; থিওজফিক্যাল সোসাইটির কংগ্রেসে তিনি স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

রেভারেণ্ড ডঃ হেনরী ব্যারোজের একান্ত সচিব কয়েকজন ধর্মযাজকসহ জাহাজের ডকে এসে সমাগত যাত্রীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং ৫ম এভেনিউ, ব্রুন্স-উইক, ওয়ালডর্ট এবং অন্যান্য হোটেলে তাঁদের পৌঁছে দেন।

অধিকতর বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন কলকাতার এইচ· ধর্মপাল...তিব্বতের মহান লামা লোজাং-থাব-ভান-গ্যাটকো যাঁর পৃষ্ঠপোষক; হিন্দু একেশ্বরবাদের নেতা, সর্ব ভারতীয় শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম প্রতাপচন্দ্র মজুমদার; ৬৩ বছর আগে রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বোম্বের বি. বি. নাগরকার; লনডন কিংস কলেজের অধ্যাপক মিনাস জের্জা—যিনি বার্লিন কংগ্রেসে আমেরিকার প্রতিনিধি ছিলেন ...; ভারতের জৈন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বীরচাঁদ এ. গান্ধী; এলাহাবাদের জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী; অ্যানি বেসান্ট, মিস মুলার, এবং অন্যান্য থিওজফিস্টগণ; ইংলণ্ডের রেভারেণ্ড জি. এফ. পেন্টি-কস্ট, এছাড়া আরো অনেকে, যাঁদের কয়েকজনের নাম উচ্চারণ করা সম্ভব, কিন্তু বেশীর ভাগের নামই উচ্চারণ করা দুষ্কর।

বীরচাঁদ এ গান্ধী বলেন যে, তাঁর বিশ্বাস দু-হাজার বছরের ইতিহাসে জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যাঁকে ভারতের বাইরে যেতে দেওয়া হল। তিনি বলেন, "আমাদের সম্প্রদায়ের নীতি হল, যদি সে -সম্প্রদায়ের কেউ ইংরেজদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খায়, তাহলে তাকে ধর্মচ্যুত করা হবে।

High Priest and a gathering of the Society selected me as a delegate to the Religious Congress at Chicago. Other meetings denounced me for coming. I am here, and glad to be here. I shall probably be punished when I return" . .

Gandhi is prohibited from touching meat of any kind. He says he does not know the taste of flesh. He is an exceedingly intelligent man, and stands high in this Order.

Mr. Mozoomdar, one of the handsomest and cleverest members of the party, expressed unbounded admiration for what little he had seen of New York.....

Mr. Nagarkar brings with him the ashes of the body of Dr. Anandalal Joshi, the first Bombay woman who studied medicine in America. She died in India six years ago. A Mrs. Carpenter of Brooklyn was her intimate friend, and requested that a portion of her ashes he brought here to be cremated again with Hindoo ceremonies.....

Dr. Dharmapala is to preach in Plymouth Church, Brocklyn, to-day. He is a warm friend of the Rev. Lyman Abbott, who was a fellow-passenger with him.

আমাদের সম্প্রদায়ের একটি সভায় সমবেত সভ্যগণ এবং প্রধান আচার্য চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমাকে মনোনীত করেন। কিন্তু অন্যান্য সভায় আমার এখানে আসার সিদ্ধান্তের নিন্দা করা হয়েছে। যাই হোক, আমি এসেছি এখানে, এবং এতে খুশীই হয়েছি। তবে ফিরে যাবার পর সম্ভবতঃ এজন্য আমাকে শাস্তি দেয়া হবে।”

গান্ধী বলেন, মাংসের স্বাদ তাঁর অজ্ঞাত। কোনও প্রকার মাংস স্পর্শ করা তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ। প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন তিনি, সম্প্রদায়ে তাঁর স্থানও খুব উচ্চে।

এই দলটির মধ্যে মজুমদারই সব চেয়ে সুদর্শন ও চতুর। নিউইয়র্ক যেটুকু দেখেছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি।…

শ্রীনাগরকার ডক্টর আনন্দলাল যোশীর দেহাবশেষ-ভস্ম সঙ্গে এনেছেন; ডক্টর যোশী বম্বের প্রথম মহিলা, যিনি আমেরিকায় ভেষজ-বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন। ৬ বছর আগে তিনি ভারতে মারা গেছেন। ব্রুকলিনের জনৈকা মিসেস কার্পেণ্টার তাঁর অন্তরঙ্গ বান্ধবী ছিলেন; তাঁরই বিশেষ অনুরোধ, ডক্টর যোশীর দেহাবশেষের কিয়দংশ যেন এখানে এনে হিন্দুপ্রথায় পুনরায় সমাহিত করা হয়।

ডক্টর ধর্মপাল আজ ব্রুকলিনের প্লিমাউথ চার্চে ভাষণ দেবেন। জাহাজের সহযাত্রী রেভারেণ্ড লীম্যান এ্যাবট তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ডাঃ বারোজ চেয়েছিলেন, ভারতীয় প্রতিনিধিগণ একত্রে চিকাগোয় আসুন। তাঁরা একত্রেই এসেছিলেন। তাঁরা সকলেই পরিচয়-পত্রসহ প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। তাঁরা কেউই অনাহূত অবাঞ্ছিত নন। তাঁদের কাউকেই ‘নির্বোধ’ বলা যায় না। ‘আমিই নির্বোধ, আমি প্রস্তুত হয়ে আসিনি’—স্বামীজী আক্ষেপে বলেছিলেন। সেই ‘অপ্রস্তুত’ ও ‘নির্বোধে’র জয়রব আর একমাসের মধ্যে ভারতের প্রান্তে প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হবে—কিন্তু এখনো পর্যন্ত তিনি কোনো অস্তিত্বই নন—এইটেই ইতিহাসের সুমহান রসিকতা।

যোগবাসিষ্ঠসারঃ

[পূর্বানুবৃত্তি]

[অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ]

২। জগৎ-মিথ্যাত্ব প্রকরণ

শ্রীবসিষ্ঠ উবাচ –

সংযমাত্মনসঃ শান্তিমেতি সংসারসংভ্রমঃ।
মন্দরেঽস্পন্দতাং যাতে যথা ক্ষীরমহার্ণবঃ॥ ১

শ্রীবসিষ্ঠ বলিতেছেন—মন্দরাচল নিশ্চল হইলে ক্ষীরসাগরও যেরূপ শান্ত, তরঙ্গরহিত আকার ধারণ করে, মনের নিয়মনেও এই সংসারভ্রম তদ্রূপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

চিত্তোন্মেষনিমেষাভ্যাং সংসারস্যোদয়ক্ষয়ৌ।
বাসনাপ্রাণসংরোধাদনিমেষং মনঃ কুরু॥ ২

চিত্তের স্পন্দন ও তদভাবে সংসারের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। অতএব বাসনা ও প্রাণ নিরোধপূর্বক মনকে (চিত্তকে) স্পন্দনমুক্ত কর। প্রাণায়াম-অভ্যাস দ্বারা বাসনানাশ ও মনোজয় হইয়া থাকে—ইহাই অর্থ।

অয়ং হি স্ববিকল্পোত্থঃ স্ববিকল্পপরিক্ষয়াৎ।
ক্ষীয়তে দগ্ধসংসারো নিঃসার ইত্যসংশয়ঃ॥ ৩

মনের সংকল্প হইতে জাত এই সংসার সংকল্পবিনাশে দগ্ধ নিঃসার হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ইহা নিঃসন্দেহ।

পরিজ্ঞানেন সর্পত্বং চিত্রসর্পস্য নশ্যতি।
যথা তথৈব সংসারঃ স্থিত এবোপশাম্যতি॥ ৪

(চিত্রের) জ্ঞান দ্বারাই চিত্রাঙ্কিত সর্পে সর্পত্বভ্রম বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধের দ্বারাই (সংসার)-প্রতীতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, সংসার বস্তুতঃ নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

পুংসো নিজমনোমোহকল্পিতো দুঃখদঃ স্মৃতঃ।
সংসারচিরবেতালো বিচারেণ বিলীয়তে॥ ৫

পুরুষের নিজ মনের ভ্রান্তি-রচিত, দীর্ঘকালীন দুঃখদায়ী এই সংসার একটি প্রেত, ইহা প্রসিদ্ধ। ইহা সম্যক্ বিচার দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

ঈদৃশী রাম মায়েয়ং যা স্বনাশেন হর্ষদা।
ন লক্ষ্যতে স্বভাবোঽস্যাঃ প্রেক্ষ্যমাণৈব নশ্যতি॥ ৬

শ্রীবসিষ্ঠ বলিতেছেন, 'হে রাম, (সংসারকারণ) এই মায়া আপনার নাশে আনন্দ দান করে। উহার স্বভাব (অর্থাৎ নিজে যে কি—তাহা) দেখা বা বুঝা যায় না; কারণ (বিচার-দৃষ্টিতে) দেখিলে উহাকে পাওয়াই যায় না, উহার নাশ হয় (—উহা তাই অনির্বচনীয়)।'

অহো নু চিত্রা মায়েয়ং তাত বিশ্ববিমোহিনী ।

সর্বাঙ্গপ্রোতমপ্যাত্মা যয়াত্মানং ন পশ্যতি ॥ ৭

শ্রীবসিষ্ঠ বলিতেছেন, 'হে স্নেহভাজন শ্রীরামচন্দ্র, অহো ! এই বিশ্ববিমোহিনী মায়া কি বিচিত্রা ! এই মায়া দ্বারা মোহিত হইয়া জীব সর্বাঙ্গব্যাপ্ত আত্মাকেও জানিতে পারে না ।'

যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিত্তন্নাস্তি কিমপি ধ্রুবম্ ।

যথা গন্ধর্বনগরং যথা বারি মরুস্থলে ॥ ৮

আকাশে দৃষ্ট গন্ধর্বনগর অথবা মরুস্থলে দৃষ্ট মরীচিকার বারিপ্রবাহ যেরূপ সত্য নহে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎও তদ্রূপ সত্য নহে অর্থাৎ বস্তুতঃ নাই ।

যত্তু নো দৃশ্যতে কিঞ্চিদন্তঃস্থমপি কিঞ্চন ।

অবিনাশং তদস্তীহ সৎ সদাত্মেতি কথ্যতে ॥ ৯

সমীপে স্থিত হইয়াও যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই অবিনাশী বস্তু এখানেই (এই শরীরেই) সদা বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনি সৎ ও আত্মা নামে খ্যাত । (তাঁহাকেই অপরোক্ষ অনুভব করা কর্তব্য) ।

স্বজ্ঞানদর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুজাতয়ঃ ।

ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ ॥ ১০

সরোবরে তটস্থিত বৃক্ষের প্রতিবিম্বের ন্যায়, স্ব-স্বরূপভূত বিশাল জ্ঞানরূপ দর্পণে, দৃশ্যমান এই সর্ব বস্তুসমূহ কেবল মিথ্যা প্রতিবিম্ব মাত্র ।

সর্গশ্চিৎস্পন্দমাত্রাত্মা সম্যগ্‌দৃষ্টৌ বিলীয়তে ।

উদেত্যসম্যগ্‌দৃষ্টৌ তু রজ্জ্বাং সর্পভ্রমো যথা ॥ ১১

চৈতন্যস্পন্দনমাত্র-রূপ এই সৃষ্টি সম্যক্‌জ্ঞানে বিলয়প্রাপ্ত হয় এবং অসম্যক্ জ্ঞানে উদিত হয়, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রমের উদয় ।

ভোগভাবনয়া যাতি বন্ধো দার্ঢ্যমবস্তুজঃ ।

যয়োপশান্তয়া যাতি বন্ধো জগতি তানবম্ ॥ ১২

মিথ্যাভূত হইলেও এই বন্ধ বিষয়ভোগ বাসনা দ্বারা দৃঢ়তা লাভ করে । বাসনা শান্ত হইলে সংসার বন্ধনও তনুতা, তুচ্ছত্ব অর্থাৎ কৃশত্ব বা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় । (অতএব বাসনা পরিত্যাজ্য) ।

মনঃ সম্পদ্যতে তস্মান্মহতঃ পরমাত্মনঃ ।

সুস্থিরাদস্থিরাকারং তরঙ্গ ইব বারিধেঃ ॥ ১৩

স্থির প্রশান্ত সাগরবক্ষে চঞ্চল তরঙ্গের ন্যায়, সেই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্যাপক শান্ত নির্বিকার পরমাত্মা হইতেই চঞ্চল মনের উৎপত্তি হইয়াছে । (স্থির হইতে অস্থিরের উৎপত্তিতে দৃষ্টান্ত,—স্থির সমুদ্র হইতে অস্থির উর্মি বা তরঙ্গের উৎপত্তি) ।

যৎ স্বয়ং স্বৈরমেবাশু সংকল্পয়তি নিত্যশঃ ।

তেনেয়মিন্দ্রজালশ্রীর্জাগ্রতি প্রবিতন্যতে ॥ ১৪

মন নিত্য ক্ষিপ্রতার সহিত যথেচ্ছ বহুবিধ সংকল্প করিয়া থাকে, সেই সংকল্প দ্বারাই জাগ্রৎকালে এই সংসাররূপ ইন্দ্রজালশোভা বিস্তারপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রকট হয়। (অতএব সংসার মনঃকল্পনামাত্র—ইহাই অর্থ)।

যথা বালস্য বেতালো মৃত্যুপর্যন্তদুঃখদঃ।
অসদেব সদাকারং তথা মূঢ়মতের্জগৎ ।। ১৫

বালকের মনঃকল্পিত ভূত যেমন তাহাকে আমরণ দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, সেই প্রকার মিথ্যাভূত জগৎও অজ্ঞানীর নিকট সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়া মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখদায়ী হয়।

অব্যুৎপন্নস্য কনকে কানকে কটকে যথা।
কটকব্যক্তিরেবাস্তি ন মনাগপি হেমধীঃ।। ১৬
তথাজ্ঞস্য পুরাগার-নগনাগেন্দ্রগোচরা।
ইদং দৃশ্যং দৃগেবাস্তি ন ত্বন্যাপরমার্থদৃক্ ।। ১৭

সুবর্ণবিষয়ে অনভিজ্ঞ পুরুষের যেমন সুবর্ণনির্মিত বলয়ে কেবল বলয়বুদ্ধিই হইয়া থাকে, কখনও সুবর্ণবুদ্ধি কিঞ্চিন্মাত্রও হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানীরও নগর-গৃহ-বৃক্ষ-পর্বত-সর্পাদি দৃশ্যবিষয়ক বুদ্ধি সত্যরূপেই প্রতিভাত হয়; এই দৃশ্য মিথ্যা, দ্রষ্টা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য, এইরূপ অন্য যথার্থ জ্ঞানের উদয় তাহার কখনই হয় না, কারণ সে (অজ্ঞ ব্যক্তি) অপরমার্থদর্শী।

অজ্ঞস্য দুঃখৌঘময়ং জ্ঞস্যানন্দময়ং জগৎ।
অন্ধং ভুবনমন্ধস্য প্রকাশং তু সচক্ষুষঃ ।। ১৮

জগৎ অজ্ঞানীর নিকট দুঃখময়, কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে উহা আনন্দময়। অন্ধের নিকট জগৎ অন্ধকার কিন্তু চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির দৃষ্টিতে সর্বজগৎ প্রকাশপরিপূর্ণ।

যথা বিশুদ্ধ আকাশে সহসৈবাভ্রমণ্ডলম্।
ভূত্বা বিলীয়তে তদ্বদাত্মনীহাখিলং জগৎ ।। ১৯

মেঘমণ্ডল যেরূপ সহসা নির্মল আকাশে উত্থিত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হয়, আত্মাতেও তদ্রূপ এই বিশ্ব সহসা আবির্ভূত হইয়া পুনঃ বিনাশপ্রাপ্ত হয় (ব্রহ্ম তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও দোষলিপ্ত হন না।)

আদিত্যাব্যতিরেকেণ রশ্ময়ো যেন ভাবিতাঃ।
আদিত্য এব তে তস্য নির্বিকল্পঃ স উচ্যতে ।। ২০

যিনি রশ্মিসকল আদিত্যের সহিত অভিন্নরূপে জানেন, তাঁহার দৃষ্টিতে ঐ রশ্মিসমূহ আদিত্যরূপই। (তদ্রূপ যিনি জগৎকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে জানেন, তাঁহারা নিকট জগৎ ব্রহ্মই, জগৎ বলিয়া আর ভিন্ন কিছু নাই)। তিনিই সর্ববিকল্পনাবিনির্মুক্ত।

তন্তুমাত্রো ভবত্যেব পটো যদ্বদ্বিচারিতঃ
আত্মাতন্মাত্রমেবেদং তদ্বদ্বিশ্বং বিচারিতম্ ।। ২১

বিচারিত হইলে পট যেরূপ তন্তুমাত্রই হইয়া থাকে, বিচারিত এই বিশ্বও তদ্রূপে ব্রহ্মরূপেই জ্ঞাতব্য। (বিবর্তাকারে ব্রহ্মই জগদাকার হইয়াছেন—ইহাই অর্থ)।

বিশ্ববীচীবিলাসোঽয়ং চিৎসুধাব্ধেরুদেতি চ।
বিলীয়তে চ তত্রৈব মধ্যে কথমতন্ময়ঃ ॥ ২২

ব্রহ্মরূপ অমৃতসাগর হইতেই এই প্রপঞ্চরূপ তরঙ্গবিলাস উদিত হয় এবং তাহাতেই বিলীন হয়, মধ্যে স্থিতি-অবস্থায় উহা অন্যরূপ কিপ্রকারে হইবে ?

যথা ন তোয়তো ভিন্নাঃ ফেনোর্মিহিমবুদ্বুদাঃ।
আত্মনোঽপি তথাঽভিন্নং বিশ্বমাত্মবিনির্গতম্ ॥ ২৩

যেমন ফেন, তরঙ্গ, তুষারখণ্ড ও বুদ্বুদসমূহ জল হইতে ভিন্ন নহে, আত্মা হইতে বিনির্গত বিশ্বও তদ্রূপ আত্মার সহিত অভিন্ন।

আত্মনোঽপি তথা বিশ্বমাত্মন্যেব লয়ং ব্রজেৎ।
মৃদি কুম্ভো জলে বীচিঃ কনকে কুণ্ডলং যথা ॥ ২৪

যে প্রকার কুম্ভ মৃত্তিকাতে, তরঙ্গ জলে ও কুণ্ডল সুবর্ণে বিলয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মা হইতে উৎপন্ন বিশ্বও আত্মাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়।

আত্মাজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি হ্যাত্মজ্ঞানান্নিবর্ততে।
রজ্জ্বজ্ঞানাদহির্ভাতি তজ্জ্ঞানাচ্চ নিবর্ততে ॥ ২৫

আত্মবিষয়ক অজ্ঞানবশতঃই বিশ্ব প্রতিভাত হয়, পুনঃ আত্মজ্ঞান হইলে উহা নিবৃত্ত হয়। রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞানবশতঃই সর্প প্রতীত হয় এবং সেই রজ্জুর জ্ঞান হইলে সর্পভ্রমও বিনিবৃত্ত হয়।

তস্যাদৃশ্যাত্মতত্ত্বস্য বিস্মৃত্যৈব স্থিতিং গতম্।
জগৎ স্যাদীশ্বরাদ্ রাম জগদ্রজ্জুভুজঙ্গবৎ। ২৬

শ্রীবসিষ্ঠ বলিতেছেন—হে রাম, সেই দুর্জ্ঞেয় আত্মবস্তুর বিস্মৃতিবশতঃই জগৎ স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। রজ্জু হইতে (ভ্রান্তি-) সর্পের উৎপত্তির ন্যায় জগৎ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

স্বপ্নে জাগ্রদসদ্রূপা সুপ্তৌ জাগ্রদসদ্বপুঃ।
মৃতির্জন্মন্যসদ্রূপা মৃতৌ জন্মাপ্যসন্ময়ম্ ॥ ২৭

স্বপ্নকালে জাগ্রদবস্থা নাই, সুপ্তিকালেও জাগ্রৎ মিথ্যা, উৎপত্তিকালে মৃত্যু মিথ্যারূপ অর্থাৎ নাই, জন্মও মৃত্যুকালে নাই।

এবং ন সন্নাসদিতি ভ্রান্তিমাত্রং বিজৃম্ভতে
অনুভূয়ত এবাশু কিঞ্চিৎ সর্বানুভূতিতঃ ॥ ২৮

এইরূপে (প্রমাণিত হয় যে) বস্তুতঃ কার্যকারণ বলিয়া কিছু নাই, ভ্রান্তিবশতঃই সব কিছু প্রতীয়মান হয়। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই সর্ববস্তুবিষয়ক অনুভব হইয়া থাকে। (কারণ ব্রহ্মসত্তাদ্বারাই সর্ব বিশ্বের সত্তা অঙ্গীকার করা হয়। ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত কিছুই নাই—ইহাই অর্থ)।

যোগবাসিষ্ঠসার গ্রন্থের জগন্মিথ্যাত্ব-নামক দ্বিতীয় প্রকরণ সমাপ্ত। [ক্রমশঃ]

শ্রুতর্ষি চরক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ

আর্ষ যুগবার্তা। শ্রুতর্ষিশ্চরকঃ, স তু মুনিপুত্রঃ।

ঋষিযুগের কথা বলা হইতেছে; তন্মধ্যে শ্রুতর্ষি চরক, ইনি মুনিপুত্র। ইনি গুর্জর-দেশবাসী জনৈক ব্রাহ্মণসন্তান, ইনি গর্ভাষ্টমাব্দে উপনয়নান্তে দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে বাস ও বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করেন; সমাবর্তনসময়ে গুরু তাঁহাকে বলিলেন, 'চরক, অতঃপর তুমি ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম, এই চারিটি আশ্রমের মধ্যে কোন্ আশ্রমে প্রবেশ করিবে?' তদুত্তরে চরক বলিলেন, 'আমার ব্রহ্মচর্যাশ্রমটিই উত্তম বলিয়া মনে হয়, ব্রহ্মচর্যাশ্রমই অবলম্বন করিব।' এই বলিয়া পিতামাতার অনুমতি গ্রহণপূর্বক ব্রহ্মচারী হইয়া বহুকাল হিমালয়ের গুহায় অবস্থানপূর্বক তপস্যা দ্বারা সিদ্ধ হইয়া তিনি জন্মভূমিদর্শনার্থে বহির্গত হইলেন।

তত্র লোকান্ গদগ্রস্তান্ ব্যথয়া পরিপীড়িতান্।
স্থলেষু বহুষু ব্যগ্রান্ ম্রিয়মাণাংশ্চ দৃষ্টবান্॥
তান্ দৃষ্ট্বাতিদয়াযুক্তস্তেষাং দুঃখেন দুঃখিতঃ।
অনন্তশ্চিন্তয়ামাস রোগোপশমকারণম্॥

গমনকালে চরক পথিমধ্যে লোকসকলকে বহু স্থলে নানা প্রকার রোগযন্ত্রণায় পীড়িত, এমনকি অনেককে প্রায় মৃত্যুগ্রস্ত দেখিলেন। দেখিয়া অতি দয়াপরবশ হইয়া, যাহাতে জীবসকলের রোগমুক্তি হয় তজ্জন্য তিনি পুনরায় পূর্বাশ্রমে পর্বতগুহায় প্রত্যাবর্তনপূর্বক তপস্যায় রত হইয়াছিলেন।

সূর্যস্যোপাসনাং চক্রে নিদ্রাহারবিবর্জিতঃ।
প্রায়েণ সপ্তাহে গতে সূর্যঃ সাক্ষাদ্বভূব হ॥

চরক ঋষি সপ্তাহকাল আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা করিলে সূর্যদেব প্রত্যক্ষ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'ওহে চরক! তোমার প্রার্থনা ব্যক্ত কর, আমি তোমাকে বর দিবার জন্য আসিয়াছি এবং তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি।' এই কথা শুনিয়া চরক বলিলেন—

রোগারোগ্যদানদক্ষ সর্বলোকপ্রদীপক।
যদি মে ভগবন্ প্রীতো যদ্যস্তি তপসঃ ফলম্॥
রোগাতুরাণাং জীবানাং মঙ্গলং দাতুমর্হতি।
সর্বেষাং রোগমুক্তিঞ্চ যাচেঽহং সবিধে তব॥

'হে জগচ্চক্ষু, রোগসকলের আরোগ্যদানে মুক্তহস্ত দিবাকর, যদি আমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রার্থিত বরদানে ইচ্ছা করেন তবে তাহার ফলে জীবসকলের মঙ্গলবিধানপূর্বক তাহাদের রোগমুক্তি করুন—ইহাই আপনার নিকট প্রার্থনা করি। অর্থাৎ জীবসকল জন্মগ্রহণের পর আয়ুর শেষ সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তন্মধ্যে রোগ ভোগ করিবে না। ইহাই আমার প্রার্থিত উত্তম বর বলিয়া মনে করি।'

তদুত্তরে সূর্যদেব বলিলেন, 'দেখ চরক!

উভাভ্যামেব কর্মভ্যাং মানুষ্যং প্রতিবিন্দতে।
কর্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্মণৈব প্রলীয়তে॥

—পাপ ও পুণ্য দ্বিবিধ কর্ম দ্বারা মনুষ্যদেহ লাভ হয়। অতএব পাপ ও পুণ্য দ্বিবিধ কর্ম অর্থাৎ সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া জীবের মৃত্যু হয়।

অতস্তেষাং রোগমুক্তির্নাস্তীত্যেবং মতং মম।

অতএব মনুষ্যদেহে রোগ হইবে না এইরূপ

বর অসম্ভব।' এইরূপ বলিয়া সূর্যদেব অন্তর্হিত হইলে চরক পুনরায় সুদৃঢ়ভাবে তপস্যায় বসিলে তৎপরদিবসে পুনরায় প্রভাতের কিছু পূর্বে সূর্যদেব প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন, 'দেখ চরক, তুমি জীবসকলের রোগারোগ্য যাহাতে হয় এইরূপ বর গ্রহণ কর। রোগ হইবে না, এরূপ বর হয় না। তুমি ঋষি, আমি রোগ-সকলের ঔষধ বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া লিপিবদ্ধপূর্বক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রোগীসকলকে প্রয়োগ কর; তাহাতেই জীবসকল রোগমুক্ত হইবে।' চরক বলিলেন, 'আমার ঐরূপ বর লইবার ইচ্ছা নয়, কিন্তু যখন হইবে না, অগত্যা আপনি সর্ববিধ রোগমুক্তির উপায়স্বরূপ ঔষধগুলি বলুন, আমি যথাযথভাবে প্রস্তুত করিয়া রোগীসকলকে ঔষধ খাওয়াইয়া রোগমুক্ত করিব।'

চরক এইরূপ বলিলে সূর্যদেব বলিয়াছিলেন—

পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং নাড়ী তস্য কফাপহা।
ফলং তস্য ত্রিদোষঘ্নং মূলং তস্য বিরেচনম্॥

অর্থাৎ পটোলের পাতা পিত্তনাশক, ডাঁটা কফনাশক, পটোল ফল কফ পিত্ত বায়ু ত্রিদোষ-নাশক এবং শিকড় কোষ্ঠপরিষ্কারক। এইরূপ ভাবে প্রায় সমস্ত রোগের নিদান এবং ঔষধাদি প্রস্তুতের প্রক্রিয়াদি বলিয়া অন্তর্হিত হইলে চরক 'লিপিবদ্ধ করিব' এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমতাবস্থায় ১০।১৫ মিঃ পরেই সূর্যদেব পুনর্বার চরকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'দেখ চরক, একটি এমন ঔষধ আছে, যাহা সর্বরোগ হইতে জীবকে আরোগ্য করে; পূর্বে যে সকল ঔষধের কথা বলিলাম তাহার মধ্যেও ইহা একটু মিশ্রিত করিয়া ঔষধ দিবে।' তখন চরক বলিলেন, 'সে ঔষধটি কি, এবং কিভাবেই বা তাহা মিশ্রণ করিয়া দিব, বলুন।'

তখন সূর্যদেব বলিলেন—

অচ্যুতানন্তগোবিন্দনামস্মরণভেষজাৎ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং ব্রবীম্যহম্॥

'ভগবানের অচ্যুত, অনন্ত, গোবিন্দ নামের স্মরণরূপ ঔষধের দ্বারা জীবসকলের সমস্ত রোগ দূরীভূত হয়, ইহা ধ্রুব সত্য। তোমাকে আমি ত্রি-সত্য করিয়া বলিলাম। এবং এবিষয়ে আরও কিছু তত্ত্ব জানিবার আছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি শোন। পৃথিবীতে দ্বিবিধ মানবজাতি দেখা যায়, তন্মধ্যে লক্ষের মধ্যে প্রায় সকলেই ভগবদ্বিমুখ, দু-একজন ভগবন্মুখ বা ভগবদ্বিশ্বাসী; ইহাদিগকে বলিবে যে "তোমাদিগের ঔষধ খাইবার প্রয়োজন নাই, তোমাদের যত কঠিন রোগ হউক না কেন, ভগবানের নামস্মরণেই তোমাদের সব রোগ ভাল হইবে।" যাহারা ভগবদ্বিমুখ বা ভগবানে যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহাদিগকে পূর্বোক্ত কটুতিক্তকষায়াদি ঔষধ দিবে, আবশ্যক হইলে দেহ বিদ্ধ করিয়া কাটিয়া ছিঁড়িয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং ভগবানের নামরূপ ঔষধটিও ঐ সঙ্গে মিশ্রণ করিয়া দিবে—ইহাই ঔষধ প্রয়োগের সুব্যবস্থা।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

নাস্তি তথাবিধো রোগো নাস্তি শোকস্তথাবিধঃ।
যং ন নাশয়তি হ্যেকং হরের্নামৈব কেবলম্॥

হরিনাম নাশ করিতে পারে না এরূপ রোগ শোক কিছুই নাই অর্থাৎ হরিনামে সর্ব রোগ নাশ হয়।

আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও ঐরূপ নিশ্চিত মৃত্যুগ্রস্ত ব্যক্তিকে কেবলমাত্র ভগবন্নামের সাহায্যে মৃত্যুমুখ হইতে প্রায় ৩০ বৎসর বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন (দক্ষিণেশ্বরেই), ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিস্তরেণালম্।

যামুনাচার্য *

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহার লিখিত 'শ্রীশ্রীরামানুজচরিতে' বলিয়াছেন, "দ্বাপরযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া তামিলদেশীয় বহু সিদ্ধ ভক্ত মহাপুরুষ (আলোয়ার)-দিগের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী ভক্ত ছিলেন। গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে এই ভক্তিবাদ প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিক যুগেও আলোয়ারগণের আবির্ভাব হইয়াছে।" খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সমস্ত ভারতবর্ষে মহাপ্লাবনের ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। এই দার্শনিক যজ্ঞের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হোতা ছিলেন যথাক্রমে সিদ্ধযোগী শ্রীনাথ মুনি, তদীয় পৌত্র যামুনাচার্য এবং যামুনাচার্যের প্রশিষ্য রামানুজাচার্য। এই প্রবন্ধে যে মহাপুরুষের জীবনালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরকাল রাজত্ব করিবার পরে রাজসিংহাসন পরিত্যাগা-নন্তর সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরারাধনে জীবনপাত করেন, এবং সেই চিরবাঞ্ছিতের দর্শনলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়া ভক্তির মহাপ্লাবনে ভারতভূমি প্লাবিত করিবার প্রেরণা প্রদান করিয়াছিলেন।

৯৫৩ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মাদুরা নগরে এক সদ্‌ব্রাহ্মণকুলে যামুনা জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে উক্তপ্রদেশ পাণ্ড্যবংশীয় রাজাদের অধীন ছিল। যামুনা শ্রীনাথমুনির পৌত্র ছিলেন; তাঁহার দশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা ঈশ্বর মুনির মৃত্যু হইলে শ্রীনাথ-মুনির বৈরাগ্যানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখন তিনি পৌত্র যামুনাকে কুলপ্রথানুযায়ী গুরুগৃহে প্রেরণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া ঈশ্বরান্বেষণে প্রস্থান করেন এবং শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে আশ্রয় লন। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরই আলোয়ার-দিগের কেন্দ্র ছিল। তিনি যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া 'যোগীন্দ্র' নামে বিখ্যাত হন এবং তাঁহাদের সম্প্রদায় 'শ্রীসম্প্রদায়' নামে বিখ্যাত ছিল।

যামুনার গুরু শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্য, প্রতিভাবান শিষ্য যামুনাকে সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। পাণ্ড্যরাজার রাজসভায় এই সময়ে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত প্রধান সভাপণ্ডিতপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের বড় বড় পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে জয় করিয়া-ছিলেন; পরাজিত পণ্ডিতগণকে সেই কারণে দিগ্বিজয়ীর অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকিতে হইত এবং প্রতিবৎসর তাঁহাকে নির্ধারিত কর প্রদান করিতে হইত। দিগ্বিজয়ী যেখানে যাইতেন সেখানকার বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে আতঙ্ককোলাহলের সৃষ্টি হইত, এইজন্য দিগ্বিজয়ী 'বিদ্বজ্জনকোলাহল' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যামুনার গুরু শ্রীমদ্ভাষ্যাচার্যও পরাজিত পণ্ডিতদিগের মধ্যে একজন ছিলেন, এইজন্য তাঁহাকেও প্রতিবৎসর 'বিদ্বজ্জন-কোলাহল'কে কর দিতে হইত। যামুনার বয়স যখন ১২ বৎসর তখন 'কোলাহলের'

* এই প্রবন্ধের উপাদান স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী-প্রণীত 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাস' হইতে সংগৃহীত।

জনৈক শিষ্য বঞ্জি, ভাষ্যাচার্যের নিকট হইতে কর আদায়ের জন্য উপস্থিত হয়। ভাষ্যাচার্য তখন কার্যব্যপদেশে গ্রামান্তরে অবস্থান করিতেছিলেন। যামুনা বিনীতভাবে বঞ্জিকে বলিল যে, তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে সে তাঁহাকে কর প্রেরণ করার কথা বলিবে। ইহাতে বঞ্জি ক্রুদ্ধ হইয়া, ২।০ বৎসরের কর বাকী পড়িয়াছে বলিয়া ভাষ্যাচার্যের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করে। বালক যামুনা গুরুনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া পাল্টা কোলাহলের পাণ্ডিত্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া বলে যে, কোলাহল তাহাকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিলে তবেই সে কর পাইবে, নচেৎ কর পাইবার তাহার কোন অধিকার নাই। বঞ্জি তাহা শুনিয়া ক্রোধোন্মত্ত হইয়া প্রস্থান করে এবং রাজসভায় গিয়া রাজাকে ও কোলাহলকে তাহা বলে। পাণ্ডারাজ সত্য নির্ধারণের জন্য লোক প্রেরণ করিয়া অসন্দিগ্ধ-রূপে জানিতে পারিলেন যে, যামুনা সত্যসত্যই কোলাহলের সহিত তর্কযুদ্ধ করিতে কৃত-সঙ্কল্প। যামুনা রাজদূতকে ইহাও বলিয়াছিল যে, রাজধানীতে যাইতে হইলে রাজা যেন পণ্ডিতোচিত সম্মানের সহিত তাহাকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করেন, ইহাই তাহার প্রার্থনা। দ্বাদশবর্ষীয় বালক যামুনা কোলাহলকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছে এই সংবাদ দাবানলের মতো দেশমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইল; দেশব্যাপী একটা হৈ হৈ রব উঠিয়া গেল। কৌতূহলোদ্দীপ্ত রাজা নির্দিষ্ট দিনে যামুনাকে লইয়া যাইবার জন্য যথাযোগ্য রক্ষীসহ রাজশিবিকাদি প্রেরণ করিলেন। ভাষ্যাচার্য ইতিমধ্যে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনান্তর সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া ভীত হইলেন। কিন্তু যামুনা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া এবং তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া রাজবাড়ী চলিয়া গেল।

কোলাহলের উদ্ধত স্বভাবের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে খুব কম লোকই তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। এজন্য তাঁহাদের মধ্যে বহু লোক যামুনার জয় কামনা করিতে লাগিলেন; ফলে রাজ্যমধ্যে দুইটী দল সংগঠিত হইল। একদল যামুনা জয়ী হইবে বলিতে লাগিল, অপর দল তাহার বিপরীত। কোলাহলের পাণ্ডিত্যে রাজার ছিল দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি কোলাহলের বিজয়পক্ষ অবলম্বন করিলেন; রাণী কিন্তু কি একটা অজ্ঞাত প্রেরণার বশবর্তিনী হইয়া যামুনা জয়ী হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। রাজা কোলাহলের পক্ষে বাজী ধরিলেন এবং বলিলেন যে যামুনা যদি জয়ী হইতে পারে তাহা হইলে তিনি যামুনাকে অর্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিবেন।

যথাকালে যামুনা রাজসভায় উপস্থিত হইলে কোলাহল তাহাকে দেখিয়া তাচ্ছিল্য-পূর্ণস্বরে রাণীকে শ্লেষোক্তি করিয়া বলিলেন, "আলওয়ান্দারা?" অর্থাৎ এই বালক আমাকে তর্কে পরাজিত করিবে? রাণী তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিলেন, "আলওয়ান্দার!" "হাঁ, এই বালকই তোমাকে পরাজিত করিবে!" অগণিত লোকে পরিপূর্ণ সভায় বিচার আরম্ভ হইল। প্রথমে কোলাহল যামুনাকে কয়েকটি ব্যাকরণগত প্রশ্ন এবং কয়েকটি অমরকোষ হইতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; যামুনা হেলায় তাহার উত্তর প্রদান করিল। অতঃপর কোলাহল যামুনাকে প্রশ্ন করিতে বলিলেন। যামুনা বুঝিতে পারিল যে, তাহাকে অতি সামান্য কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কোলাহল তাহাকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর মর্যাদাই দিতে চাহেন না। তখন সে শ্লেষোক্তি করিয়া কোলাহলকে বলিল, "আপনি কি বিবেচনা

করেন যে, আপনার মতো বিরাটকায়ত্ব এবং বিরাটোদরত্ব দ্বারাই পাণ্ডিত্যের পরিমাপ হয়? তাহা হইলে একটা হাতী তো আপনার চেয়ে বেশী পণ্ডিত! অষ্টাবক্র মুনি* যখন মহারাজ জনকের সভায় বন্দীকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স কত ছিল? তিনি তখন বালক না বৃদ্ধ ছিলেন?" গোলমাল বাড়িয়া চলিতেছে দেখিয়া রাজা যামুনাকে প্রশ্ন করিতে আদেশ করিলেন। যামুনা তখন কোলাহলকে বলিল, "আমি আপনাকে তিনটি প্রস্তাব দিতেছি। আপনি এই তিনটি খণ্ডন করুন। (১) আপনার মাতা বন্ধ্যা নহেন। (২) পাণ্ড্যরাজ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ। (৩) রাজ্ঞী সাবিত্রীর ন্যায় সাধ্বী। কোলাহল বিব্রত ও দিশাহারা হইয়া ইহার উত্তর দিতে অস্বীকার করিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ! এই উদ্ধত অর্বাচীন বালক সভামধ্যে আমা দ্বারা আপনাকে পাপী ও রাণীমাতাকে অসতী প্রমাণ করাইতে চাহে, আপনি ইহার যথাযোগ্য শাস্তিবিধান করুন।" কোলাহলের পক্ষের লোক হৈ হৈ করিয়া উঠিল; যামুনার পক্ষাবলম্বী পণ্ডিতেরাও ততোধিক কলরব করিয়া কোলাহলের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। যামুনা শাস্ত্রসম্মত যুক্তি সহ সদুত্তর দিতে পারিলে কোলাহল পরাজয় স্বীকার করিবে—এই সর্তে রাজা যামুনাকে উত্তর দিতে বলিলেন। যামুনা তখন এইপ্রকারে উক্ত তিনটি প্রস্তাব খণ্ডন করিল—(১) কোলাহল ছিলেন তাঁহার মাতার একমাত্র পুত্র। মনু একমাত্র পুত্রের পিতাকে একাধিক পুত্রপ্রাপ্তির জন্য পুনরায় বিবাহের নির্দেশ দিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ একটি পুত্রও গয়াধামে গিয়া পিতৃপিণ্ড প্রদান করিতে পারে। তাহার ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন, "একঃ পুত্রোঽপুত্রো বা।" (মনু সং ৯।৬১, ভাষ্য)। সুতরাং কোলাহলের মাতা অপুত্রক বা বন্ধ্যা। (২) মনু ৮।৩০৪ শ্লোকানুযায়ী প্রজাকে রক্ষণাবেক্ষণ করার পরিবর্তে প্রজার দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের একষষ্ঠাংশ কর রাজার প্রাপ্য বিহিত আছে; ইহা ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতে করগ্রহণের সহিত রাজাকে প্রজার পাপপুণ্যের একষষ্ঠাংশও গ্রহণ করিতে হয়। রাজ্যের সমস্ত প্রজা নিষ্পাপ নহে, সুতরাং রাজাও নিষ্পাপ নহেন। (৩) মনুসংহিতা ৭।৭ শ্লোকে আছে যে রাজ্যাভিষেকের সময় হইতে সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি অষ্টদিক্পাল রাজার শরীরে অধিষ্ঠিত হন, সুতরাং রাজ্ঞী রাজার এবং অষ্টদিক্পালের মহিষী, এইজন্য তিনি সাবিত্রী নহেন।

রাণী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কোলাহলকে বলিলেন, "আলওয়ান্দর, আলওয়ান্দর। কোলাহল, বালক সত্যসত্যই আপনাকে পরাজিত করিয়াছে!" যামুনার পক্ষাবলম্বী লোকেরা যামুনার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। কোলাহল লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে দ্রুতপদে রাজসভা হইতে পালাইয়া গিয়া নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। রাজা বাজী হারিয়া অর্ধেক রাজত্ব যামুনাকে ছাড়িয়া দিলেন। যামুনা সংসারী হইয়া ৩৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত রাজত্বভোগ করিলেন।

এতদিনে শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে যামুনার পিতামহ শ্রীনাথমুনির অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। দেহান্তের পূর্বে তিনি তাঁহার প্রধান শিষ্য রামমিশ্র নম্বিকে বলিয়া গেলেন যেন তিনি

* অষ্টাবক্র মুনি দ্বাদশ বর্ষ বয়সে জনক রাজার প্রধান সভাপণ্ডিত বন্দীকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন

আত্মবিস্মৃত যামুনাকে ব্রাহ্মণ্যধর্মে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি না করেন। নাথ মুনির মৃত্যুর পরে স্বীয় গুরুদেবের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার ইচ্ছায় নম্বি মাদুরায় গিয়া উপস্থিত হইয়া কৌশলে কার্যোদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যামুনা এই কালে তাঁহার পার্শ্ববর্তী রাজ্য জয় করিবার আকাঙ্ক্ষায় প্রচুর সৈন্যসংগ্রহাদির কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। নম্বি রাজসভাতে উপস্থিত না হইয়া, যামুনার প্রধান পাচকের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া একদিন একঝুড়ি তুদ্‌বড়েই শাক লইয়া গিয়া তাহাকে সেই শাক সুস্বাদুরূপে পাক করিবার প্রণালী বুঝাইয়া দিলেন এবং তাহা রাজাকে খাইতে দিতে বলিলেন। তুদ্‌বড়েই শাকের গুণ এই যে, তাহা নিয়মিতরূপে খাইলে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; এ তথ্য কিন্তু নম্বি পাচকের কাছে ব্যক্ত করিলেন না। এইরূপে নম্বি প্রত্যহ শাক আনিয়া পাচককে দিতে লাগিলেন এবং পাচক তাহা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে সুস্বাদুরূপে পাক করিয়া যামুনাকে পরিবেশন করিতে থাকিল একমাস অতীত হইলে হঠাৎ একদিন নম্বি শাক লইয়া গেলেন না। যামুনা আহারে বসিয়া পাতে শাক না দেখিতে পাইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পাচকের মুখে আদ্যোপান্ত শাকের ইতিহাস শ্রবণ করিয়া যামুনা পাচককে সেই সন্ন্যাসীর অনুসন্ধান করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। পরদিবস প্রাতে নম্বি যখন শাক লইয়া গেলেন তখন পাচক তাঁহাকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য যামুনার আগ্রহের কথা বলিল। স্থির হইল যে যামুনার ভোজনকালে নম্বি তথায় আসিবেন এবং তাঁহার আহার শেষ হইলে তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। নির্দিষ্ট সময়ে নম্বি আসিয়া যামুনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহাকে নাথমুনির মৃত্যুসংবাদ জানাইয়া বলিলেন, "তিনি দেহত্যাগের পূর্বে তাঁহার গুপ্ত ধনভাণ্ডার আমার কাছে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন, মহারাজ দয়া করিয়া আমার সহিত তথায় চলুন এবং তাহা গ্রহণ করিয়া আমাকে দায়মুক্ত করুন।" পার্শ্ববর্তী রাজ্য জয় করিবার প্রস্তুতিতে যামুনার যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং স্বীয় পিতামহের মৃত্যুসংবাদে তিনি যেমন দুঃখিত হইলেন, তেমনি আবশ্যকীয় অর্থপ্রাপ্তির আশায় সমধিক উৎফুল্লও হইলেন, এবং বিলম্ব না করিয়া পরদিনই লোকজন লইয়া নম্বির সহিত যাইবেন বলিলেন। নম্বি তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন যে, রাজা একাকী সাধারণ বেশে সে গুপ্তধনভাণ্ডারে না যাইলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে। সুতরাং যামুনা পরদিবস একাকীই নম্বির সহিত যাইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

নম্বি জানিতেন যে, দীর্ঘকাল যাবৎ রাজোচিত বিলাস-বাহুল্যের মধ্যে পরিবর্ধিত যামুনা রৌদ্রের মধ্যে পদব্রজে একাদিক্রমে বেশী পথ চলিতে পারিবেন না; সেইজন্য পূর্ব হইতেই পরিকল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে প্রতিদিন প্রত্যূষে রওনা হইয়া তিন ক্রোশ পথের অধিক অগ্রসর হইবেন না। তাহাই করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন প্রত্যূষে রওনা হইয়া তিন ক্রোশ পথ অন্তে যে গ্রাম পাইতেন সেদিনের মত বিশ্রাম সেখানেই করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে বিশেষত্ব রহিল এই যে, প্রতিদিন গ্রামে পৌঁছিয়া বিশ্রামান্তর উভয়ে স্নানসন্ধ্যাবন্দনাদি সম্পন্ন করিতেন; তৎপরে আহারান্তে যামুনার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নম্বি অতি ভক্তিপূর্ণচিত্তে সুললিত স্বরে

তিন অধ্যায় গীতা পাঠ করিয়া শুনাইতেন। এইভাবে যখন ছয়দিনের পথ অতিক্রান্ত হইল এবং অষ্টাদশাধ্যায়ী গীতাপাঠ শেষ হইল তখন যামুনার কৃত্রিম রাজোচিত বহিরাবরণ অপসৃত হইয়া তন্মধ্যস্থ পুরুষানুক্রমিক ভক্তির উৎস পূর্ণবেগে উৎসারিত হইয়া তাঁহার হৃদয় পরিপ্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে। সে প্লাবনের স্রোতবেগে, সুরধুনীস্রোতে ঐরাবতের মত, তুচ্ছ রাজ্যজয়ের পরিকল্পনা এবং রাজ্যভোগ-সুখাকাঙ্ক্ষা ভাসিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। সপ্তম দিনের প্রভাতে নম্বি যামুনাকে শ্রীরঙ্গ-নাথের মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া সেই অগণন সাধুজনপূজিত দেবমূর্তি দেখাইয়া তাঁহাকে বলিল, "এই গ্রহণ করুন আপনার পিতামহ-গচ্ছিত ধনভাণ্ডার," তখন যামুনার প্রেমাশ্রু দরবিগলিত ধারায় নির্গত হইয়া মন্দিরতল সিক্ত করিতে লাগিল। যামুনার জীবননাট্যের পট পরিবর্তিত হইল। রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া যামুনা সেইদিন হইতে পুণ্যস্মৃতি পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন এবং চিরজীবনের মত রাজপ্রাসাদের পরিবর্তে সেই মন্দিরতল আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করিলেন। যথাকালে 'আলওয়ান্দর' যামুনা কঠোর সাধনাবলে 'আলোয়ার' যামুনাতে রূপান্তরিত হইয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যভূমি ভক্তিস্রোতে নিমজ্জিত করিলেন।

যামুনাচার্যের জীবননাটকের অন্তিম দৃশ্যও ততোধিক হৃদয়স্পর্শী, ততোধিক রহস্যপূর্ণ। মহাপ্রস্থানের দিন আগতপ্রায় বুঝিয়া যামুনা-চার্য তাঁহার প্রধান শিষ্য রামানুজকে আনিতে পাঠাইলেন। রামানুজ তখন উদীয়-মান যুবক, তাঁহার জ্ঞান ও ভক্তির আলোক সবেমাত্র বিচ্ছুরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। রামানুজ কালবিলম্ব না করিয়া যামুনাচার্যের চরণদর্শনমানসে যাত্রা করিলেন, কিন্তু আচার্যের জীবিতাবস্থায় তিনি আর তাঁহার দর্শন পাইলেন না। তিনচার দিনের পথ অতিক্রম করিয়া যখন রামানুজ যামুনাচার্যের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার মৃতদেহ সমুদ্রতীরে অগ্নিসৎকারোদ্দেশ্যে চিতার উপরে রক্ষিত। জীবিতাবস্থায় তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া আচার্যের অন্তিম ইচ্ছা অবগত হইতে না পারায় ক্ষোভে ও দুঃখে রামানুজের হৃদয় পূর্ণ হইল, তিনি আকুলপ্রাণে ক্রন্দন করিতে করিতে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ অতীত হইবার পরে হঠাৎ রামানুজের দৃষ্টি যামুনাচার্যের দক্ষিণ হস্তের প্রতি পতিত হইল; তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, আচার্যের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী পূর্ণপ্রসারিত, কিন্তু অন্য তিনটি অঙ্গুলী মুষ্টিবদ্ধ। অগ্নিসৎকারার্থে তথায় উপস্থিত আচার্যের শিষ্যসেবকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া রামানুজ জানিতে পারিলেন যে, আচার্যের মৃত্যুকাল হইতেই উক্ত তিনটি অঙ্গুলী বদ্ধাবস্থায় আছে, তৎপূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত উহা প্রসারিত ছিল। ইহার রহস্যোৎঘাটনমানসে রামানুজ নয়ন মুদ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন, পরে নয়ন উন্মীলিত করিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া বলিলেন, "আমি শ্রীসম্প্রদায়ে যোগদান করিব," সাথে সাথে আচার্যের মধ্যমাঙ্গুলী প্রসারিত হইল; দ্বিতীয়বার বলিলেন, "আমি শ্রীসম্প্রদায়মতে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করিব," তাহাতে অনামিকা প্রসারিত হইল; তৃতীয়বার বলিলেন, "আমি ভাষাতে (তামিলভাষায়) শ্রীসম্প্রদায়ের মত প্রচার করিব," এবার কনিষ্ঠাঙ্গুলীও খুলিয়া গেল।

যামুনাচার্য-প্রণীত 'সিদ্ধিত্রয়ম্', 'আগম-

প্রমাণম্', 'গীতার্থসংগ্রহম্' ও 'স্তোত্ররত্নম্' অদ্যাবধি সাধক এবং বিদ্বন্মণ্ডলীর পাঠ্যরূপে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার হৃদয়ের অনাবিল অমৃতপ্রবাহ, গভীর অনুরাগ, প্রগাঢ় প্রেম এবং ঐকান্তিক শরণাগতি 'স্তোত্ররত্নে' সর্বত্র পরিস্ফুট। সে আত্মবিস্মৃতিপূর্ণ শরণাগতির পবিত্র প্রবাহ, অশরণশরণের শ্রীচরণে সর্বস্ব বিলাইয়া আশ্রয়প্রার্থনার ব্যাকুলতা পাঠকের হৃদয়কেও ভাসাইয়া লইয়া যায়। সেই সাধকবরিষ্ঠ ভক্তচূড়ামণির সুরে যথাসম্ভব সুর মিলাইয়া আমরাও সেই পরমপুরুষের চরণে প্রণত হই—

"নমো নমো বাঙ্‌মনসাতিভূময়ে, নমো নমো
বাঙ্‌মনসৈকভূময়ে।
নমো নমোঽনন্তমহাবিভূতয়ে, নমো
নমোঽনন্তদয়ৈকসিন্ধবে॥
ন ধর্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী ন ভক্তি-
মাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্য!
ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে॥
॥ ওঁ তৎ সৎ॥

পূজা

শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়ুয়া

বিশ্বমাঝে চরাচরে পলকে পলকে
যেখানে তোমার লীলা অপূর্ব ঝলকে
আপনার প্রাণছন্দ করিছে প্রকাশ:
ভুবনে সাগরে নভে আলোক বাতাস
অকম্পিত ধ্বনি লাগি নিত্য যথা ছুটে
নক্ষত্র-গতিতে শূন্যেঃ রূপে রূপে ফুটে
অব্যক্ত অরূপ লোক; ওগো মহেশ্বর,
বিজন আসনে হেথা ধ্যানকলেবর
সর্ব অঙ্গে বিশ্বব্যথা করি অনুভব
কখন উঠিবে জাগি?
(হে রাজন্!)…ক্ষুদ্র হয়ে কবে
আবার আসিবে নেমে হাসিয়া নীরবে?
পাতিয়া আপনি কবে হৃদয়-আসন
রিক্তের ব্যথার পূজা করিবে গ্রহণ?

সমালোচনা

শ্রীম-দর্শন (ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধন), শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীম-র কথামৃত (সপ্তম ভাগ) —স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। পরিবেশক : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ৩০৩; মূল্য আট টাকা।

শ্রীম দর্শনের সপ্তম ভাগ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অন্যান্য ভাগের মতো এই ভাগেও শ্রীম অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের মুখে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলীরই প্রতিধ্বনি। ২৭টি অধ্যায়ে উপস্থাপিত নানা প্রসঙ্গের সহিত 'ঈশ্বর ও বিশ্বশান্তি', 'সুখও আমার নয়, দুঃখও আমার নয়', 'সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয় বিপদে', 'যাবৎ কায়া তাবৎ মহামায়া', 'সাধু-সঙ্গ যেমন মরূদ্যান' প্রভৃতি মনোজ্ঞভাবে আলোচিত।

এই ভাগের বৈশিষ্ট্য হইল—প্রথমে ঈশ্বর, পরে সব। 'আগে ঈশ্বরে ভক্তি লাভ কর, আগে নিজে শান্ত হও, পরে অপরকে বা জগৎকে শান্ত কর'—ইহাই শ্রীম বলিতেছেন।

'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥'

যাঁহাকে লাভ করিলে অপর সকল লাভই অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়, অতি দুঃখেও অবিচলিত-ভাবে পরমানন্দে অবস্থান করা যায়—শ্রীরাম-কৃষ্ণবাণীর বার্তাবহ কথামৃত-পরিবেশক শ্রীম সেই কথাই বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। নিজের চিত্ত চঞ্চল থাকিলে, নিজে শান্তিলাভ করিতে না পারিলে অপরকে কখনই শান্তি দেওয়া সম্ভব নয়। 'ঈশ্বরকে ধরে থাকলেই শান্তি—ব্যক্তি ও সমাজের শান্তি, বিশ্বশান্তি।'

আমরা আশা করি ইতঃপূর্বে প্রকাশিত শ্রীম-দর্শনের ভাগগুলির মতো বর্তমান ভাগটিও পাঠক-চিত্তে আলোকপাত করিতে সমর্থ হইবে।

নিবেদিতা বিদ্যালয় পত্রিকা (১৯৭০) —রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১০২।

পত্রিকাখানি সুমুদ্রিত এবং বিভিন্ন ধরনের রচনায় সমৃদ্ধ। ছাত্রীদের রচনাগুলি সুসম্পা-দিত। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লেখা : 'অমৃত-সাগর', 'কুমায়ুনের তিন তীর্থে', 'গরমিল' (কবিতা), 'What is Home-Science', 'ছাত্র বিদ্যাসাগর'। 'আমাদের কথা'য় বিদ্যালয়ে সারা বৎসরে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী সুন্দরভাবে বিবৃত।

খাসি ভাষায় পুস্তক

1. **U Ramakrishna**
2. **Ka Sarada Devi**
3. **U Swami Vivekananda—**

প্রকাশক : স্বামী গোকুলানন্দ, সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন চেরাপুঞ্জী (মেঘালয়) পৃষ্ঠা যথাক্রমে—৩২,৪১,১৯। মূল্য যথাক্রমে—৩০প., ৩০ প., ২৫ প.।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনীটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-কথা খাসি ভাষায় নূতন প্রকাশিত হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৭৭ (২৭. ২. ৭১.) শনিবার, শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষড়্‌ত্রিংশদধিক-শততম পুণ্য জন্মতিথি-উৎসব বিশেষ আনন্দ সহকারে ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি বেদপাঠ ও উষাকীর্তন, পূর্বাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতি, শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ, কালীকীর্তন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় ১০ সহস্র ভক্ত হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্ণে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী গম্ভীরানন্দ। বক্তা ছিলেন ডক্টর অমলেন্দু বসু, স্বামী নিঃশ্রেয়-সানন্দ ও ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। ডক্টর অমলেন্দু বসু ও স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ ইংরেজীতে ভাষণ দেন। ডক্টর গোবিন্দ-গোপাল মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ বাংলায় বলেন। সকলের ভাষণই বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে প্রদত্ত হইয়াছিল।

রাত্রে শ্রীশ্রীকালীমাতার বিশেষ পূজা ও হোম হয়। রাত্রিশেষে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরা-নন্দজী মহারাজ ১৪ জনকে সন্ন্যাসব্রতে ও ১৫ জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

গত ২২শে ফাল্গুন (৭. ৩. ৭১.) রবিবার শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ মহোৎসব মনোজ্ঞ কর্মসূচীর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে প্রধান মন্দিরের পূর্বদিকে নির্মিত সুসজ্জিত মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি সুবৃহৎ প্রতিকৃতি ও তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সজ্জিত রাখা হয়। মধ্যাহ্ণে প্রায় ১৫,০০০ ভক্ত হাতে হাতে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

বেদপাঠ, ভজন, 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, বাংলা ইংরেজী ও হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাষণ, রামচরিতমানস পাঠ, আবৃত্তি, বাইবেল পাঠ, 'ধম্মপদ' পাঠ, প্রদর্শনীমণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্গীত, মঠপ্রাঙ্গণে কালীকীর্তন প্রভৃতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

গৌহাটী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে মন্দির-প্রতিষ্ঠা

গৌহাটী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৮শে জানুআরি বৃহস্পতিবার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ নবনির্মিত মন্দিরের শুভ প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন করেন।

এই উপলক্ষে পূর্বদিন সায়াহ্ণে অধিবাস হয়। প্রতিষ্ঠাদিবসে পূর্বাহ্ণ ৬-৩০ মিনিটে পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী সাধু ও ভক্তগণ সহ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীকে লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে মন্দির পরিক্রমা করিয়া বৈদিক মন্ত্রপাঠের মধ্যে অপূর্ব শান্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিবেশে মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমস্তদিনব্যাপী বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, বাস্তুযাগ ও ভজন-কীর্তনাদি হয়। পূজা সুসম্পন্ন করেন স্বামী হিতানন্দ মহারাজ। মধ্যাহ্নে প্রায় ৬।৭ হাজার ভক্ত নরনারী অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজনাদির পর রাত্রে শ্রীশ্রীকালীপূজা হয়। এই উপলক্ষে মালদহ, জলপাইগুড়ি, কাটিহার, জামতাড়া, শিলং, চেরাপুঞ্জী, আলং (নেফা) ও করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষগণ এবং কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার, ধুবড়ী, ডিব্রুগড়, আগড়তলা ইত্যাদি আশ্রমের সাধু ও ভক্তগণ যোগদান করিয়া মন্দির-প্রতিষ্ঠা সাফল্যমণ্ডিত করেন।

উৎসব-সংবাদ

জামসেদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটীতে গত ২৭শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব দুইদিন-ব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ২৭শে পূজা হোম ইত্যাদির পরে সন্ধ্যারতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী অনুধ্যান করা হয়। তৎপরে বাঁকুড়ানিবাসী শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় রামায়ণ গান করিয়া ভক্তমণ্ডলীকে আনন্দদান করেন। ২৮শে প্রাতে ৯ ঘটিকায় স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ পরিতৃপ্ত হন। সন্ধ্যারতির পর সাধারণ সভা হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন টাটা ইস্পাত কোম্পানীর শিক্ষাবিভাগের কর্তা শ্রীবি. এন. সাক্সেনা। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর স্বামী নিরাময়ানন্দ হৃদয়গ্রাহিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। স্থানীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যদেব ওঝা হিন্দিতে বক্তৃতা করিবার পর সভাপতি শ্রীসাক্সেনা ইংরেজীতে ভাষণ দেন। সভার পর শ্রীদ্বিজরাজ রামায়ণ গান পরিবেশন করেন।

ভক্তদিগের সনির্বন্ধ অনুরোধে ২রা মার্চ সন্ধ্যারতির পর স্বামী নিরাময়ানন্দ কথামৃত পাঠ এবং ব্যাখ্যা করেন।

এই উৎসব উপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণসেবা, এবং জামসেদপুর সরকারী হাসপাতালের রোগীদিগকে ফল-মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

গড়বেতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ২৭ ও ২৮শে ফেব্রুআরি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিবস প্রত্যূষে মঙ্গলারতি ও উষাকীর্তন, পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজাদি, চণ্ডীপাঠ, হোম প্রভৃতির পর মধ্যাহ্নে প্রায় হাজার ভক্ত নরনারী ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকান্তে ধর্মসভায় স্বামী বিশ্বদেবানন্দ ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শ ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন এবং পর দিবস সন্ধ্যায়-আরাত্রিকান্তে তিনি সঙ্গীতসহ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-লীলা-কথকতা পরিবেশন করেন।

কার্যবিবরণী

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুলপ্রথা এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সমন্বয়ে পরিচালিত এই বিদ্যার্থী আশ্রমে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রগণ সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে থাকিয়া বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ পায়। আংশিক বা পূর্ণ ব্যয়বহনকারী নৈতিক-শিক্ষালাভেচ্ছু কিছুসংখ্যক ছাত্রও এখানে থাকিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করে।

আলোচ্য বর্ষশেষে মোট ৯৫ জন

আশ্রমিকের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনা খরচায় ছিল ৫৮জন ; ১২জন বিদ্যার্থী আংশিক এবং ২৫ জন পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিদ্যার্থী আশ্রমের সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থীদের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

সকল ছাত্রেরই শারীরিক, মানসিক, নৈতিক—সর্ববিধ উন্নতির জন্য যথোপযুক্ত যত্ন লওয়া হয়।

গ্রন্থাগারের সুনির্বাচিত গ্রন্থসংখ্যা ৩,৫৭২। ৩টি দৈনিক সংবাদপত্র রাখা হয়। লাইব্রেরীর 'টেক্সট-বুক সেকশন'-এর ২,৭২২ খানি পুস্তকের মধ্যে বিদ্যার্থীরা ১,৮৩৫ খানি ব্যবহার করিয়াছে।

আশ্রমে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা ও শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপর লীলাপার্ষদগণের জন্মতিথি যথাবিধি উদ্‌যাপিত হয়। স্বাধীনতা-দিবস, প্রজাতন্ত্র-দিবস, ২৪শে ডিসেম্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি-উৎসব, বুদ্ধপূর্ণিমা, খৃষ্টাবির্ভাব-সন্ধ্যা প্রভৃতিও পালিত হয়।

বিদ্যার্থী আশ্রমের আর একটি কর্মবিভাগ 'রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ'। সরকার-অনুমোদিত এই ত্রৈবার্ষিক পলিটেকনিকে আলোচ্য বর্ষের ছাত্রসংখ্যা ৩৬০, তন্মধ্যে সিভিল ইন্‌জিনীয়ারিং-এ ৯০, মেকানিক্যাল ইন্‌জিনীয়ারিং-এ ২০০, ইলেকট্রিক্যাল ইন্‌জিনীয়ারিং-এ ৭০। অভিজ্ঞ অধ্যাপকবৃন্দ এখানে শিক্ষাদান-কার্যে নিযুক্ত আছেন। শিল্পপীঠের গ্রন্থাগারে ৪,৬০০ গ্রন্থ রাখা হইয়াছে, ৫ খানি দৈনিক সংবাদপত্র এবং ৬টি সাময়িক পত্রিকা এখানে লওয়া হয়।

বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের (রামকৃষ্ণ রোড, বারাণসী ১) ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া সেবাশ্রমটি আর্ত-নারায়ণের সেবায় নিরত।

সেবাশ্রমের মোট শয্যাসংখ্যা ২২৫, ইহার মধ্যে ইনডোর হাসপাতালে ১৫০টি (৬৮টি সার্জিক্যাল), অবশিষ্ট ৭৫টি শয্যা ইনভ্যালিড ওয়ার্ডে। আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের উল্লেখ-যোগ্য কার্য :

(১) অন্তর্বিভাগীয় সাধারণ হাসপাতালে ২,৭৯০ জন রোগীকে ভরতি করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১,৭১৮ জন আরোগ্য লাভ করেন। ইনডোরে ১,১৫৫ জন রোগীর অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়। দৈনিক গড়ে ৯৭টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। গঙ্গার ঘাট ও রাস্তা হইতে আনিয়া ২৫ জন রোগীর চিকিৎসা ও সেবা করা হয়।

(২) বাহিরের রোগীর চিকিৎসাবিভাগে (শিবালা-শাখা সহ) এই বৎসরে ৪৯,৬১০ জন নূতন এবং ১,১৬,৪৩৩ জন পুরাতন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। রোগীর সংখ্যা দৈনিক গড়ে ৪৫৫। আউটডোরে মোট ১০,১৬৬টি অস্ত্রচিকিৎসা করা হয় এবং ৪৫,৮৩০টি ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়।

(৩) বৃদ্ধ ও আতুর নিবাসে—যাহাদের কোন সংস্থান নাই এইরূপ ২০জন পুরুষ ও ৩৪ জন মহিলাকে রাখা হইয়াছিল।

(৪) সাহায্যদান বিভাগ হইতে ৭০ জন অসহায় এবং দুঃস্থ মহিলাকে মাসিক সাহায্য বাবদ মোট ১ ৯৫৪'২৫ টাকা ব্যয় করা হয় এবং ১,০৮০'৮৩ টাকা মূল্যের ১৮৫ খানি সূতী কম্বল বিতরণ করা হয়।

(৫) শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তীর উদ্বৃত্ত তহবিলের আয় হইতে রচনা-প্রতিযোগিতা এবং পুস্তকাদিক্রয় ইত্যাদিতে

২৩১ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৬৩ জন দরিদ্র শিশুকে ২৪৬ খানি বই দেওয়া হইয়াছে।

(৬) প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরিতে এবং এক্স-রে ও ইলেক্‌ট্রোথেরাপি বিভাগে পরীক্ষা-কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

(৭) সেবাশ্রমের কর্মীদের জন্য একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী পরিচালিত হইতেছে। বহু বিশিষ্ট অভিজ্ঞ চিকিৎসক সেবাশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিচালনা করেন। রোগীদের সেবা-শুশ্রূষার অনেক কার্যই, মিশনের ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়; ভক্তবৃন্দও সেবাকার্যে অনেক সহায়তা করেন।

উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য বর্ষে বারাণসী সেবাশ্রমের আউটডোরে ও ইনডোরে জাতিধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে মোট চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৪৯,৬১০ ও ২,৭৯০; ইহার মধ্যে উত্তরপ্রদেশের রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক—৪৬,৪১০ ও ২,২৮৩; অবশিষ্ট রোগিসমূহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ও ভারতেতর দেশসমূহের।

তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ২৭ ও ২৮ ফেব্রুআরি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-মহোৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা-পাঠাদি ছাড়াও হলদিয়ার তৈলশোধনাগারের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এন্. এস্. ভি. শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় অধ্যক্ষ শ্রীগোপালচন্দ্র কর মহাশয় আলোচ্য বিষয় "যুগসমস্যাসমাধানে বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ" কি পথ দেখাইয়াছেন তাহার উল্লেখ করিবার পর বেলুড় মঠের স্বামী চেতনানন্দ উক্ত বিষয়টি মনোজ্ঞভাবে বিশ্লেষণ করিয়া প্রাণস্পর্শী সুদীর্ঘ ভাষণে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন।

মহোৎসবের দুই দিনই সন্ধ্যার পর বেতার-শিল্পী শ্রীগৌরীশংকর মুখোপাধ্যায় ও সহশিল্পিগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ও শ্রীশ্রীসারদা-লীলাগীতি কথা ও সুরে পরিবেশন করেন। আনুমানিক ২০০০ নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিবিধ সংবাদ

মানুষের তৃতীয়বার চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ

গত ৩১শে জানুআরি, ১৯৭১ মধ্যরাত্রে আমেরিকার অ্যাপোলো ১৪ মহাকাশযান 'কিটি হক' তিনজন মহাকাশযাত্রী অ্যালেন বি. শেপার্ড (কম্যাণ্ডার) স্টুয়ার্ট রুসা (মহাকাশযানচালক) ও এগার ডি মিচেলকে (চন্দ্রযানচালক) লইয়া কেপ কেনেডি হইতে উৎক্ষিপ্ত হয়, এবং উৎক্ষেপের আড়াই ঘণ্টা পরে চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা শুরু করে। চাঁদের কাছে পৌঁছিবার পর মহাকাশযানটি চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে মাত্র ৯.৫ মাইল উপরে থাকিয়া ৪ঠা ফেব্রুআরি হইতে চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। (ইতিপূর্বে যে দুটি চন্দ্রযান চাঁদে মানুষ লইয়া গিয়াছিল সে দুটিই ৭০ মাইল উপরে থাকিয়া চন্দ্রপ্রদক্ষিণ করিয়াছিল এবং সেখান হইতেই চন্দ্রযানকে নামিতে হইয়াছিল)।

পরদিন ৫ই ফেব্রুআরি শেপার্ড ও মিচেল চন্দ্রযানে আরোহণ করিয়া যানটিকে বিকাল ২-৪৮ মিনিট সময়ে (ভাঃ) চাঁদের 'ফ্রা মরো' অঞ্চলে অবতরণ করান। যানের অবতরণস্থলে, বিশেষ করিয়া চন্দ্রযানের সম্মুখের পায়াটি যে স্থান স্পর্শ করে সে স্থলে মাটি খুব নরম ছিল, স্থানটিও ঢালু ছিল। পূর্ণিমার দিন চাঁদকে আমরা যেভাবে দেখিতে পাই, তাহার কেন্দ্রবিন্দু হইতে সামান্য বামদিকে 'ফ্রা মরো' অঞ্চল অবস্থিত। শেপার্ড চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ করেন রাত্রি ৮-২৪ মিনিটে, মিচেল ৮-৩০ মিনিটে (ভাঃ)। নির্ধারিত কাজগুলি করিয়া তাঁহারা যানে ফিরিয়া আসেন এবং পরে বিশ্রামান্তে আবার নামিয়া কাজ করেন। একটি ছাড়া নির্ধারিত আর সব কাজই তাঁহারা করিয়া আসিয়াছেন; চন্দ্রযানটির অবতরণস্থল হইতে ৩,০০০ ফুট দূরে অবস্থিত ৪০০ ফুট উঁচু প্রাচীরে ঘেরা চাঁদের গর্তটি পর্যবেক্ষণ করার কথা ছিল; তাঁহারা একাজে আগাইয়াও গিয়াছিলেন, কিন্তু উপরে উঠিবার সময় তাঁহাদের নাড়ীর গতি খুব বাড়িয়া যাওয়ায় (মিনিটে ১৫০) পৃথিবীস্থ নিয়ন্ত্রণাগার হইতে ঐ কাজটি অসমাপ্ত রাখিয়াই ফিরিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

পরদিন ৬ই ফেব্রুআরি তাঁহারা চন্দ্রযানের একাংশকে চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ৯.৫ মাইল উপরে চন্দ্রপ্রদক্ষিণকারী মহাকাশযানে ফিরিয়া আসেন এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবতরণ করেন ১০ই ফেব্রুআরি রাত্রি ২-৩৫ মিনিটে (ভারতীয় সময়)।

উৎসব-সংবাদ

ফরিদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর ১০৯তম জন্মতিথি যথাযথভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

ঐদিন প্রাতে মঙ্গল-আরতি, ভজন, শ্যামা-সঙ্গীত হয়। মধ্যাহ্নে বিশেষ পূজা, হোম এবং চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়।

অপরাহ্ণে সমাগত বহু নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় আরতির পর স্বামীজীর সঙ্গীত, ভজন, কীর্তন পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পী শ্রীকরুণাময় অধিকারী, মিহির, বিমল, অমল, শ্রীযুক্তা গীতা ভৌমিক, কুমারী দীপালী, তপতী, উমা, মৈত্রেয়ী, শুক্লা ব্যানার্জী ও শুক্লা চক্রবর্তী।

পরিশেষে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কার্য-

নির্বাহক সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর বিনোদলাল ভদ্র স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করেন।

বিগত ৫ই ফেব্রুআরি শুক্রবার কার্য-নির্বাহক সমিতির উদ্যোগে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-প্রাঙ্গণে ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফরিদপুর জেলা জজ জনাব ইকবাল হোসেন চৌধুরী সাহেব। প্রধান অতিথি ছিলেন ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

স্তোত্রপাঠের মাধ্যমে সভার উদ্বোধন করেন আশ্রম-পরিচালিত মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ। পরে শ্যামাসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। শ্রীবলাই কর্মকার ও শ্রীবিমল দাস স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রীশ্যামল বণিক স্বামীজীর জীবনী সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন।

ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন আলোচনা করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে জেলা-জজ সাহেব স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন।

সমাগত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য-নির্বাহক সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর বিনোদলাল ভদ্র।

খেপুত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৪ই ফাল্গুন শনিবার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের ১৩৬তম জন্মতিথিপূজা ও উৎসব মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, প্রসাদবিতরণ, ভজন, কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শত শত গ্রামবাসী ভক্তনরনারী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উৎসবে যোগদান করিয়া আশ্রমটিকে আনন্দমুখর রাখিয়াছিলেন সারাদিন রাত্রে কীর্তনান্তে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

চাঁদপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ১লা জানুআরি হইতে ৪ঠা জানুআরি পর্যন্ত সাড়ম্বরে চারিদিবসব্যাপী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 'কল্পতরু' উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উৎসবে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা, বরিশাল, দিনাজপুর, ফরিদপুর, ঢাকা, চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ভক্তনরনারী যোগদান করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কল্পতরু-উৎসবের দিন স্বামী সোমদানন্দ মহারাজ, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর উৎসবের দিন স্বামী দয়ানন্দ মহারাজ এবং স্বামীজীর উৎসবের দিন শঙ্কর-মঠের স্বামী জ্যোতীশ্বরানন্দ গিরি মহারাজ সভাপতিত্ব করেন এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্তী মহাশয় প্রত্যহ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় প্রত্যহ শত শত ভক্ত-নরনারী যোগদান করেন। চতুর্থ দিবস প্রায় ছয়হাজার নর-নারী খিচুড়ি এবং মিষ্টান্ন-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ভ্রমসংশোধন

উদ্বোধনের গত ফাল্গুন সংখ্যায় ৭৮ ও ৭৯ পৃষ্ঠায় 'বাসিষ্ট' ও 'বসিষ্ট' স্থলে যথাক্রমে 'বাসিষ্ঠ' ও 'বশিষ্ঠ' পড়িবেন।

Statement about ownership and other particulars of

UDBODHAN

FORM IV

According to Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956

1.	Place of Publication	..	1, Udbodhan Lane, Baghbazar, Calcutta-3
2.	Periodicity of its Publication	..	Monthly
3.	Printer's Name	.. ..	Swami Niramoyananda
	Nationality	.. ..	Indian
	Address	.. ..	1, Udbodhan Lane, Calcutta-3
4.	Publisher's Name	.. ..	Swami Niramoyananda
	Nationality	.. ..	Indian
	Address	.. ..	1, Udbodhan Lane, Calcutta-3
5.	Editor's Name	.. ..	Swami Vishwashrayananda
	Nationality	.. ..	Indian
	Address	.. ..	1, Udbodhan Lane, Calcutta-3
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper		Trustees of the Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah, West Bengal

I, Swami Niramoyananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Publisher :

Date, 15th March, 1971. (Sd.) Swami Niramoyananda

রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্বাস্তু-সেবাকার্য

জনসাধারণ অবগত আছেন, সম্প্রতি বিভিন্ন স্থানে পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুগণ অসহায় অবস্থায় ভারতে প্রবেশ করিতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন ইতিমধ্যেই সিলেট সীমান্তে ডাউকীতে এবং পূর্ব-দিনাজপুর সীমান্তে রাধিকাপুরে এই সব উদ্বাস্তুদের সেবায় ব্রতী হইয়াছেন। জলপাইগুড়িতে এবং করিমগঞ্জের নিকট ফকিরাবাদ ক্যাম্পেও কার্যারম্ভের উদ্যোগ চলিতেছে, শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

সহৃদয় জনগণ সর্ববিধ সেবাকার্যে বরাবরই রামকৃষ্ণ মিশনকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন; বর্তমানে আরব্ধ এই উদ্বাস্তু-সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট আবেদন জানাইতেছি—তাঁহারা যেন অকুণ্ঠভাবে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন; তাঁহাদের সর্ববিধ দানই কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে; "RAMAKRISHNA MISSION" এই নামে চেক লিখিবেন:

১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, (হাওড়া)

২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এন্টালী রোড, কলিকাতা ১৪

৩। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩

৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা ২৯

বেলুড় মঠ,
১০ এপ্রিল,
১৯৭১

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

দিব্য বাণী

'যথাগারং সুচ্ছন্নং বুট্‌ঠী ন সমতি বিজ্‌ঝতি
এবং সুভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতি বিজ্‌ঝতি ॥'
'সুঞ্ঞাগারং পবট্ঠিস্‌স সন্তচিত্তস্‌স ভিক্‌খুনো।
অমানুসী রতী হোতি সম্মাধম্মং বিপস্‌সতো ॥'

—বুদ্ধদেব

গৃহ যদি ভালভাবে থাকে আচ্ছাদিত
সে গৃহে বর্ষিত বারি প্রবেশিতে নারে,
সেরূপ যে চিত্ত থাকে সৎ-চিন্তান্বিত
আসক্তি ঢুকিতে নারে সে চিত্ত-আগারে ॥

শূন্য চিত্তাগার মাঝে ঢুকেছেন যাঁরা—
(নির্বাসনা চিত্ত যাঁর, সর্ববৃত্তিহীন, অচঞ্চল,)
ধীমান্‌ প্রশান্তচিত্ত তাঁরাই কেবল
পেয়েছেন দিব্যানন্দ বিপুল বিমল;
ধর্মের প্রকৃত রূপ দেখেছেন তাঁরা।

কথাপ্রসঙ্গে

ভগবান বুদ্ধ ও শিবাবতার শঙ্কর

বোধিদ্রুমতলে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট সমাধিস্থ সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। ঊনপঞ্চাশ দিন মগ্ন রহিলেন সে সমাধির আনন্দে। পরে যে সত্য তিনি লাভ করিয়াছেন তাহা প্রচারের ইচ্ছা যখন জাগিল, তখন ভাবিলেন ইহা প্রচার করিয়া লাভ কি? কাহার নিকট এ সত্য তিনি প্রচার করিবেন, কেই বা ইহা বুঝিবে, আর কেই বা সচেষ্ট হইবে ইহা লাভ করিতে? জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির হাত হইতে মানুষের নিষ্কৃতি-লাভের পথের সন্ধানে তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, সে পথের সন্ধানও পাইয়াছেন। কিন্তু মানুষ এ পথে চলিতে চাহিবে কি? পরমানন্দ, অমৃতত্ব প্রভৃতি শব্দের দ্বারা যাহার ইঙ্গিত দেওয়া হয় তাহা এ পথেই লভ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু এ পথকে তো সাধারণ মানুষ নিরানন্দের, মৃত্যুর পথ বলিয়াই ভাবিবে। আনন্দ বলিতে তাহারা বোঝে দেহমনের মাধ্যমে আহৃত সুখ, জীবন বলিতে বোঝে দেহমনবুদ্ধির সীমায় নিজ অস্তিত্বকে আটকাইয়া রাখা। কিন্তু এ পথ তো এ সব কিছুর সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া এ সব কিছুর পারে নিজেকে লইয়া যাইবার পথ। মানুষ তাহা করিতে চাহিবে না; কাজেই প্রচার করিয়া লাভ নাই।

কথিত আছে, এই সময় ব্রহ্মা (ব্রহ্ম সহম্পতি) বুদ্ধের সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং তাঁহাকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া প্রচার করিতে বলেন। একথাও বলেন যে, তাঁহার কথা যথাযথভাবে ধারণা করিবার ও তাঁহার নির্দেশিত পথে চলিবার মতো মানুষও আছে। ইহার পরই বুদ্ধদেব প্রচারার্থে বারাণসী গমন করেন এবং সেখানে মৃগদাবে তাঁহার পূর্ব-পরিচিত পঞ্চভিক্ষুকে শিষ্য করিয়া প্রচারের সহায়তার জন্য তাঁহাদের লইয়া সংঘগঠন করেন।

অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায় শিবাবতার শঙ্করের জীবনেও। কথিত আছে, ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের পর তিনিও প্রচারে উদাসীন ছিলেন। গুরুর আদেশে বারাণসীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন এবং যাঁহারা জিজ্ঞাসু হইয়া আসিতেন তাঁহাদেরই উপদেশ দিতেন বটে, তবে কোন কিছুতে উৎসাহ ছিল না। ইহার কারণ দেখানো হইয়াছে অনুরূপ। শঙ্করাচার্যের নিকট তখন জীব-জগৎ অবাস্তব, স্বপ্নবৎ বলিয়া প্রতিভাত; স্বপ্নরাজ্যে প্রচারের অর্থ কি? কথিত আছে, এই সময় তিনি কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণার দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার কৃপায় জীবজগৎকে জগন্নিয়ামিকা চিন্ময়ী মহাশক্তিরই বিকাশরূপে প্রত্যক্ষ করেন। শ্রীশ্রীবিশ্বনাথও এই সময় তাঁহাকে দর্শন দিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইহার পরই শঙ্করাচার্য বদরিকাশ্রমে যাইয়া প্রায় চারিবৎসর ব্যাসগুহায় বাস করিয়া ব্রহ্মসূত্রের এবং গীতা ও উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন।

এই সময় তিনি সমীপাগত ব্যক্তিদের নিকট এই ভাষ্যের অধ্যাপনা করিতেন বটে, কিন্তু দেশ ঘুরিয়া প্রচারে কোন উৎসাহই ছিল না; বরং উত্তরকাশীতে আসিয়া

দেহত্যাগের ইচ্ছাই করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এখানে ব্যাসদেবের আদেশেই তিনি লোককল্যাণার্থে প্রচারে উৎসাহী ও ব্রতী হন।

ভগবান বুদ্ধ ও শিবাবতার শঙ্করের জীবনের এই ঘটনাগুলির ঐতিহাসিক দৃঢ় ভিত্তি না থাকিলেও আধুনিক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের অনুরূপ ঘটনা এগুলির অন্তর্নিহিত ভাবের সত্যতায় আমাদের নিঃসন্দেহ করে।

অদ্বৈতসাধনায় সিদ্ধিলাভের পর (শ্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরত্যাগের পর) শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘ ছয় মাস কাল নিরন্তর নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন ছিলেন। পরে জগন্মাতা তাঁহাকে 'ভাবমুখে' থাকিবার জন্য আদেশ করেন। তাঁহার লোককল্যাণে ব্রতী হওয়া ইহার পরবর্তী ঘটনা।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' হইতে যতটুকু বুঝা যায়, 'ভাবমুখে' থাকার অর্থ হইল ঈশ্বরেচ্ছার সাহত নিজের ইচ্ছার অভিন্নতার উপলব্ধিতে অবস্থান, শ্রীভগবানের ভাবাতীত সত্তা এবং তাঁহাতে ভাবের বিকাশের অবস্থার সংযোগস্থলে অবস্থান; অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত একত্বানুভূতিতে অবস্থান। এই বিকশিতভাবযুক্ত ভাবাতীত সত্তাই ঈশ্বর। এরূপ ভাবমুখে অবস্থিত পুরুষগণই আমাদের ভাষায় 'অবতার'।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও অনুরূপ ঘটনা দেখা যায়। তিনিও নির্বিকল্প সমাধিলাভের পর উহাতেই মগ্ন থাকিতে চাহিয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশই তাঁহাকে প্রচারে, 'মায়ের কাজে' ব্রতী করে। গুরুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইলেও নির্বিকল্প সমাধিতে আবার ডুবিয়া যাওয়ার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই অনুমান হয়—এই সময়কার কয়েকটি পত্রে হিমালয়ের কোন নির্জন প্রদেশে যাইয়া ধ্যানমগ্ন হইবার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশিত। মনে হয় এই দোটানার ভাব কাটাইয়া মায়ের কাজেই তিনি পূর্ণোদ্যমী হন হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলে ধ্যানমগ্ন হইবার মতো নির্জন স্থানের সন্ধানে শেষবার যাইবার পথে কনখলের নিকটবর্তী একটি বটবৃক্ষতলে বসিয়া গভীর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় একটি অনুভূতিলাভের পর। ধ্যানভঙ্গের পরই তিনি নিকটে উপবিষ্ট সঙ্গী গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দকে বলিয়াছিলেন, "আজ এই বটবৃক্ষতলে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।" আর দিনপঞ্জীতে লিখিয়াছিলেন, "যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাই আছে ভাণ্ডে"...ইত্যাদি। ইহা হইতে অনুমান হয়, আচার্য শঙ্করের বারাণসীতে থাকাকালীন দর্শনের মতোই এই সময় তিনিও যাঁহাকে নির্বিকল্প সমাধিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই দেখিয়াছিলেন জীবজগৎরূপে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি কথাও এই উপলব্ধিলাভেরই ইঙ্গিত বহন করে; নির্বিকল্প সমাধিলাভের পর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যখন তিনি উহাতে সর্বক্ষণ মগ্ন থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন বলিয়াছিলেন, "এর চেয়েও উঁচু অবস্থা হতে পারবে; তুই না গা'স 'যো কুছ্ হ্যায় সব তুঁহী হ্যায়'?"

বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্যের সম্বন্ধে কথিত ঘটনার অনুরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে সংঘটিত ঘটনাগুলির অন্তর্নিহিত সত্য হইল, চরমসত্যের সঙ্গে নিজের একত্ব-অনুভূতির পর 'নিজের ইচ্ছা' বলিয়া ইহাদের

আর কিছুই থাকে না; ইঁহারা যে লোক-কল্যাণকর্মে ব্রতী হন তাহা জগন্মাতা বা জগদীশ্বরের 'আদেশে' বা ইচ্ছায়; তিনি ইঁহাদের অতি শুদ্ধ মন-বুদ্ধি-অহংরূপ যন্ত্রকে ব্যবহার করেন লোককল্যাণকর্মে। অর্থাৎ তাঁহাদের মন-বুদ্ধি এবং 'আমি'তেও অধিষ্ঠিত থাকেন স্বয়ং ঈশ্বর—সর্বজীবের অন্তরে অবস্থিত অন্তর্যামিরূপেই নয়, মনবুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষাৎ চালকরূপে। ইঁহারাই অবতার। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, ইঁহারা সকলেই ভগবানের ভাবাতীত নির্গুণ স্বরূপ এবং ভাবময় সগুণ রূপ—নিত্য ও লীলা—দুই-ই সমকালে প্রত্যক্ষ করেন; শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, ইঁহাদের 'আমি' যেন এ-দুটির মধ্যবর্তী উঁচু একটি প্রাচীরের মধ্যে খুব বড় একটি ফুটা, যেখানে দাঁড়াইয়া দুইদিকই দেখা যায়, দুদিকে 'যাওয়া-আসা'-ও করা যায়; অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই 'ভাবমুখে' থাকেন। অবতার বা অবতারকল্প পুরুষেরই এখানে থাকা সম্ভব—ভাবাতীত স্বরূপে লীন হইবার পরও মা যাঁহাদের ফিরাইয়া আনিয়া এখানে রাখেন আমাদের কাছে সেখানকার খবর পরিবেশন করিবার জন্য।

আচার্য শঙ্কর শিবাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। হিন্দুমতে বুদ্ধদেব দশাবতারের একজন। তাঁহারা উভয়েই সনাতনধর্মকে গ্লানিমুক্ত করিবার জন্যই যুগোপযোগী প্রচার করিয়াছিলেন, যদিও বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন বেদ মানিবার কোন প্রয়োজন নাই। একথা তাঁহাকে বলিতে হইয়াছিল বোধ হয় এই জন্য যে, তাহা না হইলে বেদের কেবলমাত্র কর্মকাণ্ডে তৎকালে অতি-আবদ্ধ জাতীয় মনকে বেদোক্ত মূল জীবনলক্ষ্যের দিকে—জ্ঞানের বা মুক্তির বা নির্বাণের দিকে ফিরাইয়া আনা সম্ভবই হইত না। এইজন্যই বোধ হয় মনবুদ্ধির অতীত সত্য সম্বন্ধে তিনি নীরব ছিলেন। কারণ মনবুদ্ধির সীমার মধ্যে সে সত্যের কথা বলিতে গেলে সত্যদ্রষ্টাদের প্রত্যক্ষকেই, বেদকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করা ছাড়া অন্য পথ আর নাই। বেদেও সে সত্যকে যে 'সচ্চিদানন্দ' প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমাদের মনবুদ্ধির দর্পণে সে-সত্যের সর্বাধিক প্রকট প্রতিবিম্ব মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, সেখান হইতে 'একশো হাত নামিয়া' আসিয়া তবে কথা বলা সম্ভব। স্বামীজী বলিয়াছেন, অন্য কোন ভাষা নাই বলিয়াই 'প্রত্যক্ষ' শব্দটি ব্যবহার করিতে হয়। আমরা মনবুদ্ধিতে যেটুকু ধরিতে পারি, বুদ্ধদেব শুধু সেটুকুই বলিয়াছেন—অবিদ্যা হইতে আমাদের দেহমনবুদ্ধির সঙ্গে একাত্মতা বোধ, জন্ম ও বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ ঘটে এবং তাহার ফলে তৃষ্ণা বা বাসনার উৎপত্তি হয়, যাহা পুনর্জন্ম ঘটাইয়া চলে। এই অবিদ্যার নাশেই মুক্তি। অবিদ্যা কোথা হইতে আসিল সে বিষয়ে তিনি নীরব; অবিদ্যার নাশে, নির্বাণের পর কি থাকে, সে বিষয়েও নীরব। কি প্রয়োজন এসব লইয়া মাথা ঘামাইবার? শরীর তীরবিদ্ধ হইয়াছে, যন্ত্রণা হইতেছে, তাহার উপশম যাহাতে হয়, সেজন্য সচেষ্ট হও। কে, কিভাবে তীর ছুঁড়িল, ওসব তত্ত্ব লইয়া ভাবিবার প্রয়োজন কি? দেখিতেছি জীবনে দুঃখ আছে, তাহার কারণ আছে; সে দুঃখনিবারণের উপায়ও আছে, কাজেই তাহা করিতেই সচেষ্ট হও।

কিন্তু বুদ্ধদেব ঈশ্বর বা চরম সত্য সম্বন্ধে নীরব থাকিলে কি হইবে? সাধারণ মানুষের একটা অবলম্বন তো চাই, যাহাকে সে মনবুদ্ধির সীমায় আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে। তাই

পরবর্তীকালে বৌদ্ধদের একটি প্রকাণ্ড শাখা—মহাযান-শাখা, বুদ্ধদেবকেই ঈশ্বরের আসনে বসাইয়াছে।

আচার্য শঙ্কর আসিয়াছিলেন যখন বৌদ্ধ-ধর্মের মধ্যে মালিন্য ঢুকিয়াছিল; আসিয়াছিলেন সনাতনধর্মকে পুনরায় মালিন্যমুক্ত করিতে। অদ্বৈত বেদান্তের অতি উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তিনি সনাতন-ধর্মকে সর্বজনসমক্ষে তুলিয়া ধরেন। তবে, সাধারণ মানুষের পক্ষে যে ইহা ধারণা করা এবং সাধনার প্রথম হইতেই এই সর্বোচ্চ লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চলা সম্ভব নয়, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন; তাই অধিকারিভেদে সাকারোপাসনারও অনুমোদন দিয়াছেন।

বিভিন্ন নামের ও আকারের নদী যেমন বিভিন্নমুখী হইয়া প্রবাহিত হইলেও একই সাগর তাহাদের সকলেরই চরম লক্ষ্য, এবং সেখানে পৌঁছিয়া যেমন সব নদীই নিজ নিজ বিভিন্ন নামরূপ হারাইয়া সাগর হইয়া যায়, সনাতনধর্ম বলেন, ভগবানলাভের জন্য সাধনার পথ তেমনি বিভিন্ন জনের পক্ষে বিভিন্ন রূপ হইলেও সবই পরিণামে আমাদের সকলেরই 'আমি'র ধারাকে মিশাইয়া দেয় সেই একই 'পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসঙ্গমে।' উহার নাম আমরা ভগবানলাভ, বা নির্বাণ, বা জ্ঞানলাভ যাহাই দিই না কেন।

সনাতনধর্ম এই চরমলক্ষ্যাভিমুখী সব পথেরই সন্ধান মানুষকে দিয়াছে। যখন লক্ষ্য ভুলিয়া আমাদের জীবনধারা বিপথে প্রবাহিত হয়, ভগবান স্বয়ং আসিয়া উহাকে আবার লক্ষ্যাভি-মুখী করিয়া দেন। বিভিন্ন যুগে জাতীয় জীবনে এই বিপথগামিত্ব বিভিন্নরূপ হয় বলিয়াই বিভিন্ন যুগের অবতারগণের কথাও আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

ভগবান বুদ্ধ ও আচার্য শঙ্কর উভয়েই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন একই প্রয়োজনে—যদিও একজন যুগপ্রয়োজনে বেদ মানিবার প্রয়োজন নাই বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, যেজন্য তাঁহাকে অহিন্দু, নাস্তিক ইত্যাদিও বলা হয়। অথচ তিনি প্রচারের দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন বেদেরই জ্ঞানকাণ্ডকে। আর অপরজন সনাতন-ধর্মের চিরাচরিত প্রথায় বেদকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যলাভের জন্য সাধনার যে পথ তাঁহারা দেখাইয়াছিলেন, তাহা মূলতঃ একই। সে পথ সনাতন ভারতের চিরদিনের পরমতীর্থযাত্রার পথ—ত্যাগ অবলম্বনে চরমসত্যে মন একাগ্র করার পথ।

শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী আদিনাথানন্দ

৮

জীবাত্মা

প্রত্যেক জীব নিজের অস্তিত্ব সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিতেছে। অহং-প্রত্যয় স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁহার সুবিখ্যাত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের 'অধ্যাস' সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "ন তাবদ্ একান্তেন অবিষয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয়-বিষয়ত্বাৎ।" ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু একান্তভাবে অবিষয় নহেন। অহং-প্রত্যয়ের মাধ্যমে তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান হয়। এই জন্যই 'অহং প্রত্যয়ের' স্বরূপ-আলোচনা ভাষ্য-দার্শনিকগণ করিয়াছেন। কারণ ব্রহ্মবস্তুকে পুরাপুরি জানিতে হইলে এই স্বয়ংসিদ্ধ প্রত্যক্ চৈতন্যকে প্রথম চিনিতে হইবে। 'সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার' গ্রন্থে আচার্য শঙ্কর বলিতেছেন—

১। "যঃ স্বপ্রকাশমখিলাত্মকমাসুষুপ্তে-রেকাত্মনাঽহমহমিত্যবভাতি নিত্যম্"—অর্থাৎ যে ব্রহ্মসত্তা স্বপ্রকাশ, অখিলের আত্মা, তিনি অহংরূপে জীবহৃদয়ে নিত্য প্রকাশিত।"

২। এই অহং-প্রত্যয়ই ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ জীবাত্মা বলিয়া পরিচিত। শ্রীরামানুজদর্শনে এই জীবাত্মা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীশঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদিগণের মতে ইহা বলা হয় - জীবাত্মা চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্তারূপে অনুভবসিদ্ধ হইলেও স্বরূপতঃ ইনি ব্রহ্মসত্তার সঙ্গে অবিভক্ত। "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—ইহাই সিদ্ধান্ত। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যের প্রতিপাদন এই আচার্যগণ করিয়াছেন।

৩। সাংখ্যদর্শনে জীবাত্মা নিগু'ণ-স্বরূপ, জ্ঞাতা ও ভোক্তা কিন্তু কর্তা নহে। সব কর্মের কর্তা প্রকৃতি। জীব অবিবেকবশতঃ নিজেকে কর্তা মনে করে। সাক্ষিত্বই তাহার যথার্থ স্বরূপ। এই সাক্ষিত্ববোধ হইলেই প্রকৃতির হাত হইতে মুক্তি বা কৈবল্য লাভ হয়। জীবাত্মা স্বরূপতঃ স্বাধীন, একটি চিরবর্তমান সত্তা। কোন কারণে প্রকৃতি সম্বদ্ধ হইয়া গিয়াছে মাত্র। অদ্বৈতবাদী আচার্যগণ সাংখ্যের নিগু'ণ স্বরূপতা ও সাক্ষিত্ব মানিয়া লইয়াছেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের মতে Vedanta accepted Sankhya epistemology.

৪। শ্রীরামানুজাচার্য উক্ত উভয় মতই স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে (ক) আত্মা চৈতন্যস্বরূপ ও জ্ঞাতা কিন্তু সাংখ্যের মতানুযায়ী স্বাধীন সত্তাযুক্ত নহে। ইহা ব্রহ্মসত্তাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি লাভ করিতেছে। গীতোক্ত মত অনুসরণ করিতেছেন। যথা—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" জীব ব্রহ্মের অংশ।—যেমন, অগ্নি ও তাহার অজস্র স্ফুলিঙ্গ। ব্রহ্মাশ্রিত হইয়া জীব কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতারূপে প্রত্যেক জীবদেহে বর্তমান।[১]

(খ) ব্রহ্ম যেমন স্থূল ও সূক্ষ্ম বিশ্বপ্রপঞ্চের নিয়ন্তা, অন্তর্যামীশক্তি, তেমনি তিনি জীবাত্মারও নিয়ন্তা—এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য, জীবের স্বাতন্ত্র্য ও ব্রহ্মের সর্বনিয়ন্তৃত্ব রক্ষা করিয়া জীবাত্মার স্বরূপের আলোচনা শ্রীরামানুজ-দর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি "জীবো ব্রহ্মৈব

নাপরঃ”—এই মত স্বীকার করেন নাই ; এই মতবাদ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-বিরুদ্ধ।

৫। শ্রীরামানুজমতে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব শ্রুতিসিদ্ধ নহে। কারণ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আছে—“তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।” তিনি জগৎ ও জীব সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। গীতায় বলা হইয়াছে—“ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত”—অর্থাৎ আমি সবক্ষেত্রের জ্ঞাতা হইয়া বিদ্যমান আছি। অন্যান্য বহু শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞাপক বহু উপদেশ রহিয়াছে।

৬। কোন কোন শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—

‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ অথবা ‘এই আত্মাই ব্রহ্ম’। অদ্বৈতবাদিগণ মনে করেন ইহাতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীরামানুজ এই মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। ইহাও যুক্তিসিদ্ধ মনে হয়। নিম্নে উহা প্রদত্ত হইল।

(ক) “নিরস্তনিখিলদোষ-কল্যাণগুণাত্মক-ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশা হি বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্যুঃ।”

“নিখিলদোষ-বিবর্জ্জিত অশেষকল্যাণ-গুণময় ব্রহ্মের সহিত সর্ববিধদোষপূর্ণ জীবের একত্ব-উপদেশ অসঙ্গত হইতেছে বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়।”

(খ) ব্রহ্ম হইতেছেন শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, নিষ্কল ও নির্গুণ। তাঁর সঙ্গে দোষযুক্ত, অল্পজ্ঞ, শোক-ও দুঃখাধীন জীবের একত্ব কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে ? যদি আপনারা (অদ্বৈত-বাদিগণ) বলেন, এই সম্বন্ধ অজ্ঞানজনিত, শ্রীরামানুজ প্রশ্ন করিতেছেন – এই অজ্ঞান কাহার ? এই অবিদ্যা-সম্বন্ধ কবে এবং কি করিয়া হইল ? ব্রহ্মের শুদ্ধত্ব ও নির্বিশেষত্ব স্বীকার করিলে এই ‘অবিদ্যা-সম্বন্ধ’ প্রতিপাদন করা যায় না। অবিদ্যাযুক্ত’ হইলে তাহার নির্বিশেষত্ব থাকে না। সুতরাং সশক্তিক ব্রহ্মবাদ অনস্বীকার্য। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি অভেদ।

(গ) শ্রুতিবাক্য—‘তত্ত্বমসি’ এইভাবে ব্যাখ্যাত হইলে সব দিক বজায় থাকে। তৎ বলিতে বুঝায় ব্রহ্ম – যিনি সর্বকারণ, সত্যসঙ্কল্প, সর্বকল্যাণগুণময়, নিখিলদোষগন্ধ-বিবর্জিত ত্বম্—স্বশরীর জীব।

অর্থাৎ ব্রহ্ম এই জীবাত্মারও আত্মা।

ও ব্রহ্মসমানাধিকরণ ন্যায়ানুসারে বিশেষ্য ও বিশেষণ সম্বন্ধে জড়িত। জীব ব্রহ্মের প্রকার বা বিশেষণ। জীব কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা কিন্তু অল্পজ্ঞ। ব্রহ্ম আনন্দময়। জীব দুঃখ-সুখাভিভূত হয় ; কিন্তু আনন্দময় ব্রহ্মের সত্তায় সত্তাবান। যেমন সমুদ্র ও তার ঢেউ পৃথক বলিয়া অনুভূত হইতেছে। কিন্তু সমুদ্রকে বাদ দিয়া ঢেউ থাকিতে পারে না। তরঙ্গ বহু রকমের, বহুগুণযুক্ত। কিন্তু সমুদ্রকে আশ্রয়

১। রামানুজ জীবাত্মার অস্তিত্বের যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ দিয়াছেন :

(ক) আমাদের জ্ঞানের তিনটি অবস্থা স্বতঃপ্রমাণিত। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা-ত্রয়। এই তিন অবস্থা জীবাত্মার জ্ঞানে একীভূত হইয়াছে। আমরা অনুভব করি—যে-আমি জাগ্রত ছিলাম, তারপর স্বপ্ন দেখিয়া-ছিলাম, আবার স্বপ্নহীন অবস্থায় সুখে নিদ্রিত ছিলাম, সেই আমি এখন জাগ্রত হইয়া জগৎ দেখিতেছি।

(খ) আমাদের শরীর ও মনের পরিবর্তন অহর্নিশ হইতেছে। কিন্তু আমরা অনুভব করিতেছি ‘আমি’ জ্ঞাতারূপে অপরিবর্তনীয় আছি। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য ইত্যাদি পরিবর্তন আসিলেও আমরা জানি ‘আমাদের আসল সত্তা’ এক অবস্থায় আছে।

(গ) স্ত্রী, পুরুষ, শিশু—সকলেই ‘আমি’, ‘আমি’ ব’লে একটি অস্তিত্ব অনুভব করিতেছে।

(ঘ) সকলেই অনুভব করিতেছে—আমার শরীর, আমার মন; ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞাতা আত্মা ও জ্ঞেয় শরীর ও মন পৃথক সত্তাযুক্ত।

করিয়া সব বর্তমান। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে জীবের অজ্ঞান-মুক্তি হয়।

৭। ব্রহ্ম সর্বনিয়ন্তা এবং জীবাত্মার নিয়ন্তা। তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে পাপ পুণ্য কার্যের কর্তা হিসাবে জীবাত্মার দায়িত্ব কিছু আর থাকে না। এই প্রশ্নের জবাবে শ্রীরামানুজাচার্যের মত ব্যক্ত করা হইয়াছে নিম্নোক্তভাবে :—

প্রাত্যহিক কাজে জীবাত্মার ধীশক্তি, ইচ্ছাশক্তি স্বাধীনভাবে কাজ করিতেছে দেখা যায়। শ্রীভগবান বিভিন্নভাবে অবতীর্ণ হইয়া নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম আদর্শ প্রদর্শন করেন এবং উপদেশদানে শ্রেয়োমার্গ ও প্রেয়োমার্গের বিভিন্নতা সর্বসমক্ষে উপস্থিত করেন। জ্ঞানেন্দ্রিয়-এবং কর্মেন্দ্রিয়সম্পন্ন জীব ইহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বুঝিতে সক্ষম। জীব মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে আবার বন্ধনের রাস্তাও ধরিতে পারে। শাস্ত্র মুক্তি-পথের সহায়ক—ইহা ভগবন্নির্দিষ্ট পথ। সকলের সম্মুখে প্রসারিত আছে।

শ্রীভগবান জীবের স্বাতন্ত্র্য দান করিয়া দ্রষ্টা হিসাবে সব দেখিতেছেন। স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার দ্বারা জীব স্বকর্ম-অর্জিত ফল ভোগ করে। ইহাই বিধাতার অমোঘ বিধান। সুতরাং পাপ-পুণ্যের জন্য জীবের দায়িত্ব সবটাই। শ্রীবিষ্ণুর প্রদর্শিত পথে চলিবার সামর্থ্য তিনিই দান করিয়াছেন। সদ্ব্যবহার নিজের হাতে। গীতায় যেমন আছে—

'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ'—অজ্ঞানাবৃত জগৎ ইহার প্রভাবে মোহগ্রস্ত হইতেছে। তবে শ্রীরামানুজ বলিতেছেন, যথার্থ 'প্রপত্তি' লাভ হইলে তিনি তাঁহার শ্রীধামে স্থান দিবেন। (ক্রমশঃ)

যোগবাসিষ্ঠসারঃ

[পূর্বানুবৃত্তি]

[অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ]

৩। তত্ত্বজ্ঞান প্রকরণ

তত্ত্বাত্মবোধ এবৈকঃ সর্বাশাতৃণপাবকঃ।
প্রোক্তঃ সমাধিশব্দেন ন তু তুষ্ণীমবস্থিতিঃ ॥ ১

একমাত্র ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধই সর্ববিষয়ভোগবাসনারূপ তৃণের দাহকারী অগ্নিসদৃশ, তাহাই সমাধি শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে, কেবল নীরব অবস্থানমাত্রই সমাধি নহে।

চিদাকারমিদং সর্বং জগদিত্যেব ভাবয়েৎ।
স্থিত ইত্যুপশান্তস্থঃ স ব্রহ্মকবচঃ সুখী ॥ ২

এই দৃশ্যমান সর্বপ্রপঞ্চ চিদাকার, এই প্রকার ভাবনা করিবে। এইরূপ ভাবনাযুক্ত হইয়া ব্রহ্মেতেই যিনি স্থিতি লাভ করেন, তিনিই সুখী। কারণ তিনি ব্রহ্মরূপকবচধারী।

সর্বাতীতপদালম্বী পূর্ণেন্দুশিশিরাশয়ঃ।
যস্তিষ্ঠতি সদা যোগী স এব পরমেশ্বরঃ ॥ ৩

পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শীতলচিত্ত যে যোগী সর্বদা সর্বাতীত ব্রহ্মপদকে আশ্রয় করিয়াই থাকেন, তিনিই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর।

ব্রহ্মোপনিষদাং তত্ত্বং ভাবয়ন্ যোঽন্তরাত্মনা।
নোদ্বেগী ন চ তুষ্টাত্মা সংসারে নাবসীদতি ॥ ৪

যিনি অন্তরে ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদসমূহের তত্ত্ব চিন্তাকরতঃ সদা উদ্বেগ- ও হর্ষরহিত হইয়া অবস্থান করেন, যিনি কোন সংসারদুঃখেই অভিভূত হইয়া পড়েন না।

যথা পর্বতমাদীপ্তং নাশ্রয়ন্তি মৃগদ্বিজাঃ।
তদ্বদ্ ব্রহ্মবিদং দোষা নাশ্রয়ন্তি কদাচন ॥ ৫

পশুপক্ষিসমূহ যেরূপ অগ্নিদহ্যমান পর্বতকে আশ্রয় করে না, ব্রহ্মবিদ্‌কেও সেরূপ কামাদি-দোষ স্পর্শও করে না।

অসন্ত ইব সন্তোঽপি কোপয়ন্তি পরং নরম্।
নিজং কর্মগুণোদারং পরিপাকং পরীক্ষিতুম ॥ ৬

ফলীভূত নিজের কর্ম ও উদারগুণসমূহ পরীক্ষা করিবার জন্য বিদ্বানগণ সাধারণ অজ্ঞ পুরুষের ন্যায় অপরকে (নিজের প্রতি) ক্রোধাবিষ্ট করাইয়া থাকে।

জ্ঞাত্বাপ্যসর্পং সর্পোত্থং যথাকম্পং ন মুঞ্চতি।
বিধ্বস্তাঽখিলমোহোঽপি মোহকার্যং তথাত্মনি ॥ ৭

যেরূপ রজ্জুসর্পভ্রান্তির অনন্তর রজ্জুজ্ঞানোদয়ে ইহা (ভ্রান্তি সর্প) যথার্থ সর্প নহে, এইরূপ জ্ঞান হইলেও পূর্বের সর্পদর্শনজনিত ভয়কম্পাদি সহসা তৎকালেই নিবৃত্ত হয় না (ধীরে ধীরে হয়), তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সম্পূর্ণ অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেও ঐ (বাধিত) অজ্ঞানের কার্য কামাদি সহসা নিবৃত্ত হয় না। (প্রারব্ধভোগপ্রদানার্থই উহাদের স্থিতি এবং ভোগাবসানেই উহাদের চিরনিবৃত্তি হইয়া থাকে)।

স্ফটিকঃ প্রতিবিম্বেন যথা নায়াতি রঞ্জনম্।
তজ্‌জ্ঞঃ কর্মফলেনান্তস্তথা নায়াতি রঞ্জনম্॥ ৮

নির্মল স্বচ্ছ স্ফটিক যেরূপ কোন বর্ণের প্রতিবিম্ব দ্বারা বস্তুতঃ রঞ্জিত হয় না, তত্ত্ববেত্তাও তদ্রূপ কর্মফলেপ দ্বারা অন্তরে লিপ্ত হন না।

অন্তর্মুখতয়া তিষ্ঠন্ বহির্বৃত্তিপরোঽপি সন্।
পরিশ্রান্ততয়া নিত্যং নিদ্রালুরিব লক্ষ্যতে॥ ৯

বহিরিন্দ্রসহায়ে বিষয়ানুভব করিলেও জ্ঞানী সদা অন্তর্মুখ আত্মনিষ্ঠ থাকেন বলিয়া নিদ্রালু পুরুষের ন্যায় পরিদৃষ্ট হন। কারণ তিনি সংসারতাপ হইতে শ্রান্ত অর্থাৎ নিবৃত্ত।

অদ্বৈতে স্থৈর্যমায়াতে দ্বৈতে চ প্রশমং গতে।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি পশ্যন্তঃ স্বপ্নবজ্জগৎ॥ ১০

অদ্বৈততত্ত্বে বুদ্ধি দৃঢ়রূপে স্থিরতা প্রাপ্ত হওয়ায় এবং দ্বৈতবিষয়ে সত্যত্ববুদ্ধি নিঃশেষে বিলীন হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ জগৎকে স্বপ্নবৎ জানিয়া সর্ব কর্ম করেন।

অদ্যৈব মরণং বাস্তু কল্পান্তনিচয়েন বা।
তজ্‌জ্ঞঃ কলঙ্কং নাপ্নোতি হেম পংকগতং যথা॥ ১১

অদ্যই মৃত্যু হউক বা বহুকল্পান্ত পর্যন্তই শরীর থাকুক, পঙ্কনিমগ্ন সুবর্ণের ন্যায় বিদ্বান্ কোন কলুষতাই প্রাপ্ত হন না।

তনুং ত্যজতু বা কাশ্যাং শ্বপচস্য গৃহেঽথবা।
জ্ঞানসম্প্রাপ্তিসময়ে মুক্তোঽসৌ বিগতাশয়ঃ॥ ১২

জ্ঞানী পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে বা চণ্ডালগৃহে যেখানেই দেহত্যাগ করুন না কেন, জ্ঞানোৎপত্তিকালেই তিনি লিঙ্গদেহরহিত হইয়া মুক্ত হইয়া থাকেন।

গোঃপদং পৃথিবী মেরুঃ স্থাণুরাকাশমুদ্রিকা।
তৃণং ত্রিভুবনং রাম নৈরাশ্যালংকৃতাকৃতেঃ॥ ১৩

বসিষ্ঠ বলিতেছেন—'হে রাম, বিষয়তৃষ্ণারহিত পুরুষের নিকট বিশাল পৃথিবী গোষ্পদচিহ্নিত ক্ষুদ্রস্থানতুল্য, অত্যুচ্চ মেরুপর্বত একটি তুচ্ছ স্তম্ভের ন্যায়, মহান আকাশ অঙ্গুরীয়কমধ্যস্থ ছিদ্রবৎ এবং ত্রিভুবন তৃণপ্রায় (তুচ্ছ) প্রতিভাত হয়।'

অন্তঃশূন্যো বহিঃশূন্যঃ শূন্যকুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে॥ ১৪

আকাশমধ্যস্থ শূন্যকুম্ভের ন্যায় (বিষয়বাসনার অভাববশতঃ) বিদ্বান্ অন্তরে ও বাহিরে শূন্য ; পুনঃ সাগরমধ্যস্থ পূর্ণকুম্ভের ন্যায় তিনি অন্তরে ও বাহিরে সদা পরিপূর্ণ। কারণ ব্যাপক আত্মা সহ অভিন্ন হইয়া তিনি সর্বত্র পরিপূর্ণরূপে অবস্থান করেন।

ঈপ্সিতানীপ্সিতৌ ন স্তো যস্যান্তর্বস্তুদৃষ্টিষু।
সুপ্ত ইব প্রবর্তেত স মুক্ত ইতি কথ্যতে ॥ ১৫

পদার্থদর্শনে যাঁহার অন্তরে ইহা উপাদেয়, ইহা ত্যাজ্য, এইরূপ চিন্তার উদয় হয় না, এবং যিনি সুপ্ত পুরুষের ন্যায় (কর্তৃত্বাভিমানরহিত হইয়া) কর্মে প্রবৃত্ত হন, তিনিই মুক্ত বলিয়া কথিত হন। (অভিপ্রায় এই যে সুপ্ত পুরুষের যেমন কোন অভিলাষ বা অনভিলাষ কিছুই থাকে না, সেই প্রকার ব্যবহারকালেও যাঁহার প্রিয় অপ্রিয় বোধ নাই, তিনিই মুক্ত।)

নিগ্রস্থিঃ শান্তসন্দেহো জীবন্মুক্তঃ স্বভাবতঃ।
অনির্বাণোঽপি নির্বাণশ্চিত্রদীপঃ ইব স্থিতঃ ॥ ১৬

জীবন্মুক্ত পুরুষ নিরহঙ্কার, সংশয়রহিত, বাহিরে নির্বাণ (অর্থাৎ নিবৃত্ত বা বিশ্রান্তের ন্যায়) দৃষ্ট হইলেও অন্তরে স্বাভাবিক জ্ঞানালোকে সদা ভাসমান হইয়া চিত্রস্থ দীপের ন্যায় প্রশান্ত, নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন।

অহংকারময়ীং ত্যক্ত্বা বাসনাং লীলয়ৈব যঃ।
তিষ্ঠতি ধ্যেয়সংত্যাগী জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ১৭

বিষয়চিন্তারহিত হইয়া যিনি অনায়াসে অহংকারোৎপন্ন বাসনাসমূহ ত্যাগপূর্বক নিশ্চিন্ত অবস্থান করেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা হইয়া থাকে।

দূরে মুঞ্চতি বন্ধুমন্ধমিব যঃ সঙ্গাদ্ ভুজঙ্গাদিব,
ত্রাসং যো বিদধাতি বেত্তি সদৃশং ভোগং চ রোগং চ যঃ।
স্ত্রৈণে যস্তৃণবৎ ঘৃণাং প্রকুরুতে মিত্রেষ্বমিত্রেষ্বপি,
স্বান্তং যস্য সমং স মঙ্গলমিহামুত্রাপি মর্ত্যোঽশ্নুতে ॥ ১৮

যিনি অন্ধের ন্যায় বন্ধুসঙ্গ ত্যাগ করেন, যিনি সর্পের ন্যায় জনসঙ্গভীত, ভোগ ও রোগকে যিনি তুল্য মনে করেন, স্ত্রীসমূহকে যিনি নিন্দিত তৃণের ন্যায় ঘৃণাদৃষ্টিতে দর্শন করেন, শত্রু ও মিত্রে যাঁহার চিত্ত সমভাবাপন্ন, সেই পুরুষধুরন্ধর ইহলোকে বা পরলোকে সর্বত্রই মোক্ষভাগী হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনি সদা মুক্ত।

হৃদয়াৎ সংপরিত্যজ্য সর্বং দৃশ্যং প্রশান্তধীঃ।
ব্যোমসৌম্যতরোঽব্যগ্রঃ স মুক্তঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৯

যে প্রশান্তচিত্ত পুরুষ হৃদয় হইতে সর্বদৃশ্যের সত্যত্বভাবনা নিঃশেষে পরিত্যাগপূর্বক আকাশের ন্যায় নির্মল ও অনাসক্ত হইয়া অবস্থান করেন তিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বরতুল্য ও জীবন্মুক্ত।

সমাধিমথ কর্মাণি মা করোতু করোতু বা।
হৃদয়েনাত্তসর্বাশো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ ॥ ২০

বিষয়তৃষ্ণাবিরহিতচিত্ত, মহামনা, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কোন কর্ম বা সমাধি আদি অনুষ্ঠান করুন বা নাই করুন, তিনি সর্বথা মুক্ত।

অনাত্মন্যাত্মধীর্বন্ধ স্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে।
বন্ধমোক্ষৌ ন বিদ্যেতে নিত্যমুক্তস্য চাত্মনঃ॥ ২১

দেহাদি অনাত্মপদার্থে আত্মবুদ্ধি হওয়াই বন্ধ এবং ঐ আত্মবুদ্ধিনাশই মোক্ষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নিত্যমুক্ত আত্মার বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই, কারণ আত্মা অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নিত্যমুক্ত।

দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যবর্জনম্*।
সংপন্নং চেত্তদুৎপন্না পরা নির্বাণনির্বৃতিঃ॥ ২২

দৃশ্যপ্রপঞ্চ বস্তুতঃ নাই (উহা একটা মিথ্যা প্রতীতি বা প্রতিভাসমাত্র)—এই বোধে যখন মন হইতে দৃশ্যের সত্তাবোধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়, তখনই পরম মোক্ষসুখের আবির্ভাব হয়।

ন মোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে পাতালে ন চ ভূতলে।
সর্বাশাসংক্ষয়ে চেতঃক্ষয়ো মোক্ষো ইতীষ্যতে॥ ২৩

মোক্ষ (-রূপী আত্মা) আকাশপৃষ্ঠে, পাতালে বা পৃথিবীতলে (কোন দূরবর্তী দেশে) স্থিত নহে। (তৃষ্ণাই চিত্তবিক্ষেপের হেতু ও দুঃখের কারণ, অতএব) বিষয়তৃষ্ণানিবৃত্তি সহায়ে চিত্তের যে শান্তি বা বিলয় তাহাই মোক্ষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অনন্তে চিদ্ঘনানন্দে নির্বিকল্পৈকরূপিণি।
স্থিতে দ্বিতীয়স্যাভাবাৎ কো বন্ধো মোক্ষ এব বা॥ ২৪

অনন্ত, চিদানন্দস্বরূপ, সদা একরূপ ও সর্ববিকল্পরহিত ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, ইহা সত্য; তাহা হইলে বন্ধই বা কি, মোক্ষই বা কি? অর্থাৎ যখন দ্বিতীয় বস্তুই নাই, তখন অবস্থা বা অবস্থান, গতি বা গন্তব্য, কিছুই নাই।

মন এবোল্লসন্ মাত্রং বন্ধতামগমদ্ যতঃ।
মনঃ-প্রশমনাৎ রাম মোক্ষ এবাবশিষ্যতে॥ ২৫

ইতি শ্রীযোগবাসিষ্ঠসারবিবরণে তৃতীয়ং প্রকরণম্।

বসিষ্ঠ বলিতেছেন—'হে রাম, মন ক্রীড়াপরায়ণ বা চঞ্চল হইলেই বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব সেই মনের প্রশমন বা বিলয় ঘটিলে এক মোক্ষ বা চিদাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন।'

যোগবাসিষ্ঠসার গ্রন্থের তত্ত্বজ্ঞান-নামক তৃতীয় প্রকরণ সমাপ্ত। [ক্রমশঃ]

* দৃশ্যমার্জনমিতি বা পাঠঃ

'রত্নাকর নয় শূন্য কখন'

অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা যেমন মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে খাদ্য ও বাসস্থানের দিক্ থেকে, তেমনি আধুনিক বিজ্ঞানী মনকে প্রবৃত্ত করিয়েছে নতুন উৎসের সন্ধানে। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বর্ষ (International Geo-Physical Year, 1964) থেকে সমুদ্রবিদ্যাকে (Oceanography) তাই সাধারণের গোচরে আনবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন দেশে। এই তো কিছুদিন আগে (সেপ্টেম্বর, ১৯৭০) জাপানের টোকিয়োতে ৪০০ বিজ্ঞানীর (বিভিন্ন দেশের সমুদ্রবিৎ) এক সম্মেলন হয়ে গেল। যতদিন যাবে, রত্নাকরের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বাড়বে অনিবার্যভাবে। এ শুধু বিজ্ঞানীর কৌতূহল নয়—পৃথিবীজোড়া মানুষের নিছক বাঁচার তাগিদ। এখন দেখা যাক্, রত্নাকর কিসে পূর্ণ, আর আমাদের কি কাজেই বা তা আসতে পারে।

মহাসমুদ্রের বিশাল সম্ভাবনাময় সম্পদকে এতাবৎ আমরা খুব কমই কাজে লাগাতে পেরেছি। তবে সাম্প্রতিক কালে সামুদ্রিক গবেষণার অগ্রগতি এ সম্ভাবনাকে অনেক কাছে এনে দিয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ষষ্ঠ মহাদেশকে (Sixth Continent) মানব-প্রয়োজনে অনেকাংশে নিয়োজিত করা যাবে, এ সম্ভাবনাও ক্রমেই উজ্জ্বলতর হচ্ছে। খাদ্যের জন্য সমুদ্রের উপরিভাগে আঁচড় কাটা হয়েছে মাত্র এতদিন। ইলেক্‌ট্রনিক ও অন্যান্য সাহায্য নেওয়া সত্ত্বেও মৎস্যশিকারের ধরন-ধারন বড় পালটায়নি। সামুদ্রিক খাদ্যবৃত্তের (Marine food cycle) গবেষণা যত এগোচ্ছে, ততই বেশী মাছ ধরার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, এমনকি বেশ কিছু নতুন মৎস্য-শিকারকেন্দ্র গড়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। বর্তমানে অগভীর সমুদ্রে বহুলভাবে মৎস্যপালন সম্ভব। তাছাড়া, খাদ্য ও ওষুধ হিসেবে সামুদ্রিক উদ্ভিদের ব্যবহারও বাড়বে ক্রমে। গভীর সমুদ্রের তলদেশে যে বিপুল খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, নতুন যন্ত্রপাতির সাহায্যে তা' উত্তোলন করা সম্ভব হবে। এমনকি, মহাদেশ-অলিন্দ বা মহীসোপানে (Continental Shelf) জলের তলায় কিছু মনুষ্য-আবাস গড়ে তোলাও সম্ভব।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও শিল্পায়নের জন্য পৃথিবীতে সুপেয় জল ও শক্তির চাহিদা বেড়েই চলেছে। এর জন্য মহাসমুদ্রের জলকে কাজে লাগানো ছাড়া গতি নেই। এর জন্য অত্যাবশ্যক হ'ল সমুদ্রের জলের বি-লবণায়ন (De-salination)। বি-লবণ কারখানা (Desalination Plants) বর্তমানে যা আছে তাতে ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও মিটবে না, অধিক সংখ্যায় খুলতে হবে ভবিষ্যতে। সমুদ্র-তরঙ্গ থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি-উৎপাদনের কারখানাও (Tidal Power Station) দুই একটি দেশে স্থাপিত হয়েছে। মহাসমুদ্রকে সব সময়েই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে; কারণ আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে উপকূলরেখার কয়েক মাইল পরেই (territorial waters) সমুদ্র কোন দেশের একার নয়, সব দেশের। তাই আন্তর্জাতিক

সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের নতুন সোপান হিসেবে সমুদ্রবিদ্যা ও তার প্রয়োগকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

সমুদ্রে অজস্র খাদ্যসম্পদ বিদ্যমান—প্রয়োজনীয় চাষ ও আহরণ-ব্যবস্থা করতে পারলে একমাত্র আটলান্টিক মহাসাগর থেকেই ২০,০০০ প্রকারের খাদ্য পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কোটি কোটি টন খনিজও এ উৎস থেকে পাওয়া সম্ভব। বৈদ্যুতিক শক্তির বিশাল আধার লুকিয়ে আছে সমুদ্র-সলিলের—ডিউটেরিয়াম্ (Deuterium) নামে দুর্লভ একপ্রকার হাইড্রোজেন এই জলে আছে। এই ডিউটেরিয়াম্‌কে জ্বালানিতে রূপান্তরিত করতে পারলে শক্তির স্বল্পমূল্যে সরবরাহ সম্ভব হতে পারে। দর্জির আঙ্গুলে যে ধাতু-টুপি (ছুঁচ যাতে না বেঁধে) পরানো থাকে তার একটিতে যতটুকু সমুদ্রজল ধরে তার থেকে ১ হন্দর কয়লার সমান শক্তি উৎপন্ন হতে পারে।

সারা বছর ধরেই উত্তর সাগরে (North Sea) কিছু জাহাজ সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণী সংগ্রহ করে বেড়ায়। বিশেষ করে জলের ওপর ভেসে বেড়ানো প্ল্যাংকটন (Plankton) সংগ্রহ করে এডিনবরার Oceanographic Laboratoryতে জমা দেওয়া এদের কাজ। পৃথিবীতে যা' কিছু জ্যান্ত (তা স্থলজই বা জলজই হউক) তার শক্তির যোগান আসে সূর্যরশ্মি থেকে। প্ল্যাংকটন উদ্ভিদও হতে পারে (তখন তার নাম ফাইটো-প্ল্যাংকটন), আবার প্রাণীও হতে পারে (তখন তার নাম জু-প্ল্যাংকটন)। সূর্যকিরণ সমুদ্রের জলের নীচে বেশীদূর পর্যন্ত যেতে পারে না, সুতরাং ফাইটো প্ল্যাংকটনদের জলের নীচে ৩০।৪০ ফুটের মধ্যে থাকতে হয়। জু-প্ল্যাংকটনদের খাদ্য ফাইটো-প্ল্যাংকটনদের থেকেই আসে; কিন্তু তারা প্রত্যক্ষভাবে সূর্যকিরণের ওপর নির্ভর করে না বলে তারা আরো খানিকটা নীচে পর্যন্ত যেতে পারে, খাদ্যের জন্য অবশ্য তাদের ওপরে আসতেই হয়। সামুদ্রিক মৎস্যের আহার্য এরাই। সুতরাং এদের প্রাচুর্য যেখানে দেখা যায়, যেমন উত্তর সাগরের Dogger's Bank অথবা নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের Grand Bank অথবা পেরুর উপকূল, সেখানে সামুদ্রিক মৎস্যেরও প্রাচুর্য। জাপানীরা প্রশান্ত মহাসাগরে নতুন মৎস্যকেন্দ্র খুঁজে পেয়েছে; আটলান্টিকেও ক্যানাডিয়ান ও আমেরিকান সন্ধান ক্রমশঃ জোরদার হচ্ছে। সামুদ্রিক আহার্য হিসেবে মাছ যতদিন একক স্থান দখল করে থাকবে, ততদিন নতুন নতুন সামুদ্রিক মৎস্য-আবাস-আবিষ্কারও যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন উন্নততর মৎস্যশিকার-কৌশল।

ফাইটোপ্ল্যাংকটন, জুপ্ল্যাংকটন ও মৎস্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রাচুর্যের সন্ধান এখনো সমুদ্রজীববিদ্‌দের (Marine Biologists) পুরোপুরি আয়ত্তে আসেনি। মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা জলের তাপ, লবণাক্ততা এবং প্ল্যাংকটনের সঙ্গে মৎস্যের সহাবস্থানের সঠিক সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পেরেছেন, যেমন, জাপান ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 'তুনা' (Tuna) মৎস্যকেন্দ্রগুলিতে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে এখনো তা' সম্ভব হয়নি। মধ্য সমুদ্রে (high seas) কিছু কিছু মাছ হাল আমলে ধরা হচ্ছে ঠিকই; কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই তা এখনো উপকূলসন্নিহিত অগভীর অংশে সীমাবদ্ধ। সামুদ্রিক মাছ যা' ধরা পড়ছে তাদের প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করা যায়:—১। গভীর-বাসী বা গহনচারী

(Demersal or bottom-living), যেমন, কড্ (Cod), হ্যাডক্ (Haddock), প্লেইস্ (Plaice) ইত্যাদি—প্রতিবছর একমাত্র উত্তর সাগরেই ৩০ লক্ষ টনেরও অধিক কড্ মাছ ধরা পড়ে—তরুণ অবস্থায় প্ল্যাংকটন খাওয়ার জন্য এরাও অধিকাংশ সময়েই জলের উপরিভাগে বিচরণ করে ; ২। অগভীর-বাসী বা উর্ধ্ববিহারী (Pelagic or surface-living), যেমন, হেরিং (Herring), ম্যাকারেল (Mackerel), ইত্যাদি—এরা জলের উপরিভাগেই সর্বদা থাকে। এরা ছাড়াও অজস্র রকমারি মাছ সমুদ্রে আছে—কালে তাদেরও ধরবার ব্যবস্থা হয়ত হবে। মৎস্য-শিকারের নতুন কৌশল এবং ধৃতমৎস্য-সংরক্ষণের নতুন নতুন উপায় আবিষ্কৃত হচ্ছে—freezer trawlers প্রভৃতির প্রয়োগ ক্রমেই বাড়ছে।

স্থলভাগে যেমন সার ব্যবহার করে কৃষির ফলন বাড়ানো হয়ে থাকে, সমুদ্রের জলেও অনুরূপভাবে মাছের খাদ্যের ফলন বাড়ানোর চেষ্টা করা যেতে পারে—ফস্ফেট ও নাইট্রেট ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে দুটি প্রধান বাধা আছে—একটি হ'ল ঢেউ, যাতে এই সার অন্যত্র বাহিত হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে ; আর একটি হল সমুদ্রের জলে বিস্তর ক্ষতিকর শামুক, কাঁকড়া ইত্যাদির উপস্থিতি—এরা মনুষ্যখাদ্য হিসেবে নিকৃষ্ট, কিন্তু নিজেরা খায় বেশী, মৎস্য-খাদ্য প্রচুর পরিমাণে আত্মসাৎ করে। একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ সমুদ্রজীববিৎ স্যার এ্যালিস্টার হার্ডি প্রস্তাব করেছেন, সুবিশাল সমুদ্রতলমন্থনকারী ট্রাক্টর দিয়ে এসব উৎপাতকে নির্মূল করতে হবে। অবশ্য এ মন্থন একবার করলেই হবে না, বারে বারেই করতে হবে কিছুদিন অন্তর অন্তর। কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহারের কথাও কেউ কেউ বলেছেন ; কিন্তু তাতে বিপদ অনেক বেশী, কারণ মাছ, প্ল্যাংকটন ইত্যাদিও মারা পড়তে পারে ; দ্বিতীয়তঃ, তাতে বিভিন্ন দেশের আপত্তির সম্ভাবনাও আছে।

আইল অব্ ম্যান্-এর পোর্ট এরিনে প্লেইস্ মাছের চাষ হচ্ছে। এর জন্য ওখানকার ল্যাবরেটরীর সন্নিহিত দুটো অগভীর দীঘি সমুদ্রজলে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই সেখানে বছরে ১০ লক্ষ প্লেইস্ মাছের লালনের ব্যবস্থা হয়েছে। একটু বড় হলেই তাদের উত্তর সাগরের ডগার ব্যাংকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, যাতে তারা অনেক দ্রুত ও অনেক বেশী বড় হতে পারে। ভবিষ্যতে অনুরূপ আরো সামুদ্রিক মৎস্য লালনকেন্দ্র গড়ে উঠবে নিশ্চয়। এভাবে মৎস্য-ফার্ম (Fish farms) তৈরী হলে মাছের যোগান অনেকাংশে বাড়বে। এর জন্য সামুদ্রিক হ্রদ (Lochs) ও বে-সমূহকে (Bays) কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু সাগরের চাষীকেও তার ফলনের সঠিক পরিমাণ জানতে হলে ও ঘরে তুলতে হলে স্থলের চাষীর মতই তার ফার্মের যত কাছাকাছি সম্ভব থাকতে হবে—হয়ত সমুদ্রতরঙ্গের নিম্নে তাকে প্রায়ই বিহার করতে হবে, শেষে হয়ত-বা সমুদ্রতল-আবাসেই তাকে বেশীরভাগ জীবন যাপন করতে হবে।

১৯৬২ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে Bay of Pomegues-এ দুজন ডুবুরিকে এক সপ্তাহের জন্য জলের তলায় ৪৩ ফুট নীচে নোঙ্গর করা এক বিশালায়তন লৌহ-নির্মিত চোঙের মধ্যে রাখা হয়। এই চোঙটির নাম Diogene—৩৪ টন ওজন, ভেতরটা ফাঁপা এবং ডুবুরিদের থাকা-খাওয়া-

শোওয়া-বসার জন্য একটি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট। এই পরীক্ষায় দেখা যায় ডুবুরি দুজন (ফালকো ও ওয়েসলি) স্বচ্ছন্দেই ওখানে বাস করছে; মাঝে মাঝে চোঙের থেকে বেড়িয়ে গিয়ে সমুদ্রবিহারও করছে এবং তাদেরই বসানো উজ্জ্বল-আলোসমন্বিত 'Sea-cucumber avenue'তে চলে বেড়াবার সময় আলোকাকৃষ্ট মৎস্যকুলের সঙ্গে ক্রীড়াকৌতুকও চলছে। ব্যাপারটা যত সোজাভাবে বলা হ'ল কাজে কিন্তু ততটা সোজা হয়নি। অতটা নীচে জলের চাপ সহ্য করার মত ডুবুরির পোশাক, যথেষ্ট অক্সিজেনযুক্ত মুক্ত বায়ু ও অন্যান্য বহু সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয়েছিল। ইদানীং আমেরিকান ও জাপানী বিজ্ঞানীরা আরো বেশীসংখ্যক ডুবুরি, আরো গভীর জলে দীর্ঘতর সময়ের জন্য বসবাস প্রভৃতির পরীক্ষা চালাচ্ছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আবিষ্কৃত 'একোয়ালাঙ্গ' (Aqualung) এখন ডুবুরিরা (Frogmen বা Divers) কাজে লাগাচ্ছে। যতক্ষণ ডুবুরিরা জলের নীচে থাকবে, ততক্ষণ ওপর থেকে নলের সাহায্যে অক্সিজেন যোগান দেবার প্রয়োজনীয়তা এখন আর নেই। 'একোয়ালাঙ্গ' নামক স্বয়ম্ভর যন্ত্রটি ডুবুরির পিঠের দিকে পোশাকের ওপরে বসানো থাকে, তার থেকে নল এসে যুক্ত থাকে ডুবুরির পোশাকের নাকের সঙ্গে। যন্ত্রটিতে ভাল্‌ভ্ বসানো আছে, যাতে করে জলের চাপ অনুযায়ী ওর অভ্যন্তরের বায়ুস্রোতের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ডুবুরির বিন্দুমাত্র শ্বাসকষ্ট না হয়। অবশ্য জলের নীচে ৩০০ ফুট বা তারও নীচে গেলে জলের চাপের যে সব সমস্যা দেখা দেয় তার সমাধান এখনো পুরোপুরি হয়নি। তবে হ্যানস্ কেলার (Hannes Keller) নামে একজন সুইস ডুবুরি সমুদ্রের ১০০ ফুট নীচে গিয়েও জ্যান্ত ফিরে এসেছেন—জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী অধ্যাপক আলবার্ট বুলমান-এর 'Breathing mixtures'-এর দৌলতে। জলের ওপরে ওঠার সময়ে ডুবুরিকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, নতুবা প্রাণান্ত পর্যন্ত হতে পারে। জলের চাপের বৈষম্যের সঙ্গে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বর্তমানে Decompression table, Pressure chamber প্রভৃতি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু একটা সমস্যা এখনো সমাধানবিহীন হয়েই আছে—তা' হল চাপমুক্ত হবার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। যদি একজন ডুবুরি মাত্র ৫ মিনিট ধরে ৬০০ ফুট জলের তলায় কাজ করে, তবে তাকে চাপমুক্ত করে নিরাপদে জলের ওপরে আনা যেতে পারে ৬ ঘণ্টা ব্যবধানে।

ফরাসীরাই জলনিম্নে বসবাসের ক্ষেত্রে (underwater living) দুঃসাহসিক অগ্রণী। লোহিত সমুদ্রে ৫০ ফুট জলের নীচে ৫ জন ফরাসী ডুবুরি বিজ্ঞানী Coursteau-র তত্ত্বাবধানে ১ মাস বাস করে—রুটিন মাফিক কাজকর্ম ও বিশ্রাম স্বচ্ছন্দেই সম্পাদিত হয়। তাদের দেখাদেখি ১৯৬৪ সালে আমেরিকান নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন জর্জ বণ্ডের পরিচালনায় ৪ জন আমেরিকান একোয়ানট (Aquanaut) ১০ দিন একনাগারে ২০০ ফুট জলের তলায় বাস করে (বারমুডার দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩০ মাইল দূর সমুদ্রে) এবং বায়ুর বদলে হিলিয়াম ও অক্সিজেনের এক মিশ্রণ শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য ব্যবহার করে। ৪০ ফুট লম্বা Sealab I নামক এক চোঙের মধ্যে তারা বাস করেছিল। এর পরে ১৯৬৫ সালে বিখ্যাত এস্ট্রোনট স্কট্ কার্পেন্টারের পরিচালনায় আমেরিকানরা Sealab II-র পরীক্ষা চালায়। এসব পরীক্ষা-

নিরীক্ষার ফলে এখন জলের তলায়, বিশেষ করে মহীসোপানে, গৃহনির্মাণ করে বেশ কিছু মানুষ বসবাস করতে পারবে এ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ফরাসী বিজ্ঞানী Commandant Courstean-র 'ষষ্ঠ মহাদেশ' এখন আর শুধু স্বপ্ন নয়, তা' বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে। পাঁচটি মহাদেশের চারপ্রান্তে এই মহাদেশ-অলিন্দ বা মহীসোপান ধীরে ধীরে ৬০০ ফুট পর্যন্ত নীচে নেমে গেছে, তারপর গভীর সমুদ্র যার তলদেশ হাজার হাজার ফুট নীচে।

জলের ওপর থেকে কাজ করেই জেলেরা ১৯৬০ সালে একমাত্র উত্তর সাগর থেকেই ১৫ লক্ষ টন মাছ ধরেছিল। জলের নীচে মানুষ স্থায়ী আস্তানা গড়ে তুলতে পারলে আরো মাছ ও সামুদ্রিক খাদ্য-আহরণের বেশী সম্ভাবনা। মানুষ এখনো বস্তুত: স্থলচর—সমুদ্রের তলায় সাময়িক বসবাস করতে পারছে এইমাত্র। Courstean'র কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস, এককালে পুরোপুরি সামুদ্রিক মানুষ বা Homo Aquaticusও সম্ভব হবে। জুল বার্ণের (Jules Verne) "20,000 Leagues Under the Sea"-র কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। এর জন্য অবশ্য নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি ও জলনিমগ্নযান (Submersibles)-এর প্রয়োজন ক্রমেই বাড়বে।

সমুদ্রতলে খনিজ তেলের অনুসন্ধান ক্রমশঃ বাড়ানো হচ্ছে। এর জন্য Shell Co. প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন। 'Mobot' নামে একরকম যন্ত্র তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। এর সাহায্যে তাঁরা বিনা ডুবুরিতে অগভীর সমুদ্রে তো বটেই, গভীর সমুদ্রেও তৈলসন্ধান চালাতে পারছেন। রত্নাকর থেকে কৃষ্ণ স্বর্ণ (Black Gold) সংগ্রহ করার সম্ভাবনা তাই পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। ভারী ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির প্রয়োগ এ-ব্যাপারে যে বাড়বে তা' প্রায় স্বতঃসিদ্ধের কোঠায় পড়ে এখন। এযাবৎ যা' কিছু খনিজপদার্থ সমুদ্র থেকে পাওয়া গেছে তা' সবই অগভীর মহীসোপান থেকে; কিন্তু সামুদ্রিক খনিজ পদার্থের চৌদ্দ আনাই নিহিত আছে গভীর সমুদ্রতলে। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামুদ্রিক গবেষণাকেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী একমাত্র প্রশান্ত মহাসাগরেই ১৫০,০০০ কোটি টন খনিজ পদার্থ আছে। উল্কাপিণ্ড-পতন এবং নদীবাহিত ধাতবপদার্থের অবদানে প্রতি বছর এর সঙ্গে আবার যোগ হচ্ছে আরো ১,০০০ কোটি টন। এই ধাতুগুলির মধ্যে প্রধান হ'ল লোহা ও ম্যাঙ্গানীজ; কোবল্ট, নিকেল, সীসা, মলিবৃডিনাম্ প্রভৃতিও কিছু আছে। ডাঃ জে. এল. মেরোর মতে টেলিভিসন ক্যামেরার সাহায্যে এদের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করে বিশালায়তন হাইড্রলিক্ ড্রেজার সমুদ্রতলে নামিয়ে দিয়ে তার সাহায্যে এই ধাতুপিণ্ডগুলিকে (nodules) উত্তোলন করা যেতে পারে। ১৩,০০০ ফুট জলের নীচ থেকে প্রতিদিন এভাবে ১,০০০ টন ম্যাঙ্গানীজ পিণ্ড (nodules) তোলা যেতে পারে বলে তাঁর ধারণা। তিনি এও মনে করেন, এতে বর্তমানের তুলনায় সস্তায় ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যাবে। গভীর সমুদ্রে Home Aquaticus-এর বিচরণের সম্ভাবনা এখনো ঠিক দেখা দেয়নি—সেখানে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ও তার কলা-কৌশল-প্রয়োগের ক্ষেত্র ক্রমেই প্রসারিত হবে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, মানুষ গভীর সমুদ্রতলে যেতে পারেনি বা পারবে না। বাস্তবিকপক্ষে Frieste নামে একটি Bathyscaphe জলযানে করে ১৯৬০

সালের ২৩শে জানুআরি জেক্‌স্ পিকার্ড ও ডন ওয়াল্‌শ্ নামক দুজন দুঃসাহসিক নাবিক প্রশান্ত মহাসাগরের Marianas Trench-এ ৩৫,৮০০ ফুট (প্রায় সাত মাইল) নীচে নেবেছিলেন। অবশ্য ঐ জলযানের মধ্যেই তারা ছিলেন, বাইরে বেরোবার চেষ্টা করেন নি। 'Bathyscaphe'-এর আবিষ্কর্তা জেক্‌স্-এর পিতা অধ্যাপক আগস্ত পিকার্ড। ফরাসী বিজ্ঞানীরা Bathyscaphe নিয়ে আরো পরীক্ষা চালিয়েছেন বা চালাচ্ছেন। ১৯৬৪ সালে Archimede নামে আর একটি জলযানে করে আটলান্টিক মহাসাগরে ১৭,৭০০ ফুট নীচে নামা হয়েছিল। কিন্তু এরূপ জলযানের অসুবিধে হল, এরা 'lift' এর মতো শুধু সোজা নীচে নেমে যেতে পারে বা সোজা ওপরে উঠতে পারে; সাবমেরিনের মতো চারদিকে ঘুরে বেড়াতে পারে না। সামরিক সাবমেরিন এখনো সচরাচর ৮০০ ফুটের নীচে বড় যেতে পারে না। Aluminant নামে একটি সাবমেরিন হালে তৈরী হয়েছে—এ নাকি ১৫,০০০ ফুট জলের তলা দিয়ে ১০০ মাইল বেগে ছুটতে পারবে। উন্নততর জলনিমগ্নযান কালে আরো নির্মিত হবে—গভীর সমুদ্রতলও মানুষের অগম্য থাকবে না।

এবিষয়ে ফরাসীরা ছাড়া জাপানী ও আমেরিকান বিজ্ঞানীরা আজ সবচেয়ে বেশী অগ্রণী হয়েছেন। মৎস্য, অন্যান্য সামুদ্রিক খাদ্য ও খনিজ সম্পদের আকর ছাড়াও রত্নাকরে আর এক প্রয়োজন বর্তমানে বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। শিল্পোন্নতি ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন দেশে দেখা দিয়েছে তীব্র জলাভাব। একটন ইস্পাত তৈরি করতে জল লাগে ৬৫,০০০ গ্যালন। একটন কাগজ তৈরি করতে লাগে তার ১০ গুণ জল। সুতরাং ইস্পাত ও কাগজের ব্যবহারের ক্রমিক বৃদ্ধি, যন্ত্রচালিত যানবাহনের বৃদ্ধি, সুপেয় জলের চাহিদা বৃদ্ধি সব—মিলিয়ে পৃথিবীতে জলের চাহিদা অনেকগুণ বেড়ে গেছে। এ জল আবার সবই অ-লবণাক্ত হওয়া চাই। স্থলভাগে এরূপ জলের যোগান ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় ক্রমশই বেশী ঘাটতির পর্যায়ে পড়ছে। সুতরাং সামুদ্রিক সলিলের বি-লবণাকরণ ছাড়া গতি নেই। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এরূপ বি-লবণ প্রক্রিয়ায় ৪ কোটি গ্যালনের মত লবণমুক্ত সামুদ্রিক জল পাওয়া যাচ্ছে। একমাত্র kuwait-এর বি-লবণ কারখানা এরূপ ৮০ লক্ষ গ্যালন জলের যোগান দিচ্ছে। Guernsey ও Kuwait-এর বি-লবণ কারখানায় পুরণো পদ্ধতিতেই কাজ হয়ে থাকে অর্থাৎ জলটাকে প্রথম ফুটিয়ে জলীয় বাষ্পে রূপান্তরিত করে তাকে লবণ থেকে আলাদা করা হয়, তারপর ঐ ধরে রাখা জলীয় বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে জলে পরিণত করা হয় এবং তাতেই লবণমুক্ত সুপেয় জল পাওয়া যায়। কিন্তু এতে ব্যয় পড়ে বেশী। আমেরিকান বিজ্ঞানী ডাঃ রোজার রেভেল-এর মতে অনেক সস্তায় এ জল পাওয়া যেতে পারে—যদি সমুদ্রজলের ডিউটেরিয়ামকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের উপায় বের করা যায়। তাঁর হিসেবে, একটিমাত্র শক্তিকেন্দ্র থেকেই তাহলে ১৫ লক্ষ লোকের প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি ও ৬০ লক্ষ লোকের প্রয়োজনীয় সুপেয় জলের যোগান দেওয়া যাবে। কেউ কেউ আবার বলেছেন, রৌদ্র-করোজ্জ্বল অঞ্চলগুলিতে সূর্যকিরণ থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে এ ব্যবস্থাগুলি করা যেতে পারে। কিন্তু এর কোন পদ্ধতিই এখনো পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়নি। সাবেকী

distillation পদ্ধতি (Kuwait কারখানা ইত্যাদিতে) ছাড়া আর একটিমাত্র পদ্ধতিই এখনো পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছে। তার নাম হ'ল Electrodialysis। এছাড়া ইস্রায়েলের Eilat নামক স্থানে একটি কারখানায় সমুদ্র-জলকে বরফে রূপান্তরিত করে লবণ-বিচ্ছেদ ঘটান হচ্ছে; এতে distillation প্রক্রিয়ার থেকে খরচ কম পড়ে। আরো কম খরচের কথা ক্যালিফোর্নিয়ার Institute of Oceanography'র বিজ্ঞানীরা বলেছেন। দক্ষিণ মহাসাগরের (Antarctica) লবণমুক্ত হিম-বাহের থেকে তৈরী প্রকাণ্ড একটা হিমশৈলকে যদি জাহাজের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে আসা যায়, তবে তা' গলে গিয়েও যা' থাকবে তার থেকেই ৩০,০০০ কোটি গ্যালন সুপেয় জল পাওয়া যাবে।

সাম্প্রতিক কালে সমুদ্রতরঙ্গ থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহের চেষ্টাও হয়েছে। সারা পৃথিবীতে এই উৎস থেকে শক্তিসংগ্রহের প্রচুর সম্ভাবনা আছে বলে ২৪টি কেন্দ্র চিহ্নিত হয়েছে। তার মধ্যে ভারতের ২টি—একটি কাম্বে উপসাগরে, অপরটি কচ্ছ উপসাগরে। অবশ্য এপর্যন্ত একমাত্র ফ্রান্সেই এরূপ একটি tidal power station স্থাপিত হয়েছে—১৯৬৬ সালের নভেম্বরে এটির উদ্বোধন হয়। ফরাসী ইঞ্জিনিয়াররা শুধু ভরা কটাল (Spring tide) থেকে শক্তিসংগ্রহে তাঁদের চেষ্টা আবদ্ধ আবদ্ধ রাখেননি ; সমুদ্রপৃষ্ঠ ও সমুদ্রতলের তাপের তারতম্য (যা' নিরক্ষীয় অঞ্চলে বেশী দেখা যায়) থেকে শক্তিউৎপাদনের চেষ্টাও তাঁরা করে চলেছেন। এদিক দিয়ে তাঁরা অন্যান্য দেশের চেয়ে এগিয়ে আছেন।

অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে সামুদ্রিক গবেষণার একটা মস্ত সুবিধা এখনো আছে। তা হ'ল সংকীর্ণ উপকূলসীমার বাইরে সমুদ্র এখনো সব দেশের—কোন দেশের একার নয়। সুতরাং ছোট-বড় সব দেশই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে সামুদ্রিক গবেষণায় হাত দিতে পারে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে পারে। দূর সমুদ্রে (high seas) সব দেশের মানুষকে একসূত্রে বেঁধে ফেলা যাবে একথা মনে করবার সঙ্গত কারণ না থাকলেও প্রতিযোগিতার তীব্রতা যে কম হতে পারে একথা মনে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সৌভ্রাত্র গড়ে তোলা সম্ভব বলেই এখনো মনে হয়। ১৯৬৪ সালের ভারতসমুদ্র-অভিযানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথা এ উপলক্ষ্যে স্মরণ করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক মহাসমুদ্র কমিশন (International Oceanographic Commission) ১৯৬২ সাল থেকে সামুদ্রিক গবেষণার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপরে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে চলেছেন। এবিষয়ে অজ্ঞতা বা লোভ উপকারের থেকে অপকারই বেশী করবে মনে হয়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে রত্নাকরকে যত তাড়াতাড়ি আমরা জানতে পারব এবং যত বেশী আমাদের কাজে লাগাতে পারব ততই মঙ্গল। 'রত্নাকর নয় শূন্য কখন'—প্রায় সবারই এখন জানা আছে; এ জানাকে কাজে লাগাতে হবে।*

* এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যাঁরা আরো বেশি জানতে চান, তাঁরা Sir Allister Hardy, Charles Nightingale, Tony Loftas প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের রচিত পুস্তকসমূহ পড়লে উপকার পাবেন।

'আজি নারায়ণ জাগো হৃদে সবাকার !'

শ্রীশান্তিময় ঘোষ

বড় প্রয়োজন আজি নারায়ণ জাগো হৃদে সবাকার !
জাগো জাগো আজি পরমহংস, ভাঙ্গা বুকে বাংলার !
চারিদিকে আজ জ্বলে হুতাশন
নৃশংস ক্রূর নিত্য নূতন
মৃত্যুর হুঙ্কার !
হিংসা ও ঘৃণা বিনিময়ে চায়
সাম্য ও প্রেম স্থাপিতে ধরায়—
পরিহাস বিধাতার !

কি সর্বনাশা রক্তপিপাসা নিঠুর নির্মমতা
মানবতাবোধ পূর্ণ বিলোপ, পশুত্ব-প্রবণতা !
মানবদরদী দেবতা কোথায়
বজ্র হাতে যে সদা ছুটে যায়
নাশিতে দুঃখীর ব্যথা,
ত্যাগ-সেবা দিয়ে বাঁধা যার সুর ?
মানুষের বেশে এ যে রে অসুর,
মূর্ত নির্দয়তা !

জাগো আনন্দে বিবেকানন্দে সাথে করে চিন্ময়
বজ্রনিনাদে বেদান্তবাদে করিতে বিভেদ জয়,
সেবা-রাজপথে সবারে সমান
তোমার আসনে করিবে যে জন,
পশুত্ব পাবে লয় !
জাগো জাগো প্রভু পতিতপাবন
বিতরি বিমল শান্তি-কিরণ
জাগো হে জ্যোতির্ময় !

ভগিনী ক্রিশ্চিন

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্রহ্মচারী ত্রিদিবচৈতন্য (শ্যামল)

ভারতবর্ষ

স্বামীজীর কাছ থেকে আর একটি নতুন রাজ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি। তা হল—ভারতবর্ষ। স্বামীজীর মধ্যে দেখেছিলেন ভারতের পূর্ণতার রূপ ; স্বামীজীর কণ্ঠে শুনেছিলেন ভারতের চিরন্তন বাণী। ক্রিশ্চিন লিখেছেন, স্বামীজী যে'দিন "India" কথাটি প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন, সেদিনই তাঁর মধ্যে প্রথম জেগেছিল ভারতের প্রতি ভালবাসা। কখনও বা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, folklore থেকে প্রাচীন আখ্যান বলতেন স্বামীজী, আবার কখনও বা উপনিষদের মন্ত্র আবৃত্তি করে শ্রোতাদের মনে আনতেন গভীরতর আলোড়ন। স্বামীজীর কণ্ঠে যখনই উচ্চারিত হত "India"—ক্রিশ্চিন অনুভব করতেন এক মহাসংগীতের ঐক্যতান যার মধ্যে তিনি শুনতেন নানা সুর—কখনও "love", কখনও "passion", কখনও "pride", কখনও "longing", কখনও "adoration", কখনও "tragedy", আর সর্বোপরি প্রেম। শত শত বই পড়েও ভারতের প্রতি যে প্রেম কখনও জাগত না, স্বামীজীর একটি কথাতেই শ্রোতারা অনুভব করতেন এই পুণ্যভূমির প্রতি সেই উচ্ছ্বসিত প্রেম। ক্রিশ্চিনের ভারতপ্রেমের সূচনা ডেট্রয়েটের এই বিবেকানন্দ-বক্তৃতাবলী। জীবনস্মৃতিতে ক্রিশ্চিন বলেছেন, "এর পর থেকে ভারতবর্ষই হয়েছিল আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ভারতবর্ষ সম্পর্কিত সবকিছু—তার জনগণের ইতিহাস, স্থাপত্য, রীতি-নীতি, তার নদী পর্বত সমতলভূমি, তার সভ্যতা, উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব এবং তার শাস্ত্র—এ সবই আমার কাছে হয়ে গিয়েছিল পরম আগ্রহের বস্তু এবং জীবন্ত। এইভাবে শুরু হয়েছিল এক নতুন জীবন—পড়াশুনার এবং ধ্যানের। The centre of interest was shifted."[১২]

ভারতে আসার আহ্বান ক্রিশ্চিন পেয়েছিলেন সহস্রদ্বীপোদ্যানের দিনগুলো থেকেই ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু আরও ৭টি বছর কেটে গিয়েছিল এ আহ্বানে সক্রিয় সাড়া দিতে। ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে ক্রিশ্চিন পারিবারিক দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভ করলেন ছোট বোনদের মানুষ করে। মায়ের মৃত্যুর পর চলে এলেন ভারতবর্ষে। প্রথমে উঠেছিলেন নিবেদিতার কাছে বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে, যেখানে ৪ বৎসর আগে থেকেই ভারতীয় ধারায় প্রথম নারীশিক্ষার পত্তন করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ক্রিশ্চিনের ধ্যানের ভারতবর্ষ। যে কয়দিন বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে ছিলেন প্রায়ই গুরু-দর্শন করতে যেতেন বেলুড়মঠে, গঙ্গার ওপর দিয়ে খেয়া পেরিয়ে। অপ্রত্যাশিত মহাসমাধির পূর্বে শেষ দু'মাস স্বামীজী প্রেমে, আশীর্বাদে, অনুপ্রেরণায় আর অভয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন সদ্যভারতাগত এই বিদেশিনী শিষ্যাটির অন্তর। এ সময়কার একটি স্মৃতি বড় মর্মস্পর্শী। প্রথম যেদিন বেলুড় মঠে এসেছিলেন তখন এপ্রিলের শুরু, ১৯০২। জীবিতাবস্থায় এই শেষবারের

১২ Reminiscences, p. 163

মত সবেমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব দর্শন শেষ করেছেন স্বামীজী। ক্লান্ত, কিন্তু ক্রিশ্চিনকে অভ্যর্থনা করলেন পিতৃহৃদয়ের স্নেহ আর আশীর্বাদ দিয়ে। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকেই সেই দিনটির স্মৃতি তুলে ধরছি :

"আগে থেকেই খবর এসেছে তাই আজ বিশেষ ব্যবস্থা ও ব্যস্ততা। স্বামীজী সিষ্টার ক্রিশ্চিনকে তাঁর ঘরের সামনে বসে খাওয়াবেন। এই সঙ্গে নিজেও বসে খাবেন। সব সরঞ্জাম প্রস্তুত। ঐদিন ঘরের ভিতরে বেশী একটি টেবিল আনা হয়। কন্যারত্নের পানসীখানি ঘাটের কাছে দেখা যাওয়া মাত্রই স্বামীজী তাঁর উপরের ঘরের জানালা থেকে হাত তুলে অভিনন্দন জানালেন। ক্রিশ্চিনও স্বামীজীর প্রতি চোখ পড়ামাত্র পানসীর উপর দাঁড়িয়ে উর্ধ্বহস্তে নমস্তে করলেন। সর্বপ্রথম স্বামীজীর শ্রীমুখ সন্দর্শন করবেন এই আশা বুকে নিয়ে আসছিলেন। অলক্ষ্যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তা পূর্ণ করলেন। কি অপার আগ্রহ, আকুতি, মুখে চোখে বৈরাগ্যের শ্রী, জগৎভ্রান্তির রেখা।"[১৩]

মহাসমাধির অব্যবহিত পূর্বে বোধহয় জ্ঞাতসারেই স্বামীজী ক্রিশ্চিনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আলমোড়ায়। অপ্রত্যাশিত এই মহাপ্রয়াণের পরে ক্রিশ্চিনের মানসিক অবস্থা কল্পনা করাও কঠিন। সুদূর আমেরিকায় গৃহপরিজন ছেড়ে জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আশা চিরতরে বিসর্জন দিয়ে প্রায় নিঃসম্বল হয়েই তিনি ভারতে এসেছিলেন স্বামীজীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ত্যাগসমুজ্জ্বল পবিত্র এক সন্ন্যাসজীবন যাপনের জন্য। এই অপ্রত্যাশিত বজ্রাঘাতে সে সংকল্পের উপর সামান্যতম সন্দেহের ছায়াপাতও হয়েছিল বলে আমরা জানি না। গুরু নেই। কিন্তু গুরু-নির্দেশিত পথ রয়ে গেছে জাগতিক সহায় হয়ত অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু হৃদয়ে স্বামীজীর জাজ্বল্যমান উপস্থিতি, আর অন্তরে অফুরন্ত প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। ক্রিশ্চিন সেদিন গুরুভগিনী নিবেদিতার মত গুরুর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে শান্ত, কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে পা বাড়ালেন নতুন এই জীবন-সাধনার পথে। ওয়াহ্ গুরুজীকী ফতে।

পরবর্তী দীর্ঘ ১২ বছর এবং পরে আরও দু'বছর ভারতবর্ষে এবং ১৬ বছর আমেরিকায় ক্রিশ্চিন এই নীরব মুক্তি-সাধনাই করেছিলেন চরম পবিত্রতা, প্রেম, সেবা আর নিঃশব্দ শান্ত আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে। ভারতবর্ষে নারীশিক্ষাদানের আদেশ স্বামীজীই তাঁকে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষীয় নারীসমাজের কি করে শিক্ষা দিতে হবে সে বিষয়ে আমেরিকায় বহুবার সবিস্তারে স্বামীজী আলোচনা করেছিলেন শিক্ষাব্রতী এই শিষ্যার সঙ্গে। যে বিভাগটিকে শিক্ষিত করে তোলার কথা স্বামীজীর মনে হয়েছিল সেটি হল—বালবিধবা; সমাজে একান্তভাবে পরমুখাপেক্ষী এবং নীরব যন্ত্রণায় কাতর এই নারীসমাজ। এদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামীজী বিহ্বল হয়ে পড়তেন। ক্রিশ্চিন লিখেছেন—'নারীসমাজের এই শ্রেণীটিকেই স্বামীজী বিশেষভাবে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। "অর্থোপার্জনের দিক দিয়ে তাঁদের স্বাবলম্বী করে তুলতেই হবে।" স্বামীজী বলতেন।...আর বলতেন, "এঁদের শিক্ষিত করে তোলা অবশ্যই দরকার।"'[১৪]

১৩ স্বামীজীর স্মৃতি—নির্লেপানন্দ, পৃঃ ১৫৪

১৪ Reminiscences, p. 224

নারীজাগরণের নতুন তীর্থ

"আধুনিক ভারতের নারীজাগরণের ইতিহাসে একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থের উদ্বোধন করেছিলেন কলকাতার এক অখ্যাত পল্লীতে—বাগবাজার, ১৭ নং বোসপাড়া লেন—অবতারলীলাসঙ্গিনী শক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীমা আর যুগাচার্য বিবেকানন্দ। সেদিন ছিল ১৮৯৮, ডিসেম্বর। প্রথম কর্ণধার হয়েছিলেন নিবেদিতা—ভারতের বেদীতে উৎসর্গীকৃত শিখাময়ী, লোকমাতা, সিংহিনী আইরিশ নারী মার্গারেট নোবল্। তাঁরই সঙ্গে আজ ৪ বছর পরে ১৯০৩ সালের শরৎকালে এসে জুটলেন ক্রিশ্চিন। যে বাণীমূর্তির প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছিল আগামী যুগের ভারতীয় নারীর জন্য, তার কাঠামো তৈরি করলেন, রসদ যোগালেন নিবেদিতা। আর নিপুণ তুলিকায়, নিরলস সাধনায় এবং একনিষ্ঠ আত্মনিবেদনে মূর্তিটির পূর্ণাঙ্গ রূপদান করলেন ক্রিশ্চিন। ক্রিশ্চিনের আগে চলেছিল ছোট ছোট মেয়েদের ভারতীয় পদ্ধতিতে শিক্ষার জন্য একটি experiment। ক্রিশ্চিনের আগমনের পরে এ শিক্ষা একটি নির্দিষ্টরূপে ফুটে উঠল। সাতবছর পরে (১৯১০ খ্রী:) ক্রিশ্চিনের এই অবদানের কথা স্মরণ করে নিবেদিতা লিখেছিলেন, "১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে ভারতীয় নারীদের জন্য সমগ্র কার্যের ভার গ্রহণ করেছিলেন ভগিনী ক্রিশ্চিন। ক্রিশ্চিনের একাগ্রতা, দৃঢ়সংকল্প ও উদ্দেশ্যের একতানতা এবং আত্মত্যাগের ফলেই এই বিদ্যালয়ের বর্তমান উন্নতি সম্ভব হয়েছে। পূর্বে আমি কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে মেয়েদের যে শিক্ষা দিতাম তাতে কিছু কিছু ফল হয়েছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু ভগিনী ক্রিশ্চিন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে এই বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করে বিবাহিতা ও বিধবা মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, যার ফলে আমাদের কাজের প্রসার বিশেষরূপে বৃদ্ধি পেল।"[১৫]

নিবেদিতার এই স্বীকারোক্তিটি অনেক দিক দিয়েই মূল্যবান। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পরেই শিখাময়ী নিবেদিতা ফেটে পড়েছিলেন বৃহত্তর ভারতের বহুবিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে—শিক্ষা, শিল্প, রাজনীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান আর মনীষীদের মধ্যে স্বামীজীর আদর্শ ছড়াবার এক aggressive zeal নিয়ে। নারীজাগরণের যে অমূল্য ভিত্তিপ্রস্তরটি স্থাপন করেছিলেন তার ওপর সৌধনির্মাণের মত সময়, ধৈর্য ও একাগ্রতা নিবেদিতার পক্ষে দেওয়া আর সম্ভব হচ্ছিল না। ঠিক এই সময়ে ক্রিশ্চিনের আগমন, বিদ্যালয়ের "সমগ্র" কার্যভার বহন এবং "বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ" সত্যদ্রষ্টা গুরুরই এক অভিপ্রেত আশীর্বাদ। নিবেদিতা বই লিখে চলেছেন—The Web of Indian Life—কিন্তু তা কেবল এই বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্যই। ক্রিশ্চিন তাঁকে সেই সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আর্থিক অনটনের জন্যই নিবেদিতাকে আমেরিকার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে যেতে হয়েছিল। এমনকি ক্রিশ্চিনকেও স্থানান্তরে শিক্ষকতাগ্রহণ করে কিছুকালের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে হয়েছিল বিদ্যালয়টিকে বাঁচাবার জন্য।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে গুরুর স্বপ্ন—বিবাহিতদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার—ক্রিশ্চিন জীবনের ব্রত করে তুললেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে জগদ্ধাত্রী-পূজার দিন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হ'ল পুরস্ত্রী বিভাগ। সমগ্র পরিচালনার দায়িত্ব

---

১৫ নিবেদিতা বিদ্যালয় পত্রিকা (১৯৬৮), পৃঃ ৪০

ক্রিশ্চিনের। স্বামীজীর প্রিয় শিষ্যা মিসেস ওলি বুলের অর্থানুকুল্যে আরম্ভ হল এই বিভাগ। প্রথমে ৬০ জন ছাত্রী। পরে আরও আসতে শুরু করল। একদিন যেখানে দুই ভগিনীকে দ্বারে দ্বারে গিয়ে ছাত্রী খুঁজতে হত, আজ এমনিতেই তারা এল। পর্দা উন্মুক্ত হয়ে গেল। এসময় অপ্রত্যাশিতভাবে ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন মহিলা গোঁড়া হিন্দুসমাজের মেয়েদের জন্য নিবেদিতা-ক্রিশ্চিনের পক্ষ থেকে বাংলা ও সংস্কৃত শেখাতে করলেন।[১৬] কলকাতার তৎকালীন গোঁড়া সমাজও অনুভব করলেন বিবেকানন্দের বিদেশীনী শিষ্যাদ্বয়ের প্রকৃত মহত্ত্ব। নিবেদিতা লিখেছেন, "পরিশ্রমের ফলে আমরা আনন্দ ও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে, সমাজের লোকেরাও আমাদের আপন ভাবতে আরম্ভ করেছেন, সবচেয়ে গোঁড়া পরিবারের পর্দানশীন মহিলারাও সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমাদের কাছে আসতে চাইলেন তাঁদের ভগিনী অথবা পুত্রবধূদের নিয়ে। শুধু আমাদের দিক থেকে একমাত্র অসুবিধা হল শিক্ষা দেবার সাজ-সরঞ্জামের অভাবহেতু, আর মেয়েদের দিয়ে আসা আর নিয়ে আসার অসুবিধার জন্য ছাত্রীসংখ্যা সীমিত রাখতে হল।......বাস্তবিক-পক্ষে, হিন্দুসমাজ তাদের নারীদের একটি নতুন ধরনের শিক্ষাপদ্ধতির জন্য বিশেষভাবে সচেতন এবং ভগিনী ক্রিশ্চিনের পরিচালনায় বিবেকানন্দ বিদ্যালয় (Vivekananda School) ফাণ্ড্স্ এবং বিল্ডিং নিয়ে বড় আকারে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই গোঁড়া হিন্দুসমাজের সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাবে।'[১৭]

দুই ভগিনীই পাশ্চাত্যের "নতুন শিক্ষা (New Education)"-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন এবং এ শিক্ষা দেবার জন্য আশ্চর্যভাবে তৈরী হয়ে এসেছিলেন ক্রিশ্চিন। আমেরিকায় থাকাকালীন অত্যন্ত আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিন ধরে লাভ করেছিলেন তিনি। আর তার সঙ্গে স্বামীজীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন হিন্দু নারীর পবিত্রতা, সহনশীলতা এবং ধর্মবোধের আদর্শ। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অত্যন্ত আধুনিকতার সঙ্গে ভারতীয় নারীর মহত্তম গুণাবলীর এই সমাবেশের জন্য সেদিনকার রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দুসমাজের কাছেও ক্রিশ্চিন আদর্শ ভারতীয় নারীর সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এ গৌরবের পেছনে ছিল স্বামীজীর পুণ্যভূমি "ভারতবর্ষের" সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মবোধ যা ক্রিশ্চিন নিবেদিতার মতই পুরোপুরিভাবে লাভ করেছিলেন। দেখলে মনে হত বিদেশিনী। মিশলে মনে হত ভারতীয়ের চেয়েও ভারতীয়। সহায় নেই, সম্বল নেই, অর্থ নেই, ঘর নেই, আসবাবপত্র নেই—অথচ শিক্ষা আর শিক্ষার্থিনীর প্রতি কি গভীর ভালবাসা! জনৈক ছাত্রীর স্মৃতিকথা থেকে কিছুটা তুলে ধরছি—"আমি প্রথম স্কুলে যোগদান করি। তখন সিস্টার নিবেদিতা স্কুলে ছিলেন না। আমি তাঁকে কখনও দেখিনি; স্কুলের ভার ছিল সিস্টার ক্রিশ্চিয়ানার উপর। যতদিন নিবেদিতা আসেননি, ক্রিশ্চিয়ানা আমাদের ইংরেজী ও অন্যান্য বিষয়ের ক্লাস নিতেন। তিনি এত মাধুর্যময়ী ছিলেন যে, তিনি যখন আমাদের পড়াতেন তখন আমরা তাঁকে শিক্ষক বা গুরুর চেয়ে বন্ধু বলেই বেশী মনে করতাম; যেন তিনি আমাদের কত আপনজন। তাঁকে আমাদের একটুও ভয় হত না, তাঁর কাছে আমরা পড়বার সময়

১৬ Prabuddha Bharata, (1930) p. 32
১৭ Prabuddha Bharata, (1930) p. 32

ভুল করলে তাঁর সেই ক্ষমাপূর্ণ হাসি এখনো মনে হয়। ক্রিশ্চিয়ানা আমেরিকায় চলে যাওয়ার পর নিবেদিতা অনেকবার আমাদের কাছে তাঁর দৃঢ়তা, নিয়মানুবর্তিতা, সাহস ও পাণ্ডিত্যের কথা বলেছেন যা শুনে আশ্চর্য হতে হয়।"[১৮]

স্বভাবের দিক দিয়ে দুই ভগিনী যেন বৈপরীত্যের সমাবেশ। নিবেদিতা—প্রচণ্ড তেজস্বিনী with aggressive missionary zeal, emotional এবং রুদ্রবীর্যের প্রতীক আর ক্রিশ্চিন—শান্ত-মধুর অথচ সুগভীর, দৃঢ় ও অনমনীয়। একটি পত্রে নিবেদিতা লিখেছিলেন এই গুরুভগিনীর সম্বন্ধে, "শান্ত, নির্ভরশীল—তাঁর স্বভাবে ঔদ্ধত্য নেই, অনুগত ও সহৃদয়।"[১৯] সেদিনকার ১৭নং বোসপাড়া লেনের ভগিনীদের গৃহটি ছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছে এক শক্তি ও প্রেরণার উৎস। স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্যাদ্বয়ের ত্যাগবহ্নিময় জীবনের দ্যুতি এবং মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে সেদিন যেসব সুধী গুণগ্রাহী আসতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেশনেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে, শ্রীঅরবিন্দ, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিকিৎসক নীলরতন সরকার, বৈজ্ঞানিক স্যর জগদীশ বোস, লেডী অবলা বসু, লেখিকা-দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডু, শিল্পী নন্দলাল বসু ও অসিত হালদার, সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশবাবু তাঁর "ঘরের কথা ও যুগসাহিত্যে" ভগিনী নিবেদিতার কথাপ্রসঙ্গে একজায়গায় লিখেছিলেন—"নিবেদিতার এক সঙ্গিনী ছিলেন—ভগিনী ক্রিশ্চিয়ানা, স্বভাবটি মিছরীর মত মিষ্টি।"

এই মিষ্টি স্বভাবের জন্য ক্রিশ্চিন মায়ের স্থান অধিকার করেছিলেন তাঁর ছাত্রীদের জীবনে। একবার যাঁরা এই পূতচরিত্রা ত্যাগী মহীয়সীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁরা আর কোনদিনই তাঁকে ভুলতে পারেননি। শিক্ষিকা হিসাবে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ছাত্রীর অন্তরের সহজতম সান্নিধ্যে আসার জন্যই ক্রিশ্চিন-এর বিবেকানন্দ-বিদ্যালয়ের বিবাহিতা কিংবা বিধবা ছাত্রীরা এতখানি অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। ১৯০৩ সালে যে কাজ আরম্ভ হয়েছিল একটি স্বল্পপরিসর গৃহে—সেলাই-এর কাজ, সুতোর কাজ, ছবি-আঁকা আর মুখে মুখে রামায়ণ-মহাভারত আর পুরাণের গল্পসল্প দিয়ে, ১২ বছর পরে এ সাধনার ফলশ্রুতি হয়েছিল বিরাট আকারে, যার বিস্তৃত পরিচয় পাই ১৯১৬ সালে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের পক্ষ থেকে তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর প্রকাশিত বার্ষিক রিপোর্টে।

শুধু সমাজসেবিকা অথবা মিশনারী মনোবৃত্তি নিয়ে ক্রিশ্চিন আসেননি। ভারত তাঁর কাছে মুক্তিসাধনার পুণ্যস্থল। জনৈক অনুরাগী ভক্ত লিখেছিলেন, "তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পর অনুভব করতাম ভারতবর্ষে থাকা আর ভারতবর্ষের সেবা করা এক মহা সৌভাগ্য।" তাই যে ব্যক্তিত্বটি ঢেকে ক্রিশ্চিন সহজভাবে একান্ত আত্মগোপন করে মানুষের সঙ্গে মিশেছেন সেটি হ'ল—ব্রহ্মবাদিনীর রূপ। জনৈক পাশ্চাত্যবাসী ভারতে এসে এই পাশ্চাত্য ব্রহ্মবাদিনীর সঙ্গে পরিচিত হবার পর বিস্ময়ে লিখেছিলেন—"যে কণ্ঠটি আমাদের অভ্যর্থনা করেছিল তা এত স্বচ্ছ ও মৃদু, এত মধুময়, এত অনুরণিত অথচ এত পবিত্র ও

---

১৮ নিবেদিতা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ (নিবেদিতা বিদ্যালয়), পৃঃ ১২৮

১৯ নিবেদিতা বিদ্যালয় পত্রিকা (১৯৬৮), পৃঃ ৪০

পূর্ণতর এবং সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত যে, ক্রিশ্চিনের প্রথম কথাটি শোনার পরই তাঁর পবিত্র, মাধুর্যময় এবং পূর্ণতায় ভরা আধ্যাত্মিক রূপটি প্রকৃতরূপে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিল। সেই শীর্ণকায় ব্যক্তিত্বটির ঋজু স্থিরতা, গৌরবের ভঙ্গীতে মাথা তুলে দাঁড়ানো —পরিষ্কার যেন বুঝিয়ে দিল তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত নারী। প্রত্যেকটি চালচলনই যেন এই একই ভাব প্রকাশ করছিল।...মুখের সেই জলজলে আভা এবং···মাধুর্যমণ্ডিত, করুণ অথচ সুদৃঢ় রূপটি, এবং সর্বোপরি পরদুঃখকাতরতার ছাপটি, ছাঁচে ঢালা মুখটি যা রাজপুতনার শিল্পরীতিতে আঁকা তেজোময়ী সীতার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়···যার মধ্যে সবসময় জলছিল প্রাচ্যের ভঙ্গীতে তৈরী তাঁর বিস্ফারিত দুটো চোখ—যা হচ্ছে প্রাচ্যদেশীয় সাধিকার চোখ। ধ্যানস্তিমিত, প্রায়ই বাইরের জগৎ থেকে আবৃত···পদ্মপলাশ নেত্র যার নীল-কালো-আবছাসাদা পর্দার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছিল অন্তরের আলো।"[২০]

আশ্চর্য! পাশ্চাত্যবাসীও অভিভূত না হয়ে পারেননি বিবেকানন্দ-শিষ্যার আধ্যাত্মিক মাহাত্মে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে জনৈক পাশ্চাত্য সাংবাদিকের কথা যিনি আমেরিকায় বিবেকানন্দ-অনুপ্রাণিতদের কয়েকজনকে দেখে লিখেছিলেন, "There is a glow about everyone who is in some or other way associated with Vivekananda."

ভারতের নারীজাগরণের আর শিক্ষার ক্ষেত্রে এতবড় একটি পদক্ষেপ, একটি যুগান্তর আনার জন্য যে সুদীর্ঘ একটানা পরিশ্রম করতে হয়েছিল তার ফলে ভগিনী নিবেদিতার জীবনাবসান হ'ল নিতান্ত অল্প বয়সেই—স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের মাত্র ৯ বৎসর পরে ১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে নিবেদিতা হিমালয়ের কোলে চিরনিদ্রায় মগ্ন হলেন। মাত্র কয়েক মাস আগে বস্টনে চিরবিদায় নিয়েছিলেন ক্রিশ্চিনের জীবনের আর এক পরমাত্মীয়া মিসেস ওলি বুল—স্বামীজীর ধীরামাতা।

মিসেস বুল আর নিবেদিতার অন্তর্ধানের পরে ক্রিশ্চিন পড়ে রইলেন একা গুরুনির্দিষ্ট সাধনার প্রদীপটি জ্বালিয়ে অতি যত্নে। মিসেস বুলের অর্থানুকুল্য আর নিবেদিতার বিরাট সহযোগিতার অভাবের জন্য ক্রিশ্চিনকে একাকী আপ্রাণ সংগ্রাম করে চলতে হল আরও তিনটি বছর, বিদ্যালয়টিকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু সব সংগ্রামেরই মূল্য দিতে হয়। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ১৯১৪ সালে ক্রিশ্চিনের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। এই অসুস্থতা থেকে উঠে ক্রিশ্চিন ফিরে চললেন আমেরিকায়—পুরানো আত্মীয়স্বজনকে একবার দেখবার আশায়। পেছনে পড়ে রইল স্বামীজীর ভারতবর্ষ। আর বোসপাড়া লেনের ছোট্ট বিদ্যালয়টির সাধন-জগৎ আর জীবন-সংগ্রামের পরাজয় ও পরমুখাপেক্ষার গ্লানি থেকে মুক্ত অগণিত ছাত্রীর জন্য শুভেচ্ছা, ভালবাসা আর আশীর্বাদ।

বেদান্ত-প্রচার

১৯১৪। প্রতীচ্যের পুরানো ঘরে মেয়ে আজ ফিরে এসেছে প্রাচ্যের তপস্বিনীর রূপে। সেই ডেট্রয়েট—যেখানে ২০ বছর আগে পরশমণির সন্ধান পেয়েছিলেন ক্রিশ্চিন সেই পরশমণির ছোঁয়ায় আর তপস্যার আগুনে জলে ক্রিশ্চিন ফিরে এসেছেন পুরানো ঘরে সংসার-সুখের আত্মীয়স্বজনের স্নেহচ্ছায়ায় ডুবে যাবার জন্য নয়, পাশ্চাত্যে শ্রীগুরুর বাণী

২০ Prabuddha Bharata, 1930, p. 422

বহন করতে। বহুদিন আগে স্বামীজী তাঁদের কাছে বলেছিলেন: "আমেরিকানরাই আমেরিকাতে যেদিন বেদান্তপ্রচার করবে সেদিনই ঠিক হবে।" আজ এতদিন পরে দৈবনির্দেশেই যেন ক্রিশ্চিন গুরুর আর একটি দায়, আর একটি স্বপ্ন সফল করতে এসেছেন।

ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকাকে লিখিত একটি পত্রে স্বামীজী বলেছিলেন, "দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষি-মুখাগত ধর্ম প্রচার করিলে, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি এক মহান তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্য-ভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে।"

দেশীয় নারী যাবার বহুবর্ষ আগেই ক্রিশ্চিন গিয়েছিলেন বৈরাগ্যদীপ্তা ভারতবাসিনীর বেশে পাশ্চাত্যের দ্বারে।

আমেরিকাবাসিনী ক্রিশ্চিন সেদিন প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক প্রতিনিধি—পোশাকে, পরিচ্ছদে, চিন্তায়, কাজে, কথায় আর ধ্যানে।

গিয়েছিলেন আত্মীয়দের প্রতি তাঁর কর্তব্য-পালন করে কর্মভূমি ভারতবর্ষে ফিরে আসবেন ভেবে কিন্তু বিধাতা সে সঙ্কল্প ভেঙে দিলেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ। আমেরি-কাতে তার সুদূরপ্রসারী ফলে যে গোলযোগ শুরু হ'ল তার জন্য দীর্ঘ দশ বছর ক্রিশ্চিনকে আমেরিকাতেই থাকতে হ'ল। ক্রিশ্চিনের উপস্থিতিতে বেদান্তে উৎসাহী একদল ছাত্রছাত্রী নতুন করে অনুপ্রেরণা পেলেন। তাদের কাছে ক্রিশ্চিন এ সময়ে ভারতবর্ষ ও বেদান্ত-দর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তৃতাদি দিতেন। প্রাচ্যের ব্রহ্মবাদিনী সন্ন্যাসিনীর মুখে এই বেদান্ত-ব্যাখ্যা যাঁরা সেই সময় শুনেছিলেন তাঁদের একজন Elizabeth King লিখে-ছিলেন: "তাঁর নির্ভুল ভাষা, সুললিত স্বর, যেন কোন প্রাচীনকালের মন্দির থেকে আগত নারী-পুরোহিতের রূপ—এ সবের জন্য বক্তৃতা শোনাও ছিল অসীম আনন্দের ব্যাপার। কয়েকটি বিশেষ বক্তৃতা ছাড়া, যার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের ভারতবর্ষকে জানতে এবং ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন, তাঁর সব ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল একটিই—যা ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় সবচেয়ে ভালভাবে ব্যক্ত করা যায়—"By Me all this world is pervaded in My manifested aspect. Having manifested this universe with one fragment of My glory, I remain." "কিন্তু এই তত্ত্বটিকে এত বহুল গল্প-কথার মাধ্যমে এবং এত বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন যে শ্রোতৃবৃন্দ গভীরভাবে সেই তত্ত্বের ভাবে ডুবে যেতেন

২১ Prabuddha Bharata (1930), P. 422

শেষ তপস্যা

১৯২৪ সালে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের আরম্ভের দশবছর পরে ক্রিশ্চিন আবার ফিরে এলেন ভারতবর্ষে পুরানো কাজে আবার আত্মনিয়োগ করবেন বলে। কিন্তু দীর্ঘ অনুপস্থিতি এবং আরও নানা কারণে পুরানো তীর্থ ১৭ নং বোসপাড়া লেনের বাড়ীটি, যেখানে নিবেদিতার সঙ্গে তিনি থাকতেন, ভগ্নপ্রায় হয়ে গিয়েছে এবং দশ বৎসরে ইতিহাসের নানা উত্থান-পতনের পর বিদ্যালয়টি অন্য ব্যবস্থাপকদের হাতে চালিত হচ্ছে। কিছুদিনের জন্য ক্রিশ্চিন অবসর নিলেন বিদ্যালয়ের কাজ থেকে। কিন্তু চুয়ান্ন বছরের ভগ্নশরীর আবার অসুস্থতার মধ্যে পড়ে গেল এবং সক্রিয়ভাবে বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেওয়ার আশা ক্ষীণতর হ'য়ে উঠল। অনেক দিক দিয়েই এই সময়টি ক্রিশ্চিনের জীবনের আর একটি দুঃখ এবং কষ্টের অগ্নিপরীক্ষার অধ্যায়। কিন্তু

অন্তরে তিনি অনুভব করতেন স্বামীজীর অনন্ত অনুপ্রেরণা আর অমোঘ আশীর্বাদ। প্রায় চল্লিশ বছর আগে, ১৮৯৬ সালে স্বামীজী আমেরিকায় ক্রিশ্চিনকে একটি ছোট কবিতা উপহার দিয়েছিলেন যার মধ্যে হয়ত বা ছিল এই অনাগত ভবিষ্যতের জন্য সান্ত্বনা আর শক্তি-সঞ্চার—যেদিন ক্রিশ্চিন গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন একদিকে স্থূলশরীরে স্বামীজীর সান্নিধ্যের অভাব, আর অন্য একদিকে শুরু হয়েছিল জাগতিক বিপর্যয়ের একটি নতুন অধ্যায়।

What though thy bed be frozen earth,
Thy cloak the chilling blast ;
What though no mate to cheer
thy path
The sky with gloom overcast.
What though if love itself doth fail,
Thy fragrance strewed in vain ;
What though if bad over good prevail,
And vice over virtue reign :—
Change not thy nature, gentle bloom,
Thou violet sweet and pure,
But ever pour thy sweet perfume
Unasked, unstinted, sure !"[২২]

এ যেন ঠিক ক্রিশ্চিনের জীবনের প্রতিচ্ছবি। অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে ক্রিশ্চিনের আজীবন দুঃখসংঘাতময় সাধনার এবং শেষ সিদ্ধির একটি প্রাণস্পর্শী ছবি স্বামীজী এঁকেছিলেন এই ছোট কবিতাটিতে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে বহুদিন আগের আর একটি স্মৃতি। নিউইয়র্কের রাস্তায় চলেছিলেন ক্রিশ্চিন স্বামীজীর সঙ্গে বৈকালিক ভ্রমণে। সঙ্গে চলেছিল কতগুলি নিত্যসহচর—যারা রোজই এ সময়টিতে স্বামীজীর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান—বৃদ্ধ, হতাশায় মুহ্যমান, সর্বাঙ্গে জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত আর পরাজয়ের ছাপ। মহাপুরুষের স্বল্প সান্নিধ্যই তাঁদের পক্ষে হয়েছিল বেঁচে থাকার শেষ সম্বল। তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্য আর শক্তি নিয়ে স্বামীজীর কাছে তখন এসেছেন শিষ্যা ক্রিশ্চিন বেদান্তব্যাখ্যা শোনার জন্য। অবাঞ্ছিত অতিথিদের দিকে তাকিয়েই মনে মনে শুধু একটু ভেবেছিলেন, 'এ সব অদ্ভুত ধরনের ব্যক্তিদের কেন স্বামীজী টেনে এনেছেন?' চিন্তা শেষ না হ'তেই না-বলা প্রশ্নের উত্তর ভেসে এল। স্বামীজীর কণ্ঠে বুদ্ধের করুণার মূর্ছনা, "দেখছ না, আহা, বেচারীরা জীবনের কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রেছে!" সেই মুহূর্তেই শ্রোতা নীরবে প্রার্থনা করেছিলেন গুরুর কাছে যেন তার জীবনেও দুঃখ-দারিদ্র্য আর হতাশার দিনে গুরুর আশীর্বাদ অক্ষুণ্ণ থাকে। নীরবেই উত্তর পেয়েছিলেন ক্রিশ্চিন। লিখেছিলেন, "তাঁর নীরব আশীর্বাদের মধ্যে লুকিয়েছিল বিরাট শক্তি।"[২৩] দুঃখময় জীবনটার জন্য ভগিনী কোনদিন দুঃখপ্রকাশ করেননি। সামান্যতম হতাশাকেও মন থেকে দূর করে দিয়েছিলেন শুধু গুরুর প্রতি ভক্তি-বিশ্বাসের প্রগাঢ়তায়। জনৈক অনুরাগী ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "আমি কি কখনো অন্যরকম জীবন হ'লে খুশী হ'তাম? না, হাজার বার আমি 'না'ই বলব। কারণ এই পৃথিবীতে একজন বিবেকানন্দের মত ব্যক্তির আগমন অতি বিরল। যদি আমাকে আবার জন্ম নিতে হয়, হাসিমুখে আমি আরও হাজার-গুণ দুঃখ সইতে রাজী আছি আমার জীবনের

২২ Prabuddha Bharata (1930), P. 421

২৩ Reminiscences, p. 217

এই বিরাট সৌভাগ্যের জন্য।"[২৪]

দুঃখের জীবনটাকে করে তুলেছিলেন ক্রিশ্চিন মুক্তির তপস্যা ; ভয় পাননি, নিরুৎসাহ হননি, সামান্যতম অবিশ্বাসকেও অন্তরে স্থান দেননি। গুরুর অমোঘ আশীর্বাদকে ক'রে নিয়েছিলেন একমাত্র রাজসম্পদ। যে-পথে ভয়ের আকার দেখেছেন, সে-পথে 'রাজার দোহাই' দিয়েছেন। গুরুর শেষ আশীর্বাদ এসেছিল ১৯০১ সালের ৬ই জুলাই, মহাপ্রয়াণের বছরখানেক আগে। "আমি ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র ; কিন্তু আমি জানি যে তুমি মহৎ, আর তোমার মহত্ত্বে সর্বদা আমার আস্থা আছে। অন্য সকলের বিষয়ে ভাবনা হ'লেও তোমার সম্পর্কে আমার একটুও দুশ্চিন্তা নেই। জগজ্জননীর কাছে তোমাকে সমর্পণ করেছি। তিনিই তোমাকে সর্বদা রক্ষা করবেন ও পথ দেখাবেন। এ-কথা নিশ্চয়ই জানি যে, কোনও অনিষ্ট তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না—কোনও বাধাবিঘ্ন মুহূর্তের জন্যও তোমাকে নিরুৎসাহ করতে পারবে না।"

অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল স্বামীজীর আশীর্বাদ। চরম দারিদ্র্য, অর্থাভাব আর শারীরিক দুঃখকষ্ট হাসিমুখে উপেক্ষা করে ক্রিশ্চিন ১৯২৪-১৯৩০ পর্যন্ত শেষ কয়েকটি বছর কাটিয়েছিলেন আমেরিকায়। জীবন-সায়াহ্নে একটা গভীর শান্তিতে ভরে থাকতেন এই মহীয়সী নারী। জীবন-সায়াহ্নে পেছনের তপস্যাপূত দিনগুলির দিকে তাকিয়ে বলতেন, "এত দীর্ঘ, এত দুঃখময় জীবনটি। তবুও মুহূর্তের জন্য অন্তর্নিহিত সর্বশক্তিমত্তাকে ভুলে যাইনি, জীবনটাকে দিনের পর দিন ইচ্ছামত তৈরি করার চেষ্টা করেছি। কত ভুল করেছি, কত যন্ত্রণা সয়েছি আর কতবার হতাশা এসেছে দীর্ঘ বছরগুলিতে। যুগের পর যুগ কেটেছে। শেষে এ জীবনে ইচ্ছাশক্তিটাকে করে তুলেছি দুর্জয়। অদ্ভুত শক্তি এই তপস্যাপূত ইচ্ছার। কখনও মনে হয়েছে আমি নক্ষত্র-গুলিকেও কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারি। কখনও এত শক্তি অনুভব করেছি যে, যম এলে বলতে পারতাম, 'এই পর্যন্ত তুমি এগোতে পার, আর একটি পদক্ষেপও নয়।' অলঙ্ঘ্য বাধাকে লঙ্ঘন করেছি আমি। এই ইচ্ছা-শক্তিই আমাকে টেনে এনেছিল ভারতে। মানুষের পক্ষে অসহনীয় শারীরিক যন্ত্রণার মুহূর্তগুলিতে এই ইচ্ছাশক্তিই আমাকে এই দেহে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আর আজ এই ইচ্ছাকে সমর্পণ করেছি প্রভুর ইচ্ছার মধ্যে। এবার আমার নয়, প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"[২৫]

মহাসঙ্গীতের শেষ সুরধ্বনি। কন্যা ক্রিশ্চিনকে জগজ্জননীর পায়ে সমর্পণ করেছিলেন রামকৃষ্ণের নরেন। আজ সেই সমর্পণের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হ'ল সমর্পিতার শেষ সন্ধ্যায়। প্রিয় বন্ধুর বাড়ীতে নিউইয়র্কে ১৯৩০ সালে মহাসমাধিতে মগ্ন হয়েছিলেন ক্রিশ্চিন। খুব শান্তভাবে, বেশ একটা আনন্দের ঘোরে, সজ্ঞানে শেষ সমাধিতে ডুবে গেলেন তিনি। পাশে দাঁড়িয়ে দু-এক জন অনুরাগী ভক্ত দেখে-ছিলেন দুঃখসাগর থেকে অমৃতসাগরে উত্তরণ হল এক মহাজীবনের—বিবেকানন্দ-কন্যা ক্রিশ্চিনের।

---

২৪ Prabuddha Bharata (1930), P. 423

২৫ Prabuddha Bharata (1930), P. 423

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ঃ 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

কার্ল মার্কস, হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শিক্ষায় কলাবিদ্যার স্থান

স্পেন্সারের পাঁচটি শিক্ষাসূত্রের প্রথম চারটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। তার মধ্যে চতুর্থ সূত্রটি স্বামীজীর অনুবাদের ভাষায়—"যাহা দ্বারা সামাজিক অবস্থা যথাযথ সংরক্ষিত হয়।"[১] এ প্রসঙ্গে স্পেন্সার ও স্বামীজীর দৃষ্টিতে "ইতিহাস"-চেতনার তুলনামূলক আলোচনা এর আগে আমরা বিস্তৃতভাবে করেছি। কারণ, আধুনিক জীবনবোধের সঙ্গে এ ইতিহাসচেতনার সম্পর্ক নিকটতম।

স্পেন্সারের পঞ্চম সূত্র—"কতকগুলি মিশ্র কার্য—যাহারা জীবনের অবসরভাগ অধিকার করিয়া আমোদ এবং সুখেচ্ছা চরিতার্থ করাইয়া পর্যবসিত হয়।"[২]

সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প (ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কণ) প্রভৃতি কলাবিদ্যার প্রধান কয়েকটি বিষয় অবলম্বনে স্পেন্সার এদের সামাজিক মূল্য স্বীকার করেও দেখিয়েছেন যে, এদেরও মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তি। তবু এরা মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তাই জীবনের অবসরভাগেই এদের অবস্থিতি। 'শিক্ষা'-গ্রন্থের সূচনায়ই স্পেন্সার আদিম মানব-সমাজে বসনের চেয়ে ভূষণের আদর লক্ষ্য করেছেন। অর্থাৎ এই অপ্রয়োজনের বিস্তার প্রতিই মানবজাতির আগ্রহ যে বেশী, একথা তাঁর বৈজ্ঞানিক উপযোগিতাবাদী চিন্তার পক্ষে অসহ্য ঠেকেছে।

'শিক্ষা' গ্রন্থের 'সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি?'-প্রথম অধ্যায়ে স্বামীজীর অনুবাদ—"অবশেষে আমরা মানবজীবনের যে অবকাশ-সময় আমোদপ্রমোদে নিয়োজিত হয়, তাহাতে উপনীত হই। পূর্বোক্ত বিভাগগুলির ন্যায় ইহাকে শুদ্ধ প্রত্যক্ষ উপযোগিতার দ্বারা বিচার না করিলেও উচ্চ এবং সুন্দর ভাব-গ্রাহক মানসিক বৃত্তির পরিচালনার আমরা সম্যক পক্ষপাতী। চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, কাব্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুভব পরিত্যাগ করিলে জীবন শুষ্ক মরুময় হইয়া উঠে। ইহাদের উপেক্ষা করা দূরে থাকুক, আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে ইহারা সমধিক শ্রদ্ধা লাভ করিবে। মনুষ্যসমাজ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া যখন প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ সম্যকপ্রকারে মানবসৌকর্যে নিয়োজিত হইবে, যখন পরিশ্রমের যৎপরোনাস্তি সুব্যবহার হইবে এবং যখন এই সকল সুবিধার জন্য জীবনের অবসরভাগ অনেক পরিবর্ধিত হইবে, তখনই শিল্পবিদ্যাজনক-সৌন্দর্য-গ্রহণেচ্ছা সম্যকভাবে পরিস্ফুট হইতে

১, ২ "Those activities which are involved in the maintenance of proper social and political relations ;" "Those miscellaneous activities which fill up the leisure part of life, devoted to the gratification of the tastes and feelings." Education : Spencer : 1st Edn. p 9,

থাকিবে।"৩

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, মানবসভ্যতার বিকাশে শিল্পের নিজস্ব ভূমিকা কতখানি সে বিষয়ে স্পেন্সার ততটা অবহিত ন'ন। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রয়োজনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে মানুষের অন্নময় স্তর সম্বন্ধে যতটা সজাগ করেছে, তার আনন্দময় স্তর সম্বন্ধে ততটা সচেতন করেনি। তা না হলে তিনি একথা সহজেই উপলব্ধি করতেন যে, শিল্প শুধু অবসরের বিদ্যা নয়, আমাদের সমগ্র অস্তিত্বেরই প্রয়োজনীয় সর্ত। প্রাচীন গ্রীক, মিশরীয় বা ভারতীয় যে কোনো উন্নত সভ্যতারই বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সহগামী শিল্পচেতনা। বিশেষতঃ গ্রাস ও ভারতবর্ষ—এ দুটি দেশেই অধ্যাত্ম-বিদ্যা, মানবিক শিল্প, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের প্রাথমিক অবিষ্কার—এ সব দিকেই মানবমনের অন্বেষণের অজস্র বিস্ময়কর উদাহরণ। সুতরাং বৈজ্ঞানিক উন্নতির দ্বারা মানবসমাজের অবসরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পচেতনা বৃদ্ধি পাবে মনে করা স্পেন্সারের স্বভাবসুলভ অতিসরলীকরণের প্রবণতা। অবসর শিল্পের সর্ত নয়, কারণ যে-কোনো শিল্পই সমগ্র জীবনের প্রেরণা ও পরিশ্রমের অবলম্বন ও ফলস্বরূপ হ'তে পারে। সে অর্থে কোনো যথার্থ শিল্পীই অবসরভোগী ন'ন, তাঁরাও কায়িক এবং মানসিক শ্রমজীবী। তবে তাঁদের শ্রমের প্রকৃতি আলাদা।

আর প্রয়োজনের দিক থেকে বিবেচনা

৩ And now we come to that remaining division of human life which includes the relaxations and amusements filling leisure hours. After considering what training best fits for self-preservation, for the obtainance of sustenance, for the discharge of parental duties, we have now to consider what training best fits for the miscellaneous ends not included in these—for the enjoyments of Nature, of Literature, and of the Fine Arts, in all their forms. Postponing them as we do things that bear more vitally upon human welfare ; and bringing everything as we have, to the test of actual values ; it will perhaps be inferred that we are inclined to slight these less essential things. No greater mistake could be made, however. We yield to none in the value we attach to aesthetic culture and its pleasures. Without painting, sculpture, music, poetry, and the emotions produced by natural beauty of every kind, life would lose half its charm. So, far from regarding the training and gratification of the tastes as unimportant, we believe that in time to come they will occupy a much larger share of human life than now. When the forces of Nature have been fully conquered to man's use—when the means of production have been brought to perfection—when labour has been economised to the highest degree—when education has been so systematized that a preparation for the more essential activities may be made with comparative rapidity—and when, consequently there is a great increase of spare time ; then will the beautiful, both in Art and Nature, rightly fill a large space in the minds of all."—Education : Spencer : pp 37-38 : 1st Edn.

অনুবাদক : স্বামী বিবেকানন্দ : বসুমতী-প্রকাশিত 'শিক্ষা' [শশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত সং] : পৃ: ৩৪

করলে, মানুষের অন্নবস্ত্রের প্রাথমিক প্রয়োজনের কথা স্বীকার করেও প্রশ্ন তোলা চলে মানব-মানসের তৃষ্ণানিবারণের জন্য শিল্প-সাহিত্যের প্রয়োজন চিরকালই ছিল এবং থাকবে। মানব-জীবনের প্রাথমিক উপকরণের জন্যই মানুষের অস্তিত্ব নয়, তার চেয়ে সূক্ষ্মতর এবং মহত্তর অনুভূতির জগতেই মানব-অস্তিত্বের সার্থকতা। শিল্প ও সাহিত্য মানব-অন্তরের সেই পরম-তৃষ্ণার উত্তর। মানব-অস্তিত্বের প্রয়োজনে তার ভূমিকা সাধারণ প্রয়োজনের দিক থেকে ব্যবহারিক প্রয়োজনের পরে, কিন্তু মানব-আদর্শের গভীরতর প্রয়োজনের দিক থেকে যে কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজনের অনেক ঊর্ধ্বে তাদের স্থান।

স্পেন্সার অবশ্য একথা স্বীকার করেননি। কারণ তাঁর মতে,—"...শিল্পাদি বিদ্যা উপকারক হইলেও জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় বিদ্যাসমূহ হইতে অনেক পরিমাণে অল্পমূল্য এবং তাহারা যে প্রকারে জীবনের অবকাশভাগ অতিবাহিত করায়, সেই প্রকার শিক্ষাকালের অবসরকালই তৎশিক্ষার উপযুক্ত সময়।"[৪]

শিল্প বা সাহিত্য-শিক্ষাকে বিজ্ঞানশিক্ষার পরে স্থাপনের প্রধান কারণ অবশ্য সমকালীন শিক্ষাজগতে উপযোগিতাবাদী শিক্ষাব্যবস্থার অভাবের বিরুদ্ধে স্পেন্সারের প্রতিবাদ। নিষ্প্রয়োজনে একাধিক ভাষাশিক্ষা বা কাব্য-চর্চার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতাকে স্পেন্সার বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজনের তুলনায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অনাবশ্যক জ্ঞান করেছেন। অপরপক্ষে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, ভাস্কর্য বা চিত্র-বিদ্যার ক্ষেত্রেও মানবদেহের অঙ্গসংস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান অপরিহার্য। সংগীত বা কবিতাও মূলত: বিজ্ঞানের সীমার বাইরে যেতে পারে না।

স্বামীজীর অনুবাদে সঙ্গীত ও কাব্য সম্বন্ধে স্পেন্সারের মতামতের অংশবিশেষ—"সঙ্গীতেও বিজ্ঞান আবশ্যক, একথায় অনেকের আশ্চর্য বোধ হইবে। সঙ্গীত মানব-মনের স্বাভাবিক ভাব-তরঙ্গের স্বাভাবিক স্ফূর্তি। অতএব যে পরিমাণে আমরা স্বাভাবিক ভাষার নিয়মানু-সারে চালিত হই, আমাদিগের সঙ্গীত সেই পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করে।"[৫]

"কবিত্ব সম্বন্ধেও এই প্রকার। যে স্থলে বাক্য উচিতভাব অথবা ভাব বাক্যকে অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞানকে দূরীভূত করে, সেই স্থানই পড়িতে কষ্টদায়ক।"[৬]

প্রত্যেক কলাবিদ্যারই একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে সন্দেহ নেই। তবু বস্তুতাত্ত্বিক ভিত্তিটিই সেই কলাবিদ্যার প্রাণ নয়, তাকে অবলম্বন করে যে লাবণ্যের প্রকাশ, সেই লাবণ্য বা মাধুর্যেই শিল্পকলার প্রাণ। শিল্পের ক্ষেত্রে তাই অনুকৃতি যথাযথ না হলেও রসিকের মন অভিভূত হ'তে পারে। যেমন ধরা যায়, আমাদের প্রাচীনপন্থী মূর্তিশিল্পে

৪ 'শিক্ষা' : পৃঃ ৩৬

৫, ৬ তদেব : পৃ: ৩৭ মূল ইংরেজী—To say that music, too, has need of scientific aid will cause still more surprise. Yet it may be shown that music is but an idealization of the natural language of emotion ; and that consequently music must be good or bad according as it conforms to the laws of this natural language."

দেবকল্পনার রূপবৈচিত্র্য। অথবা আধুনিককালের বিমূর্ত শিল্পসৃষ্টি। চীনা চিত্রকলাকে স্পেন্সার হাস্যকর মনে করেছেন। কিন্তু জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর জাতরূপেই আজ প্রাচীন চীন পরিচিত। ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধেও রূপ-সৌন্দর্যের য়ুরোপীয় ধারণা না বদলালে রসগ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি—সেই কারণেই আমাদের নিজস্ব শিল্পকলার ঐতিহ্যসম্মত বিকাশ হয়নি।

সঙ্গীত বা কবিতা সম্বন্ধে স্পেন্সারের মন্তব্য আরো অগভীর। সন্দেহ নেই যে কাব্যতত্ত্ব নামে একটি বিষয় অনেক পরিমাণে কবিতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। তবু জগতের ইতিহাসে কাব্যই আগে, তত্ত্ব পরে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে মানুষের অন্তরতম বাণীর প্রকাশ বহুবিচিত্র। শুধুমাত্র প্রচলিত বা আভিধানিক ভাষাকে অনুসরণ করেই কোনো যথার্থ কাব্যের সৃষ্টি হয় না বরং ভাষার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার নব নব আবিষ্কারে ও রূপায়ণেই কবির অভ্যুদয়।

সঙ্গীত সম্বন্ধে স্বামীজীর প্রথম জীবনের একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকবোধে আমরা উদ্ধৃত করছি। স্পেন্সারের 'এডুকেশন' গ্রন্থটি যদি ১৮৮৪-৮৫ সালে স্বামীজী 'শিক্ষা' নামে অনুবাদ করে থাকেন, তাহলে সঙ্গীত-সংকলনগ্রন্থ 'সঙ্গীতকল্পতরু' তার অল্পদিনের ব্যবধানেই প্রকাশিত। বাংলা ১২৯৪ সালে অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত 'সঙ্গীত-কল্পতরু'-গ্রন্থের 'সঙ্গীত ও বাদ্য' নামক ভূমিকায় স্বামীজী বিশেষভাবে ভারতীয় সঙ্গীত-প্রসঙ্গে লিখেছেন—"আধুনিক মনুষ্যের মধ্যে শিক্ষালব্ধ এবং কৃত্রিম ভাবের প্রাবল্যই অধিক। পুরাকালে প্রাকৃতিকভাবে মানবহৃদয় পূর্ণ হইয়া থাকিত।···অনন্ত সাগরের অনন্ত বিস্তৃতি, অনন্ত নীলাকাশের বুদ্ধিপ্রতিঘাতী প্রভা, নিবিড় অরণ্যের মহান্ স্তব্ধ ভাব, গিরিনির্ঝরের গম্ভীর হৃদয়-মণ্ডকারী মর্মরধ্বনি, অভ্রভেদী পর্বতের শান্তিপূর্ণ বিশাল বপু, নদীসকলের অর্ধস্ফুট সঙ্গীতধ্বনি, বনবিহঙ্গের হৃদয়ের অন্তস্তলস্পর্শকারী সঙ্গীত প্রাচীন মানবেরাই ভোগ করিত। আমরা শোভা দেখি, গান শুনিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হই; অরণ্য-আশ্রমী ফলমূলাহারী সরলপ্রাণ বৈদিক ঋষিদিগের বিশ্বব্যাপী হৃদয় কি তাহাতে শান্ত হয়? যে হৃদয় প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি হইতে বর্ষার ভেকের ঘর্ঘররবে নাচিয়া উঠিত, প্রকাণ্ড হিমালয়ের চিরশুভ্র শিখর হইতে ভ্রমরের গুঞ্জন এবং প্রাতঃকুন্দের বিকাশ পর্যন্ত যে প্রাণকে আত্মহারা করিত, তাহা কি ইহাতে সন্তুষ্ট হয়? আমরা সৌন্দর্য দেখি, তাঁহারা সৌন্দর্য পান করিতেন,—আমরা মধুর ধ্বনি শ্রবণ করি, ঋষির প্রাণ বিষ্ণুপদ-নিঃসৃতা নির্মলসলিলা ভাগীরথীর ন্যায় আর্দ্র হইয়া সঙ্গীত-তরঙ্গে মিশাইয়া যাইত।···যাঁহাদের প্রাণে কবিত্ব, যাঁহাদের জীবনে অলঙ্কার, যাঁহাদের কার্য ন্যায়, সেই পূজ্যপাদ ঋষিগণই এই সঙ্গীতের স্রষ্টা—স্রষ্টা বলিলে হয়ত ভুল হইবে, তাঁহারা আবিষ্কর্তা।"[৭]

"Even in poetry the same thing holds. Like music, poetry has its root in those natural modes of expression which accompany deep feeling. Its rhythm, its strong and numerous metaphors, its hyperboles, its violent inversions are simply exaggerations of the traits of excited speech. To be good, therefore,

ভারতীয় সঙ্গীতের এই আর্যমহিমা-প্রচারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, স্বামীজী সঙ্গীতের ভাবময় দিকটির প্রতিই জোর দিয়েছেন। অবশ্য বিশুদ্ধ তানলয়-সম্বন্ধে স্বামীজী বা শ্রীরামকৃষ্ণদেব দু'জনেই বিশেষ অবহিত ছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র তানলয় বা ধ্বনিবিজ্ঞানই সঙ্গীতের মূল উপকরণ নয়।

সাহিত্য ও শিল্পে এই প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের বিচার-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'তথ্য ও সত্য' আলোচনাটি স্মরণীয়। কবি তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে সাহিত্যে তথ্যের যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করে বলেন—'যেহেতু সাহিত্য ও ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এইজন্যে তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ।··· চিত্রী যখন ছবি আঁকিতে বসেন তখন তিনি তথ্যের খবর দেবার কাজে বসেন না। তখন তিনি তথ্যকে ততটুকুমাত্র স্বীকার করেন যতটুকুর দ্বারা তাকে উপলক্ষ করে কোনো একটা সুষমার ছন্দ বিশুদ্ধ হয়ে দেখা দেয়। এই ছন্দটি বিশ্বের নিত্যবস্তু। এই ছন্দের ঐক্যসূত্রেই আমরা সত্যের আনন্দ পাই।"···

"সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়। অর্থাৎ সে বস্তু যদি এমন একটি রূপ-রেখা-গীতের সুষমাযুক্ত ঐক্য লাভ করে যাতে করে আমাদের চিত্ত আনন্দের মূল্যে তাকে সত্য বলে স্বীকার করে, তাহলেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়।"···

"কবিতা যে ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দটির অভিধান-নির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই বিশেষ অর্থই শব্দের তথ্য-সীমা। এই সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইসারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গি।"

রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্য ছড়া, বৈষ্ণবপদাবলী, জাপানী চিত্রকলা, কীট্‌সের কবিতা অবলম্বনে তাঁর বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর বিশেষ প্রিয় কবিত্বময় 'কঠোপনিষদে'র একটি অপূর্ব শ্লোক আমরা উদাহরণরূপে গ্রহণ করতে পারি। যেখানে আত্মোপলব্ধির আলোকসত্য রূপায়িত—

ন তত্র সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ কঠ ২।২।১৫

স্বামীজীর সমাধিলব্ধ অনুভূতির সঙ্গে এই শ্লোকটির সবচেয়ে মিল প্রকাশিত হয়েছে বাগেশ্রীরাগিণীতে রচিত স্বামীজীর সেই বিখ্যাত গানটিতে—

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর ॥
অস্ফুট মন-আকাশে জগতসংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি'—এই ধারা অনুক্ষণ ॥
সে ধারাও বন্ধ হ'ল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্', বোঝে—প্রাণ
বোঝে যার ॥

poetry must pay attention to those laws of nervous action which excited speech obeys.', Education : Spencer : 1st Edn : p 43. অনুবাদের ক্ষেত্রে স্বামীজী অনেক পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করেছেন।

৭ সঙ্গীতকল্পতরু : শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ. ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক : প্রথম সংস্করণ : 'সঙ্গীত ও বাদ্য', পৃঃ ৭-৮

ইন্দ্রিয়ের ভাষার অতীত এই কাব্যকে উপলব্ধির জন্য স্পেন্সার-কথিত "laws of nervous action" বা "স্নায়বিক ক্রিয়ার নিয়মাবলী" সম্বন্ধে জ্ঞান কোনো সহায়তা করে না। অপরপক্ষে, ইন্দ্রিয়গোচর অনুভূতির প্রকাশের ক্ষেত্রেও কবিতা বা শিল্প যে আনন্দ-লোকে আমাদের উত্তীর্ণ করে, তার জন্য ভাষাবিজ্ঞান বা স্নায়ুতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অতি সামান্যই সহায়তা করে।

ভারত তথা এশিয়ার শিল্পদৃষ্টিপ্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ—"এশিয়াটিকের (এশিয়াবাসীর) জীবন আর্টে মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ। যে-মেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর। ঠাকুর নিজে একজন কতবড় artist (শিল্পী) ছিলেন।…

"পাড়াগাঁয়ে চাষাদের বাড়ি দেখেছিস? ·· তাতে কত আর্ট। মেটে ঘরগুলোয় কত চিত্তির-বিচিত্তির। আর সাহেবদের দেশে ছোটলোকেরা কেমন থাকে, তাও দেখে আয়। কি জানিস, সাহেবদের utility (কার্যকারিতা) আর আমাদের art (শিল্প)—ওদের সমস্ত দ্রব্যেই utility, আমাদের সর্বত্র আর্ট।"[৮]

এ-ক্ষেত্রে স্মরণীয়, স্বামীজী আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষা ও কারিগরী বিদ্যার প্রসারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তবু শিল্পকে তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য মনে করেছেন। এশিয়াবাসীর শিল্পময় জীবনের মাধুর্য তাঁর কাছে বিশেষ শ্রদ্ধেয় মনে হয়েছে। জাপানের শিল্পচেতনা ও কারিগরি বিদ্যায় উন্নতি, সর্বোপরি পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি গ্রহণ করেও জাপানের স্বকীয়তার আদর্শে অবিচল থাকার বৈশিষ্ট্য স্বামীজীকে মুগ্ধ করেছিল। স্পেন্সারের মতো সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি কলা-বিদ্যাকে স্বামীজী ব্যবহারিক বিজ্ঞানের পরবর্তী স্তরে স্থাপন করেননি। তাঁর অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত অনুভূতিলোকে ধর্ম, শিল্প ও বিজ্ঞান—এ তিনেরই বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।[৯] শিল্প ও বিজ্ঞানের শেষ উত্তরণক্ষেত্র অদ্বৈতানুভবে—যা ধর্মচেতনারই শেষকথা। ধর্ম যেহেতু সমগ্র জীবনকে ধারণ করে আছে, তাই শিল্প ও বিজ্ঞানচেতনাও তারই অন্তর্ভুক্ত। [ক্রমশঃ]

৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : নবম খণ্ড : পৃঃ ৪০৭

৯ "Art, science and religion are but three different ways of expressing a single truth. But in order to understand this we must have the theory of Advaita."—Complete Works of Swami Vivekananda : Vol 1 : Introduction by Sister Nivedita, Centenary Edition, p xiv.

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শন

পূর্বাভাষ : স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে সমাজদর্শনের প্রকৃতি

"That society is the greatest where the highest truths become practical."
—Vivekananda.

"বন্ধনমুক্তির উদ্‌গাতা না হ'লে বিবেকানন্দ কিছুই নন।"—উক্তিটি স্বামীজীর একজন পাশ্চাত্য ভক্তের।[১] সাধারণ ভাষায় অনুবাদ করলে উক্তিটির তাৎপর্য দাঁড়ায় যে, স্বামীজী হ'লেন সর্বোপরি স্বাধীনতার (freedom) উপাসক ও প্রচারক। বস্তুত, স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণাই যে তাঁর সমগ্র দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু, সে-বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। অবশ্য অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিপাদনীয় সত্য হ'লো একত্ব (unity)। কিন্তু এই প্রতিপাদনকার্য জ্যামিতিক উপপাদ্যের ন্যায় স্বকার্যবিষয়ের ভিত্তিতেই অগ্রসর হয়, এবং স্বীকার্য বিষয়টি হ'লো 'স্বাধীনতা' বা 'মুক্তি'। সকল জীবের সহিত ঐক্যানুভূতির জন্য প্রয়োজন হয় স্বাধীন সত্তার। অতএব, বৈদান্তিকের মৌলিক মন্ত্র স্বাধীনতা বা মুক্তির মধ্যেই নিহিত। স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : "আমরা দেখিতেছি যে, সমুদয় জগৎ কর্ম করিতেছে। কিসের জন্য ? মুক্তির জন্য, স্বাধীনতালাভের জন্য। পরমাণু হইতে মহোচ্চ প্রাণী সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই এক উদ্দেশ্যে কর্ম করিয়া চলিয়াছে, সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য—মনের স্বাধীনতা, দেহের স্বাধীনতা, আত্মার স্বাধীনতা। সকল বস্তুই সর্বদা মুক্তিলাভ করিতে এবং বন্ধন হইতে ছুটিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেছে। সূর্য চন্দ্র পৃথিবী গ্রহ—সকলেই বন্ধন হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে।"[২]

এখন প্রশ্ন, সামাজিক জীব মানুষের ক্ষেত্রে এই যে প্রকৃতিগত স্বাধীনতা এর ঠিক স্বরূপ কি ? সংক্ষেপে বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের মতে এই স্বাধীনতা দ্বারা সমাজবন্ধন থেকে মুক্তি বোঝায় না, বোঝায় সমাজের অন্তর্ভুক্ত থেকেই সকলের সঙ্গে মুক্ত অবস্থা আস্বাদন করা (freedom in society along with others)।

সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা সম্বন্ধে এই ধারণা আরও দু'টি সংশ্লিষ্ট ধারণা নির্দেশ করে : সাম্য ও ভ্রাতৃবন্ধন (equality and fraternity), এবং ফলে শাশ্বত আদর্শসমূহকে, যাদের বলা হয় ১৭৮৯ সালের আদর্শ, পুনরুজ্জীবিত করে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে।[৩]

অগস্ত কোঁত ও ভারতীয় চিন্তাবীরদের উপর তাঁর প্রভাব :

আদর্শ তিনটি ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই

১ Nivedita : Notes of Some Wanderings with Swami Vivekananda in the Himalayas, p. 55

২ কর্মযোগ

৩ Barker : Principles of Social and Political Theory, p 2

সম্প্রসারণের সূত্র বলে গণ্য। ১৭৮৯ সালে প্রযুক্ত হ'লে সূত্রটি কিন্তু মোটেই কার্যকর হয়নি।[৪] অসংখ্য নরনারী স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন শব্দ তিনটির মন্ত্রশক্তিকে বৃথাই আহ্বান করেছিল—দেবতা এসে দেখা দেননি। বিপ্লবের শেষে ফ্রান্সের সাধারণ লোকে একটা হিসাবনিকাশের চেষ্টা ক'রে দেখেছিল যে, 'আইনের চক্ষে একটা অস্পষ্ট সমতা (a vague equality in the eye of law) ব্যতীত জমার ঘরে আর কোন অঙ্কই লেখা হয়নি।[৫] সমাজ-দার্শনিকগণ তখন স্বাভাবিক ভাবেই বিজ্ঞানের (science) দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং 'সমাজের বিজ্ঞান' (the science of society) নামে শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানের কল্পনা করতে থাকেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত ছিল যে দর্শন মানবজীবনের উন্নয়নের জন্য সকল বিজ্ঞানের সার্থক সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নয়।[৬] শুরুতে দর্শনের ভিত্তি ছিল পরমার্থবাদ (theology) এবং তারপর অধ্যাত্মবিদ্যা (metaphysics)। অগস্ত কোঁতের (Auguste Comte—1798-1857) মতে উভয়ই হ'লো বালসুলভতার লক্ষণ ও 'রুদ্ধ সম্প্রসারণের দ্যোতক'। অন্যভাবে বলা যায় পরমার্থবাদ, অধ্যাত্মবিদ্যা এবং পৌরাণিক মন্ত্রতন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত এমন একটা 'নূতন ধর্মের' (a new religion) প্রয়োজন অনুভূত হ'য়েছিল যা মানবসমাজকে সকলের উর্ধ্বে স্থান দিয়ে মানুষের অন্তর্নিহিত পরার্থিতাকে (altruism) লালনপালনের মাধ্যমে বলিষ্ঠ করে তুলবে। মোটকথা, সম্প্রসারণের এক নূতন সূত্রের সন্ধান করা হ'য়েছিল এবং সমাজবিজ্ঞানীরা এর সন্ধান পেয়েছিলেন মানবসেবাধর্মের (religion of humanity) মধ্যে। মানবসেবাধর্মকে 'মানবধর্মের বিজ্ঞান'ও (the science of humanity)[৭] বলা হয়। কারণ এই ধর্ম ছিল নিরীশ্বরবাদী (a godless religion)। এই নূতন সূত্রটিও ফরাসী প্রতিভার অবদান। তুর্গো (Turgot) ও কোঁদরসেত (Condorcet) দ্বারা কল্পিত এবং সেন্ট সাইমন (Saint Simon) দ্বারা প্রতিপালিত হ'য়ে পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করবার জন্য সূত্রটি এল কোঁতের হাতে, এবং কোঁতই এর নাম দিলেন 'মানবসেবাধর্ম'। সমাজ-বিজ্ঞান (sociology) শব্দটিও তাঁর সৃষ্টি।

মানবসেবাধর্মের নূতন নাম হলো ধ্রুববাদ (positivism)।[৮] ধ্রুববাদ শীঘ্রই ইংলিশ প্রণালী অতিক্রম করে নূতন দেশে অনেক চিন্তাবীরকে প্রভাবিত করল। ইংলণ্ড থেকে ধ্রুববাদ এল ভারতে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মত মনীষীরা প'ড়লেন এর প্রভাবে। বস্তুত, ধ্রুববাদই ছিল বঙ্কিম যুগের সর্বাধিক প্রভাবশালী দর্শন।

হার্বার্ট স্পেনসার ও তাঁর প্রভাব:

দর্শনকে সকল বিজ্ঞানের সামান্যীকরণ (generalisation) হিসাবে গণ্য করে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই পথ চলতে লাগলেন, কিন্তু বেশীদিন যেতে না যেতেই

৪ Isaiah Berlin: Karl Marx—His Life and Environment, p. 59

৫ Laidler: History of Socialist Thought, p. 55

৬ Durant: The Story of Philosophy, 1953, p. 353

৭ Dunning: Political Theories, Vol VII, p 387

৮ Positivism-এর বাংলা 'প্রত্যক্ষবাদ' বা 'দৃষ্টবাদ' করা হয়।

প্রাধান্যলাভের জন্য বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে শুরু হ'ল প্রতিযোগিতা এবং অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিযোগিতায় জয়ী হ'ল জীববিদ্যা (Biology)। উনিশ শতকের মধ্যভাগ অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই সারা বিশ্বের চিন্তা-জগতে আলোড়ন আনল বিবর্তনবাদ এবং ১৮৫৯ সালে ডারউইন-এর Origin of the Species by Natural Selection প্রকাশিত হবার পর থেকে দার্শনিকগণ মানুষের সামাজিক সমস্যার সমাধানে উত্তরোত্তর জীববিদ্যার সূত্র প্রয়োগ করে চললেন। এই যুগের সর্বাধিক খ্যাত চিন্তাবীর হলেন হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer—1820-1903)। স্পেন্সার কতটা পরিণত ডারউইনবাদী হ'য়েছিলেন সে-সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকলেও, তাঁর উপর যে বিবর্তনবাদের প্রভুত প্রভাব ছিল সে-সম্বন্ধে বিতর্কের বিশেষ অবকাশ নেই।[৯]

স্পেন্সার সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক সমস্যাবিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করেছিলেন। তিনি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কতকগুলি পূর্বধারণা (preconceptions) নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে অবশ্যম্ভাবিরূপে তাঁর রচনায় কয়েকটি 'প্রাথমিক মূলসত্যের' (First Principles) সন্ধান পাওয়া যায়। এরূপ অন্যতম প্রাথমিক মূলসত্য হ'লো 'অজ্ঞেয়তত্ত্ব' (the Unknowable)। আমাদের কাছে যা পরিদৃশ্যমান তার পশ্চাতে বাস্তব নিশ্চয়ই কিছু আছে, কিন্তু তা কি তা আমরা জানতে পারি না—তা অজ্ঞেয়। সুতরাং অজ্ঞেয়র অনুসন্ধানে লিপ্ত না থেকে যা জ্ঞেয় দার্শনিকের কাজ হ'লো তারই সন্ধান করা। স্পেন্সারের মতে, এই জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে বিবর্তনবাদের মধ্যে। এই বিবর্তনবাদ জীববিজ্ঞানের বিবর্তনবাদ; সুতরাং উহা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় ও বিনাশেরও সূত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সমাজ বিবর্তিত হয় পরিবার থেকে গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠী থেকে উপজাতিতে, উপজাতি থেকে নগরীতে, নগরী থেকে রাষ্ট্রে, রাষ্ট্র থেকে সমবায়ে এবং শেষ পর্যন্ত কবি টেনিসনের ভাষায় 'বিশ্ব রাষ্ট্র-সমবায়ে' (the Federation of the World)।[১০] কেন্দ্রাভিগামী এই শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় হ'য়ে একদিন নিঃশেষ হ'য়ে যাবে। সমাজ তার ভাঙনের পথে চলবে। শাসন-ব্যবস্থা হবে দুর্বল এবং বিশৃঙ্খলা হয়ে দাঁড়াবে সংঘবদ্ধ মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য। তারপর সমাজের বিলুপ্তিতে ঘটবে বিবর্তনের পরিসমাপ্তি। তারপর আবার শুরু হবে জীবন-চক্রের পুনরাবর্তন। এই হ'লো স্পেন্সারের চক্রতত্ত্ব (Theory of Cycles)।

প্রাথমিক মূলসত্য (The First Principles):

প্রধানত, অজ্ঞেয়তত্ত্ব ও চক্রতত্ত্ব হলো স্পেন্সারের প্রাথমিক মূলসত্য (First priciples)। এই মূলসত্যগুলিকে কেন্দ্র করেই তাঁর সমগ্র দার্শনিক ধারণা গড়ে উঠেছে। এদের ভিত্তিতে রচিত বৃত্তান্ত চিত্তাকর্ষক হ'লেও করুণ রসে ভরপুর, কারণ তা মানুষের প্রচেষ্টার অকিঞ্চিৎকরতাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং শুধু ঈশ্বরকে নির্বাসিত করা নয়, মানুষের মর্যাদাও সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে এই প্রাথমিক মূলসত্যগুলি। সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মূল-

৯ History of Political Thought in England, p. 76

১০ Locksley Hall

সত্যগুলি মানুষকে বিবর্তনধারার সামিল হ'তেই বলে। বিবর্তনধারার কাছে দাসসুলভ নতি স্বীকার করতেই নির্দেশ দেয়। এই তত্ত্ব-প্রচারক বিবর্তনবাদী হার্বার্ট স্পেন্সার স্বামী বিবেকানন্দের যুগে প্রভাবশালী সমাজ-দার্শনিক হিসাবে কোঁতের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।[১১]

স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক ধ্যানধারণার পটভূমিকা ও তাঁর প্রাথমিক মূলসত্য :

স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক ধ্যান-ধারণার পটভূমিকা হ'লো বেদান্তের আলোতে ব্যাখ্যাত মানব-ঈশ্বর-সম্পর্ক (man-God relationship), জীববিজ্ঞান বা অন্য কোন বিজ্ঞান নয়। এই কারণে তাঁর কলেজ-জীবনে স্বামীজী স্পেন্সারের প্রভাবে পড়া সত্ত্বেও এবং তাঁর সামাজিক ধ্যানধারণায় স্পেন্সারের প্রভাব কিছুটা লক্ষ্য করা গেলেও স্পেন্সারের প্রাথমিক মূলসত্যগুলি এবং স্বামীজীর প্রাথমিক মূলসত্যগুলি মূলত পরস্পর-বিরোধী। স্পেন্সারের প্রতিপাদ্য বিষয় হ'লো, মানুষ বিবর্তনধারার অংশীভূত বলে বিনাশাভি-মুখী জীব; অপরপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হ'ল যে, মানুষ ঐশী শক্তিরই আধার এবং ফলে তার পক্ষে সচেতন ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা পূর্ণাঙ্গতা (perfection) লাভ করা সম্পূর্ণ সম্ভব। অতএব, মানুষ প্রকৃতির কাছে দাস-সুলভ আত্মসমর্পণ করবে না, বরং 'যুদ্ধং দেহি' ভাব নিয়ে প্রকৃতির সম্মুখীন হবে। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে আসে স্পেন্সারের সমসাময়িক প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী টমাস হেনরি হাক্সলীর (T. H. Huxley 1825 95) কথা, 'যা কিছুকেই আমরা প্রগতি বলি, প্রকৃতির কার্যপদ্ধতি তার বিরোধী', ('the course of nature is in opposition to everything that we call progress')[১২]—অর্থাৎ বিবর্তনের সামিল হ'য়ে নয়, বিবর্তনের বিরোধিতা করেই মানুষ সকল ক্ষেত্রে তার জয়যাত্রায় অগ্রসর হ'য়েছে। স্বামী বিবেকা-নন্দের মতে, এই যাত্রা আবার বিরতিবিহীন, কারণ পূর্ণাঙ্গতায় না পৌঁছানো পর্যন্ত যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে না। অতএব ক্ষয়, পতন বা বিনাশের কোন কথা নেই, কথা হলো শুধু পূর্ণাঙ্গতার লক্ষ্যাভিমুখে যাত্রার। এইরূপ মহান ধারণা ও বলিষ্ঠ আশাবাদের উদাহরণ সমাজদর্শনে অপূর্ব বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা হবে।

স্পেন্সারের আশাবাদ :

আশ্চর্যের বিষয় যে, স্পেন্সারের সমাজ-দর্শনেও আশাবাদের অভাব নেই। বিবর্তন ও প্রগতিকে অভিন্ন প্রমাণ করেই তিনি এই আশাবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই অভিন্নতার ভিত্তিতে তিনি উক্তি করেন যে: "আদর্শ ব্যক্তির পূর্ণ পরিণতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই" ("the development of the ideal man is certain")।[১৩] বিবর্তনের পথে সমাজ উত্তরোত্তর রাজনৈতিক পদ্ধতি (political means) পরিত্যাগ করে অর্থনৈতিক পদ্ধতি (economic means) গ্রহণ করে। ফলে বিবদমান জনগোষ্ঠিসমূহ অবাধ উদ্যোগাধীন শিল্প-ব্যবস্থার পথে চলে। কিছু পরে আসে

---

১১ Rolland: Prophets of the New India, p 175.

১২ Universal History of the World, Vol viii. p 5088

১৩ Social Statics

স্থিতিশীল শান্তির অবস্থা, যার মাধ্যমে মানুষ ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সম্পূর্ণ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ভারসাম্যের অবস্থায় মানুষের নৈতিক চেতনা হয় সম্প্রসারিত এবং তার ফলে দেখা যায় সামাজিক আদর্শে প্রভূত রূপান্তর। স্বাজাত্যাভিমান পরিশুদ্ধ হ'য়ে দেশভক্তিতে পরিণত হয়। জনগোষ্ঠিসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের অবসান ঘটে, ধর্মের ক্ষেত্র থেকে কুসংস্কার বিদায় গ্রহণ করে এবং 'আবশ্যিক সহযোগিতার' (compulsory cooperation) স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় 'স্বাধীনতার ভিত্তিতে সহযোগিতা' (cooperation in liberty)।[১৪] ফলে স্ত্রীজাতির মুক্তির দ্বার খুলে যায় -তার জন্য সংগ্রাম করতে হয় না।[১৫]

শুধু স্পেন্সারের নয়, তাঁর সমসাময়িক সকল দার্শনিকেরই ছিল অমোঘ প্রাকৃতিক আইনের (immutable natural law) অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে অবশ্যম্ভাবী প্রগতিতে অপরিমেয় বিশ্বাস। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ভাষায়, "উনিশ শতকে বিশ্বজনীন আইনের অন্যতম প্রধান সূত্র হিসাবে প্রগতিতে বিশ্বাসপ্রবণতা ছিল অতি প্রবল।"[১৬] এই কারণে মার্ক্স প্রমুখ দার্শনিকগণ নৈতিক চিন্তাকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মার্ক্সের সিদ্ধান্ত ছিল যে, সমাজবাদ (socialism) যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তা নিশ্চয়ই উন্নয়নের সূচক বলে গণ্য হবে। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, সকল শ্রেণীর লোকই—বিশেষ করে ভূস্বামী ও পুঁজিপতিরা—একে উন্নয়ন বলে মনে করবে না। কিন্তু মার্ক্সের মতে তাদের এই মনোভাব শুধু প্রমাণিত করবে যে, তারা সময়ের দ্বন্দ্বশীল গতিপথ থেকে বিচ্যুত ('they are out of harmony with the dialectic movement of time')। এই ধারণা উদ্দেশ্যবাদেরই (teleology) দ্যোতক। যে উদ্দেশ্যবাদ মার্ক্সের মত নিরীশ্বরবাদীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।[১৭]

স্পেন্সার অবশ্য নৈতিক প্রশ্নকে মোটেই পরিহার করেননি। বস্তুত উচ্চ নৈতিক আদর্শ তাঁর আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যপ্রস্তর এবং এই নৈতিক আদর্শের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন বিবর্তনবাদের মধ্যেই। তাঁর মতে, বিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থা উচ্চ স্তরে উন্নীত হ'লে সম্ভূত পরার্থিতা (altruism) মানুষের স্বার্থপরতাকে দমিত রাখবে এবং সংঘবদ্ধ জীবন-পদ্ধতির দরুন পারস্পরিক সহায়তার (mutual aid) পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। অতএব, ইতিহাসের গতি হ'লো উচ্চ নৈতিক আদর্শ-সৃষ্টির দিকে।

যদি তাই-ই হয় তবে শিক্ষা ও সমাজসেবার অগ্রগমনকে (process) কি দ্রুততর করা যায় না? স্পেন্সারের সুস্পষ্ট উত্তর হলো, 'না'। তার মতে, শিক্ষা ব্যতিরেকেও মানুষ সমাজের সুযোগ্য হিসাবে গণ্য হতে পারে, কারণ নৈতিক চেতনার বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হয় না এবং সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধের সঙ্গে অজ্ঞতার কোন সম্পর্ক নেই।[১৮]

স্পেন্সার সমাজসেবামূলক কার্যপদ্ধতির ঘোরতর বিরোধী, কারণ যে স্বাভাবিক

১৪ Durant, op. cit, p 381

১৫ Isaiah Berlin, op. cit, p 30

১৬ History of Western Philosophy, p 816

১৭ Ibid.

১৮ Joad: Modern Political Theory, pp. 295-96

নির্বাচন প্রক্রিয়ার (process of natural selection) মাধ্যমে আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এই কার্যপদ্ধতি ঐ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

এখন দেখা যাক স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে স্পেন্সারের এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কোথায়। একাধিক কারণে এই অনুসন্ধানকার্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, স্বামী বিবেকানন্দের সময়ে স্পেন্সারই ছিলেন সর্বাধিক প্রভাবশালী সমাজদার্শনিক। দ্বিতীয়ত, স্পেন্সারের কয়েকটি তত্ত্ব পরিবর্তিত আকারে স্বামীজীর সমাজদর্শনে স্থান পেয়েছে। [ক্রমশঃ]

আহ্বান

শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়ুয়া

"বর্ষাবাস হলো শেষ"—ভিক্ষুগণে ডাকি
করিলেন প্রভু বুদ্ধ প্রসারিয়া আঁখি—
"পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্নাসুধা দানি
সঞ্জীবিত করিতেছে অশেষ পরাণি ;
তেমতি হে ভিক্ষুগণ, জীবের কল্যাণ-
ব্রত করি দিকে দিকে করো আত্মদান।
জ্ঞানদীপ্ত যাত্রাপথে ভয় কিছু নাহি
আপনারে ঢেলে দিয়ে ওঠো সবে গাহি
মুক্তপক্ষ পক্ষী সম। চতুর্দিকে চল
আর্তনাদে যন্ত্রণায় ধরিত্রী চঞ্চল :
পথে পথে, জনে জনে দাও আলো, আশা
পতিতের দুঃখিতের তোমরা ভরসা,
সদ্ধর্মের মর্মবাণী করো প্রসারণ
ওই শোনো ব্যথিতের করুণ ক্রন্দন।
কি বেদনা বুকে নিয়ে চলে আজীবন
নাহি শান্তি, সান্ত্বনার নাহি যে বচন।
প্রেম দাও প্রতি জনে, মোছ নেত্রনীর,
বর্ণ গোত্র ভেদ ভুলে তারা উচ্চশির
আসুক পতাকাতলে। স্নেহে ডাক, ভাই,
যতনে আদরে কহ, কোন দুঃখ নাই,
আসিয়াছি, আসিয়াছি তব সেবা তরে,
তুমি বীর, তুমি শক্তি, তব শুভ্র করে
তোমার মঙ্গল, মুক্তি। আরাধনা বিনা
অমৃতের আস্বাদন কভু লভিবে না।
অহর্নিশ পুণ্যকর্ম করিয়া বরণ
চিত্তের কলঙ্কক্লেশ করহ শোধন।
দুঃখের জনম-মূল করি উৎপাটন
জ্ঞানজ্যোতি, শান্তিসুধা কর বিতরণ।"

ভারতের বনপ্রান্তে কোন জ্যোৎস্নারাতে
প্রেমঘন তথাগত শতভিক্ষু সাথে
উচ্চারিল মৈত্রীমন্ত্র জগৎকল্যাণ—
আজো সেই মহাবাণী জানায় আহ্বান।

দুর্গতের চিরসাথী, মহাযাত্রী তুমি
জাগো হৃদে, ধন্য পূর্ণ কর চিত্তভূমি।

বর্ষ-বরণ

শ্রীআশুতোষ দাশ

অমিয় মাখায়ে, ধরণীর কায়ে, প্রদানিয়া প্রিয় স্পর্শ,
হরিয়া তাহার যত আবিলতা শ্রান্তি
আলোকে ভরায়ে, পুলক ছড়ায়ে, এসো তুমি নব বর্ষ
ভরিয়া পাত্র নিয়ে সফলতা শান্তি।
প্রভাতের রবি, এসো প্রিয় কবি, সাথে তব নব রচনা,
অসীমের বাণী অনুপম অভিনব।
অতীতের তুমি সমাপন লিপি, আগামীর শুভ সূচনা,
শুনাও জগতে জীবন-মন্ত্র তব।
পথহারা কত প্রবাহের ধারা ফিরিছে সাথীরে ডাকি,
জোগাইয়া বারি বাড়াও তাদের গতি।
হতাশা নিশায় হারায়েছে দিশা, কত শত ম্লান আঁখি,
তোমার পরশে টুটে যাবে বিস্মৃতি।
নীরব যে বাঁশী, বেদনার রাশি গুমরিছে যার বুকে,
তোমার কুশল করের করুণা লভি
আবার বাজিবে, রাগিণী জাগিবে, উছলিবে মনোসুখে,
সুরের দোলায় ফুটিবে শোভন ছবি।
বাঞ্ছিত তুমি, বরণীয় তুমি, অসীমের কিছুখানি ;
অভয় আশিস্, অমৃতের তুমি স্পর্শ ;
অজানা তোমায় জানিতে বাসনা, পরশিতে তব পাণি ;
প্রণতি তোমায়, ওগো শুভ নব বর্ষ।

তথাগতের মহানির্বাণলাভের পূর্বের তিনমাস

'জিজ্ঞাসু'

বুদ্ধদেব প্রায় ৮০ বছর বয়সে কুশিনারা নগরের শালবনে পরিনির্বাণ লাভ করেন। এর ঠিক আগের তিন মাসের ঘটনাবলী সংক্ষেপে পালিগ্রন্থ 'মহাপরিনির্বাণ সুত্তে' বিধৃত রয়েছে।

বুদ্ধদেব ভারতের যে অংশে জন্মলাভ করেন (কপিলাবাস্তু—বর্তমান নেপালের অন্তর্গত), যেখানে সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করেন (বুদ্ধগয়া), যে স্থানে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন (রাজগৃহ ও বারাণসী) এবং অন্তিম তিন মাস যে-সব অঞ্চল পরিভ্রমণ ক'রে কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন, সেই স্থানগুলি প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহকে কেন্দ্র ক'রে একটি পরিমণ্ডলে অবস্থিত। এই রাজগৃহে রাজা বিম্বিসার শ্রীবুদ্ধের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁর পুত্র অজাতশত্রু বৈদিকধর্ম রক্ষার জন্য পিতার বিরুদ্ধাচরণ ও বুদ্ধদেবের অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা করেন। আবার এই রাজগৃহেই জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর সাধনা ও সিদ্ধিলাভ এবং অন্তিম সমাধি প্রাপ্ত হন। বুদ্ধদেব তাঁর জীবনের শেষ তিনমাস কাল কিভাবে কখনও রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে থেকে, কখনও গ্রামে-গ্রামে, জনপদে জনপদে ভ্রমণ ক'রে ভিক্ষু সংঘের বুনিয়াদ দৃঢ় করতেন ও ভক্ত শিষ্যদের মনোবাঞ্ছা পূরণ ক'রে বেড়াতেন —তারই বিবরণ উক্ত গ্রন্থটিতে আছে তার কয়েকটি মাত্র এখানে আহৃত হল।

সংঘরক্ষার উপায়:

হাজার হাজার ভিক্ষু বুদ্ধদেবের শরণ নিচ্ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছিল। বুদ্ধদেব তাঁর অবর্তমানে সংঘকে দৃঢ়বদ্ধ রাখার জন্য একদিন আয়ুষ্মান আনন্দকে ডেকে বললেন—'রাজগৃহের কাছাকাছি যে-সব ভিক্ষু আছেন, তাঁদের সকলকে ডেকে উপস্থানশালায় (বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণার্থ নির্দিষ্ট গৃহে) সমবেত কর।'

আনন্দ আদেশ পালন করলেন, তথাগত সেখানে গিয়ে বললেন—"ভিক্ষুগণ, হানি-নিবারক কয়েকটি নিয়ম বলব, শোন—যতদিন তোমরা মাঝে মাঝে পূর্ণ সভায় অভিন্ন হৃদয় নিয়ে মিলিত হবে, একসঙ্গে উত্থান (শয্যাত্যাগাদি) করবে ও সংঘের কর্তব্যসকল একমনা হয়ে সম্পাদন করবে, যতদিন তোমরা পূর্ব ব্যবস্থাপিত বিধিসকল বর্জন না করবে, (প্রয়োজনমত) নূতন বিধিসকল প্রবর্তন ও গ্রহণ করবে এবং পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত অনুশাসনগুলি মেনে চলবে, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের উন্নতি হবে, হানির আশংকা নাই।"

"যতদিন তোমরা স্থবির, বহুদর্শী, দীর্ঘকাল প্রব্রজ্যা-অবলম্বনকারী সংঘপিতা ও সংঘনেতা ভিক্ষুদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং তাঁদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাবে এবং তাঁদের ভরণ-পোষণ করবে, তাঁদের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে শুনবে, যতদিন তোমরা পুনর্জন্মের জনক বাসনার বশবর্তী না হবে, যতদিন তোমরা আরণ্যবাসের একান্ত পক্ষপাতী থাকবে ও প্রত্যেক স্মৃতিকে এরূপ উপস্থিত রাখবে যে, অনাগত মৃদুস্বভাব পবিত্রচরিত্র ব্রহ্মচারীরা তোমাদের কাছে আসবে এবং যারা আসবে,

তারা বেশ সানন্দচিত্তে বাস করবে—ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের উন্নতির আশা করা যায়।"

"যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা বিষয়াসক্ত না হবে... বৃথা আলাপে সময়ক্ষেপ না করবে···, যতদিন পর্যন্ত তারা নিদ্রালু, নিন্দাপ্রিয় না হবে···, যতদিন পর্যন্ত সামান্য আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ ক'রে সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বাণসাধনে বিরত না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের উন্নতির আশা করা যায়, ততদিন তাদের হানির আশংকা নাই।"

"যতদিন ভিক্ষুদের শ্রদ্ধা, হ্রী, অনুতাপ, বহুশাস্ত্রজ্ঞতা ও বীর্য থাকবে, যতদিন তারা অপ্রমত্ত বা প্রজ্ঞাবান থাকবে, ততদিন তাদের উন্নতির আশা করা যায়, হানির আশংকা নাই।"

"যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা সাতটি বোধ্যঙ্গ অর্থাৎ স্মৃতি, অনুসন্ধান, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রদ্ধি (শান্তভাব), সমাধি ও উপেক্ষা সাধন করবে, ততদিন তাদের উন্নতি হবে, আশা করা যায়।"

"যতদিন ভিক্ষুরা অনিত্যতা, অনাত্মতা অনুভব করবে, দুঃখে অপ্রমত্ততা এবং ত্যাগ, বৈরাগ্য, নিরোধ (চিত্তবৃত্তিনিরোধ) ও ধ্যান সাধনা করবে, ততদিন তাদের উন্নতির আশা করা যায়, হানির আশংকা নাই।"

"যতদিন ভিক্ষুরা প্রকাশ্যে বা গোপনে সদ্ভাবে সাধুদের সেবা করবে, ততদিন তাদের উন্নতি হবে আশা করা যায়।"

"যতদিন ভিক্ষুরা বর্গের (সংঘের) নিয়মানুসারে সকল সামগ্রী, এমন কি ভিক্ষাপাত্রে লব্ধ আহার্যদ্রব্যসকল শীলবান সাধুদের সঙ্গে সমান বিভাগ করে গ্রহণ করবে, ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি হবে আশা করা যায়, অবনতির আশংকা নাই।"

"যতদিন ভিক্ষুরা প্রকাশ্যে ও গোপনে সাধুদের সঙ্গে অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অবিমিশ্র, মুক্তিপ্রদ, বিজ্ঞজনপ্রশংসিত, অকলঙ্কিত ও সমাধি-প্রবর্তক বিধিসকল মেনে চলবে এবং যতক্ষণ ভিক্ষুগণ সাধুসঙ্গে বাস করবে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে সেই শ্রেষ্ঠ ও পরিত্রাণপ্রদ বিশ্বাস রক্ষা করবে, যাতে দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়, ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের উন্নতির আশা করা যায়, অবনতির আশংকা নাই।"

শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা :—

গৃধ্রকূট পর্বতে, অম্বলট্ঠিকায়, নালন্দা ও অন্যান্য স্থানে অবস্থানের সময় বুদ্ধদেব ভিক্ষুদের কাছে বলেছিলেন—

১। শীল শব্দের অর্থ শুদ্ধ চরিত্র। শীল-দ্বারা সুপরিশুদ্ধ সমাধিতে মহাফল ও মহালাভ হয়।

২। সমাধি দ্বারা সুপরিশোধিত প্রজ্ঞাতে মহাফল ও মহালাভ হয়।

৩। প্রজ্ঞা দ্বারা চিত্ত সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করে।

৪। দুঃখ বলতে কাম, অস্মিতা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা এই চারটিকে বোঝায়। প্রজ্ঞা বলতে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানকে বোঝায়। এর অপর নাম সম্বোধি।

সপ্তবোধ্যঙ্গ :

শ্রীবুদ্ধ যে সম্যক্ সম্বোধি লাভ করেছিলেন, তা নিজ মুখে ব্যক্ত করেন এবং সেই সম্বোধি-লাভের সাতটি অঙ্গ এইভাবে বর্ণনা করেন : ১। স্মৃতি, ২। ধর্মবিচার, ৩। বীর্য, ৪। প্রীতি, ৫। প্রশ্রদ্ধি, ৬। সমাধি, ৭। উপেক্ষা।

পাটনা ও শ্রীবুদ্ধ :

বর্তমান পাটনার নাম শ্রীবুদ্ধের সময় ছিল পাটলিগ্রাম। তখনও তার নাম পাটলিপুত্র হয়নি। বুদ্ধদেব একবার বহু-

সংখ্যক ভিক্ষু ও প্রিয় শিষ্য আনন্দের সঙ্গে পাটলিগ্রাম যান। সেখানকার উপাসকদের প্রার্থনায় তিনি আবসথাগারে অবস্থান করতে সম্মত হন। উপাসকরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আবসথাগারটি জলকুম্ভ, তৈলদীপাদি দ্বারা সাজালেন এবং তথাগতকে সেখানে আহ্বান করলেন। তথাগত সন্ধ্যাকালে চীবর ও ভিক্ষাপাত্র নিয়ে সেখানে গেলেন এবং পাদ প্রক্ষালন ক'রে বিশ্রামাগারে ঢুকলেন। আগারটির মাঝখানে একটি স্তম্ভ ছিল, শ্রীবুদ্ধ সেই স্তম্ভে ঠেস দিয়ে পূর্বদিকে মুখ ক'রে বসলেন। ভিক্ষুরাও হাত-পা ধুয়ে ঘরে ঢুকে পশ্চিমদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে পূর্বমুখ হয়ে বসলেন। তখন উপাসকরা পা ধুয়ে ঘরে ঢুকে পূর্বদিকের দেয়াল পেছনে রেখে তথাগতের দিকে মুখ ক'রে বসলেন।

শ্রীবুদ্ধ এখানে শীল সম্পর্কে বলেন—দুঃশীল ব্যক্তির ৫ প্রকারের অপকার হয়। যেমন—(১) দুঃশীল ব্যক্তি আলস্যবশতঃ মহাদারিদ্র্যে পতিত হয়। (২) তার নিন্দা করতে থাকে সবাই। (৩) সে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ বা শ্রমণ যাঁদের কাছেই যায়, তাকে উদ্বিগ্ন ও অপ্রতিভভাবে ঢুকতে হয়। (৪) সে মূঢ় অবস্থায় দেহত্যাগ করে। (৫) সে মৃত্যুর অপায়, দুর্গতি, অধঃপতন ও নরক প্রাপ্ত হয়। শীলবান সৎকর্মকারী ব্যক্তির পাঁচটি লাভ সম্পর্কে তথাগত বলেন—(১) তিনি অনলস হয়ে বহু ধন লাভ করেন। (২) তাঁর সকলেই সুনাম করে। (৩) তিনি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ বা শ্রমণ যাঁদের ভেতরই যান, অপ্রতিভ ও অনুদ্বিগ্ন চিত্তে যান। (৪) তিনি সচেতন ভাবে দেহত্যাগ করেন। (৫) দেহত্যাগের পর তিনি উত্তম গতি ও স্বর্গলাভ করেন।

অনেক রাত্রে উপদেশ শ্রবণের পর উপাসকগণ স্ব-স্ব-গৃহে ফিরে গেলেন এবং ভগবানও শয্যাগ্রহণ করলেন। তথাগত দিব্য-চক্ষে পাটলিগ্রামে সহস্র সহস্র দেবতার বাস দেখতে পেয়েছিলেন এবং আনন্দকে বলেছিলেন—"আমি গতরাত্রে দিব্যনেত্রে দেখেছি যে, ত্রয়ত্রিংশ সহস্র সহস্র দেবতা এই গ্রামে বাস করছেন। যেখানে প্রবল-প্রতাপ দেবতারা বাস করেন, সেখানে তাঁরা প্রবলপ্রতাপশালী রাজা ও রাজমন্ত্রীদের মনকে সেখানে বাসস্থান তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করেন। এই পাটলিপুত্র নগর মহানগর ও বাণিজ্যস্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে। কিন্তু অগ্নি, জল ও অন্তর্বিবাদ—এই তিন অন্তরায় এর থাকবে।

ভক্তদের নিমন্ত্রণ স্বীকার :

শ্রীবুদ্ধ তাঁর অনুগামীদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য তাঁদের আন্তরিক নিমন্ত্রণ প্রায় প্রত্যাখ্যান করতেন না, তা নিমন্ত্রণ-কারী যে স্তরেরই লোক হোক না কেন। ভিক্ষুসংঘও তাঁর সঙ্গে নিমন্ত্রিত হ'ত। এমনকি শ্রীবুদ্ধ একবার বৈশালী নগরে উপস্থিত হয়ে গণিকা অম্বাপালিকার নিমন্ত্রণও গ্রহণ করেছিলেন। তার আম্রকাননে বুদ্ধদেব এসে অবস্থান করছেন শুনতে পেয়ে অম্বা-পালিকা বহু শকটে নানা উপহারদ্রব্য সাজিয়ে নিয়ে প্রভুর কাছে যায়। ওদিকে লিচ্ছবিরাও বহু শকট নিয়ে প্রভুর কাছে আসে। লিচ্ছ-বিদের ও অম্বাপালিকার শকটে শকটে ঠোকা-ঠুকি হয়। লিচ্ছবিরাও শ্রীবুদ্ধকে ঐদিন নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু তৎপূর্বেই তিনি অম্বাপালিকার নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছিলেন। কাজেই অম্বা-পালিকার জয় হয়। সে প্রভুকে স্বগৃহে নিয়ে গিয়ে পরম সমাদরে খাদ্য-সামগ্রী পরিবেশন করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যুবক লিচ্ছ-

বিরা অম্বাপালিকাকে শত সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বুদ্ধদেবের নিমন্ত্রণটি ক্রয় ক'রে নেওয়ার প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু অম্বাপালিকা বলেছিল—'তোমরা যদি সমগ্র বৈশালী রাজ্যও আমাকে দিয়ে দাও, তবু প্রভুর নিমন্ত্রণ ত্যাগ করতে পারব না।' এরপরও লিচ্ছবি-যুবকরা শ্রীবুদ্ধের কাছে গিয়ে পরদিন নিমন্ত্রণ স্বীকার করার জন্য তাঁকে ধরাধরি করেছিল, কিন্তু তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন—"আমি তো আগে অম্বাপালিকার নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছি। তার অন্যথা হবে না।" যুবকরা আঙুল নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল—'ও! অম্বাপালিকার কাছে আমরা পরাজিত হলাম, প্রবঞ্চিত হলাম।' পরে তারা ভগবানের কাছে ভক্তি ও প্রণতি জানিয়ে বিদায় নিল।

ধর্মাদর্শলাভের ফল :

একদা বুদ্ধদেব মহাবনে কূটাগারশালায় আহূত ভিক্ষুদের সম্বোধন ক'রে বলেন—

"আমি যে ধর্ম জ্ঞাত হয়ে তোমাদের উপদেশ দিয়েছি, তা উত্তমরূপে আয়ত্ত ক'রে পূর্ণরূপে আচরণ কর। সে-বিষয়ে গভীর চিন্তা কর, তৎসমুদয় সর্বত্র বিস্তার (প্রচার) কর। এই ব্রহ্মচর্য স্থায়ী হয় এবং চিরদিন বিদ্যমান থাকে। এর দ্বারা বহু লোকের সুখ হয়, লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ হয়, দেবতা ও মনুষ্যের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।"

"আমি যে ধর্ম স্বয়ং জ্ঞাত হয়ে তোমাদের উপদেশ দিয়েছি—তা কি? কোন্ ধর্ম তোমরা উত্তমরূপে আচরণ করবে, পূর্ণরূপে আচরণ করবে, গভীর চিন্তা করবে, তোমরা সর্বত্র বিস্তার (প্রচার) করবে—এই ব্রহ্মচর্য স্থায়ী হয় এবং চিরদিন বিদ্যমান থকে, এর দ্বারা বহু লোকের হিত হয়, বহু লোকের সুখ হয়, লোকের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ হয় এবং দেবতা ও মনুষ্যগণের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাদের হিত ও সুখ হয়? সে ধর্ম হচ্ছে এই—

(১) চতুর্বিধ স্মৃত্যুপস্থান অর্থাৎ গভীর আত্মচিন্তা।

(২) চতুর্বিধ পাপনিরোধ (পাপের সঙ্গে সংস্রবত্যাগ)

(৩) চতুর্বিধ ঋদ্ধিপদ (যোগবলসাধন বা যোগবিভূতিলাভ)

(৪) পঞ্চেন্দ্রিয়বল (পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শক্তিলাভ)

(৫) সপ্তবিধ জ্ঞান (সপ্তবোধ্যঙ্গ)

(৬) মহৎ অষ্টাঙ্গ মার্গ।"

"হে ভিক্ষুগণ, আমি এইসকল ধর্ম স্বয়ং উপলব্ধি ক'রে তোমাদের উপদেশ দিয়েছি। তোমরা এই ধর্ম উত্তমরূপে আয়ত্ত কর, সাধন কর, এ বিষয়ে গভীর চিন্তা কর। তোমরা সর্বত্র প্রচার কর যে, এই ব্রহ্মচর্য স্থায়ী হয় ‥ ‥" ইত্যাদি পূর্ববৎ।

পরিনির্বাণের পূর্বে :

(ক) পরিনির্বাণের সূচনা

অতঃপর শ্রীবুদ্ধ আরও বললেন—"সকল প্রকার জাত বস্তুই বয়োধর্মের অধীন, অতন্দ্রিতভাবে নির্বাণ-সাধন কর। অচিরে তথাগত পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত হবেন। আজ থেকে তিনমাসের পর তথাগতের মৃত্যু হবে।" একদিন বৈশালীতে ভিক্ষা করার পর আনন্দকে বলেছিলেন—"আনন্দ, বৈশালী নগরের প্রতি এই আমার শেষ দৃষ্টিপাত।"

বুদ্ধদেব যখন চাপাল মন্দিরে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন, তখন অতি ভীষণ লোমহর্ষণ এক মহা ভূমিকম্প হয়। ঐ ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে আনন্দ জিজ্ঞাসা করায় তিনি মহাভূমিকম্পের ৮টি

কারণ নির্দেশ করেন। তন্মধ্যে সপ্তম ও অষ্টম কারণ হচ্ছে—যখন কোন তথাগত স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাতভাবে নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল ত্যাগ করেন, আর যখন কোন তথাগত কোনরূপ উপাধি অবশিষ্ট না রেখে পরিনির্বাপিত হন, তখন পৃথিবী কম্পিত, সঞ্চালিত ও ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হয়। এই উক্তি নিশ্চিতরূপে আসন্ন পরিনির্বাণের সূচক।

(খ) মারের কার্য :

পাপাত্মা মার শ্রীবুদ্ধকে তাঁর সম্বোধিলাভের ঠিক পরেই পরিনির্বাণলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। এ-সম্পর্কে শ্রীবুদ্ধের নিজ মুখের উক্তি—"হে আনন্দ, সম্বোধি লাভ করার অল্প কাল পরে একদা আমি উরুবিল্ব গ্রামে নিরঞ্জনানদীতীরে অজপাল-ন্যগ্রোধে অবস্থান করছিলাম, তখন মার আমার কাছে এসে এক পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল—'ভগবান সুগত, এখন আপনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হোন, অস্তিত্ব থেকে মুক্ত হোন।' আমি তার কথা শুনে বলেছিলাম—"পাপাত্মা মার, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুণীগণ, উপাসকগণ, উপাসিকাগণ প্রকৃত শ্রাবক-শ্রাবিকা (শিষ্য-শিষ্যা) না হয়, জ্ঞানী, বিনীত বহুশাস্ত্রজ্ঞ, সত্যধর্মজ্ঞ, বিনয়ধর, বিশেষ ও সাধারণ ধর্মানুষ্ঠানকারী, বিশুদ্ধ জীবন ও ধর্মানুসারে জীবনযাত্রানির্বাহকারী না হয় এবং যতদিন স্বয়ং ধর্ম আচরণ ক'রে অন্যকে বলতে ও উপদেশ দিতে না পারে, অন্যকে বুঝিয়ে দিতে, সত্য প্রকাশ করতে, বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করতে, পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যা করতে না পারে এবং যতদিন মিথ্যা প্রবাদ ধর্ম উপস্থিত হলে তারা সত্যের দ্বারা পরাজিত ও খণ্ডিত ক'রে এই অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন সত্যধর্ম প্রচার করতে সমর্থ না হয়, ততদিন আমি অস্তিত্ব ত্যাগ করব না। যতদিন এই ব্রহ্মচর্য-ধর্ম প্রভাবশালী, বর্ধনশীল ও বহুবিস্তৃত জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত না হয়, যতদিন তা মনুষ্যদের কাছে সুপ্রকাশিত না হয়, ততদিন আমি অস্তিত্ব থেকে চলে যাব না।"

'আজ আমি যখন চাপাল মন্দিরে বসেছিলাম, তখন পাপাত্মা মার আবার কাছে এসে বলল—'ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করুন'—ইত্যাদি। মারের কথা শুনে তাকে আমি বললাম—'পাপাত্মা, শুনে আনন্দ লাভ কর যে, তথাগত অচিরে পরিনির্বাণ লাভ করবেন। আজ থেকে তিন মাস পরে আমি অস্তিত্ব (জীবন) ত্যাগ করব'।"

(গ) ভিক্ষুদের প্রতি অন্তিম উপদেশ

পরিনির্বাণের কিছু পূর্বে একদা শ্রীবুদ্ধ আনন্দ-প্রমুখ ভিক্ষুদের সম্বোধন ক'রে বললেন—

"আমি দেহত্যাগ করলে তোমাদের হয়ত মনে হবে—আমাদের শাস্তা তো আর নাই, প্রবচন শেষ হয়েছে, আমাদের শিক্ষাদাতা আর কেউ নাই। কিন্তু এরূপ মনে করা ঠিক হবে না। আমি তো তোমাদের সকলের কাছে ধর্মবিধি ও সাধনবিধি বর্ণনা করেছি। আমি চলে গেলেও সেগুলিই তোমাদের শাস্তা বা শিক্ষক হবে।"

"এ পর্যন্ত ভিক্ষুরা পরস্পরকে বন্ধু বলে সম্বোধন ক'রে এসেছেন। এখন থেকে বর্ষীয়ান ভিক্ষুরা অল্পবয়স্ক ভিক্ষুদের নাম ধ'রে বা গোত্রের নাম ধ'রে বা আবুসো (বন্ধু) ব'লে ডাকবে। আর নবীনতর ভিক্ষু প্রাচীনতর ভিক্ষুকে ভন্তে বা আয়ুষ্মান্ ব'লে সম্বোধন করবে।"

"ভিক্ষুরা আমার দেহত্যাগের পর ইচ্ছা করলে ছোটখাট নিয়মগুলি ত্যাগ করতে

পারে।"

এরপর বুদ্ধদেব ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে আবার বললেন—"বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, মার্গ, বা প্রতিপদ (পথ) বিষয়ে তোমাদের একজনেরও যদি কোন সংশয় থাকে, তবে আমাকে প্রশ্ন কর। নতুবা হয়ত পরে তোমরা অনুতাপ করবে এই ব'লে যে, আমাদের শাস্তা সম্মুখে যখন ছিলেন, তখন আমরা সন্দেহ দূর করিনি।"

কিন্তু ভিক্ষুরা কেউ কোন প্রশ্ন করলেন না, চুপ ক'রে রইলেন। বুদ্ধদেব দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার সেই একই কথা বললেন। তবু ভিক্ষুরা নীরব হয়ে রইলেন।

আবার শ্রীবুদ্ধ বললেন—"তোমরা নিজেরা যদি সঙ্কোচ বোধ কর, তবে অপরকে দিয়ে প্রশ্ন কর।" তাতেও তাঁরা নিরুত্তর রইলেন।

এই দেখে আনন্দ ব'লে উঠলেন—'আমার মনে হচ্ছে—কারুরই কোন সন্দেহ নেই।'

তথাগত বললেন—"আনন্দ, তুমি তোমার বিশ্বাসের কথা বলছ। আমিও জানি—এই পাঁচশত ভিক্ষুর কারুরই বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ ও মার্গ সম্পর্কে কোন সন্দেহ বা দ্বিধা নাই। এরা সকলেই পরিত্রাণের স্রোতে পতিত হয়েছে, এরা দুঃখ-পূর্ণ জন্মের অতীত স্থান লাভ করেছে, এদের সম্বোধিলাভ নিশ্চয় হয়েছে।"

অতঃপর ভগবান ভিক্ষুসংঘকে বললেন—"তোমরা সাবধান হয়ে শোন। আমি বলছি—সকল যৌগিক বস্তুই ক্ষয়শীল, একাগ্রচিত্তে তোমরা সাধনা ক'রে যাও।"

পরিব্রাজক সুভদ্র ও বুদ্ধ

এমন সময় সুভদ্র নামক এক প্রাচীন পরিব্রাজক আনন্দকে এসে বললেন—'আমি তথাগতের কাছে শিক্ষালাভ করতে চাই।' কিন্তু আনন্দ বললেন—'আর না।' তবু সুভদ্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার আগ্রহ দেখালেন। আনন্দ বললেন—'আর তথাগতকে কষ্ট দেবেন না, ভগবান এখন ক্লান্ত।'

বুদ্ধদেব আনন্দ ও সুভদ্রের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি আনন্দকে ডেকে বললেন—"না আনন্দ, সুভদ্রকে আসতে দাও, সে সত্য-জিজ্ঞাসু হয়েই আমাকে প্রশ্ন করবে, আমাকে কষ্ট দেবার জন্য নয়। আর আমি যে উত্তর দেব, তা সে সহজে বুঝতে পারবে।"

অনুমতি পেয়ে সুভদ্র ভগবানের কাছে গিয়ে নমস্কার করলেন, ভগবানও প্রতি-নমস্কার করলেন। সুভদ্র একপার্শ্বে বসে ভগবানকে বললেন—'ভগবন্, যাঁরা প্রসিদ্ধ লোকশিক্ষক, বহু শিক্ষার্থীর শিক্ষক, বহু শিষ্যের আচার্য, যশস্বী, শাস্ত্রকার, বহুজনকর্তৃক সাধু ব'লে সমাদৃত, তাঁরা কি সকলে জ্ঞাতব্য বিষয় জেনেছেন, না তাঁরা সকলে কি জানতে পারেননি, অথবা তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জানতে পেরেছেন, আর কেউ জানতে পারেননি?'

শ্রীবুদ্ধ বললেন, 'তাঁরা সকলে জ্ঞাতব্য বিষয় জেনেছেন বা জানতে পারেননি, অথবা তাঁদের কেউ কেউ জানতে পেরেছেন, কেউ কেউ জানতে পারেননি—এসব বিচার ক'রে লাভ নেই। আমি তোমাকে সত্যধর্ম শিক্ষা দিচ্ছি, শোন।"

"যে ধর্মে ও বিষয়ে আর্য অষ্টাঙ্গমার্গের উপলব্ধি নাই, তাতে প্রথম শ্রেণীর শ্রমণের ধর্মজীবন দৃষ্ট হয় না, তাতে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর উচ্চ ধর্মজীবনও নাই।"

"যে ধর্ম ও বিষয়ে আর্য অষ্টাঙ্গমার্গের উপলব্ধি হয়, তাতেই পবিত্র ধর্মজীবন এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর উচ্চ ধর্মজীবন দেখতে পাওয়া যায়।"

"এই ধর্মে ও ধর্মবিনয়প্রণালীতে আর্য

[বাকী অংশ ২১৯ পৃষ্ঠায়]

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ কর্তৃক উদ্বোধনের নূতন ভবনের
(উপরে) দ্বারোদ্ঘাটন, (নিম্নে) লাইব্রেরীর উদ্বোধন
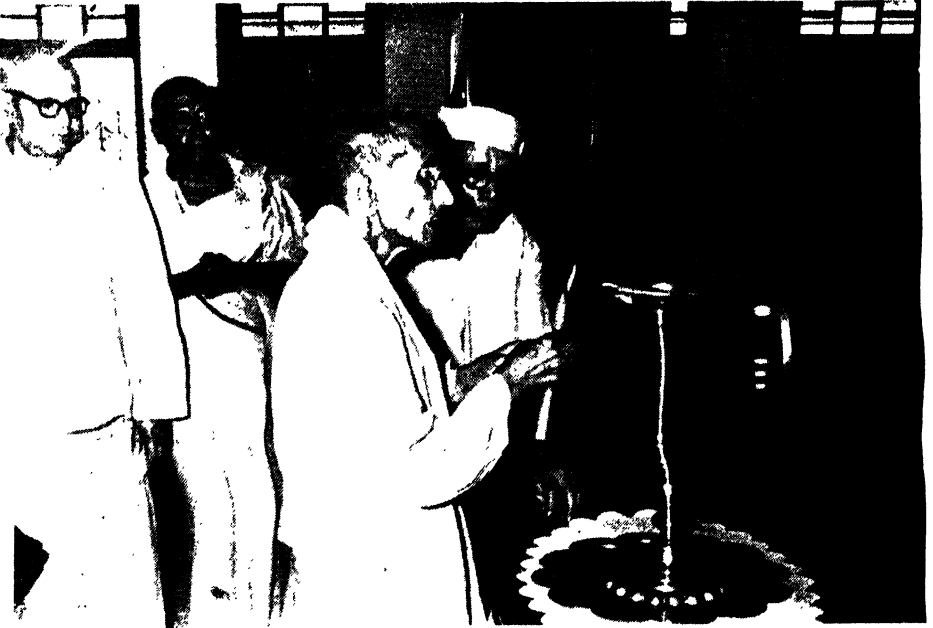
উদ্বোধনের নূতন ভবনের সভাগৃহে সজ্জিত পূজাবেদীতে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ কর্তৃক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

উদ্বোধনের নূতন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ৪ঠা এপ্রিল, শ্রীশ্রীরামনবমীর দিন সকাল ৯-৩০ মিনিটে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ উদ্বোধনের নয়নকৃষ্ণ সাহা লেন-এ অবস্থিত নবনির্মিত ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। প্রবেশদ্বার উদ্ঘাটনের পর তিনি দ্বিতলে অবস্থিত লাইব্রেরীতে দীপ জ্বালাইয়া দেন, পরে ত্রিতলে সভাগৃহে আসিয়া সেখানে আয়োজিত পূজামণ্ডপে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষদ্বয় শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দ ও শ্রীমৎ স্বামী ওঙ্কারানন্দ মহারাজ, সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ, এবং স্বামী দয়ানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ প্রমুখ বহু সাধু ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ এবং প্রায় চারিশত ভক্ত এই শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রভাত হইতে এখানে পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও ভজন আরম্ভ হইয়াছিল; দ্বারোদ্ঘাটনের পর হাতে-হাতে প্রসাদ বিতরিত হয়। বিকালে ৪টায় ত্রিতলে পূজামণ্ডপে শ্রীশ্রীরামনামসঙ্কীর্তন হয়।

উদ্বোধন কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে, কলিকাতার কম্বুলিয়াটোলায় ১৪নং রামচন্দ্র বসাক লেন-এ গিরীন্দ্রলাল বসাকের বাটীতে; গিরীন্দ্রলাল বসাকের মৃত্যুর পর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ৩০নং বোসপাড়া লেন-এ উহা স্থানান্তরিত হয়। এই সময় উদ্বোধন কার্যালয়ের একটি নিজস্ব ভবনের অভাব খুবই অনুভূত হইতেছিল। শ্রীশ্রীমায়ের কলিকাতায় অবস্থানের জন্য একটি নিজস্ব বাটীর অভাবও অনুরূপভাবেই অনুভূত হইতেছিল। স্বামী সারদানন্দ এই উভয় অভাব দূর করিবার জন্য একটি ত্রিতল বাটী নির্মাণ করেন (তেতলায় মাত্র একখানি ঘর)। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৯ই জুলাই খড়ব্যবসায়ী কেদারচন্দ্র দাস বাগবাজার এলাকায় ১২, ১৩নং গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেন-এ তিন কাঠা চার ছটাক জমি মঠকে দান করিয়াছিলেন; এই জমির উপরই বাড়ীটি নির্মিত হয়। বাড়ীটির দোতলা শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহারের জন্য এবং একতলাটি উদ্বোধন কার্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট হয়। এই বাড়ীতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে উদ্বোধন কার্যালয় উঠিয়া আসে এবং শ্রীশ্রীমা পদার্পণ করেন ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে। বাটীটির ঠিকানা ইহার উত্তর দিকের রাস্তার নামে পরবর্তী কালে ১নং মুখার্জী লেন হয়; আরো পরে মুখার্জী লেনের নাম উদ্বোধন লেন হইয়াছে।

বাড়ীটি খুব ছোট হওয়ায় প্রথম হইতেই স্থানসঙ্কুলানে অসুবিধা হইত। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এই বাড়ীর পূর্বদিকসংলগ্ন সওয়া এক কাঠা জমির উপর আরো দুখানি ঘর নির্মিত হয়। ১৯৫৭ খৃঃ পূর্বদিকে বাড়ীটি আরো একটু সম্প্রসারিত হইয়াছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান কর্মপ্রসারহেতু স্থানাভাব বাড়িয়াই চলিয়াছিল। এই অভাব দূর করিবার জন্য নয়নকৃষ্ণ সাহা লেন-এ সাড়ে বারো কাঠা জমি কিনিয়া ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে নূতন বাটীর নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছিল; শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন। বাড়ীটির একতলায় পুস্তকবিক্রয়াদি সংক্রান্ত আপিস, এবং পুস্তকের গুদাম ঘর। দোতলায় প্রকাশনবিভাগ ও লাইব্রেরী এবং তেতলায় 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ ও অডিটোরিয়াম। চারতলাটি সম্পূর্ণ নির্মিত হইলে সাধুকর্মীদের আবাসগৃহরূপে ব্যবহৃত হইবে।

উদ্বোধন কার্যালয়ের নূতন ভবন

(লে-আউট-প্ল্যান)
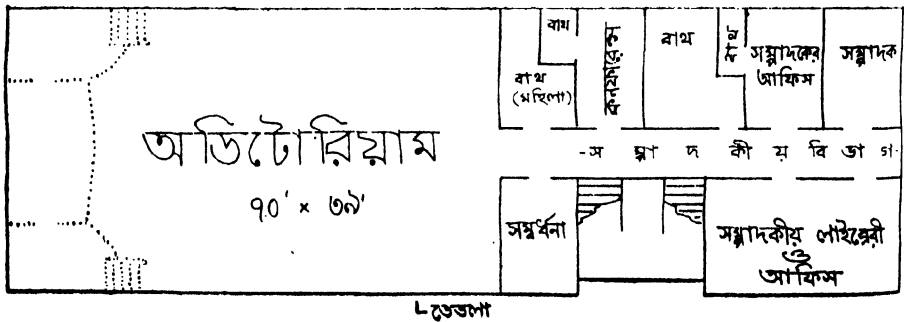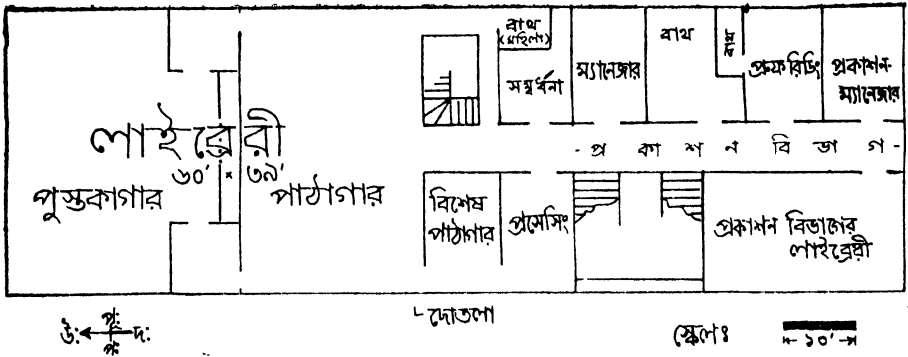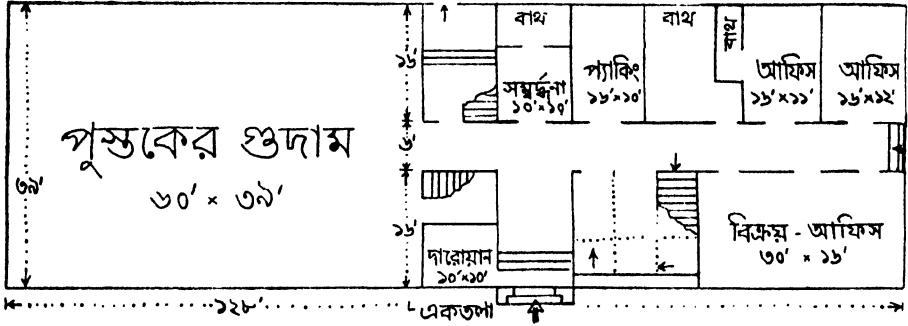
[২১৬ পৃষ্ঠার পর]

(শ্রেষ্ঠ) অষ্টাঙ্গ মার্গ দেখা যায়। এতে পবিত্র শ্রমণ-ধর্মজীবন দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পবিত্র ধর্মজীবনও দেখা যায়।"

"অন্যান্য জনশ্রুতিমূলক ধর্মসকল শূন্যগর্ভ, শ্রমণশূন্য।"

"এই ধর্মে ভিক্ষুগণ সম্যক জীবন (অষ্টাঙ্গ মার্গানুমোদিত জীবন) যাপন করুক— যেন পৃথিবী অর্হৎ-বিহীন না হয়।"

"সুভদ্র, আমি ২৯ বছর বয়সে কিসে মঙ্গল হয়—তারই খোঁজে গৃহত্যাগ ক'রে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলাম। ৫১ বছর এইভাবে জীবন কাটিয়েছি, জ্ঞান ও ধর্মের রাজ্যে বিচরণ করেছি। যাঁরা এর অনুবর্তী নন, তাঁরা শ্রমণ নন। এতে (আমার আচরিত প্রব্রজ্যায়) পবিত্র শ্রমণ-ধর্মজীবন দেখা যায়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর উচ্চ ধর্মজীবনও এতে দেখা যায়। অন্যান্য জনশ্রুতিমূলক ধর্মসকল শূন্যগর্ভ। সে-সকল ধর্ম শ্রমণ-শূন্য (পবিত্রধর্মজীবন-শূন্য)।"

সুভদ্র বললেন, "আপনার উক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট। যে জিনিস উপর থেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল, তাকেই যেন আপনি উপরে তুলে দিলেন; যেন ঢাকা জিনিসকে আপনি খুলে ধরলেন, যেন মূঢ় ব্যক্তির কাছে সত্য-পথ দেখানো হ'ল, যেন অন্ধকারে বাতি জেলে দেওয়া হ'ল।"

এই ব'লে সুভদ্র শ্রীবুদ্ধের শরণ নিলেন। শ্রীবুদ্ধও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে প্রব্রজ্যা দিতে আনন্দকে আদেশ দিলেন। এই সুভদ্রই শ্রীবুদ্ধের সর্বশেষ সাক্ষাৎ শিষ্য। (ক্রমশঃ)

কে তুমি

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

কে তুমি গো হৃদে মোর
আছ বসি চিরদিন
জীবনের সুখে-দুঃখে
থাকি সদা উদাসীন ?
কে তুমি ত্রিগুণাতীত
শুদ্ধ বুদ্ধ নির্বিকার
প্রকৃতির কর্মাকর্মে
থাক শুধু সাক্ষী তার ?

তুমি তো আমিই—এই
আভাস বিজলী সম
চকিতে প্রকাশি পুনঃ
লুকায় হৃদয়ে মম।
কে তুমি ? প্রকাশ হও
ত্রিগুণ-আঁধার নাশি
ঘুচে যাক জন্মমৃত্যু,
সব সুখ-দুঃখরাশি।

সমালোচনা

কুশদহের ইতিহাস—হাসিরাশি দেবী। প্রকাশক: শ্রীদেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬বি নন্দলাল বোস লেন, কলিকাতা-৩। প্রাপ্তিস্থান: ইম্প্রেসিও, ৮ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ১৮৮; মূল্য চার টাকা।

গবেষণা শ্রমসাধ্য সুকঠিন কর্ম। ইতিহাস লিখিবার মূলে থাকে যথার্থ অনুসন্ধিৎসা।

আলোচ্য গ্রন্থ 'কুশদহের ইতিহাস' গবেষণাগ্রন্থ। 'কুশদ্বীপ' বা 'কুশদহ' বাংলা দেশে এক সময়ে, বিশেষতঃ মধ্যযুগের শেষে ও ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে অতি প্রসিদ্ধ ছিল। কুশদহের অবস্থান ছিল ভাগীরথীর পূর্বপ্রান্তে, তাহার বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলার অনেক অংশে এবং যশোহর জেলার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া।

এই গ্রন্থের অনেক উপাদান ইতঃপূর্বে প্রকাশিত 'খাটুরার ইতিহাস ও 'কুশদ্বীপ-কাহিনী' তথ্যমূলক পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

আলোচ্য গ্রন্থখানি নানা দিক দিয়া অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার যোগ্যতা বহন করে। কুশদহের নদী খাল বিল হইতে আরম্ভ করিয়া স্থলপথ জলপথ রেলপথ, কৃষি শিল্প ব্যবসাবাণিজ্য, সম্প্রদায় ধর্ম, শ্রেণী বৃত্তি, তীর্থ মন্দির মেলা, বন্যা অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ, প্রসিদ্ধ বংশসমূহ ও ব্যক্তিগণের পরিচিতি এবং 'কুশদহের মানচিত্র' পুস্তকখানির বিশেষ আকর্ষণ। বর্ণনায় ভাষার স্বচ্ছতা আছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী ও পূর্ববঙ্গীয় পার্ষদ—শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য। প্রকাশক: শ্রীমণীন্দ্রকুমার পাল, হাইলাকান্দি প্রেস, হাইলাকান্দি, কাছাড় (আসাম) পৃষ্ঠা ১২৫; মূল্য ৩·২৫।

অনন্ত ঈশ্বরের লীলাবিভূতিও অনন্ত ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হইয়া যে লীলা প্রকট ও প্রচার করিয়াছিলেন তাহা বিবিধ গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ। এইরূপ একখানি সুপ্রাচীন পুস্তক 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী'। এই গ্রন্থ অবলম্বনে এবং পূর্ববঙ্গে আবির্ভূত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদগণের জীবনী অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়া আলোচ্য পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। সুধী গ্রন্থকার ও সঙ্কলক এই কার্যে যথোপযুক্ত গবেষণা করিয়াছেন এবং যথেষ্ট অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গীয় পার্ষদগণের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য: অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস, মুরারি গুপ্ত, চন্দ্রশেখর আচার্য, সেন শিবানন্দ, রত্নগর্ভ আচার্য, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাসুদেব দত্ত, মুকুন্দ দত্ত, তপন মিশ্র। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জীবনবেদের ভাষ্যরূপেই তাঁহার পার্ষদগণ সুপরিচিত।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বহু দুষ্প্রাপ্য উপাদানে সমৃদ্ধ হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্যময় জীবনের একটি মূল্যবান অধ্যায় উপস্থাপিত করিয়াছে বলিয়া ভক্ত-ও সুধীসমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

দিব্যায়নের নূতন ভবন

রাঁচি (মোরাবাদী) আশ্রমে গত ২রা মার্চ, ১৯৭১ 'দিব্যায়ন'-এর নূতন ভবনের (store building) উদ্বোধন করিয়াছেন স্বামী চিদাত্মানন্দ।

উৎসব-সংবাদ

চণ্ডীগড় আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় হরিয়ানার গভর্ণর শ্রী বি. এন. চক্রবর্তী এবং পঞ্জাবের গভর্ণর শ্রী ডি. সি. পাভাতে সভাপতিত্ব করেন।

কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ১৪ই ফাল্গুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভাবির্ভাব-উৎসব বহু ভক্ত নর-নারীর উপস্থিতিতে সম্পন্ন হইয়াছে। সকাল ৮ টায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ শোভা-যাত্রা সহ কামারপুকুর গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। বিশেষ পূজাপাঠাদি উৎসবের কর্মসূচী ছিল। এতদুপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ভূতপূর্ব সদস্য শ্রীকালীপদ সেনের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় শ্রীরাম-কৃষ্ণের বাণী ও জীবন আলোচিত হয়। মধ্যাহ্নে পাঁচ সহস্রাধিক নরনারীকে বসাইয়া খিচুড়ি প্রভৃতি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৭শে ফেব্রুআরি ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৩৬তম জন্মোৎসব বিশেষ পূজাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সন্ধ্যায় ডক্টর বন্দিতা ভট্টাচার্য শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ত্যাগ-বৈরাগ্য সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। পর দিবস দ্বিপ্রহরে প্রায় তিন হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ভাষণ দেন। যুবকবৃন্দ যাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শগ্রহণে যত্নবান হইতে পারেন তজ্জন্য তিনি আবেদন জানান। শ্রীনির্মলপ্রসাদ বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই উৎসবে আশ্রমের বিদ্যার্থিবৃন্দ কর্তৃক দুইটি নাটক অভিনীত হয়।

পাটনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৭শে ফেব্রুআরি হইতে ৫ই মার্চ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী পূজা, পাঠ, প্রসাদবিতরণ, রামায়ণ-কীর্তন প্রভৃতি কার্যসূচীর মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১৩৬তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

২৭শে ফেব্রুআরি সকালে আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী তীর্থানন্দ সমবেত ভক্তমণ্ডলীর নিকট 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। দুপুরে প্রায় তিন হাজার ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ডঃ জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ (সভাপতি), স্বামী চিৎসুখানন্দ ও ঈশ্বরীনন্দন প্রসাদ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানবধর্ম' বিষয়ে আলোচনা করেন।

২৮শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ডঃ নর্মদেশ্বর প্রসাদ (সভাপতি), শ্রীমতী অদিতি দে, এবং স্বামী ব্যোমানন্দ 'আধুনিক জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী' বিষয়ে আলোচনা করেন।

১লা মার্চ সকালে আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ের রোগীদিগকে ও পাটনা অন্ধ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ফল বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যারতির পর ধর্মসভায় অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ

শর্মা (সভাপতি), স্বামী প্রত্যয়ানন্দ ও স্বামী ব্যোমানন্দ 'ভক্তি দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি' বিষয়ে আলোচনা করেন।

২রা, ৩রা ও ৪ঠা মার্চ তিন দিন শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীতসহযোগে 'রামায়ণকথা' পরিবেশন করেন।

৫ই মার্চ 'শ্রীরামকৃষ্ণলীলাগীতি' গীত হয়।

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ২৭শে ফেব্রুআরি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

ঐদিন প্রত্যূষে রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ এবং স্থানীয় শিল্পিগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম কীর্তন করিয়া সারা শহর প্রদক্ষিণ করেন।

মধ্যাহ্নে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠাদির পর সর্বশ্রেণীর আনুমানিক চারি সহস্র নরনারী পরিতৃপ্তির সঙ্গে খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ ভজন, কীর্তন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাগীতি পরিবেশন করেন।

কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৭শে ফেব্রুআরি পূর্বাহ্নে পূজা, পাঠাদি এবং শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাস ও সঙ্গিগণ কর্তৃক সারদা রামকৃষ্ণ লীলাগীতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে পাঁচ হাজারের উপর ভক্ত নরনারী বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গপাঠ ও ভজনসঙ্গীত হয়।

২৮শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় স্থানীয় টাউন ক্লাব ও বলারাম ব্যায়ামাগারের ব্যায়াম-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। ১লা মার্চ সন্ধ্যায় আশ্রমসম্পাদক স্বামী কৃষ্ণাত্মানন্দ কর্তৃক আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী-পাঠের পর বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের বিচিত্রানুষ্ঠানের শেষে এন. এফ. রেলওয়ের ডি. এস. শ্রীশিবকিশোর বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ করেন। ২রা মার্চ সন্ধ্যায় বিদ্যামন্দিরের ছাত্র ও শিক্ষকগণ কর্তৃক 'প্রতাপসিংহ' অভিনীত হয়।

৩রা, ৪ঠা ও ৫ই মার্চ সন্ধ্যায় স্বামী অকুণ্ঠানন্দ যথাক্রমে স্বামীজী, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে বাংলায় এবং ৩রা ও ৫ই মার্চ স্থানীয় ডি. এস. কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীব্রহ্মদেব হিন্দীতে স্বামীজী ও শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। তিন দিনই সভার পর রাত ৮টায় চুঁচুড়ার বেতারশিল্পী সঙ্গীতসুধাকর গীতরত্ন শ্রীসুধীরকুমার রায়-চৌধুরী রামায়ণ গান করেন

কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৬তম জন্মতিথি উপলক্ষে ২৭শে ফেব্রুআরি বিশেষ পূজানুষ্ঠান এবং ৪ঠা মার্চ হইতে ৭ই মার্চ পর্যন্ত দিবসচতুষ্টয়-ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২৭শে ফেব্রুআরি মধ্যাহ্নে প্রায় ৪০০ জন নরনারীকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে ধর্মসভায় স্বামী রমানন্দ (সভাপতি), ব্রহ্মচারী পূর্ণচৈতন্য, অধ্যাপক বনবিহারী ভট্টাচার্য, অধ্যাপক স্নেহাংশু সরকার ও আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী আপ্তকামানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনকথা আলোচনা করেন। ৪ঠা মার্চ অপরাহ্নে বিবিধ বিদ্যালয় ও মহা-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অধ্যাপকবৃন্দের প্রায় ছয় হাজার ব্যক্তি শোভা-যাত্রা করিয়া আশ্রমপ্রাঙ্গণে শিক্ষক-ছাত্র-দিবসের সভায় সমবেত হন। স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। শিক্ষক ও ছাত্রজীবনের আদর্শ ও মানুষগড়া শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন অধ্যাপক মনোরঞ্জন মাইতি, অধ্যাপক সুধাংশু শাসমল এবং বিদ্যার্থী বিবেকানন্দ বেরা ও অমিয়কুমার মাইতি। সভাপতি মহারাজ উদ্দীপনাময় ও ভাবগম্ভীর

ভাষণ দেন। ৫ই মার্চ পূর্বাহ্ণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পরিবেশিত হয়। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণলীলাগীতি পরিবেশনের পর স্বামী আপ্তকামানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বর্তমান ভারত' সম্বন্ধে ভাষণ দেন অধ্যাপক স্নেহাংশু সরকার ও অধ্যাপক বনবিহারী ভট্টাচার্য। ৬ই মার্চ অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীমা-সারদা গীতি-আলেখ্য পরিবেশনের পর শ্রীমতীকৃষ্ণভাবিনী ভট্টাচার্যের সভানেত্রীত্বে 'শ্রীশ্রীমা ও নারীপ্রগতি' সম্বন্ধে ভাষণ দেন অধ্যাপক স্নেহাংশু সরকার, অধ্যাপক সুধাংশু শাসমল, শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ বেরা ও স্বামী আপ্তকামানন্দ মহারাজ। সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর কলিকাতার প্রাচ্যবাণী সঙ্ঘের সভ্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্রীগণ কর্তৃক সংস্কৃতে 'মীরাবাঈ' অভিনয় বিশেষ আকর্ষণের সৃষ্টি করে। ৭ই মার্চ মধ্যাহ্নে ৭ হাজার নরনারী অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। তৎপরে স্বামী আপ্তকামানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় কালিন্দী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জ্ঞানদাকান্ত মিশ্র ও অ্যাড-ভোকেট শ্রীযামিনীকুমার বসু 'মানবচরিত্র-গঠনে স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। পরে সভাপতি মহারাজ আবৃত্তি ও প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। ৪ঠা, ৫ই এবং ৭ই মার্চ সভার পর প্রত্যহ একটি করিয়া নাটক অভিনীত হয়।

বহরমপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৯শে, ২০শে ও ২১শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম-মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিন দিনই অপরাহ্ণে বক্তৃতা ও তৎপরে শ্রীকানাইলাল হালদার মহাশয়ের রামায়ণ-গান অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনই বক্তা ছিলেন স্বামী পরশিবানন্দ, স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। তৃতীয় দিন অধ্যক্ষ ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধরও বক্তৃতা করেন। তৃতীয় দিন ২১শে মার্চ ভোরে মঙ্গলারতি প্রভৃতির শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, হোমাদির পর হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'যুগস্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ'। বক্তাগণ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত পথে শ্রীভগবানের সন্ধান—শুধু মন্দিরে গির্জায় মস্‌জিদে নয়, নিজের এবং বিশ্বমানবের অন্তরেও—ইহাই হইল শান্তির পথ। দ্বিতীয় দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'জগন্মাতা সারদাদেবী', তৃতীয় দিনের বিষয়—'যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ'। বর্তমান যুগে সাম্যের বাণী বিশ্ববাসীর চিন্তা অধিকার করিয়াছে। কিন্তু যথার্থ সাম্য একমাত্র বেদান্তনিহিত সত্যানুসরণে, স্বামীজীর প্রদর্শিত ত্যাগ ও সেবার পথে ভগবানজ্ঞানে মানুষের সেবার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব —এই কথাই বক্তাগণ বিস্তৃতভাবে বলেন।

বহরমপুর শহরে সন্ত্রাসের ভাব চলা সত্ত্বেও যুব-সম্প্রদায় ও বহু নরনারী উৎসবপ্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকিয়া মুগ্ধচিত্তে বক্তাদের সুললিত ভাষণশ্রবণে তৃপ্ত হইয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

পাণ্ডু বিবেকানন্দ পাঠচক্রে গত ৬ই হইতে ৮ই মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

পূর্বাহ্নে প্রথম দিন শোভাযাত্রাসহ শহর-পরিক্রমা, কীর্তন, ভজন ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-গীতি, দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা-পাঠাদি এবং তৃতীয় দিন কীর্তন, ভজন ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ হয়। দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরে প্রায় ছয় হাজার ভক্ত বসিয়া অন্ন-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

তিন দিনই অপরাহ্নে সাধারণ সভা আয়োজিত হইয়াছিল। প্রথম দুই দিনের আলোচনাসভায় পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে অধ্যাপিকা সুমিতা সেন ও শ্রী এম. আই, ছায়া। তৃতীয় দিন ছাত্রসম্মেলন ও পুরস্কার-বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীপরিমল-চন্দ্র ধর। স্বামী প্রণবাত্মানন্দ তিন দিনই সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবধারা বিবৃত করেন। অন্যান্য বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন প্রথম দিন অধ্যাপিকা সরোজা দাস, দ্বিতীয় দিন শ্রী এন. এন. বৈঞ্জন (প্রধান অতিথি), অধ্যক্ষ শ্রীসত্যকিঙ্কর সেন ও অধ্যাপক শ্রীগিরি। দ্বিতীয় দিনের সভার পর প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন আলোচনা করেন। শেষদিন স্থানীয় এলোকেশী সমিতি কালীকীর্তন পরিবেশন করেন।

কিষণগঞ্জ (পূর্ণিয়া, বিহার) শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রমে গত ২১শে মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূজা-পাঠাদির পর প্রায় দেড় হাজার নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় পূর্ণিয়া জেলার কালেক্টরের উপস্থিতিতে ধর্মসভা এবং পরে শ্যামাসঙ্গীত ও ভজন অনুষ্ঠিত হয়।

রামকৃষ্ণনগর (ত্রিপুরা) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ২৭ ও ২৮ মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-তিথি পূজা ও উৎসব সুচারুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ২৭শে পূজাপাঠাদি এবং ২৮শে সারাদিন কীর্তনাদি হয় ও প্রায় দুই হাজার নর-নারী বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। দুই দিনই সন্ধ্যার পর ধর্মবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

খিদিরপুর 'সুরবিতানে' গত ৭ই মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। সংস্থার শিল্পিবৃন্দ ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

সন্ন্যাসীর গীতি—১৪শ সংস্করণ। স্বামীজী-রচিত 'Song of the Sannyasin'-নামক ইংরেজী কবিতা ও উহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ। মূল্য ০'২০।

ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—৫ম সংস্করণ, ভগবান ঈশার জীবনালোচনা—মূল্য ০'৪০, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৩৫।

সরল রাজযোগ—৫ম সংস্করণ। স্বামীজী আমেরিকায় তাঁহার শিষ্যা সারা সি. বুলের বাড়িতে কয়েকজন অন্তরঙ্গকে 'যোগ' সম্বন্ধে যে বিশেষ উপদেশ দান করেন, বর্তমান পুস্তক তাহারই ভাষান্তর। মূল্য ০'৫০।

পত্রাবলী—১ম ও ২য় ভাগ। অভিনব পরিবর্ধিত সংস্করণ। প্রায় ১০৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বামীজীর বহু অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। তারিখ অনুযায়ী পত্রগুলি সাজানো হইয়াছে। পরিচয়- এবং নির্ঘণ্ট-সংযুক্ত। মনোরম বাঁধাই। স্বামীজীর সুন্দর ছবি-সংবলিত। প্রতি ভাগ মূল্য ৫'৫০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৫৲।

ভারতে বিবেকানন্দ—১৪শ সংস্করণ। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজীর ভারতীয় বক্তৃতাবলীর উৎকৃষ্ট অনুবাদ। ৫৯৯ পৃষ্ঠা; মূল্য ৫৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ৪'৫০।

দেববাণী—৯ম সংস্করণ। আমেরিকার 'সহস্র-দ্বীপোদ্যান'-নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে স্বামীজী যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন, ঐগুলির একত্র সমাবেশ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২১৪ পৃষ্ঠা; মূল্য—২৲ উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'৮০।

শিক্ষাপ্রসঙ্গ—৪র্থ সংস্করণ। শিক্ষা-সম্বন্ধে স্বামীজীর বাণীসকল সংকলিত ও ধারাবাহিক-ভাবে সন্নিবেশিত। ১৮৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ১'৭৫।

বাণীসঞ্চয়ন—১ম সংস্করণ। যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র রচনাবলী হইতে বিভিন্ন বিষয়ে সুনির্বাচিত উপদেশাবলী। স্বামীজীর বাস্ট-সংবলিত সুন্দর প্রচ্ছদপট। পৃষ্ঠা ৩১২, মূল্য ৩'২৫।

কথোপকথন—৭ম সংস্করণ। স্বামীজীর ছবিযুক্ত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি, ১৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'২৫। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'১৫।

মদীয় আচার্যদেব—স্বামী বিবেকানন্দ-প্রণীত; ১১শ সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা। স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের নিকট স্বামীজীর বিবৃতি। মূল্য ০'৭৫; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ০'৬৫।

ভারতীয় নারী—১২শ সংস্করণ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি হইতে নারী-সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির একত্র সমাবেশ। ভারতীয় নারীর শিক্ষা, মহান্ আদর্শ, পাশ্চাত্য নারীদের সহিত পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা। স্বামীজীর মনোরম ছবি-সংবলিত, ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজি ১২০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১'৫০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ১'৩৫।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(পূর্বকাণ্ড — ১৩শ সংস্করণ; উত্তরকাণ্ড—১১শ সংস্করণ)। শ্রীশরৎ-চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। স্বামী বিবেকানন্দজীর মতামত অল্প কথায় জানিবার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। স্বামী-জীর জীবিতকালে তাঁহার সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দেশীয় আচার-নীতি, দর্শন-বিজ্ঞানাদি এবং ধর্ম ও সমাজগত সমস্যামূলক নানা বিষয়ের বিশদ আলোচনা। সরস ও হৃদয়গ্রাহী এই সব বর্ণনা সত্যিই আনন্দদায়ক। বর্তমান যুগের বহু সমস্যার আদর্শানুগ সমাধানও ইহাতে পাওয়া যাইবে। জীবনতত্ত্ব বিষয়ে এই পুস্তকদ্বয় অমূল্য রত্নের সন্ধান দিবে। ২২০ ও ২১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য প্রতি কাণ্ড ২'২৫।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ—১৬শ সংস্করণ। ১৫৪ পৃষ্ঠা। ইহাতে রামায়ণ, মহাভারত, জড়-ভরতের উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্র, জগতের মহত্তম আচার্যগণ, ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট ও ভগবান বুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আছে। কোমলমতি বালক-দিগের চরিত্রগঠনে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহাদিগকে শ্রদ্ধাবান্ করিতে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে; মূল্য ৩'০০; উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে মূল্য ২'৭০।

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে অপূর্ব পুস্তক। স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত। দুইভাগে রেক্সিন-বাঁধাই। মূল্য—১ম ভাগ ১০৲ ২য় ভাগ ৮৲
উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে „ ৯৲ „ ৭·২০
সাধারণ বাঁধাই পাঁচ ভাগে :

মূল্য—১ম ভাগ ২·০০	উঃ গ্রাঃ পক্ষে ১·৮০
২য় „ ৩·৭৫	„ ৩·৪০
৩য় „ ৩·০০	„ ২·৭০
৪র্থ „ ৩·০০	„ ২·৭০
৫ম „ ৩·৫০	„ ৩·১৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি— ৭ম সংস্করণ। অক্ষয়কুমার সেন-প্রণীত। সুললিত কবিতায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিস্তারিত জীবনী ও অলৌকিক শিক্ষা-সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ আর নাই। ৬৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—বোর্ড-বাঁধাই ১১৲ উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১০৲।

পরমহংসদেব—ষষ্ঠ সংস্করণ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত। সুললিত ভাষায় অল্প কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবনবেদ। ১৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—১·৭৫।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—১২শ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। বালক-বালিকাদিগের জন্য সরল ভাষায় লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী। মূল্য—·৬০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত — ২য় সংস্করণ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী-প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর অপূর্ব সমাবেশ। বোর্ড-বাঁধাই ডিমাই সাইজ। মূল্য—৪·০০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ— ১৮শ সংস্করণ। সুরেশচন্দ্র দত্ত-সংগৃহীত। ২৬৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩৲।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত। ২২শ সংস্করণ। মূল্য—৭৫ পয়সা। কাপড়ে বাঁধাই ১৲ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত-মহাকাব্য শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির অমর লেখক অক্ষয়কুমার সেনের লেখনী-প্রসূত গ্রন্থ। মূল্য—২·০০।

রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—১৪শ সংস্করণ। স্বামী প্রেমঘনানন্দ-প্রণীত। এই সুচিত্রিত সুদৃশ্য সুলভ পুস্তকখানি ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনগঠনের সহায়তা করিবে। মূল্য—১·৭৫।

শ্রীমা সারদাদেবী—৪র্থ সংস্করণ। স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃষ্ঠা ৭১০; মূল্য—৮৲।

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ১১০। মূল্য—২·০০।

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ৯৮; মূল্য ১৲।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানদের 'ডাইরী' হইতে সংগৃহীত সারগর্ভ উপদেশ। সংসারতাপে সান্ত্বনাদায়ক ও অধ্যাত্মরাজ্যে পথপ্রদর্শক। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগ—৫·৫০।

মাতৃসান্নিধ্যে—২য় সংস্করণ; স্বামী ঈশানানন্দ-প্রণীত। পৃষ্ঠা ২৫৬; মূল্য ৪৲ টাকা।

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত। স্বামীজীর অধুনাতন মূল্যবান প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড ৮৲, ২য় ও ৩য় খণ্ড ৭৲ করিয়া। একত্র লইলে ২১৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ২০৲।

স্বামী বিবেকানন্দ—৩য় সংস্করণ, শ্রীপ্রমথনাথ বসু-রচিত। দুই খণ্ডে প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী। ৯৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—প্রতি-খণ্ড ৪৲। উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ৩·৬০। দুই খণ্ড একত্র বাঁধান ৮·৫০।

স্বামী বিবেকানন্দ—১১শ সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। স্বামীজীর জীবনের প্রধান প্রধান সকল কথাই বলা হইয়াছে। মূল্য—·৭০।

বিবেকানন্দ-চরিত—৯ম সংস্করণ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-প্রণীত। মূল্য—৭৲

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ রচিত পাঁচ শতের অধিক সঙ্গীতের সমাবেশ। মাতৃসঙ্গীত, শিবসঙ্গীত, গুরুসঙ্গীত, মহামানব-সঙ্গীত, রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, সারদা-লীলাগীতি ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। মূল্য—ছয় টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

উদ্বোধন-প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলী

দশাবতারচরিত—৫ম সংস্করণ। শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত। এই পুস্তক-পাঠে চরিত-কথার গল্পপ্রিয় পাঠক এবং ভক্তগণ ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। মূল্য ১.২৫।

শঙ্কর-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য-প্রণীত—৫ম সংস্করণ; আচার্য শঙ্করের অদ্ভুত জীবনী অতি সুললিত ভাষায় লিখিত। মূল্য ১৲।

রামানুজ-চরিত—স্বামী প্রেমেশানন্দ-প্রণীত। যে-সকল মহাপুরুষের চরিত্র-প্রভাবে ভারতের জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, আচার্য রামানুজ তাঁহাদের অন্যতম। সুললিত সহজ ভাষায় লিখিত। মূল্য ০.৭৫।

শিব ও বুদ্ধ—৭ম সংস্করণ। ভগিনী নিবেদিতা-প্রণীত। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত সরল ও সুখপাঠ্য আখ্যান। মূল্য ০.৬৫।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সবিস্তার ধারাবাহিক জীবনী। মূল্য—৩.০০।

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—৭ম সংস্করণ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। মূল্য ২.৫০।

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর বিস্তারিত জীবনী। মূল্য—৫.৫০।

শিবানন্দ-বাণী—২য় ভাগ—৩য় সংস্করণ। স্বামী অপূর্বানন্দ-সঙ্কলিত। মূল্য—২.৫০।

শ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রণীত, ৩য় সংস্করণ, ২৫৮ পৃষ্ঠা। শ্রীসম্প্রদায়ে প্রচলিত আচার্য রামানুজের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত। আচার্যের জীবদ্দশায় ক্ষোদিত প্রতিমূর্তির ছবি এই গ্রন্থে আছে। মূল্য ৩৲। উঃ গ্রাঃ পক্ষে ২.৭৫।

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ-প্রণীত। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, সেবাব্রতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের পথিকৃৎ স্বামী অখণ্ডানন্দের ধারাবাহিক জীবনী। ডিমাই সাইজ, ৩১০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৪৲।

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-প্রণীত। ১১শ সংস্করণ। যাঁহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।"—পাঠক! তাঁহার পুণ্য জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ২.০০।

গোপালের মা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলিত)। অতুলনীয়-সাধননিষ্ঠ, পরমভক্ত গোপালের মা-র আদর্শ জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মূল্য ৫০ পয়সা।

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। ২য় সংস্করণ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুরের শিষ্যবর্গ সম্বন্ধে বহু অপ্রকাশিত ঘটনাবলীর সমাবেশ। নিজ জীবনের কঠোর ত্যাগ-তপস্যার কথার অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গীতে পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। মূল্য—৪.০০।

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-প্রণীত। বাল্যাবধি বেদান্তী এই মহারাজের জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী-পাঠে চমৎকৃত হইবেন। ৩৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—৩.৫০।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত একত্র এই প্রথম প্রকাশিত হইল। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। প্রতি ভাগের মূল্য—৫.৫০।

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ-প্রণীত। ইহাতে তাঁহার জীবনের মুখ্য ঘটনাবলীর সম্যক্ আলোচনা রহিয়াছে। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "ভগিনী নিবেদিতা-স্মৃতি বক্তৃতামালা"র প্রথম বক্তৃতা। মূল্য—১.২৫।

দিব্য বাণী

অশ্মন্বতী রীয়তে সং রভধ্বম্ উত্তিষ্ঠত প্রতরতা সখায়ঃ।
অত্রাজহাম যে অসন্নশেবাঃ শিবান্বয়মুত্তরেমাভি বাজান্॥

—ঋগ্বেদ, ১০।৮।৫৩

অশ্মন্-বতী—শিলা-আকীর্ণ এ জীবননদী—যায় বয়ে,
উদ্যোগী হও, ওঠো সখা সবে, সোৎসাহে যাও পার হয়ে—
ছাড়ি রাখি পিছু—এখানেই রাখি অশুভ যা-কিছু ফেলিয়া—
উত্তরণেতে সম্মুখে শুধু মঙ্গলে নিতে বরিয়া।

কথাপ্রসঙ্গে

কোন্ পথে

আজ মানবসভ্যতা চলিয়াছে কোন্ পথে? বাহিরে সভ্যতার চাকচিক্যময় আবরণ একটি থাকিলেও বিবেক, সততা, সহানুভূতি প্রভৃতি মানবতার পরিচায়ক সব কিছুকে অভিনয়মাত্রে রূপায়িত করিয়া, কোথাও বা প্রকাশ্যেই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মানুষ কি আজ প্রগতির নামে অজ্ঞাতসারে আদিম বর্বরতার অভিমুখেই ছুটিয়া চলিয়াছে?

ধর্ম, জনগণের উন্নতিবিধান, জগতে শান্তিস্থাপন, মানবতা প্রভৃতি উচ্চ আদর্শগুলির নামে আজ চারিদিকে যে নৃশংসতার, যে স্বার্থান্ধতার, যে পাশবিকতার বিভীষিকা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহাই তো মনে হয়। উচ্চ আদর্শের দোহাই দিয়া স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ আজ ব্যাপক; গণদরদী রাষ্ট্রগুলি স্বার্থের জন্য পরস্পরের সহিতও সংঘর্ষে রত হইতে দ্বিধা করে না, নির্বিচার গণহত্যাকেও সমর্থন করার মতো রাষ্ট্রের অভাব আজ নাই। পারস্পরিক স্বার্থের বেড়াজাল আজ আর্তমানবের সেবা করিবার অধিকারকে পর্যন্ত আকটাইয়া রাখিতেছে; আশঙ্কা হয় এই স্বার্থ রাষ্ট্র-পুঞ্জের দৃষ্টিকেও প্রভাবিত করিতে সক্ষম

হইয়াছে। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক আদর্শগুলি যেখানে এতখানি গ্লানিযুক্ত এবং স্বার্থসিদ্ধিতে নিয়োজিত, এতখানি স্বার্থসীমিতদৃষ্টি, অর্থ ও পাশবিক বল যেখানে অপ্রতিহতগতিতে মানবাত্মাকে বলি দিয়া চলিয়াছে, সেখানে পৃথিবীর মানুষ আজ কাহার মুখ চাহিয়া ভরসা পাইবে, কিভাবে মনুষ্যত্ব ও মানবতাকে রক্ষা করিবে?

মানবসভ্যতার গতি কি তবে এই পথেই অব্যাহত থাকিয়া পরিশেষে ধ্বংসের লক্ষ্যে পৌঁছিবে? নিশ্চয়ই না। যথার্থ ধার্মিক, যথার্থ মানবপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক, সহানুভূতিশীল, সেবাপরায়ণ মানুষের একান্ত অভাব এখনো পৃথিবীতে হয় নাই, বরং আমাদের বিশ্বাস তাঁহাদেরই সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বেশী। কিন্তু প্রায় নিষ্ক্রিয় রহিয়াছেন তাঁহারা। শুভশক্তির এরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থান মানবসমাজের নিশ্চিত বিনাশকেই টানিয়া আনিবে। আজ মানবসভ্যতার এই মহা দুর্দিনে মানবতাকে বাঁচাইবার জন্য সংঘবদ্ধ শুভশক্তির সক্রিয় প্রতিরোধ একান্তভাবে প্রয়োজন—স্বামীজীর কথায়, 'সমস্ত অশুভশক্তির বিরুদ্ধে সমস্ত শুভশক্তিকে সংহত করিতে হইবে।'

যুগাচার্য বিবেকানন্দ

যুগাচার্য

আমরা জানি, মানবজাতির ক্রমবর্ধমান জ্ঞানভাণ্ডার আজ অপরিমেয়, বহুবিচিত্র। একজন মানুষের পক্ষে সে ভাণ্ডারের সব কিছু দেখিয়া, বুঝিয়া, যাচাই করিয়া তাহার ভিতর হইতে আধুনিক যুগের মানুষের পক্ষে যথার্থ কল্যাণকর চিন্তাগুলি আহরণ করিয়া আদর্শ নির্ণয় করা প্রায় দুঃসাধ্য। অবশ্য একথা সর্বযুগেই প্রযোজ্য—সর্বযুগেই সর্বসাধারণের জন্য একাজ করিয়া দেন বিশেষ শক্তিধর কোন পুরুষ—আচার্য বা যুগনেতা। বর্তমান যুগে কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে, এযুগে মানবমনে প্রবলপ্রভাববিস্তারকারী বহুবিধ চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি আপাত-বিরুদ্ধও; আবার, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে অতি উন্নত যোগাযোগব্যবস্থায় সেগুলি পৃথিবীর সব দেশের মানুষের কাছে পৌঁছিতেছে বলিয়া এখন আদর্শ-নির্ণয় প্রয়োজন পূর্ব যুগগুলির মতো কোন বিশেষ দেশ বা জাতির জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্যই। একাজের জন্য তাই এমন একজন আচার্যের প্রয়োজন যিনি মানবচিন্তার কোন বিশেষ অংশমাত্রের নয়, পৃথিবীর সব দেশের সর্ববিধ প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তার সহিত সুপরিচিত এবং সেগুলির নিঃসংশয় সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম। এই দিক দিয়া দেখিলে নবযুগের আচার্যরূপে স্বামী বিবেকানন্দের ভাস্বর রূপই দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

বিষ্ণুপুরাণে আচার্যের একটি সংজ্ঞা আছে, যাহা সাধারণ শিক্ষক হইতে শুরু করিয়া যুগাচার্য পর্যন্ত সকলের পক্ষেই সমভাবে প্রযুক্ত:
'স্বয়মাচরতে যস্মাদাচারং স্থাপয়ত্যপি।
আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থান্ যমৈঃ সনিয়মৈর্যুতঃ॥'
যিনি কেবল উপদেশই দেন না, যাহা অপরকে করিতে বলেন নিজ জীবনে তাহা আচরণ করেন, যিনি নিজে করিয়া দেখাইয়া আদর্শ স্থাপন করিয়া যান; যিনি শাস্ত্রসমূহ হইতে শাস্ত্রার্থগুলি চয়ন করিয়া আনিয়া দেন; যাঁহার

জীবন সংযত ও সদাচার-ভূষিত—তিনিই আচার্য। এই সংজ্ঞানুসারে স্বামী বিবেকানন্দকেই নবযুগে সমগ্র মানবজাতির আচার্য বলিতে দ্বিধার কোন কারণ নাই।

পৃথিবীর সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের বৌদ্ধিক জ্ঞানলাভই নয়, শাস্ত্রোক্ত অতীন্দ্রিয় সত্যগুলির প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন তিনি—সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। বৌদ্ধিক জ্ঞানেও কেবল পৃথিবীর সব ধর্মশাস্ত্রই নয়, আধুনিক যুগের বিজ্ঞান, পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাস, দর্শন, সমাজ ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ক শাস্ত্র—বলা যায় মানবজাতির প্রাচীন ও আধুনিক সর্ববিধ চিন্তার সহিত তিনি সুপরিচিত ছিলেন। আর, নিজের অসাধারণ স্মরণশক্তি, সুতীক্ষ্ণ-বুদ্ধি এবং অতীন্দ্রিয়-সত্য প্রত্যক্ষ করিবার শক্তিসহায়ে সে-সব চিন্তাগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া সেখান হইতে আধুনিক যুগের মানুষের জন্য চয়ন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহার পক্ষে এ যুগে গ্রহণীয় এবং কল্যাণকর চিন্তাগুলি, নবযুগের আদর্শ। সেগুলি আমাদের কাছে উপস্থাপিত করিয়াছেন এমন ভাবে ও ভাষায়, যাহাতে বিচারপ্রবণ আধুনিক মনের পক্ষে তাহা বোঝা সহজ হয়।

আদর্শ সম্বন্ধে বর্তমান বিশ্বদ্বন্দ্ব

আধুনিক যুগের চিন্তাগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রভাববিস্তারকারী হইল দুটি চিন্তা—সাম্যবাদ ও বিজ্ঞান; সেই সঙ্গে মানবজাতির চিন্তার সহিত কোন-না-কোন আকারে সর্বযুগে বিজড়িত ধর্মচিন্তা তো আছেই। আজ এ চিন্তাগুলিকে উপেক্ষা করিয়া বা এগুলির পাশ কাটাইয়া মানবজাতির পক্ষে প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। এগুলির মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সবগুলিকে ভালভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া আদর্শ সম্বন্ধে নিঃসংশয় একটা সমাধানে আজ হউক কাল হউক সমগ্র মানবজাতিকে আসিতেই হইবে। অথচ বিজ্ঞান ও সাম্যবাদে কোন বিরোধিতার কারণ না থাকিলেও ধর্মের সহিত সাম্যবাদ ও বিজ্ঞানচিন্তার সামঞ্জস্য-বিধান আপাতদৃষ্টিতে প্রায় দুঃসাধ্য মনে হয়। সাম্যবাদে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার কোন স্থান নাই—ঈশ্বর অথবা মানুষের আত্মা বা দেহাতীত কোন সত্তা সেখানে অলীক অসত্য বলিয়া, শোষণের সহায়তার জন্য একশ্রেণীর মানুষের মনঃকল্পিত বলিয়া ঘোষিত। ভারতে একদা-প্রচারিত এবং অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শীর অতীন্দ্রিয় সত্যোপলব্ধির কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত হইয়া পরিত্যক্ত চার্বাকমতই যেন পুনরুদ্ঘোষিত সেখানে: যাহা চোখে দেখা যায়, সত্য-নির্ণয়ে একমাত্র তাহাই প্রমাণ—'মানম্ত্বক্ষমেবহি'; বিশ্বের উপাদান কঠিন, জলীয় ও বাষ্পীয় অবস্থায় এবং শক্তিরূপে অবস্থিত অচেতন পদার্থের সমবায় হইতেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়—'চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যঃ চৈতন্যমুপজায়তে', এ সবের অতিরিক্ত, দেহাতিরিক্ত চেতনা বা 'আত্মা' বলিয়া কিছু নাই, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা 'চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এব আত্মা'; কাজেই মানুষের আত্মা আছে, ঈশ্বর আছেন ইত্যাদি ধর্মকথা যাঁহারা প্রচার করেন বা শাস্ত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা 'ধূর্ত-ভণ্ড-প্রতারকাঃ'। ধর্মবিশ্বাসকে, ঈশ্বরবিশ্বাসকে তাই সেখানে মানুষের উন্নতির পরিপন্থী বলিয়াই ভাবা হয়—আফিং-এর মতো উহা মানুষকে ঝিমাইয়া রাখে, ড্রাগনের মতো উহা প্রগতির সিংহদ্বার রোধ করিয়া আছে ইত্যাদি।

অপরদিকে জড়বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত যাহা আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের ব্যাপারে ঈশ্বরকে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। বিশ্বের সব কিছুর মূলে যে একত্ব তাঁহারা খুঁজিয়া

পাইয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বর তো দূরের কথা 'মানুষ'-এরও কোন স্থান নাই; জড়পদার্থ হইতে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীকে যাহা পৃথক করে, সেই চেতনা ইচ্ছা প্রভৃতি কিছুই নাই সেখানে, তাহা মানুষের স্থূলদেহের মূল উপাদানমাত্র, অচেতন ইচ্ছাবিহীন শক্তি একটি—বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গবিশেষ বা ঐ জাতীয় কিছু। আর উহার নিয়ন্তা হইল কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম, বা প্রকৃতি—যাহা একটি কল্পিত শব্দমাত্র। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মনে ইহারও পিছনে ইহার নিয়ন্তারূপে বুদ্ধির ও ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্বের আভাস রেখাপাত করিলেও তাহা বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে এখনো গৃহীত হয় নাই। কাজেই জড়বিজ্ঞানীরা 'সত্যান্বেষণের পথে এ পর্যন্ত যাহা আবিষ্কার করিয়াছি তাহার ওপারে আর কোন সত্য নাই', একথা না বলিলেও (তাঁহারা কখনো তাহা বলেন না, বলিতে পারেনও না), জড়বাদী চিন্তানায়কগণ কিন্তু বিশ্বের সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের মূলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জড়বিজ্ঞানের এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত সত্যকেই প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করেন। কাজেই জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যগুলি সাম্যবাদের মতো ধর্মবিরোধী না হইলেও সাধারণের কাছে উহাকে ধর্মের বিরোধিরূপেই জড়বাদিগণ উপস্থাপিত করিতেছেন।

আধুনিক যুগের চিন্তাজগতের এই পরিস্থিতিতে, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মানবমনে সর্বাধিক প্রভাববিস্তারকারী এই চিন্তাগুলির মধ্যে একটা নিঃসংশয় সামঞ্জস্যবিধান, সত্যসম্বন্ধে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত না করিয়া মানবজাতিকে যথার্থ-প্রগতির পথে অগ্রসর করাইবার জন্য আদর্শনির্ণয় আজ অসম্ভব। যথার্থ ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত না হইয়া বিভিন্ন মতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানপদ্ধতিকেই ধর্ম ভাবিয়া ও ধর্মের অপব্যবহার দেখিয়া ধর্মকে একেবারে বাদ দিয়াই এপথে চলার প্রচেষ্টা ইতিমধ্যে কয়েকটি দেশে শুরু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মানুষ বলিতে সেখানে বোঝায় কেবল দেহসীমিত মানুষ মাত্র, মানুষের প্রয়োজন বলিতেও সেখানে তাই মূলতঃ তাহার দেহের প্রয়োজনই বোঝায়—মানুষের চিন্তা ও হৃদয়-বৃত্তির স্বাধীন প্রকাশের প্রয়োজন সেখানে অস্বীকৃত, এগুলির উন্নততর বিকাশের অবাধ সুযোগ সেখানে নাই। এরূপ আদর্শকে পৃথিবীর সব মানুষ মানিয়া লইতেও পারিতেছে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জড়বিজ্ঞান-আবিষ্কৃত সত্যের দ্বারা প্রভাবিত চিন্তার ফলে ঈশ্বর ও মানবাত্মার অস্তিত্বে যে অবিশ্বাস জাগিয়াছিল, এবং তাহারই ভিত্তিতে যে যুগান্তকারী সমাজচিন্তার উদ্ভব হইয়াছিল, আধুনিক কালে মুখ্যতঃ তাহারই উপর এই-ধরনের সমাজ ও রাষ্ট্রসৌধগুলি গঠিত।

নবযুগের আদর্শ

সাম্যবাদ, বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়

স্বামী বিবেকানন্দ এই ঊনবিংশ শতাব্দীরই শেষভাগে আধুনিক যুগে এই সব চিন্তার প্রভাবের পরিণত রূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন—তাঁহার ঐতিহাসিক জ্ঞানোদ্ভূত সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই হউক, বা অতীন্দ্রিয় প্রজ্ঞাদৃষ্টিতেই হউক, অথবা উভয়ের মিলনেই হউক। তিনি জানিতেন, এমন দিন আসিতেছে যেদিন সব মানুষই 'সমান ভোগ' 'সমান অধিকার' চাহিবেই; জানিতেন সেদিন পৃথিবী জুড়িয়া চিরযুগের নিপীড়িত বঞ্চিত শ্রমিকদল—শূদ্রজাতি—সংঘবদ্ধ হইয়া জাগিয়া উঠিয়া তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য জোর করিয়া আদায়

করিয়া লইবেই—সারা পৃথিবীতে 'শূদ্রযুগের আবির্ভাব' আসন্ন। চীন অথবা রাশিয়াতে যে এই যুগান্তকারী ঘটনার সূত্রপাত হইবে, তাহার ইঙ্গিতও তিনি দিয়া গিয়াছেন। একথাও বলিয়াছেন যে, ক্ষমতালাভের পূর্বে এই 'শূদ্র-জাতিকে' যদি সাংস্কৃতিক দিক দিয়া উন্নত করিবার চেষ্টা না করা হয়, তাহা হইলে মূল্য না বুঝিয়া তাহারা মানবজাতির উচ্চ আদর্শ-গুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে।

এদিকে জড়বিজ্ঞানের তৎকাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত সত্যগুলি সম্বন্ধেও তিনি অবহিত তো ছিলেনই বরং আধুনিক দু'একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও করিয়া গিয়াছিলেন। যেমন শক্তিই জড়ের উপাদান, জড়কে শক্তিতে রূপায়িত করা সম্ভব।[১]

কাজেই তিনি যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, বাস্তবভূমিতে দাঁড়াইয়াই তাহা বলিয়াছেন কোন 'স্বপ্নলোক' হইতে নয়। স্থূলজগৎকে আমরা যতখানি 'বাস্তব', 'রিয়্যাল' বলিয়া অনুভব করি, ইহার পিছনে সূক্ষ্মতর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে-সব জগৎ আছে, সেগুলিকেও স্বামীজী সমভাবেই বা অধিকতর ভাবে 'রিয়্যাল' বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেন। আমরা সেগুলি দেখিতে পাই না বা দেখিবার জন্য যোগ্যতা-অর্জনে চেষ্টাও করি না বলিয়া সেগুলিকে 'স্বপ্নলোক' বলি, এবং সেগুলির কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের 'স্বপ্নলোকচারী' বলি। অধ্যাত্মসত্যদ্রষ্টাগণকে 'স্বপ্নবিলাসী' যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী পাশ্চাত্যে একবার বলিয়াছিলেন, 'সকল স্বার্থ বিসর্জন দিয়া, সমস্ত কুসংস্কার দূর করিয়া এইখানে এই শরীরেই ঈশ্বর লইয়া জীবনযাপন, তাঁহার ভাব লইয়া বিচরণ' করেন এরূপ স্বপ্নবিলাসী সেদেশে 'আরো কিছু বেশী থাকিলে ভাল হইত;...এই স্বপ্নবিলাস ও উনবিংশ শতাব্দীর দাম্ভিকতা—এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিপুল।' নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কোন কিছুকে সত্য বলার আর পরীক্ষাগারে না ঢুকিয়াই উহাকে মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করার মধ্যে যে পার্থক্য, এ পার্থক্য তাহা অপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম নয়।

কাজেই 'রিয়্যালিটি'র ভিত্তির উপর—আমাদের অতি আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তাও রিয়্যালিটির যে সীমিত অংশমাত্র স্পর্শ করে তাহা তো বটেই, তাহার অতীত প্রদেশে অবস্থিত অংশের উপরও—আংশিকভাবে নয় সামগ্রিকভাবে রিয়্যালিটির উপর দাঁড়াইয়াই স্বামীজী আধুনিক যুগের আদর্শ দিয়া গিয়াছেন এবং আচরণে তাহা স্থাপনও করিয়া গিয়াছেন। সে আদর্শ হইল ধর্মকে আঁকড়াইয়া থাকিয়া যথার্থ সাম্যস্থাপন; সর্ব-বিষয়ে মানুষের সর্ববিধ বিশেষ অধিকারের বিলোপসাধন; মানুষের দৃষ্টিকে রিয়্যালিটির অতি স্থূল অংশমাত্রে সীমিত রাখিয়া নয়, উহাকে তাহার সূক্ষ্মতর অংশেও বিস্তৃত করিয়া—সকলকেই 'ব্রাহ্মণত্বে' উন্নীত করিয়া—যথার্থ বিশ্বপ্রেমের প্রেরণায় বিশ্বমানবের সেবা; এককথায় ইহার ব্যবহারিক রূপ 'ঈশ্বর জ্ঞানে মানুষের সেবা', বা 'কর্মকে পূজায় রূপায়িত করা'—নিবেদিতার ভাষায় যাহার অর্থ, ক্ষেতখামার, কারখানা, গৃহস্থালী, শিক্ষায়তন প্রভৃতি মানুষের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রকে পূজা-মন্দিরে রূপায়িত করা। এ আদর্শে ঘৃণার, সংঘর্ষের স্থান নাই, আছে শুধু সত্যের বিমল আলোকে উদ্ভাসিত একত্ববোধ, প্রেম

১ স্বামীজী মহাসমাধি লাভ করেন ১৯০২ খৃষ্টাব্দে; আইনস্টাইন কর্তৃক এ সত্যটি আবিষ্কৃত হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে।

ও সেবা। আধুনিক কালের কোন জ্ঞানকেই এড়াইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই এ আদর্শের, ইহা সব কিছুকেই পরিতৃপ্ত করিয়া, সব কিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে সক্ষম, অধিকতর জ্ঞান ও মহিমায় ভাস্বর।

ধর্ম সাম্যপ্রতিষ্ঠায় সহায়ক

ধর্ম বলিতে অবশ্যই তিনি বিভিন্ন ধর্মমতোক্ত কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানমাত্রকে, বা কতকগুলি কুসংস্কার ও ধর্মোন্মত্ততাকে আঁকড়াইয়া থাকা বলেন নাই; বলিয়াছেন, 'যাহা মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ-সাধন করে', 'যাহা মানুষের অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তিকে' বিকশিত করে, যাহা 'মানুষকে পশুত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত করে', তাহাই ধর্ম; 'ধর্ম ও ঈশ্বর বলিতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য বোঝায়।' সত্যের উপলব্ধিই ধর্ম, সত্য সম্বন্ধে বৌদ্ধিক ধারণা বা সত্যে বিশ্বাসমাত্র নয়; আমরা যে দেহাতীত অমর আনন্দময় সত্তা—এই সত্যের উপলব্ধিই ধর্ম, দেহমনের মাধ্যমে বাহ্যবিষয়ভোগ-সুখে বিরত থাকাই ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা,—'সুখের জন্য বাইরের বস্তুর উপর নির্ভর না করে যতো ভিতরের বস্তুর উপর নির্ভর করবো -যতোই আমরা "আত্মসুখ", "আত্মারাম" হবো, আমরা ততোই আধ্যাত্মিক হবো। এই আত্মানন্দকেই ধর্ম বলা হয়।'

এ ধর্ম সর্বজনীন, সব ধর্মেরই স্বরূপ, কোন মতবাদ বা অনুষ্ঠান-বিশেষে সীমিত নয়; আবার এই ধর্মলাভের জন্য রুচি মতো যে কোন মতবাদ বা অনুষ্ঠানপদ্ধতিকে অবলম্বন করিতেও বাধা নাই। এ ধর্ম কখনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরকে শোষণ বা নিপীড়ন করিবার কথা ভাবিতে পারে না। এ ধর্ম মানুষকে দুর্বলতর করে না, অধিকতর শক্তিশালীই করিয়া তোলে। ইহার বিকৃত রূপ বা অপব্যবহারই যত কিছু অনর্থের মূল। ইহাকে বিকৃতি- ও অপব্যবহার-মুক্ত করিয়া মানব-কল্যাণে ইহার যথার্থ রূপকে গ্রহণ করিতেই হইবে। অপব্যবহার কোন সত্যের না হয়? বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিরও তো অপব্যবহার হইতেছে—মানুষের সর্বনাশসাধনেও আজ তাহা প্রযুক্ত। তাই বলিয়া বিজ্ঞানকে মানুষ ত্যাগ করিবে, না তাহার অপব্যবহার রোধ করিয়া তাহাকে কেবল মানবকল্যাণে প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হইবে? একমাত্র এই ধর্মই মানুষকে যথার্থ সাম্যে ও বিশ্বপ্রেমে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম, কোনও রূপ শাসনপদ্ধতি-মাত্র নয়। স্বামীজী তাই আমাদের সর্ববিধ প্রচেষ্টায় ধর্মকে সর্বাগ্রে আঁকড়াইয়া ধরিতে বলিয়াছেন। বলিয়াছেন ধর্ম না থাকিলে সকল অনিষ্টের মূল মানুষের স্বার্থ-পরতাকে বিনাশ করিবে কে? স্বার্থের জন্য ক্ষমতাসীন ব্যক্তির ক্ষমতার অপপ্রয়োগকে রোধ করিবে কে? বর্তমান পৃথিবীর দিকে তাকাইলে এ প্রশ্নটির গুরুত্ব যে কতখানি তাহা হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হয়। এই ধর্মকে বাদ দিয়া চলিলে যাহা ঘটিবে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন আজ তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে নানাস্থানে তাহাই ঘটিতেছে—যেখানে ধর্মের নামে ধর্মোন্মত্ততা ও কুসংস্কারকে আশ্রয় করা হইয়াছে সেখানেও, যেখানে ধর্মকে একেবারে বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে সেখানেও —'পাশবিক বল ও অর্থ'কে পুরোহিত করিয়া স্বার্থের পূজায় 'মানবাত্মাকে' বলি দেওয়া চলিতেছে! ধর্মের মাধ্যমে যদি মানুষকে অধিকতর নিঃস্বার্থপর, মানবপ্রেমিক, মানব-সেবাব্রতী করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে তাহাতে যে-কোনও মতবাদ লইয়া গঠিত রাষ্ট্র

ও সমাজের ক্ষতি হইবে, না পরম কল্যাণ হইবে?

কাজেই যথার্থ সাম্যপ্রতিষ্ঠার কাজে ধর্ম যে বিরোধী নয় বরং যেখানে সব মানুষই দেহামনাদির বিভিন্নতার ঊর্ধ্বে এক সেখানে লইয়া যায় বলিয়া একাজে পূর্ণ সহায়ক, স্বামীজী তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। কেবল কথায় নয়, আচরণেও। জনগণের উন্নতি-বিধান তিনি তাই করিতে বলিয়াছেন ধর্মকে আঁকড়াইয়া থাকিয়াই, জনগণকে যথার্থ ধর্ম-জীবনে উদ্বুদ্ধ করিয়াই।

বিশ্বাস নয়, প্রত্যক্ষই ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ

ঈশ্বর ও মানুষের দেহাতীত সত্তায় বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়াই তো ধর্ম দাঁড়াইতে পারে; এসব যে আছে তাহার প্রমাণ কি? বিশ্বের অন্যান্য বস্তুর মতো এসব তো প্রত্যক্ষ-গোচর নয়? কাজেই ঈশ্বর নাই দেহের জন্মমৃত্যুর সীমার বাইরে মানুষের কোন সত্তাও নাই।—এ যুগের যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক চিন্তায় ভাবিত জড়বাদী মনের এটি একটি প্রশ্ন, যুক্তি ও সিদ্ধান্ত। এ প্রশ্নটি উঠিয়াছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ইহার সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত উত্তরও দেওয়া হইয়া গিয়াছে। আমরা সকলেই জানি, স্বামী বিবেকানন্দের যুক্তিবাদী মন এদেশের এবং বিদেশের প্রায় সর্ববিধ আস্তিক ও নাস্তিক চিন্তার সহিত পরিচিত হইবার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, ঈশ্বর আছেন কি নাই তাহা বই পড়িয়া, যুক্তি দিয়া সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব; তাহার একমাত্র প্রমাণ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা। এই প্রত্যক্ষদর্শী তিনি খুঁজিতেছিলেন, এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে পাইয়া-ছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ 'আমি দেখিয়াছি' বলাতেও ঈশ্বরাস্তিত্বকে বিজ্ঞানসম্মত সত্যরূপে গ্রহণ করা চলে না। কারণ কোন বৈজ্ঞানিক, যত বড়োই তিনি হউন, 'আমি দেখিয়াছি', বা 'আমি বলিতেছি ইহা সত্য'— ইহা বলিলেই বিজ্ঞান কোন কিছুকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে না। যেভাবে তিনি সে সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেই পদ্ধতি ঘোষণা করা চাই, যাহা অনুসরণ করিয়া যাঁহাদের যোগ্যতা আছে তাঁহারা উহা যাচাইয়া লইতে পারেন। একজনের দেখিলে হইবে না, যাহা সত্য তাহা যাচাই করিয়া দেখিবার পথ সকলেরই জন্য উন্মুক্ত থাকা চাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই পর-ক্ষণেই বলিয়াছিলেন, 'তুই যদি চাস তোকেও দেখাতে পারি।' শুধু নরেন্দ্রনাথ নয়, সকলেই দেখিতে পারে; 'কিন্তু কে তা চায় বল?' চাই মানে 'আমাকে এখনই উচ্চতম বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি দেখাইয়া দাও' বলিলেই তো চলিবে না, উহা যাচাই করার মতো যোগ্যতা অর্জন করিতে চাহিতে হইবে দীর্ঘকাল শিক্ষার মাধ্যমে। ঈশ্বরদর্শনের পদ্ধতি ঘোষিত, সে পদ্ধতি অবলম্বনে চলিয়া যোগ্য হইতে হইবে। কয়জন তাহা চায়? পরীক্ষাগারে না ঢুকিয়াই, পরীক্ষা করিয়া ফলাফল না দেখিয়াই যদি ঘোষণা করি 'এ তত্ত্ব মিথ্যা'—সে কথার মূল্য যুক্তির দিক দিয়া কতখানি? ভগবানের সাকাররূপে অবিশ্বাসী নরেন্দ্রনাথ তাই মা-কালীর প্রথম দর্শনলাভের পরই বুঝিয়াছিলেন, সত্যদ্রষ্টা-নির্দিষ্ট সাধন-পথ অবলম্বনে চলিয়া নিজে যাচাই করিয়া দেখিবার পূর্বে শাস্ত্র-বা অবতারাদি-উক্ত সত্যগুলির সম্বন্ধে কোনওরূপ মন্তব্য করিবার অধিকারই আসে না কাহারো। এরূপ অনধিকারীর কথা—তিনি যত বড় চিন্তাশীলই হউন—অন্ধভাবে গ্রহণ করা আদৌ যুক্তি-বা বিজ্ঞানসম্মত কি?

অন্যদিক দিয়া দেখিলেও একই সিদ্ধান্তে আসিতে হয়। কেহ বলিতেছেন ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে আমি দেখিয়াছি। কেহ আবার বলিতেছেন না, নাই; যাঁহারা দেখিয়াছি বলেন, হ্যালুসিনেশন দেখিয়া ওরূপ বলেন। এ সংশয় নরেন্দ্রনাথও তুলিয়াছিলেন; 'মা-কালী বলিলেন না মাথার খেয়ালে দেখিলেন, বুঝিলেন কিরূপে? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন প্রমাণ করিয়া দিয়াছে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি পদে পদে আমাদের প্রতারিত করে।'—ইহার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান হইল—কাহারো কথা বিশ্বাস করিবার প্রয়োজনই নাই, তুমি নিজে উহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া লও। একথাও শ্রীরামকৃষ্ণ আধুনিক সংশয়ের প্রতীক নরেন্দ্র-

নাথকে বারবার জোর দিয়া বলিয়াছেন—আমি বলিতেছি বলিয়াই মানিয়া লইবার প্রয়োজন নাই—নিজে যাচাইয়া দেখিয়া লও।

ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব যুক্তি-বা বিজ্ঞানবিরোধী নয়

দেহের বিনাশে এমনকি মনবুদ্ধিরও বিনাশে আসল মানুষের বিনাশ নাই—মানুষ আসলে এক সর্বানুস্যূত চেতন আনন্দময় সত্তা এবং এই স্বরূপে সব মানুষই, বিশ্বের চেতন-অচেতন সব কিছুই যথার্থই এক—হাজার হাজার বছর পূর্বে ভারতের সত্যদ্রষ্টাগণকর্তৃক বিঘোষিত এবং চিরযুগে অসংখ্য সত্যদ্রষ্টাগণকর্তৃক উপলব্ধ এই সত্যেরই নব সমর্থন দিয়া গিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ, নিজ প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতেই। যুক্তির দিক দিয়াও ইহা যে বিজ্ঞানের আধুনিক-আবিষ্কারবিরোধী নয় তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন বহু ভাবে। তাহার মধ্যে একটি যুক্তিই এখানে উপস্থাপিত হইল :

যখন কোন বিজ্ঞানী জল হইতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিকাশ সাধন করেন, তিনি তাহা করিতে পারেন এই জন্য যে, জলে এগুলি পূর্ব হইতেই অন্তর্নিহিত ছিল। অণু হইতে পরমাণুর, পরমাণু হইতে শক্তির বিকাশসাধন সম্বন্ধেও একই কথা প্রয়োজ্য—কোন বস্তুর ভিতর পূর্ব হইতে কিছু অন্তর্নিহিত না থাকিলে উহা হইতে তাহার বিকাশসাধন অসম্ভব। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অণু পরমাণু বা শক্তির ভিতর প্রাণ, ইচ্ছা, মন প্রভৃতি সূক্ষ্ম শক্তি এবং চেতনা পূর্ব হইতেই প্রচ্ছন্ন না থাকিলে কোন পরিবেশে কোন সমবায়-প্রক্রিয়াতেই সেগুলির ভিতর হইতে এসবের বিকাশ সম্ভবই হইত না। কি বলিবার আছে আমাদের এযুক্তির বিরুদ্ধে? প্রভৃতিকে তো আর আকর্ষণ-বিকর্ষণ, ঘনত্ব-লঘুত্ব, রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতির পর্যায়ভুক্ত সমবায়-উদ্ভূত গুণ বলা চলে না—ইহা সূক্ষ্মতর-শক্তি যাহা প্রাকৃতিক নিয়মের সহায়তায় জড়শক্তিকেও পরিকল্পনানুসারে পরিচালিত করিতে পারে, যাহা এনারজি, অণু, পরমাণু প্রভৃতি করিতেই পারে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, স্বামীজী অন্যান্য সত্য-দ্রষ্টাদের মতো, বিজ্ঞানীদের মতো নিজের প্রত্যক্ষ করা সত্যই প্রচার করিয়াছেন ; যুক্তি দিয়াছেন শুধু আমাদের নিকট তাহা বোধগম্য করিবার জন্য—পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতো যুক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই! তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন জড়জগৎকে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যেমন কতকগুলি জড়কণা বা অচেতন শক্তির সমুদ্ররূপেই দেখা যায়, তেমনি সূক্ষ্মতর সত্য প্রত্যক্ষের শক্তি আসিলে এই জগৎকেই একটি মানস-সমুদ্ররূপে দেখা যায়, প্রত্যক্ষের শক্তি আরো বাড়িলে দেখা যায় চৈতন্যের সমুদ্ররূপে। প্রত্যক্ষদর্শীর কথা হইল, 'সাক্ষাৎ দেখিতেছি তিনিই সব হইয়া রহিয়াছেন। বিচার আর কি করিব?' তবে যুক্তির যতখানি সীমা, তাহার মধ্যে এই প্রত্যক্ষ-করা সত্য যে যুক্তিবিরোধী নয়, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যের বিরোধীও নয়, বিবেকানন্দ তাহা যুক্তির দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন।

আধুনিক যুগের সাম্যবাদের চিন্তা, বিজ্ঞানচিন্তা এবং মানুষের চিরদিনের ধর্ম-চিন্তার মধ্যে যে বিরোধ এবং সামঞ্জস্য-হীনতা আজ আপাতদৃষ্টিতে প্রকট, স্বামী বিবেকানন্দ মানবজাতির এইসব চিন্তার সহিত সুপরিচিত হইয়াই সে বিরোধের নিরসন করিয়া, এগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়া, এ-সব কিছুর ভিতর হইতে মানবজাতির পক্ষে যথার্থ কল্যাণকর শাস্ত্রার্থ চয়ন করিয়া নবযুগের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন শুধু কথায় নয়, আচরণেও। তিনিই নবযুগের আচার্য, তাঁহার আদর্শানুসরণেই আমাদের কল্যাণের পথ প্রশস্ততর হইবে—রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, আন্তর্জাতিকতা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই।

যোগবাসিষ্ঠসারঃ

[পূর্বানুবৃত্তি]

[অনুবাদ ঃ স্বামী ধীরেশানন্দ]

৪। মনোলয় প্রকরণ

বসিষ্ঠ উবাচ—

এষ স্বভাবাভিমতং স্বতঃ সংকল্প্য ধাবতি।

চেতনা স্বয়মম্লানা সৈবেহ মন আত্মনঃ ॥ ১

অনুবাদ ঃ বসিষ্ঠ বলিলেন—চেতনা (চিৎ) নিজে অম্লানা (হ্রাসবৃদ্ধিরহিত, কূটস্থ, নিত্য); আবার ইহাই নিজের মন (মনের আকার ধারণ করে); এবং নিজ হইতেই নিজের ইচ্ছামত পদার্থ কল্পনা করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়।

এতস্মাৎ সর্বগাৎ দেবাৎ সর্বশক্তের্মহাত্মনঃ।

বিভাগকল্পনাশক্তির্লহরীবোত্থিতাম্ভসঃ ॥ ২

সর্বব্যাপক, সর্বশক্তিমান, অপরিচ্ছিন্ন এই পরমেশ্বর হইতেই এই বিশ্ববিভাগরচনাময়ী শক্তি জল হইতে তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হইয়াছে।

অতঃ সংকল্পসিদ্ধেয়ং সংকল্পেনৈব শাম্যতি।

যেনৈব জায়তে তেন বহ্নিজ্বালেব বায়ুনা ॥ ৩

যাহা যে বস্তু দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা সেই বস্তু দ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, যেমন অগ্নি বায়ু-সহায়ে উৎপন্ন হইয়া পুনঃ বায়ু দ্বারাই নির্বাপিত হয়, তদ্রূপ। অতএব বিষয়-সংকল্প দ্বারা সিদ্ধ এই সংসার-পরম্পরা (ব্রহ্মবিষয়ক) সংকল্প দ্বারাই নষ্ট হইয়া থাকে।

মনোঽমুনৈবাভ্যুদিতং মনাগেবানবেক্ষণাৎ।

স্বস্বপ্নমরণাকারং প্রেক্ষমাণং ন বিদ্যতে ॥ ৪

অতি অল্প বিচারাভাবেই এই সংকল্পপ্রভাবে মন স্বস্বপ্নদৃষ্টমরণতুল্য বৃথা কল্পিত হইয়া থাকে। বিচারদৃষ্টিতে দেখিলে উহার অস্তিত্ব আর পাওয়া যায় না।

অসম্যগ্‌দর্শনং যৎ স্যাদনাত্মন্যাত্মভাবনম্।

যদবস্তুনি বস্তুত্বং তন্মনো বিদ্ধি রাঘব ॥ ৫

বসিষ্ঠ বলিতেছেন—'হে রঘুবংশতিলক রামচন্দ্র, অনাত্মা দেহাদি বস্তুতে যে আত্মত্ববুদ্ধি, তাহা ভ্রান্তিজ্ঞান। মিথ্যাভূত সংসারে যে সত্যত্বজ্ঞান তাহাই মন জানিও।

অয়ং সোঽহমিদং তন্মে এতাবন্মাত্রকং মনঃ।

তদভাবেন মাত্রেণ বিচারেণ বিলীয়তে ॥ ৬

এই দেহরূপ আত্মাই আমি, এই যে ধনাদি পদার্থ উহা আমার—মন এইরূপ মিথ্যা-জ্ঞানাত্মক (উহা বস্তুতঃ নাই)। এইরূপ বিচারের দ্বারাই এই মন বিলীন হইয়া থাকে।

উপাদেয়ানুপতনং হেয়ৈকান্তবিবর্জনম্।
যদেতন্মনসো রূপং তদ্‌বন্ধং বিদ্ধি নেতরম্ ॥ ৭

উপাদেয় বস্তুর গ্রহণ ও হেয় বস্তুর একান্ত পরিত্যাগ—ইহাই মনের রূপ, উহাই বন্ধ জানিও, অপর কিছুই নহে।

মনো হি জগতাং কর্তৃ মনো হি পুরুষঃ স্মৃতঃ।
মনঃকৃতং কৃতং লোকে ন শরীরকৃতং কৃতম্ ॥
যেনৈবালিঙ্গিতা কান্তা তেনৈবালিঙ্গিতা সুতা ॥ ৮

মনই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকে, মনই পুরুষ (পুরুষ মনোময়), মনের (যে ভাব) দ্বারা যাহা করা হয়, উহা তদ্রূপই হইয়া থাকে, শরীর দ্বারা যাহা করা হয় উহা বস্তুতঃ করা নহে। কারণ লোকে (কামাতুর হইয়া) যে শরীর দ্বারা স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে, সেই শরীর দ্বারাই (অপত্যস্নেহবশে) স্বীয় শিশু দুহিতাকেও আলিঙ্গন করিয়া থাকে। (বাহ্যদৃষ্টিতে ক্রিয়া একরূপ হইলেও মানসিক ভাবের ভেদবশতঃ উহা ভিন্ন হইয়া থাকে। অতএব মনের ভাবই প্রধান)।

চিত্তং কারণমর্থানাং তস্মিন্ সতি জগৎত্রয়ম্।
তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণং তচ্চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ ॥ ৯

চিত্তই যাবতীয় পদার্থের কারণ। চিত্ত বিদ্যমান থাকিলেই ত্রিজগৎও সত্যরূপে প্রতীতি-গোচর হয়, চিত্ত ক্ষীণ অর্থাৎ নির্বাসনা হইলে পুরুষের নিকট জগৎ থাকিয়াও নাই। অতএব প্রযত্নের সহিত এই চিত্ত অর্থাৎ মনের চিকিৎসা করা কর্তব্য।

রাম বাসনয়া বদ্ধং মুক্তং নির্বাসনং মনঃ।
তস্মান্নির্বাসনীভাবমাহরাশু বিবেকতঃ ॥ ১০

বসিষ্ঠ বলিতেছেন—'হে রাম, মন বাসনা দ্বারাই বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং মন কামনা-রহিত হইলেই মোক্ষ লাভ হয়। অতএব তুমি শীঘ্র বিবেকসহায়ে (বিচারের সহায়ে) মনের সর্ববাসনা নিরাকরণ কর।

যথাভ্রলেখা শশিনং সুধালেপং মষী যথা।
দূষয়ত্যেবমেবান্তর্নরমাশাপিশাচিকা ॥ ১১

মেঘরেখা যেপ্রকার চন্দ্রমাকে কলঙ্কিত করে, মষী (কৃষ্ণবর্ণ কালি) যেরূপ সুধা অর্থাৎ চূর্ণদ্বারা লিপ্ত ধবল প্রাচীরগাত্রকে বিরূপ করিয়া দেয়, তৃষ্ণারূপিণী পিশাচীও তদ্রূপ পুরুষকে অর্থাৎ তাহার চিত্তকে দূষিত করিয়া থাকে।

অন্তর্মুখতয়া সর্বং চিদ্‌বহ্নৌ ত্রিজগৎতৃণম্।
জুহ্বতোঽন্তর্নিবর্তেত রাম চিন্তাদিবিভ্রমঃ ॥ ১২

বসিষ্ঠ বলিতেছেন—'হে রামচন্দ্র, অন্তর্মুখ হইয়া তৃণসদৃশ অতি তুচ্ছ এই সমস্ত ত্রিভুবন অন্তরে চিদ্রূপ অগ্নিতে হবনকারী পুরুষের চিন্তাদিবিভ্রম অচিরেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। অথবা

বহ্নিতে হবন করিলে তৃণ যেমন (নিঃশেষে) দগ্ধ হইয়া যায়, তেমন (পুরুষ) অন্তর্মুখ হইলে ভিতরে মন হইতে আরম্ভ করিয়া বাহিরের সারা বিশ্ব (ত্রিজগৎ) (নিঃশেষে) ধ্বংস হইয়া যায়। (অতএব রাম, তুমি অন্তর্মুখ হও)।

যদা ন ভাব্যতে কিঞ্চিৎ হেয়োপাদেয়রূপবিৎ।
স্থীয়তে সকলং ত্যক্ত্বা তদা চিত্তং ন জায়তে ॥ ১৩

যখন ত্যাজ্যগ্রাহ্যবেত্তা চিত্ত সর্বপদার্থ (মিথ্যাবোধে) ত্যাগকরতঃ (শান্তরূপে) অবস্থান করে এবং কোন বিষয়বস্তুই আর স্মরণ করে না, তখনই চিত্ত বিলীন হয়।

ঘোরং জাগ্রন্ময়ং চিত্তং মূঢ়ং স্বপ্নে ব্যবস্থিতম্।
শান্তং সুষুপ্তিভাবস্থং ত্রিভির্হীনং মৃতং ভবেৎ ॥ ১৪

জাগ্রদবস্থাপন্ন চিত্ত ঘোর অর্থাৎ দুঃসহদুঃখদায়ী, স্বপ্নকালে চিত্ত মূঢ় হইয়া থাকে এবং সুষুপ্তিকালে চিত্ত শান্তভাবে অবস্থান করে। এই তিন অবস্থারহিত হইলে চিত্ত তখন বিলীন হয়। (তুরীয়াবস্থায় চিত্তের অদর্শন ঘটিয়া থাকে। অতএব তুরীয় অবস্থারই ভাবনা করা কর্তব্য)।

বিলাপ্য পঙ্কং কতকংরজোঽম্বু বিলয়ং নয়েৎ।
যথাত্মনি তথা বিদ্ধি বিলাপ্য বিলয়ং মনঃ॥ ১৫

কতকচূর্ণ (নির্মলীফলচূর্ণ) যেপ্রকার ধূলি বিলীনকরতঃ জলস্থিত পঙ্ক নাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মাতে মনকে বিলীনকরতঃ মনের নাশ সম্পাদন করিতে হয় জানিও।

চিত্তং জানীহি সংসারং বন্ধশ্চিত্তমুদাহৃতম্।
পাদপঃ পবনেনেব দেহশ্চিত্তেন চাল্যতে ॥ ১৬

চিত্তকেই সংসার বলিয়া জানিও, চিত্তকেই বন্ধ বলা হইয়াছে। বৃক্ষ যেমন বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হয়, এই দেহও তদ্রূপ চিত্ত দ্বারাই চালিত হইয়া থাকে।

হস্তং হস্তেন সংপীড্য দন্তৈর্দন্তাংশ্চ পীডয়ন্।
অঙ্গান্যঙ্গৈঃ সমাক্রম্য জয়েদাদৌ স্বকং মনঃ ॥ ১৭

হস্তদ্বারা হস্ত, দন্তদ্বারা দন্ত ও অঙ্গদ্বারা অঙ্গ পীড়ন করিয়া (অর্থাৎ সর্ব অঙ্গ স্থির করিয়া) সর্বপ্রথমে নিজের মনকে জয় কর।

চিত্তমেকং ন শক্নোতি জেতুং স্বাতন্ত্র্যবর্তি যঃ।
ধ্যানবার্তাং বদন্ মূঢ়ঃ স কিং লোকে ন লজ্জতে ॥ ১৮

লোকের কাছে যে মূঢ় ব্যক্তি ধ্যানের প্রসঙ্গ করে, কিন্তু নিজের স্বচ্ছন্দচারী চিত্তকে জয় করিতে পারে না, সে লজ্জাবোধ করে না কেন ?

এক এব মনো দেবো জয়ঃ সর্বার্থসিদ্ধিদঃ।
অনেন বিফলক্লেশঃ সর্বেষাং তজ্জয়ং বিনা ॥ ১৯

এক মনরূপী দেবতাকেই জয় করা কর্তব্য। বিজিত মনই সর্বপ্রয়োজনসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। অতএব মনোজয় বিনা অন্য সর্ব সাধনানুষ্ঠানক্লেশ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া থাকে।

অনুদ্বেগঃ শ্রিয়ো মূলমনুদ্বেগাৎ প্রমুচ্যতে।

জন্তোর্মনোজয়াদন্যস্ত্রৈলোক্যবিজয়স্তৃণম্ ॥ ২০

সর্বপ্রকার উদ্বেগের অভাবই সর্বপ্রকার সম্পদের হেতু, অনুদ্বেগ হইতেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। পুরুষের মনোজয় ভিন্ন অন্য ত্রিভুবনজয়ও তৃণবৎ তুচ্ছ।

সৎসঙ্গো বাসনাত্যাগোঽধ্যাত্মবিদ্যাবিচারণম্।

প্রাণস্পন্দনিরোধশ্চেত্যুপায়াশ্চেতসো জয়ে ॥ ২১

সৎসঙ্গ, বাসনাত্যাগ, অধ্যাত্মবিদ্যাবিচার ও প্রাণায়াম বা প্রাণস্পন্দনিরোধ—এই চারিটি চিত্তজয়ের উপায়।

পূর্ণে মনসি সংপূর্ণং জগৎ সর্বং সুধাদ্রবৈঃ।

উপানদ্‌গূঢ়পাদস্য নম্ন চর্মাবৃতেন ভূঃ ॥ ২২

চর্মনির্মিত পাদত্রাণব্যবহারকারী পুরুষের নিকট যেমন সমস্ত পৃথিবী নিশ্চিতরূপে চর্মাবৃত বলিয়াই মনে হয়, তদ্রূপ মনোজয় হইলে সর্ব জগৎ সুধারসে পরিপূর্ণ প্রতিভাত হইয়া থাকে।

নাহং ব্রহ্মেতি সংকল্পাৎ সুদৃঢ়ং বধ্যতে মনঃ

সর্বং ব্রহ্মেতি সংকল্পাৎ সুদৃঢ়ং মুচ্যতে মনঃ ॥ ২৩

আমি ব্রহ্ম নহি, আমি জীব—এইরূপ ভাবনাদ্বারাই মন দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়; এবং সবই ব্রহ্মরূপ—এইরূপ ভাবনা দ্বারাই মন নিশ্চিতরূপে মুক্ত হইয়া থাকে।

চিত্তে ত্যক্তে লয়ং যাতি দ্বৈতমৈক্যং চ সর্বতঃ।

শিষ্যতে তু পরং ব্রহ্ম শান্তং নিত্যমনাময়ম্ ॥ ২৪

চিত্ত বিলয় হইলে তৎসহ সর্ব-দ্বৈত-এবং ঐক্যজ্ঞানও সর্বপ্রকারে বিলীন হয়, তখন একমাত্র শান্ত, নিত্য, নিরুপদ্রব পরব্রহ্মমাত্রই অবশিষ্ট থাকেন।

চিন্মাত্রত্বং প্রযাতস্য তীর্ণমৃত্যোঃ সচেতসঃ।

যো ভবেৎ পরমানন্দঃ কেনাসাবুপমীয়তে ॥ ২৫

ইতি যোগবাসিষ্ঠসারে মনোলয়াখ্যং চতুর্থং প্রকরণম্।

ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত, জরামৃত্যুরহিত, স্বস্থচিত্ত জ্ঞানীর যে পরমানন্দ অনুভব হইয়া থাকে, উহা অপর কিছু সহ তুলিত হইতে পারে না।

যোগবাসিষ্ঠসার গ্রন্থের মনোলয় নামক চতুর্থ প্রকরণ সমাপ্ত।

কৃপা

শ্রীউমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রথম প্রথম পূজ্যপাদ মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রতি কোনই আকর্ষণ অনুভব করতাম না। তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমা অনুভব করবার ক্ষমতাও আমার ছিল না। তাঁকে প্রণাম করতে গেলে তিনি কথা তো বলতেনই না, একবার তাকিয়েও দেখতেন না। পরে অবশ্য লক্ষ্য করেছি তিনি তাকিয়ে দেখতেন—প্রণামের সময় প্রণত ব্যক্তির অজ্ঞাতে তার সর্বাঙ্গে একবার নিজের চোখটা বুলিয়ে নিতেন; এবং শুনেছি তাতেই তার অন্তর বাহির সব দেখতে পেতেন। শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের (স্বামী প্রেমানন্দ) ব্যবহার ছিল অন্যরকম। তিনি যেন কোলে টেনে নিতেন। দেখা মাত্র কুশলপ্রশ্ন, 'কোথা থেকে এসেছ', 'কোন্ পথে এসেছ,' 'কোন কষ্ট হয়নি ত'? তারপর প্রসাদ দেওয়ানো ইত্যাদি। তাঁর এই প্রেমে আমার (বোধ হয় আরও অনেকের) দৃষ্টি আচ্ছন্ন ছিল, মঠের অপর কোন মহারাজকে মনে ধরতো না।

এই প্রেমিক মহারাজকে কি আমি খুঁজে বার করেছিলাম? তা নয়! বরং তিনিই আমাদের মতো অভাজনদের খোঁজে আমাদেরই কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই বৃত্তান্ত একটু দেওয়া দরকার। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী তাঁর গ্রামে (বিক্রমপুর বিদগাঁ) ৺ঠাকুরের উৎসব করেন। বিক্রমপুরে এটিই বোধ হয় প্রথম ঠাকুরের উৎসব। চক্রবর্তী মহাশয়ের কলিকাতায় অধ্যয়নকালে পূজনীয় শরৎ মহারাজ ও পূজনীয় শশী মহারাজ তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ঐ সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন স্পর্শন ও কিছু উপদেশ পেয়ে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। তিনি পূজনীয় শরৎ মহারাজকে এই উৎসবে যোগদান করার আহ্বান জানান। কিন্তু ঐ সময় তিনি বিশেষ কোন কাজে ব্যস্ত থাকায় পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে পাঠিয়ে দেন। ব্রহ্মচারী রাম মহারাজ এবং আরও দু-একজন ভক্ত সঙ্গে নিয়ে বাবুরাম মহারাজ কলকাতা থেকে গোয়ালন্দ হয়ে ষ্টীমারে লোহজঙ্গ ষ্টেশনে নেমে সেখান থেকে নৌকায় ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ তারিখ বিকালে বিদগাঁ বাজারের ঘাটে অবতরণ করেন।

উৎসব শেষ হ'ল। শেষ হতে না হতেই বেলুড় মঠ থেকে এই মর্মে টেলিগ্রাম এল—বাবুরাম মহারাজকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দাও। বিক্রমপুরের দূর দূর গ্রাম থেকে ভক্তেরা উৎসবে এসেছিলেন। অনেকের ইচ্ছা ছিল মহারাজকে নিয়ে যাবেন, কিন্তু ঐ টেলিগ্রাম সকলকে নিরস্ত করল। কিন্তু কলমা গ্রামের জমিদার এবং তাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত ও নিজেদের ব্যয়ে পরিচালিত স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূপতিচন্দ্র দাশ গুপ্তকে লক্ষ্য করে বাবুরাম মহারাজ বললেন, "আমি এঁদের বাড়ী যাব।" সঙ্গে সঙ্গে গীতার 'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে'—শ্লোকটিও আওড়ালেন। টেলিগ্রামরূপ বাধার কথা উঠলে মহারাজ উত্তর করলেন—দু-একদিনের বিলম্বে কিছু এসে যাবে না। ভূপতিবাবুর প্রিয় ছাত্র হিসাবে প্রবন্ধকার তার দু-একজন সহপাঠী সহ উৎসবের আসর

সাজাবার জন্য উৎসবের পূর্বদিন হতে উপস্থিত ছিল। সে এসব অধিকাংশই দেখাশুনার সুযোগ পেল। এদের তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়ে গেছে, অখণ্ড অবসর। তখন সকালবেলা; আমাদের কলমা পাঠান হল, সেখানে যাতে এঁদের অভ্যর্থনার সুব্যবস্থা হয়। দু-রাত্রি বিদগাঁয় অবস্থানের পর ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ তারিখে মধ্যাহ্নভোজনের পর একটি পানসী নৌকায় মহারাজ সদলবলে কলমায় রওনা হলেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে নৌকা কলমা বাজারে পৌঁছালে স্থানীয় কীর্তনের দল উচ্চ সংকীর্তন জুড়ে দিলেন, মহারাজও ছপ্পরের বাইরে এসে এঁদের উৎসাহ বর্ধন করলেন। নৌকা বাজার থেকে সরু খালে ঢুকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হল আর কীর্তনের দলও খালের পাড়ের সড়ক দিয়ে চলতে লাগল এবং অবশেষে ভূপতি বাবুদের বিশাল অট্টালিকার কিয়দ্দূরে দক্ষিণ দিকের ঘাটে লাগল। আগে পাছে কীর্তনদল মহারাজকে নিয়ে ভূপতিবাবু-দের নীচতলার বারান্দায় উঠে তুমুল কীর্তন জুড়ে দিল। পূবে-পশ্চিমে বিশাল লম্বা বারান্দা। তার পূব প্রান্তে ঠাকুরঘর। কীর্তন থেমে গেলে মহারাজ ভাবস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, আর বালকের দল মহারাজের পায়ে পড়ে প্রণাম করতে লাগল। কিন্তু এক বয়স্ক ব্যক্তি প্রণামে উদ্যত হওয়া মাত্র মহারাজ সাষ্টাঙ্গ হয়ে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হয়ে পড়লেন। সেই ভদ্রলোকের আর প্রণাম করা হল না। আর যে বালকেরা প্রণাম করেছিল, পরবর্তী জীবনে তারা বেলুড় মঠে দীক্ষা নিয়েছিল।

রাত্রে আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা দোতলায় হল। ভোরে ভূপতিবাবুদের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীকান্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাওয়ার পথে (বিদ্যালয় তাঁদেরই বহির্বাটীতে অবস্থিত) ভূপতিবাবুদের খুল্লতাত তারাকান্ত দাশ চৌধুরীর বৈঠকখানায় গিয়ে গ্রামের প্রধান বিবেচনায় তাঁর সঙ্গে সৌজন্য-সাক্ষাৎকার করেন। উঠে আসবার সময় এক গ্লাস জল চেয়ে পান করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শন করে ফিরবার সময় অবশ্য তাঁরা মহারাজকে জলযোগ করিয়ে দেন। বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে মৌলভী সাহেবের খোঁজ করেন এবং তাঁর পিঠ চাপড়ে বলেন, "দেখবেন মৌলভী সাহেব, হিন্দু-মুসলমানে যেন বিরোধ না হয়।"

এর পরে সংকীর্তন সহ তাঁকে কলমার ৺কালীবাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ৺কালীমাতা বিনোদেশ্বর বাবুদের পূর্বপুরুষ কর্তৃক ২০০ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা (২০০ × ৪০০ হাত) এক বিশাল দীঘির পশ্চিম পাড়ে এই পাকা মন্দির অবস্থিত। এই দিঘীটি মজে গিয়েছিল, ভিতরে চাষাবাদও চলছিল; ভূপতিবাবু ৩০০০৲ টাকা ঋণ করে সম্প্রতি এর পঙ্কোদ্ধার করিয়েছিলেন। গত রাত্রে তারই উত্তরপারের চাতালটা কোন প্রকারে সমতল করে একটা চালা খাড়া করে তার মধ্যে ৺ঠাকুরের ছবি বসিয়েছিলেন। এই হ'ল সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি। সংকীর্তনদল মহারাজকে নিয়ে দিঘীর পূর্বপার দিয়ে উত্তরপারে উপস্থিত হল। মহারাজ ৺ঠাকুরের ছবির সম্মুখে বসলেন; 'শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ' থেকে একজন কিয়দংশ পাঠ করলেন। তারপর মহারাজ ঐ চাতালের এদিক ওদিক ঘুরে বলতে লাগলেন, "বেশ স্থান, কত সাধুভক্ত এখানে আসবে।" পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ আশ্রমের সূচনা করে গেলেন, পূজনীয় খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এই আশ্রমের কুঁড়েঘরে ৭ দিন

কাটিয়ে গেলেন, তারপরে কত সাধুভক্ত যে এই দুই মহাপুরুষের পদধূলিপূত পুণ্যভূমি-দর্শনে এসেছেন তার ইয়ত্তা নাই।

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পরে সংকীর্তনের দল মহারাজকে নিয়ে দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়ে দক্ষিণমুখো হয়ে বিনোদেশ্বর বাবুদের ৺কালী-মন্দিরে উপস্থিত হল এবং সেখানে খানিকক্ষণ কীর্তন করার পর মহারাজ নাটমন্দিরে চেয়ারে বসে বিশ্রম্ভালাপ করতে লাগলেন। লেখক মহারাজকে হাওয়া করছিল। তিনি আসন ছেড়ে ৺কালীমন্দিরে প্রণাম করে মন্দিরের পশ্চিম ধারের ছোট উঠান দিয়ে উত্তরমুখো হয়ে মা-কালীর পাকশালা ও বিনোদবাবুদের এক অন্দরের ঘরের মধ্যবর্তী গলি দিয়ে পশ্চিম-মুখো হয়ে বিনোদবাবুদের অন্দরের উঠানে ঢুকলেন এবং দক্ষিণমুখো হয়ে সোজা তাঁর ঠাকুরঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। লেখক তাঁর পাছে পাছে। মহারাজ প্রণাম করে আবেগ ও উচ্ছ্বাস ভরে কত কি বলতে লাগলেন—"ও রাম! ও রাম! দেখবে এস, দেখবে এস, ঠাকুর নিজেই এখানে এসে বসে আছেন, আর আমরা কিনা মনে করি, তাঁকে প্রচার করছি। প্রভু নিজেই আপনাকে প্রচার করে বসে আছেন, আর তাই দেখাবার জন্য এই অলিগলি দিয়ে আমাকে নিয়ে এসেছেন। ধিক্ আমাদের অহঙ্কার অভিমানকে! ছি! ছি! থুক্ থু! নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু! জয় প্রভু! জয় প্রভু!" ইত্যাদি ইত্যাদি। অত উচ্ছ্বাস আবেগ লিখে প্রকাশ করা যায় না। এক বেলগাছের নীচে ঠাকুরঘরটি ছিল। ঠাকুর-ঘরটি লক্ষ্য করে কত আনন্দ করলেন; শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিতে শুভ্র জুঁই ফুলের মতো যে কাপড়ের মালাটি পরানো হয়েছিল, চন্দন দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে যে অলকা তিলকা পরানো হয়েছিল, একটি একটি করে ঐগুলির উল্লেখ করে প্রশংসা করলেন।

স্নানান্তে মহারাজ ঐ ঠাকুরঘরে বসে জপধ্যান করলেন। তারপর অন্নভোগ, প্রসাদ-বিতরণ, বিশ্রাম। সন্ধ্যায় সমবেত মেয়েদের কাছে কৃষ্ণ-কালী যে অভেদ এই সম্বন্ধে একটি কথিকা বললেন এবং জ্যোৎস্নালোকে সকলে ভূপতিবাবুদের বাড়ীতে ফিরে এলেন। সেদিন ছিল বুদ্ধপূর্ণিমা।

রাত্রে সেখানে আহার ও বিশ্রামের পর শেষ-রাত্রে একটি দো-মাল্লাই নৌকায় মহারাজদ্বয় ভূপতিবাবু, বিনোদবাবু এবং তাঁদের অনুগৃহীত ছাত্র হিসাবে আমি চারু বলে নীচের ক্লাসের একটি ছেলের সঙ্গে সেই নৌকাতে ষ্টীমার ষ্টেশন লোহজঙ্গ রওনা হলাম। সেই পাবকসদৃশ প্রেমানন্দ স্বামীর সান্নিধ্যে ঘণ্টা দুই কাটালাম। সেই অবধি এই লৌহময় 'আমিটা' কাঞ্চনে পরিণত হচ্ছে, পুরোপুরি কাঞ্চন হলেই বোধ হয় রেহাই পাবে। অন্ধকার থাকতেই মহারাজদ্বয় ডাঙ্গায় নেমে প্রাতঃ-কৃত্যাদি সারলেন, তারপর রোদ উঠল, ষ্টীমার এলো। শ্রীযুক্ত ভূপতিবাবু, বিনোদবাবু মহারাজদের নিয়ে ষ্টীমারে উঠলেন, বিনোদ-বাবু তাঁদের গোয়ালন্দ ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবেন আর ভূপতিবাবু মহারাজদের সঙ্গে বেলুড় মঠে গিয়ে কয়েকদিন থাকবেন। আমরা দু'জন জয়ধ্বনি দিয়ে তাঁদের তুলে দিলাম, এবং ষ্টীমার দূরে চলে গেলে আমাদের চোখের আলো যেন নিভে গেল। শূন্য হৃদয়ে কী কষ্টে যে বাড়ী ফিরলাম তা বলবার নয়।

কলকাতার কলেজে ভর্তি হলাম। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের আকর্ষণে মাসে অন্ততঃ ২টি রবিবার মঠে যাই। গঙ্গাস্নান, ঠাকুর-দর্শন, প্রসাদগ্রহণ ও বিশ্রাম ক'রে

এবং সন্ধ্যারতি দেখে অথবা পূর্বেই কলিকাতায় মেসে ফিরি। এই চলে। কলকাতা থেকে রওনা হয়ে মঠে পৌঁছে প্রায়ই দেখি পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ পুরাতন ঠাকুরঘরের নীচ-তলায় বসে কুটনা কুটছেন। আমি প্রণাম করতেই জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজকে প্রণাম করে এসেছিস ?" উত্তরে "না" বলতেই গর্জে উঠলেন এবং বাহু প্রসারিত করে ক্রমোচ্চ কণ্ঠে "যা! যা! যা!" বলতে বলতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের কথায় প্রায়ই আবেগ-উত্তেজনা থাকত। যা হ'ক এরকম আর একদিন ঘটবার পর, এই নাটকীয় দৃশ্য এড়াবার জন্য আমি ঠাকুরপ্রণাম করে রাজা মহারাজকে প্রণাম করেই তবে বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করতে যেতাম। এই রকম একদিন প্রণাম করতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন —"তুই চান করে এসেছিস ?" "আজ্ঞে হ্যাঁ" —বলতেই বললেন, "ছাখ, মহারাজ বরানগর যাচ্ছেন, তুই তাঁর নৌকায় চলে যা, আমরাও পরে সেইখানে যাব, মা ঠাকরুণ সেইখানে আসবেন।" শুনে তো আমি হতবাক্! মহারাজের সঙ্গে এক নৌকায় যাব কি করে! সে যে অসম্ভব বাবুরাম মহারাজের তাড়নায় আজকাল তাঁকে একটা প্রণাম করে আসি বটে, তা বলে এক নৌকায় বসে যাওয়া যায় না। মনের এই দ্বন্দ্বটা বাবুরাম মহা-রাজকে খুলে বললেই হ'ত, তা'ও বললাম না। নৌকা চলে গেল। বেলায় যখন বাবুরাম মহারাজ মঠের বহু সাধু ভক্ত নিয়ে রওনা হলেন তখন ভিজিটারস্ রুমে গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম। মঠে প্রসাদ পেতে গিয়ে দেখ-লাম খালি, মোটে দু-একজন প্রসাদ পাচ্ছে। প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করে বেলা পড়তেই ভাবলাম, এইবার বাবুরাম মহারাজ না ফিরতেই সরে পড়ি। কিন্তু শুভ বুদ্ধির উদয় হ'ল। ভাবলাম ক্রমান্বয়ে দুটো অপরাধ করেছি, এখন তৃতীয় আর একটি করতে যাচ্ছি। না—বাবুরাম মহারাজ আসুন, তাঁর বকুনি খেয়েই তবে ফিরব। সূর্য অস্ত যায়, এমন সময় বাবুরাম মহারাজের নৌকা আসছে দেখা গেল। তিনি ছপ্পরের বাইরে দাঁড়িয়ে। নৌকা ভিড়ল। তিনি উপরে উঠে এলেন, আমি গিয়ে সামনে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখেই যেন ফেটে পড়লেন—"তুই যাসনি কেন আহাম্মক কোথাকার?" আহাম্মক বললে কম বলা হয়। আহাম্মকির একেবারে চূড়ান্ত করলাম। মহারাজ যে আমাকে কৃপা করবেন, বাবুরাম মহারাজ এটা নিশ্চয়ই জানতেন। গঙ্গাবক্ষে তিনি আমাকে ঐ বিষয়ে প্রাথমিক কোন উপদেশ দিতে পারতেন; ইতিপূর্বে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনলাভ ঘটেনি, বরানগরে তাঁর দর্শন লাভ করে কৃতার্থ হতে পারতাম; নিজের আহাম্মকিতে তাও হ'ল না। বাবুরাম মহারাজ চেষ্টা করলে কি হবে, আমার প্রাক্তনই বাধাস্বরূপ হল।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা, একদিন পূর্বাহ্ণে মহাপুরুষ মহারাজ নীচতলায় পশ্চিম-দিকের বারান্দায় বসে কথাবার্তা বলছেন, আমরা কয়জন দাঁড়িয়ে শুনছি, এমন সময় দোতলার সিঁড়িতে খস্ খস্ জুতোর আওয়াজ হতে লাগল। সিঁড়ি বেয়ে কেউ নামছেন মনে হ'ল। একজন বলে উঠলেন—মহারাজ নামছেন; শুনে সবাই তটস্থ হয়ে দাঁড়ালুম, আমার মনে প্রথম প্রতিক্রিয়া হল—ওখান থেকে সরে পড়ি, পরমুহূর্তে মনে হ'ল সরিই বা কেন, আমার মতো পাপী তাপী ইনি ছাড়া কেই বা উদ্ধার করবেন? দাঁড়ালাম, কাছে আসতেই প্রণাম করলাম। বলে উঠলেন—

"তোমায় চিনি চিনি মনে হয়। আমাদের চিনতে পারো?" আমার কানে যেন মধু ঢাললেন। সেদিন থেকে তাঁর প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম।

১৯১৮ খৃঃ সরস্বতীপূজার পূর্বরাত্রি, হিন্দু হস্টেলে শোবার সময় মনে উঠল দীক্ষা নিলে হত, কাল তো শুভদিন, মহারাজ হয়তো কাউকে দীক্ষা দেবেন। আমিও গিয়ে দেখি। হস্টেলের ধূমধামের পূজা ফেলে রওনা হলাম বেলুড় মঠে, তখন বাবুরাম মহারাজ অন্তিম শয্যায় বলরাম-মন্দিরে, পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ তাঁর জায়গায় বসে কুটনা কুটছেন। আমি পাশে গিয়ে বসলাম। একজন হন্তদন্ত ভাবে ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে বললেন—"মশাই, দীক্ষা নেবেন? দীক্ষা নেবেন? দীক্ষা নেবেন ত শিগ্‌গীর আসুন।" এই বলে তেমন হন্তদন্তভাবে বেরিয়ে গেলেন। আমি ইতস্ততঃ করছি কিন্তু কৃষ্ণলাল মহারাজ আগেই উঠে পড়লেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম—মহারাজ উঠানে একটা বেঞ্চিতে রোদে বসে গড়গড়া টানছিলেন—আমরা তাঁর কাছে পৌঁছবার আগেই সেই ভদ্রলোক কয়েকটি অল্পবয়স্ক ছোকরা নিয়ে ফিরেছিলেন। সবাইকে দেখে মহারাজ বলে উঠলেন, "ওরে বাপরে! কত লোক নিয়ে এসেছে গ্যাখ!" আর উঠে পালালেন, কৃষ্ণলাল মহারাজ আমাকে আশ্বাস দিলেন পরে দেখা যাবে।

বিকালে মহারাজ দোতলার গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসে গড়গড়া টানছিলেন, আমি নীচের লন থেকে দেখছি, ইতিমধ্যে কৃষ্ণলাল মহারাজ সেখানে গিয়ে উপস্থিত। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য নীচে পায়চারি করতে লাগলাম, আমার উদ্দেশ্য সফল হল, তিনি আমাকে উপরে যেতে ইঙ্গিত করলেন, আমি দু-তিন লাফে যেন উঠে গেলাম। স্বামীজীর ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি আর মহারাজ বলে উঠলেন, "সন্ধ্যা হয়ে এল, একটু বেড়িয়ে আসি।" উঠে পড়লেন। আমিও হতাশ হয়ে কলকাতা রওনা হলাম। এরপর শিবরাত্রি। আবার আশা নিয়ে মঠে গেলাম। মঠের প্রবেশদ্বার তখন দক্ষিণদিকে ছিল। এগুতে এগুতে দেখলাম জ্ঞান মহারাজের দোরের সামনে একখানা মোটর গাড়ী দাঁড়িয়ে, ২।১ জন সাধু-ব্রহ্মচারী গাড়ীতে নানা জিনিস তুলছেন, গড়গড়া পর্যন্ত। পরেই মহারাজ এসে উঠলেন, আর গাড়ী আমার পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। আমি তখন মঠের জমিতে ঢুকে আমগাছের সার পর্যন্ত এসেছি। ওখান থেকেই কলকাতা ফিরবার ইচ্ছা হচ্ছিল। তবে ঠাকুরের স্থানে এসেছি, তাঁকে প্রণাম করে যাওয়াই উচিত বিবেচনায় গঙ্গা দর্শন-স্পর্শন করে, ঠাকুর-প্রণাম করে কলকাতায় ফিরলাম। পথে আসতে আসতে মনের মধ্যে একটা অপবিত্র ভাবের উদয় হল। তখনই খেয়াল হল, এই মন নিয়ে মহারাজের কাছে দীক্ষা নিতে চাইছি, তা হবে কেন? এ যে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার ধৃষ্টতা! মহারাজের কাছে দীক্ষা নেওয়ার কল্পনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। ঝেড়ে ফেললাম বটে, কিন্তু মনে একটা ক্ষোভ রয়ে গেল। সারাদিন ক্লাস ল্যাবরেটরি ইত্যাদিতে ব্যস্ত থেকে রাত্রে শোবার সময় বা ঘুম ভাঙ্গলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসত—'হতে পারত, হল না!' সঙ্গে সঙ্গে নানা মতলব আঁটতাম শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা নেওয়ার। কারণ শুনেছিলাম যে, 'মা' অত বাছাবাছি করেন না।

তিন-চার দিন পরেই ঠাকুরের জন্মতিথি—

ফাল্গুনী শুক্লাদ্বিতীয়া। খুব সকাল সকাল মঠে গেছি, গঙ্গা দর্শন-স্পর্শন, ঠাকুরপ্রণাম, মহারাজকে প্রণাম করে পূবদিকের নীচের বারান্দার ছোট বেঞ্চটিতে বসে আছি। ঝকঝকে রোদ, আম্রমুকুলের গন্ধ, প্রভুর জন্মদিন বলে মহারাজদের মনের আনন্দ, সব মিলে একটা জমাট ভাব, খুব ভাল লাগছে। এমন সময় পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ এসে বড় বেঞ্চটিতে বসলেন, সঙ্গে দুটি বালক। এদের কথাবার্তা আমার কানে আসতে লাগল। মনোযোগ দিতেই বুঝলাম। ছেলেরা বলছে, "মহারাজ, আপনি দয়া করে যদি রাজা মহারাজের কাছে একটু সুপারিশ করেন তবেই আমাদের দীক্ষা হয়ে যায়।" পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ বলছেন, "ওরে, আমার সুপারিশে কিছু হবে না, রাজা মহারাজের কৃপা হলেই হতে পারে।" ছেলেরা নাছোড়বান্দা। অগত্যা কৃষ্ণলাল মহারাজ বললেন—"আচ্ছা চল্, আমি বললেই যদি হয়, বলে দেখি।" সবাই উঠে উপরে গেলেন। একটু পরেই আমার মনে হল—ব্যাপারটা দেখে আসি না কেন, এদের কি হয়। মনে হওয়া আর অমনি উঠে যাওয়া। গিয়ে দেখি সব নিস্তব্ধ। মহারাজ ইজিচেয়ারে বসে, নিস্তব্ধ। কৃষ্ণলাল মহারাজ ও ছেলে দুটি দাঁড়িয়ে, কেবল মহারাজের গড়গড়া গুড়ুক গুড়ুক করে ঐ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। আমি সবার পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে কৃষ্ণলাল মহারাজ বললেন—"এই উমেশকে করে দিন না।" 'কে হে উমেশ?' মহারাজ প্রশ্ন করলেন। আমি একটু এগিয়ে দাঁড়ালাম। মহারাজ বললেন—"আচ্ছা, হবে। বাড়ী কোথায়?" "ঢাকা—বিক্রমপুর"—উত্তর দিলাম।

"এ যে বাবুরাম মহারাজের লোক। কাল সকাল ৭টা নাগাদ হবে।" কৃতকৃতার্থ হলাম।

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ কি কোন সুপারিশ করেছিলেন? মনে পড়ে সরস্বতী-পূজারও আগে এক রাত্রে রোগে শয্যাগত বাবুরাম মহারাজকে মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি প্রশ্ন করলেন—"যাচ্ছিস?" "আজ্ঞে হ্যাঁ", উত্তর করতেই বললেন, "আর একটু বোস", পরেই আবার বললেন—"এবার তবে আয়।" শীতের রাত—আমার ঘাম বেরিয়ে গেল। উঠে এলাম। এই কি সুপারিশ?

মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাওয়া গেল—আয়োজন ভালই ছিল। বিকালে কৃষ্ণলাল মহারাজ বললেন—"কলকাতা কলেজ স্কোয়ার থেকে রওনা হয়ে সকাল ৭টার আগে মঠে পৌঁছানো সহজ হবে না—রাত্রে মঠেই থেকে যাও।" কিন্তু বিনা অনুমতিতে রাত্রে হিন্দু হস্টেলের বাইরে থাকা যায় না। আর তখন সি. আই. ডি. পুলিশের যে প্রতাপ! হস্টেলে ফিরে আসলাম এবং পরে একটা বাজে অজুহাত দেখিয়ে ছুটি নিয়ে রাত্রে মঠাভিমুখে রওনা হলাম। সালকে থেকে হেঁটে মঠে যেতে যেতে উত্তেজনাবশে কতবার যে পথ ছেড়ে চলে গেলাম তার ইয়ত্তা নেই। মঠে যেতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। সেদিন তিনবার সালকে-বেলুড় পথটি পরিক্রমা হল। "রাত্রে কিছু খেয়ে কাজ নেই"—কৃষ্ণলাল মহারাজের নির্দেশ। রাত ভোর হতে গঙ্গাস্নান করে প্রস্তুত হলাম। চার জনের দীক্ষা—অমিয়, জিতেন, আমি আর একটি মঠেরই ব্রহ্মচারী। মন্ত্র দেওয়ার আগে মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন ঠাকুর দেবতার চিন্তা কর?" বললাম, "ঠাকুর ও আপনাদেরই ত করি।" প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর ও বাবুরাম

মহারাজকেই চিন্তা করতাম এবং দীক্ষার পরেও অনেককাল মনের মধ্যে মহারাজ-বাবুরাম মহারাজ দ্বন্দ্ব ছিল। যা হোক আমার জবাব শুনে মহারাজ খুশী হলেন—সেটা বোঝা গেল। দীক্ষার পর খানিকক্ষণ মন্ত্র জপ করার পর যখন নীচে নেমে এসে প্রণাম করলাম—তিনি তখন ঠাকুরঘরের পূবদিকে উত্তর-দক্ষিণে পায়চারি করছিলেন—তিনি বারান্দায় উপবিষ্ট মহাপুরুষ মহারাজকে দেখিয়ে আমাকে বললেন—"এঁর সঙ্গে আলাপ কর"। দুর্ভাগ্য-বশতঃ এই আদেশ আমি পালন করতে পারি-নি। কারণ আগের দিনের হাঁটাহাঁটি, রাত্রে নিরম্বু উপবাসে তখন বেলা ১০টায় আমার মুখ গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল, ভাবলাম একটু প্রসাদ খেয়ে এসে আলাপ করব। ফিরে এসে কিন্তু তাঁকে পেলাম না।

গুরুর দয়া ত হ'ল। কিন্তু নিজের দয়া! দীক্ষার কিছুদিন পরে মহারাজ একদিন বললেন,—আমি আর এক ছোকরা সাধু কাছে দাঁড়িয়ে—"দীক্ষার আগে লোকের কত অনুরাগ দেখা যায়, কিন্তু দীক্ষাটি যেই হয়ে গেল তখন আর কিছু নেই।"

বছর দুই পরে ভুবনেশ্বর গেছি। মহারাজ হতাশভাবে আমার দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"উমেশ, জপটপ করছ? একটু খাটো, খাটলেই উপকার পাবে।"

"গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব—তিনের দয়া হল।" এঁদের এইসব স্মৃতিই আমার জীবন-মরুভূমিতে মরূদ্যান-স্বরূপ!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীসলিলকুমার ঘোষ

আগম, নিগম, তন্ত্র, সংহিতার দুর্গম আঁধারে,
বহুমত-বিখণ্ডিত কুটিল-ব্যাখ্যাত বনপথে,
পরধর্ম-মোহগ্রস্ত, পথভ্রান্ত জনতার মাঝে,
জ্ঞানদীপ্ত, তমোপহা নবসূর্য সেদিন উদিলে!
অনুপম উপমার দীপমালা জ্বালি' থরে থরে,
দেখা'লে সরল পথ, বাঁচাইলে পথভ্রান্তি হ'তে॥
যে জ্ঞান চৈতন্য মেলে সদাচারে প্রত্যহের কাজে,
বিশ্বাসে সহজ-লভ্য, সেই রত্ন দিলে হাতে তুলে।
কথামৃতে সঞ্জীবিয়া, জাগা'লে জাতির মহাজ্ঞান;
সাধিলে আস্তিক্যবোধে সে সত্তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ,
দীনার্তের সেবাধর্মে দেখা দিল দাক্ষিণ্যরূপিণী,
চিত্তে উপলব্ধ হ'ল—সে জননী প্রাণ-প্রবাহিণী।
তব মন্ত্র আপ্তবাণী, ব্যাপ্ত হ'ল সারা বিশ্বময়,
জয় জয় রামকৃষ্ণ, জয় জয় বিবেক-আশ্রয়॥

শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী আদিনাথানন্দ

৯। মুক্তি

১। জীব অসীম-প্রত্যাশী। জীবের চিত্তবৃত্তি মাত্রই অসীম পিপাসায় হা-হুতাশের মধ্য দিয়া তাহাকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে। আরও জানিতে, আর ভালবাসিতে, আরও ভোগ্য উপকরণ পাইতে, আরও ধর্ম-কর্মা, সত্যসন্ধ হইতে জীবের কী না প্রয়াস চলিলেছে! যেন এক অব্যক্ত পূর্ণতাকে ব্যক্ত করিয়া এক বিরাট ভূমিকায় আবির্ভূত হইবার জন্য সে কোন্ অজ্ঞাত কাল হইতে বিরাটের বক্ষ হইতে চ্যুত হইয়া, 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোন খানে' এই প্রেরণায় যাত্রা করিয়াছে। এই অব্যক্ত প্রেরণাটির মূলে কি? উপনিষদের ঋষি আবিষ্কার করিলেন, এই হাড়-মাংসের খাঁচার মধ্যে এক চিন্ময় সত্তা; যিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা হইয়া 'সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।' এই সত্তাই 'ব্রহ্মকলা' ব্রহ্মাংশ; ব্রহ্মের পরা প্রকৃতি জীবকে কোথাও সীমাকে স্বীকার করিয়া লইতে দিতেছে না। এ যেন বহির্দেশে কুঞ্জাভিসারী করিবার জন্য বংশীবদনের নিত্য বংশীর আহ্বান! কবি গাহিতেছেন, আমাকে করহ তোমার বীণা লহগো লহ তুলে। উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি তোমার মোহন আঙ্গুলে'—ইহাই সংস্কৃতিসম্পন্ন জীবের আকুতি!

এই প্রবৃত্তিকে Underhill তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ Mysticism-গ্রন্থে বলিয়াছেন—'His innate tendency to that Absolute spiritual weight—' অর্থাৎ জীবের সর্বনিরপেক্ষ অধ্যাত্ম সত্তার তাৎপর্য-অনুভবের এক স্বতঃস্ফূর্ত আন্তর প্রয়াস।

২। এই চূড়ান্ত প্রত্যাশাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমবিবর্তন সাধন করিতেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্মে' লিখিয়াছেন, "সেই অভাবনীয় পূর্ণকে দেখতে পাই দুঃখের দীপ্তিতে, মৃত্যুর গৌরবে। সেই আমাদের জ্ঞানকে ঘরছাড়া করে বড়ো ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছে। নইলে পরমাণুতত্ত্বের চেয়ে পাক-প্রণালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেতো। সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে মানুষ প্রত্যক্ষ দেখছে, তাকে ব্যবহার করছে, কিন্তু তার মন বলছে এই সমস্তের সত্য রয়েছে সীমার অতীতে।"

৩। জীব তার জ্ঞান-অনুভব-ক্রিয়ারূপ ত্রিমুখীবৃত্তি লইয়া জগৎ ও জীবনকে ব্যাখ্যা করিতে, তাহাদের স্বরূপ বুঝিতে, এমন কি উপভোগ করিতে সচেষ্ট। এই প্রচেষ্টা হইতেই জন্ম লইয়াছে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্যসাধনা ও সৌন্দর্যচর্চা।

৪। ধর্ম ও দর্শন চর্চা করিয়া ভারতীয় ঋষিগণ জীবের পুরুষার্থ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষকে চতুর্বর্গ পুরুষার্থ বলিয়া ধর্ম-অবিরুদ্ধ কাম ও অর্থ ভোগকে স্বীকার করিয়াও চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষকেই উচ্চ আসন দিয়াছেন এবং এই 'মোক্ষলাভ'ই জীবের পরাকাষ্ঠা, পরাগতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রাচ্য দার্শনিকগণের মতে ইহা শ্রেয়োমার্গ। এই শ্রেয়োমার্গের চরম উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ

করিতে পারিলে জীবের অতৃপ্ত অসীম প্রত্যাশা চিরতরে শান্ত হয়। এবং সে এক ইন্দ্রিয়াতীত পরমানন্দের অধিকারী হইয়া কৃতকৃতার্থতা বোধ করে। এই মোক্ষভূমিতে আরূঢ় হইবার বহুবিধ প্রণালী হিন্দুদর্শনে বিবৃত আছে। ভারতীয় দর্শনবিচার মোক্ষলাভের অনুকূল। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া দর্শন-চিন্তার আরম্ভ হয়। শ্রীরামানুজ এই ভূমিতে আরূঢ় হইবার একটি সুনির্দিষ্ট উপায় তৎপ্রবর্তিত দর্শনে নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহা সহজবোধ্য, সুখকর ও নানাসমস্যাসমাকুল জীবনে অনুষ্ঠিত হইলে জীবনযাত্রা শান্তি-পূর্ণ ও দুঃখনাশক হইবেই হইবে।

৫। এই আচার্যপ্রবরের মতানুযায়ী মুক্তিলাভের অর্থ এই নহে যে, আত্মার বিলুপ্তি ঘটিবে। মুক্তি অর্থে বিবিধ বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি-লাভ; সাংখ্যকারগণ যেমন বলেন, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ। ইহাকে মোক্ষফল বলা যাইতে পারে গীতা-প্রবক্তা শ্রীভগবান যেমন বলিয়াছেন 'দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগম্'—দুঃখের সহিত সংস্পর্শ-বিহীন হওয়াই মোক্ষ।

৬। শ্রীরামানুজ জীবাত্মাকে চিরন্তন সত্তাযুক্ত বলিয়াছেন। ব্রহ্মের সঙ্গে ইহার অংশ-অংশী সম্বন্ধ—কাজেই একটি চিরন্তন সত্তা অন্য একটি চিরন্তন সত্তায় বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, ইহা ভাবনাতীত। জীবাত্মা সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরাধীন, এবং এই জগৎনিয়ন্তার সর্ব-নিয়ামকত্ব স্বীকার করিয়া মুক্তিপদে আরূঢ় হইতে হইবে। জীব ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মৈকত্ব লাভ করিতে পারে না এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। তিনি উল্লেখ করিতেছেন, 'ব্রহ্মণো ভাবঃ ন স্বরূপৈক্যং'। শ্রীভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, মুক্ত জীব সর্বজ্ঞত্ব লাভ করেন এবং ঈশ্বরের ধ্রুবাস্মৃতি লইয়া বাস করেন। অহঙ্কার মুক্তির আসল প্রতিবন্ধক, ব্যক্তিত্ব নহে। জীবের ব্রহ্মাশ্রিত সত্তা স্বরূপতঃ আনন্দ-ও জ্ঞানযুক্ত; কিন্তু অবিদ্যা-ও কর্মজনিত শুভ ও অশুভ সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া সংসারগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা ধ্রুবাস্মৃতি লাভ করিলে অবিদ্যা-সম্বন্ধ চলিয়া যায় এবং স্বকীয় জ্ঞান-স্বরূপতা ও আনন্দময় সত্তা লাভ হয়। এই প্রসঙ্গে ইহা বলা যাইতে পারে, 'মুক্তি লাভ' করা অর্থ নূতন কিছু লাভ করা নহে। নিজের ব্রহ্মময়ত্ব অনুভব করা এবং আবরিত জ্ঞান, সীমায়িত প্রেম ও আচ্ছাদিত আনন্দ-স্বরূপতাকে ফুটাইয়া তোলা। অদ্বৈতবাদিগণের মুক্তির কল্পনা কিন্তু প্রায় এই ধরনের। তাঁহারাও বলেন, আত্মা চিরমুক্ত। জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ—শুধু অজ্ঞানাবৃত বলিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্যবোধ হইতেছে না। মহাবাক্যবর্ণিত জ্ঞান এই অজ্ঞানকে বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মের সাথে আত্মাকে চির ঐক্যবোধে প্রতিষ্ঠিত করে। মনে রাখিতে হইবে এই ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধ একটি 'চিত্তবৃত্তি' মাত্র। এই বৃত্তির বিলোপ হইলে আত্মা স্বরূপতঃ যাহা তাহা থাকিবে—'অবাঙ্-মনসোগোচরম্' অবস্থা। এই অবস্থায় 'জীবা-ত্মা'র বিলুপ্তি বলা যায়। 'নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে গলে গেল'—এই অবস্থার সাথে তুলনা করা যায়। এই অবস্থায় 'আস্বাদন' নাই, 'আস্বাদ্য' নাই। ইহা 'শূন্যে শূন্য মিলাইল'—বৌদ্ধধর্মের নির্বাণমুক্তিও এই ধরনের জিনিস—সব গিয়ে 'শূন্যে' মিশিয়া গেল!

৭। শ্রীরামানুজের মতবাদে এই ধরনের আত্মবিলুপ্তি ও শূন্যত্বে বিলীন হইয়া যাওয়ার

কোন ব্যাপার নাই। এখানে 'চিনি হ'তে চাই না—চিনি খেতে ভালবাসি'—এই ভাব।

আত্মা শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থা লাভ করিয়া ব্রহ্মের ধ্রুবাস্মৃতি লইয়া নিত্য নূতন আনন্দ আস্বাদ করিতে থাকেন। বিদেহত্ব হইলে পর বিষ্ণুর পরমধামে চলিয়া যান এবং শ্রীভগবানের নিত্যধামে পরমানন্দে চিরকাল বাস করেন। ইহাই শ্রীবিষ্ণুর বা শ্রীনারায়ণের পরম ধাম। ইহা প্রাপ্ত হইলে, শ্রীগীতা বলিতেছেন, আর 'পুনরাবর্তন' হয় না। এই 'ভগবৎরসাস্বাদন' বা পরাভক্তিরস আস্বাদন করাই জীবাত্মার একমাত্র কাম্য—পরমপুরুষার্থ।

৮। শ্রীরামানুজ 'জীবন্মুক্তি'-বাদ স্বীকার করেন নাই। জীবাত্মার দেহসম্বন্ধ থাকা-কালীন 'পূর্ণজ্ঞান' হইতে পারে না। বিদেহাবস্থা হইলেই যথার্থ পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। কারণ কর্মফল নষ্ট হইয়া গেলে পূর্ণজ্ঞানের প্রতিবন্ধক কিছু থাকে না এবং জীবাত্মার 'অজ্ঞানবিমুক্তি' পুরোপুরি ঘটে।

পূর্ববর্ণিত 'মুক্তি'লাভ কি উপায়ে হইতে পারে তাহাই আচার্য নির্দেশ করিতেছেন।

প্রথমতঃ যাহার 'মুক্তি' হইবে সেই জীবাত্মার আলোচনা করা হইয়াছে। জীব সর্বজীব-দেহে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থিত। ইহা একটি ব্রহ্ম-শক্তি-নিয়ন্ত্রিত সত্তা; কিন্তু অজ্ঞান ও কর্মফল দ্বারা স্বরূপাবৃত হইয়া আছে। কর্মফলজনিত শরীরমনসম্বন্ধযুক্ত—'পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌তে প্রকৃতিজান্ গুণান্'—এই অবিদ্যা-সম্বন্ধ নাশ করিবার সহজসাধ্য উপায় স্বধর্ম-পালন, জ্ঞান-ও ভক্তিলাভ। শ্রীরামানুজাচার্য-দর্শনে 'ভক্তি'লাভই মুক্তির উপায়। বিশুদ্ধা-ভক্তিলাভও প্রপত্তিতে বা পূর্ণ শরণাগতিতে পর্যবসিত হয়। শ্রীরামানুজমতে মুক্তি ভগবদনুগ্রহলভ্য। পূর্ণ শরণাগতি হইলেই শ্রীভগবানের কৃপালাভ হয়। কিন্তু ইহাও পুরুষকার দ্বারা লাভ করিতে হইবে।

১০। ভক্তির অর্থ নিরবচ্ছিন্ন ধ্রুবাস্মৃতি। ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কীর্তন ও ভাবোচ্ছ্বাস নহে, অথবা গোপীগণের প্রেমোচ্ছ্বাসও নহে, ইহা উন্মত্ততা-বিরোধী। 'ভক্তি' এই আচার্যের মতানুযায়ী ব্রহ্মজ্ঞানের বিগলিত রূপ। তিনি বলিয়াছেন, 'জ্ঞানশ্চ ভক্তিবিশেষঃ'। সর্বজ্ঞ, সর্বনিয়ন্তা ব্রহ্মই সৎ বস্তু। তিনি বিশ্বচরাচর ব্যাপিয়া সর্বভূতকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তিনি তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে জীবাত্মা ও জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই 'জ্ঞানে' প্রতিষ্ঠিত হইলে জীব পরাভক্তি লাভে সমর্থ হয়। তখন পূর্ণভাবে 'প্রপত্তি' লাভ করিয়া নিজের ক্ষুদ্র আমিত্ব-বোধকে অতিক্রম করিয়া নিজেকে ব্রহ্মাংশ বলিয়া অনুভব করে। এই অববোধ অজ্ঞান নাশ করিয়া জীবকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে এবং তিনি ভূমানন্দ উপভোগ করেন।

১১। শ্রীভাষ্যে—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আচার্য বলিতেছেন—

"অত্রোচ্যতে, যদুক্তমবিদ্যা-নিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ। সা চ ব্রহ্মবিজ্ঞানাদেব ভবতীতি, তদভ্যু-পগম্যতে। অবিদ্যানিবৃত্তয়ে বেদান্তবাক্যৈ-র্বিধিৎসিতং জ্ঞানম্, কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্। কিং বাক্যাদ্বাক্যার্থ-জ্ঞানমাত্রম্? উত তন্মূলমু-পাসনাত্মকং জ্ঞানমিতি? ন তাবদ্বাক্যজন্যং জ্ঞানম্। তস্য বিধানমন্তরেণাপি বাক্যাদেব সিদ্ধেঃ; তাবন্মাত্রেণাবিদ্যা-নিবৃত্ত্যনুপলব্ধেশ্চ।"

"আপনি যে বলিয়াছেন—অবিদ্যানিবৃত্তিই মোক্ষ এবং এই নিবৃত্তি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই সাধিত হয়—তাহা স্বীকার করি। কিন্তু এই অবিদ্যা-

নিবৃত্তির জন্য বেদান্তবাক্যসমূহ যে জ্ঞানের বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন সেই জ্ঞানটি কিরূপ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। সেই জ্ঞান কি কেবল বাক্য-জন্য বাক্যার্থের জ্ঞান মাত্র, অথবা এই বাক্যার্থ-জ্ঞানের পরে তদনুগুণ উপাসনাত্মক জ্ঞান? এই অবিদ্যা-নিবর্তক জ্ঞান (কেবলমাত্র) বাক্য-জন্য জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ কোন বিধান ব্যতীত (নিদিধ্যাসনপূর্বক উপাসনা ব্যতীত) কেবল মাত্র বাক্য হইতেই এই জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে, এরূপ দেখা যায় না। বরং কেবল বাক্যার্থ-জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্ত হইতে দেখা যায় না।"

মনে রাখিতে হইবে শ্রীরামানুজ শব্দা-পরোক্ষবাদিগণের মত উক্ত ভাষ্যে স্বীকার করেন নাই। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই মহাবাক্য শ্রবণ করিলেই অজ্ঞান-নিবৃত্তি হইতে পারে না। ইহা 'জীবন্মুক্তিবিবেক' গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

১২। শ্রীগীতামুখে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলিয়াছেন,

'ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।"

"কর্মের অনুষ্ঠান সম্পাদিত না হইলে জ্ঞানরূপা নৈষ্কর্ম্যাবস্থা লাভ হয় না।"

শ্রীরামানুজ তাঁহার প্রসন্নগম্ভীর শ্রীভাষ্যে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

"রজস্তমসোর্যথার্থজ্ঞানাবরণত্বং, সত্ত্বস্য চ যথার্থজ্ঞানহেতুত্বং ভগবতৈব প্রতিপাদিতম্— 'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্' (গীতা—১৪।১৭) ইত্যাদিনা। অতশ্চ জ্ঞানোৎপত্তয়ে পাপং কর্ম নিরসনীয়ম্। তন্নিরসনং চ অনভিসংহিত-ফলেনানুষ্ঠিতেন ধর্মেণ। তথা চ শ্রুতি— 'ধর্মেণ পাপমপনুদতি' ইতি। তদেবং ব্রহ্ম-প্রাপ্তিসাধনভূতং জ্ঞানং সর্বাশ্রমধর্মাপেক্ষম্। অতোঽপেক্ষিত-কর্মস্বরূপজ্ঞানং, কেবলকর্মণা-মল্পাস্থির-ফলত্ব-জ্ঞানং চ।''

"রজঃ এবং তমোগুণ সে যথার্থ জ্ঞান আবৃত করিয়া রাখে এবং সত্ত্বগুণ যে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানোদয়ের হেতু তাহা ভগবান স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন। 'সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উদয় হয়' ইত্যাদি গীতাবাক্য। অতএব জ্ঞানের উৎপত্তির জন্য পাপকর্ম পরিত্যাগ করা কর্তব্য। এই পাপপরিহার কামনারহিত কর্মের দ্বারা (নিষ্কাম কর্মের দ্বারা) সাধিত হইয়া থাকে।"

"এতদ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায়রূপ যে জ্ঞান তাহার জন্য সমস্ত আশ্রম-ধর্মের অনুশীলন প্রয়োজন, ফলাভিসন্ধি-রহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের প্রয়োজন।"

১৩। অবশ্য আবার বলিতেছেন:

"এষাং সাধনত্বং চ বিনিয়োগাবসেয়ম্। বিনিয়োগশ্চ শ্রুতিলিঙ্গাদিভ্যঃ।... উদ্গী-থাদ্যুপাসনানি কর্ম-সম্বন্ধার্থান্যপি ব্রহ্মদৃষ্টি-রূপাণীতি ব্রহ্মজ্ঞানাপেক্ষাণীতি ইহৈব চিন্ত-নীয়ানি। তান্যপি কর্মাণি অনভিসংহিত-ফলানি ব্রহ্ম-বিদ্যোৎপাদকানীতি, তৎ সাদ্-গুণ্যাপাদনান্যেতানি, সুতরামিহৈব সঙ্গতানি। তেষাং চ কর্মস্বরূপাধিগমাপেক্ষা সর্বসম্মতা।''

শ্রীভাষ্য—১।৩০

"কর্মের যথাযথ বিনিয়োগ মীমাংসা-শাস্ত্র হইতে জানা যায়। উদ্গীথাদি উপাসনা কর্মের পুষ্টিসাধক হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভে অপেক্ষিত; অতএব ব্রহ্মমীমাংসায় এ সকল বিষয়ের চিন্তা বা বিচার প্রয়োজন। যেহেতু (উদ্গীথাদি উপাসনাসমন্বিত) কর্মসকল ও ফলানুসন্ধান-রহিত-ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তখন কেবল ব্রহ্মবিদ্যা-উৎপাদনে সহায় হয় এবং যেহেতু

উদ্গীথাদি উপাসনাও এই সকল কর্মের উৎকর্ষ সাধন করে ; অতএব, উদ্গীথ-উপাসনা-যুক্ত কর্ম ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনায় সুসঙ্গত। এই উপাসনায় যে অঙ্গীরূপ কর্ম অপেক্ষিত তাহা সর্বসম্মত।"

অবশ্য ইহা বলিতে চাহিতেছেন যে, নিষ্কাম কর্ম দ্বারা রজঃ ও তমোগুণের মালিন্য দূরীভূত হইলে চিত্তের সত্ত্বাধিক্য হয় এবং এই সুনির্মল চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়। এই জ্ঞান উদিত হইলে শ্রীনারায়ণে পরাভক্তি হয় এবং ইহাই মোক্ষাবস্থা। অর্থাৎ 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি'লাভই মোক্ষ। (ক্রমশঃ)

অনুক্ষণ-ভাবনয়া ভজস্ব

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

অনুক্ষণ ভাবনার স্বর্ণসূত্র দিয়া
চিত্ত তাঁর পাদপদ্মে রাখোনা বান্ধিয়া!
অহরহ একতান স্মৃতির সাধন—
তার কাছে কোথা লাগে পুষ্প ও চন্দন?
কোথা লাগে বিল্বপত্র? কোথা গঙ্গাবারি?
ঈশ্বর তোমার কাছে প্রেমেরই ভিখারী!
চেতনার চক্রবালে প্রেমারুণজ্যোতি
হেরিতে বাসনা যদি—জাহ্নবী যেমতি
অবিরাম বহি যায় সমুদ্রের পানে
তোমার চিন্তার ধারা ভূমার সন্ধানে
তেমনি বহিয়া যাক্! চাও প্রেমধন?
ষোলো আনা মন তাঁরে করো সমর্পণ।
অধ্যাত্ম-জীবন-নাট্য—মঞ্চ তার মন!
মনেতেই মুক্ত মোরা, মনেই বন্ধন ॥

দীন দরিদ্রের চিরদরদী বন্ধু স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী জীবানন্দ

'হে ভারত,...ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই!'—সারা ভারত যাঁর হৃদয়ের এই বাণী বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হ'তে শুনে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়েছিল, এখনও যাঁর প্রাণপ্রদ বাণীর বৈদ্যুতিক শক্তি হৃদয়তন্ত্রীকে নাড়া দিয়ে সঞ্জীবিত ক'রে তোলে সেই স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সর্বদেশের সর্বজাতির দীন দরিদ্রের চিরদরদী বন্ধু।

সাধারণতঃ দরিদ্র অর্থে নির্ধনকেই বোঝায়। যাদের খাওয়াপরার সচ্ছলতা নেই, যারা দিন আনে দিন খায়, যাদের দুবেলা দুমুঠোও জোটে না, যারা রোগে ঔষধপথ্য পায় না, যাদের বাসের উপযুক্ত গৃহ নেই, যারা সর্বহারা, তারা সকলেই দরিদ্রের পর্যায়ভুক্ত। তাদের জন্য স্বামীজীর দরদ বেশী। যারা রিক্ত, উপেক্ষিত, যুগযুগ ধ'রে দলিত, তাদের জন্য স্বামীজীর অনন্ত সহানুভূতি! যারা অজ্ঞানের অন্ধকারে, শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিত, তাদের জন্য স্বামীজীর অসীম সমবেদনা! ভূমার উপলব্ধিতে আপ্তকাম স্বামীজী তাঁর পরমপ্রাপ্তি নিঃশেষে আপামর সকলকে উজাড় ক'রে দিয়েছেন। সর্বস্তরের মানুষের সর্ববন্ধনবিমুক্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর একান্ত কাম্য।

স্বামীজীর মহাজীবনে দেখা যায়, ভারতের রিক্ত জনসাধারণের জন্য তাঁর বিশাল হৃদয় ব্যথায় ভ'রে উঠেছে, করুণায় বিগলিত হয়েছে এমন বহু ঘটনার সমাবেশ। এই বেদনা ও করুণা বাণীরূপ ধ'রে কখনো তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েছে, কখনো রচনার মাধ্যমে অনুপম ভাষায় ফুটে উঠেছে। তাঁর পত্রাবলীতে মানুষের প্রতি অগাধ সহানুভূতির অজস্র নিদর্শন!

পরিব্রাজক অবস্থায় আসমুদ্রহিমাচল পরিক্রমা ক'রে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতের দুর্গতির অন্যতম কারণ তার দারিদ্র্য। ধনীর প্রাসাদ অপেক্ষা দরিদ্রের কুটিরের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল বেশী। কন্যাকুমারীতে সমুদ্রপরিবেষ্টিত শিলায় ব'সে ভারতের দুর্গতিনাশের উপায় চিন্তা করতে করতে স্বামীজী গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিলেন। তপঃপূত সন্ন্যাসীর ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল নিপীড়িত ভারতবাসীর অব্যক্ত মর্মবেদনা—তার উন্নতির পথ রুদ্ধ, চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার, অসংখ্য অসহায় মানুষের দুঃখদারিদ্র্যের ছবি! এর প্রতিকারের উপায় কি? সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য বারিধি! তাঁর শুদ্ধসত্ত্ব মনে শুভ সঙ্কল্পের উদয় হ'ল, বিদেশে গিয়ে তিনি ভারতের অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করবেন, প্রতিদানে তাঁদের কাছে চাইবেন ইহলৌকিক ঐশ্বর্যলাভের অর্থাৎ দারিদ্র্য-মোচনের যাদুমন্ত্র—শিল্পবিজ্ঞান।

আমেরিকায় প্রথমে স্বামীজীকে অবর্ণনীয় নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়েছিল; একে দারুণ শীতে অনাহারের ক্লেশ, তার উপর কত বঞ্চনা বিদ্রূপ সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে—এ সবের মধ্যে ঈশ্বর তাঁকে কী কঠিন পরীক্ষাই না করেছিলেন! তারপর পটপরিবর্তন। তিনি সমস্ত পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ।

চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টিতে তিনি সর্বজনবিদিত। যেদিন তাঁর নাম বিশ্ববিখ্যাত হয়ে প'ড়ল, সেদিন চিকাগো শহরের জনৈক অতি সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি তাঁকে নিজগৃহে অত্যন্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গিয়ে তাঁর খুব সেবাযত্ন করেন। প্রাসাদোপম অট্টালিকায় তাঁর শয়নের ব্যবস্থা, সেখানে দুগ্ধফেননিভ শয্যা ও অন্যান্য দ্রব্যের প্রাচুর্য তাঁর চিত্তকে কিন্তু বিশেষ ব্যথিত ক'রল, বিগলিত অশ্রুধারায় বুক ভেসে গেল। সুকোমল শয্যা কণ্টকময় বোধ হ'তে লাগলো। তিনি শয্যা থেকে উঠে পড়লেন, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গভীরচিন্তামগ্ন হলেন। সে চিন্তা ভারতের - তাঁর স্বদেশের। ভারতের লোক দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না; আর এদেশের লোকের এত ঐশ্বর্য যে তুচ্ছ ভোগ-বিলাসের জন্য কোটি কোটি মুদ্রা জলের মতো খরচ করে—এ চিন্তা তুষানলের মতো তাঁর অন্তর দগ্ধ করতে লাগলো। ভাবতে ভাবতে যন্ত্রণার আবেগে তাঁর শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হ'ল। তিনি ঘরের মেজেতে প'ড়ে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন, তাঁর মর্মস্থল ভেদ ক'রে ক্রমাগত এই চিন্তা উঠতে থাকলো —'হা আমার দুখিনী মাতৃভূমি! তোমার এত দুর্দশা, আর আমার অদৃষ্টে এই সুখভোগ! আমি এই সৌভাগ্য ও নামযশ নিয়ে কি ক'রব?'

সাধারণতঃ খুব দুঃখকষ্টের পর মানুষ যদি একটু সুখের স্পর্শ পায়, তাহলে তাতেই মশগুল হয়ে যায়, স্বামীজীর কিন্তু অন্যরূপ, সকলের দুঃখ যে তাঁর দুঃখ, সকলের সুখ যে তাঁর সুখ! তিনি বলেছেন, 'যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।' মহাসাগরের মতো সুবিশাল, মহাকাশের মতো উদার তাঁর হৃদয়ে তাইতো এত ব্যথা, এত বেদনা, এত দুঃখ সকলের জন্য!

যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে রুজি রোজগার করে, অত্যাচার অবিচার নির্বিবাদে নীরবে স'য়ে স্বদেশের অন্নোৎপাদনে, বিভিন্ন দেশের ধনসংস্থানে ও সভ্যতা-বিকাশে সহায়ক হয়েছে, সেই ভারতের শ্রমজীবীদের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের দরদী মনোভাব তাঁর লেখনীমুখে যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে তার তুলনা কোথায়? স্বামীজী বলেছেন—

"হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগদাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি?—কে ভাবে এ কথা।...যাদের রুধির-স্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি—তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা; আমাদের গরীবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য ক'রে যাচ্ছে, তাতে কি বীরত্ব নাই?"

যুগ যুগ ধ'রে অবহেলিত দলিত মথিত হয়েও যারা কর্তব্য কর্ম নিঃস্বার্থভাবে ক'রে চলেছে, সেই ভারতীয় শ্রমজীবিগণ স্বামী বিবেকানন্দের প্রজ্ঞানেত্রে নারায়ণের বিরাট রূপ, তাদের তিনি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। স্বামীজী বলেছেন: "বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়,

ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজ্ঞাতেও যিনি সেই নিঃস্বার্থপরতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবি! --তোমাদের প্রণাম করি।" আর কেউ উপেক্ষিতদের উদ্দেশ্যে এমনিভাবে প্রণাম করেছেন কিনা জানি না, এমনিভাবে তাদের জয়গানে পঞ্চমুখ হয়েছেন কিনা জানি না!

স্বামীজী নূতন ভারতের যে উদ্বোধন চেয়েছেন, তাতে শ্রমজীবীদেরই আহ্বান করেছেন, কারণ সংখ্যায় বিপুল তারাই হচ্ছে ভারতের প্রাণস্বরূপ, তাদের উন্নতিতেই ভারতের উন্নতি, তাদের জাগরণেই ভারতের জাগরণ। স্বামীজীর অপূর্ব আহ্বান-বাণী আজও যেন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে:

"...নূতন ভারত বেরুক বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে-মালা মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।"

অগণিত জনগণের মধ্যে কী বিপুল শক্তি রয়েছে, তা স্বামীজী উপলব্ধি ক'রে অননুকরণীয় ভাষায় প্রকাশ করেছেন:

"এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ ক'রে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!!...এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত।"

এক দিকে গরীব দুঃখী শ্রমজীবীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা, অন্যদিকে তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-কামনা, সর্বোপরি ভবিষ্যতে তাদের উত্থান-সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী ও অভ্রান্ত পদনির্দেশ কার না হৃদয়বীণা ঝঙ্কৃত করে?

স্বামীজীর নিকট ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য কত তুচ্ছ, কত অকিঞ্চিৎকর ছিল তার বহু পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জীবন অনুধ্যানে, অথচ সুখ দুঃখ সর্বাবস্থায়ই তিনি দরিদ্রদের সম্বন্ধে চিন্তাকুল! স্বামীজী বলেছেন, "যখন সন্ন্যাসী হই, তখন বুঝে সুঝেই এপথ বেছে নিয়েছিলাম; বুঝেছিলাম, অনাহারে মরতে হবে। তাতে কি হয়েছে? আমি তো ভিখারী; আমার বন্ধুরা সব গরীব; গরীবদের আমি ভালবাসি; দারিদ্র্যকে সাদরে বরণ করি।"

আমেরিকা থেকে তিনি লিখেছিলেন: "এই অপরিচিত দেশের নরনারী আমাকে যতটুকু বুঝতে পেরেছে ভারতবর্ষে কেউ ততটুকু বোঝেনি, আমি ইচ্ছা করলে এখন এখানে আরামের জীবন কাটাতে পারি, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে ভালবাসি।"

স্বামীজী অবহেলিত জনগণের সমপর্যায়ভুক্ত হতেও কুণ্ঠিত হতেন না, অধিকন্তু তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দই অনুভব করতেন—কি স্বদেশে কি বিদেশে, এরূপ অনেক ঘটনা আছে। দেখা যায়, তথাকথিত শিক্ষিত ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এমনভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়, যার দ্বারা তার ও রিক্ত অবহেলিত জনের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য অচলায়তন বাধার সৃষ্টি

হয়। স্বামীজীর জীবনের একটি ঘটনা এবিষয়ে জনমানসে অপূর্ব আলোকসম্পাত করে।

আমেরিকায় তখন স্বামীজীর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একবার এক জায়গায় তিনি ট্রেন থেকে নেমেছেন, অমনি বহু গণমান্য লোক তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করতে লাগলেন। তাই দেখে জনৈক কৃষ্ণকায় নিগ্রো তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বললো, 'আমি শুনেছি, আপনি আমাদের জাতির মধ্যে একজন মস্ত বড় লোক হয়েছেন। তাই আমি এসেছি আপনার সঙ্গে করমর্দনের সৌভাগ্যলাভ করতে।' স্বামীজী বুঝতে পারলেন, তাঁকে অশ্বেতকায় দেখে নিগ্রোটি ভেবেছে যে তিনিও নিগ্রো। স্বামীজী কিন্তু এই ব্যাপারে একটুও ক্ষুব্ধ হলেন না, দাম্ভিক শ্বেতাঙ্গদের মতো নিগ্রোকে অবমানিত না ক'রে কোন কথা না ব'লে সাদরে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং করমর্দনের পর ধন্যবাদ জানালেন।

এতদ্ব্যতীত আমেরিকার অনেক শহরে তাঁকে নিগ্রো ভেবে কোন কোন শ্বেতাঙ্গ অপমান করলেও তিনি আত্মপরিচয় দিয়ে সে অপমান থেকে রক্ষা পেতে চাইতেন না। তাঁর মৌনাবলম্বন ও ঔদাসীন্যের কারণ জিজ্ঞাসিত হ'লে তিনি বলিষ্ঠভাবে উত্তর দিতেন, 'কি! অপরকে ছোট ক'রে বড় হবো? এ জন্য তো আমি জগতে আসিনি!' এমনি ছিল স্বামীজীর মহানুভবতা! যাঁরা তাঁর সঙ্গে প্রথমে হয়তো ভাল ব্যবহার করতেন না, পরে কিন্তু তাঁর অসামান্য মহাপ্রাণতার পরিচয় পেয়ে তাঁর অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পড়তেন।

স্বামীজী উচ্ছ্বসিত ভাষায় অগণিত ভারতবাসীর দুর্গতির কথা প্রকাশ করেছেন: "এই লক্ষ লক্ষ নরনারীর উন্নতির জন্য কে চিন্তা করে? কয়েক হাজার ডিগ্রীধারী ব্যক্তিদ্বারা একটি জাতি গঠিত হয় না, অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনীও একটি জাতি নহে।" বলেছেন, "আমার ভগবানকে, আমার ধর্মকে, আমার দেশকে—সর্বোপরি দরিদ্র ভিক্ষুককে আমি ভালবাসি। নিপীড়িত, অশিক্ষিত ও দীনহীনকে আমি ভালবাসি, তাদের বেদনা অন্তরে অনুভব করি, কত তীব্রভাবে অনুভব করি, তা প্রভুই জানেন।" "আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, মানুষকে বিশ্বাস করি; দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য, পরের সেবার জন্য নরকে যেতে প্রস্তুত হওয়া—আমি খুব বড় কাজ ব'লে বিশ্বাস করি।"

দরিদ্র জনগণের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা চেয়েছেন, তাঁর 'দরিদ্র নারায়ণ'দের জন্য কেমন ব্যবস্থা করতে হবে তা-ও বলেছেন:

"গরীব দুঃখীদের জন্য well-ventilated (বায়ুচলাচলের পথযুক্ত) ছোট ছোট ঘর তৈরী করতে হবে। এক এক ঘরে তাদের দুজন কি তিনজন মাত্র থাকবে। তাদের ভালো বিছানা, পরিষ্কার কাপড়-চোপড় সব দিতে হবে। তাদের জন্য···ডাক্তার থাকবেন। হপ্তায় একবার কি দুবার সুবিধামত দেখে যাবেন।"

প্রকৃতিতে অনন্ত বৈচিত্র্য। বৈচিত্র্যই তো প্রকৃতি। কিন্তু প্রকৃতির সর্বত্র সেই এক সচ্চিদানন্দ বিরাজমান। স্বামীজীর কথায় 'Unity in diversity'—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। স্বামীজী বলেছেন, "If there is inequality in nature, still there must be equal chance for all—or if greater for some and for some less—the weaker should be given more chance than the stronger,"—অর্থাৎ প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকলেও সকলের সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাকেও অধিক, কাকেও

কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান অপেক্ষা দুর্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হবে। এর থেকে বড় সাম্যবাদ আর কি আছে? সাম্যবাদের উচ্চতম ধারণা কি এই কথাগুলির মধ্যে নিহিত নেই?

দরিদ্র লোকদের শিক্ষা কিভাবে দিতে হবে স্বামীজী সে প্রসঙ্গে একটি প্রবাদবাক্যের কথা কয়েকখানি পত্রে উল্লেখ করেছেন। প্রবাদ-বাক্যটি হরজত মহম্মদ সম্বন্ধে। মহম্মদ একবার ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি পর্বতকে আমার কাছে ডাকলে পর্বত আমার কাছে উপস্থিত হবে।' এই অলৌকিক ব্যাপার দেখবার জন্য বিশাল জনতা হয়। মহম্মদ পর্বতকে বার বার ডাকতে লাগলেন, তবু পর্বত একটুও বিচলিত হ'ল না। তাতে মহম্মদ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে ব'লে উঠলেন, 'পর্বত যদি মহম্মদের নিকট না আসে তবে মহম্মদই পর্বতের কাছে যাবে।' তদবধি এটি একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য-স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বামীজী বলেছেন, "যদি পর্বত মহম্মদের নিকট নাই আসে, তবে মহম্মদকেই পর্বতের নিকট যেতে হবে। দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছিতে না পারে (অর্থাৎ নিজেরা শিক্ষালাভে তৎপর না হয়), তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যেতে হবে।" "ভারতে দারিদ্র্য এত অধিক যে, দরিদ্র বালকেরা বিদ্যালয়ে না গিয়ে বরং মাঠে গিয়ে পিতাকে কৃষিকার্যে সহায়তা করবে, অথবা অন্য কোনরূপে জীবিকা-অর্জনের চেষ্টা করবে; সুতরাং যেমন পর্বত মহম্মদের নিকট না যাওয়াতে মহম্মদই পর্বতের নিকট গিয়েছিলেন, সেইরূপ দরিদ্র বালকেরা যদি শিক্ষালয়ে না আসতে পারে, তবে তাদের কাছেই শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে হবে।" কী দূরদৃষ্টি স্বামীজীর! এইভাবে দরিদ্র জনগণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের প্রয়াস করতে পারলে নিরক্ষর দেশবাসীকে সাক্ষর করতে কত সময় লাগে? বর্তমানে মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটদের বাধ্যতামূলকভাবে গ্রামে গ্রামে সেবার কাজে পাঠাবার কথা শোনা যাচ্ছে, তা খুবই ভাল কাজ হবে। এইরূপ সেবার কাজে সুষ্ঠু পথনির্দেশ রয়েছে স্বামীজীর বহু পত্রে।

স্বামীজী দরিদ্র জনসাধারণ এবং নিজের মধ্যে একই ব্রহ্ম, একই শক্তি উপলব্ধি ক'রে বলেছেন, "আমি দিব্য চোখে দেখছি, এদের ও আমার ভেতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র।" "এদের কল্যাণের জন্য আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত প্রার্থনা প্রযুক্ত হোক—আমরা কাজে কিছু ক'রে উঠতে না পেরে লোকের অজ্ঞাতসারে মরতে পারি—কেউ হয়তো আমাদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি দেখালে না, কেউ হয়তো আমাদের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত ফেললে না, কিন্তু আমাদের একটা চিন্তাও নষ্ট হবে না। এর ফল শীঘ্র বা বিলম্বে ফলবেই ফলবে। আমার প্রাণের ভেতর এত ভাব আসছে, আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না—তোমরা আমার হৃদয়ের ভাব কল্পনা ক'রে বুঝে নাও।"

অনুন্নত দুঃখী দরিদ্রদের সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞান করতেন স্বামীজী এবং তাদের সর্ববিধ দুঃখমোচনের জন্য আত্মনিয়োগ করতে বলতেন। স্বামীজী যে দরিদ্রনারায়ণ-সেবার কথা বলেছেন, তা নিজে অনুষ্ঠান ক'রে দেখিয়েও গেছেন। তখন মঠের জমির জঙ্গল সাফ করতে ও মাটি কাটতে প্রতি বছরই কতকগুলি স্ত্রী পুরুষ সাঁওতাল আসত। স্বামীজী

তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতে ভাল বাসতেন এবং আগ্রহভরে শুনতেনও। সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল কেষ্টা। একদিন স্বামীজী কেষ্টাকে বললেন, 'ওরে, তোরা আমাদের এখানে খাবি?' কেষ্টা ব'ললো, 'আমরা যে তোদের ছোঁয়া এখন আর খাই না; এখন যে বিয়ে হয়েছে, তোদের ছোঁয়া নুন খেলে জাত যাবেরে বাপ?' স্বামীজী বললেন, 'নুন কেন খাবি? নুন না দিয়ে তরকারি রেঁধে দেবো। তা হ'লে তো খাবি?' কেষ্টা ঐ কথায় স্বীকৃত হ'ল। তারপর স্বামীজীর আদেশে মঠে ঐ সাঁওতালদের জন্য লুচি, তরকারি, মেঠাই মোণ্ডা, দই ইত্যাদি যোগাড় করা হ'ল এবং তিনি তাদের বসিয়ে পরিতোষ সহকারে খাওয়াতে লাগলেন। খেতে খেতে কেষ্টা ব'ললো 'হ্যাঁরে স্বামী বাপ, তোরা এমন জিনিসটা কোথা পেলি? হামরা এমনটা কখনো খাইনি।' স্বামীজী তাদের পরিতোষ ক'রে খাইয়ে বললেন, 'তোরা যে নারায়ণ; আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হ'ল।' ধন্য দীন দরিদ্রের চিরদরদী বন্ধু স্বামীজী! ধন্য তাঁর কালজয়ী মহাভাব!

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা

The Math
Belur P. O.
11. 11 09

My dear Sris,

তোমার পত্রপাঠে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। যে-কেহ পরমপূজ্য শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের শরণাগত হইয়াছেন, তিনি ইহ জীবনেই আত্মদর্শন বা ভগবদ্দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইবেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তুমি অন্য কোনও গুরুর নিকট গমন করিও না। এক গুরুর নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। অন্যত্র গিয়াছিলে বলিয়া হৃদয়ে শান্তি পাও নাই। অন্যত্র গমনে দোষ হয়। ইহা তোমার শিক্ষা হইল। কদাচ ভুলিও না। যে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী। তুমি ইহাতে কেন সন্দেহ কর? সন্দেহের ফল কষ্ট। যাঁহার সন্দেহ নাই তিনিই পরম সুখী। সর্ব সময়ে যথাসাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম চিন্তা করিও, তাহা হইলে সন্দেহাসুরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

Yours affly
রামকৃষ্ণানন্দ

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃশরণম্

Chilkapeta, Almora, U. P.
27. 9. 15

প্রিয় অ—

বহুকাল তোমার পত্রাদি পাই নাই। সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবন হইতে মহিমবাবুর পত্রে জানিলাম যে তোমাদের অঞ্চলে বড়ই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে এবং তুমি যথাসাধ্য সেবা করিতেছ শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। এই তো প্রকৃত সময়, যাকে যতটুকু ক্ষমতা প্রভু দিয়াছেন সেটুকু সে এইরূপ কার্যে প্রয়োগ করিলে ধন্য হইবে এবং তাঁর বিশেষ কৃপা লাভ করিবে, ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। যাহা হউক সমস্ত খপর দিয়া পত্র লিখিলে বড়ই সুখী হইব।

গত এপ্রেল মাসে আমি ও হরি মহারাজ এখানে আসিয়াছি। হরি মহারাজ অনেকদিন হইতে diabetes-এ ভুগিতেছেন, তাঁকে এ পাহাড়ে একটা change দিবার জন্যই এবার এখানে আসা, এখানে তাঁর general health খুব ভাল হইয়াছে প্রভুর কৃপায়।...তুমি আমাদের আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। প্রভু তোমায় তাঁর দুঃখিরূপী নারায়ণমূর্তির সেবা করিবার শক্তি দিন, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃশরণম্

Chilkapeta, Almora, U. P.
2. 10. 15

প্রিয় অ—

তোমাদের ওখানকার দুর্ভিক্ষপীড়িত নারায়ণদের সেবার জন্য আজ মনি অর্ডার করিয়া পাঁচটি টাকা পাঠাইলাম। তোমার প্রেরিত ৮ টাকা পাইয়াছি। তোমরা যেরূপ কার্য এসময় করিতেছ, ইহাই প্রকৃত ধর্ম ও মনুষ্যত্ব, স্বামীজীর প্রাণের কার্যই এই সকল। খুব কাজ কর; প্রভু তোমাদের বল দিন, স্বাস্থ্য দিন, অধ্যবসায় দিন। দেশের যুবকদের ইহা দৃষ্টান্তস্থল হউক। আর কি লিখিব, আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিও এবং মধ্যে মধ্যে সংবাদ দিও। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

স্বামী সারদানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

[অ-কে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃশরণম্

কলিকাতা

২৩।৪।২৬

কল্যাণবরেষু,

তোমার প্রেরিত ১০ টাকা এবং পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আমার diabetes দেখা দিয়াছিল, কারণ Convention-এর জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। বিশ্রাম লওয়ায় এবং আহার পথ্যাদি regulate করায় উহা একরূপ সারিয়া গিয়াছে, চিন্তার কোনও কারণ নাই। সতত আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। এখানকার কুশল। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসারদানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃশরণম্

কলিকাতা

২৪।৩।২৭

কল্যাণবরেষু,

তোমার প্রেরিত ১০ টাকা পাইয়া সুখী হইলাম। আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা সতত জানিবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা ও উৎসবের সময় মঠে বাস করিয়াছিলাম। ঠাকুরের উৎসবে এবার অন্যান্য বারের চেয়ে লোকসংখ্যা অনেক অধিক হইয়াছিল, ২০।২৫ [হাজার] লোককে বসাইয়া প্রসাদ খাওয়ানো হয় এবং কত লোককে যে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। মঠের ও এখানকার কুশল। আমার শরীর ভাল আছে। মধ্যে মধ্যে তোমাদের কুশল-সংবাদ দিয়া সুখী ও নিশ্চিন্ত করিও। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসারদানন্দ

তথাগতের মহানির্বাণলাভের পূর্বের তিন মাস

[পূর্বানুবৃত্তি]

'জিজ্ঞাসু'

পরিনির্বাণের জন্য শ্রীবুদ্ধের প্রস্তুতি

শ্রীবুদ্ধ যখন এইভাবে মারের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার উল্লেখ ক'রে সত্বর পরিনির্বাণের সূচনা দিচ্ছিলেন, তখনই বললেন—"আনন্দ, আজই তথাগত চাপাল মন্দিরে স্মৃতিমান ও প্রজ্ঞাবান অবস্থায় স্বীয় আয়ুষ্কাল ত্যাগ করেছেন।"

স্বভাবত: এই কথা শুনে আনন্দ কাঁদতে লাগলেন, বললেন—"প্রভু, আপনি এখনই দেহরক্ষা করবেন না। বহুজনের হিতের ও সুখের জন্য, দেবতা ও মনুষ্যদের হিতের ও সুখের জন্য আপনি এক কল্পকাল দেহধারণ করুন।"

শ্রীবুদ্ধ বললেন, "না আনন্দ, আর এ-প্রার্থনা কোরো না, এ-প্রার্থনা করার সময় আর নেই।"

আরও দু-বার আনন্দ ঐ প্রার্থনা জানালেন, শ্রীবুদ্ধও আরো দু-বার একই উত্তর দিলেন। আরও বললেন—"আনন্দ, তুমি কি তথাগতের বোধিত্বে বিশ্বাস কর না?"

আনন্দ বললেন,—"হাঁ ভগবান, আমি বিশ্বাস করি।"

শ্রীবুদ্ধ বললেন,—"তবে কেন তুমি বার বার এই প্রার্থনা করছ?"

আনন্দ বললেন,—"কারণ, আমি আপনার কাছেই শুনেছি যে, যিনি ধ্যানবলে চতুর্বিধ ঋদ্ধি (যোগবল) লাভ করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে এই জন্মেই এক কল্পকাল অথবা বর্তমান কল্পের অবশিষ্টকাল জীবিত থাকতে পারেন। প্রভুর তো চতুর্বিধ ঋদ্ধি লাভ হয়েছে। কাজেই আপনি ইচ্ছা করলে এক কল্পকাল জীবিত থাকতে পারেন।"

শ্রীবুদ্ধ বললেন,—"আনন্দ, তোমার কি বিশ্বাস আছে?"

আনন্দ বললেন,—"আজ্ঞে হাঁ।"

"তবে এটা তোমার দোষ। কারণ, তুমি আমার স্পষ্ট নির্দেশ পেয়ে, স্পষ্ট কথা শুনেও আমার কাছে তো কখনো বলনি—'ভগবান, এক কল্প দেহধারণ করুন।' তখন তুমি যদি এই প্রার্থনা জানাতে, তাহলে হয়ত আমি দু-এক বার তোমার কথায় কান দিতাম না, কিন্তু তৃতীয় বার প্রার্থনা করলে হয়ত তোমার কথা রাখতাম। দেহ যে নশ্বর, এক সময় নষ্ট হবেই, এ কথা তুমি জান—দেহধারী মাত্রকেই দেহত্যাগ করতে হয়। সুতরাং আর দেহ-রক্ষার কথা বোলো না। তথাগতের আয়ু শেষ হয়েছে, আজ থেকে তিন মাস পরে তাঁর দেহ যাবেই। চল, এখন মহাবনে কূটাগার-শালায় যাই।"

আনন্দ প্রভুর আদেশমত তাঁকে নিয়ে কূটাগারশালায় গেলে শ্রীবুদ্ধ তাঁকে বৈশালীর আশে-পাশে যেখানে যত ভিক্ষু ছিল, তাঁদের উপস্থানশালায় সমবেত করতে আদেশ দিলেন। আদেশ পালিত হলে ভগবান সমবেত ভিক্ষুদের বললেন—"আমি যে ধর্ম নিজে জেনে তোমাদের জানিয়েছি, তা ভাল ক'রে আয়ত্ত কর ও পূর্ণরূপে আচরণ কর। এই ব্রহ্মচর্য চিরদিন স্থায়ী হয়..."ইত্যাদি।

ভগবান বুদ্ধ একবার বহু ভিক্ষু সমভি-ব্যাহারে পাওয়ানগরে (বর্তমান পাওয়াপুরী)

চুন্দ কর্মকারের আম্রবনে গিয়ে অবস্থান করছিলেন। খবর পেয়ে চুন্দ তাঁর কাছে যায়। তথাগত চুন্দকে উপদেশ দান ক'রে জাগ্রত, উৎসাহিত, উত্তেজিত ও আনন্দিত করেন। চুন্দ ভিক্ষুসংঘসহ তাঁকে পরদিন নিজ বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল, প্রভুও তাতে সম্মতি দিলেন।

পরদিন চুন্দ স্বগৃহে শূকরমাংস ও অন্য নানা দ্রব্য দিয়ে নানা রুচিকর খাদ্য প্রস্তুত ক'রে তথাগতের কাছে পাঠালো।

তথাগত যথাসময়ে চুন্দের বাড়ি এসে তাকে বললেন—"তুমি যে শূকরমাংস রেঁধেছ, সেটা আমাকে দাও, আর অন্যান্য খাদ্য ভিক্ষুদের দাও।" চুন্দও সেইভাবে পরিবেশন করলো। বুদ্ধদেব অবশিষ্ট শূকরমাংস চুন্দের দ্বারা গর্ত খুঁড়িয়ে পুঁতে দেবার ব্যবস্থা করলেন। কারণ, তিনি বললেন, "এই শূকরমাংস জীর্ণ করতে পারে—তথাগত ছাড়া এমন আর কেউ নাই—কি মনুষ্যলোকে, কি দেবলোকে।" আসল কথা এই, বুদ্ধদেব জানতেন—চুন্দের শুষ্ক শূকরমাংস বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তা খেলে ভিক্ষুদের মৃত্যু ঘটত; কিন্তু নিজের জন্য তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ভক্তের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি ঐ মাংস একাই খেয়েছিলেন। খাওয়ার পর তিনি কঠিন রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হন এবং ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা পান। এই যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞাত ভাবের কোন ব্যতিক্রম হয়নি। কোন কাতরোক্তি তাঁর মুখ থেকে বের হয়নি।

ব্যাধির একটু উপশম হতেই শ্রীবুদ্ধ আনন্দের সঙ্গে কুশীনর নগরের দিকে যাত্রা করলেন। রাস্তায় অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের নীচে চার-ভাঁজ করা চীবরের আসনে বসে পিপাসার্ত হয়ে আনন্দের কাছে জল চাইলেন। নিকটে জল থাকলেও সে জল অত্যন্ত পঙ্কিল হওয়ায় আনন্দ তা দিতে চাইলেন না, বললেন—আর কিছুদূরে ককুৎস্থা নামক নদীতে নির্মল জল আছে, সেখানে গেলেই তিনি নির্মল জল পাবেন। কিন্তু শ্রীবুদ্ধ অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে তিনবার জল চাইলেন। তখন আনন্দ বাধ্য হয়ে ঐ ঘোলাটে জলই আনতে গিয়ে দেখেন—জল সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়ে গেছে। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সেই জল এনে প্রভুকে পান করতে দিলেন।

শেষে শ্রীবুদ্ধ কুশীনরের নিকটবর্তী মল্লদের শালবনে এসে একজোড়া শালবৃক্ষের উপর চীবর দ্বারা শয্যা নির্মাণ করিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। শালবৃক্ষের ও মন্দারবৃক্ষের পুষ্পে তাঁর শরীর ঢেকে গেল। শ্রীবুদ্ধ সেই প্রসঙ্গে বললেন—"আনন্দ, এভাবে তথাগতকে সম্মান করা যায় না। যদি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা, উপাসক ও উপাসিকারা ধর্মের মূল শাসন ও অনুশাসন অনুসারে জীবন যাপন করে, বিশুদ্ধ জীবন যাপন করে, তাহলেই তথাগতের প্রতি সম্মান দেখান হয়, তাঁকে পূজা করা হয়। অতএব হে আনন্দ, শাসন ও অনুশাসন অনুসারে জীবন-যাপন কর।"

স্তূপ-নির্মাণ

আসন্ন পরিনির্বাণের কালো ছায়া যখন ঘনিয়ে আসছিল, তখন একদিন আনন্দ শ্রীবুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন—'ভগবন্, আমরা তথাগতের শরীর-পূজা কিভাবে করব?' শ্রীবুদ্ধ বললেন—"আনন্দ, সে নিয়ে তুমি চিন্তা করো না। তথাগতের শরীরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। নিজের মঙ্গলের জন্য দৃঢ়নিষ্ঠ হও, নিজ মঙ্গলের জন্য

সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ কর, স্বীয় মঙ্গলের জন্য সদা ব্যগ্র ও উৎসাহী হয়ে সাধনা করতে থাক। বিজ্ঞ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ—যাঁরা তথাগতের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত, তাঁরাই তথাগতের শরীরের প্রতি সম্মান দেখাবেন।"

আনন্দের শোক ও সান্ত্বনালাভ

আনন্দকে সর্বদা শোকাচ্ছন্ন হয়ে থাকতে দেখে তথাগত তাকে ডাকিয়ে আনালেন ও বললেন—"আর শোক করো না, আর কেঁদো না, আমি আগেই তোমাদের বলেছি—আমরা একদিন সকল প্রিয় ও মনোরম বস্তু থেকে বঞ্চিত হব সকল প্রিয়জনের সঙ্গে আমাদের বিয়োগ ঘটবেই। জগতে সব কিছুই যখন ক্ষণিক, তখন কোন দেহধারীর দেহ চিরস্থায়ী হতে পারে না, তথাগতেরও না। তুমি দীর্ঘকাল আমার সেবা করেছ, আমার হিত ও সুখের জন্য তুমি কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেছ, তুমি পুণ্য অর্জন করেছ। তীব্র সাধনা কর, শীঘ্র তুমি আস্রব (দুঃখ অর্থাৎ কাম, সংসারাসক্তি, মিথ্যাদৃষ্টি ও অবিদ্যা) থেকে মুক্ত হবে

অতঃপর শ্রীবুদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বললেন—"এই আনন্দ যেমন আমার সেবা করেছে, ইতিপূর্বে আমার মত যেসব সম্যক্ সম্বুদ্ধ তথাগত এসেছিলেন এবং পরে যাঁরা আসবেন, তাঁদের সকলের সঙ্গেই এমনই একজন সেবক এসেছিলেন ও আসবেন। আনন্দ পণ্ডিত ও মেধাবী, তথাগতকে দর্শন করবার উপযুক্ত সময় কি—তা সে জানে।—আনন্দের চারটি অদ্ভুত গুণ আছে। যথা—(১) ভিক্ষুমণ্ডলী বা উপাসকমণ্ডলী আনন্দকে দর্শন করতে এসে তাঁকে দেখে প্রীত হয়। (২) আনন্দের মুখ থেকে ধর্ম-উপদেশ শুনলে প্রীত হয়। (৩) আনন্দ কথা না বললে দুঃখিত হয়। (৪) তথাগতের সঙ্গে কার, কখন ও কোথায় দেখা করা উচিত, তা আনন্দ জানে।"

পরিনির্বাণের স্থান ও সময় সম্পর্কে আনন্দ ও তথাগত

এক সময় আনন্দ বললেন—"প্রভু, আমার একটা নিবেদন আছে। আপনি এই জংলা মেঠো জায়গায় একটা তুচ্ছ স্থানে পরিনির্বাণ লাভ করবেন না। অনেক মহানগর আছে, যেমন—চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত (অযোধ্যা), কৌশাম্বী ও বারাণসী—এগুলির যে-কোন একটিতে আপনার পরিনির্বাণ হোক্, কারণ ঐসব জায়গায় ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিরা আছেন, তাঁরা আপনার প্রতি বিশ্বাসবান, তাঁরা উপযুক্ত সম্মান দেখাবেন।'

শ্রীবুদ্ধ বাধা দিয়ে বললেন—"না, না, এ জায়গা তুচ্ছ নয়, এক সময় এখানে কুশাবতী নামক প্রসিদ্ধ মহৈশ্বর্যপূর্ণ নগর ছিল, এখানে দেহত্যাগে কোন বাধা নাই। তুমি কুশীনরবাসী মল্লদের খবর পাঠাও যে, আজই রাত্রে শেষ প্রহরে তথাগতের পরিনির্বাণ হবে।" আনন্দ আর একজন ভিক্ষুর সঙ্গে কুশীনরে গিয়ে ঐ সংবাদ প্রচার করলেন। শুনে মল্লদের মেয়ে, পুরুষ, শিশু-সবাই হায় হায় করতে লাগলো। তারা রাত্রির প্রথম প্রহরে শালবনে এসে আনন্দের ব্যবস্থাপনায় সুশৃঙ্খলভাবে বুদ্ধদেবকে বন্দনা ক'রে গেল।

চুন্দকে সঙ্কটমুক্ত করার জন্য তথাগতের ব্যবস্থা

দেহত্যাগের জন্য কুশীনর যাত্রার পূর্বে শ্রীবুদ্ধ আনন্দকে বলেন—"দেখ, চুন্দের অন্ন খেয়ে আমি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে এখন দেহত্যাগ করতে

[শেষাংশ ২৬৫ পৃষ্ঠায়]

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক ধ্যান-ধারণার উৎস ও প্রকৃতি

মোটামুটিভাবে স্বামী বিবেকানন্দের 'সমাজ-দর্শনের তিনটি উৎস নির্দেশ করা যায় : (১) তাঁর জীবনবেদ, যাকে তিনি বেদান্ত নামে অভিহিত করেছেন। (২) বিভিন্ন সূত্র থেকে আহৃত বিদ্যা (literary education) এবং (৩) পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানুষ ও সমাজ-ব্যবস্থায় তাঁর ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞান। শেষোক্তটির সহিত সংঘাতের ফলে তাঁর বৈদান্তিক আশাবাদের প্রচণ্ডতা বেশ কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। এই কারণে তিনি বিবর্তন-বাদকে প্রগতি বা অগ্রগতির দ্যোতক বলে কোনমতেই মনে করতে পারেননি। বস্তুতঃ, সমাজজীবনের সঙ্গে জড়িত অমঙ্গলগুলি এতই প্রবলশক্তিসম্পন্ন ও ব্যাপকপ্রকৃতির যে, তারা স্পেন্সার-কল্পিত বিবর্তনধারায় দ্রবীভূত হ'য়ে যাবে, এরূপ কোন আশাবাদী ধারণা স্বামীজী মুহূর্তের জন্যও পোষণ করতে পারেননি। জাতিভেদপ্রথা, পুরোহিত-প্রথা, ছুঁৎমার্গ, পাকশালার শুচিতা, নারীর দাসত্ব, বর্ণবৈষম্য (colour bar), অর্থ-মূলধনের শোষণ (exploitation of the finance capital), বিশেষাধিকারের জন্য দ্বন্দ্বসংঘাত (struggle for special privileges) প্রভৃতি নিশ্চয়ই সমাজের অগ্রগতির সূচক নয়। বিশ্লেষক শক্তিসম্পন্ন স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে এগুলিকে বেছে নেওয়া মোটেই কঠিন হয়নি। তবে তিনি সাধারণ ভাবে বিবর্তনবাদকে মেনে নিয়েছিলেন, কারণ বিবর্তনবাদ 'ভারতের সকল দর্শনশাস্ত্রাদির ভিত্তি' [১] এবং বিবর্তনবাদের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন ইতিহাসের অভিযানের সন্ধান—যে অভিযান হ'লো মিথ্যা থেকে সত্যে নয়, 'নিম্ন-স্তরের সত্য থেকে উচ্চস্তরের সত্যে' ('from truth which is lower to truth which is higher') অভিযান। এই অভিযানের অর্থ হ'লো, মানুষকে অগ্রসর হতে হবে ধীরে ধীরে, হাজার হাজার বছর ধরে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাদিষ্ট স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে সমাজজীবনের এই মন্থরগতি অভিযান মোটেই পর্যাপ্ত বলে পরিগণিত হয়নি। অন্যভাবে বলা যায়, ভোলতেয়ার (Voltaire) প্রভৃতির মত পৃথিবীকে বিকৃতি ও নির্বুদ্ধিতার আগার বলে কখনও মনে করেননি। এবং আরও উল্লেখযোগ্য, যে অবস্থায় তিনি পৃথিবীকে দেখেছিলেন সেই অবস্থায় রেখে যেতেও মোটে রাজী হননি। তাঁর কাছে এই সংসার ছিল অসম্পূর্ণতার সূচক, এবং ত্রুটি দূরীকরণের মাধ্যমে এর দ্রুত উন্নয়নসাধন, এমনকি পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদনও সম্ভব বলে ছিল তাঁর ধারণা। এই কারণে তিনি পতঞ্জলির বিখ্যাত সূত্র "প্রকৃত্যাপূরাৎ" (filling in of nature) থেকে আহরণ করে বিবর্তনবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য হ'লো : বিবর্তনধারার নিম্নস্তরে 'জীবন-সংগ্রাম ও স্বাভাবিক নির্বাচনের সূত্র' (struggle for existence and the principle of natural

---

১ The East and the West (C. W. V, 519)

selection) চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করে সন্দেহ নেই, কিন্তু উচ্চস্তরে, মানবজীবনে এই সংগ্রাম ও সূত্র অগ্রগতির সহায়ক না হ'য়ে অগ্রগতিকে ব্যাহতই করে। তাঁর নিজের ভাষায়, "পশু-জগতে আমরা জীবন-সংগ্রাম, যোগ্যতমের অস্তিত্ব প্রভৃতি সূত্রের প্রয়োগ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করি···কিন্তু মনুষ্যজগতে মননশীলতার বিকাশের দরুন সূত্রগুলির কার্যকারিতার পরিবর্তে বিপরীতই লক্ষ্য করা যায়।' ("In the animal kingdom we really see such laws as struggle for existence, survival of the fittest etc. evidently at work.··· But in the human kingdom, where there is manifestation of rationality we find just the reverse of those laws."[২]) পূর্ণাঙ্গতাই মানুষের প্রকৃতি; শুধু কতকগুলি প্রতিবন্ধকের জন্য এই পূর্ণাঙ্গতা ঠিকমত পরিস্ফুটিত হতে পারে না। সুতরাং প্রতিবন্ধক-গুলিকে অপসারিত করাই হ'লো কর্তব্য। এবং "শিক্ষা-সংস্কৃতির মাধ্যমে, উপাসনা ও একাগ্রতার মাধ্যমে এবং সর্বোপরি ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে (renunciation and sacrifice) প্রতিবন্ধকগুলিকে অপসারিত করা যায়।"[৩] "মানুষের চূড়ান্ত ক্রমবিকাশ সংঘটিত হ'তে পারে ত্যাগেরই মাধ্যমে।"[৪] সুতরাং সমাজের প্রগতির জন্য স্বামীজীর নির্দেশ হ'ল 'পারস্পরিক সহায়তা' (mutual aid), কারণ 'ত্যাগ ও সেবা' বলতে পারস্পরিক সহায়তাই বোঝায়—'সমাজসেবা' (social service) কথাটি এই সহায়তার নির্দেশক নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্বামীজী এই ধারণা ব্যাখ্যা করেছিলেন ১৮৯৮ সালে, ক্রপটকিনের (Prince Peter Kropotkin) বিখ্যাত গ্রন্থ Mutual Aid, A Factor in Evolution প্রকাশিত হবার চার বছর আগে।

দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবনবেদ বেদান্তের অনুসরণে সকল সামাজিক অকল্যাণ দোষ ত্রুটি অজ্ঞতা-প্রসূত ব'লে মনে করেছেন, সেইহেতু তিনি অজ্ঞতাদূরীকরণের মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব করবার জন্য শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখানে তিনি হিতবাদী দার্শনিকদের (the utilitarians) সঙ্গে একমত যে, শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্যক পরিকল্পনা দ্বারা 'সর্বাধিক জনের সর্বাধিক হিতসাধন' ('greatest good of the greatest number') করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, যদিও স্বামীজী তাঁর সামাজিক ধ্যান-ধারণার পরিস্ফুটনে বৈজ্ঞানিক সূত্র ও দার্শনিক তত্ত্ব উভয়কেই অবলম্বন করেছিলেন, তবুও কিন্তু এই সকল ধ্যান-ধারণায় উপযোগ (utility) অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতার প্রকাশই বেশী লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ তাঁর সামাজিক ধ্যান-ধারণার প্রেরণা সরাসরি সুবিধা-বিনিময় (direct qud pro qud) না, প্রেরণা হ'ল এই জীবনেই মোক্ষ বা মুক্তিলাভের জন্য মনুষ্য-সেবা। একে 'সামাজিক সম্পর্কের আধ্যাত্মিককরণ' (spiritualisation of social relationships) বলে বর্ণনা করা যায় এবং ভারতীয় ধারণা অনুসারে এই আধ্যাত্মিক-করণই হ'লো সমাজজীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই ধারণার জন্য ভারতে সমাজবিজ্ঞান হিসাবে কোন শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেনি। কারণ সমাজ-বিজ্ঞানের মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয় হ'লো যে, সমাজ স্বাভাবিকভাবে বিবর্তিত প্রতিষ্ঠান,

২ Conversations, and Dialogues (C. W. VII, p 154)
৩ Life, 615
৪ C. W. VII, p 154

পারমার্থিক অথবা উদ্দেশ্যসাধক (purposive) কোন কিছু নয়।[৫]

অদ্বৈত বেদান্তের অনুসরণে সমাজকে অন্যতম দেহবদ্ধ সংস্থা (organism) ব'লে গণ্য করে স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে 'পারস্পরিক সহায়তার' ধারণায় উপনীত হওয়া মোটেই কঠিন হয়নি। কিন্তু তাঁর বিশিষ্ট অবদান হ'লো হৃদয়ের উপাদান প্রেম বা ভালবাসা এবং বিজ্ঞানকে একই সূত্রে গ্রথিত করে ধারণার পূর্ণতর রূপদান করা। মোটামুটিভাবে তাঁর সমাজদর্শনকে অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্ব, সাংখ্য দর্শনের মর্মবাণী এবং আধুনিক বিজ্ঞানসমূহের সিদ্ধান্তের সমন্বয় বলে বর্ণনা করা যায়, তবে এই সব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত তাঁর জীবনদর্শন ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে তবে তাঁর সমাজ-দর্শনে স্থান পেয়েছে।

এইবার আমরা স্বামীজীর বাণী ও রচনা থেকে সংগ্রহ ক'রে তাঁর সামাজিক ধ্যান-ধারণার বিশ্লেষণকার্যে অগ্রসর হ'তে পারি।

স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্লেষণ :

১। সমাজের স্বরূপ ও উদ্ভব :

পরম্পরাগত ভারতীয় ধারণা হলো যে, মৌলিক প্রকৃতিতে সমাজ চিরন্তন, জৈব এবং বিশেষ উদ্দেশ্যাভিমুখী ক্রমবিকশিত প্রতিষ্ঠান।[৬] মানুষের অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তি তাঁর দর্শনের মূলতত্ত্ব ব'লে স্বামী বিবেকানন্দ এই পরম্পরাগত ভারতীয় ধারণাকে মাত্র আংশিক সমর্থন করেছিলেন। সমাজ যদি স্বাভাবিকভাবে ক্রমবিকাশমান শাশ্বত প্রতিষ্ঠানই হয় তবে সমাজ-ব্যবস্থাপনায় মানুষের কোন ভূমিকাই থাকতে পারে না। এর অর্থ বেদান্তের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় মানুষের অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তিকে পুরাপুরি অস্বীকার করা। অতএব, স্বামীজীর অভিমত হ'ল যে, সমাজ অংশত স্বাভাবিক এবং অংশত কৃত্রিম বা যান্ত্রিক (mechanistic) প্রতিষ্ঠান।

সমাজ যে স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান তার মূলে আছে মানুষের অন্যতম প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য যাকে 'ত্যাগের প্রবৃত্তি' (renunciatory impulse) বা স্বামীজীর নিজের ভাষায় 'আমিত্বের গণ্ডির বাইরে আসার ঝোঁক' ('the desire to jump out of ourselves'[৭]) বলে বর্ণনা করা যায়। আবার এই প্রবৃত্তির উৎস হ'ল মানস বা চিত্ত-বৃত্তির অস্তিত্ব। চিত্তবৃত্তির দরুন মানুষ চিন্তা করে এবং ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুটিত করতে চায়। ফলে ত্যাগের প্রবৃত্তি কার্যকর হ'য়ে সৃষ্টি করে সমাজ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের। "সমাজগঠন, বিবাহপ্রথা, পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহমমতা, সমগ্র কল্যাণকর কার্য, নৈতিক চেতনা এবং নীতি-শাস্ত্রাদি—সকলই হ'ল ত্যাগপ্রবৃত্তির প্রকাশের বিভিন্ন রূপ মাত্র।" ('The formation of society, institution of marriage, the love for children, our good works, morality and ethics are our all different forms of renunciation.'[৮])

৫ R. M. MacIver's article in Encyclopaedia of the Social Sciences, XIV, 233. ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় লেখকও তাঁদের সমাজবিজ্ঞানমূলক রচনায় সমাজের আধ্যাত্মিককরণ মেনে নিয়েছেন। তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ' দ্রষ্টব্য।

৬ Dr. Roma Choudhuri's article in the C. V, 350; also Ghosal: Hindu Political Theories, 36-37 & 234-35

৭ C. W. VI, 378

৮ Ibid.

অতএব, প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে মানুষই সমাজ সৃষ্টি করেছে এবং মহৎ সমাজ-স্রষ্টার ('great originators of society') সাক্ষাৎ সকল সময়ই পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দের এই ধারণায় এ্যারিস্টটলের বিখ্যাত উক্তি যে 'মানুষ প্রকৃতিগত কারণেই সমাজবদ্ধ জীব' ("Man is by nature a social animal".) তার আধুনিক ব্যাখ্যার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতে, উক্তিটির তাৎপর্য এই নয় যে, মানুষ সঙ্গপ্রিয় (sociable) জীব; তাৎপর্য হ'লো সংগঠিত সমাজ ব্যতিরেকে, সামাজিক উত্তরাধিকার (social heritage) ব্যতিরেকে মানুষের ব্যক্তিত্ব পূর্ণভাবে বিকশিত হয় না, হতে পারে না।[৯] অতএব আমিত্বের গণ্ডিও অতিক্রম ক'রে, পরস্পরের সমবায়েই আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে হবে।

সমাজ স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান হ'লেও কোন অর্থেই কিন্তু চিরন্তন প্রতিষ্ঠান নয়। "বহু যুগ পূর্বে সমাজ বলে কিছু ছিল না, বহু যুগ পরেও হয়ত থাকবে না।"[১০] উপরের আলোচনায় দেখা গেছে যে, যদিও বা মানুষ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সমাজ গঠন করেছে, প্রকৃত অর্থে কিন্তু সমাজ-গঠনের মূলে আছে এক বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের—জীবনকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জীবনকে উপলব্ধি করার পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষ কখনই একমত হতে পারেনি। ফলে সমাজ-গঠনের জন্য দু'টি ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রথম পদ্ধতিতে 'ধর্ম'কে এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে 'উপযোগ'কে সমাজের ভিত্তি করা হয়েছে। ফলে কোন সমাজের বুনিয়াদ হ'ল আধ্যাত্মিকতা, কোন সমাজের বা জড়বাদ (materialism)। প্রথমোক্ত সমাজ জড়বাদী বা বস্তুবাদী ধ্যানধারণার বাইরে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে এক শাশ্বত জগৎকে খুঁজে বার করে এবং অজানার ভয়কে অতিক্রম করে সেখানেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে চায়। দ্বিতীয়োক্ত সমাজ এই পৃথিবীকেই পরম ও চরম বলে মেনে নিয়ে জড়বাদকেই সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় করে।[১১] উভয় পন্থাই ভ্রান্তির সূচক—দেহ বা মন কারও আধিপত্য সমাজের উদ্দেশ্য-সাধনের অনুপন্থী নয়। যখন এই একাধিপত্যের অবসান ঘ'টে পূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাজের জন্য দেহ ও মানসের সংযুক্ত বুনিয়াদ গ'ড়ে উঠবে তখন ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার দরুন সমাজের আর কোন প্রয়োজনই থাকবে না—এঞ্জেলের অনুসরণে বলা যায়, সমাজের তখন অবলুপ্তি ঘটবে (society will wither away)। ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্য সমাজকে অন্যতম যৌথ উদ্যোগাধীন নৈতিক ব্যবস্থা (a collective ethical enterprise) হিসাবে গণ্য করতে হবে। এবং যেহেতু যৌথ, সেইহেতু জৈবপ্রকৃতির (of organic character) ব'লেও ধরতে হবে। মানবজীবন শুধু ব্যক্তিগতভাবে অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তির উপলব্ধির জন্য নয়, অন্য সকলকে সমভাবে ঐ উপলব্ধিতে সহায়তা করার জন্যও বটে। অতএব, সামাজিক পরিবেশ থেকে 'আমি' 'তুমি' এবং 'আমার'

৯ MacIver and Page : Society, 47 ; also Bosanquet : Philosophical Theory of the State. বোসানকেত লিখেছেন, "The fundamental idea of Greek political Philosophy, as we find it in Plato and Aristotle, is that human mind can only attend its full and proper life in a community of minds."

১০ C. W. II, 64

১১ C. W. III, 156

'তোমার' পার্থক্যকে সম্পূর্ণ দূর করতে হবে, এই কাজ সম্পাদিত হ'লে সমাজ হ'য়ে দাঁড়াবে জীবদেহেরই প্রতিকৃতি।

সমাজের এই অতি-জৈব (super-organic nature) সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণার উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় অদ্বৈত বেদান্তের 'অদ্বৈতবাদ' ছাড়াও 'মায়াবাদে'। অদ্বৈতবাদ বা একত্বে বিশ্বাস দার্শনিককে সরাসরি জৈব ধারণায় উপনীত করে এবং মায়াবাদ তাঁর দর্শনের ভিত্তিকে পোক্ত করে তোলে। স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করাচার্যের মায়াবাদকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সমাজদর্শনের প্রয়োজনে মায়াবাদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন। 'মায়ার' অর্থ প্রপঞ্চ নয়, 'মায়া' বলতে মানুষের প্রকৃত সত্তা বা আত্মার উপর 'আমিত্বের' উপলেপন বোঝায়। এই আমিত্ব বা অহংবাদ ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণার দ্যোতক মাত্র। এর দরুন আমরা নিজেদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক মনে করি। সুতরাং এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদে সম্পাদিত যে-কোন কাজ আমাদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যবন্ধন রচনা না ক'রে পারে না, এবং যখন আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তাকে চিনতে পারি তখন—চূড়ান্ত উপলব্ধির অবস্থায়—ব্যক্তিসত্তার ছায়ামাত্রও আমাদের অনুসরণ করে না।[১২]

এই উপলব্ধিকে একটি প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করা যায় এবং সমাজ-জীবনের কাজ হ'লো ঐই প্রক্রিয়ার সহায়ক হওয়া। সমাজের বিবর্তন উদ্দেশ্যাভিমুখী। নৈকট্যের মনোভাব থেকে ক্রমে আমরা অনুভব করি ব্যক্তিসত্তাহীন অস্তিত্বের, যে অনুভূতিতে শেষ পর্যন্ত 'আমিত্বের গণ্ডি অতিক্রম করার ঝোঁক' ('the desire to jump out of ourselves') পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা সম্ভব না হচ্ছে ততক্ষণ সমাজব্যবস্থা ও সমাজের ক্রমবিকাশের সকল দিকেই এই প্রবণতার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাবে। স্বামীজীর নিজের ভাষায়, "ব্যক্তির ভ্রান্ত ইচ্ছা বা মিথ্যা সত্তাকে বর্জন করা—অর্থাৎ আমিত্বের গণ্ডি অতিক্রম করার প্রচেষ্টা এবং এই প্রচেষ্টাকে কার্যে পরিণত করার জন্য বিরতিবিহীন সংগ্রামকেই জগতে একমাত্র নিত্য ঘটনা বলে অভিহিত করা যায়, যার বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও স্তর হ'লো আমাদের বিভিন্ন সমাজ ও সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ।" ("The surrender of the will or the fictitious self—or the desire to jump out of ourselves, as it were—the struggle still to objectify the subject—is the one phenomenon in this world of which all societies and social forms are various modes and stages".[১৩])

২। সমাজের ভিত্তিঃ

সমাজের ভিত্তিমূল ত্যাগের প্রবৃত্তি—'আমিত্বের গণ্ডি অতিক্রম করার প্রচেষ্টা' বলে সমাজজীবন সত্যের সন্ধানে অভিযানের—তীর্থযাত্রারই সামিল। প্রত্যেক সমাজই অবশ্য বিশ্বাস করে যে, সত্যের সন্ধান ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে; এ বিশ্বাস ছাড়া কোন সমাজ বাঁচতে পারে না। আবার মানুষ যে 'নিম্ন পর্যায়ের সত্য থেকে উচ্চ পর্যায়ের সত্যে' উপনীত হবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে তাও সন্দেহাতীত। কিন্তু এ ধরনের বিশ্বাসের দরুন সমাজের অগ্রগতি হয় ব্যাহত

১২ Swami Probhavananda : The Spiritual Heritage, 293

১৩ C. W. VI, 368

এবং দেখা দেয় আনুষঙ্গিক সামাজিক অকল্যাণ। অতএব জড়বাদীরা যখন বলেন যে সত্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তখন তাঁরা অভিযানে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করেন; অনুরূপভাবে অবিমিশ্র আধ্যাত্মিকতার সমর্থকরাও এ পথ বিঘ্নিত করে তোলেন। একমাত্র অন্ন অথবা একমাত্র আত্মাকে অবলম্বন করে মানুষ বাঁচতে পারে না। জীবনকে উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন হ'লো জড়বাদ ও আধ্যাত্মিকতার সার্থক সমন্বয়। অবশ্য এই সমন্বিত জীবনীশক্তির কার্যকারিতায় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনভার অর্পিত থাকবে আধ্যাত্মিকতার উপর। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, মাত্র এইরূপ সমন্বিত শক্তিই সমাজের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে গ'ড়তে পারে।[১৪] অন্য ভাবে ভিত্তিরচনার অর্থ হ'লো কাম্যাবস্থা থেকে বিচ্যুত হওয়া (deviation from the optimum) এবং এর ফল ভয়াবহ হ'তে পারে। কিভাবে কতটা ভয়াবহ হতে পারে তার ব্যাখ্যা অবশ্যই করা প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

১৪ C. W. I, 67.

[২৫৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

যাচ্ছি—এতে লোক নিশ্চয়ই চুন্দকে দোষী করবে, হয়ত নির্যাতনও করবে। চুন্দেরও মনে হয়ত এই ব'লে অনুতাপ হবে যে, 'আমার অন্ন খেয়েই প্রভুর প্রাণ গেল।' আনন্দ, চুন্দকে তোমরা এই ব'লে সান্ত্বনা দেবে যে, এতে চুন্দেরই লাভ হয়েছে। তার অন্ন ভোজন ক'রে তথাগত পরিনির্বাণ-প্রাপ্ত হয়েছেন, এতে তার গৌরবেরই কথা। তথাগতকে যারা সম্বোধিলাভের পরে ও পরিনির্বাণের পূর্বে অন্ন দান করেছে, তাদের সমান ফল ও সমান মুক্তিলাভ ঘটবে। এই কর্মের দ্বারা চুন্দ দীর্ঘায়ু লাভ করবে এবং জন্মান্তরে তার উত্তম বর্ণে জন্ম হবে। চুন্দের এতে সুখ যশ, স্বর্গ, আধিপত্য ইত্যাদিও লাভ হবে।"

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ঃ 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

কার্ল মার্কস, হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় কবিতা, বিজ্ঞান ও ধর্ম

উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতা যে অনেক পরিমাণে বিজ্ঞান-নির্ভর তার অন্যতম প্রমাণ সেকালের প্রভাবশালী দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার। বিংশ শতাব্দীতেও বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার আমাদের আন্দোলিত করে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি সেই আস্থা আজকের দিনের মানুষ অনেক পরিমাণে হারিয়েছে। বস্তুবিজ্ঞানের তত্ত্ব যে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য নয়, একথা যেমন আমরা জানি, তেমনি দু'-দুটি মহাযুদ্ধের পর বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ যে মানবাত্মার ক্রমোন্নতির উপরে নির্ভরশীল, সে তত্ত্বও আমাদের অজানা নয়। সুতরাং নিছক বৈজ্ঞানিক উন্নতিই যে সভ্যতার উন্নতির মাপকাঠি নয়—একথা আজকের 'আধুনিক' মানুষ স্বীকার করে।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অনন্ত সম্ভাবনা আমাদের কাছে যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল, তার ফলে সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, নীতি—সব কিছুতেই আমরা বিজ্ঞানের প্রভাব দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর 'Education' ('শিক্ষা') গ্রন্থে কবিতার সঙ্গে যে স্নায়বিক ক্রিয়ার সম্পর্কের কথা ভেবেছেন, সেকথা তেমন স্বীকার্য না হ'লেও বিজ্ঞানের কবিত্বপূর্ণ দিকটি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

স্বামীজীর অনুবাদের ভাষায় স্পেন্সারের বক্তব্য "…বিজ্ঞান কেবল প্রত্যেক শিল্পের মূলে উপবিষ্ট নহে, বিজ্ঞানও কাব্যবিশেষ। সচরাচর শুনা যায়, কাব্য এবং বিজ্ঞান পরস্পরবিরোধী; একথা অতি ভ্রান্ত। সত্য বটে, অহংজ্ঞান-জড়িত মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে বোধশক্তি এবং অন্তরের ভাব উভয়েই বিরোধী। সত্য বটে, চিন্তাশক্তির সমধিক পরিচালনায় হৃদয়ের ভাবের উচ্ছ্বাস ক্রমশই স্বল্প হইয়া উঠে এবং প্রবল ভাবের চিন্তাশক্তিকে জড়বৎ করিয়া ফেলে। এই অর্থে সমুদয় মনোবৃত্তি পরস্পরবিরোধী। তাহা হইলেও বিজ্ঞান-প্রণোদিত বিষয়গুলি যে নীরস, কাব্যবিহীন এবং বিজ্ঞানচর্চা স্বভাবতই কাব্য-রস আস্বাদন ও কল্পনা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে, এ কথা সত্য নহে। বরং বিজ্ঞান দ্বারা শুষ্কবৎ প্রতীয়মান বিষয়ও কাব্যরসময় হইয়া উঠে। যে-কেহ "হিউগ মিলার" কৃত ভূগর্ভ-বিজ্ঞান ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারই প্রতীতি হইবে যে, বিজ্ঞান কি প্রকারে কাব্য উত্তেজিত করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য আলোচনা করিতে করিতে তাহার প্রতি কি প্রেমের হ্রাস হয়? যিনি একবিন্দু জলের উপাদানসকল যে শক্তি দ্বারা সংযুক্ত আছে এবং যাহাকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন করিলে সহসা আভা উৎপাদিত হইবে জানেন, তাঁহা অপেক্ষা অজ্ঞলোকের কাছে কি জলবিন্দুর অধিক আদর? পণ্ডিত কি তুষারকণার অদ্ভুত শিল্প দেখিয়া অজ্ঞ-লোকাপেক্ষা উচ্চতর ভাবে নীত হ'ন না? বাস্তবিকই সাধারণ লোকাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক সহস্রগুণে অধিক কবি।

হায়! হায়! মনুষ্য সামান্য বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ইতিহাসোক্ত কোন ক্ষুদ্র মনুষ্যরাজার মন্ত্রণা লইয়া কত তর্কবিতর্ক করিতেছে, তথাপি অনন্ত আকাশের অনন্ত রচনাকৌশল দেখিবে না এবং রাজাধিরাজ ঈশ্বরের হস্ত ভূমণ্ডলের স্তরে স্তরে কত মহান কাব্য লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে দৃষ্টিপাতও করিবে না!"[১]

বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত এই কাব্যস্বরূপ স্পেন্সার যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তরুণ নরেন্দ্রনাথ যেভাবে অনুবাদ করেছেন—তাতে দু'জনেরই কবিদৃষ্টি সুপ্রমাণিত। শিল্পকলাপ্রসঙ্গে স্পেন্সারের দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণতঃ অতিমাত্রায় প্রয়োজনবাদী। কিন্তু বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্বময় ঈশ্বরের লীলাসৌন্দর্যের উদ্ভাসনপ্রসঙ্গে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

প্রসঙ্গতঃ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে আর

১ 'শিক্ষা': স্বামী বিবেকানন্দ-[অনূদিত]। শশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত বসুমতী সংস্করণ। পৃঃ ৩৮-৩৯ মূল ইংরেজী গ্রন্থ 'Education' থেকে স্পেন্সারের নিজের ভাষা—And now let us not overlook the further great fact, that not only does science underlie sculpture, painting, music, poetry, but that science itself is poetic. The current opinion that science and poetry are opposed, is a delusion. It is doubtless true, that as states of consciousness, cognition and emotion tend to exclude each other. And it is doubtless also true that an extreme activity of the reflective powers tends to deaden the feelings; while an extreme activity of the feelings tends to deaden the reflective powers: in which sense, indeed, all orders of activity are antagonistic to each other. But it is not true that the facts of science are unpoetical; or that the cultivation of science is necessarily unfriendly to the exercise of imagination and the love of the beautiful. On the contrary science opens up realms of poetry where to the unscientific all is a blank. Those engaged in scientific researches constantly show us that they realize not less vividly, but more vividly, than others, the poetry of their subjects. Whoso will dip into Hugh Miller's works on geology, or read Mr. Lewes's "Seaside Studies", will percieve that science excites poetry rather than extinguishes it. And he who contemplates the life of Goethe, must see that the poet and the man of science can co-exist in equal aclivity. Is it not, indeed, an absurd and almost a sacriligious belief, that the more a man studies Nature, the less he reveres it? Think you that a drop of water, loses anything in the eye of the physicist who knows that its elements are held together by a force which, if suddenly liberated would produce a flash of lightning? Think you that what is carelessly looked upon by the uninitiated as a mere snowflake, does not suggest higher association to one who has seen through a microscope the wondrously varied and elegant forms of snow-crystals?···The truth is that those who have never entered upon scientific pursuits are blind in most of the poetry by which thay are surrounded....···

এক বৈজ্ঞানিকের চিন্তাধারায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রচনাকার ঈশ্বরের যে ভাবকল্পনা প্রকাশিত, তাও স্মরণীয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহযোগী 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক বাংলায় বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় প্রবন্ধকারদের মধ্যে অগ্রণী অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষায়—"এক এক অসীম-প্রায় সৌরজগৎ যে বিশ্বরূপ মূলগ্রন্থের এক এক পত্রস্বরূপ, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, ধূমকেতু যাহার অক্ষরস্বরূপ এবং যাহার এই সমস্ত অবিনশ্বর অক্ষর অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী মসী-দ্বারা লিখিত-বৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই অবিকল্প অভ্রান্ত শাস্ত্র। যে দেশের যে-কোন ব্যক্তি এই অতি প্রগাঢ় মূলগ্রন্থ শুদ্ধরূপে পাঠ ও তাহার যথার্থ অর্থপ্রতীতি করিতে পারেন, তিনি স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া অন্য লোকের ভ্রান্তি দূর করিতে সমর্থ হয়েন।"[২]

স্পেন্সার ও অক্ষয়কুমার—দু'জনের রচনাতেই দেখি বিশ্বরহস্যের অন্তর্লীন অনন্ত সৌন্দর্যের বিস্ময় তাঁদের কবিচেতনাকে স্পন্দিত করেছে। কিন্তু এঁরা দু'জনেই বিজ্ঞানের অভ্রান্ত নিয়মাবলীর সম্বন্ধে যতটা উৎসাহী, ঈশ্বরস্বরূপ অনুধাবনে ততটা অনুসন্ধিৎসু ন'ন। তাই জগৎরহস্যরূপ হিরণ্ময়পাত্রে এসেই তাঁদের জিজ্ঞাসা অনেক পরিমাণে পরিতৃপ্ত।

সৌরজগতের নিয়মাবলী আমরা যতই জানি না কেন, ঈশ্বর বা ব্রহ্মসত্তার জ্ঞান যে তার দ্বারা বর্ধিত হয়, একথা মনে করার কোনো হেতু নেই। অপরা বিদ্যার যে-কোনো শাখাতে আমরা উন্নতি করতে পারি। তার দ্বারা পরা বিদ্যা অধিগম্য হয় না। কিন্তু যাঁরা বিজ্ঞানচেতনাকে ব্রহ্মোপলব্ধির পথে সোপান-রূপে গ্রহণ করেন, তাঁদের পক্ষে বিজ্ঞানের সাধনাই ব্রহ্মসাধনায় রূপান্তরিত হ'তে পারে।

মানুষের সেই অনন্তোপলব্ধির একটি পন্থা কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, সংগীতে বিকশিত, আর একটি পন্থা বিজ্ঞানের যুক্তি, তথ্য, আবিষ্কারে নিহিত। বিজ্ঞানও কবিতা হয়ে উঠতে পারে তখনই যখন বস্তু নয়, ভাবগত অনুভূতিলোকে তার বাণী স্পন্দিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' 'সাবিত্রী' 'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী' প্রভৃতি কবিতায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব যে কাব্যরূপ লাভ করেছে তার মূলে রয়েছে কবির বিশ্বোপলব্ধির ভাবজগৎ। বিজ্ঞানের নিয়মাবলীর পরিবর্তন

Sad indeed, is it to see how men occupy themselves with trivialities, and are indifferent to the greatest phenomenon—care not to understand the architecture of the Heavens, but are deeply interested in some contemptible controversy about the intrigues of Mary Queen of Scots !—are learnedly critical over a Greek ode, and pass by without a glance that grand epic written by the finger of God upon the strata of Earth.—Educatian : Spencer : 1st Edn : pp 44-46.

সংক্ষিপ্তকরণের প্রয়োজনে স্বামীজী একাধারে কবি ও বিজ্ঞানী গ্যেটের উদাহরণটি অনুবাদে বর্জন করেছেন। সেকালের গ্যেটের মতো এত প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও একালের রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-কৌতূহলও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' কবির ভাষায় লেখা একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুখপাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ।

২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—ফাল্গুন, ১৭৭৩ শক।

হ'তে পারে নব নব আবিষ্কারের দ্বারা। কিন্তু ভাবের জগতের সত্য একবার মানুষের উপলব্ধিতে ধরা দিলে তা চিরকালই মানুষকে আন্দোলিত করে। জগতের শ্রেষ্ঠ কবি ও কবিতার বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা এইখানে।

স্বামীজীর একটি কবিতায় বৈজ্ঞানিক তথ্য কীভাবে কাব্যরূপ লাভ করেছে তার উদাহরণ এ আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতাটিতে রূপের জগৎ থেকে অরূপের জগতে প্রয়াণের এক অপূর্ব চিত্রকল্প এইভাবে উপস্থাপিত—

"মেরুতটে হিমানীপর্বত,
যোজন যোজন সে বিস্তার ;
অভ্রভেদী নিরভ্র আকাশে
শত উঠে চূড়া তার।
ঝকমকি জ্বলে হিমশিলা
শত শত বিজলি-প্রকাশ !
উত্তর অয়নে বিবস্বান্,
একীভূত সহস্রকিরণ,
কোটি বজ্রসম করধারা
ঢালে যবে তাহার উপর,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে মূর্ছিত ভাস্কর,
গলে চূড়া শিখর গহ্বর,
বিকট নিনাদে খসে পড়ে গিরিবর,
স্বপ্নসম জলে জল যায় মিলে।"[৩]

বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত সাকার ও নিরাকার পরম সত্যের উপমায় বরফ ও জলের উদাহরণই[৪] এখানে মেরুপ্রদেশে সূর্যকিরণে বরফ গলে যাওয়ার উপমায় পরিণত। কিন্তু বিবেকানন্দের কবিদৃষ্টি এক বৈজ্ঞানিক তথ্যকে কীভাবে ব্রহ্মোপলব্ধির বেদান্তস্বরূপ অনির্বচনীয়তায় রূপায়িত করেছে, সেইটিই আমাদের আলোচ্য। এক্ষেত্রে বস্তুবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাধিলব্ধ অতীন্দ্রিয় সত্যের জ্ঞানও প্রয়োজন।

স্পেন্সার বা অক্ষয়দত্ত যে বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের কল্পনা করেছেন, তিনি মানুষের ইন্দ্রিয়-সীমার অতীত ন'ন, বরং বিশেষভাবে বিজ্ঞানের নিয়মাবলীতে আবদ্ধ ঈশ্বর। অপরপক্ষে মানবচৈতন্যের সীমাবদ্ধতা পার হয়ে যে পরমরহস্য, সেইখানেই যথার্থ ঈশ্বর-চেতনার পরিণাম।

ভারতীয় সাহিত্যে উপনিষদের কাব্যমূল্য-প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য এদিক থেকে প্রণিধান যোগ্য—"…ঔপনিষদিক সাহিত্যে মহান ভাবের যেমন অপূর্ব চিত্র আছে, জগতে আর কোথাও তেমনটি নাই।…অন্যান্য সকল জাতির ভিতরই এই মহান ভাবের চিত্র অঙ্কন করিবার চেষ্টা দেখা যায় ; কিন্তু প্রায় সর্বত্রই দেখিবে, তাহারা বাহ্য প্রকৃতির মহান ভাবকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ মিল্টন, দান্তে, হোমর বা অন্য যে-কোন পাশ্চাত্য কবির কাব্য আলোচনা করা যাউক, তাঁহাদের কাব্যে স্থানে স্থানে মহত্ত্বব্যঞ্জক অপূর্ব শ্লোকাবলী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে সর্বত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনার চেষ্টা —বহিঃপ্রকৃতির বিশাল ভাব, দেশকালের অনন্ত ভাবের বর্ণনা। আমরা বেদের

৩ বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃঃ ২৭৫

৪ "তিনি সাকার ; তিনি নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দসমুদ্র। কুলকিনারা নাই। ভক্তিহিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, যেন জল বরফে জমাট বাঁধে ; অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন কখন সাকাররূপে দেখা দেন আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়।"—কথামৃত : ২২শে অক্টোবর ১৮৮৫ : ১ম খণ্ড

সংহিতাভাগেও এই চেষ্টা দেখিতে পাই। সৃষ্টি প্রভৃতির বর্ণনাত্মক কতকগুলি অপূর্ব ঋঙ্‌মন্ত্রে বাহ্যপ্রকৃতির মহান্ ভাব, দেশকালের অনন্তত্ব যতদূর উচ্চভাষায় সম্ভব বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা যেন শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে, এ উপায়ে অনন্তস্বরূপকে ধরিতে পারা যায় না; বুঝিলেন, তাঁহাদের মনের যে-সকল ভাব তাঁহারা ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, অনন্ত দেশ, অনন্ত বিস্তার ও অনন্ত বাহ্যপ্রকৃতিও সেগুলি প্রকাশ করিতে অক্ষম। তখন তাহারা জগৎ-সমস্যা ব্যাখ্যা করিবার জন্য অন্য পথ ধরিলেন।

উপনিষদের ভাষা নূতন মূর্তি ধারণ করিল। উপনিষদের ভাষা একরূপ নাস্তিভাবদ্যোতক, স্থানে স্থানে অস্ফুট, উহা যেন তোমাকে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু অর্ধপথে গিয়াই ক্ষান্ত হয়, তোমাকে কেবল এক ধারণাতীত অতীন্দ্রিয় বস্তুর আভাস দেখাইয়া দেয়, তথাপি সেই বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার কোন সন্দেহ থাকে না। জগতে এমন কবিতা কোথায়, যাহার সহিত এই শ্লোকের তুলনা হইতে পারে?—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্।

নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

—সেখানে সূর্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র তারাও নয়, এই বিদ্যুৎও সেইস্থানকে আলোকিত করিতে পারে না, এই সামান্য অগ্নির আর কথা কি?"[৫]

উপনিষদের ভাষা ও ভাবের প্রভাবে স্বামীজীর বিখ্যাত 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি'[৬] গানটি রচিত। শ্রীরামকৃষ্ণসাধনলব্ধ অদ্বৈতানুভব নরেন্দ্রনাথের অন্তরে সঞ্চারিত হওয়ার পরেই এ গানের রচনা। কবিতা ও অধ্যাত্ম-উপলব্ধি—দু'দিক থেকেই এ গানটি স্বামীজীর ভাবলোকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাক্ষী। ইন্দ্রিয়াতীত লোকের বাণী বলেই এ গানের শেষ কথা—'বোঝে প্রাণ বোঝে যার'। (ক্রমশঃ)

৫ 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' বক্তৃতা: বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড: পৃঃ ১২৫-১২৬

৬ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ২৬৭

বিশ্ব-হৃদয় *

জি. শঙ্কর কুরুপ

[অনুবাদ : শ্রীমতী সুস্নাতা প্রিয়ংবদা]

হে শাশ্বত বিশ্ব-হৃদয়,
হে সুন্দর অথচ ভীষণ মৌলিক তত্ত্ব
তোমাকে প্রণাম !

হে নবনবোন্মেষশীল,
তোমার স্পন্দন থেকে জন্ম নিয়েছে
মহাকাল
তারপর প্রস্ফুটিত হয়েছে এই
নীহারিকাগণ
অব্যক্ত কল্পনারাশির মত
আনন্দবিহ্বল হয়ে ব্যাপক
তোমার অসীমতার ভিতর !
ব্যক্ত আর বিভক্ত হয়ে গেছে
এই দিব্য নীহারিকাগণ
পূর্ণতা পেয়েছে জগতের নানা রূপে।

হে মহাসত্ত্ব,
এই সমগ্র বিশ্বমণ্ডল
তোমার একটি মাত্র সিদ্ধান্তের অংশ,
কদাচিৎ এই অংশগুলির নিত্য-
সম্পর্কের নামই আকর্ষণ।

তোমা থেকে জন্ম নিচ্ছে নানা সঙ্কল্প
আবার তোমার ভিতরেই লীন
হয়ে যাচ্ছে ঐ সব ;
তাদেরই একটি আমি
তোমার চিন্তন ধারাকে দেখতে দেখতে
পুলকিত হয়ে উঠছি
চোখ আর্দ্র হয়ে আসছে আমার।

তোমার রক্তের উষ্ণতায় ভরা সূর্য
আর তোমার আনন্দের দীপ্তিতে ভরা চন্দ্র
তোমার সংকোচ-বিকাশের সাথে
সংকুচিত আর বিকশিত হওয়া এই সমুদ্র
এ সবই তোমার বিভিন্ন কল্পনারাশি
সবই তোমার পাবন সৌন্দর্যের অকলঙ্ক
রেখা।

চরম দারিদ্র্য,
দারুণ ব্যাধি,
ভয়ঙ্কর সংগ্রাম
সবই যে তোমারই স্বপ্ন !
যে তোমার কল্পনার সৌন্দর্যকে উপলব্ধি
করেছে
শুধু তারই জন্ম সার্থক।
তোমাকে শত নমস্কার !

হে শাশ্বত বিশ্ব-হৃদয়,
তোমাকে প্রণতি জানাই !
হে সর্গ-স্থিতি-লয়শীল,
আমার বন্দনা নিও !

সমালোচনা

নবধারায় গীতার মর্মবাণী—শ্রীদাশরথি সোম। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮০, মূল্য তিন টাকা।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা আধ্যাত্মিক রত্নের ভাণ্ডার-স্বরূপ, জ্ঞানপিপাসু মানবের অমূল্য সম্পদ। এই গ্রন্থের যত আলোচনা হয় ততই কল্যাণ। আলোচ্য গ্রন্থে নবধারায় গীতার মর্মকথা আলোচনা করার আন্তরিকতা ও চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়।

গীতার অর্জুনবিষাদযোগের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন: "বিষয়-ইন্দ্রিয়সুখে মন মগ্ন থাকিলে কেউ জ্ঞান, হিত-তত্ত্বকথা শুনিতে চায় না। মানুষের শোক বা বিষাদ হইলে ধর্মসম্বন্ধে মন বিমূঢ় হয়, তাই ধর্মের তত্ত্বকথা শুনিতে চায়। অর্জুনের বিষাদ ও মোহ দেখিয়া ভগবান বুঝিলেন যে, অর্জুনকে ধর্মের তত্ত্বকথা শোনাইবার এই হইল প্রকৃষ্ট সময়। তাই তিনি অর্জুনকে যোগশাস্ত্র শোনাইলেন।"

গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের মর্মবাণী স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচিত, আলোচনা সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ। পরিশেষে প্রদত্ত যোগ সম্বন্ধে আলোচনাটি মনোজ্ঞ। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিলে গীতা-অনুশীলনের আগ্রহ জাগিবে। গীতার মূল শ্লোকগুলি পুস্তকে সন্নিবেশিত হইলে আরও ভাল হইত।

সৎকথা ও স্তোত্রাবলী—সঙ্কলক: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ, খুলনা। পৃষ্ঠা ৯৬; মূল্য দেড় টাকা।

সঙ্কলন-কার্য সহজ নয়। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ও প্রয়োজন অনুযায়ী সঙ্কলনের মর্যাদা ও উপযোগিতা হয়, এই দিক দিয়া দেখিলে আলোচ্য সঙ্কলন-পুস্তকখানি আকর্ষণীয় হইয়াছে। প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনীটি পাঠ করিলে পাঠকচিত্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুপম ভাগবত লীলা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলী হইতে ২১টি করিয়া 'নিত্যস্মরণীয় উপদেশ' সঙ্কলিত হইয়া তিনটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কয়েকটি স্তোত্র, সুপ্রচলিত ভজনাবলী, শ্রীশ্রীরামনামসঙ্কীর্তন প্রদত্ত হইয়াছে।

এই একখানি পুস্তক সঙ্গে থাকিলেই সাধক-ভক্তের বহু প্রয়োজন সাধিত হইবে।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় পত্রিকা (১৯৭০)—রামকৃষ্ণ মিশন কামারপুকুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭২।

এবারের পত্রিকাখানির বৈশিষ্ট্য নানা দিক হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'শ্রীমাতুঃ সুপ্রভাতম্', 'শ্রীসারদানন্দস্তোত্রম্' পত্রিকাটির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। ছাত্রদের রচিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার অধিকাংশ মনোজ্ঞ এবং শিক্ষকগণের লেখাগুলিও সময়োপযোগী হইয়াছে। সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী রচনাবলীতে সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটির কাগজ ও ছাপা উভয়ই সুন্দর।

'আমাদের কথা', 'ক্রীড়াবিভাগের বার্ষিক বিবরণী', 'বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে' এই তিনটি লেখায় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সুন্দরভাবে পরিবেশিত।

একটি লেখা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। রচনাটির নাম 'গোপনীয়'। এটি একটি রস-রচনা, সরস গল্প। পড়িতেও খুব ভালো লাগে, রসোত্তীর্ণ বলা যায়। কিন্তু এটি বিদ্যালয়ের পত্রিকায় সন্নিবেশিত না হইলেই ভাল হইত মনে হয়।

স্বামী তেজসানন্দের দেহত্যাগ

গত ১১ই মে, ১৯৭১, সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিটের সময় স্বামী তেজসানন্দ কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন; ক্যানসার রোগের বৃদ্ধি তাঁহার দেহত্যাগের কারণ, এই রোগে তিনি দীর্ঘদিন হইতে ভুগিতেছিলেন। পরদিন সকালে বেলুড় মঠে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

স্বামী তেজসানন্দের পূর্ব নাম খগেন্দ্রনাথ। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার হাপানিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা মানিকগঞ্জ স্কুল হইতে ম্যাট্রিক এবং রাজসাহী গভর্ণমেণ্ট কলেজ হইতে বি.এ. পরীক্ষা দিবার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯ ৯ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বৎসরই তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং ভুবনেশ্বর ও মায়াবতী আশ্রমে বৎসরখানেক থাকিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মে সহায়তা করেন। পরে ঢাকা ও ২৪ পরগনা জেলার দুটি স্কুলে কয়েক বৎসর প্রধান শিক্ষকরূপে কর্ম করিবার পর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন। ঐ বৎসরই স্বামী শিবানন্দজীর নিকট তিনি ব্রহ্মচর্যদীক্ষা এবং চার বৎসর পরে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে যোগদানের পর প্রথম চারি বৎসর স্বামী তেজসানন্দ (১৯২৭ হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ইহার পর পাঁচ বৎসর উত্তরকাশীতে শাস্ত্রাধ্যয়ন ও তপস্যান্তে বেলুড় মঠে আসিয়া 'কালচার্যাল হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের প্রকাশনের কাজে স্বামী মাধবানন্দকে সহায়তা করেন (১৯৩৬-৩৭)। পরে 'প্রবুদ্ধ ভারতের' সম্পাদকরূপে দুই বৎসর মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে কাজ করেন। ইহার পর কিছুকাল তীর্থভ্রমণ ও হৃষীকেশে তপস্যা করিয়া ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বেলুড় 'বিদ্যামন্দির' কলেজে প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষরূপে সেবারত হন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কর্মে ব্রতী থাকিবার পর তিনি পাটনা আশ্রমের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। সেখান হইতে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ হইয়া ফিরিয়া আসেন এবং ১৯৬৮ খৃঃ পর্যন্ত সেকাজেই ব্রতী ছিলেন।

বিদ্যামন্দিরের প্রারম্ভ হইতে ইহার সাফল্যের মূলে ছিল স্বামী তেজসানন্দের তপস্যাপূত, অনলসকর্মরত জীবনের প্রভাব। তাঁহার ব্যক্তিত্বে সকলেরই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইত। বিদ্যামন্দিরের কাজ ছাড়া ম্যানেজিং কমিটির সভ্যরূপে সারদাপীঠের অন্যান্য বিভাগের কর্মেও তিনি সহায়তা করিয়াছেন। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

A Short Life of Sri Ramakrishna, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী, যুগাচার্য বিবেকানন্দ, ভগিনী-নিবেদিতা প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকাও বিভিন্ন সময়ে তাঁহার রচনায় সমৃদ্ধ।

রোগশয্যাশায়ী তাঁহার দেহে যখন ৯ই মে রক্ত দিবার উদ্যোগ চলিতেছিল, তখনই তিনি বলিয়াছিলেন, 'পরশু শরীর যাবে, এসব করে আর কি হবে?' ১১ই মে দেহত্যাগের ঘণ্টাখানেক পূর্বেও পুনরায় ইঙ্গিত দিয়াছিলেন যে, দেহত্যাগের আর বিলম্ব নাই।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে মিলিত হইয়াছে।

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্বাস্তু-সেবাকার্য

জনসাধারণ অবগত আছেন, সম্প্রতি বিভিন্ন স্থানে পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুগণ অসহায় অবস্থায় ভারতে প্রবেশ করিতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন নিম্নোক্ত সাতটি স্থানে কেন্দ্র খুলিয়া এই সব উদ্বাস্তুদের সেবায় ব্রতী হইয়াছে: মেঘালয় সীমান্তে ডাউকী ও শেলায়, আসাম সীমান্তে ফকিরবাজারে (কাছাড়), এবং পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে মানিকগঞ্জে (জলপাইগুড়ি), রাধিকাপুরে (পশ্চিম দিনাজপুর), জামশেরপুরে (নদীয়া) ও গাইঘাটায় (২৪ পরগনা)।

সহৃদয় জনগণ সর্ববিধ সেবাকার্যে বরাবরই রামকৃষ্ণ মিশনকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন; বর্তমানে আরব্ধ এই উদ্বাস্তু-সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট আবেদন জানাইতেছি—তাঁহারা যেন অকুণ্ঠভাবে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দেন; সর্ববিধ দানই কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে; "RAMAKRISHNA MISSION" এই নামে চেক লিখিবেন:

১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, (হাওড়া)
২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এণ্টালী রোড, কলিকাতা ১৪
৩। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩
৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা ২৯

বেলুড় মঠ,
৩০ এপ্রিল,
১৯৭১

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক,
রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

উদ্বাস্তুসেবা

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় : পূর্ববঙ্গে সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের ফলে সেখান হইতে বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশন গত ১০ই এপ্রিল হইতে তাঁহাদের সেবায় ব্রতী হইয়াছে। এপ্রিল মাসের মধ্যে এই সেবা-কার্যের জন্য সাতটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে—মেঘালয়-সীমান্তে ডাউকী ও শেলায়, আসাম-সীমান্তে ফকিরবাজারে (কাছাড়), এবং পশ্চিমবঙ্গ-সীমান্তে মানিকগঞ্জে (জলপাইগুড়ি), রাধিকাপুরে (পশ্চিম-দিনাজপুর), জামশেরপুরে (নদীয়া) ও গাইঘাটায় (২৪ পরগনা)। এই-সব কেন্দ্রে উদ্বাস্তুদের প্রয়োজনানুসারে রান্না করা খাবার, চাউল প্রভৃতি অরন্ধিত খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ, জামা-কাপড়, গুঁড়া-দুধ, শিশু-খাদ্য প্রভৃতি বিতরিত হইতেছে।

বন্যাত্রাণসেবা

সৌরাষ্ট্র : গত ২৮শে আগস্ট ১৯৭০ হইতে এপর্যন্ত সৌরাষ্ট্রের রাজকোট ও সুরেন্দ্রনগর জেলার বন্যার্তগণের সেবায় রাজকোট আশ্রম ৫৪,৭৭০ টাকা খরচ করিয়াছেন।

খরাত্রাণসেবা

গুজরাট : রাজকোট আশ্রম-পরিচালিত কচ্ছের খরাত্রাণসেবায় গত ১৯শে মে ১৯৭০ হইতে ৬ই অক্টোবর ১৯৭০ পর্যন্ত মোট ৮৪,৮৩০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। এই সেবায় ২৪টি গ্রামের ১,৯২,৬৫৮ জনকে খাওয়ানো হইয়াছে; তাছাড়া ১২,০০০ মিটার বস্ত্র ও ৭ জোড়া বলদ বিতরিত হইয়াছে; একটি ধর্মশালা এবং ২৪টি গৃহও নির্মিত হইয়াছে।

অনুষ্ঠান

কালাডি আশ্রমে গত ২৯শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ পরিকল্পিত নূতন মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

পোনামপেট আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। উৎসবের উদ্বোধন করেন মহীশূরের রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর।

কার্যবিবরণী

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন টি. বি. স্যানাটোরিয়ামের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল ১৯৬৯-মার্চ ১৯৭০) প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এই যক্ষ্মা হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাকালে শয্যাসংখ্যা ছিল মাত্র ৬২। বর্তমানে স্যানাটোরিয়ামে ২৬০ টি শয্যা আছে; এই শয্যাগুলির মধ্যে ২৩৭টি সাধারণ ওয়ার্ডে এবং অবশিষ্ট ২৩টি শয্যার ১৫টি কেবিনে ও ৮টি কুটিরে অবস্থিত।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাকেন্দ্রটি একটি পূর্ণাঙ্গ টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে পরিণত হইয়াছে। এখানে সর্বপ্রকার যক্ষ্মারোগের আধুনিক পদ্ধতিতে রোগনির্ণয়, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের সুবন্দোবস্ত আছে। অভিজ্ঞ ও সুযোগ্য চিকিৎসকগণ চিকিৎসাকার্যে নিযুক্ত আছেন।

আরোগ্যলাভের পর রোগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। রোগমুক্ত রোগী-দিগকে ল্যাবরেটরি, এক্স-রে, নার্সিং, স্টোর, অফিস, পাওয়ার-হাউস, ওয়াটার-ওয়ার্কস, টেলারিং প্রভৃতি স্যানাটোরিয়ামের বিভিন্ন বিভাগে বৃত্তিমূলক কর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়।

আলোচ্য বর্ষে রাঁচি স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৬৪৩, তন্মধ্যে ৩৮৭ জন রোগীকে এই বৎসর ভরতি করা হয়, ২৫৬ জন পূর্বে ভরতি হইয়াছিলেন; ৩৮২ জন হাসপাতাল হইতে ছাড়া পান এবং বর্ষশেষে ২৬১ জন রোগী চিকিৎসাধীন থাকেন। ১২০জন রোগীর অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল। এক্স-রে বিভাগে ৪,৫১০টি এক্স-রে করা হয়। ল্যাবরেটরিতে যে-সব পরীক্ষা হয় তাহাদের সংখ্যা ১৫,৬১৪।

বহির্বিভাগে ৫৮৮ জন টি. বি. রোগীকে ও ১,৪২০ জন অন্যান্য রোগীকে চিকিৎসা-বিষয়ে প্রয়োজনীয় মূল্যবান উপদেশ ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

আলোচ্য বর্ষে স্যানাটোরিয়ামে ৭৮ জন রোগী সম্পূর্ণ বিনা-খরচে এবং ১৪ জন রোগী কম খরচে চিকিৎসিত হন। বহির্বিভাগে আগত অধিকাংশ রোগীই এবং ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের সমস্ত রোগীই বিনা-খরচে চিকিৎসার সাহায্য লাভ করেন।

আলোচ্য বর্ষে ৩৩ জন রোগী আরোগ্য-লাভের পর স্থানীয় আরোগ্যোত্তর উপনিবেশে স্থান পাইয়াছেন। স্যানাটোরিয়ামে ইঁহাদের অনেককে নানা প্রকার বৃত্তিমূলক কর্ম শিক্ষা দেওয়ার পর বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত করিয়া জীবিকা-নির্বাহের সুযোগ দেওয়া হইতেছে।

স্থানীয় জনসাধারণের জন্য ফ্রি হোমিও-প্যাথিক ডিসপেন্সারীতে আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১৪,০৭৮; তন্মধ্যে নূতন রোগী ৫,৯৫৬।

উৎসব-সংবাদ

চেরাপুঞ্জী: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, চেরাপুঞ্জী, সোবার ও সেলা আশ্রমে গত ২৭শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব সমারোহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস উক্ত তিন আশ্রমে পাঠ, ভজন, বিশেষ পূজাদি, প্রসাদবিতরণ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণীর আলোচনা হইয়াছিল।

চেরাপুঞ্জী আশ্রমে ২রা মার্চ সাধারণ উৎসবে পূজা-পাঠাদি ও শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ প্রায় ছয় হাজার লোকের (২০টি গ্রামের) এক মনোরম শোভাযাত্রা, প্রায় ছয় হাজার লোককে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ ও বিকালে ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-আলোচনা হইয়াছিল। বক্তৃতা দিয়াছিলেন আসাম সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জয়ভদ্র হাগ্‌জার, অধ্যাপক শ্রীকপিলা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমাহাম্‌ সিং (খাসি ভাষায়) ও শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত। সভাপতিত্ব করিয়া-ছিলেন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আসাম পুলিশ ব্যাণ্ড ও গৌহাটী পুলিশ ব্যাণ্ড আশ্রমকে মুখরিত রাখিয়াছিল। স্থানীয় সিয়েম্‌ (রাজা), জনসাধারণ (খাসি ও অন্যান্য), উৎসবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

এই উৎসবের মাধ্যমে খাসি পাহাড়ের এই অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার সহিত পরিচিত হইবার আগ্রহ জনসাধারণের মধ্যে সূচিত হইতেছে।

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৭শে

ও ২৮শে মার্চ, ১৯৭১ পরমপূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ১০৯তম জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ২৭শে মার্চ আয়োজিত সভায় স্বামী অপূর্বানন্দ সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন শ্রীকিশোরী মোহন দ্বিবেদী। স্বামী ভক্ত্যানন্দ ও শ্রীদিবাকর ত্রিপাঠী শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ওড়িয়া ভাষায় মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সভান্তে ভজন পরিবেশিত হয়। ২৮শে মার্চ প্রাতঃকালে আশ্রমের বিদ্যার্থিবৃন্দ কর্তৃক ভজনানুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। ইহার পর শ্যামনাম-সংকীর্তন হয়। অপরাহ্ণে আশ্রমের ছাত্রগণ শিবনাম করিবার পর আয়োজিত সভায় স্বামী অপূর্বানন্দ (সভাপতি) ও স্বামী ভক্ত্যানন্দ ভাষণ দেন। 'স্বামীজীর মানুষ-তৈরীর শিক্ষা' সম্বন্ধে বলেন স্বামী ভক্ত্যানন্দ। সভাপতি তাঁহার ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দকে 'অশরীরী বাণী' বলিয়া বর্ণনা করেন এবং সকলকে তাঁহার ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে বলেন। আশ্রমের বালকেরাও আবৃত্তি ও প্রবন্ধপাঠের মাধ্যমে সভায় উল্লেখ-যোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৯, ১০ ও ১১ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তিনদিনই সকালে ভজন ও পাঠ এবং বিকালে ধর্মসভা ও সন্ধ্যায় লীলাগীতি হইত। ১১ই দ্বিপ্রহরে প্রায় পাঁচহাজার নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

পূর্বাহ্ণে প্রথম দিন পাঠ করেন শ্রীরমানাথ রায়, দ্বিতীয় দিন ব্রহ্মচারী পবিত্রচৈতন্য এবং তৃতীয় দিন স্বামী প্রতিভানন্দ।

অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় প্রথম দিন শ্রীশ্রীমায়ের, দ্বিতীয় দিন স্বামীজীর এবং তৃতীয় দিন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। স্বামী পরশিবানন্দ ও স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ তিনদিনই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন; শ্রীমতী আশা গুপ্তা প্রথমদিন এবং শ্রীকুমুদিনী-কান্ত চক্রবর্তী দ্বিতীয় দিন ভাষণ দেন; তৃতীয় দিন সভার প্রারম্ভে আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ইজ্যানন্দ কার্যবিবরণী পাঠ করেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৯ই ও ১১ই সভান্তে এবং ১০ই অপরাহ্ণে কথকতা ও লীলাগীতি পরিবেশন করেন। স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্তৃক দ্বিতীয় দিন সভান্তে 'স্বামী বিবেকানন্দ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

ভারতের বর্তমান লোকসংখ্যা

১৯৭১ সালের গণনা অনুযায়ী

ভারতে সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত লোকগণনায় নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পাওয়া গিয়াছে। ভারতের মোট জনসংখ্যা বর্তমানে ৫৪,৬৯, ৫৫,৯৪৫ (পুরুষ ২৮,৩০,৫৫,৯৮৭, স্ত্রীলোক ২৬,৩৮,৯৯,৯৫৮)। বসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৮২ জন (প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৪৬৬ জন)। শিক্ষিত ব্যক্তির হার শতকরা ২৯.৩৫ (পুরুষ ৩৯.৪৯, স্ত্রীলোক ১৮.৪৭)।

১৯৬১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ৪৩,৯০,৭২,৫৮২; দশ বছরে ১০,৭৮,৮৩,৩৬৩ জন, অর্থাৎ শতকরা ২৪.৫৭ জন লোক বাড়িয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা বর্তমানে ৪,৪৪,৪০,০৯৫, ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮.১২ শতাংশ। গত দশ বছরে ভারতের জন-সংখ্যাবৃদ্ধির মোট হার অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কিছু বেশী — শতকরা ২৭.২৪। বসতির ঘনত্ব ভারতের গড় ঘনত্বের তুলনায় অনেক বেশী – প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫০৭ জন (প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ১২৯৮ জন); এবিষয়ে কেরল-এর পরই বাংলার স্থান।

বৃহত্তর কলিকাতা পৌর এলাকার বর্তমান জনসংখ্যা ৭০,৪০,৩৪৫। কলিকাতাই ভারতের সর্বাধিক জনবহুল শহর; দ্বিতীয় বোম্বাই (৫৯,৩১,৯৮৯), তৃতীয় দিল্লী (৩৬,২৯, ৮৪২), চতুর্থ মাদ্রাজ (২৪,৭০,২৮৮)। অন্যান্য প্রধান (metropolitan) শহর: হায়দ্রাবাদ (১৭,৯৮,৯১০), আমেদাবাদ (১৭,৪৬,১১১), ব্যাঙ্গালোর (১৬,৪৮,২৩২), কানপুর (১২,৭৩, ০৪২) এবং পুণা (১১,২৩,৩৯৯)।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনসংখ্যা:

প্রদেশ	জনসংখ্যা
উত্তরপ্রদেশ	৮,৮২,৯৯,৪৫৩
বিহার	৫,৬৩,৮৭,২৯৬
মহারাষ্ট্র	৫,০২,৯৫,০৮১
পশ্চিমবঙ্গ	৪,৪৪,৪০,০৯৫
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪,৩৩,৯৪,৯৫১
মধ্যপ্রদেশ	৪,১৪,৪৯,৭২৯
তামিলনাড়ু	৪,১:,০৩,১২৫
মহীশূর	২,৯২,২৪,০৪৬
গুজরাট	২,৬৬,৬০,৯২৯
রাজস্থান	২,৫৭,২৪,১৪২
ওরিশা	২,১৯,৩৪,৮২৭
কেরল	২,:২,৮০,৩৯৭
আসাম	১,৪৮,৫৭,৩১৩
পঞ্জাব	১ ৩৪,৭২,৯৭২
হরিয়ানা	৯৯,৭১,১৬৫
জম্মু ও কাশ্মীর	৪৬.১৫,১৭৬
দিল্লী	৪০,৪৪,৩৩৮
হিমাচল প্রদেশ	৩৪,২৪,৩৩২
ত্রিপুরা	১৫,৫৬,৮২২
মনিপুর	১০,৬৯,৫৫৫
মেঘালয়	৯,৮৩,৩৩৬
দিউ, দমন, গোয়া	৮,৫৭,১৮০
নাগাল্যাণ্ড	৫,১৫,৫৬১
পণ্ডিচেরী	৪,৭১,৩৪৭
নেফা	৪,৪৪,৭৪৪
চণ্ডীগড়	২,৫৬,৯৭৯
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	১,১৫,০৯০
দাদরা ও নগর হাভেলি	৭৪,১৬৫
লাক্ষা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ	৩১,৭৯৮

উৎসব-সংবাদ

বনগাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে গত ২৭ ও ২৮ মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রথমদিন পূজাদি এবং স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ কর্তৃক পূর্বাহ্ণে 'কথামৃত' পাঠ এবং বিকালে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা আলোচিত হয়। দ্বিতীয় দিন দরিদ্রনারায়ণ-সেবার পর স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। এইদিন সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় 'বিবেকানন্দ' নাটক অভিনীত হয়।

ভদ্রেশ্বর সারদাপল্লীতে গত ৯ই, ১০ই ও ১২ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পূজা, পাঠ, শোভাযাত্রা ও সভাদির মাধ্যমে তিনদিন নানাবিধ অনুষ্ঠান হয়।

৯ই অপরাহ্ণে উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা (সভানেত্রী) ও প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা ভাষণ দেন। রাত্রে 'শ্রীশ্রীমা সারদামণি' লীলাগীতি পরিবেশন করেন কলিকাতার 'রসরঙ্গ'। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, স্তোত্রপাঠ ও ভজনগান হয়।

১০ই সকালে শ্রীশ্রীচণ্ডী ও ভাগবত-পাঠের পর সহস্রাধিক নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে আয়োজিত সভায় স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বসু ভাষণ দেন। পরে 'মহা উদ্বোধন' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। ১১ই পূজা ও প্রসাদবিতরণের পর জনসভায় অপরাহ্ণে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (সভাপতি), স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ও স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ভাষণ দেন পরে কীর্তন পরিবেশিত হয়।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদে গত ৯ই, ১০ই ও ১১ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ৯ই এপ্রিল আলোচনা-সভায় ডক্টর মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার (সভাপতি) ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে, ১০ই এপ্রিল স্বামী স্মরণানন্দ (সভাপতি) ও অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এবং ১১ই এপ্রিল স্বামী অমৃতত্বানন্দ (সভাপতি) ও অধ্যাপক ধ্যানেশ-নারায়ণ চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১১ই এপ্রিল পূর্বাহ্ণে স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ নগরপরিক্রমা, বিশেষ পূজাদি, প্রসাদবিতরণ ও অপরাহ্ণে ছাত্র-সমাবেশ হইয়াছিল।

চক্রধরপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতিতে নবগৃহ-প্রবেশ-উৎসব গত ১০ই এপ্রিল সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। স্বামী মায়াতীতানন্দ পূজা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। চণ্ডীপাঠ, ভজন ও প্রসাদবিতরণের পর অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় প্রায় এক হাজার নরনারীর নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বাণী আলোচিত হয়।

দিনহাটা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল স্থানীয় কালীবাড়ীতে পূজা, পাঠ, শোভাযাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমদিন প্রায় তিন হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক অলোক গঙ্গোপাধ্যায় (সভাপতি), স্বামী পরশিবানন্দ ও সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীহৃষীকেশ সাহা। রাত্রে শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত রামকৃষ্ণ লীলাগীতি পরিবেশন করেন। পরদিন সভায়

শ্রীরেবতীরঞ্জন ভৌমিক (সভাপতি) ও স্বামী পরশিবানন্দ স্বামীজীর বাণী আলোচনা করেন। এইদিন ছাত্রসম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল

এই সংঘের উদ্যোগে স্থানীয় নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে বিভিন্ন দেবালয়-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতপাঠ ও ভজনাদি ্ঠিত হয়।

চন্দননগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবকসংঘের উদ্যোগে গত ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ১৭ই অপরাহ্নে উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ.

১৮ই পূর্বাহ্নে পূজাপাঠাদির পর প্রসাদ-বিতরণ করা হয়। বিকালে ধর্মসভায় স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর বাণী আলোচনা করেন। ছাত্রদের চরিত্রগঠনে তিনি শিক্ষক ও অভিভাবকদের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে বলেন। সন্ধ্যারতির পর শ্রীরথীন ঘোষ 'মানভঞ্জন' পালা কীর্তন করেন। উৎসবের উদ্বৃত্ত অর্থ পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুসেবায় প্রদত্ত হইয়াছে।

পরলোকে ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব

অতীব দুঃখের কথা, পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক বিভীষিকাময় বিপর্যয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু খ্যাতনামা অধ্যাপকগণের সহিত ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবও নিহত হইয়াছেন বলিয়া খবর প্রকাশিত হইয়াছে।

ডঃ দেব স্বামী সারদানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমে অতিবাহিত করিবার সময় তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন—যাহার প্রভাব তঁাহার অবিবাহিত জীবন জুড়িয়া ছিল। পরিচিতদের, বিশেষ করিয়া ছাত্রদের মনে তাঁহার প্রতি স্বতই যে শ্রদ্ধা জাগিত তাহার কারণ কেবল অগাধ পাণ্ডিত্যই নয়, তঁাহার অনাড়ম্বর অন্তর্মুখ জীবনও।

শ্রীহট্ট জেলার লাউডা গ্রামে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তঁাহার জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ. পাস করিবার পর তিনি রিপন কলেজে (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনা শুরু করেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দিনাজপুরে ঐ কলেজের শাখা খোলা হইলে সেখানে অধ্যক্ষরূপে যান। দেশ-বিভাগের পর হইতেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনবিভাগের প্রধানরূপে ছিলেন। উদ্বোধন পত্রিকায় তঁাহার কিছু লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীভগবচ্চরণে তঁাহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

পরলোকে নরেন্দ্র দেব

গত ১৯শে এপ্রিল খ্যাতনামা কবি নরেন্দ্র দেব ৮৩ বৎসর বয়সে কলিকাতায় তাঁহার বাসভবনে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই কলিকাতার ঠনঠনে দেবপরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই তাঁহার সাহিত্যসাধনা শুরু হয়—যে সাধনায় তিনি শেষ পর্যন্ত ব্রতী ছিলেন। কবি হিসাবেই সমধিক খ্যাত হইলেও সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান রহিয়াছে। অনুবাদ-কাব্য হিসাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদান মেঘদূত ও রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের অনুবাদ।

'উদ্বোধন' পত্রিকায় তাঁহার কয়েকটি লেখা, প্রধানতঃ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করি।

দিব্য বাণী

স এব সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্ সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥—কৈবল্যোপনিষদ্ ৯

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥—শ্বেঃ ৩.৮

মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং জ্বলনদ্যুতিম্।
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ ॥—মহাভারত, শাঃ ৪৭

যা কিছু হয়েছে সৃষ্ট, যা হইবে ভবিষ্যতে এ বিশ্ব-মাঝার
সবই তিনি, সনাতন, চিদানন্দময়।
তাঁরে জানি তরে জীব মৃত্যুপারাবার—মুক্ত হয়ে যায়—
বিমুক্তিলাভের আর অন্য পথ নাই ॥

তমসার পরপারে—অপসারি অজ্ঞান-আঁধার
সূর্যসম স্বপ্রকাশ যে পুরুষ চিদানন্দময়,
আমি জানিয়াছি তাঁরে, সে মহান পুরুষেরে!
তাঁহারে জানিয়া শুধু তরে জীব মৃত্যুপারাবার—হয় মৃত্যুঞ্জয়—
অমৃতত্বলাভে আর অন্য পথ নাই ॥

মহা তমসার পারে—অপসারি অজ্ঞান-আঁধার
দীপ্তিতে জাজ্বল্যমান, স্বপ্রকাশ যে পুরুষ চিদানন্দময়,
যাঁরে জানি তরে জীব মৃত্যুপারাবার—সেই জ্ঞেয়াত্মায়
নমি (যিনি মনাতীত হইয়াও আবির্ভূত
শ্রীকৃষ্ণ রূপেতে মোর হৃদয়-গুহায়) ॥

কথাপ্রসঙ্গে

স্বামীজীর আমেরিকাযাত্রা স্মরণে

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে, স্বামী বিবেকানন্দ বোম্বাই বন্দর হইতে আমেরিকা যাত্রা করেন, চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করিবার জন্য। এই যাত্রা কেবল ভারতেরই নয় সমগ্র বিশ্বেরই একটি স্মরণীয় ঘটনা। ভারতের পক্ষে ইহা বিশেষভাবে স্মরণীয় এইজন্য যে, ভারতের জাগরণ-মন্ত্র উদ্‌ঘোষের জন্য স্বামীজী ভারত ছাড়িয়া চলিতেছেন সুদূর পাশ্চাত্যে—ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার বাণী সেখান হইতে ধ্বনিত করিতে না পারিলে তৎকালে রাজশক্তির রথে আসীন পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে অতিমুগ্ধ ভারতবাসীর আত্মপ্রত্যয়, নিজ ধর্ম ও সভ্যতার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনা যাইবে না; আত্মপ্রত্যয়ই জাগরণের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সারা বিশ্বের পক্ষে স্মরণীয় এই জন্য, যে আদর্শের সহিত পাশ্চাত্য আদর্শের মিলন সমগ্র মানবসভ্যতাকে উন্নততর করিতে, সমগ্র বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ, সেই আদর্শের কথা বিশ্ববাসীর নিকট তুলিয়া ধরিতেই স্বামীজী যাত্রা করিয়াছিলেন।

আমরা জানি, ভারতের জাতীয়তাবোধকে স্বামী বিবেকানন্দই জাগ্রত করিয়াছিলেন, অগ্রগমনের পথে দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হইবার শক্তিও তাহাকে দিয়াছিলেন; ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ও আর. সি. প্রধানের ভাষায়, 'নির্দ্বিধায় তাঁহাকে আধুনিক ভারতের জাতীয়তার জনক বলা যায়—বিবেকানন্দের জীবন ও কর্ম হইতেই ইহা প্রচণ্ড গতিবেগ পাইয়াছিল, প্রধানতঃ তিনিই ইহা সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং নিজ জীবনে মূর্ত করিয়াছিলেন ইহার সর্বোচ্চ ও মহত্তম ভাবগুলিকে।'

পাশ্চাত্যকে বাঁচিতে হইলে যে তাহার সভ্যতাকে জড়বাদের ভিত্তি হইতে সরাইয়া আনিয়া আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইবে, একথা স্বামীজী বলিয়াছিলেন, ভারতকে যেমন বলিয়াছিলেন পাশ্চাত্যের কর্মদক্ষতা—'শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ'—এবং শিল্পবিজ্ঞানাদি গ্রহণ করিতে। সমগ্র মানবজাতির অগ্রগতির পথ এটি—প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সহিত পাশ্চাত্যের জাগতিক উন্নতিপ্রচেষ্টার মিলনসাধন। আমেরিকা যাইয়া সেখানে বেদান্তের উচ্চ তত্ত্বগুলির প্রচারের গুরুত্ব সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই তাই অপরিসীম।

বোম্বাই বন্দর হইতে স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রা তাই ভারতকে জাগাইবার পথে, বিশ্ব-মানবকল্যাণসাধনের পথে তাঁহার প্রথম পদক্ষেপ। যে কর্মসাধনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে নির্বিকল্প সমাধিলাভের পর তাহাতে সর্বক্ষণ মগ্ন হইয়া থাকিতে দেন নাই, হিমালয়ের কোন নির্জন প্রদেশে যাইয়া যতবার তিনি ধ্যানমগ্ন হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন ততবারই তাঁহাকে সেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন মানুষের মাঝখানে,—বলা যায় সে কর্মের আরম্ভ এই যাত্রার দিন হইতে। এই কর্ম সাধনের জন্য সাগরপারে যে তাঁহাকে যাইতে

হইবে, তাহা তিনি পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন ; পোরবন্দরে সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া একথা তাঁহার মনে হইয়াছিল ; ধর্মমহাসভা-প্রসঙ্গে একসময় তাঁহার জনৈক গুরুভ্রাতাকে বলিয়াছিলেনও যে, তাঁহারই জন্য এসব আয়োজন হইতেছে। বাহিরের ঘটনা হইতে কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর প্রথম ভাষণদানের পূর্ব পর্যন্ত ইহা কিছু বুঝিবার উপায় ছিল না। এই মহাসভায় যোগদানের জন্য ভারত হইতে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ধর্মপাল, বি. বি. নাগরকার প্রভৃতি খ্যাতনামা যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই গিয়াছিলেন আমন্ত্রিত হইয়া, আমেরিকায় পৌঁছিয়া অভ্যর্থিতও হইয়াছিলেন যথাযোগ্যভাবে ; এদেশের এবং আমেরিকার সংবাদপত্রে তাঁহাদের এই যাত্রার বিষয় ঘোষিত এবং আলোচিতও হইয়াছিল। আর তৎকালে অখ্যাতনামা স্বামীজী গিয়াছিলেন বিনা নিমন্ত্রণে, বিনা পরিচয়ে। তাঁহার যাত্রার কথা তাঁহার স্বল্পসংখ্যক কয়েকজন ভক্ত এবং গুরুভ্রাতা ছাড়া অপর কেহ জানিতেও পারেন নাই—কোন সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হয় নাই। শুধু তাহাই নয়, চিকাগো পৌঁছিয়া বুঝিয়াছিলেন ধর্মমহাসভায় তাঁহার যোগদানের কোন সম্ভাবনা নাই, বরং অর্থাভাবের দরুন শীতে ও অনাহারে প্রাণনাশের সম্ভাবনাই সমধিক। কিন্তু আমরা জানি, ঈশ্বরের অমোঘ ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত ধর্মমহাসভায় তাঁহার যোগদানের ব্যবস্থা তো অভাবিত উপায়ে হইয়া গিয়াছিলই, উপরন্তু সভার প্রথম দিন হইতে তিনিই হইয়া উঠিয়াছিলেন সভার প্রতিনিধিগণের মধ্যে সর্বাধিক আকর্ষণীয় ব্যক্তি।

২

পাশ্চাত্যের খৃষ্টধর্মে কি আধ্যাত্মিকতা নাই যে স্বামীজীকে যাইয়া তাহা প্রচার করিতে হইবে? কথাটি তাহা নয়—সর্বধর্মেরই তো উদ্দেশ্য মানুষকে আধ্যাত্মিক করা, দেহাতীত সত্তার দিকে চোখ ফিরাইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করাইবার দিকে অগ্রসর করানো। কিন্তু দেখা যায়, কালক্রমে সর্বধর্মেই এই দিকটি অবহেলিত হইয়া অনুষ্ঠানপদ্ধতিই সর্বস্ব হইয়া উঠে, যাহা কেবল খৃষ্টধর্মেই নয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীর সর্বত্রই সব ধর্মে হইয়াছিল। তাছাড়া, বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলির ফলে সে সময় যুক্তিবাদী মানুষ শাস্ত্র ও ধর্মের কথাগুলিকে 'বিশ্বাস' করিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। স্বামীজীর ভাষায়, তখন 'আধুনিক বিজ্ঞানের সত্য-আবিষ্কারের মুহুর্মুহুঃ প্রবল আঘাতে প্রাচীন আপাতদৃঢ় ও অভেদ্য ধর্মবিশ্বাসগুলির ভিত্তি পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছে,...আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব-অনুসন্ধানের প্রবল মুষলাঘাত প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কারসমূহকে ভঙ্গুর কাচপাত্রের ন্যায় গুঁড়াইয়া ফেলিতেছে...পাশ্চাত্য জগতে জ্ঞানিগণ ধর্মসম্পর্কিত সব কিছুকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।' সে সময় স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম আধুনিক যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার কষ্টিপাথরে যাচাইয়াই শাস্ত্রোক্ত কথাগুলির সত্যতা দেখাইয়া দেন ; দেখাইয়া দেন যে, শাস্ত্রোক্ত চরম সত্য মনবুদ্ধির অতীত হইলেও আমাদের যুক্তি যতদূর পর্যন্ত উহা ধরিতে-ছুঁইতে পারে, তাহার মধ্যে উহাতে যুক্তি-বা বৈজ্ঞানিক-সত্য-বিরোধী কিছুই নাই। তাছাড়া, আধুনিক যুক্তি ও বুদ্ধিকে পরিতৃপ্ত করানোর চেয়েও বেশী প্রয়োজন ছিল সেখানে এমন একটি জীবন

দেখানো, যে জীবনে শাস্ত্রোক্ত কথাগুলিকে মূর্ত দেখা যায়। স্বামীজীর আমেরিকাগমনের এবং চিকাগো ধর্মমহাসভার পর আমেরিকার চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এইটিই,—মেরী লুই বার্ক তাঁহার 'নিউ ডিস-কভারীজ অব স্বামী বিবেকানন্দ ইন আমেরিকা' গ্রন্থে এদিকে আমাদের দৃষ্টি যথার্থতই আকর্ষণ করিয়াছেন—যাহাতে সেখানকার যত বেশী-সংখ্যক সম্ভব লোক তাঁহাকে দেখিতে পায়, সোজাসুজি তাঁহার মুখ হইতে কিছু শুনিতে পায়, তাঁহার সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পায়। কারণ মহাপুরুষগণ এভাবেই অপরের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা সঞ্চার করেন। ইহা শুধু ধর্মে অনুপ্রাণিত করা নয়—সে কাজ তাঁহাদের বাণী তাঁহাদের অবর্তমানেও করিতে সমর্থ—ইহা ধর্ম 'দেওয়া', তৎক্ষণাৎ মনকে আধ্যাত্মিক করিয়া দেওয়া। স্বামীজীর ভাষায়, একটি গোলাপ ফুল যেমন অপরকে দেওয়া যায়, ঠিক সেভাবে দেওয়া। তুলসীদাস সাধুকে 'চলমান তীর্থ' বলিয়াছেন; তাঁহার এই অনুপম উপমা অবলম্বনে আমরা বলিতে পারি, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে একটি চলমান মহাতীর্থ বোম্বাই হইতে যাত্রা করিয়াছিল সুদূর পাশ্চাত্যের দ্বারে দ্বারে অযাচিত হইয়া মহাতীর্থদর্শনের ফল বিলাইবার জন্য।

৩

আজ প্রশ্ন উঠিতে পারে, স্বামীজীর এই সমুদ্রযাত্রার ফল পাশ্চাত্যে কতটুকু হইয়াছে? স্বল্প কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া তাঁহার কথা লইয়া কে আর আজ চিন্তা করে? জড়বাদের ভিত্তির উপরই তো পাশ্চাত্য তাহার সভ্যতার ভিত্তি দৃঢ়তর করিয়া চলিয়াছে; সমগ্র মানবসভ্যতাই তো সামগ্রিকভাবে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি হইতে আজ সরিয়া যাইতে উদ্যত—বহুস্থানে সম্পূর্ণ সরিয়া আসিয়াছেও। ভারতের দিক দিয়া অবশ্য উহা বিপুল ফলপ্রসূ হইয়াছিল; কিন্তু বর্তমানে তাঁহার যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে -এরূপ কথাও বলিতে শোনা যায়।

সত্য বটে আজ আমরা বিবেকানন্দকে ভুলিয়াছি, কিন্তু তাঁহার যুগ শেষ হয় নাই—নিবেদিতার মতে তাঁহাকে ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতেই আমাদের তিন পুরুষ কাল সময় লাগিবে। ভারত একদিন তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই, আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক জীবনের উপর দাঁড়াইয়াই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তাহার পরই অবশ্য সে বিবেকানন্দকে ভুলিয়াছে এবং তাহার ফল যে কি হইয়াছে তাহাও দেখিতেছি। পাশ্চাত্যের জাতিগুলি জড়বাদের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই আজ বিপুল শক্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু পৃথিবীকে আজ টানিয়াও আনিয়াছে সামগ্রিক ধ্বংসের গহ্বরের একেবারে কিনারায়। আধ্যাত্মিকতা ছাড়া আর কে যে আজ মানবজাতির রক্ষা-কর্তা এবং বিবেকানন্দ ছাড়া আর কে যে আধুনিক মনের গ্রহণযোগ্য ভাবে আধুনিক ব্যবহারিক জীবনে সে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োগ-বিধি দিয়াছেন, তাহা তো জানা নাই। যে ভাবে আজ মানুষ চলিতেছে সেপথে তাহার গতি অব্যাহত হইলে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক স্বার্থসংঘর্ষই একদিন ধ্বংসের গহ্বরে তাহাকে নিক্ষেপ করিবে। জাতি-বা দলগত স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া জড়বাদভিত্তিক কোন সভ্যতার আর যে কোন লক্ষ্য নাই, যতবড় আদর্শের কথাই মুখে উচ্চারিত হউক না কেন, তাহা তো আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। ঈশ্বরের অস্তিত্বে, এবং তিনি যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব

মানুষেরই স্বরূপ এই সত্যে বিশ্বাসবান্ হইয়া তদনুযায়ী জীবনগঠন করিয়া ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষের সেবায় ব্রতী হইবার চেষ্টা না করিলে—স্বামীজীর আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক জীবন এবং শিবজ্ঞানে জীবসেবার ভাব গ্রহণ না করিলে—পৃথিবীর কোন জাতিরই মনে সব দেশের সব মানুষের জন্য অকপট সহানুভূতি আনা আর অন্য কোন্ উপায়ে সম্ভব হইবে? আজ তো দেখিতেছি, আদর্শ যাহাই বলুক, পৃথিবীর কোন দেশের কোন মতবাদই আচরণে মানুষকে সব ধর্মের, সব দেশের সব মানুষের জন্য সহানুভূতিশীল করিতে পারে নাই; বরং আধুনিক যোগাযোগ-ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বাড়াইয়া তুলিয়াছে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা, অবিশ্বাস ও বিদ্বেষকে। এই পরিস্থিতিতে, 'মানবজাতির অস্তিত্বরক্ষাই যখন সঙ্কটাপন্ন', স্বামীজীর সাবধান-বাণীই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে পাশ্চাত্যেরই একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবীর কণ্ঠে—'মানবেতিহাসের এই চরম বিপজ্জনক মুহূর্তে ভারতীয় পন্থাই মানবজাতির মুক্তির একমাত্র পথ'—যে পন্থার উপযোগিতা বর্তমান সঙ্কট হইতে মানবজাতির কেবল রক্ষা পাওয়াই নয়, সত্যের দিকে তাহার ঊর্ধ্বায়নও, কারণ উহা 'আধ্যাত্মিক সত্যের যথার্থ উপলব্ধি-প্রসূত।'

কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস, ভারত আজ ভারতীয়তার মূর্ত প্রতীক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শকে ত্যাগ করিয়া নিজস্ব সম্পদকেই হারাইতে বসিয়াছে। বিদেশীয় আদর্শের অনুকরণে চলিয়া সে যদি আজ জীবনকে আধ্যাত্মিকতাশূন্য করিয়া ফেলে, তাহাদেরই একজন হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহারা যখন আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিবে, কী দিবার থাকিবে আমাদের তখন?

তবে স্বামীজী পরম আশ্বাসবাণী শুনাইয়া গিয়াছেন, ভারত হইতে ধর্ম—আধ্যাত্মিকতা চলিয়া যাইবে, ইহা কখনই হইতে পারে না। বর্তমান সময়ে ইহার যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, তাহা সাময়িক একটা অবস্থা মাত্র। এই সাময়িক বিভ্রান্তিই পরিণামে আমাদের দৃষ্টিকে স্বামীজীর ভাবরাশির দিকে ফিরাইয়া আনিবে। সুদীর্ঘকাল তামসিকতায় আচ্ছন্ন ভারত রাজসিকতা দ্বারা উহা কাটাইবার মুখে একটু বিপথগামী হইতেছে, সাত্ত্বিকভাবের মিশ্রণে তাহার রাজসিকতা অকল্যাণের পথ ছাড়িয়া কল্যাণপথে ফিরিবেই। সুদীর্ঘকাল দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত ভারত আজ পাশ্চাত্যের ভোগের প্রতি কিছু আকৃষ্ট হইতে পারে, নিবেদিতার ভাষায়, তাহার 'যৌবনকামনা আধুনিক সভ্যতার বিলাসদ্রব্য লইয়া কিছু নাড়া-চাড়া করিতে পারে, সে অধিকার নিশ্চয়ই তাহার আছে'—কিন্তু সে-ও কি পাশ্চাত্যের মতো উহাতে ভাসিয়া যাইবে, ভোগ-সর্বস্ব হইয়া উঠিবে? না, 'প্রত্যাবর্তন সে করিবেই, কারণ তাহার প্রাণের গভীরে আছে নীতি, তপস্যা ও আধ্যাত্মিকতা।' স্বামীজীর অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী, অত্যধিক অবনতি সত্ত্বেও এখনো প্রত্যেক ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয় শুভসংস্কার প্রচ্ছন্ন আছে, 'মহামায়ার কৃপায় যথাকালে তাহার স্ফুরণ হইবেই।'

ভারত স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সারা জগৎকে পথ দেখাইবে—ইহা দৈবনির্দিষ্ট। আজ হইতে ৬৮ বৎসর পূর্বে স্বামীজী যে আমেরিকা যাত্রা করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় ঘটিয়াছিল

—'আমি যে আমেরিকা গিয়াছিলাম, তাহা আমার ইচ্ছায় বা তোমার ইচ্ছায় হয় নাই; ভারতের ঈশ্বর, যিনি ইহার অদৃষ্ট নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই আমায় পাঠাইয়াছেন।' ঈশ্বরের ইচ্ছা অমোঘ। তাঁহার ইচ্ছাই বাস্তবের রূপ ধারণ করে। যে অমোঘ ইচ্ছা স্বামীজীকে নবযুগে জগৎকল্যাণ সাধনের জন্য অমিত আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী করিয়া পাশ্চাত্যে পাঠাইয়াছিল, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া সেখানে তাঁহাকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিল, এবং বিশ্বের সম্মুখে সগৌরবে তুলিয়া ধরিয়াছিল, সেই ইচ্ছাই সব বিপদ, সব দুর্যোগ কাটাইয়া ভারতকে যে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই—'ঈশ্বরাদেশ ঘোষিত হইয়াছে, ভারত জাগিবেই- জগতের কোন শক্তির সাধ্য নাই তাহাকে আর দাবাইয়া রাখে।'

"যেন দুইটি বিশাল চিন্তাতরঙ্গিণী—প্রাচ্য ও আধুনিক; ধর্মমহাসভার বক্তৃতামঞ্চে দণ্ডায়মান গৈরিকপরিহিত পরিব্রাজক সেই সময়ের জন্য হইয়াছিলেন ইহাদেরই সঙ্গমক্ষেত্র।...যখন তিনি পাশ্চাত্যের যৌবনকালে—মধ্যাহ্নসময়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন প্রশান্ত মহাসাগরের অপর প্রান্তে, পৃথিবীর তিমিরাচ্ছন্ন গোলার্ধের প্রচ্ছায়ে সুপ্ত একটি জাতি তাহাদের দিকে সঞ্চরমাণ উষার দ্বারা পরিবাহিত বাণীর জন্য মনে মনে অপেক্ষা করিতেছিল—যে বাণী তাহাদের নিকট উদ্ঘোষিত করিবে তাহাদের নিজস্ব মহিমা ও শক্তির গূঢ় রহস্য।"

—নিবেদিতা

স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

৺ ভুবনেশ্বর
Sri Ramakrishna Math,
Bhubaneswar, P. O.
Dt. Puri (Orissa)
30. 1. 1923

প্রিয় সিদ্ধেশ্বর,

আজ সকালে তোমার পত্র পাইলাম, পূর্বে ২৫ তারিখে হাবলার এক পত্র পাইয়াছি। সকলের মঙ্গল সংবাদে সুখী হইলাম। আমার ইচ্ছা আছে এই শিবচতুর্দশীতে এইখানেই থাকিব, সেও খুব শীঘ্রই আসছে, সেই জন্য কলিকাতায় যাওয়া হইল না, আর এখানে শরীরও ভাল আছে, জল বাতাস ভাল। এখানে আবার আর এক কাজ আছে, চৈত্রমাসে অন্নপূর্ণাপূজার সময় দেবীপক্ষে ঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। রাখাল মহারাজ সেই মন্দির আরম্ভ করিয়াছিলেন, এতো দিনে শেষ হইয়াছে। আমি কলিকাতায় এখন যাইতে পারিব না, সেজন্য তোমরা কেহ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবে না, যখন কলিকাতায় যাইব সব দেখা হবে। উপস্থিত শারীরিক ভাল আছি, মাকে আমার প্রণাম জানাবে, তোমরা সকলে আন্তরিক ভালবাসা শুভেচ্ছা জানিবে। সংবাদ সমস্ত জানাবে। তুমি কি ইতিমধ্যে বেলুড় মঠে গিয়েছিলে, কোথায় ঠাকুরের মন্দিরের প্ল্যান দেখিলে? আশা করি সমস্ত কুশল সংবাদ। যোগেন ভাল আছে, তার সঙ্গে দেখা হইলে কলিকাতায় সবার কথা বলিব ও পরে আমি পত্র দেবো।

অনেক দিন দেবুদের সংবাদ পাই নাই, তারা সব কেমন আছে? এলাহাবাদ থেকে ইতিমধ্যে সব আসবে তো? হাবলার পত্রতে ভোলানাথ খাঁদু এদের ক্লাস প্রমোশনের বিষয় শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। পোসা এখন কোথায়? সে হয়তো এতো দিনে আমায় ভুলে গেছে। এখানে ভোর বেলায় একটু শীত হয়, দুপুর বেলায় গরম। গরমের সময় সমুদ্রের ধার ও গঙ্গার ধার বেশ ঠাণ্ডা থাকে। নেত্যলালের ৺কাশীতে বাড়ী কেনবার কথা ছিল, তার কি হইল?

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
ভুবনেশ্বর পোঃ, পুরী জিলা
১২ আষাঢ়। রবিবার [১৯২৬ খৃঃ]

কল্যাণীয়া মায়ী [প্রতিভা দেবী]

আমি ৺পুরী জগন্নাথ হইতে স্নানযাত্রার পর ভুবনেশ্বর আসিয়াছি। পুরীতে অনেক লোকসমাগম হইয়াছিল। সমুদ্রের হাওয়া আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল; সেখানে থাকিবার সুবিধা থাকিলে আরো কয়েক দিন থাকিয়া আসিতাম। আজকাল আমি শারীরিক ভালই আছি।···আমার যদি শরীর এদেশে ভাল থাকে, কিছুদিন থাকিব, এখন অন্নজলের বরাত। ভুবনেশ্বরে খুব গরম যখন, টেম্পারেচার হইয়াছিল ১১৯ ডিগ্রি। ৺পুরীতে সে-সময় ৯০ ডিগ্রী ছিল। আমরা এখানে দুপুর বেলায় দোর জানালা বন্ধ করিয়া থাকিতাম, রাত্রে বারান্দায় জল ঢালিয়া তবে শুইতে পারিতাম। ভুবনেশ্বরে গরমের সময় দুইজন উড়িয়া সর্দি-গরমি হয়ে দুপুর বেলায় মারা গিয়াছিল। ভগবান যাকে রাখেন সেই থাকে; কথায় বলে রাখে কৃষ্ণ মারে কে? সকল বিষয়েতে ওই রকম; সাধন-ভজনে তিনি যদি একাগ্রচিত্ত করিয়া দেন, তবেই মঙ্গল, নচেৎ চঞ্চল মন সেই রকমই থাকিয়া যায়। সেইজন্য তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা চাই, ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান এই সবের জন্য। জপ তপ পূজা পাঠ যাহা কিছু, মনকে স্থির করিবার জন্য।··মধ্যে ২।৩ দিন বৃষ্টি হইয়াছিল, আজকে আকাশ মেঘলা, হয়তো বৃষ্টি হইবে। আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইচ্ছা জানিবে ও সকলকে জানাইবে।···

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

(৩)

ওঁ Belur Math P. O., Howrah Dist.
5. 6. 32

কল্যাণবরেষু,

শ্রীমান্ সরোজ, তোমার পত্র যথাসময়েই পাইয়াছি এবং ভাল আছ জেনে সুখী হইয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সদা সুস্থ থাকিয়া তাঁর চিন্তায় আনন্দে থাক। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাবাতাস সর্বদাই বইছে; যে পাল তুলে দিতে পারবে, গন্তব্যে পৌঁছিতে তার বিলম্ব নিশ্চয়ই হবে না। তবে ধরে থাকতে হয়!

আমার শরীর পূর্বের ন্যায়ই আছে। .জ্বর এখনও হচ্ছে। আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং আশ্রমস্থ সকলকে জানাবে।···শ্রীশ্রীঠাকুর সতত তোমার কল্যাণ করুন।

গতকল্য ভোর ৬টা ১৫ মিনিটের সময় মাষ্টার মহাশয় (শ্রীম) শরীর ছেড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে মিলিত হইয়াছেন। ইতি

তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

যোগবাসিষ্ঠসারঃ

[পূর্বানুবৃত্তি]

[অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ]

৫। বাসনোপশমপ্রকরণ

রাম স্বাত্মবিচারোঽয়ং কোঽহং স্যামিতিরূপকঃ।
চিত্তদুর্দ্রুমবীজস্য দহনে দহনঃ স্মৃতঃ ॥ ১

বসিষ্ঠ বলিতেছেন, "হে রামচন্দ্র, 'আমি স্বরূপতঃ কে'—এইরূপ যে আত্মবিচার তাহা দুঃখদায়ী চিত্তবৃক্ষের বীজ (বাসনা)-দহনে অগ্নিসদৃশ জানিও।"

বিচারদর্পণে লগ্নাং ধিয়ং ধৈর্যধুরং গতাম্ ॥
আধয়ো ন নিলুম্পন্তি বাতা শ্চিত্রলতামিব ॥ ২

চিত্রাঙ্কিত লতাকে যেরূপ বায়ু প্রকম্পিত করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ বিচাররূপ দর্পণে সংলগ্ন, অতএব ধৈর্যভারপ্রাপ্ত (একান্তধৈর্যপরায়ণ) বুদ্ধিকে আধি (মনঃপীড়া) ব্যাধি আদি বিচলিত করিতে পারে না।

বিচারোঽধ্যাত্মবিদ্যানাং জ্ঞানং তত্ত্ববিদো বিদুঃ।
জ্ঞেয়ং তস্যান্তরেবাস্তি মাধুর্যং পয়সো যথা ॥ ৩

অধ্যাত্মবিদ্যার বিচারকেই তত্ত্ববিদ্‌গণ জ্ঞান বলিয়া থাকেন। দুগ্ধমধ্যে মাধুর্যের ন্যায় ঐ জ্ঞানমধ্যেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম বিদ্যমান।

বিচারেণ পরিজ্ঞাতস্বভাবস্যোদিতাত্মনঃ।
অনুকম্প্যা ভবন্তীহ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ৪

বিচার সহায়ে যিনি নিজের ব্রহ্মভাব অবগত হইয়াছেন এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন, ইহলোকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি দেবগণও এইরূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের অনুকম্পার পাত্র হইয়া থাকেন। (জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞানের ইহাই অপূর্ব মহিমা।)

কিমিদং বিশ্বমখিলং কিং স্যামহমিতি স্বয়ম্।
বিচারনিরতস্যৈতদসদেব ভবেজ্জগৎ ॥ ৫

এই সমগ্র বিশ্বের স্বরূপ কি এবং স্বয়ং আমারই বা স্বরূপ কি—এইরূপ বিচারপরায়ণ পুরুষের নিকট জগৎ অসৎ, তুচ্ছরূপে প্রতিভাত হয়।

যস্য মৌর্খ্যং ক্ষয়ং যাতং সর্বং ব্রহ্মেতি ভাবনাৎ।
নোদেতি বাসনা তস্য প্রাজ্ঞস্যাম্বুমতির্মরৌ ॥ ৬

মরুভূমিতে যেমন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির জলবুদ্ধি হয় না, সেই প্রকার 'সবই ব্রহ্মরূপ' এই শ্রুতির

অর্থ-উপলব্ধি দ্বারা যাঁহার মূর্খতা অর্থাৎ অজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে, তাঁহার আর বিষয়ে বাসনার উদ্রেক হয় না।

বাসনাসংপরিত্যাগাচ্চিত্তং গচ্ছত্যচিত্ততাম্।
প্রাণস্পন্দনিরোধাচ্চ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৭

প্রাণায়াম দ্বারা এবং বাসনা-পরিত্যাগ দ্বারা চিত্ত অচিত্ততা (অর্থাৎ ব্রহ্মস্বভাব) প্রাপ্ত হয়। এইরূপে চিত্তবিলয়ের অনন্তর যথেচ্ছ ব্যবহারাদি করিও (ব্যবহার জ্ঞানের বাধক নহে)।

সাধুসঙ্গমসচ্ছাস্ত্রপরো ভবসি সম্মতে।
তদ্দিনৈরেব নো মাসৈঃ প্রাপ্নোসীমাং পরাং ধিয়ম্॥ ৮

হে বিশুদ্ধ বুদ্ধিমান্, যদি তুমি সাধুসঙ্গ-ও বেদান্তশাস্ত্রপরায়ণ হও তবে কতিপয় দিবসের মধ্যেই তুমি এই বুদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে, সেজন্য তোমাকে আর মাসাদি দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা করিতে হইবে না।

সৎসঙ্গব্যবহারিত্বাদ্ ভবভাবনবর্জনাৎ।
শরীরনাশদর্শিত্বাদ্ ভাবনা ন চ বর্ততে॥ ৯

সৎসঙ্গপ্রভাবে সজ্জনতুল্যব্যবহারানুষ্ঠান দ্বারা, সাংসারিক চিন্তা পরিত্যাগ ও শরীরের নশ্বরত্বচিন্তাসহায়ে বাসনা ক্ষীণ হইয়া থাকে। (ভাবার্থ এই যে, বাসনাক্ষয়ের এই তিনটি সাধন।)

দৃঢ়ভাবানুসন্ধানাৎ বিমূঢ়া অপি রাঘব।
বিষং নয়ন্ত্যমৃততামমৃতং বিষতামপি॥ ১০

বসিষ্ঠ বলিতেছেন—'হে রঘুকুলোদ্ভব রামচন্দ্র, দৃঢ় ভাবনা দ্বারা মূর্খগণও বিষকে অমৃতে এবং অমৃতকেও বিষে রূপান্তরিত করিয়া থাকে।'

সত্যভাবেন দৃষ্টোঽয়ং দেহো দেহো ভবত্যলম্।
দৃষ্টস্ত্বসত্যভাবেন ব্যোমতাং যাতি দেহকঃ॥ ১১

দেহকে সত্যরূপে চিন্তা করিলে উহা দৃঢ় সত্যরূপেই প্রতিভাত হয় (এবং সংসারপ্রাপক হয়), পুনঃ উহাকে অসত্যরূপে চিন্তা করিলে উহা শূন্যতা প্রাপ্ত হয় (ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে)।

সুখতল্পগতো যেন স্বপ্নে দেহেন দিক্তটান্।
পরিভ্রমসি হে রাম স দেহস্তে ক্ব সাম্প্রতম্॥ ১২

বসিষ্ঠ বলিতেছেন, 'হে রাম, তুমি সুখশয্যাশায়ী হইয়া স্বপ্নাবস্থায় যে দেহে দিগন্তসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া থাক, তোমার সে দেহ এখন কোথায়?'

দেহোঽহমিতি ধীস্ত্যাজ্যা সর্বনাশেঽপ্যুপস্থিতে।
স্প্রষ্টব্যা সা ন ভব্যেন সশ্বমাংসেব পুষ্কশী॥ ১৩

সর্বনাশ উপস্থিত হইলেও 'আমি দেহ'—এই বুদ্ধি সর্বথা পরিত্যাজ্য। কুকুরমাংসগৃহীত-হস্তা চাণ্ডালী যেরূপ অস্পৃশ্যা, মুমুক্ষু সাধুও দেহাত্মবুদ্ধি সেইরূপ দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবেন।

ব্রহ্মৈকংভাবয়ন্ সাধুঃ শান্তস্তিষ্ঠন্ গতব্যথঃ।
ততস্তেসাবহংভাবঃ স্বয়মেব বিনশ্যতি ॥ ১৪

সদাচারী সাধু তুমি যখন এক ব্রহ্মভাবনাসহায়ে শান্তচিত্তে অবস্থান করিয়া বিগতদুঃখ হইবে, তখন তোমার এই দেহাত্মবুদ্ধি স্বতই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

সর্বত্রৈক্যাববোধেন স্বস্থোহন্তঃশীতলঃ সদা।
নিরহংকৃতিরাকাশবিশদস্তেন সংস্থিতঃ ॥ ১৫

দৃশ্যমান সর্ব বিশ্ব ব্রহ্মরূপ—এইরূপ দৃঢ় ভাবনা দ্বারা শীতলান্তঃকরণ হইয়া মুমুক্ষু যখন স্বস্বরূপস্থ হন, তখন তাঁহার অহংকার বিলয়প্রাপ্ত হয়, এবং অহংকারবিলয়ে তখন তিনি আকাশের ন্যায় নির্মল অবস্থা লাভ করেন। (তাঁহার দেহাত্মবুদ্ধি তিরোহিত হয়)।

অন্তঃশীতলতায়াং হি লব্ধায়াং শীতলং জগৎ।
অন্তস্তাপোপতপ্তানাং দাবদাহময়ং জগৎ ॥ ১৬

ইতি যোগবাসিষ্ঠসারে বাসনোপশমনং নাম পঞ্চমং প্রকরণম্।

(ব্রহ্মচিন্তন দ্বারা) অন্তর শীতল হইলে সর্বজগৎও তখন শীতল মনে হয়, পুনঃ অন্তর (তৃষ্ণা-) তাপসন্তপ্ত হইলে জগৎকেও তখন যেন দাবাগ্নিপরিবৃত বলিয়া মনে হয়।

যোগবাসিষ্ঠসার গ্রন্থের বাসনোপশম নামক পঞ্চম প্রকরণ সমাপ্ত।

৬। আত্মমননপ্রকরণ

শুদ্ধনিরঞ্জনোহনন্তো বোধোহহং প্রকৃতেঃ পরঃ।
চেষ্টমান ইমং দেহং পশ্যাম্যন্যশরীরবৎ ॥ ১

আমি শুদ্ধ, নিরঞ্জন, অনন্ত, জ্ঞানস্বরূপ এবং মায়াতীত। মিথ্যা প্রাতিভাসিক দেহসম্বন্ধ-বশতঃ লোকদৃষ্টিতে নানা কর্মে ব্যাপৃত থাকিলেও এই শরীরকে আমি আমা হইতে পৃথক্ অপরের শরীরের ন্যায় দর্শন করিয়া থাকি।

এতে হি চিদ্‌বিলাসান্তা মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াদয়ঃ।
অসন্ত সর্ব এবাহো অবধানং বিনা স্থিতাঃ ॥ ২

অহো! ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা আশু বিনাশী এই মিথ্যা মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি একটু অবধানতার (বিচারের বা মনঃসমাধানের) অভাববশতঃই বিদ্যমান, যথার্থ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। (চিদ্‌বিলাসান্ত অর্থাৎ চিদ্‌বিলাস বা ব্রহ্মানুভবই যাহাদের অন্ত বা বিনাশ। ভাব এই যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে এই সকল পদার্থ আর প্রতীয়মান হয় না।)

আপদ্যচলচিত্তোঽস্মি জগন্মিত্রং চ সংপদি।
ভাবাভাববিহীনোঽস্মি তেন জীবাম্যনাময়ম্ ॥ ৩

যেহেতু আমি আপৎ অর্থাৎ দুঃখপ্রাপ্তিতে অচলচিত্ত বা স্থিরমনা, সম্পন্নদশাতে আমি জগতের মিত্র অর্থাৎ সর্ববিশ্বের উপকারক। আমি ভাবাভাব অর্থাৎ লাভালাভরহিত, ক্ষয়বৃদ্ধিহীন, অতএব আমার কোন হর্ষ বা বিষাদ নাই এবং আমি সদা দুঃখরহিত হইয়া অবস্থান করি

নিরীহোঽস্মি নিরাশোঽস্মি খবৎ স্বচ্ছোঽস্মি নিস্পৃহঃ।
শান্তোঽস্ম্যহমরূপোঽস্মি চিরায়ুরচলঃ স্থিতঃ ॥ ৪

আমি নিরীহ অর্থাৎ ঈহা-বা সাংসারিকচেষ্টারহিত, নিরাশ অর্থাৎ বিষয়তৃষ্ণারহিত, আকাশতুল্য স্বচ্ছ বা নির্মল, নিস্পৃহ বা বিষয়বাসনারূপ স্পৃহারহিত, শান্ত বা স্থিরমনা, এবং অরূপ অর্থাৎ রূপরসাদি বিষয়ে অনাসক্ত (রূপ শব্দ এখানে উপলক্ষণরূপে গৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে)। অতএব আমি চিরায়ু বা অবিনাশী এবং অচল অর্থাৎ সর্বচঞ্চলতারহিত।

চিদেব পঞ্চভূতানি চিদেব ভুবনত্রয়ম্।
বিজ্ঞাতমধুনা সম্যগহমেব চিদেব হি ॥ ৫

এখন আমি তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে বিদিত হইয়াছি। দৃশ্যমান আকাশাদি পঞ্চভূত ও তিনভুবন সবই চিদ্‌রূপ ব্রহ্ম, এবং আমিও চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহি।

সর্বাতীতঃ সর্বগম্যঃ খমিবায়মহং স্থিতঃ।
যত্তদস্মি তদেবাস্মি বক্তুং শক্নোমি নেতরৎ ॥ ৬

এই প্রত্যক্ষ আমিই সর্বাতীত, সর্বব্যপক ও আকাশের ন্যায় স্থিত হইয়া আছি। আমি যাহা তাহাই ব্রহ্ম এবং সেই ব্রহ্মই আমি, ইহার অধিক আর অন্য কিছুই আমি বলিতে সমর্থ নহি

ময্যনন্তচিদম্ভোধাবাশ্চর্যং জীববীচয়ঃ।
সমুল্লসন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ ৭

ইহা বড়ই আশ্চর্য যে, অনন্তচিৎসমুদ্ররূপ আমাতে স্বভাবতই জীবরূপী লহরীসমূহ উৎপন্ন হইতেছে, আমাতে স্থিত হইয়াই বিবিধ ব্যাপার করিতেছে, পুনঃ আমাতেই বিলীন হইতেছে। (সাগরবক্ষে উর্মিমালার ন্যায় জীবসমূহের স্বভাবই এইরূপ।)

ময্যনন্তচিদম্ভোধৌ বিশ্ববীচ্যাদিকল্পনা।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন মে বৃদ্ধির্ন চ ক্ষয়ঃ ॥ ৮

অনন্তজ্ঞানসমুদ্ররূপ আমাতে সংসাররূপ লহরী-কল্পনা যথেচ্ছ উদিত হউক বা বিনাশ প্রাপ্ত হউক, তাহাতে আমার কোন বৃদ্ধি বা হানি হয় ন। (কারণ আমি পরিপূর্ণস্বরূপ)।

[২৯৩ পৃষ্ঠায় ে াংশ]

শ্রীশ্রীরামানুজদর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী আদিনাথানন্দ

১০। উপসংহার

১। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথাপ্রসঙ্গে বহুবার বলিয়াছেন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত)—তিনি নিরাকার, সাকার, আরও কত কিছু ; তাঁহার সম্বন্ধে ইতি করা যায় না।

উক্ত উক্তির তাৎপর্য-নির্ণয় আমরা গীতামুখে ভগবদ্বাক্য হইতে করিতে পারি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও জ্ঞেয় ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণ করিতে গিয়া বলিতেছেন :

"অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।"
১৩।১৫

এখন প্রশ্ন উঠে অসক্ত ও নির্গুণ সত্তা 'সর্বভৃৎ'ও 'গুণভোক্তৃ' কি করিয়া হন। উহার উত্তর শ্রীধরস্বামী-কৃত গীতার টীকায় পাওয়া যায়। যথা :—

নন্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য উপ. ৩।১৪।১), ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্ (মৈত্র্যুপনিষদ্ ৪।৬), ইত্যাদি শ্রুতিভির্বিরুধ্যেত ইত্যাশঙ্ক্য—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া" (শ্বেতাশ্ব. উপ., ৬।৮ ইত্যাদি) শ্রুতিপ্রসিদ্ধয়াচিন্ত্যাশক্ত্যা সর্বাত্মতাং তস্য দর্শয়ন্নাহ" ইত্যাদি।

এই ব্যাখ্যা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হয় যে, স্বাভাবিকী অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে জ্ঞেয় ব্রহ্ম নির্গুণস্বরূপ অব্যাহত রাখিয়া সমস্ত অচেতন পদার্থের অধিষ্ঠানস্বরূপ এবং তাঁহার সত্তায় সমস্ত ভূতবর্গ জন্মলাভ করিয়া তাঁহাতেই স্থিতিলাভ করিতেছে।

[২৯২ পৃষ্ঠার পর]

মদজ্ঞানোদিতং বিশ্বং ময্যেব লয়মাগতম্।
অপরোক্ষচিদানন্দসাম্রাজ্যমধুনাস্ম্যহম্ ॥ ৯

আমার স্বরূপবিষয়ক অজ্ঞানবশতঃই এই বিশ্ব উদিত হইয়া পুনঃ (জ্ঞানকালে) আমাতেই লয়প্রাপ্ত হইল। এখন আমি অপরোক্ষ চিদানন্দের সাম্রাজ্য হইয়াছি অর্থাৎ সীমাহীন স্বপ্রকাশরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছি।

সর্বভূতান্তরস্থায় নিত্যমুক্তচিদাত্মনে।
প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপায় মহ্যমেব নমো নমঃ ॥ ১০

ইতি যোগবাসিষ্ঠসারে আত্মমননং নাম ষষ্ঠং প্রকরণম্।

সর্বভূতান্তর্যামী, নিত্যমুক্তজ্ঞানস্বরূপ, প্রত্যক্‌চৈতন্যস্বরূপ আমাকেই আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি।

যোগবাসিষ্ঠসার গ্রন্থের আত্মমনন নামক ষষ্ঠ প্রকরণ সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

শুধু তাহাই নহে। তাঁহার নিজের ইন্দ্রিয় নাই। কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাব ভিন্ন হস্তপদাদির কাজ কেহ করিতে পারে না। শ্রবণ, কথন, সংকল্প, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির ক্রিয়া এবং শ্রোত্র, বাক্, মনের যাবতীয় ক্রিয়া ব্রহ্মের শক্তিতে পরিচালিত। সেই পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় হইলেও সকল ক্রিয়ার মূল তিনি। পূজ্যপাদ স্বামীজী সমাধিজ প্রজ্ঞা লইয়া যে 'সৃষ্টি' নামক কবিতা লিখিয়াছিলেন এবং কাশীপুরে গুরু-ভ্রাতাদের গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন, তাহাতে বর্ণিত আছে:

"সেথা হ'তে বহে কারণ-ধারা "সে অপার ইচ্ছা-সাগর মাঝে, অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে—কতই রূপ, কতই শকতি, কত গতিস্থিতি, কে করে গণন ॥

আবার শেষে বলিতেছেন:

'সেই সূর্য, তারি কিরণ; যেই সূর্য, সেই কিরণ ॥

উক্ত গীতাবাক্য হইতে ইহা পাওয়া যায়—তিনি চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন করেন। শ্রুতি-বর্জিত হইয়াও শ্রবণ করেন (ভক্তদের প্রার্থনা শুনেন)। আবার তিনি সঙ্গ- বা সম্বন্ধযুক্ত নহেন কিন্তু তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই ত্রিজগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি নিগুর্ণ কিন্তু গুণসমূহ উপলব্ধি করেন—তাঁহার স্বাভাবিকী অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে, যাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

২। উপরে যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত হইল, ইহাই অতি প্রাচীন 'Vedantic theism' (বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদ), যাহা শ্রীরামানুজাচার্য-প্রতিপাদিত দার্শনিক চিন্তায় আধুনিককালে প্রকটিত হইয়াছে। এই আচার্য সেই সুপ্রাচীন মতবাদকে ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই 'Vedantic theism' একটি অতি প্রাচীন ভক্তিবাদ। বহু সিদ্ধ আচার্য কর্তৃক ইহা বহু শতাব্দী ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া বেদান্ত-দর্শন সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছে এবং সরস ভক্তিবাদ প্রচার করিয়া অগণিত নরনারীর আধ্যাত্মিক জীবন পুষ্ট করিয়াছে। অতি উচ্চগ্রামে বাঁধা অজাতবাদ বা নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদ, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য ইত্যাদি তত্ত্ব ধারণা করিবার শক্তি সাধারণের মধ্যে অতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তির আছে। অতি উচ্চাধিকারী, শুদ্ধচিত্ত, অপাপবিদ্ধ ব্যক্তির শুদ্ধ চিত্তে এইসব তত্ত্বজ্ঞান স্ফুরিত হয়। বহু জন্মজন্মান্তরের তপস্যালব্ধ ধীশক্তি লইয়া জন্মিলে এই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞানের উদয় হইতে পারে। সেই কারণে Vedantic theismই সর্ব সাধারণের একমাত্র উপজীব্য, সহজসাধ্য ধর্মপথ বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরকে দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে সহায়করূপে পাইতে জীবের প্রাণ যায়। 'সুহৃদং সর্বভূতানাম্' হিসাবে সহজে তাঁহাকে ধারণা করিয়া বিপদসঙ্কুল জীবনে দুর্বল মানুষ মানসিক বল লাভ করে। ইহাই ঈশ্বরা-রাধনার প্রত্যক্ষ ফল।

৩। এই Vedantic theism জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যে তত্ত্ব প্রচার করিয়াছে, তাহা কতিপয় দার্শনিকদের মতে highest reading of Truth (সত্যের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা) হিসাবে ধরা হয়। ব্রহ্ম বিবর্তকারণ বলিলে উহাও বুদ্ধিগ্রাহ্য, conceptional reading নহে কি? এমন কি তিনি নিগুর্ণ, নিরাকার এবং জগতের অধিষ্ঠান ইত্যাদি বলিলেও তো তাহা জীববুদ্ধিপ্রসূত একটি 'মতবাদ'। ইহাও অন্য একটি reading of Truth।

৪। Vedantic theism ধর্মানুভূতির মাধ্যমে যে তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদন করে তাহাকে বহু আচার্য চরম সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বোধির দ্বারা যে তত্ত্ব অনুভূত হয় তাহাকে চরম বলিতে বাধা কি?

এক সত্তা 'বহু' কেন হইলেন—Vedantic theism ও Vedantic absolutism (বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদ ও বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ)—এই প্রশ্নের জবাব দিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং ব্যাখ্যা লইয়াই যত মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, স্বামী সারদানন্দের বরিশালে অবস্থানকালে একদিন বক্তৃতার পর তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—'ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার; কেন তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করিলেন?' পূজনীয় মহারাজ উত্তর দিয়াছিলেন, "I will answer the question if it is logically put." (যদি ন্যায়সঙ্গতরূপে প্রশ্ন করা হয় তবে আমি উত্তর দিব)। অর্থাৎ অবাঙ্‌মনসোগোচরম্ ব্রহ্মসত্তার জগৎ ও জীবরূপে যে ব্যক্ত মূর্তি তাহার কারণ-নির্ণয় জীবভূমি হইতে করা সম্ভব কিনা, তাহা বিচার্য বিষয়। সীমায়িত বুদ্ধি এই অচিন্ত্য রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে পারে না। তাই জীবগোস্বামী বলিয়াছেন, "অচিন্ত্যা খলু যে ভাবাঃ নস্তান্ তর্কেণ যোজয়েৎ" (তর্কদ্বারা এইসব অচিন্ত্য তত্ত্ব নির্ণয় হয় না)।

৫। একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, জগৎ ব্রহ্মে বিবর্তিত এই মতবাদ, এবং জগৎ ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে কারণসত্তা হইতে কার্যে পরিণত হইয়াছে এই মতবাদ—উভয়ই একমত যে, জগৎ ও জীবের সম্বন্ধ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে। আমরা জগৎকে ও জীবনকে যে জড়দৃষ্টি লইয়া দেখিতেছি তাহা সত্য দৃষ্টি নহে। কাজেই কোন্ মতবাদ পারমার্থিক আর কোন্‌টি ব্যাবহারিক—এইসব লইয়া ? । বাদবিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। আধ্যাত্মিক জীবনগঠনে উক্ত যে কোন মতবাদই যথেষ্ট। যদি সশক্তিক ব্রহ্মানুভূতির ঊর্ধ্বে কোন স্তর থাকে উহা আপনিই প্রকাশিত হইবে। তিনি নির্গুণ না সগুণ, অথবা নির্গুণ হইয়াও সগুণ এসব প্রশ্নের জবাব তখন আপনিই পাওয়া যাইবে, শুদ্ধ বুদ্ধির মাধ্যমে।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণন তাঁহার 'Indian Philosophy' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

'Much more remarkable is the deep earnestness and hard logic with which he conceived the problems and laboured to bridge the yawning gulf between the apparently conflicting claims of religion and philosophy.'

'The Saguna Brahman of Sankara and Brahmaloka answers to Ramanuja's Vishnu and Vaikuntha. Sankara presses the point that these conceptions though the highest open to us are not highest in themselves. This reservation makes little difference so far as life is concerned.'

ধর্ম ও দর্শনের আপাত-বিরুদ্ধ দাবীর বিরাট ব্যবধান ঘুচাইতে যে পরিশ্রম তিনি করিয়াছেন এবং যে গভীর আন্তরিক আগ্রহ ও সূক্ষ্ম যুক্তিবিচার সহায়ে সমস্যাগুলি অনুধাবন করিয়াছেন তাহা অধিক লক্ষণীয়।

শঙ্করের সগুণ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মলোক, রামানুজের বিষ্ণু ও বৈকুণ্ঠের অনুরূপ। শঙ্কর দৃঢ়ভাবে একথা বলিতেছেন যে, এই সব ধারণা

যদিও আমাদের নিকট উচ্চতম, তবুও এগুলি নিরপেক্ষ উচ্চতম তত্ত্ব নয়। আমাদের জীবনের কথা ধরিলে চরম তত্ত্ব সম্বন্ধে এই অসম্পূর্ণ উক্তিতে সেখানে বিশেষ কিছু ইতর-বিশেষ ঘটে না।

৬। উপরোক্ত প্রসঙ্গ আমরা অন্যভাবে প্রতিপাদিত করিতে পারি।

পূজ্যপাদ স্বামীজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর লণ্ডনে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে আছে : "বেদান্ত প্রকৃতপক্ষে জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চায় না। বেদান্তে যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে তেমন আর কোথাও নাই। কিন্তু ঐ বৈরাগ্যের অর্থ 'আত্মহত্যা নহে'—নিজেকে শুকাইয়া ফেলা নহে (জগৎ যখন তিনকালে নাই, কাজেই হৃদয়ানুভূতি, সংবেদন, পরোপকার, সমবেদনা—সবই ভ্রম এবং হেয় ও ত্যাজ্য)।

বেদান্তের বৈরাগ্য অর্থে—জগতে ব্রহ্ম-ভাব। জগৎকে আমরা যেভাবে দেখি সেভাব ত্যাগ কর এবং উহার স্বরূপ অবগত হও। তুলনীয় শঙ্করের উক্তি—বুদ্ধিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেৎ ব্রহ্মময়ং জগৎ—'অপরোক্ষানুভূতি' জগৎকে ব্রহ্মভাবে দেখে—বস্তুতঃ উহা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নহে। সমুদয় জগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে।"

স্বামীজীর এই বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামানুজ-প্রদর্শিত Vedantic theism-এর মাধ্যমে উক্ত এই 'ব্রহ্মদৃষ্টি' লইয়া জীবন যাপন করা অতি সহজসাধ্য হইবে- ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ আমাদের যেরূপ মানসিক গঠন তাহাতে জগতে Abstract Monism (বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ) লইয়া জীবন যাপন প্রায় অসম্ভব বলা যায়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন-সমাধির চেয়ে উচ্চ অবস্থা আছে। মনে হয় এই দৃষ্টিকোণ হইতেই স্বামীজী কর্মযোগ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, আমার এই 'কর্মযোগ' is both discipline and a consummation (সাধনা এবং পূর্ণতালাভ দুই-ই)।

আসুন, ভগবদ্গীতায় জ্ঞেয় ব্রহ্মের যে স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা স্থিরচিত্তে অনুধ্যান করিয়া আমরা অধ্যাত্মরাজ্যে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করি।—

"ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥"

৫।২৯

মাতৃতীর্থ-পরিক্রমা

প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা

এ ভারত পুণ্যভূমি। বহুশতাব্দীর সাধক তপস্বীর চরণস্পর্শে পূত ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা। বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষপূর্বেই ভারতের অপরূপ মহিমা হৃদয়ের সপ্রেম অনুভূতির দ্বারা ঘোষণা করেছিলেন—“আমার শৈশবের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী”। এ ভারতভূমি মাতৃভূমি। ভারতের আসমুদ্রহিমাচল মাতৃদেহালিঙ্গিত। এ দেশের শিরায় উপশিরায়, অণুতে পরমাণুতে মাতৃনামের অমৃতসুধা সিঞ্চিত। ভারতের প্রাণশক্তি মাতৃশক্তিতে সঞ্জীবিত। সুদূর অতীতে একবার আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখবো পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড·৫) বর্ণিত আছে—দক্ষালয়ে যজ্ঞের আয়োজন হয়েছে। মহাদেব ব্যতীত সকল দেবদেবী আহূত। সতী যজ্ঞস্থানে প্রবেশ করে দক্ষকে জিজ্ঞেস করলেন—তাঁর যজ্ঞে শিব ও সতী নিমন্ত্রিত হননি। দক্ষ প্রত্যুত্তর করলেন যে, শিবের বেশভূষা সুধীজনযোগ্য নয়। এই মঙ্গলকার্যে সর্বপ্রকার অমঙ্গলের প্রতীক শিব, এই কারণে তিনি আহূত হননি। দক্ষপ্রজাপতির মুখে শিবনিন্দা শ্রবণ করে সতী উত্তর দিলেন—

> ন যস্য লোকেঽস্ত্যতিশায়নঃ প্রিয়-
> স্তথাঽপ্রিয়ো দেহভৃতাং প্রিয়াত্মনঃ।
> তস্মিন্ সমস্তাত্মনি মুক্তবৈরকে
> ঋতে ভবন্তং কতমঃ প্রতীপয়েৎ॥
>
> শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৪।৪।১১

ইহলোকে যাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই, যাঁর প্রিয় বা অপ্রিয় নাই, যিনি দেহধারীদের প্রিয় আত্মাস্বরূপ, সেই শিবের প্রতি তুমি ভিন্ন আর কে প্রতিকূলতা করতে পারে? পিতাকে সম্বোধন করে সতী বলেছিলেন—“তুমি ভগবান নীলকণ্ঠের নিন্দাকারী। তোমার দেহ থেকে আমার এ দেহ উৎপন্ন হয়েছে। এ দেহ আমি আর ধারণ করব না।” সতী সমাধি-সমুৎপন্ন অগ্নি দ্বারা স্বীয় দেহ দগ্ধ করলেন; এই দৃশ্য· অবলোকনে আকাশ ও ভূতলে মহা হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হলো। রুদ্র-কোপানল থেকে বীরভদ্রের উৎপত্তি হলো; এবং ভগবতীর ক্রোধাগ্নি থেকে ভদ্রকালী উৎপন্ন হলেন; ভদ্রকালী কোটি কোটি যোগিনী-পরিবৃতা হয়ে বীরভদ্র সহযোগে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করলেন। দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসের পর মহেশ্বর যজ্ঞস্থানে গমন-পূর্বক চিন্ময়ী সতীকে যোগানলে দগ্ধ দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে ‘হা সতী! হা সতী!’ বলে সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে স্থাপনকরতঃ উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে নানাদেশ ভ্রমণ করতে লাগলেন। দেবগণ অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। ভগবান বিষ্ণু শরাসন সজ্জিত করে সতীর অবয়ব ছেদন করলেন।—

> তত্তৎস্থানেষু তত্রাসীন্নানামূর্তিধরো হরঃ।
> উবাচ চ ততো দেবান্ স্থানেষ্বেতেষু যে শিবাম্॥
> ভজন্তি পরয়া ভক্ত্যা তেষাং কিঞ্চিন্ন দুর্লভম্।
> নিত্যং সন্নিহিতা যত্র নিজাঙ্গেষু পরাম্বিকা॥
> স্থানেষ্বেতেষু যে মর্ত্যাঃ পুরশ্চরণকর্মিণঃ।
> তেষাং মন্ত্রাঃ প্রসিধ্যন্তি মায়াবীজং বিশেষতঃ॥
>
> (দেবীভাগবতম্—৭।৩০।৪৭-৪৯)

সতীর দেহাবয়ব যে যে স্থানে পড়লো,

মহাদেব নানা মূর্তিধারণপূর্বক সেই সেই স্থানে বাস করতে আরম্ভ করলেন।

এই সেই ভারতবর্ষ—জগন্মাতার দেহালিঙ্গিত মহাপুণ্যতীর্থ। পৃথিবীর সমস্ত তথাকথিত সভ্যজাতি যখন স্ত্রীমূর্তিকে সকল ভোগের আকরস্বরূপ বলে মনে করেছে তখন ভারতবর্ষ 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'—এই পবিত্রতার বাণী নিয়ে নারীমূর্তির উপাসনা করেছে। যে একত্বের অনুভূতি ভারতকে অধ্যাত্ম-জগতে শীর্ষস্থান দিয়েছে এবং যে ঐক্যবোধ ভারতবর্ষকে বিরাট হৃদয়বত্তার অধিকারী করেছে—সেই ঐক্যবোধের সহায়ক ভারতের পীঠস্থানগুলি।

ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পুণ্যভূমি ভারত আজও সগৌরবে একত্বের পতাকা বহন করছে। তপস্যাপূত, সনাতন ধর্মের জীবন্ত প্রতীক আসমুদ্র-হিমাচলের তীর্থসকল একসূত্রে গ্রথিত।

(১) ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ।
কোট্টরী সা মহাদেবী ত্রিগুণা যা দিগম্বরী॥

বেলুচিস্তানের দক্ষিণে হিঙ্গুলা নদীর তীরে অবস্থিত, হিঙ্গুলার আধুনিক নাম হিঙ্গলাজ, কোট্টরী বা কোট্টবী দেবী কালীরই রূপবিশেষ। মুসলমানেরা এই দেবীকে 'নানী বিবি' নামে পূজা করে। করাচী থেকে ৯০ মাইল উত্তরে হিঙ্গলাজ হিন্দুদের পশ্চিমতম তীর্থক্ষেত্র। পৌনে চার হাজার ফুট হিঙ্গলাজ পর্বতকে হিঙ্গুলা নদী দ্বিধা বিভক্ত করেছে। স্থানটি মরুভূমিতুল্য হলেও বৃক্ষলতায় সুশোভিত। চারিদিকে পর্বতমালায় পরিবেষ্টিত গুহার মধ্যে একটি শিলাতে দেবী অধিষ্ঠিতা—হিঙ্গল শব্দের অর্থ সিন্দুর।

(২) করবীরে ত্রিনেত্রং মে দেবী মহিষমর্দিনী।

সিন্ধুদেশের সক্কর নগরে করবীর পুর বা শর্করার দ্বিতীয় পীঠস্থান। দেবীর তৃতীয় নয়ন পতিত হয়েছিল এই তীর্থে।

(৩) ক্রোধীশো ভৈরবস্তত্র সুগন্ধায়াঞ্চ নাসিকা।
দৈবস্ত্র্যম্বকনামা চ সুনন্দা তত্র দেবতা॥

পূর্ববঙ্গের বরিশাল শহরের প্রায় ১২ মাইল উত্তরে শিকারপুর নামক গ্রামে অবস্থিত মহাপীঠ সুগন্ধা। সুদূর অতীতে এই তীর্থের পার্শ্বে সুগন্ধা নদী প্রবাহিত ছিল। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী সুনন্দা উগ্রতারা নামেও অভিহিতা হন।

(৪) কাশ্মীরে কণ্ঠদেশশ্চ ত্রিসন্ধ্যেশ্বরভৈরবঃ।
মহামায়া ভগবতী গুণাতীতা বরপ্রদা॥

কাশ্মীর শ্রীনগরের ১৫ মাইল উত্তরে ক্ষীর-ভবানীর মন্দির একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে কুণ্ডমধ্যে অবস্থিত। যে কুণ্ডের মধ্যে ক্ষীরভবানীর মন্দির—তার জল কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও বা নীল। তীর্থযাত্রীরা ক্ষীর বা পায়সান্ন দিয়ে দেবী ভবানীর পূজা করে। মন্দিরমধ্যে শ্বেত প্রস্তরের শিবলিঙ্গ ও তার পাশে কৃষ্ণপ্রস্তরের ভবানীমূর্তি।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অমরনাথতীর্থ ও ক্ষীরভবানী-দর্শন-কাহিনী প্রসঙ্গতঃ আমরা উদ্ধৃত করছি। ক্ষীর-ভবানীর পবিত্র প্রস্রবণতটে উপনীত হয়ে স্বামীজী উগ্র তপস্যায় ব্রতী হয়েছিলেন। প্রত্যহ দেবীর সামনে হোম করতেন ও বহুক্ষণ বসে মালা জপ করতেন। একদিন প্রজ্বলিত হোমাগ্নির সম্মুখে যোগাসনে উপবিষ্ট স্বামীজীর ভগ্নমন্দির-দর্শনে মনে হলো—"যখন মুসলমানগণ এই মন্দির ধ্বংস করেছিল, তখন হিন্দুগণ কি এসব অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছিল? তারা বাহুবলে গতিরোধ করতে পারেনি? আমি যদি থাকতাম, কখনও এরকম হতে দিতাম না, প্রাণ দিয়েও মাকে

রক্ষা করতাম।"

সহসা দৈববাণী হলো, বিস্ময়বিমূঢ় স্বামীজী উৎকর্ণ হয়ে শুনলেন, জগজ্জননী সস্নেহে ভৎর্সনার সঙ্গে বলছেন,—'বিধর্মী বা বিশ্বাস-হীনেরা যদি আমার মন্দিরে প্রবেশ ক'রে আমার মূর্তি কলুষিত করে, তাতেই বা কি? তোর তাতে কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি?'

পরে স্বামীজী আবার আপন মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে, যদি তিনি নিজে একটি নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন তবে বেশ আনন্দ হত। আবার সহসা জগজ্জননীর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করে স্বামীজীর চমক ভাঙল— 'বৎস! আমি মনে করলে অসংখ্য মন্দির ও মঠ স্থাপন করতে পারি। এই মুহূর্তে এখানে প্রকাণ্ড সপ্ততল সুবর্ণ মন্দির নির্মিত হতে পারে।' দৈববাণী-শ্রবণমাত্র স্বামীজী মন থেকে সব সংকল্প পরিত্যাগ করলেন, বুঝলেন মার যা ইচ্ছা তাই হবে। দিব্যদৃষ্টিতে স্বামীজী দেখলেন, মহামায়ার বিরাট ইচ্ছায় তিনি যন্ত্রের মত চালিত হচ্ছেন। প্রাণে অপূর্ব শান্তি, অদ্ভুত নীরবতা নিয়ে স্বামীজী শ্রীনগরে ফিরে এলেন। ক্ষীরভবানীতে স্বামীজীর আরও দিব্যদর্শন ও দিব্যানুভূতি হয়েছিল।

(৫) জ্বালামুখ্যাং তথা জিহ্বা দেব উন্মত্তভৈরব
　　অম্বিকা সিদ্ধিদা নাম্নী—

জ্বালামুখী মহাপীঠ পাঞ্জাবের কাংড়া জেলাতে অবস্থিত। এখানে সতীর জিহ্বা পড়েছিল—দেবী অম্বিকা, ভৈরব উন্মত্ত। জ্বালামুখীর দেবীমন্দিরে একটি স্বতঃপ্রজ্বলিত অগ্নিশিখাকেই শক্তিরূপে অর্চনা করা হয়, ঐ শিখাই সেখানে দেবীর বিগ্রহ। শারদীয়া ও বাসন্তী নবরাত্রে এখানে খুব বড় মেলা হয়।

(৬) স্তনং জালন্ধরে মম
　　ভীষণো ভৈরবস্তত্র দেবী ত্রিপুরমালিনী।

জালন্ধর মহাপীঠ হিমালয়ের ত্রিগর্তপ্রদেশে অবস্থিত। জালন্ধরে দেবীর স্তন পড়েছিল;— দেবী ত্রিপুরমালিনী, ভৈরব ভীষণ। প্রাচীন কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গন্ধার, উড্ডিয়ান, কাশ্মীর ও জালন্ধর তান্ত্রিক সাধনার চারটি মুখ্য কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ ছিল। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে—'জালন্ধরে স্তনযুগং স্বর্ণহার-বিভূষিতম্' (১৮।৪৪)—এই কারণে জালন্ধর স্তনপীঠ নামে পরিচিত।

মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত তীর্থযাত্রা-পর্বে যেসকল মাতৃতীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায় তন্মধ্যে গৌরীশিখরস্থিত স্তনকুণ্ডের এইরূপ বর্ণনা আছে—

তততা গচ্ছেত ধর্মজ্ঞ তীর্থসেবনতৎপরঃ।
শিখরং বৈ মহাদেব্যা গৌর্যা ত্রৈলোক্য-
　　　　বিশ্রুতম্॥

সমারুহ্য নরশ্রেষ্ঠ স্তনকুণ্ডেষু সংবিশেৎ।
স্তনকুণ্ডমুপস্পৃশ্য রাজপেয়ং ফলং লভেৎ॥
　　　　(বনপর্ব—৮৪।১৫১-৫২)

(৭) হার্দপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ।
　　দেবতা জয়াদুর্গাখ্যা—

বিহারের অন্তর্গত সাঁওতাল পরগনায় অবস্থিত বৈদ্যনাথধাম। সুপ্রসিদ্ধ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে বৈদ্যনাথের শিবলিঙ্গ অন্যতম প্রধান মহালিঙ্গ। দেবী এখনে জয়দুর্গা নামে পরিচিত।

(৮) নেপালে জানু মে শিব
　　কপালী ভৈরবঃ শ্রীমান্ মহামায়া
　　　　চ দেবতা॥

নেপালে পশুপতিনাথ তীর্থের নিকট দেবীর জানু পতিত হয়। এখানে দেবী মহামায়া নবদুর্গা নামে অভিহিতা

(৯) মানসে দক্ষহস্তো মে দেবী দাক্ষায়ণী হর।
অমরো ভৈরবস্তত্র সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥

মানসসরোবরে দেবীর দক্ষিণ হস্ত পতিত হয়, এখানে দেবী দাক্ষায়ণী, ভৈরব অমর। মানসসরোবরের তীরস্থিত এক সুবৃহৎ গুহায় হরপার্বতী-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই গুহার মধ্যে হস্তলিখিত বহু পুস্তক অতি গোপনে সুরক্ষিত আছে। লামাগণ এই গ্রন্থসমূহ অতি পবিত্রভাবে সংরক্ষণ করেন।

(১০) উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ॥

পুরীতে সতীর নাভি পতিত হয়, এই তীর্থের নাম বিরজাক্ষেত্র। দেবীর নাম বিমলা, ভৈরব স্বয়ং জগন্নাথ। জগন্নাথদেবের মূলমন্দিরের পশ্চিমে বিমলাদেবীর মন্দির অবস্থিত। দেবী পূর্বাভিমুখে বিরাজিতা, দেবীর চতুর্ভুজা মূর্তি, দক্ষিণ নিম্নহস্তে অক্ষমালা, দক্ষিণ উর্ধ্বহস্তে অমৃতকলস, বাম উর্ধ্বহস্তে নাগকন্যা ও বাম নিম্নহস্তে বরাভয়।

(১১) গণ্ডক্যাং গণ্ডপাতশ্চ তত্র সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ।
তত্র সা গণ্ডকী চণ্ডী চক্রপাণিস্তু ভৈরবঃ॥

গণ্ডকী নদীর (আধুনিক গণ্ডক) উৎপত্তিস্থল শালগ্রাম নামক স্থানে এই মহাপীঠ প্রতিষ্ঠিত। এখানে দেবীর গণ্ডদেশ পতিত। স্থানটি নেপাল রাজ্যের অধীন।

(১২) বহুলায়াং বামবাহু র্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরবস্তত্র সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥

বহুলাতে দেবীর বামবাহু পতিত হয়। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে কেতুগ্রামে এই মহাপীঠ অবস্থিত।

(১৩) উজ্জয়িন্যাং কর্পূরঞ্চ মাঙ্গল্যকপিলাম্বরঃ।
ভৈরবঃ সিদ্ধিদঃ সাক্ষাদ্দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা॥

মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী (আধুনিক উজ্জেন পশ্চিম ভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যে অবস্থিত) একটি প্রধান শক্তিপীঠরূপে কীর্তিত হয়। সতীর কনুই এখানে পতিত। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম হরসিদ্ধি, ভৈরব মহাকাল। তন্ত্রে ভিন্নমত প্রদর্শিত হয়েছে—উজ্জয়িনী মহাপীঠের শক্তি মঙ্গলচণ্ডী, ভৈরব কপিলাম্বর। এখানে দেবীর কোন প্রতিমা নেই, শ্রীযন্ত্র দেবীপ্রতীকরূপে পূজিত হয়। শিবপুরাণে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারপরমেশ্বরম্॥
কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
বারাণস্যাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে॥
বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দারুকাবনে।
সেতুবন্ধে চ রামেশং ঘুশ্মেশঞ্চ শিবালয়ে॥
দ্বাদশৈতানি নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
সর্বপাপৈর্বিনির্মুক্তো সর্বসিদ্ধিফলো ভবেৎ॥
শিবপুরাণম্ ১।১৮।১৭-২০

(ক) সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ, (খ) শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুন, (গ) উজ্জয়িনীতে মহাকাল, (ঘ) কাবেরী-নর্মদা- সমাগমস্থল মান্ধাতৃপুরে ওঁঙ্কারেশ্বর, (ঙ) হিমালয়ে কেদারনাথ, (চ) ডাকিনীতে (পুণার উত্তর-পশ্চিমে ভীমানদীর উৎপত্তিস্থলে) ভীমশঙ্কর, (ছ) বারাণসীতে বিশ্বনাথ, (জ) গোদাবরীতীরে ত্র্যম্বক, (ঝ) দেওঘর বৈদ্যনাথধামে বৈদ্যনাথ, (ঞ) দ্বারকায় নাগেশ, (ট) সেতুবন্ধে রামেশ্বর, এবং (ঠ) ইলোরাতে ঘুশ্মেশ বা ঘৃষ্ণেশ নামক লিঙ্গ। শিবপুরাণে এই দ্বাদশ লিঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

(১৪) চট্টলে দক্ষবাহুর্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী যত্র দেবতা

বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে ॥

এই মহাপীঠ পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম জেলায় সীতাকুণ্ড ষ্টেশনের নিকট চন্দ্রনাথ পর্বতে অবস্থিত। এইস্থানে সতীর দক্ষিণবাহু পতিত হয়। দেবী ভবানী, ভৈরব চন্দ্রশেখর। ভগবতী. স্বয়ং বলেছেন—"আমি কলিযুগে বিশেষ করে চন্দ্রশেখরে বাস করিয়া থাকি।"

সপ্তদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরেশ্বর রাজর্ষি গোবিন্দমাণিক্য তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে চন্দ্রনাথদেবের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বারাহীতন্ত্রের ৭ম পটলে উক্ত হয়েছে—দেবাদিদেব মহাদেব চন্দ্রনাথক্ষেত্রে অষ্টমূর্তি ধারণপূর্বক অবস্থান করছেন—

ক্ষিতিরূপো মহাদেবো বিরূপাক্ষো মহাশয়ঃ।
অগ্নিরূপে মহাদেবো মৃদং ভিত্বা বিরাজিতঃ ॥

(১৫) ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী।
ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ সর্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ ॥

ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত উদয়পুরে এই মহাপীঠ অবস্থিত। এইস্থানে সতীর দক্ষিণ চরণ পতিত; দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী, ভৈরব ত্রিপুরেশ। উদয়পুর নগর থেকে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একক্রোশ দূরে একটি পর্বতের সানুদেশে দেবীমন্দির আছে। মন্দিরে প্রস্তরময়ী কালিকামূর্তি প্রতিষ্ঠিতা। ত্রিপুরাধিপতি ধনমাণিক্য ১৫০১ খৃঃ এই মন্দির নির্মাণ করেন। চন্দ্রনাথতীর্থের স্বয়ম্ভুনাথলিঙ্গকে ধনমাণিক্য নিজের রাজধানী উদয়পুরে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভগবতী তাঁকে স্বপ্নে আদেশ দেন যেন ত্রিপুরাসুন্দরী বিগ্রহকে উদয়পুরে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বপ্নাদেশ অনুসারে ত্রিপুরাসুন্দরীকে চন্দ্রনাথতীর্থ থেকে উদয়পুরে আনা হয়।

(১৬) ত্রিস্রোতায়াং বামপাদো ভ্রামরী
ভৈরবেশ্বরঃ।

ত্রিস্রোতা বা তিস্তায় সতীর বামপদ পতিত হয়। দেবীর নাম ভ্রামরী, ভৈরব ঈশ্বর। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তানদীতটে শালবাড়ী গ্রামে এই মহাপীঠ অবস্থিত।

(১৭) যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র
দেবতা।

যত্রাস্তে ত্রিগুণাতীতা রক্তপাষাণরূপিণী ॥
যত্রাস্তে মাধবঃ সাক্ষাদ্ উমানন্দোঽথ
ভৈরবঃ।
সর্বদা বিহরেদ্ দেবী তত্র মুক্তি র্ন সংশয়ঃ ॥

কামগিরিতে যোনিপীঠ অবস্থিত, দেবীর নাম কামাখ্যা। অম্বুবাচী ও শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে কামাখ্যাধামে সর্বাধিক লোকসমাগম হয়। বিষ্ণুচক্রদ্বারা বিচ্ছিন্ন সতীর যোনিমণ্ডল নীলপর্বতে কুব্জিকা নামে পীঠস্থানে পতিত হয় এবং প্রস্তর হয়ে বর্তমান পীঠের উৎপত্তি হয়। এখানে কামাখ্যা দেবী নিত্য বিরাজিতা। বর্তমান কামাখ্যা মন্দিরের নিম্নস্থলে প্রস্তরে দেবীর প্রধান পীঠ—কোন মূর্তি নেই - হস্তমাত্র প্রবিষ্ট হতে পারে এরূপ একটি ছিদ্র থেকে প্রস্রবণ আকারে অবিরত জলধারা নিঃসৃত হচ্ছে। এখানেই পূজা করা হয়। কালিকা পুরাণে এর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

এবং পুণ্যতমে পীঠে কুব্জিকা পীঠসংজ্ঞকে।
নীলকূটে ময়া সার্ধং দেবী রহসি সংস্থিতা ॥
সত্যাস্তু পতিতং তত্র বিশীর্ণং যোনিমণ্ডলম্।
শিলাত্বমগমচ্ছৈলে কামাখ্যা তত্র সংস্থিতা ॥

(১৮) ভূতধাত্রী ভৈরবঃ ক্ষীরখণ্ডয়ঃ

যুগাদ্যা মা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পদো মম ॥

বর্ধমান ষ্টেশন থেকে ২০ মাইল উত্তরে কাটোয়ার কাছে অবস্থিত ক্ষীরগ্রাম। এখানে দেবীর দক্ষিণচরণের অঙ্গুষ্ঠ পতিত হয়। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম যুগাদ্যা বা যোগাদ্যা,

ভৈরবের নাম ক্ষীরখণ্ডক বা ক্ষীরকণ্ঠ। পাষাণময়ী দেবীমূর্তি একটি পুষ্করিণীতে সারা বছর জলে নিমগ্ন থাকেন—বিশেষ দিনে জল থেকে তুলে পূজা করা হয়।

(১৯) নকুলীশঃ কালীপীঠে দক্ষপাদাঙ্গুলী চ মে।
সর্বসিদ্ধিকরী দেবী কালিকা তত্র দেবতা॥

কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে আদিগঙ্গার পূর্বতটে কালীঘাট নামক স্থানে এই মহাপীঠ অবস্থিত। বৃহন্নীলতন্ত্রে এই স্থানকে কালীঘট্ট বলা হয়েছে। কালীঘাটে সতীর দক্ষিণপাদের চারিটি আঙ্গুল পতিত হয়। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকা, ভৈরব নকুলেশ্বর। কালীঘাটের কালীমূর্তি পাষাণময়ী। মূর্তির অধোভাগ অদৃশ্য। কটিদেশ থেকে মস্তক পর্যন্ত অংশ বহুবিধ মূল্যবান্ অলঙ্কারে ভূষিত এবং জিহ্বা স্বর্ণমণ্ডিত।

(২০) অঙ্গুলীবৃন্দং হস্তস্য প্রয়াগে ললিতা ভবঃ।

অধুনা এলাহাবাদে সতীর হস্তাঙ্গুলিসমূহ পতিত হয়। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ললিতা, ভৈরবের নাম ভব। ত্রিবেণী ঘাটের উত্তরপূর্ব দিকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে ললিতাদেবীর মন্দির। স্থানীয় নাম আলোপীদেবী। মন্দির-মধ্যে কোন মূর্তি নেই। সুপ্রশস্ত মন্দিরমধ্যে একটি মর্মরপ্রস্তর-নির্মিত উচ্চ বেদী, মধ্যভাগে চতুর্হস্ত-পরিমিত একটি গর্ত, গর্তমধ্যে দেবীর পীঠ। গর্তের ওপরে একটি দোলনা ঝোলান আছে—এটিই দেবীর আসন। এই দোলনার চতুর্দিকে ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ করেন।

'এতৎ প্রজাপতেঃ ক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্'

এই প্রয়াগ প্রজাপতির স্থানরূপে ত্রিলোকে বিখ্যাত। এখানে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হয়ে ত্রিবেণী সৃষ্টি করেছে। (ক্রমশঃ)

'ততো ন বিজুগুপ্সতে'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

এই আত্মকেন্দ্রিকতা, এ পাপ আদিম
নিশ্চিহ্ন করো হে প্রভু! নির্মল নিঃসীম
সূর্যকরোজ্জ্বল নীলে মুক্ত হোক পাখা!
সঙ্কীর্ণ কোটরে আর কতকাল ঢাকা
রহিবে অস্তিত্ব মোর? আমি যেন, হায়,
নেপোলিয়ঁ। বন্দী কোন্ সেণ্ট্ হেলেনায়!
পরিত্যক্ত দ্বীপ—গর্জে ক্রুদ্ধ তরঙ্গেরা!
অন্ধকূপে আসক্তির মৃত্যুজালে ঘেরা
অভিশপ্ত নমি আমি! বাঁধো, হে ঠাকুর,
অনন্তের সুরে মোর বাঁশরির সুর!
দেখি যেন সর্বভূতে আপন সত্তারে।
মূর্ত এই নারায়ণে অসংখ্য আকারে!

নিম্বার্ক সম্প্রদায় ও তদুপদিষ্ট সাধনপ্রণালী

শ্রীমতী পার্বতী সান্ন্যাল

শাস্ত্রে আছে,—ভারতভূমিতে জন্মলাভ না করিলে মনুষ্য মোক্ষলাভের অধিকারী হয় না। ভারতের ভূমি পূত ভূমি। যুগে যুগে অসাধারণ কঠোর তপস্যা দ্বারা এ ভূমিকে মুনিঋষিগণ পুণ্য মোক্ষপদদায়িনী তীর্থে পরিণত করিয়া আসিয়াছেন। জীবতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, সৃষ্টিস্থিতি-লয়বিষয়ক জ্ঞান এবং সর্বোপরি পরব্রহ্মতত্ত্ব এই ভূমিতেই ব্রহ্মর্ষিগণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবাসী স্বভাবতঃ ধর্মপ্রাণ এবং এই ব্রহ্ম-বিদ্যা ভারতবাসিগণের বিশেষ বিদ্যা। হিন্দু-দর্শন,—এই সকল ব্রহ্মর্ষিগণের সাক্ষাৎ অনুভব ও উপলব্ধির ফল। হিন্দুধর্মের প্রচ্ছদপটে বহু সম্প্রদায় বা গুরুপরম্পরাগত ধারা ধর্মের ধারকরূপে ভারতভূমিতে নিজ নিজ চিন্তা-ধারার বিস্তার নরসমাজে প্রবর্তন করিয়াছেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায় শ্রীনিম্বার্ক ভগবান কর্তৃক প্রবর্তিত ঐরূপ একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ধারা।

ভারতবর্ষের বৈষ্ণবসম্প্রদায় চারিশ্রেণীতে বিভক্ত,—প্রথম শ্রীমৎ মধ্বাচার্য-উপদিষ্ট মাধ্বসম্প্রদায়; দ্বিতীয় শ্রীবিষ্ণুস্বামী-প্রচারিত বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়; তৃতীয় শ্রীরামানুজ স্বামী-প্রবর্তিত শ্রীসম্প্রদায়; চতুর্থ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নাম নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়। মহামুনি নারদ ভগবানের মন্ত্রিশিষ্য শ্রীনিম্বার্ক স্বামী (অপর নাম নিয়মানন্দ স্বামী)-প্রবর্তিত এই সম্প্রদায় তাঁহারই নামানুসারে নিম্বার্ক সম্প্রদায় নামে খ্যাত হইয়াছে। শ্রীনিম্বার্ক স্বামী শ্রীভগবৎচক্রাবতার বলিয়া সাধুসমাজে পরিচিত আছেন।

শ্রীনিম্বার্কস্বামী-প্রবর্তিত ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত এই যে, অনন্তজীবসমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড মূলতঃ ব্রহ্ম। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। বিশ্বসংসার তাঁহার মতে অলীক নহে; ইহা ব্রহ্মের সগুণ রূপ। তিনি অনন্তশক্তিমান এবং অনন্তশক্তি দ্বারা অনন্তজীবনময় বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। কিছুই তাঁহা হইতে পৃথক নহে। তিনিই নানারূপে নানা-ভাবে ক্রীড়া করিতেছেন। কিন্তু তিনি শুধুমাত্র জীবজগৎ নহেন। এতদুভয়ের অতীত স্বরূপও তাঁহার আছে। এই অতীত স্বরূপই জগতের মূল উপাদান কারণ। জীবজগৎ তাঁহার অংশ মাত্র। অংশের সহিত অংশীর যে ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সম্বন্ধ, জগৎ ও জীবের সহিত ব্রহ্মেরও তদ্রূপ সম্বন্ধ। অংশ অংশীর অঙ্গীভূত, অতএব অভিন্ন। কিন্তু অংশী অংশকে অতিক্রম করিয়াও আছেন। জীব অংশ হওয়ায় ব্যষ্টিদ্রষ্টা, ব্রহ্ম পূর্ণস্বরূপ বলিয়া সমগ্রদ্রষ্টা। ব্রহ্ম চিদানন্দরূপ একমাত্র সদ্বস্তু। সর্বঘটেই পরমাত্মা পরব্রহ্ম বিরাজিত আছেন। জগৎ তাঁহার বিভূতি। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় বিশ্বের সকল বস্তুতেই পরমাত্মার অভেদজ্ঞানই সারভূত সত্য। ব্রহ্মাণ্ডের আপাতপ্রতীয়মান বিভিন্নতার অন্ত-রালে সেই একই চরম সত্তা অদৃশ্যরূপে বিদ্যমান।

শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান অথবা রাধাকৃষ্ণ যুগল-মূর্তি নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাস্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র প্রকটরূপই ব্রহ্মের সগুণ রূপ। অতএব সকল রূপই ব্রহ্মবুদ্ধিতে বৈষ্ণবগণের ধ্যেয়। সর্ব রূপের মধ্যে

ব্রহ্মার অবতাররূপের শক্তি সমধিক,—এই রূপের উপাসনা সহজ ও শীঘ্রফলপ্রদ। নিম্বার্ক-মতাবলম্বী সাধকগণ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানে আত্ম-নিবেদনপূর্বক তাঁহারই উপাসনা ভক্তিপূর্বক একান্তমনে করেন। এইরূপ সাধন করিতে করিতে তন্ময়তাপ্রাপ্ত হইলে চিত্তমল দূরীভূত হয় এবং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন ঘটে। ব্রহ্ম সগুণ, নির্গুণ, সর্বময় হইলেও সর্বাতীত পরব্রহ্মরূপ আপনা হইতেই সাধকগণের চিত্তে প্রতিভাত হইতে থাকে। সর্বজীবেই ব্রহ্মবুদ্ধি আরোপ-হেতু বস্তুর দোষগুণবিচার সম্বন্ধে সাধক উদাসীন হন। তখন সর্বত্র সমদর্শন ঘটে। সর্বজীবরূপই ভগবৎরূপ, সেইহেতু সকল জীবের প্রতি সেবাভাব (সেবকভাব) অবলম্বনপূর্বক কর্তব্যকর্মের নিষ্কাম সম্পাদনই নিম্বার্কীয় সাধকগণের আদর্শ আচরণ-নীতি। দাস্য বা অধীনভাব অবলম্বন করিয়া ভক্তিসহকারে ভগবৎসেবার্চনাই তাঁহাদের অপর ধর্ম। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ এই সাধনেরই বিশেষ পক্ষপাতী।

ভক্তি দুইপ্রকার,—সাধনরূপিকা ভক্তি ও পরাভক্তি। সাধনরূপিকা ভক্তি দ্বারা তাঁহারা শ্রীভগবানের সেবারাধনা, ধ্যান করিয়া থাকেন। এইরূপ করিতে করিতে চিত্ত নির্মল হইলে তাঁহাদের সর্বত্র সমদর্শন ঘটে এবং তৎপর স্বতঃই তাঁহারা পরাভক্তিলাভের অধিকারী হন। অশান্ত মানবচিত্তের স্থিতি-লাভ-প্রচেষ্টায় নির্মলাত্মা সাধুদিগের ধ্যান প্রকৃষ্ট পন্থা। এতএব হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণভগবানের ধ্যান যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধুসঙ্গ, তাহা নিখিলশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।

পরাভক্তিপ্রভাবে ভগবৎসাক্ষাৎকার হইলে, সাধক সমগ্র সৃষ্টিস্থিতিলয়, জীবজগৎতত্ত্ব ও সর্বশেষ পরব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানপ্রযুক্ত হন। তৎপর তাঁহারা জীবন্মুক্ত পুরুষ হইয়া ইহসংসারে বিচরণ করেন। অজ্ঞানতার নাশ-হেতু কর্মপাশে তাঁহারা আর লিপ্ত হন না। কর্তব্যবুদ্ধিতে কর্মের অনুষ্ঠান নির্লিপ্তবৎ ভগবৎ-অভিপ্রায়ে করিয়া থাকেন। তৎপর দেহান্তে অর্চিরাদি মার্গে তড়িৎবেগে গমনপূর্বক ব্রহ্ম-লোকসকল প্রাপ্ত হন। অতঃপর ঐ ব্রহ্মলোক-সকলও অতিক্রম করিয়া তাঁহারা পরাৎপর পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট হন। তখন তাঁহারা সর্ববিধসামর্থ্যপ্রযুক্ত হন ও অরূপতা প্রাপ্ত হন। ইহাই সর্বশাস্ত্রে উল্লিখিত পরম নির্বাণ, মোক্ষ বা কৈবল্যপ্রাপ্তি। পরব্রহ্মের ন্যায় সর্ব-বিধ সামর্থ্য তাঁহাদের আয়ত্ত হওয়ায় তাঁহারা স্বরাট হন। যে-কোনো দেহধারণ তাঁহাদের ইচ্ছাধীন থাকে,—দেহশূন্য, দেহযুক্ত উভয়ভাবে যদৃচ্ছাক্রমে থাকিতে তাঁহারা সক্ষম হন। তবে সর্বপ্রকার সামর্থ্যপ্রযুক্ত হইলেও তাঁহারা ঈশ্বর হইয়া যান না। অংশ-অংশী সম্বন্ধ সর্বাবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং সমগ্র সৃষ্টিস্থিতিলয়বিষয়ক সামর্থ্য কখনও প্রাপ্ত হয়েন না। সামগ্রিক ক্ষমতা একমাত্র ঈশ্বরেরেই আছে।

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় সদ্‌গুরুকরণ ব্রহ্মচিন্তা তথা ভগবৎ- বা আত্মসাক্ষাৎকারের একমাত্র উপায়। সাধক আপন আপন সাধন-বলে বহুবিধ অলৌকিক যোগৈশ্বর্যের অধিকারী হইতে পারেন, কিন্তু ভগবদ্দর্শন এক-মাত্র গুরুকৃপাতেই হইয়া থাকে। সদ্‌গুরুলাভ না হইলে আত্মার আত্মরূপে স্থিতিরূপ মোক্ষফল লাভ হয় না। বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থায় গমন একমাত্র গুরুকৃপাতেই হয়। আত্মার নবজন্ম হয় সদ্‌গুরুকৃপায় অজ্ঞানতার নাশপূর্বক মুক্তাবস্থায়।

ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞান সদ্‌গুরুর আশ্রয় ভিন্ন

উপজাত হয় না। গুরুতে আত্মসমর্পপূর্বক ভক্তির সহিত ভজন করিলে ব্রহ্ম সাধকের নিকট প্রকাশিত হন। গুরুবাক্য একমাত্র প্রতিপালনীয়, যিনি শুধুমাত্র গুরুর উপদেশই সার করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হন, তিনি জীবন্মুক্ত হন ও অচিরাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করেন। গুরু পরমাত্মাই। পরমাত্মাই সাধকের উদ্ধারের নিমিত্ত গুরুরূপী হইয়াছেন।

নিম্বার্কীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের দীক্ষাপ্রণালী তন্ত্র ও বেদ উভয়েরই অনুমোদিত। এই দীক্ষাপ্রণালীতে কোনপ্রকার প্রক্রিয়া (প্রাণায়াম ইত্যাদি) ব্যতীতই শুধুমাত্র শরণাগত হইয়া নিষ্ঠাপূর্বক ভক্তিসহকারে মন্ত্রজপ দ্বারাই ষট্‌চক্রভেদ হইয়া যায়।

অন্তিমে মোক্ষলাভই নিম্বার্ক সাধনভজনের চরম কাম্যফল। জীব যে অবস্থায় স্বরূপে অনন্ত দর্শন করেন তাহাকেই মুক্তাবস্থা বলে। যখন সমগ্র দৃশ্যবর্গ আপনা হইতে পৃথক ও ভিন্নভাবে দর্শন করেন তখন তাহাকে জীবের বদ্ধাবস্থা বলা হয়। এই ভিন্নরূপে দর্শনই বদ্ধাবস্থা, যাহা জীবকে কর্মপাশে ইহসংসারে আবদ্ধ রাখে। ইহাই ভগবৎমায়াশক্তি—মায়াশক্তিও নিত্য ভগবৎ অঙ্গ। জীব আত্মরূপে নিত্য হইলেও বদ্ধাবস্থা ও মুক্তাবস্থা,—এই দুই অবস্থাভেদ জীবের আছে। ব্রহ্ম সর্ব অবস্থাতেই সচ্চিদানন্দ। শ্রুতি বলিয়াছেন, —ব্রহ্ম আনন্দময়, রসময়, সুখময়,—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ,—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"—ইত্যাদি। আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ,—সমগ্র জগৎ আনন্দ হইতেই উপজাত হইয়াছে। ব্রহ্মের এই আনন্দাবস্থা চৈতন্যময়ও। এই আনন্দময় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে জীব সর্ববিধ ভয়ক্লেশরহিত হইয়া যান ও অংশ-অংশী সম্বন্ধে নিজের স্বরূপগত আনন্দময়তাও প্রাপ্ত হন। জীবের মুক্তাবস্থায়, দেহান্তে স্থূলদেহসম্বন্ধ বিনষ্ট হইবার পর যখন সূক্ষ্মদেহেরও পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়—তখনই তাঁহারা অরূপ অবাধিত নির্মল আনন্দ লাভ করেন। এই বিদেহমুক্তাবস্থায় চিদানন্দময়রূপে স্থিতিকেই জীবের পরম মোক্ষলাভ বলা হয়। এই মোক্ষলাভই সর্ববিধদুঃখরহিত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদায়ক অবস্থা বলিয়া শ্রুতিসকল বর্ণনা করিয়াছেন। এই আনন্দ স্থূলদেহসম্বন্ধলব্ধ আনন্দ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। জীবন্মুক্ত পুরুষগণেরও দেহসম্বন্ধ থাকায় সেই নির্মল আনন্দময়তা জন্মে না। দেহান্তে বিদেহমুক্তাবস্থায় প্রকৃত মোক্ষানন্দ লাভ হয়। এই মোক্ষফললাভই নিম্বার্কীয় সাধকগণের সাধন-ভজনের একমাত্র লক্ষ্য।

বঙ্গদেশে এই নিম্বার্কীয় সাধনপ্রণালী পূর্বে একপ্রকার অজানিতই ছিল। পরন্তু ভগবৎকৃপায় চুয়াত্তর বৎসর পূর্বে কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী (পরবর্তীকালে শ্রীসন্তদাস নামে খ্যাত) মহাশয় বাংলা ১৩০১ সনে এই নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবাচার্য শ্রীশ্রীস্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের কৃপালাভপূর্বক তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী মহারাজ সমগ্র উত্তর-ভারতের সাধুসমাজের আচার্যস্থানীয় উপাস্য বা ভজনীয় ছিলেন। শ্রীশ্রীস্বামী সন্তদাসজী মহারাজ (গৃহস্থাশ্রমে শ্রীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী) গৃহস্থাশ্রমে প্রভূত মানযশ, অর্থ, প্রভুত্ব উপেক্ষাপূর্বক সন্ন্যাস লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁহার এই বিরাট ত্যাগ সমগ্র জাতির নিকট দৃষ্টান্তস্থল হইয়া আছে। সন্ন্যাস

গ্রহণ করিবার পর শ্রীগুরুর কৃপায় শ্রীশ্রীসন্ত-দাসজী মহারাজ শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আপ্তকাম, সিদ্ধমনোরথ হন। শ্রীশ্রীকাঠিয়া বাবাজী ও তদীয় সুযোগ্য শিষ্য শ্রীশ্রীসন্তদাসজী কর্তৃকই এতৎ নিম্বার্কীয় দীক্ষা ও সাধনপ্রণালী বঙ্গদেশে কথঞ্চিৎ প্রসারলাভ করিয়াছে। শ্রীশ্রীসন্তদাসজী তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই তাঁহার সুযোগ্য, শরণাগত শিষ্য শ্রীশ্রীধনঞ্জয়দাসজী মহারাজকে আপন স্থানে অভিষিক্ত করিয়া নিম্বার্ক দর্শন ও সাধন-প্রণালী প্রচারের গুরুভার তাহার উপর ন্যস্ত করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ-বন্দনা

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার গুহঠাকুরতা

জয় শ্রীবিবেকানন্দ সপ্তর্ষির ঋষি
অভীঃ অভীঃ সিংহনাদ যাঁর দিবানিশি।
শিব-অবতার যিনি পতিতপাবন,
আবির্ভাবে ভারতের নবজাগরণ॥
প্রভুর মানস-সুত স্নেহের দুলাল
জয় ব্রহ্মানন্দ, জয় ব্রজের রাখাল॥
প্রণমি শ্রীপ্রেমানন্দ মূর্ত পবিত্রতা
নৈকষ্য কুলীন, প্রেমময়, প্রেমদাতা॥
নমি অর্জুনের অংশ যোগানন্দ-পায়
সমর্পিত প্রাণ যাঁর মায়ের সেবায়॥
বন্দি নিরঞ্জনানন্দ চরণযুগল
রাম-অংশে জন্ম যাঁর, সাহসী, সরল॥
রামকৃষ্ণানন্দ জয় অকলঙ্ক শশী
রামকৃষ্ণ-পূজনেতে চির-অভিলাষী॥
নমি শ্রীসারদানন্দ দ্বারী জননীর
কর্মযোগে ব্রতী, সদা অচঞ্চল, ধীর॥
জয় জয় শিবানন্দ, সন্ন্যাসিপ্রবর,
নাম বিলাইতে সদা দয়ার্দ্র-অন্তর॥
জয় শ্রীতুরীয়ানন্দ, মূর্তি তিতিক্ষার
তুরীয় ভূমিতে সদা বিহার যাঁহার॥
নমি শ্রীঅভেদানন্দে তপস্বিপ্রধানে
ভেদজ্ঞানপারে যিনি স্থিত পূর্ণজ্ঞানে॥
জয় শ্রীঅদ্ভুতানন্দ অদ্ভুতচরিত
নিদ্রাহীন দিবানিশি জপতপে স্থিত॥
নমি শ্রীঅদ্বৈতানন্দ প্রভুর স্বগণ
বয়সে প্রবীণ, শান্ত, সেবাপরায়ণ॥
নমি শ্রীসুবোধানন্দ, অতীব সরল
আজীবন শিশুসম, অন্তর নির্মল॥
জয় শ্রীত্রিগুণাতীত, নির্ভয়াচরণ
সারদা মাতার পদে গত তনুমন॥
জয় শ্রীঅখণ্ডানন্দ করুণা-আধার
শিবজ্ঞানে জীবসেবা ধরম যাঁহার॥
জয় শ্রীবিজ্ঞানানন্দ গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী,
প্রসন্ন গম্ভীর-আত্মা, প্রশান্ত, বিজ্ঞানী॥
সপার্ষদ-রামকৃষ্ণ-জননীসারদা-
চরণস্মরণে মতি থাকে যেন সদা॥

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

৩। **সমাজ ও ধর্ম**

আধ্যাত্মিকতাকে ঐহিক জীবনের নিয়ামক বলে অভিহিত করার অর্থ হ'ল সমাজজীবনে ধর্মের গুরুত্ব সর্বাধিক বলে নির্দেশ করা। প্রকৃতপক্ষে, স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ধর্মের প্রস্তর-কঠিন ভিত্তির ওপরই সমাজজীবনের উপরিতল (super-structure) নির্মাণ করা উচিত। ধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর ধারণা ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর জৈব মতবাদ (organic conception) থেকে শুরু করলে এই সিদ্ধান্তে আসা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

স্বামীজীর মতে, ধর্ম অবিদ্যারই বিপরীত গুণ (quality)। অতএব 'মানুষের সকল জ্ঞান ধর্মের অংশমাত্র।' যেহেতু, বেদান্ত অনুসারে বিদ্যামায়ার আহ্বান দ্বারা অবিদ্যার অবসান ঘটিয়ে অন্তর্নিহিত ঐশীশক্তির উদ্বোধনই মানবজীবনের লক্ষ্য, সেইহেতু ধর্মকে নিত্য সহযাত্রী হিসাবে গণ্য করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজজীবনে পথ চলতে হবে। ব্যক্তি এই আদর্শ কতটা অনুসরণ করতে সমর্থ হয়েছে, তাই হ'ল তার অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তির অভিব্যক্তির মাপকাঠি।[১] আবার ব্যক্তি সামগ্রিক সমাজের (the social whole) অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ধর্মকে সমাজ-সত্তারও অপরিত্যাজ্য সঙ্গী বলে গ্রহণ করতে হয়। যুধিষ্ঠিরের সারমেয়ের মত 'স্বর্গসুখের' জন্যও তাকে পরিত্যাগ করা চলবে না।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ডিস্‌রেইলী একজন কার্ডিন্যালকে (Cardinal) ধর্মসম্বন্ধে তাঁর নিম্নলিখিত উক্তিগুলি করে প্রচার করতে অনুরোধ করেছিলেন: 'ধর্ম হ'ল মূল জীবন-নীতি, জীবনের কোন নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান নয়'; 'ধর্ম উত্তুঙ্গ সভ্যতারই দ্যোতক'; 'ধর্ম বলতে সর্বশক্তিমান দ্বারা বন্য অবস্থা থেকে মানুষের পরিত্রাণই বোঝায়'; 'খৃষ্টধর্ম আমাদের শেখায় প্রতিবাসীকে নিজের মতই ভালবাসতে, আধুনিক সমাজ কিন্তু প্রতিবাসীর অস্তিত্ব স্বীকারই করে না'; 'বর্তমানে সমাজ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত, এতে হৃদয়বৃত্তির কোন স্থান নেই'; 'সুতরাং মানুষের আত্মা এক পবিত্র আশ্রয়স্থলেরই সন্ধান করে'; 'যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ, তা আমাদের জন্যে ধর্মের পথই নির্দেশ করে·· তা আমাদের ঐশী শক্তির উপলব্ধিতেই সহায়তা করে।'[২]

ডিস্‌রেইলীর উক্তিগুলিতে যে ধারণা প্রতিফলিত হ'য়েছে তার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণার সঙ্গতি ও অসঙ্গতি উভয়ই লক্ষণীয়। ডিস্‌রেইলী ধর্মকে ব্যক্তির নিত্য সহচর হিসাবে বর্ণনা করলেও সমাজের জীবন-পদ্ধতির অঙ্গ বলে নির্দেশ করেননি। সমাজ প্রবৃত্তি দ্বারাই পরিচালিত, হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রে

---

১ C. W., IV, p. 358। স্বামীজী ধর্মের সংজ্ঞাই দিয়েছেন: 'মানুষের অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তির অভিব্যক্তি' ('the manifestation of Divinity already in man') বলে।

২ A. J. Russell: Their Religion, pp. 138-39.

সমাজ নয়। সুতরাং ব্যক্তিকে তার কক্ষপথের সন্ধান করতে হবে নিজের মধ্যেই।

ডিস্‌রেইলীর ধারণা যুগসন্ধ্যারই দ্যোতক। প্রাচীন গ্রীসে নগর-রাষ্ট্রকেন্দ্রিক মহান যুগের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে স্টোইক দার্শনিকরা এই রকম ধারণাই প্রচার করেছিলেন—তাঁরাও ব্যক্তিকে তার কক্ষপথের সন্ধান করতে বলেছিলেন নিজের মধ্যে।[৩]

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ধর্ম ব্যক্তি ও সমাজকে সমভাবে স্পর্শ করে—অবিদ্যা-অপসারণের মাধ্যমে উভয়কেই বন্ধনমুক্ত করে। ধর্মকে অবলম্বন করে ব্যক্তি তার প্রকৃত সত্তা—পূর্ণাঙ্গতার ('the perfection itself')[৪] উপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধকগুলি অতিক্রম করতে সমর্থ হয়। ফলে হাজার হাজার বছরের বিলম্বিত যাত্রা ত্বরান্বিত হয়। সমাজও সহজে সকল শৃঙ্খলকে—তা বেস্থাম-নির্দেশিত 'অশুভ স্বার্থের' ('sinister interests') শৃঙ্খলই হোক বা মার্কস-বর্ণিত শ্রেণীস্বার্থের (class-interests) বন্ধনই হোক বা স্বামী বিবেকানন্দ-দৃষ্ট যাজক-সম্প্রদায় ও ডলারের (dollar) স্বৈরাচারের শৃঙ্খলই হোক—দূরে নিক্ষেপ ক'রে দ্রুত অগ্রগমনে সমর্থ হয়। ধর্মের উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের ঐশীশক্তির অভিব্যক্তি সম্ভব করা ('to evolve God out of man')[৫]। ব্যক্তি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ধর্ম উভয়কেই পূর্ণাঙ্গতার পথে পরিচালিত করে। এই সত্যের উপলব্ধি করেই বোধ হয় বার্ক লিখেছিলেন: "আমরা জানি···আমরা অন্তরে অনুভব করি যে, ধর্মই পৌরসমাজের ভিত্তি এবং কল্যাণ ও সুখের উৎস"। ("We know···we feel inwardly, that religion is the basis of civil society, and source of all good and of all comfort.")[৬]

৪। ধর্মের একাভিমুখিতা এবং একাভিমুখিতার সংকট

সমাজ ধর্মের প্রস্তর-কঠিন ভিত্তির ওপর স্থাপিত হ'লেও সমাজ-জীবনযাত্রায় ধর্মকে একমাত্র শক্তি বলে গণ্য করলে ভুল করা হবে। আবার স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনে এই সতর্কবাণীও বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে যে, জড়বাদকেও ধ্রুবতারকা গণ্য করে চল বলা ভুল—সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে, স্বামীজী সমাজের একাভিমুখিতার যে-কোন প্রকারভেদেরই সম্পূর্ণ বিরোধী, কারণ এই প্রকার একাভিমুখিতা তাঁর উদ্দেশ্যবাদকে (teleology) সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। জড়বাদের ভিত্তিতে স্থাপিত সমাজ 'শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যেরই সামিল'।[৭]—এরূপ সমাজে মানুষ পশুর পর্যায়েই থেকে যায় এবং নেকড়ের পালের মধ্যে সংঘবদ্ধতাজনিত যে সৌন্দর্য দেখা যায় তার চেয়ে বেশী কিছু গুণ বা সৌন্দর্য তাতে পরিলক্ষিত হয় না। মানুষ তখন নিজেকে দেহসর্বস্ব বলেই কল্পনা করে এবং অন্যান্য দেহের মূল্যে নিজ দেহকে সংরক্ষণ করতে, চাকচিক্যময় করে তুলতেই ব্যস্ত থাকে।[৮] বহির্ভূতকরণের এই ধারণা, ঐক্যনীতির এই

৩ CP. Hearashaw: Development of Political Ideas, pp. 18-19

৪ Aldous Huxly তাঁর Reflections on the Lord's Prayer-এ পূর্ণাঙ্গতাকে এইভাবেই বর্ণনা করেছেন।

৫ C. W., I, pp. 18-19

৬ Reflections on the Revolution in France (Select Works, II, p. 106)

৭ C. W., IV, p. 210

৮ C. W., II, p. 84

অস্বীকার বন্ধনেরই সূচক ; এখানেই আবার সন্ধান পাওয়া যাবে সকল সামাজিক অকল্যাণের উৎসের।

অপরদিকে আবার মাত্র আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে সমাজ গড়লে যাজক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটতে বাধ্য। এরূপ অবস্থায় সমাজের অপর সকলের স্বার্থহানি করে মুষ্টিমেয় কয়েকজনই বিশেষাধিকার ভোগ করে থাকে। উপরন্তু এরূপ সমাজ তৈত্তিরীয় উপনিষদুক্ত বাণী 'অন্নং বহু কুর্বীত'—যার অর্থ হ'ল পন্থা বা উপায় হিসাবে হ'লেও দৈহিক প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য—সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়। সমাজকে মাত্র জড়বাদের ভিত্তিতে সংগঠন করা অপেক্ষা এ কম বিপজ্জনক নয়। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে স্বামীজী বলেছেন, "পাশ্চাত্য জগৎ শাইলকদের স্বৈরাচারে এবং প্রাচ্য দেশসমূহ যাজকদের স্বৈরাচারে পরিত্রাহি চীৎকার করছে ; প্রয়োজন হ'ল একের দ্বারা অপরের নিয়ন্ত্রণের। ভেব না যেন কোনটাই এককভাবে জগৎকে রক্ষা করতে পারবে"। ("The West is groaning under the tyranny of the Shylocks and the East is groaning under the tyranny of the priests ; each must keep the other in check. Do not think that one alone is to help the world".) [৯]

অতএব, নির্দেশ হ'ল একাভিমুখিতাকে পরিহার করে জড়বাদ ও আধ্যাত্মিকতা উভয়েরই ভিত্তিতে সমাজ সংগঠন করা। এই সমন্বয়কে 'মর্যাদাপূর্ণ জড়বাদ' (dignified materialim) বলে অভিহিত করা হয়েছে ;[১০] একে আবার আমরা শুদ্ধিকৃত অধ্যাত্মবাদ- (sublimated spirituality) আখ্যাও দিতে পারি।

৫। সামাজিক অপূর্ণাঙ্গতা ও সমাজের পুনরুজ্জীবন

সমাজজীবনকে তীর্থযাত্রার সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই তুলনায় সমাজের পূর্ণাঙ্গতার অভিব্যক্তি সত্যের উপলব্ধি ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না। অন্যভাবে বলতে গেলে, কোন সমাজ সত্যকে কতটা কার্যে রূপায়িত ক'রতে সমর্থ হ'য়েছে তাই তার সার্থকতার মাপকাঠি। স্বামী বিবেকানন্দের নিজের ভাষায়, "সেই সমাজই মহত্তম যেখানে শ্রেষ্ঠ সত্যনিচয় কর্মে রূপায়িত হয়"। (That society is the greatest, where the hightest truths become practical.)[১১] স্বামীজী আরও বলেছেন, "সত্য কোন সমাজকে আনুগত্য জানায় না ; সমাজকেই সত্যের অনুগত হতে হবে। নচেৎ সমাজের মৃত্যু ঘটবে"। ("Truth does not pay homage to any society ancient or modern. Society has to pay homage to truth or die".)[১২] অর্থাৎ সমাজকেই সত্যাভিমুখী হ'তে হবে, সত্য কখনই সমাজাভিমুখী হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন, সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে 'সত্য' (Truth) বলতে ঠিক কি বোঝায় ? এর উত্তর পাওয়া যাবে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য

---

৯ C. W., III, p. 151

১০ অভিহিত করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব। সংবাদে প্রকাশ—তিনি পাকিস্তানের জঙ্গীচক্রের বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী নির্মূল করার পাশবিক ষড়যন্ত্রের বলি হয়েছেন।

১১ C. W., II, p. 85

১২ Ibid, p. 84

বিষয়ের মধ্যেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে, স্বামীজীর মতে, সত্যের মৌলিক উপাদান দুটি : অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐক্যবাদ (unity of existence) এবং মানুষের অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তিতে বিশ্বাস। যে সমাজ বেদান্তের এই দুটি মৌলিক উপাদান বা সারবস্তু মেনে নেয়, সেই সমাজই সত্যের সন্ধানে যাত্রা করেছে বলে স্বীকৃত হবে ; এবং এই সারবস্তুই হ'ল 'শ্রেষ্ঠ সত্য' (highest Truth)।

এই শ্রেষ্ঠ সত্য হতে স্বাভাবিক অনু-সিদ্ধান্ত হিসাবে আরও কয়েকটি মহৎ সত্য নিঃসৃত হয়, যাদের আমরা সামাজিক আদর্শ (social ideals) বলে অভিহিত করি—যথা, সাম্য, বিশ্বজনীন প্রেম, প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা-হীন সেবা ইত্যাদি।[১৩]

এখানে লক্ষণীয় যে, স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদের প্রধান মানবকেন্দ্রিক (anthropo-centric) ব্যাখ্যার মাধ্যমে এক নূতন সমাজ-দর্শনের অবতারণা করেছেন। তাঁর ধারণায় শ্রেষ্ঠ সত্যের উপলব্ধির প্রচেষ্টায় প্রত্যেক সমাজই পূর্ণাঙ্গতার পথে চলেছে। তবে মানুষের অজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রেই এই যাত্রার প্রতিবন্ধকতা করে এবং প্রতিবন্ধকগুলির অপসারণের নামই সমাজের পুনর্নবকরণ (rejuvenati_n)

অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের পুনর্নবকরণ হ'ল সামাজিক ক্ষেত্রে জড়বাদ ও আধ্যাত্মিকতার পরস্পরবিরোধী দাবির সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন। তাঁর ইতিহাসজ্ঞান থেকেই স্বামীজী এই সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, যুগে যুগে ধর্মের স্থানচ্যুতি ও অধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে ; মিথ্যা আদর্শ প্রচারের ফলে সমাজ অকল্যাণকর দ্বন্দ্বসংঘর্ষে ভরে গেছে ; ভারতে বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্যের সময়ের মতো অন্যান্য দেশেও জড়বাদ শঙ্কাজনকভাবে ব্যাপক হ'য়ে উঠেছে।[১৪] কিন্তু স্বামীজীর মতে, ইতিপূর্বে কখনও নগ্ন জড়বাদ সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এরূপ এককভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর মূলে আছে জড়বাদকে বিজ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন বলে কল্পনা করা এবং বিজ্ঞানকেই ধর্ম বা জীবনবেদ বলে গ্রহণ করা। বিজ্ঞানের এই সার্বভৌম প্রকৃতি অবিমিশ্র একাভিমুখিতাই নির্দেশ করে এবং ফলে বিজ্ঞান হ'য়ে দাঁড়ায় মানব-জীবন ও সমাজ-সংগঠন সম্বন্ধে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। অতএব, স্বামীজীর মতে, প্রয়োজন হ'ল বিজ্ঞান ও ধর্মকে একসূত্রে গ্রথিত করা। এর জন্যে আবার প্রয়োজন হ'ল পাশ্চাত্য জগতের ক্ষেত্রে—যেখানে জড়বাদের প্রাধান্য—যুক্তিসিদ্ধ ধর্ম (rationalistic religion) প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা, আর প্রাচ্য জগতে—যেখানে ধর্ম বিকৃত-রূপ সত্ত্বেও সাধারণের জীবন-পদ্ধতির নিয়ামক হিসাবে প্রবর্তিত আছে—ধর্মকে জড়বাদের সংমিশ্রণে যুক্তিসিদ্ধ করে তোলা। অতএব, সমাজের পুনরুজ্জীবন বা পুনর্নবকরণ ব'লতে বোঝায় সমাজের সামগ্রিক ভিত্তির যুক্তিসিদ্ধ-করণ—খণ্ড খণ্ড সমাজসংস্কার নয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, শুদ্ধিকরণ যুক্তিসিদ্ধকরণের প্রক্রিয়াভুক্ত।

৬। যুক্তিসিদ্ধকরণের পদ্ধতি

সমাজের ভিত্তির যুক্তিসিদ্ধকরণ বলতে শুদ্ধিকরণ ও সমন্বয়সাধন বোঝায় বলে যুক্তি-সিদ্ধকরণের পদ্ধতি নির্দেশ করা অতি সহজ—

১৩ C. P. Dr. Roma Choudhuri's article in the C. V.

১৪ C. W., II, pp. 138-39

অর্থাৎ শুদ্ধিকরণ ও সমন্বয়সাধনই যুক্তিসিদ্ধ-করণের পদ্ধতি। অবশ্য পদ্ধতি যে সম্পূর্ণ প্রকার-ভেদবিহীন তা নয়। সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য পদ্ধতিকে অবশ্যই স্থান ও কালের আপেক্ষিক হতে হবে। তবুও কিন্তু মোটামুটি দুটি ফলিত নীতির সমবায়ে গঠিত এক সর্বজনীন পদ্ধতির নির্দেশ করা যায়। নীতি দুটি হ'ল: (ক) বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যের প্রচার এবং (খ) 'ত্যাগ ও সেবা'কে (renunciation and service) সমাজ-জীবনের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা। নীতি দুটি গৃহীত হলে পদ্ধতির বিভিন্নতা সম্পূর্ণ পরিমাণগত হ'য়ে দাঁড়ায়। পাশ্চাত্য জগতে স্বামীজীর ধর্মীয় সত্যের বিশ্বজনীনতা-প্রচার এবং জড়বাদের ওপর আক্রমণ, ভারতে তাঁর সমাজ-সেবার ওপর গুরুত্বদান থেকে মূলত পৃথক নয় এর প্রমাণ মেলে স্বামীজীর নিম্নলিখিত ও অনুরূপ উক্তির মধ্যেই: 'পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রয়োজন হ'ল আরও আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক সভ্যতার, আর আমাদের প্রয়োজন আরও কিছুটা জড়বাদভিত্তিক সভ্যতার' ('The west requires more spiritual civilisation, and we, the more material'.)।[১৫] সমাজের ভিত্তির যুক্তিসিদ্ধকরণ বলতে এরূপ ভারসাম্য আনয়নই বোঝায়, কারণ এর ফলে প্রয়োজনীয় সমাজ-সমন্বয় (social harmony) প্রতিষ্ঠিত বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। একেই বলা হয় সমাজের পুনর্নবকরণ বা পুনরুজ্জীবন (social rejuvenation or regeneration.) এই প্রসঙ্গে স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শের পারস্পরিক পুনরুজ্জীবনে সহায়তার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন যে, উভয় আদর্শের মধ্যেই এমন কিছু মূল্যবান উপাদান আছে যা বর্জনের ফল জগতের পক্ষে শুভ হতে পারে না।[১৬] ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, 'এই প্রত্যয়ই তাঁকে (স্বামীজীকে) প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সামাজিক আদর্শের পার্থক্য-অনুধাবনে বিশেষ ব্যাপৃত রেখেছিল।'[১৭]

একদিক থেকে তত্ত্বটিকে যান্ত্রিক (mechanistic) বলে বর্ণনা করা যায়, কারণ এর বক্তব্য হ'ল যে, মানুষের সচেতন প্রচেষ্টাই সামাজিক উন্নয়নের উৎস। অন্যদিকে অবশ্য তত্ত্বটিকে বেদান্তের প্রতিফলন বলেই গ্রহণ করতে হয়, কারণ মানুষের মর্যাদাবৃদ্ধি তত্ত্বটির তাৎপর্যের একটি বিশেষ দিক।

৭। সমাজ-জীবনযাত্রায় ত্যাগ ও সেবার স্থান

সাধারণ ধারণার বিরোধিতা করে বলা যায় যে, 'ত্যাগ' (renunciation) একটি ব্যাপক আদর্শ যার বিভিন্ন দিক আছে। প্রথমত: ত্যাগ বলতে সংসারত্যাগ বা সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করা বোঝায়। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই আদর্শের মূল্য আপাতদৃষ্টিতে কম, কারণ সামাজিক মূল্যায়নে আদর্শটি নেতিবাচক প্রকৃতির। সুতরাং সমাজ-সচেতন বা সমাজসেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তির কাছে এই আদর্শ আকর্ষণীয় নয়। উদাহরণস্বরূপ, লোকমান্য তিলক মনে করেছিলেন যে, ভগবদ্-গীতা সন্ন্যাসের শিক্ষা দেয় না, অনাসক্তভাবে নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করতেই উপদেশ

---

১৫ C. W., IV. p. 362

১৬ Nevedita: The Master as I Saw Him, p. 324

১৭ Ibid, p. 325

দেয়।[১৮] ত্যাগের দ্বিতীয় অর্থটি সম্বন্ধে সচেতন থাকলে লোকমান্য তিলক সন্ন্যাসের সঙ্গে সমাজ-সেবার পূর্ণ সঙ্গতির সন্ধান পেতেন। এই দ্বিতীয় অর্থে ত্যাগ বলতে বোঝায় আত্ম-বিলোপ (self-effacement)—স্বত্বাধিকারের সকল ধারণাকে সম্পূর্ণ বর্জন করা, এমনকি স্বর্গসুখের আশাকেও সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া। অতএব, ত্যাগের মূলতত্ত্ব হ'ল চরম স্বার্থহীনতা (perfect unselfishness), বৌদ্ধরা যাকে 'আকাঙ্ক্ষার নির্বাণ' বলে অভিহিত করেছেন। ব্যক্তিসমূহের ক্ষেত্রে এই সকল আকাঙ্ক্ষার অবসান ঘটলে সমাজের গ্রাসপ্রবৃত্তিও (acquisitive character) লুপ্ত হয়। ফলে যা অবশিষ্ট থাকে তা হ'ল 'সেবা' (service) যাকে সামাজিক ক্ষেত্রে 'পারস্পরিক সহায়তা' (mutual aid) বলে বর্ণনা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের মতে, বিশুদ্ধ পারস্পরিক সহায়তাই পূর্ণাঙ্গ সমাজজীবনের একমাত্র সড়ক। একে অস্বীকার করার অর্থ হ'ল সমাজের পক্ষে অপূর্ণাঙ্গতাকেই আঁকড়ে থাকা।

স্বামীজী আবার পারদর্শিতার প্রত্যেক চূড়ান্ত রূপকেও 'ত্যাগ (renunciation) বলে বর্ণনা করেছেন। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, 'ত্যাগের দ্বারাই, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন দৃঢ়সংকল্পিত প্রচেষ্টার দ্বারাই—নির্জনে একা সাধনায় লিপ্ত থেকে, শ্রান্তিকে নিয়ত সহচর করে, অর্থাৎ বিশ্রামকে উপেক্ষা করে, জর্জ স্টিফেনসন বাষ্পীয় যান-আবিষ্কারে সমর্থ হ'য়েছিলেন' বলে স্বামীজী অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।"[১৯] অতএব, পারদর্শিতা-লাভের জন্য প্রত্যেক প্রচেষ্টা, অবিদ্যাজয়ের প্রত্যেক অভিযানই আত্মকেন্দ্রিক সকল কাজ-কর্মকে পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়—নির্দেশ দেয় আত্মসুখের অন্বেষণে বিরত থাকতে। ফলে 'ত্যাগ' হ'য়ে দাঁড়ায় সমাজকেন্দ্রিক এবং 'সেবা' (service) আখ্যা লাভ করে।

দেখা যাচ্ছে যে, 'ত্যাগ' মূলতঃ সমাজবদ্ধ জীবের জীবনধর্ম, সন্ন্যাসী-ফকিরের আচরণ-বিধিই নয়। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ ক্ষেত্রে উৎকর্ষের শিখরে উঠতে পারে—গৃহীও তাঁর জীবনকে অপরের কল্যাণে উৎসর্গ করতে পারেন।[২০] তিনিও সন্ন্যাসীর মত, যদিও বা ভিন্ন পথে, আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের আদর্শ অনুসরণ করতে পারেন। নাগ মহাশয় বা এ্যালাসিঙ্গা পেরুমল[২১] হ'লেন এইরকমই গৃহী। গৃহী হলেও তাঁরা আদর্শ সন্ন্যাসী।

সুতরাং, সমাজ-জীবনের পথ পরিবর্তন করতে হ'লে এই রকম গৃহীর সংখ্যাবৃদ্ধি করতে হবে, কারণ সমাজ অসংখ্য গৃহী বা গৃহের সমবায়েই গঠিত।[২২] প্রাথমিক কাজ অবশ্য ন্যস্ত থাকবে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের হস্তে যাঁরা তাদের সম্প্রসারণ-সেবাকে (extention service) দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিয়ে 'সমাজের সংশ্লিষ্ট সভ্যগণকে' (associated members) এই নূতন অভিযানে উদ্বুদ্ধ করবেন।

ত্যাগ মানুষকে নির্ভীক করে তোলে এবং ভয়শূন্যতাই হ'ল আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় প্রকার প্রকৃতি-জয়ের মূলমন্ত্র।' মানুষ যতক্ষণ

১৮ Reminiscences of Swami Vivekananda, p. 21

১৯ The Master as I Saw Him, op, cit, p. 21-22

২০ কর্মযোগ—২ (C. W., II, pp. 36)

২১ নাগ মহাশয় ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহী শিষ্য এবং পেরুমল ছিলেন স্বামীজীর অনুরূপ শিষ্য।

২২ বর্তমান ভারত (C. W., IV, p. 451)

পর্যন্ত প্রকৃতির উর্ধ্বে ওঠার প্রচেষ্টা করছে ততক্ষণই সে মানুষ বলে গণ্য হতে পারে'। ("Man is man so long as he is struggling to rise above nature".)[২৩] অতএব, ত্যাগ বা প্রকৃতিজয় মানুষকে মনুষ্য-মর্যাদা দান করে এবং যেহেতু মানুষ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সেইহেতু 'ত্যাগ' এবং ত্যাগের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত 'সেবা' (service) একমাত্র সমাজধর্ম (social religion) বলে গণ্য হ'তে পারে। (ক্রমশঃ)

২৩ C. W., II, pp 64-65

বন্ধনহীন

'অবধূত'

বন্ধন সব ছিঁড়ে ফেল্ ওরে অমৃতের সন্তান
তোর লাগি' আছে চিরযাত্রার রুদ্রের আহ্বান!
　　ঘর নাহি তোর, নাহিরে ঘরনী,
　　দুর্দম বেগে চলে ও তরণী,
বিশ্রামহীন তর্জনে ধায় জীবনের অভিযান,
তোর লাগি' আছে চিরযাত্রার রুদ্রের আহ্বান!
মিথ্যা কোনও ভাষণ যে তোরে শাসন করিতে নারে
সব ভীতি যে রে পরাজিত হল তোর কাছে বারে বারে।
　　ভয় নাই তোর, নাহি রে ভাবনা,
　　তুই ক'রে যাস আপন সাধনা,
তোর নাই লাজ, নাই তোর মান, নাহি তোর অপমান,
তোর লাগি' আছে চিরযাত্রার রুদ্রের আহ্বান!
গতিহীন যারা, নির্জীবসম মৃত্যু-জীবন যাপে
তোর ঐ প্রাণের স্পন্দনে তারা শিহরি' শিহরি' কাঁপে।
　　তোর আশা লয়ে এ পৃথ্বী জাগে,
　　দর্শন সারা বিশ্ব যে মাগে,
চির পুরাতন, যুগে যুগে তোর নব অভ্যুত্থান,
তোর লাগি' আছে চিরযাত্রার রুদ্রের আহ্বান॥
তারুণ্য আর যৌবন তোর চিরদিন জ্বলে দেহে,
তোর ঐ কণ্ঠে মাভৈঃমন্ত্র দুর্দিনে ওঠে গেহে।
　　দুর্জয় তোর নির্ভয় বাণী
　　আসে দুর্বল লজ্জারে হানি'
সবখানে তোর ঠাঁই আছে, তাই এক ঠাঁই নাই স্থান,
তোর লাগি' আছে চিরযাত্রার রুদ্রের আহ্বান॥

কুম্ভমেলা

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অগণিত সম্প্রদায়, বহু ভাষা, নানা জাতি বর্ণ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের মিলনভূমি ভারতবর্ষ। আপাত-দৃষ্টিতে এখানে অনৈক্য, বৈচিত্র্য ও অসংহতি বর্তমান বলিয়া মনে হইলেও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট ইহার ভিতর এক সুদৃঢ় ঐক্যবন্ধন উদ্‌ভাসিত হয়। বহুশাখাপল্লবিত সনাতন ধর্ম—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা বৈদিক ধর্ম— এই বহুধা-বিভক্ত বিচ্ছিন্ন হিন্দুজাতিকে একডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ভারতবাসীর অন্তরে যে মূল সুর অহর্নিশ রণিত হইতেছে তাহা ধর্ম এবং এই ধর্মই বৈচিত্র্য ও বিভেদের মধ্যে সংহতির মূল সূত্র। ত্রিকালদর্শী ঋষি বিবেকানন্দ আসমুদ্রহিমাচল পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ করিয়া, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, অভিজাত অন্ত্যজ সকল শ্রেণীর লোকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়া আবিষ্কার করেন, ধর্মই ভারতের প্রাণ এবং ধর্মের মাধ্যমেই হিন্দু ঐক্যবদ্ধ।

কুম্ভমেলা এই ঐক্যবোধের এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ভারতের সর্বস্থানের মানুষ জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়নির্বিশেষে সাগ্রহে এই মেলায় যোগদানপ্রয়াসী। এতদুদ্দেশ্যে অর্থব্যয়, কায়িক ক্লেশ ও যে-কোনরূপ কৃচ্ছ্রসাধনে বা বিপদ্‌বরণে তাহারা পশ্চাদ্‌পদ হয় না। কি উৎসাহ, উদ্দীপনা, উন্মাদনা! পুণ্যার্থী মুমুক্ষু নরসমুদ্র—এক অপরূপ দৃশ্য! ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় ৪০ লক্ষ লোক-সমাগম হইয়াছিল বলিয়া কথিত। তৎকালীন ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে ইহা প্রতি ১০০ জনের মধ্যে একজনেরও কিঞ্চিৎ অধিক দাঁড়ায়। মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি যাঁহারা হিন্দুধর্মবহির্ভূত অথচ ভারতে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা হিসাব হইতে বাদ দিলে এই সংখ্যা শতকরা প্রায় .ন দাঁড়ায়। বর্তমান বৎসরে যে কুম্ভমেলা প্রয়াগে অনুষ্ঠিত হইয়া গেল তাহা অর্ধকুম্ভ, তথাপি প্রায় আনুমানিক ২৫ লক্ষ লোক এই পুণ্যতিথিতে সমবেত হন। ইহা ভারতের বর্তমান লোকসংখ্যার প্রতি ২০০ জনের মধ্যে প্রায় একজন। কেবল হিন্দুর মধ্যে অনুপাত ধরিলে ইহা দাঁড়াইবে প্রতি ২০০ জনের মধ্যে প্রায় তিনজন। বর্তমান পরিস্থিতি আদৌ তীর্থভ্রমণের অনুকূল নয়, তথাপি এত অধিক জনসমাগম এক বিস্ময়কর ঘটনা এবং কুম্ভমেলার জনপ্রিয়তার নিদর্শন। অদ্যাবধি অন্য কোনও তীর্থক্ষেত্রে এমন বিরাট লোকসমাবেশ অচিন্তনীয়।

এই মেলার উৎপত্তিকাল এবং হেতু নির্ণয় করা অতি দুরূহ। ইতিহাস যেখানে নীরব, কিংবদন্তী যেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করে না, সেই তিমিরাচ্ছন্ন সুদূর অতীতেও এই মেলা অনুষ্ঠিত হইত—এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। তবে প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগেও এই পুণ্যাবগাহন ও মেলার প্রচলন ছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে। বেদে কুম্ভমেলার কোনও উল্লেখ নাই। কাহারও কাহারও মতে বৈদিক মন্ত্রে কুম্ভের নিদর্শন পাওয়া যায়; তবে এ মতের যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না।

কুম্ভের নির্ভরযোগ্য উৎপত্তির কাহিনী স্কন্দপুরাণে এবং দেবাসুর-দ্বন্দ্ব হইতে পাওয়া

যায়। দেবাসুরগণ সম্মিলিতভাবে ক্ষীরসমুদ্র-মন্থনে ব্রতী হন। মন্দর পর্বতকে দণ্ডরূপে, বাসুকিকে রজ্জুরূপে ব্যবহার করিয়া একদিকে অসুরগণ এবং অপরদিকে দেবতাগণ উহার উভয় প্রান্ত ধরিয়া ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিলে সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রথমে বহুবিধ অমূল্য সম্পদ উত্থিত হয় এবং সর্বশেষে ধন্বন্তরী সুধাভাণ্ড হস্তে উত্থিত হন। এই সুধাভাণ্ড বা অমৃতকুম্ভ হইতেই কুম্ভমেলার উৎপত্তি। দেবগণের পরামর্শে অমৃত হইতে দৈত্যকুলকে বঞ্চিত করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত বায়সরূপ ধারণ করিয়া কুম্ভটি চঞ্চুতে গ্রহণ করিয়া পলায়ন করেন। দৈত্যগণ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নির্দেশে এই কুম্ভ উদ্ধার করিবার জন্য জয়ন্তের পশ্চাদ্ধাবন করে। ক্লান্তি-অপনোদনের বা অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য জয়ন্ত চারবার এই কুম্ভটি পৃথিবীর চারিটি স্থানে নামাইয়া রাখিয়া-ছিলেন। স্থান চারটি হইল—প্রয়াগ, হরিদ্বার, নাসিক ও উজ্জয়িনী। দেবগুরু বৃহস্পতির সহায়তায় বায়সরূপী জয়ন্ত এই কুম্ভ দৈত্যকুল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। এই কাজে বৃহস্পতির সহিত রবি এবং চন্দ্রও সহায়তা করেন। এই পরিক্রমার কাল ১২ দিন। দেবতাদের একদিন মানুষের এক বৎসরের সমান। এই অনুপাতে প্রতি ১২ বৎসর অন্তর কুম্ভযোগ মানা হয়। এই চারিটি ধাম হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র এবং এই সকল ধামে পূর্ণকুম্ভযোগে স্নানাদিতে অশেষ পুণ্য লাভ হয়, এমনকি পুনর্জন্ম হয় না, এইরূপ বর্ণনা আছে। বহু পুরাণে কুম্ভস্নানের নানারূপ পুণ্যলাভের বিবরণ রহিয়াছে।

কুম্ভমেলার প্রথম নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বিবরণ চৈনিক পর্যটক হিয়েনসাঙের (Hwen Tsang) লিখিত বিবরণীতে রক্ষিত হইয়াছে। চৈনিক পর্যটক ফা হিয়ান (Fa Hian) যদিও তাঁহার প্রায় কিঞ্চিদূর্ধ্ব ২০০ বৎসর পূর্বে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়া ৪০১ খৃঃ হইতে ৪১১ খৃঃ পর্যন্ত ভারতে অবস্থান করেন এবং গঙ্গাবিধৌত সমতলভূমি পর্যটন করিয়া মগধ পর্যন্ত অগ্রসর হন, তথাপি তাঁহার বিবরণীতে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ বিহারাদি এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের সামান্য সামাজিক প্রথাদি ব্যতীত অন্য কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু হিয়েনসাঙ ৬৩০ খৃঃ হইতে ৬৪৪ খৃঃ পর্যন্ত ভারতের বৌদ্ধ-ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য মধ্য এশিয়ার পথে ভারতে প্রবেশ করিয়া নানাস্থান পর্যটন করেন এবং প্রত্যক্ষদর্শিরূপে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এই চৈনিকের বিবরণে জানা যায় থানেশ্বররাজ শিলাদিত্য (হর্ষবর্ধন) আনুমানিক ৬৪৪ খৃঃ প্রয়াগে কুম্ভমেলায় উপস্থিত ছিলেন। ৭৫ দিন ধরিয়া এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় রাজা অকাতরে বহু ধনরত্ন দান করেন। এমনকি সর্বশেষে তিনি মূল্যবান রাজকীয় ভূষণ দান করিয়া ভগিনী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে একটি সাধারণ পরিধেয় ভিক্ষা করিয়া তাহা পরিয়াই রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। রাজার দানক্রিয়ায় বৌদ্ধ শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, বৈদিক সন্ন্যাসী বা জৈনদের মধ্যে কোনই পার্থক্য লক্ষিত হয় নাই। সকলকেই সমভাবে দান করিয়াছেন। শিলাদিত্য বৌদ্ধ, হিয়েন-সাঙের লেখা হইতে ইহা জানা যায়। তথাপি আনুমানিক ৬৩৪ খৃঃ তিনি বৌদ্ধ মহাসম্মিলন আহ্বান করিলে, সাঙও নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, সেই বৌদ্ধধর্মসভায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

নৈয়ায়িক বৈশেষিক প্রভৃতিও বৌদ্ধদিগের সহিত উপস্থিত ছিলেন এবং অবৌদ্ধ পণ্ডিত সাধুসন্তদেরও সে সভায় নিজ মতামত-প্রকাশের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। সাঙ্গ আনুমানিক ৬৩৬ খৃঃ বল্লভরাজ্যে অনুষ্ঠিত সপ্তদিবসব্যাপী আর একটি মেলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভৌগোলিক স্থাননির্ণয়ে এটিকে নাসিকের মেলা বলিয়া মনে হয়। কারণ বল্লভরাজ্য সুরাটের নিকটে ছিল। আরও জানা যায়, শিলাদিত্য কুম্ভমেলা জনপ্রিয় করিবার জন্য নানা নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্তন করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কুম্ভমেলা অনেকের মতে বৌদ্ধ অনুষ্ঠান। কিন্তু স্কন্দপুরাণ ব্যতীত বামনপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতেও কুম্ভমেলায় স্নানের ফল লিখিত আছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, পৌরাণিক যুগে কুম্ভমেলা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। যানবাহনের যখন অভাব ছিল, পদযাত্রাই যখন তীর্থগামীর একমাত্র সহায়, যখন দুর্গম বন অরণ্য অতিক্রম করিয়া পথ চলিতে হইত, সে-সময় কোন বহুপুরাতন প্রথারই এতটা জনপ্রিয়তালাভে সফল হইবার সম্ভাবনা। অধিকন্তু বৌদ্ধ ও জৈনদিগের কুম্ভস্নানের সার্থকতা কিছুমাত্রও নাই, কারণ তাঁহাদের মতবাদে এই প্রকার অনুষ্ঠানের কোন মূল্য নাই। এসব ভাবিয়া দেখিলে কুম্ভস্নান-বিধি বৌদ্ধদিগের পূর্বেই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, একথা বলা চলে। অবশ্য পুরাণাদি বৌদ্ধযুগের পূর্বে লেখা নয়; পুরাণ পূর্ব হইতেই প্রচলিত কুম্ভস্নানকে শাস্ত্রীয় সমর্থন দিয়াছে বলা চলে—এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। মহাভারতেও সমুদ্রমন্থনকাহিনী রহিয়াছে। মহাভারত প্রাগ্‌বৌদ্ধ হিন্দু তথা ভারতের অবিনশ্বর মহাকাব্য। ইহাতে বৌদ্ধদিগের উল্লেখ নাই, সুতরাং ইহা বৌদ্ধধর্মপ্রচারের পূর্বেই রচিত।

যদিও বৌদ্ধ মতবাদ নৈয়ায়িকগণ খণ্ডন করেন তথাপি তাহা আঞ্চলিক পণ্ডিতগণের বিচারসভাতেই আবদ্ধ ছিল। কুমারিল ভট্ট তাঁহার সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা সহায়ে বৌদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করিতে সফল হন, এবং তাঁহারই সাথে সাথে অমানুষী প্রতিভাশালী, অত্যদ্ভুত সংগঠন-ক্ষমতা-সমন্বিত আচার্য শঙ্কর বৌদ্ধধর্মের মূলে কুঠারঘাত করিয়া বেদান্তসম্মত অদ্বৈতবাদ ভারতে স্থায়িভাবে প্রচলন করেন। এই বেদান্তী সন্ন্যাসী মাত্র ৩২ বৎসর ধরাধামে থাকিয়া ভারতের চারপ্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করেন—উত্তরে জ্যোতির্মঠ, পশ্চিমে দ্বারকায় সারদা মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ ও পূর্বে উড়িষ্যায় গোবর্ধন মঠ। এই চারটি মঠের শঙ্করাচার্য নামে খ্যাত চারজন মঠাধীশের কর্তৃত্বাধীনে এবং তত্ত্বাবধানে দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়—সরস্বতী, ভারতী, পুরী, গিরি, পর্বত, বন, অরণ্য, আশ্রম, সাগর—গঠন করিয়া হিন্দু ভারতের ধর্ম ও পারত্রিক কল্যাণের ধারক ও বাহকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মঠাধীশগণের কর্তৃত্ব সকল সম্প্রদায় কর্তৃক কুম্ভমেলা বিষয়ে মান্য করা হয়। ইঁহারা এই মেলার জন্য নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তদুপরি নানা বিধিও প্রচলিত করেন। এই মেলার কালনির্ণয়ও এই শঙ্করাচার্যদিগের নির্দেশেই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে এবং সকল সম্প্রদায় এই নির্দেশ পালন করিয়া চলে।

জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুযায়ী কুম্ভস্নান-যোগ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রয়াগে কুম্ভযোগ হয় যখন মাঘ মাসে রবি ও চন্দ্র মকর রাশিতে সঞ্চারিত হন। ইহার তিন বৎসর পরে যখন

রবি ও চন্দ্র মেষ রাশিতে এবং বৃহস্পতি কুম্ভ রাশিতে থাকেন, তখন হরিদ্বারে কুম্ভস্নান-যোগ নির্ধারিত হয়। পুনরায় ইহার প্রায় তিন বৎসর ব্যবধানে যখন রবি ও চন্দ্র মেষ রাশিতে এবং বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে সঞ্চারিত হন, তখন নাসিকে কুম্ভস্নানের যোগ। পুনরায় প্রায় তিন বৎসর পরে যখন রবি ও চন্দ্র এবং বৃহস্পতি তুলা রাশিতে সঞ্চারিত হন, তখন কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে উজ্জয়িনীর কুম্ভযোগ মানা হয়।

ত্রিবেণী-সঙ্গম তীর্থরাজ প্রয়াগ। ত্রিলোক-উদ্ধারিণী গঙ্গা নদী, লোকপাবনী তপন-সুতা মহাপাতকনাশিনী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাধন্যা যমুনা, এবং বৈদিক যুগে বহু-প্রসংসিত মুনি-ঋষির সাধনক্ষেত্র, বৈদিক মন্ত্র- ও সামগান-মুখরিত সরস্বতী—এই ত্রিবেণীসঙ্গমে মিলিতা। সরস্বতী লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তিনী, অন্তঃসলিলা।

দ্বিতীয় কুম্ভমেলার স্থান হরিদ্বার, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত। হরিদ্বার বহু প্রাচীন জনপদ। কপিল মুনির নামানুসারে ইহার প্রাচীন নাম কপিল। হিয়েনসাঙ্গ একটি তীর্থ পরিদর্শন করেন যাহা তিনি 'মো-ইউ-লো' নামে লিখিয়াছেন। ইহার নিদর্শন বর্তমান হরিদ্বারের সামান্য দক্ষিণে মায়াপুরে এখনও বর্তমান। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি দুর্গ ও বহু সুন্দর ভাস্কর্যের নিদর্শন-বহনকারী তিনটি মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। বর্তমানে আকর্ষণের বিষয় 'হরিকা চরণ' বা স্নানের ঘাট। এই ঘাটের সংলগ্ন 'গঙ্গাদ্বার' মন্দির। উক্ত মন্দিরের ঘাটের সোপানশ্রেণীর উপর দিকে দেওয়ালে প্রোথিত একটি প্রস্তরে বিষ্ণুর পদচিহ্ন খচিত রহিয়াছে। ইহা তীর্থ-যাত্রী মাত্রেরই বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু। প্রতি বৎসর এই গঙ্গাদ্বার ঘাটে বহু স্নানার্থীর সমাবেশ ঘটে এবং প্রতিকুম্ভে এখানে যাত্রিসংখ্যা অতীতকালেও তিনলক্ষাধিক হইত বলিয়া জানা যায়।

তৃতীয় কুম্ভমেলার স্থান গোদাবরীতীরে অবস্থিত নাসিক। উক্ত নদীর উৎপত্তিস্থল হইতে মাত্র ২০ মাইল দূরে নাসিক অবস্থিত। এই নাসিকই প্রাচীন বল্লভরাজ্যভুক্ত ছিল মনে হয় এবং সাঙ্গ এখানের সপ্তদিবসব্যাপী মেলার কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

চতুর্থ ক্ষেত্র উজ্জয়িনী প্রাচীন অবন্তী নগরী, যাহা বহু প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করিয়া অদ্যাবধি অতীত গৌরবের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। উজ্জয়িনী পুরাণবর্ণিত পবিত্র নদী শিপ্রার পূর্বতীরে অবস্থিত। এককালে ইহা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল।

পুরাণে বর্ণিত আছে, হিন্দুদিগের সকল তীর্থ ও স্নানাদি অপেক্ষা কুম্ভস্নান অধিক জনপ্রিয় এবং পুণ্যপ্রদ। দেখা যায় যাত্রি-সমাগম এই মেলায়ই সর্বাধিক হয়। এই মেলা ও স্নানের মূল্য অনেক, সন্দেহ নাই। কিন্তু পুণ্যসঞ্চয় বা পারত্রিক কল্যাণের কথা ছাড়িয়া দিলেও জাগতিক কল্যাণ ও উপযোগিতা হিসাবেও ইহার অবদান অশেষ। এখানেই ভারতের পরিচয়লাভের প্রকৃষ্ট সুযোগ ঘটে। বিভিন্ন আঞ্চলিক আচার আচরণ সংস্কৃতি ও ভাষার সমাবেশ ঘটে এই মেলাক্ষেত্রে; সুতরাং একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সর্বভারতীয় মানুষ একই ক্ষেত্রে ভাব ও সংস্কৃতির আদানপ্রদানের সুযোগ লাভ করে। এক কথায় এই মেলা ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী বহুবিভক্ত সম্প্রদায় ও নানা জাতি-বর্ণের এক মহা সম্মেলনভূমি—ভারতীয় জাতি ধর্মের এক পবিত্র সঙ্গমক্ষেত্র।

যে-সকল সম্প্রদায় হিন্দুধর্মেরই শাখা বলিয়া গৌরব করেন, তাঁহাদের সকলেরই নিকট এই কুম্ভমেলায় যোগদান করা এক মহাপুণ্য কর্ম বলিয়া বিবেচিত। এমন কি সকল সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসী ব্যতীতও লোকালয় হইতে বহু দূরে গিরিকন্দরে তপস্যা-রত যোগী তপস্বী সকলেই কুম্ভস্নানে যোগদান করা কর্তব্য জ্ঞান করেন। সুতরাং সকল সম্প্রদায় একই লক্ষ্যাভিমুখে এই মহামিলন-ক্ষেত্রেই সম্মিলিত হয়। বহু অনৈক্য বর্তমান থাকিলেও সকলে এখানে সব বিভেদ ভুলিয়া যায়, সকলের মধ্যেই আত্মীয়তা ও সংহতিবোধ জাগরিত হয়। জাতিবিচার, ছুত-অচ্ছুত-বিচার শিথিল হইয়া যায়, অনুভূতি জাগে—আমরা সকলেই আপন জন। বিধানসভার আইনে যাহা সম্ভব হয় নাই, মঞ্চ হইতে পাণ্ডিত্য-ও নৈপুণ্যপূর্ণ বক্তৃতায় যাহা করা যায় নাই, এই পুণ্যক্ষেত্রে তাহা অবলীলাক্রমে স্বাভাবিকভাবে সিদ্ধ হয়। জনসাধারণ এই মিলনক্ষেত্রে স্বকীয় ভাবানুযায়ী যে-কোন সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভ করিয়া ধর্মপিপাসা মিটাইবার সুযোগ পায়। মোট কথা এই, কুম্ভমেলা ভারতের সমাজ-ধর্মীয় (socio-religious) মহাজাতীয় সম্মেলন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

মুসলমান ও ইংরেজ শাসনকালেও ভারতে এই প্রথা অব্যাহত ছিল, বহু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও এই কুম্ভস্নান লোপ পায় নাই, ইহার জনপ্রিয়তাও কমে নাই। কিন্তু আশঙ্কা জাগে, বিদেশী শাসনে যাহা সম্ভব হয় নাই, স্বাধীন ভারতের ধর্মহীন শিক্ষায়, নির্বিচারে জড়বাদ-ভিত্তিক পরমতগ্রহণ ও পরানুকরণপ্রিয়তায় জাতীয় দেহে যে বিষক্রিয়া শুরু হইয়াছে, তাহাতে ভারতের প্রাণ যে ধর্ম, তাহার বিনাশে ভারত কি মরিয়া যাইবে? এই আশঙ্কাসঙ্কুল বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র আশার আলোক ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের অমোঘ বাণী,—"তাহা কখনই হইতে পারে না।"

"যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের সেবা সর্বাগ্রে করিতে হইবে—জগতের জীবগণের সেবা আগে করিতে হইবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা ভগবানের দাসগণের সেবা করেন, তাঁহারাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দাস।

…আর যদি কেহ স্বার্থপর হয়, সে যদি পৃথিবীতে যত দেবমন্দির আছে, সব দেখিয়া থাকে, সব তীর্থ দর্শন করিয়া থাকে, সে যদি [ফোঁটা কাটিয়া] চিতাবাঘের মত সাজিয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলেও সে শিব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ : 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান ও ধর্ম

স্বামীজীর অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান' গ্রন্থে তরুণ নরেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে লিখেছেন—"এই সময় নরেন্দ্রনাথ বিশেষ কিছু হিন্দু-ধর্মগ্রন্থ না পাওয়ায়, হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্টুয়ার্ট মিল-এর গ্রন্থসমূহ অত্যধিক পাঠ করিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ, স্পেন্সার ও মিলের গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলের সহিত খুব তর্ক করিত। এমন কি, পাদরীদের সহিত সমানভাবে তর্ক করিত।"[১]

হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ নরেন্দ্রনাথ তরুণ বয়স থেকেই পড়েছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিক-মতবাদের তিনি আগ্রহী পাঠক। সমকালীন তরুণ ছাত্রদের মধ্যে পাশ্চাত্যদর্শনচর্চা সেকালে বিশেষ রেওয়াজ ছিল। সে তুলনায় ভারতীয় দর্শন খুব কমই পড়া হতো। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতাবলীতে পাশ্চাত্য-দর্শনের সঙ্গে প্রাচ্যদর্শনের তুলনামূলক আলোচনায় যে পারঙ্গমতা দেখিয়েছিলেন তার মূলে তাঁর তরুণবয়সের দর্শনপ্রীতি।

স্পেন্সারের শিক্ষাচিন্তায় বিজ্ঞানের বিশিষ্ট স্থান এবং এই বিজ্ঞানসচেতনতাই স্পেন্সারের ধর্মচেতনার পটভূমি। স্বামী বিবেকানন্দ সমকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও আবিষ্কারের বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু। তরুণ বয়সে স্পেন্সারের চিন্তাধারায় ধর্ম ও বিজ্ঞানের যে সূক্ষ্ম যোগসূত্র তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর ধ্যানধারণায় সে সম্বন্ধে আরো গভীর ও ব্যাপক উপলব্ধি ঘটেছে। প্রধানতঃ ধর্মসাধনাই তাঁর জীবনের অবলম্বন হ'লেও বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর সদাজাগ্রত কৌতূহল ও অধ্যাত্মজগতের সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্তরঙ্গসম্বন্ধ-বিষয়ে প্রতীতি তাঁকে আধুনিক পৃথিবীর মৌলিক চিন্তানায়কদের অন্যতম করে তুলেছে।

'শিক্ষা' গ্রন্থের 'সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি?'—নামে সূচনা অধ্যায়ের সর্বশেষপ্রান্তে বিজ্ঞান ও ধর্মের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে স্পেন্সারের বক্তব্য (স্বামীজীর দ্বারা অনূদিত)—"…বিজ্ঞানই যথার্থ ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। অবশ্য, এস্থলে ধর্মশব্দ অতি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইল। সত্য বটে, ধর্মনামের আবরণে যে-সকল কুসংস্কার মনুষ্যসমাজে প্রচলিত আছে, বিজ্ঞান তাহাদিগের বিপক্ষ, কিন্তু একবার বিজ্ঞানের গাম্ভীর্যে উপনীত হও, অমনি দেখিবে, 'যথার্থ বিজ্ঞান এবং যথার্থ ধর্ম যমজ ভগিনী, তাহাদিগকে বিশ্লিষ্ট কর, উভয়েই মরিবে। যে পরিমাণে ধর্ম মিশ্রিত হইবে, সেই পরিমাণে বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে; যে পরিমাণে বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত হইবে, সেই পরিমাণে ধর্মও অটল হইবে। বিখ্যাত পণ্ডিতেরা যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা কেবল বুদ্ধিবলে নহে, কিন্তু সেই বুদ্ধি ধর্মের দ্বারা প্রচলিত হইয়া সম্পন্ন করিয়াছে। তাঁহাদিগের যুক্তি এবং তর্ক অপেক্ষা তাঁহাদিগের অধ্যবসায়, তাঁহাদিগের প্রেম, তাঁহাদিগের নিরপেক্ষতা এবং তাঁহা-

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান : মহেন্দ্রনাথ দত্ত : পৃ : ২০

দিগের স্বার্থত্যাগে বশীভূত হইয়া সত্য তাঁহাদিগের হস্তগত হইয়াছে,'—প্রোফেসর হাক্সলি এই কথা বলেন।"[২]

সব ধর্মমতেরই অন্তরালে যুক্তি ও সাধনার একটি স্তরপরম্পরা আছে। আমরা সেটিকেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বলতে পারি। কিন্তু বহির্বিজ্ঞান ও অন্তর্বিজ্ঞানের পন্থা যে বিভিন্ন তাতে সন্দেহ নেই। এদিক থেকে পরবর্তীকালে লণ্ডনে প্রদত্ত স্বামীজীর একটি বক্তৃতার অংশবিশেষ স্মরণীয়—"বিজ্ঞানের গতি কোন্ দিকে, তাহা কি আপনারা বুঝিতেছেন না? ইউরোপীয়েরা বহিঃপ্রকৃতির আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। হিন্দুজাতি মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে দর্শনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। এখন উভয়ে এক স্থানে পৌঁছিতেছেন। মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা সেই অনন্ত সার্বভৌম সত্তায় পৌঁছিতেছি—যিনি সকল বস্তুর অন্তরাত্মা, যিনি সকলের সার ও সকল বস্তুর সত্যস্বরূপ, যিনি নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দময় ও নিত্যসত্তাস্বরূপ। জড়বিজ্ঞানের দ্বারাও আমরা সেই একই তত্ত্বে পৌঁছিতেছি। এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই একেরই বিকাশ—তিনি জগতে যাহা কিছু আছে, সেই সকলেরই সমষ্টিস্বরূপ।"[৩]

২ 'শিক্ষা': স্বামী বিবেকানন্দ-[অনূদিত]। শশিভূষণ দত্ত-মুদ্রিত সংস্করণ; পৃঃ ৪২-৪৩ হার্বার্ট স্পেন্সারের মূল গ্রন্থের ভাষা—Lastly we have to assert—and the assertion will, we doubt not, cause extreme surprise—that the discipline of science is superior to that of our ordinary education because of the religious culture that it gives. Of course we do not here use the words scientific and religious in their ordinary limited acceptations, but in their widest and highest acceptations. Doubtless, to the superstitions that pass under the name of religion, science is antagonistic; but not to the essential religion which these superstitions merely hide. Doubtless, too, in much of the science that is current, there is a pervading spirit of irreligion; but not in that true science which has passed beyond the superficial into the profound.

"True science and true religion", says Professor Huxley at the close of a recent course of lectures, "are twin sisters, and the seperation of either from the other is sure to prove the death of both. Science prospers exactly in proportion as it is religious, and religion flourishes in exact proportion to the scientific depth and firmness of its basis. The great deeds of philosophers have been less the fruit of their intellect than of the direction of that intellect by an eminently religious tone of mind. Truth has yielded herself rathar to their patience, their love, their single-heartedness, and their self-denial, than to their logical acumen." Education : Spencer : 1st Edn. : p 50 লক্ষণীয়, স্বামীজীর অনুবাদ অনেকটা সংক্ষেপিত।

৩ বাণী ও রচনা : ২য় খণ্ড : জ্ঞানযোগ : ব্রহ্ম ও জগৎ : পৃঃ ১০৫ Complete Works of S. Vivekananda : Vol. II : Jnanayoga : The Absolute and Manifestation : Centenary Edn. : pp 140-151

মূলতঃ অদ্বৈত বেদান্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েই স্বামীজী ধর্ম ও বিজ্ঞানকে মেলাতে পেরেছেন। স্পেন্সার অবশ্যই সেদিক থেকে চিন্তা করেননি। কিন্তু যথার্থ ধর্ম যে বিজ্ঞানের যুক্তিবাদকে স্বীকার করেই গড়ে ওঠে, এ বিষয়ে স্পেন্সারের দূরদৃষ্টি নিশ্চয় প্রশংসনীয়। তরুণ নরেন্দ্রনাথ স্পেন্সারের এই চিন্তাধারার দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের মূলগত ঐক্যনির্ণয়ে স্পেন্সারের চিন্তার ইঙ্গিতকে আরো পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক আকার দিয়েছেন। অধ্যাপক হাক্স্‌লির মন্তব্য উদ্ধৃত করে স্পেন্সার যে শুষ্ক যুক্তিবাদের ঊর্ধ্বে বৈজ্ঞানিকের সত্যানুসন্ধানে ত্যাগ, নিষ্ঠা, অনুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তার সঙ্গে ধর্মসাধকের ভাবনাজগতের মিল তো বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিবেদিতপ্রাণ অধ্যাত্ম-সাধক, বিজ্ঞানগবেষক বা সমাজসেবী—সকলেরই মধ্যে অন্তরধর্মের গভীর মিল নিশ্চয় আছে।

তবু প্রশ্ন ওঠে, বিজ্ঞান এবং ধর্মের সাধনায় পার্থক্যও কি অনেকখানি নয়? ধর্ম যে কারণে বিজ্ঞানকেও ধর্মসাধনার অঙ্গ মনে করতে পারে, ঠিক তেমনিভাবে বিজ্ঞান কি ধর্মকে নিজের অঙ্গীভূত করে নিতে পারে? জগদীশচন্দ্র বা আইনস্টাইনের ব্যতিক্রমী উদাহরণ ছাড়া এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজ খুব বেশী অগ্রসর হতে পেরেছেন কি? বস্তুজগতের ঐক্যধারণা এবং অধ্যাত্মজগতের ঐক্যধারণা ঠিক একই ধরনের উপলব্ধিতে এসে মেলা কি সম্ভব?

এ-জাতীয় প্রশ্নের সম্ভাবনা ভেবেই স্পেন্সারের বক্তব্য [৪]—"বিজ্ঞান মানবের ধর্মভাব হ্রাস করে—এ সকল অতি অযৌক্তিক কথা। মনে করুন, একজন গ্রন্থকারের সকলে প্রশংসা করিতেছে, শব্দসাগর মন্থন করিয়া, সুমিষ্টতাগন্ধ নিষ্কাশন করিয়া তাঁহাকে উপহার দিতেছে, কিন্তু কেহই তাঁহার পুস্তকের এক পঙ্‌ক্তিও পাঠ করে নাই। এই ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত হইতে উচ্চতম দৃষ্টান্তে উঠা যাউক। বিশ্বপতির অখণ্ড ঐশ্বর্যের এক কণামাত্রও যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের প্রশংসা অধিক গ্রাহ্য—না, যাঁহারা বিজ্ঞান লইয়া দিবারাত্র তাঁহার মহিমা-অন্বেষণে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছেন, তাঁহাদের প্রশংসা হৃদয়ের অভ্যন্তরভাগ হইতে উঠে? শুদ্ধ ইহাই নহে; বৈজ্ঞানিকই যে কেবল ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতে

৪ মূল ইংরেজীর কিছু অংশ—"So far from science being irreligious, as many think, it is the neglect of science that is irreligious—it is the refusal to study the surrounding that is irreligious. Suppose, a writer was daily saluted with praises couched in superlative language. Suppose the wisdom, the grandeur, the beauty of his works, were the constant topics of the eulogies addressed to him. Suppose those who unceasingly uttered those eulogies on his works were content with looking at the outsides of them; and had never opened them, much less tried to understand them. What value should we put upon their praises? What should we think of their sincerity! Yet, comparing small things to great, such is the conduct of mankind in general, in reference to the universe and its cause.····

Education : Spencer : 1st Edn. : pp 50-51

সমর্থ, তাহা নহে, দিবানিশি নিয়মাবলীর আলোচনা করিয়া, তাহাদের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য, অসীম দয়াভাব, অথচ অপ্রতিহত অবশ্যম্ভাবী ফল চিন্তা করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রত্যেক সুকার্য-কুকার্যের ফল অনিবার্য বলিয়া অপেক্ষা করে, অথচ সমস্তই মঙ্গলের নিমিত্ত ঘটিতেছে, তাহা মনে করিয়া আনন্দিত হয়। বিশেষতঃ এই অনন্ত দুর্ভেদ্য জগতের মধ্যে আমরা কে এবং অগণ্য সত্তা-পূর্ণ জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধই বা কি, বিজ্ঞান ইহাও স্থির করে।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানচেতনায় বিশ্ব-রহস্যের যে বিস্ময়বোধ পাশ্চাত্য-মানসে দেখা দিয়েছিল, স্পেন্সারের চিন্তাধারায় তার সুন্দর সাক্ষ্য। বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত কবিত্ব ও বিশ্ব-স্রষ্টার উপস্থিতির অনুভবে স্পেন্সার অনেক পরিমাণেই তরুণ নরেন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিজ্ঞানই পরমসত্যলাভের একমাত্র পন্থা নয়—নানা পন্থার অন্যতম পন্থামাত্র। যাঁরা বিজ্ঞানের অত শত খুঁটিনাটি তথ্যের খবর রাখেন না, তাঁরাও সৌন্দর্যবোধ, ভক্তিতন্ময়তা ও শিল্প-দৃষ্টির সহায়তায় অনন্ত সত্যের জগতে উপনীত হ'তে পারেন। যেটুকু বস্তুজ্ঞান মানুষের প্রয়োজন তার জন্য সকলেরই বৈজ্ঞানিক হবার প্রয়োজন নেই, বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রগুলি জানাই তার পক্ষে যথেষ্ট। অপরপক্ষে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনেক পরিমাণে জেনেও বাস্তব-ক্ষেত্রে বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োগ যে সবসময় ঘটে না, তার প্রচুর দৃষ্টান্তই এদেশে ওদেশে মেলে। মানব-অন্তরের গভীরতম উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান সামান্য পরিমাণে বহিরঙ্গ দিক নির্দেশ করতে পারলেও, অধ্যাত্মসাধনার যুগযুগান্তরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার তুলনায় তা কিছুই নয়।

বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসম্পন্ন স্পেন্সার যে মূলতঃ ভক্ত, সে কথা বোঝা যায়. ঈশ্বরের অসীম দয়া ও সব কিছু যে মঙ্গলের জন্য ঘটছে—এই বিশ্বাস তিনি বিজ্ঞানচর্চা থেকেই লাভ করেছেন। এক্ষেত্রে জ্ঞানের উপরে জয়ী হয়েছে তাঁর ভক্তি। [ক্রমশঃ]

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক

স্বামী চেতনানন্দ

'রঙ্গালয় জাতির দর্পণস্বরূপ'। কোন জাতির চিত্তের ও সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় মেলে তার রঙ্গালয় থেকে। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের পাতাগুলি ধর্মের দ্বারা পরতে পরতে জড়ান এবং সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় বাসে বাসিত। কুশিক্ষা, কুপ্রবৃত্তি বা নীচ সংসর্গে পড়ে মানুষ সাময়িকভাবে মুগ্ধ থাকতে পারে, কিন্তু শুভের সংযোগ ঘটলে ঐ মোহ বিদূরিত হয়। তখন চিরলম্পট বিল্বমঙ্গল উন্মত্ত হয়ে পরম প্রেমময়ের সন্ধানে ছোটে, দস্যু অঙ্গুলিমাল বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে অহিংস হয়, ঘোর পাষণ্ড জগাই-মাধাই দুহাত তুলে নগরকীর্তন করে।

যাহোক নাট্যজগতের ক্রমবিকাশের ধারা দেখলে মনে হয় যে তার প্রথম স্তরে ছিল দেবলীলা (mystery), দ্বিতীয় স্তরে ছিল দেবোপম মানবচরিত্র-বিষয়ক কাহিনী (miracle), এবং তৃতীয় স্তরের বিষয়বস্তু ছিল সাধারণ মানবজীবন। ক্রমে Morality নামক রূপক নাটকের আবির্ভাব হয়। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' ঐ শ্রেণীর একখানি রূপক নাটক। এই নাটকটির বিষয়বস্তু চিন্তা করতে গেলে জন বনিয়ানের Pilgrim's Progress-এর রূপক আখ্যানটি আমাদের চোখের সামনে স্বতঃই ফুটে উঠে। মানুষের মনের বৃত্তিগুলি কিভাবে রক্তমাংসের দেহ-ধারিরূপে জীবন্তভাবে ফুঠে ওঠে—এই দুখানি গ্রন্থই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

'প্রবোধচন্দোদয়' নাটকের রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণমিশ্র যতি। ইউরোপে গেটে (Goethe) যেমন একাধারে দার্শনিক ও কবি, শ্রীকৃষ্ণমিশ্রও তেমনি একাধারে কবি ও দার্শনিক। তাঁর নাটকে যুগপৎ রয়েছে কবিত্বের মর্মস্পর্শী ভাব এবং দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টি। শুনা যায় তিনি এই নাটকখানি লিখেই সন্ন্যাসী হয়ে যান। আর একটি কিংবদন্তী আছে যে, শ্রীকৃষ্ণমিশ্র ছিলেন দণ্ডী সন্ন্যাসী এবং অশেষ বিদ্যায় পারদর্শী। তিনি লোককল্যাণেচ্ছায় তাঁর শিষ্যদিগকে অধ্যাত্মশাস্ত্রে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু জনৈক ছাত্র অধ্যাত্মশাস্ত্রে পরাঙ্মুখ ছিলেন এবং কাব্য, অলঙ্কার ও নাটকাদি-পাঠে তন্ময় থাকতেন। এই ছাত্রটিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য সুনিপুণ গুরু বেদান্তসিদ্ধান্তের সার সংগ্রহ করে রসিকগণের চিত্তহরণকারী, কবিত্বপূর্ণ, সর্বরসে আপ্লুত, নাট্যগুণ-সমন্বিত এবং জীবন্মুক্তি-প্রদায়িনী এই সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক প্রণয়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের প্রতিভা ইউরোপীয় পণ্ডিতদেরও প্রশংসা পেয়েছে। Mac Donell সাহেব History of Sanskrit Literature গ্রন্থে লিখেছেন : 'Deserves special attention as one of the most remarkable products of Indian Literature. It is remarkable for dramatic life and vigour.'

কোন নাটকের বিষয়বস্তু উল্লেখ করবার পূর্বে পাত্রপরিচয় দেওয়ার রীতি আছে। প্রথমতঃ এরকম নাটক একরকম নাই বললে চলে, এবং দ্বিতীয়তঃ মনের বৃত্তিগুলি পরস্পর কার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত—তা দেখাবার জন্য আমরা এই নাটকের পাত্রপরিচয়টি তুলে ধরছি।

পাত্রপরিচয়

সূত্রধার—নাটকাচার্য
নটী—সূত্রধারের স্ত্রী
বিবেক—প্রধান নায়ক
মতি—বিবেকের স্ত্রী
উপনিষৎ—বিবেকের দ্বিতীয় স্ত্রী
পুরুষ—বিবেকের পিতামহ
বস্তুবিচার ও সন্তোষ—বিবেকের সহচর
প্রবোধচন্দ্রোদয়—বিবেকের পুত্র
শ্রদ্ধা—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী (তিন প্রকার)
শান্তি—বিবেকের ভগ্নী
করুণা—শান্তির সখী
বিষ্ণুভক্তি—উপনিষদের সখী
ক্ষমা—বিবেকের দাসী
বৈরাগ্য—মনের নিবৃত্তিপক্ষের পুত্র
নিদিধ্যাসন—বিষ্ণুভক্তির আত্মীয়
পারিপার্শ্বিক, প্রতিহারী ও অন্যান্য
মহামোহ—বিবেকশত্রু, মনের প্রবৃত্তিপক্ষের পুত্র এবং প্রবৃত্তিপক্ষের রাজা
চার্বাক—মহামোহের অনুচর
কাম—মনের প্রবৃত্তিপক্ষের পুত্র ও মোহের অনুচর
ক্রোধ—মনের প্রবৃত্তিপক্ষের পুত্র ও মোহের অনুচর
অহঙ্কার—মনের প্রবৃত্তিপক্ষের পুত্র ও মোহের অনুচর
লোভ—অহঙ্কারের পুত্র ও মোহের অনুচর
দম্ভ—লোভের পুত্র ও মোহের অনুচর
মন—পুরুষের পুত্র
সংকল্প—মনের মন্ত্রী
দিগম্বর, ভিক্ষুক, ক্ষপণক, কাপালিক—বিভিন্ন-মতাবলম্বী ও মোহের অনুচর
—মহামোহের পত্নী
বিভ্রমাবতী—মিথ্যাদৃষ্টির সহচরী
রতি—কামপত্নী
হিংসা—ক্রোধপত্নী
তৃষ্ণা—লোভপত্নী
বটু, দৌবারিক ও অন্যান্য।

প্রবোধচন্দ্রোদয়ের পাত্রপরিচয় দৃষ্টে মনে হয় এই নাটকটির অভিনয় বিভিন্ন ভঙ্গীতে আমাদের মনোমঞ্চে অহরহ অভিনীত হচ্ছে; এই নাটকের নট-নটীরা যেন সত্যিকারের বাস্তবদেহধারী।

সংস্কৃত নাটকের প্রারম্ভে নান্দীপাঠের বিধান আছে। নান্দী হল নির্বিঘ্নে নাটকটির পরিসমাপ্তির জন্য মঙ্গলাচরণ। তারপর নাট্যাচার্য সূত্রধার এসে নাটকের রচয়িতা, কোথায় কিভাবে অভিনয় করতে হবে, নাটকের বিষয়বস্তু ইত্যাদি শ্রোতাদের অবগত করান এবং নিজস্ত্রী নটীকে (কোথাও বা পারিপার্শ্বিককে) কিভাবে নাটকটি মঞ্চস্থ করতে হবে তার নির্দেশ দেন। তারপর নাটকটি আরম্ভ হয়। সংস্কৃত নাটকের ভূমিকার এরূপ অবতারণা কেবল কৌতূহল-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, কারণ কৌতূহলী মনই অধিক রসাস্বাদের অধিকারী হয়।

প্রথম অঙ্ক: সংসারাবতার

সূত্রধার মহারাজ শ্রীকীর্তিবর্মার সামনে নাটকটি অভিনয়ের জন্য নটীকে আদেশ দিলেন এবং বিবেকের কাছে মহামোহের পরাজয়ের উল্লেখ করা মাত্র কাম ও রতি নেপথ্য থেকে ক্রোধে চীৎকার করে উঠল, 'আরে পাপিষ্ঠ নটাধম! কি? আমরা বেঁচে থাকতে বিবেকের কাছে আমাদের প্রভু মহামোহের পরাজয়ের কথা বলছিস?' সূত্রধার ও নটীর প্রস্থান এবং কাম ও রতির প্রবেশ। আরম্ভটির ভঙ্গিমা সুন্দর ও নাটকীয়।

এই অঙ্কে কাম ও রতির এবং বিবেক ও মতির বার্তালাপ দর্শনশাস্ত্রের নিগূঢ় রসে রঞ্জিত। নাটকটির ভাষা ঘরোয়া, তাই মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে।

এ জগতে পুরুষ নারীর কাছে আপন খ্যাতি খ্যাপন ক'রে গর্ববোধ করে, তেমনি কাম নিজস্ত্রীর কাছে বলে চলল আপন মহিমা—ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা পর্যন্ত তার দ্বারা কিভাবে পরাভূত হয়েছে! তারপর কাম মহামোহের অনুচর মদ, মান, দম্ভ, লোভাদি এবং বিবেকের অনুচর যম, নিয়ম, শম, দমাদির কথা বলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মার্গের উৎপত্তি কি করে হয়েছে, বলল: 'মায়াতে ঈশ্বরের যোগ হয় এবং মন নামক পুত্রের জন্ম হয়। ঐ মনের দুটি ধর্মপত্নী—তাদের নাম প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিকুলের রাজা মহামোহ এবং নিবৃত্তিকুলের রাজা বিবেক।' রতি—'হে নাথ, যদি তোমাদের জনক একই হল, তবে ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া কেন?' কাম—'সহোদরদের মধ্যে বিবাদ, এটা জগতে প্রসিদ্ধি আছে। আর তা ছাড়া, আমরা এই সুন্দর ভোগ্যপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করেছি, আর বিবেক এসে সে-সব ধ্বংস করে দিতে চায়? কি আস্পর্ধা! তবে কি জান—এরূপ একটা জনশ্রুতি আছে যে, বিবেক নিজ পত্নী উপনিষদ্ দেবীতে প্রবোধচন্দ্র এবং তার ভগ্নী বিদ্যার উৎপাদন করবেন। এরাই আমাদের এ কুল ধ্বংস করবে তবে ঐ পাপিষ্ঠদের ভয় পেয়ো না।'

এমন সময় বিবেক ও মতির প্রবেশ। সরলা মতি নিজ স্বামীর কাছে যে প্রশ্ন করছে সেটি অদ্বৈতবেদান্তের সনাতন প্রশ্ন: 'নাথ, শুনেছি নাকি পরমেশ্বর সহজানন্দ, সুন্দর-স্বভাব, নিত্যপ্রকাশমান, আর সকল ভুবনেই তাঁর প্রভাব দীপ্যমান, তবে কি প্রকারে এই দুর্বৃত্তেরা (কামক্রোধাদি) তাঁকে বেঁধে মহামোহসাগরে নিক্ষেপ করলে বল দিকি?' বিবেক উত্তর দিচ্ছেন—'প্রিয়ে, এ তত্ত্ব বিচারের অগম্য; বেশবিলাসিনী যেমন নানাপ্রকার ভাবভঙ্গির দ্বারা পরপুরুষকে বঞ্চনা করে, সেরূপ কুহকিনী মায়াও অলীক সত্তার দ্বারা আত্মাপুরুষকে বঞ্চনা করে। দুশ্চারিণী, পিশাচিনী মায়া কখনও সম্মোহিত করে, কখনও আনন্দ দেয়, কখনও বিড়ম্বনা ঘটায়, কখনও তাড়িত করে, কখনও বা খেলায়, কখনও বা সুখ-দুঃখ দেয়। অঘটন-ঘটনপটীয়সী এই মায়া!'

তারপর উদারমনা মতি আপন সতীন উপনিষদের উপর কোন বিদ্বেষ না রেখে স্বামীকে প্রবোধচন্দ্রের জন্মের জন্য উৎসাহিত করলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক: মহামোহ প্রধান:
দৃশ্য—কাশী

জ্ঞানের অন্তরায় যে অজ্ঞান—একথা সবাই জানে, কিন্তু ঐ অজ্ঞান নেপথ্যে থেকে তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে পুরুষকে বাঁধে। বেদান্তাদি শাস্ত্রে সাধারণত: আত্মার উপর মায়ার অধ্যাস কি করে হয় বলে তারপর ঐ অধ্যস্ত অবিদ্যাকে অপবাদ-প্রণালী দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার কৌশল দেখানো হয়। পুরুষ যদি অবিদ্যার ভেল্কি দেখে ফেলে তবে অবিদ্যা লজ্জাবতী লতার মত কুঁচকে মৃতবৎ পড়ে থাকে। এই অঙ্কে জ্ঞানের অন্তরায়গুলিকে সুন্দরভাবে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।

দম্ভ প্রবেশ করে বলছে, 'মহারাজ মহামোহ আমাকে এরূপ আদেশ করেছেন, "বিবেকরাজ অমাত্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে, যাতে প্রবোধ-চন্দ্রের উদয় হয় সে-বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করে,

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সকল তীর্থস্থানেই শমদমাদিকে পাঠিয়েছেন। এখন আমাদের কুলক্ষয় হবার উপক্রম হয়েছে। অতএব এর প্রতিবিধান করা কর্তব্য। আর পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুক্তিক্ষেত্র কাশী নামক নগরীতে গিয়ে, চতুর্বিধ আশ্রমীদের মুক্তিতে যাতে ব্যাঘাত ঘটে, তারই চেষ্টা তোমরা এখন কর।' তাই আমি কাশীকে প্রথম বশীভূত করেছি।'

তারপর অহঙ্কার ঢুকে বলতে শুরু করল: 'কাশীর এ লোকগুলো দেখছি শাস্ত্র বুঝতে পারছে না, বেদের বিপ্লব ঘটাচ্ছে; ভিক্ষালাভের জন্য সাধু সেজেছে আর মূর্খের মত নিজেদের জ্ঞানী মনে করছে। এ সব পাগল দেখছি বেদান্ত শাস্ত্রকে আকুল করে তুলেছে।' ক্রমে দম্ভ ও অহঙ্কারের মিলন হল। সম্পর্কে অহঙ্কার দম্ভের পিতামহ। দম্ভের পিতার নাম লোভ, মাতার নাম তৃষ্ণা এবং পুত্রের নাম অসত্য। দম্ভ অহঙ্কারকে যুদ্ধের সংবাদ দিয়ে বলল যে, তারা মহামোহের আদেশে মুক্তিক্ষেত্র কাশী দখল করে বসে আছে। এই রূপকের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে গভীর সত্য। এখানে 'অজ্ঞান নাটকীয় চরিত্রে রাজা। সেই অজ্ঞানই কাশীরাজ। পাপ, সংশয়, মূর্খতা প্রভৃতি তার বিশ্বস্ত সহচর। অজ্ঞান কাশীরাজ্য অধিকার করে ধর্ম ও উদারহৃদয় রাজা বিবেক-জ্ঞানকে নির্বাসিত করল। কাশী শব্দের অর্থ মুক্তি। কাশ্ ধাতুর অর্থ দীপ্তি। যাতে সব প্রকাশিত হয় তাই কাশী। কাশীই জ্ঞানপুরী। কাশীর রাজা যখন অজ্ঞান তখন বুঝা গেল জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত হল।'

এরপর মহামোহের প্রবেশ। তিনি চার্বাককে (চারু=সুন্দর, বাক্=কথা; যিনি সুন্দর মনভোলানো কথা বলেন তিনিই চার্বাক) তার ভোগ-দর্শনপ্রচারের আদেশ দিলেন যাতে মোক্ষ-দর্শন বেদান্তাদি মাথা তুলতে না পারে। চার্বাকদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়: দেহছাড়া আত্মা বলে পৃথক কিছু নেই। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ; ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোমই তত্ত্ব; এবং এই পঞ্চভূত থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি। পরলোক নাই, মৃত্যুই মুক্তি। সুতরাং যতক্ষণ না মুক্তি আসছে চুটিয়ে ভোগ কর। বেদের কর্তারা সব ভণ্ড, ধূর্ত, নিশাচর। তাদের প্রলাপবাক্য শুনো না। দেহই সব। এরপর চার্বাক মহামোহকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, মহারাজ, আমি থাকতে বিদ্যা ও প্রবোধের জন্ম হবে, এ কথা স্বপ্নেও ভাববেন না।' চার্বাকের মুখ থেকে বিষ্ণুভক্তি নামে মহাপ্রভাবা যোগিনীর কথা শুনে মহামোহ কাম, ক্রোধ, মদ, মান, মাৎসর্য প্রভৃতিকে বিষ্ণুভক্তির উপর চরম অত্যাচার চালাতে নির্দেশ দিলেন। মানবমনে ভক্তি যেন কোমল পাপড়িবিশিষ্ট একটি কুসুম। ঐ কুসুমের উপর ক্ষুদ্র ভ্রমরের পায়ের চাপই বেদনাদায়ক, এবং বজ্রপাত অভাবনীয়। তেমনি ভক্তি-কুসুমের উপর বজ্রসদৃশ রিপুদের চাপ অসহনীয়। অথচ অনাদিকাল ধরে ভগবদ্-ভক্তির উপর অত্যাচার চলে আসছে।

রাজ্যের রাজার মত মহামোহেরও চর আছে। দূতমুখে তিনি খবর পেলেন যে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা ও তাঁর কন্যা শান্তি বৈরাগ্যের সঙ্গে পরামর্শ করে বিবেকের সঙ্গে উপনিষদের মিলন ঘটাতে ব্যস্ত। এ কথা শুনতে পেয়েই রেগে মহামোহ শান্তিকে দমন করবার জন্য ক্রোধ ও লোভকে এবং শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করবার জন্য মিথ্যাদৃষ্টিকে পাঠালেন।

তৃতীয় অঙ্ক: পাষণ্ড-বিড়ম্বন

তৃতীয় অঙ্কটি আপাতদৃষ্টিতে খুব মজাদার ও চপলতাপূর্ণ; কিন্তু এর অন্তরালে লুকিয়ে

রয়েছে শ্রীকৃষ্ণমিশ্রযতির অপূর্ব রচনাশৈলী। বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী জৈন, বৌদ্ধ ও শাক্ত মতবাদীদের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বিবৃত করে তুমুল হাস্যরসের সৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন। অথচ সরাসরি ঐ সব মতবাদের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেননি। বিভিন্ন মতবাদীদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে শুধু মজা উপভোগ করেছেন।

নাটকের রচয়িতা সাধকলোক। তিনি শ্রদ্ধার প্রকারভেদ জানেন। সাধারণ মানুষ যাতে শ্রদ্ধাকে যেখানে সেখানে দেখে বিভ্রান্তির মধ্যে না পড়ে—তা পর্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অঙ্কের প্রারম্ভে সখী করুণাকে সঙ্গে নিয়ে শান্তি নিজের মা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু কোথাও না পেয়ে হাহুতাশ করছেন। তারপর দিগম্বরসিদ্ধান্ত ও বৌদ্ধভিক্ষুর সঙ্গে তামসী শ্রদ্ধা এবং কাপালিক সোমসিদ্ধান্তের সঙ্গে রাজসী শ্রদ্ধাকে দেখে শান্তি আৎকে উঠে সখী করুণাকে জিজ্ঞাসা করে বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠে পরে জানতে পারলেন যে, তাঁর মা বিষ্ণুভক্তির কাছে আছেন এবং এরা সব মহামোহের চর।

চতুর্থ অঙ্ক : বিবেকোদ্যোগ

তৃতীয় অঙ্কের শেষে মহামোহের চরেরা ধর্ম ও সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাকে নস্যাৎ করবার জন্য মহাভৈরবীকে পাঠাল। মহাভৈরবী ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে বিষ্ণুভক্তির কাছ থেকে শ্যেনপক্ষীর মত শ্রদ্ধাকে ছিনিয়ে নিয়ে সবেগে ছুটল। অবশ্য বিষ্ণুভক্তি ব্যাঘ্রীর মুখ থেকে হরিণীর ন্যায় শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে বললেন, 'দেখ শ্রদ্ধে, দুরাত্মা মহামোহ আমাকে বড়ই অবজ্ঞা করে; আমি তাকে সমূলে বিনষ্ট করব। আর তুমি বিবেকের নিকট গিয়ে বল, তিনি যেন কামক্রোধাদিকে জয় করবার জন্য এক্ষুনি উদ্যোগ করেন; তা হলেই বৈরাগ্যের প্রাদুর্ভাব হবে। আমিও প্রসন্ন হয়ে যথাসময়ে প্রাণায়ামাদি দ্বারা তোমাদের সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করব; আর ঋতসম্ভবা প্রভৃতি দেবীরা শান্তি প্রভৃতির দ্বারা বিবেকের সহিত উপনিষদ্ দেবীর মিলনে যাতে প্রবোধের জন্ম হয়, তার উপায় চিন্তা করবেন।'

দ্বিতীয় অঙ্কে আমরা মহামোহের যুদ্ধের তোড়জোড় লক্ষ্য করে এসেছি; আর এ অঙ্কে মহারাজ বিবেকের সমরায়োজন। আমাদের মনের ভিতর দিবারাত্র যে অসুরভাবের সঙ্গে দৈবীভাবের সংগ্রাম চলছে—এ যেন তারই প্রতিচ্ছবি। জ্ঞান আমাদের মনে সদাই রয়েছে কিন্তু আবৃত রয়েছে। তাই ঐ আবরণ সরাবার জন্য চাই প্রস্তুতি। বিষ্ণুভক্তির আজ্ঞায় শ্রদ্ধা বিবেকের কাছে সমর-প্রস্তুতির কথা বললেন। বিবেক মৈত্রী, মুদিতা, দয়া ও উপেক্ষা—এই চার ভাগিনীকে মহাত্মা সাধুদের হৃদয়ে বাস করবার জন্য পাঠালেন।

রাঢ় জনপদে ভাগীরথীতীরে অবস্থিত ভূত-চক্রতীর্থে বিবেক কঠোর তপস্যা করছিলেন উপনিষদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। তিনি গভীর ধ্যানের দ্বারা মহামোহের করাল হাত থেকে পুরুষকে মুক্ত করবার উপায়গুলি উদ্ভাবন করলেন। বিষ্ণুভক্তিও ঐরূপ করতে আদেশ দিলেন। 'প্রায়ঃ সুকৃতিনামর্থে দেবা যান্তি সহায়তাম্' অর্থাৎ কৃতীদের কার্যে দেবতারা প্রায় সহায় হন।

কামই যে মানুষের প্রথম শত্রু। 'কামস্তা-বৎ প্রথমো বীরোঽবস্তুবিচারেণৈব জীয়তে'—শত্রুপক্ষে বীর কামই পয়লা নম্বর দুশমন্; আর সে বেঁচে আছে কেবলমাত্র বস্তুবিচারের অভাবে। তাই বিবেক বস্তুবিচারকে আদেশ করলেন কামকে সমূলে উৎখাত করতে।

বস্তুবিচার বিবেককে জানালেন যে বিষয়বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ যে অনিত্যতা তা উদ্ঘাটিত করে তিনি শাণিত বিচার-বাণের দ্বারা পুষ্পধনু-কামের পঞ্চশর ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেবেন। আর এ কথা বাস্তবিক যে, কোন সৌন্দর্য আছে কিনা তা বিচার না করে কেবল সৌন্দর্যের অভিমানেই হতভাগা কাম বৃদ্ধি পেয়ে জগৎকে বঞ্চনা করছে। রক্ত-মাংস-অস্থি পঞ্জর ক্লেদময় শরীরের উপর সৌন্দর্য অধ্যাসমাত্র, এ সব বলে বস্তুবিচার শত্রুবধে রওনা হলেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা মন্তব্য না করে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে একটু তুলে ধরছি।

"শ্রীরামকৃষ্ণ: বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবানলাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না—এর নাম বিচার; বুঝেচ?

মাষ্টার: আজ্ঞা, হাঁ; **প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক** আমি সম্প্রতি পড়েছি, তাতে আছে 'বস্তুবিচার'।

শ্রীরামকৃষ্ণ: হাঁ, বস্তুবিচার! এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে? বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড়, মাংস, চর্বি…এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?

মাষ্টার: ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ: হাঁ, অবশ্য করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জনে বাস; তাঁর নামগুণগান, এইসব উপায় অবলম্বন করতে হয়।"

রাজা বিবেক ক্রোধজয়ের জন্য ক্ষমাকে আদেশ করলেন। ক্ষমা যাবার সময় বিবেককে বলে গেলেন, মহারাজ, ক্রোধকে জয় করতে পারলেই হিংসা, কঠোরতা, মদ, মান, মাৎসর্যও আপনা হতেই পরাজিত হবে। এরপর লোভকে জয় করবার জন্য সন্তোষের ডাক পড়ল। সন্তোষ তাঁর নিজের অমৃতধারায় লোভকে ভাসিয়ে দেবে—এরূপ বলে লোভ-জয়ের জন্য কাশীধামে যাত্রা করল। কোন দেশ সম্পূর্ণভাবে জয় করতে হলে আগে রাজ-ধানী জয় প্রয়োজন। তাই মানুষের মুক্তিক্ষেত্র কাশীকে জয় করতে রাজা বিবেক বিভিন্ন সৈন্য সমভিব্যাহারে সারথিসহ সাংগ্রামিক রথে উঠে কাশীর দিকে চললেন। রাজা বিবেক যুদ্ধে নাম-বার আগে আদি কেশবকে প্রার্থনা জানালেন:

বৈকুণ্ঠদেব ওগো, করি আমি তোমায় প্রণাম।
সংসার-বন্ধন কাটি, ভকতেরে দাও প্রভু জ্ঞান॥

(ক্রমশ:)

সমালোচনা

India's Contribution To World Thought And Culture (A Vivekananda Commemoration Volume): প্রকাশক : বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল কমিটি, ১২ পিল্লাইয়ার কইল স্ট্রীট, ট্রিপ্লিকেন, মাদ্রাজ ৫ ; পৃ: ৭০৫+৬৮ ; মূল্য ১৫০৲ টাকা।

কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ-শিলা-মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দ-শিলা-স্মারক-সমিতি কর্তৃক গ্রন্থটি প্রকাশিত। বহির্বিশ্বে ভারতের ভাবধারার প্রচারকগণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম, তাই এরূপ একখানি গ্রন্থই তাঁহার স্মারক হিসাবে সর্বাধিক উপযোগী হইবে বলিয়া সমিতির প্রকাশন বিভাগ স্থির করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত ও তাহার সুষ্ঠু রূপায়ণকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

বিভিন্ন সময়ে পর্যটন, উপনিবেশ, স্থল-ও জলপথে বাণিজ্য, বিদেশ হইতে শিক্ষার্থীর আগমন এবং বিদেশে শিক্ষকপ্রেরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের যোগাযোগ অতি প্রাচীনকাল হইতেই। ইহার ফলেই ভারতের ভাবধারা ভারতেতর দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বিশ্বের ধর্ম ও দর্শন-চিন্তাই শুধু সমৃদ্ধ হয় নাই, গণিত, ত্রিকোণমিতি, চিকিৎসাবিদ্যা, স্থাপত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও বিশ্বচিন্তায় ভারত অনেক কিছু দিয়াছে। গ্রন্থটিতে এইসব বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ভারত এবং ভারতেতর দেশের ৭২ জন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত। এম. ডি. খারে, শিগিও কামাতা (Shigeo Kamata—টোকিও), রঘুবীর, দলাই লামা, ডি. দেবাহুতি (কুইন্সল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া), জে. গোণ্ডা (J. Gonda—হল্যাণ্ড), আর. ফ্রান্সিস্কো (ফিলিপাইন) প্রভৃতি আলোচনা করিয়াছেন আফগানিস্থান, মধ্য এশিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান, নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া, মালেশিয়া, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ইওরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার ও প্রভাব এবং তৎসংক্রান্ত বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে। এস. পি. গুপ্ত, পেণ্টি আলটো (Pentti Aalto—ফিনল্যাণ্ড), বি. এ. লিটভিন্স্কি (B. A. Litvinski—রাশিয়া) প্রভৃতি আলোচনা করিয়াছেন রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত মধ্য এসিয়ায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রভাব সম্বন্ধে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ভারতের অবদান-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন বি. ভি. সুব্বারায়াপ্পা, ভারতীয় ভেষজের বহির্বিশ্বে বিস্তার-প্রসঙ্গে জীন ফিলিওজাট (Jean Filliozat—প্যারিস), ভারতের সমুদ্রাভিযান ও নৌবিদ্যা-প্রসঙ্গে এস. আর. রাও এবং কে. এস. রামচন্দ্রন প্রভৃতি। বিবেকানন্দ-শিলা-মন্দিরের পরিকল্পনা, নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বাহান্ন পৃষ্ঠার একটি সচিত্র বিস্তারিত বিবরণ এবং বিবেকানন্দের জীবন ও জীবনোদ্দেশ্যবিষয়ক স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ প্রভৃতি লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধও গ্রন্থটিতে সন্নিবিষ্ট

হইয়াছে। ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার।

গ্রন্থটির মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির বহির্বিশ্বে প্রসারের সর্বাধুনিক তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে এস. পি. গুপ্তের 'প্রি-হিস্টোরিক ইণ্ডিয়ান কালচার ইন সোভিয়েট সেণ্ট্রাল এশিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে।

বৌদ্ধধর্ম-প্রসারের, বিশেষ করিয়া অশোকের সময় হইতে (খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী) বহির্বিশ্বে ভারতীয় ভাবধারার প্রসার ঐতিহাসিক দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য- ও পৌরাণিক-সংস্কৃতি এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতি, বহির্জগতে উভয়েরই বিস্তার এই সময় ঘটে। এইচ. সরকার তাঁহার প্রবন্ধে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আরও এক শতাব্দী পূর্বের বলিয়া দেখাইয়াছেন

ইহারও পূর্বে, 'ব্রোঞ্জ যুগে'ও (খৃষ্টজন্মের তিনহাজার বছর পূর্বে) মেসোপটেমিয়া, ইরান প্রভৃতি অঞ্চলে সিন্ধু-সভ্যতার (হরপ্পা-সভ্যতা) বিস্তৃতির সম্ভাবনা প্রাত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে ইতিহাসে স্বীকৃত হইয়াছে। ডক্টর গুপ্ত তাঁহার প্রবন্ধে রাশিয়ার টার্কমেনিয়া অঞ্চলেও ইহা বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়াছেন: 'হরপ্পার বণিকগণের মাধ্যমে জলপথে মেসোপটেমিয়া ও ইরানের সহিত ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক যোগাযোগ ছিল, ইহাই আমরা এতদিন জানিতাম; লোথাল-এ পোতাঙ্গন আবিষ্কার ইহার স্বপক্ষের যুক্তিকে দৃঢ়তর করে। কিন্তু কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিকটবর্তী টার্কমেনিয়া অঞ্চলে স্থলপথেও এই বাণিজ্য যে সম্প্রসারিত ছিল, রাশিয়ার প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের আধুনিক আবিষ্কার এই সত্যটির উপর আলোকপাত করিয়াছে।' (পৃঃ ২৪২)

ইহারও পূর্বে, 'নবপ্রস্তর যুগে' (Neolithic Stage), এমন কি 'প্রস্তর যুগে'ও (Stone Age—পাঁচ লক্ষ বছর পূর্বে) এই যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল বলিয়া ডক্টর গুপ্ত বিশ্বাসী। তিনি লিখিয়াছেন, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে শোননদ অঞ্চলে (পরে আরও বহুস্থানে) প্রস্তর যুগের সভ্যতার অস্তিত্বের যে নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়, যাহা 'শোন সভ্যতা' নামে খ্যাত, তাহারই অনুরূপ নিদর্শন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে রাশিয়ার তাজিকিস্থান, কাজাখস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে। উভয় দেশে প্রাপ্ত এই নিদর্শনগুলির বিস্তৃত তুলনামূলক বিবরণ দিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, 'ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে, অন্ততঃ রাশিয়ার অন্তর্গত মধ্য-এশীয় অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার শুরু হইয়াছিল অতি প্রাচীনকালে—প্রস্তর যুগের প্রারম্ভে—পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বে।' (পৃঃ ২৩৯)। বিষয়টি সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য যে সে-যুগের প্রস্তরের অস্ত্রাদির প্রমাণ ছাড়া আর অন্য কোন প্রমাণ পাওয়ার উপায় নাই, এখনো যে ইহা অধিকতর প্রমাণ- ও গবেষণা-সাপেক্ষ—এসব স্বীকার করিয়াও ডক্টর গুপ্ত তাঁহার সিদ্ধান্তে অবিচল রহিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় ইতিহাসের তৎকালীন অসম্পূর্ণতা ও বিকৃতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতা লইয়া আমাদের ইতিহাস-গবেষণার নিজস্ব স্বাধীন ধারা' শুরু হওয়া দরকার। ভারতের বহু গবেষকের অতন্দ্র সাধনায় স্বামীজীর সেই ইচ্ছা আজ বাস্তব রূপ লইয়াছে—গ্রন্থটিতে তাহার প্রভূত নিদর্শন পাইয়া তৃপ্তিতে অন্তর পূর্ণ হইল।

ভারতের মহেনজোদারো, হরপ্পা, লোথাল

প্রভৃতির এবং রাশিয়ার কয়েকটি স্থানের প্রাত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার—যাহা খৃষ্টজন্মের তিনহাজার বছর পূর্বের বলিয়া অনুমিত, এবং তিব্বত, চীন, জাপান, বোর্ণিও, যবদ্বীপ, ইন্দোচীন প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের বিস্তার ও প্রভাবের নিদর্শন প্রভৃতি বিষয়ক ১৯ টি একবর্ণ এবং ১৯টি ত্রিবর্ণ মূল্যবান চিত্রে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। সাইজ ১২" × ৯"। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই যথোপযুক্ত। যুদ্ধরথারূঢ় শ্রীরামচন্দ্র (থাইল্যাণ্ড) এবং অগ্নিদেব (জাপান)—দুখানি ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্রশোভিত পুরু আর্ট-পেপারের প্রচ্ছদপদটিও মনোরম।

শিবচন্দ্র দেব ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী: ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী: সাধারণ ব্রহ্মসমাজ, ২১১, বিধান সরণী, কলিকাতা ৬; মূল্য পঁচাত্তর পয়সা; পৃ: ১০২

১৯৬৮ সালে কোন্নগর পাঠাগারে 'কালীচরণ মুখোপাধ্যায়' স্মৃতিবক্তৃতারূপে প্রদত্ত অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহোদয়ের শিবচন্দ্র দেব বিষয়ক বক্তৃতাটির সঙ্গে পরিশিষ্টে উনবিংশ শতাব্দীর Young Bengal (নব্যবঙ্গ) ডিরোজিও-শিষ্যবৃন্দের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শিবচন্দ্র দেবের জীবনের তথ্যাবলী সংযুক্ত হয়ে আলোচ্য পুস্তিকাটি আকারে ক্ষুদ্র হ'লেও বিশেষ মূল্যবান সংযোজনরূপে এযুগের পাঠক-মণ্ডলীর কাছে গৃহীত হবে। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ"—গ্রন্থে শিবচন্দ্রদেব-কে "সাধুপুরুষ" এই বিশেষণে অভিহিত করেছেন। বলা বাহুল্য, আচার্য শিবনাথের এ বিশেষণ সুপ্রযুক্ত।

ডিরোজিওর সান্নিধ্যে এসে যে তরুণ ছাত্র-বৃন্দ স্বাধীন চিন্তা, যুক্তিবাদ এবং সত্যের জন্য আমরণ সংগ্রামের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের জীবনের প্রাথমিক উচ্ছলতা কেটে যাবার পরে দেশ ও জাতির বহুমুখী কল্যাণব্রতে তাঁরা কীভাবে আত্মদান করেছিলেন সে-কথা আজ সুবিদিত। তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাম-গোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক—এঁরা তো সেকালের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। কিন্তু সর্বজনপরিচয়ের আলোকে না এসেও যাঁরা নিজ নিজ কর্মে, জীবনে ও বাসস্থানে (শিবচন্দ্রের বাসস্থান কোন্নগর) জনহিতব্রতের সাধনায় নবযুগের ভাব ও চিন্তার প্রসার ঘটিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে শিবচন্দ্র দেব ছিলেন অন্যতম।

যথার্থ মহত্ত্ব লোকখ্যাতির অপেক্ষা রাখে না। সকলের চোখের আড়ালে থেকেও যিনি মানবকল্যাণে সদাজাগরূক থাকেন, তেমন মহাত্মাদের দ্বারাই একটি জাতির জীবনস্রোত বাধামুক্ত ও গতিসম্পন্ন হয়। শিবচন্দ্র দেবের জীবন ও কর্মসাধনার সেই আত্মস্বরূপটি পুনরালোচনা ক'রে অধ্যাপক সেনশাস্ত্রী ও এ পুস্তিকার প্রকাশকবৃন্দ আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। ঈশ্বরানুরাগ, সমাজ-সেবা, জ্ঞানান্বেষণ ও মানবকল্যাণ,—আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার সঙ্গে চিরন্তন ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার সম্বন্ধস্থাপন,—এ সব দিক থেকেই উনবিংশ শতাব্দীর এই আদর্শবাদী সাধুপুরুষের জীবন আমাদের স্মরণীয়।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামীজীর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা

বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পৃষ্ঠপোষকতায় গত ৩১শে মে বোম্বাই-এর 'গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া-'য় স্বামী বিবেকানন্দের ১২ ফুট উচ্চ একটি ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মূর্তির আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্য মন্ত্রী শ্রী ভি. পি. নায়েক। ১৭ ফুট উচ্চ প্রস্তরের বেদীর উপর মূর্তিটি স্থাপিত।

৬৮ বৎসর পূর্বে এই তারিখে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে স্বামী বিবেকানন্দ বোম্বাই বন্দর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন আমেরিকার চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় যোগদান করিবার জন্য। সেই ঘটনাটি স্মরণ করিয়াই মূর্তিপ্রতিষ্ঠার তারিখ স্থির করা হইয়াছিল।

এই অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত প্রায় একশো জন সাধু ব্রহ্মচারী।

কার্যবিবরণী

শিলচর: (কাছাড়) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শিলচরে সেবাকার্য আরম্ভ হয় এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সেবাশ্রমটি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম শাখাকেন্দ্রে পরিগণিত হয়। সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া এই সেবাশ্রম দরিদ্র-জনসাধারণের অকুণ্ঠ সেবা করিয়া চলিয়াছে। এখানে পরিচালিত কার্যধারা মূলতঃ চারিভাগে বিভক্ত: (১)

সেবাকার্য

পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তুসেবা: রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত ৭টি উদ্বাস্তু-ক্যাম্পে ১৯৭১—মে মাসে শরণার্থীর দৈনিক সর্বোচ্চ সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১,০৫,৩০০। উদ্বাস্তুদের সংখ্যা এখনও বাড়িয়াই চলিয়াছে। গত ২৫শে মে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় জামশেরপুর ক্যাম্পটি বন্ধ করিয়া দেওয়ায় এখন ৬টি ক্যাম্পে উদ্বাস্তুসেবাকার্য পরিচালিত হইতেছে। এখন পর্যন্ত এই সেবাকার্যে প্রায় ২,৩২,৯০০ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে (এই টাকার মধ্যে বিতরিত খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ধরা হয় নাই)। মিশনের মেডিক্যাল ইউনিট কর্তৃক মেঘালয় সীমান্তে ডাউকী ও শেলায় ৪,০০০ রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানের একটি ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিট নরেন্দ্রপুর আশ্রম-পরিচালিত ২৪ পরগনার গাইঘাটা উদ্বাস্তু-ক্যাম্পে কাজ করিতেছেন।

ভিত্তিস্থাপন

গত ১৫ই মে, ১৯৭১ আমেরিকার চিকাগো কেন্দ্রের প্রস্তাবিত বিবেকানন্দ ভবনের (Vivekananda Retreat) ভিত্তিস্থাপন-উৎসব গঙ্গানগরীতে (Ganges Town) অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন।

স্যান ফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রেরও একটি ভিত্তিস্থাপন-উৎসব (ground-breaking ceremony) অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৭.৪.৭১ ওলেমা স্ট্রিটে একটি নূতন ভবনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

ধর্মীয় ও সংস্কৃতিমূলক, (২) শিক্ষাসম্বন্ধীয়, (৩) জনসেবাবিষয়ক, (৪) উপজাতি-কল্যাণমূলক। প্রত্যেক বিভাগের কার্যধারাই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ কর্তৃক সেবাশ্রম পরিদর্শন এবং এখানে তিন সপ্তাহ অবস্থান।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে ১০,০০০ নরনারী অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা প্রভৃতিও যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ফ্রি লাইব্রেরী: সেবাশ্রমের গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা ২,৫০০। পাঠাগারে দুইটি দৈনিক এবং কতকগুলি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। আলোচ্য বর্ষে গ্রাহকগণ কর্তৃক পঠিত পুস্তক-সংখ্যা ১,৭৩৭।

ছাত্রাবাস: আলোচ্য বর্ষে ৫০ জন ছাত্রকে ছাত্রাবাসে রাখা হয়, তন্মধ্যে ৩২ জন নাগা, মিজো, কুকী, প্রভৃতি উপজাতি-সম্প্রদায়ের। অত্যন্ত দরিদ্র ও দুঃস্থ উপজাতি-পরিবার হইতেই এই ছাত্রগণকে লওয়া হইয়াছে।

বন্যার্তসেবা: কাছাড়ে প্রায় প্রতি বৎসরই জনসাধারণ বন্যায় অবর্ণনীয় দুর্দশাগ্রস্ত হয়। শিলচর সেবাশ্রমের উদ্যোগে বন্যার্তসেবা সুন্দরভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে।

সালেম: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (রামকৃষ্ণ রোড, সালেম-৭, তামিলনাড়ু) ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে দরিদ্র-জনসাধারণের সেবাকল্পে দাতব্য চিকিৎসালয় যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ৪৩,১১৭; তন্মধ্যে নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ২১,৬৩২ ও ২১,৪৮৫। এই দাতব্য চিকিৎসালয়টির মাধ্যমে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ব্যাধিগ্রস্ত জনসাধারণ জাতিধর্মনির্বিশেষে সুচিকিৎসা লাভ করিয়া বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছেন।

আশ্রমের গ্রন্থাগারে ইংরেজী, তামিল, তেলুগু, মালয়লম, কানাড়া এবং হিন্দী ভাষার সুনির্বাচিত পুস্তকাবলী রাখা হইয়াছে। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ১,৩২৫।

আশ্রমে দৈনন্দিন পূজা ও ভজনাদি এবং সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। অন্যান্য পুণ্য জন্মতিথিও যথারীতি উদ্‌যাপন করা হইয়াছিল। দরিদ্র ও পুষ্টির অভাবজনিত রুগ্ন বালক-বালিকাগণকে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়।

উৎসব-সংবাদ

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে গত ৯ই এপ্রিল হইতে ১২ই এপ্রিল চারিদিনব্যাপী সাগর দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে।

৯ই এপ্রিল স্বামী রমানন্দের সভাপতিত্বে বিকালে আশ্রমের বিদ্যালয়গুলির (বহুমুখী বিদ্যালয়, বালকদের নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

ও বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের) পারিতোষিক-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্রগণ ক্রীড়া-কৌশল-প্রদর্শনে ও বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করে।

১০ই সকালে বিশেষ পূজাদি ও বিকালে শোভাযাত্রাসহ গ্রামপরিক্রমার পর আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্বামী শিবেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী রমানন্দ ও স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধিদানন্দ আশ্রমের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। সভান্তে প্রায় ৩,০০০ হাজার ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ পরিবেশন করা হয়। রাত্রে আশ্রমের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রগণ কর্তৃক 'রাজলক্ষ্মী' যাত্রা অভিনীত হয়।

১১ই সকালে কমলপুরে পূজা ও বিকালে স্বামী জ্যোতীরূপানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দ ও স্থানীয় শিক্ষকগণ। স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীরা গান, আবৃত্তি ও বক্তৃতাদিতে অংশ গ্রহণ করে। মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পরিচালনায় ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়

১২ই বিকালে বামনখালি এম. পি. পি. বহুমুখী বিদ্যালয়ে ধর্মসভা হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দ ও স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ।

পূর্ববঙ্গস্থ শাখাকেন্দ্র

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূর্ববঙ্গস্থ শাখাকেন্দ্রগুলির কোন নিশ্চিত সংবাদ বর্তমান অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে না। তবে ঢাকা আশ্রমের স্বামী কালিকাত্মানন্দ ও ব্রহ্মচারী দেবীপ্রসাদ, দিনাজপুর আশ্রমের ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য এবং নারায়ণগঞ্জ আশ্রমের স্বামী যোগদানন্দ ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ব্রহ্মচারী বিদেহচৈতন্য নিরাপদে আছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

স্বামী বিশেষানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২রা মে, ১৯৭১, বেলা ১০ টা ১৫ মিনিটের সময় স্বামী বিশেষানন্দ ৭৮ বৎসর বয়সে মেদিনীপুর আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিছুকাল তিনি ডায়েবিটিস ও বার্ধক্যজনিত অসুখে পীড়িত ছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়। কয়েক বৎসর তিনি চণ্ডীপুর আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি অবসরজীবন যাপন করিতেছিলেন।

স্বামী বিশেষানন্দ একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। অনাড়ম্বর জীবন ও সরল আচরণের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

তাঁহার আত্মা ভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের (৩৩, নয়াপট্টি রোড, কলিকাতা ৫৫): ১৯৬৭-১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

ছাত্রীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই ত্রৈবার্ষিক আর্টস্ কলেজে ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, গণিত প্রভৃতি অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে। ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে অনার্স পড়ানো হইয়া থাকে। বিদ্যাভবনে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগও আছে।

সকল বিভাগেই বিদ্যাভবনের ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

আলোচ্য বর্ষত্রয়ে ছাত্রীনিবাসে ৯৫, ১০৫ এবং ১১০ জন ছাত্রী ছিল। ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে ৪ জন ছাত্রী বিনা ব্যয়ে এবং ১০ জন ছাত্রী অল্প ব্যয়ে ছাত্রীনিবাসে থাকিবার সুযোগ লাভ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

উৎসব-সংবাদ

নতুন পুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১১ই এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৩৬তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সকালে উষাকীর্তন, উপনিষদ্- ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় পাঁচশত নরনারী হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে আয়োজিত জনসভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুব সঙ্ঘের (অখিল ভারত বিবেকানন্দযুব মহামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত) উদ্যোগে ২রা মে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। পূর্বাহ্নে পূজা-পাঠাদি ও অপরাহ্নে নেতাজীর জীবন-রূপক পরিবেশনের পর আয়োজিত জনসভায় স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ (সভাপতি), অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার (প্রধান অতিথি), অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত ও ডক্টর ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। পরে ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শিত হয়।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে গত ৯, ১০ ও ১১ই এপ্রিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। তিন দিন জনসভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার, স্বামী স্মরণানন্দ ও স্বামী অমৃতত্বানন্দ; আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার, অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। বিশেষ পূজাপাঠ, শোভাযাত্রা, ছাত্রসম্মেলন প্রভৃতি বিভিন্ন দিনে উৎসবের অঙ্গ ছিল। বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণও এই সভায় অনুষ্ঠিত হয়।

পরলোকে নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৫ই এপ্রিল নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জামসেদপুর সোনারীতে নিজ ভবনে দেহত্যাগ করিয়া বাঞ্ছিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৭৭ বৎসর হইয়াছিল।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগনায় তাঁহার জন্ম। ঢাকা জগন্নাথ কলেজে উচ্চ-শিক্ষালাভের সময় তিনি স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। বি. এ. পাশ করিবার পর জামসেদপুর টাটা ইস্পাত কারখানায় তাঁহার কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। সেই সময় হইতে জামসেদপুর বিবেকানন্দ সোসাইটীর তিনি একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন; কয়েক বৎসর আশ্রমে বসবাসও করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

১৩৭৮ সালের অনুষ্ঠান-সূচী

[বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে]

শ্রাবণ—কার্ত্তিক :

তিথি-কৃত্য

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	৪ঠা শ্রাবণ	মঙ্গলবার	২০শে জুলাই
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	২১শে শ্রাবণ	শুক্রবার	৬ই আগষ্ট
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	২৮শে শ্রাবণ	শুক্রবার	১৩ই আগষ্ট
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২রা ভাদ্র	বৃহস্পতিবার	১৯শে আগষ্ট
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	২৭শে ভাদ্র	সোমবার	১৩ই সেপ্টেম্বর
স্বামী অখণ্ডানন্দ	মহালয়া	২রা আশ্বিন	রবিবার	১৯শে সেপ্টেম্বর
স্বামী সুবোধানন্দ	কার্ত্তিক শুক্লা দ্বাদশী	১৪ই কার্ত্তিক	রবিবার	৩১শে অক্টোবর
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্ত্তিক শুক্লা চতুর্দশী	১৬ই কার্ত্তিক	মঙ্গলবার	২রা নভেম্বর

পূজা-কৃত্য

শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখী অমাবস্যা	৮ই জ্যৈষ্ঠ	রবিবার	২৩ মে
স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	২৪শে জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	৮ই জুন
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	১০ই আশ্বিন	সোমবার	২৭শে সেপ্টেম্বর
শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	১লা কার্ত্তিক	সোমবার	১৮ই অক্টোবর

দিব্য বাণী

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৪

কঠোপনিষদ্, ১.৩

দেহমাঝে জেনো আত্মাই রথী, দেহখানি তার রথ,
ইন্দ্রিয়গুলি রথের অশ্ব, বিষয় চলার পথ,
বুদ্ধি সেথায় সারথি হইয়া মনকে লাগাম করি
ছোটায় অশ্ব, ছুটে চলে রথ। (জনম জনম ধরি
চলে, কাজ করে রথ ও সারথি বল্‌গা অশ্ব পথে,
আমরা কিছুই করি না কেবল বসে থাকি দেহ-রথে।
বসে থাকি, তবু মন ও বুদ্ধি দেহ ইন্দ্রিয়গণে
'আমি' ভাবি, তাই 'চলি, ভোগ করি'
এই বোধ জাগে মনে।)
দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিতে যুক্ত জীবাত্মায়
অভিহিত (তাই) করেন জ্ঞানীরা 'ভোক্তা' এ অভিধায়।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৫
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥ ৭

বিবেকবিহীন বুদ্ধি যাহার, মনও অসংযত,
অশুচি যে—যার মন ও বুদ্ধি ইন্দ্রিয়-অনুগত
ইন্দ্রিয় তার বশে থাকে নাকো, আপন খেয়াল ভরে
দেহরথখানি টেনে নিয়ে চলে বিষয়ের পথ ধ'রে—
জনম হইতে জনমান্তরে ঘোরায় তাহার রথ ;
পথের শেষ সে পায় না কখনো, পায় না পরম পদ।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৬
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচি ঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৮
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৯

—কঠোপনিষদ্, ১।৩

বিবেকী যাহার সারথি বুদ্ধি, সংযত যার মন,
শুদ্ধ যে, তার নিজবশে সদা থাকে ইন্দ্রিয়গণ—
বিষয়ের পথে আপন খেয়ালে ঘোরাতে পারে না তারে,
বিবেকচালিত হয়ে ছুটে চলে সত্যের পথ ধ'রে।
তার রথ থামে অমৃতধামে, ফুরায় তাহার পথ—
পায় পথ-শেষ, পায় সে মুক্তি, বিষ্ণু-পরমপদ—
যে পরমধামে পৌঁছিলে আর কোন দেহরথে চ'ড়ে
জীবনের পথে কোনদিন আর আসিতে হয় না ফিরে ॥

কথাপ্রসঙ্গে

'এ যাত্রা মোর থামাও'

যাত্রাপথ

জীবনের পথ ধরিয়া আমরা চলিয়াছি, অনাদি কাল হইতে। এই চলার পথের আগের অংশটুকু আমরা সকলে দেখিতে পাই না, পরের টুকুও রহস্যাবৃত। কিন্তু বর্তমান জন্মের চলার পথটুকু এবং সেখানে পথিকরূপে আমাদের অস্তিত্ব আমাদের সকলেরই নিকট প্রত্যক্ষ সত্য। আমরা জানি আমাদের দেহ আছে, চিন্তা অনুভূতি আছে, কোন কিছু দেখিবার শুনিবার পর সে সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিবার শক্তি আছে,—আমরা দেহ-মন-বুদ্ধি-সমন্বিত। আবার প্রাণশক্তি আছে আমাদের, যাহা এই দেহটিকে গঠন করিয়াছে, আমরা যাহা খাদ্যরূপে গ্রহণ করি তাহার অনুগুলিকে ভাঙিয়া আমাদের দেহগঠন ও রক্ষার প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলিকে নূতন করিয়া সাজাইয়া দেহের বিভিন্ন যন্ত্রগুলিকে সচল রাখিয়া আমাদের দেহটিকে রক্ষা করিতেছে। সর্বোপরি আমাদের চেতনা আছে, যাহার জন্য দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি সব-গুলিকেই চেতন বলিয়া মনে হইতেছে, এসবগুলিকে জড়াইয়া আমাদের 'আমি'-বোধ উঠিতেছে। এই সবের মিলিত সংঘাতটিই আমাদের জীবন। এই সংঘাতের অঙ্গগুলিকে কথায় কথায় ভাসা-ভাসা ভাবে আমরা 'আমার' বলিয়া অভিহিত করি বটে,—আমার দেহ ভাল নাই, আমার মন খারাপ, আমার বুদ্ধি খুব পরিষ্কার, আমার প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে ইত্যাদি বলি বটে, কিন্তু আমাদের গায়ের পোশাকটিকে যেভাবে 'আমার' ভাবি—উহা আমার গায়ে জড়ানো থাকিলেও আমা হইতে পৃথক্—দেহ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতিকে সেভাবে আমার বলিয়া ভাবি না; সেগুলিকে 'আমি' বলিয়া মনে করি—ভাবি এসব লইয়াই আমি। দেহমনাদি সংঘাতের সঙ্গে নিজেকে এভাবে এক ভাবা, এই সংঘাতকেই 'আমি' বলিয়া মনে করা যেদিন হইতে শুরু হইয়াছে, আমাদের পার্থিব জীবন-পথে যাত্রাও শুরু হইয়াছে সেদিন হইতে। যেদিন এই সংঘাত ভাঙিয়া যায়, স্থূল দেহটি নষ্ট হইয়া যায়, সেদিন আমাদের এই পার্থিব যাত্রাও থামিয়া যায়।

কিন্তু আমাদের যাত্রা তাহাতে থামে না; কারণ স্থূল দেহটি নষ্ট হইয়া গেলেও প্রাণ-মন-বুদ্ধি-চেতনার সংঘাতটি অটুটই থাকিয়া যায়—এটিকে 'আমি' বলিয়া তখনো ভাবিতে থাকি আমরা। আর আসলে আমাদের ভাবনা চিন্তা অনুভূতি সব এটিতেই তো হয়, স্থূলদেহের সঙ্গে এটি জড়িত থাকাকালেও। অনুভূতি তো আর স্থূলদেহে হয় না, স্থূলদেহ স্থূল বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া এটিতে অনুভূতির স্পন্দন তুলিতে সহায়তা করে মাত্র। আমরা ভাবি বটে চোখে দেখিতেছি, কানে শুনিতেছি, হাতে বা পায়ে ব্যথা হইতেছে ইত্যাদি, কিন্তু দেখা শোনা ব্যথা পাওয়া সব হয় মন-বুদ্ধি-চেতনার সংঘাতে। সেজন্য স্থূলদেহটি নষ্ট হইয়া গেলেও, আমাদের তথাকথিত মৃত্যু ঘটিলেও আসলে আমরা মরি না; আমাদের প্রাণ-মন-বুদ্ধির সংঘাতে, সূক্ষ্মদেহে, এখনকার মতোই আমাদের 'আমি'-বোধ, চিন্তা-অনুভূতি প্রভৃতি তখনো সব কিছুই অটুট থাকে, সেসব

লইয়াই আমরা থাকিয়া যাই। যেমন শিশুকাল হইতে এখন পর্যন্ত আমাদের দেহ কত পরিবর্তিত হইয়াছে, আমাদের চিন্তা অনুভূতি বিচারের বিষয় পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু যে আমি চিন্তা করি বিচার করি বলিয়া ভাবে তাহার কোনই পরিবর্তন হয় নাই। যেমন অন্ধ বা বধির হইয়া গেলে বা শরীরের হাত পা প্রভৃতি কোন অঙ্গ কাটিয়া বাদ দেওয়া হইলেও চিন্তা-বিচারশক্তি-সমন্বিত আমি-বোধ কিছুই কমে না, তেমনি পুরো দেহটাই নষ্ট হইয়া যাইলেও ইহা কিছুই কমে না, এখন যেমন আছি তখনও ঠিক তেমনি থাকিয়া যাই।

সেজন্য আমাদের যাত্রাপথের একটি অংশে, আমাদের একটি পার্থিব জীবনে চলা শেষ হইলেও যাত্রা আমাদের থামে না। আর একই কারণে আমাদের এই-জন্মের দেহটির জন্মক্ষণটিতে আমাদের যাত্রা শুরু হইয়াছে, একথাও সত্য নয়। এ যাত্রা শুরু হইয়াছে অনাদি কালে, অথবা বলা যায় কালের সৃষ্টিরও পূর্বে—'দিবস রজনী ছিল না যখন' যখন আমরা এই প্রাণমনবুদ্ধির সংঘাত লইয়াই সূক্ষ্মশরীরের চেয়েও সূক্ষ্মতর একটি শরীরে, কারণ-শরীরে ছিলাম। তখন অবশ্য এসবই ছিল সূক্ষ্মাকারে, বীজাকারে; তখন এসব লইয়াই যেন ঘুমাইয়া-ছিলাম আমরা, আমরা আছি কি নাই, তাহাও বোঝা যাইতেছিল না। এই স্থূলদেহেই খুব গভীর নিদ্রাকালে যেমন হয়, অনেকটা সেই রকম। তবে ইহাকেও ঠিক যাত্রার শুরু বলা যায় না—যেমন প্রতিদিন প্রভাতে জাগরণকে আমাদের বর্তমান জীবনের শুরু বলা যায় না। যখন আমাদের কারণ-শরীরও ছিল না, সেই অবস্থা হইতে আমাদের যাত্রা শুরু হইয়াছিল।

ঘুমাইয়া পড়াকে যেমন জীবনের শেষ বলা যায় না, কারণ-শরীরে লীন হওয়াকেও তেমনি আমাদের যাত্রার শেষ বলা যায় না, বিশ্রাম বলিতে পারি। এটি ঘটে প্রলয়কালে। তাহার পর, প্রলয়ের পর, জাগিয়া উঠিবার পর আবার চলিতে শুরু করি আমরা। কখনো সূক্ষ্মদেহ লইয়া সূক্ষ্মলোকের জীবনপথে চলি, কখনো বা স্থূলদেহ লইয়া স্থূলজীবনে চলি। জন্ম হইতে জন্মান্তরে, জীবন হইতে জীবনান্তরে, কল্প হইতে কল্পান্তরে এইভাবে যাত্রা আমাদের চলিতেই থাকে, স্থূলদেহের নাশেও থামে না, কল্পান্তে প্রলয়েও থামে না।

ইহারই নাম জন্মান্তরবাদ। এই জন্মান্তর-বাদ ভারতীয় ধর্মেরই বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর আর সব প্রধান ধর্মের মতে এ পৃথিবীতে জীবনে পথ চলিবার সুযোগ আমরা একবার মাত্র পাই—বর্তমান জীবনই আমাদের একমাত্র পার্থিব জীবন।

যাত্রার শেষ

তাহা হইলে আমাদের জীবনপথে এ যাত্রার—স্থূলদেহ লইয়াই হউক বা সূক্ষ্মদেহ লইয়াই হউক—কি কোন শেষ নাই? ভূলোকের বিবিধ তির্যক্‌প্রাণীর জীবন, মানবজীবন, দেবলোক পিতৃলোক ব্রহ্মলোক প্রভৃতিতে দিব্য জীবন, যে জীবনই হউক, জীবন হইতে জীবনান্তরে এই যাত্রা কি চলিতেই থাকিবে অনন্তকাল? পথের শেষ, 'অধ্বনো পারম্' বলিয়া কি কিছু নাই?

নিশ্চয়ই আছে। 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনঃ' হইলেও ভগবানলাভ বা আত্মজ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই—যাহা সত্য তাহা জানিতে পারিলেই আমাদের যাত্রা থামিয়া যায়, আমরা পথের শেষে পৌঁছিয়া যাই—'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'। এই পথের শেষকেই বলা হয়

'বিষ্ণোঃ পরমং পদম্', পরমধাম। ইহাই আমাদের স্বরূপ, ভগবানেরও স্বরূপ—'তদ্ধাম পরমং মম'। আমাদের যাত্রা শুরু হইয়াছে এখান হইতেই। কোন জীবনের পথে চলাই যাঁহাদের আর ভাল লাগে না, পৃথিবীর, স্বর্গাদিলোকের, এমনকি সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেরও কোন আকর্ষণই আর যাঁহাদের জীবনের পথে চলিবার জন্য আকৃষ্ট করিতে পারে না, তাঁহারাই ব্যাকুল হইয়া পথের এই শেষ খোঁজেন এবং পূর্বে যাঁহারা পথের শেষ দেখিয়া আসিয়া সেখানে পৌঁছাইবার উপায় আমাদের বলিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নির্দিষ্ট উপায় অবলম্বনে পথের শেষে পৌঁছিয়াও যান—'সোঽধ্বনো পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।' একবার সেখানে পৌঁছিলে, ভগবানলাভ বা জ্ঞানলাভ করিলে, আর জীবনের পথে ফিরিতে হয় না—'যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম', 'যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'।

ফিরিতে হয় না, কারণ দেহমনবুদ্ধির সঙ্গে বা কেবল মনবুদ্ধির সঙ্গে নিজেকে জড়াইয়া রাখাই, নিজেকে বাঁধিয়া রাখাই তো জীবন। যে মুহূর্তে এগুলির সঙ্গে নিজেকে আমরা এক বলিয়া ভাবিয়াছি, এগুলিকেই 'আমি' বলিয়া ভাবিয়াছি, সেই মুহূর্ত হইতেই আমাদের জীবন—আমাদের যাত্রা শুরু হইয়াছে। জীবন বলিতে তো কতকগুলি পরিবর্তনের, কতকগুলি কর্মের বা ঘটনার সমষ্টি মাত্র বুঝায়, এবং সে সব পরিবর্তনই, সব কাজ বা ঘটনাই দেহ-মন-বুদ্ধির মধ্যে ঘটে—স্থূল কর্ম, চিন্তা, সুখদুঃখাদির অনুভব, সংকল্প, বিচার প্রভৃতি সবই। আসলে আমার সঙ্গে এগুলির কোন সংস্রবই নাই, আমি মন-বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে নিজেকে যতক্ষণ জড়াইয়া রাখি, সেগুলিকে আমি বলিয়া ভাবি, ততক্ষণই মনে করি আমি জীবনের পথে চলিতেছি। এগুলি হইতে যে মুহূর্তে নিজেকে পৃথক করিয়া দেখিতে পারি, যাহা সত্য তাহা প্রত্যক্ষ করি, তখনই আমাদের যাত্রা তাই থামিয়া যায়। নিজেকে দেহ-মন-বুদ্ধি হইতে পৃথক দেখিবার, সত্যোপলব্ধি করিবার নামই বিষ্ণুরূপ পরমপদ- বা পরমধামপ্রাপ্তি, জ্ঞান-লাভ বা ভগবানলাভ, পথের শেষে পৌঁছানো। নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ আর ভগবান-লাভ মূলতঃ একই কথা, কারণ আমাদের স্বরূপ তিনিই। চেতনাই আমাদের স্বরূপ। ভগবান বা আমাদের স্বরূপ—যে নামই দিই না কেন, সেই সত্তা ছাড়া চৈতন্য আর কিছুরই নাই—কোন স্থূল পদার্থের, মন-বুদ্ধি প্রভৃতি কোন সূক্ষ্ম পদার্থের, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুরই নাই। তাঁহার বা আমাদের স্বরূপের সংস্পর্শ থাকে বলিয়াই মনবুদ্ধি এবং তাহাদের সংস্পর্শহেতু স্থূলদেহকেও চেতন বলিয়া মনে হয় মাত্র। যেমন দর্পণে বা শিশিরবিন্দুতে সূর্যালোক পড়িলে মনে হয় সেগুলিই যেন আলোর উৎস, সেগুলির ভিতর হইতেই যেন আলো আসিতেছে। অথবা, যেমন একটি ত্রিকোণাকার (প্রিজম্) স্বচ্ছ কাঁচের পিছনে একটি লাল ফুল রাখিলে কাঁচটিকেই লালরঙের বলিয়া মনে হয়।

যাত্রা থামাইবার উপায়

এ যাত্রা থামানো যায় কি ভাবে? আমরা তো দেখিলাম, স্থূলদেহের সহিত সংযুক্ত, স্থূলদেহ হইতে বিযুক্ত, অথবা সুপ্ত—যে কোন অবস্থাতেই মন-বুদ্ধি প্রভৃতি থাকুক না কেন, তাহার সহিত আমরা যতক্ষণ নিজেকে জড়াইয়া রাখিব ততক্ষণ এ যাত্রা থামিবে না। যাত্রা থামাইতে হইলে যে ভাবেই হউক এগুলি হইতে নিজেকে সরাইয়া লইতে হইবে।

আমি দেহ হইতে তো বটেই, মন-বুদ্ধি হইতেও পৃথক, আমি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ—বিচার করিয়া এই সত্যের অবিরাম অনুধ্যানের পথে তাহা হইতে পারে; ধ্যানে মন-প্রাণকে নিবাতস্থ দীপশিখার ন্যায় নিষ্কম্প করিবার পথেও তাহা হইতে পারে; আমার স্বরূপকেই কোন মূর্তি-বিশিষ্ট বা গুণবিশিষ্টমাত্র ভাবিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়া তাঁহার পূজা, তাঁহার নাম জপ, কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁহাতে মন স্থির করার পথে, 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' করিয়া 'তন্ময়' হইয়া যাওয়ার পথেও তাহা হইতে পারে। আবার কর্মের পথেও তাহা হয়; অবশ্য সে কর্মের সঙ্গে জ্ঞান বা ভক্তি অবলম্বনে সর্বক্ষণ মনকে সত্যের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি রাখিতে হয়—কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে সর্বক্ষণ ভাবিতে হয় 'আমি কিছুই করিতেছি না, মন-বুদ্ধি প্রভৃতিই প্রকৃতির নিয়মচালিত হইয়া সব কাজ করিতেছে', অথবা 'আমার মন-বুদ্ধিতে, এমনকি সেগুলিতে জড়িত আমার অহং-এরও ভিতর থাকিয়া ভগবান সেগুলিকে দিয়া সব কিছু করাইতেছেন,—তিনি কর্তা, আমি অকর্তা, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র'; কিংবা ভাবিতে হয়, তাঁহার তৃপ্তির জন্যই, তাঁহার পূজারূপেই কাজ করিতেছি। আর তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হয়, 'এ যাত্রা মোর থামাও।'

এসবগুলিই যাত্রা থামাইবার উপায় সত্য, কিন্তু সবগুলিই সকলের উপযোগী নয়। অনাদি কাল হইতে আমাদের যাত্রাপথে যাহাদের 'আমি' 'আমার' ভাবিয়া আসিতেছি, সেই দেহ-মন-বুদ্ধির সহিত আমার একাত্মভাবকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া ধ্যান বা বিচার সহায়ে সোজাসুজি সত্যে পৌঁছাইবার মতো অধিকারী অতি বিরল। যাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি অমিতবিক্রম, তাঁহাদের পক্ষেই ইহা সম্ভব, তাঁহারা "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।" জগজ্জাল ছিন্ন করা মানে সংসার-ত্যাগ মাত্র নয়, দেহত্যাগও নয়—দেহ-মন-বুদ্ধির কারাগার হইতে নিজেকে পৃথক বলিয়া প্রত্যক্ষ করা। এই প্রত্যক্ষের পর দেহ থাকিলেও যাত্রা থামিয়া যায়, কারণ দেহ-মন-বুদ্ধির চলাকে আমার চলা বলিয়া ভ্রম আর হয় না; সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় 'নৈব কিঞ্চিৎ করোমি।'

সর্বসাধারণের জন্য উপায়, সহজ উপায় হইল ভক্তিভাব, বিশেষ করিয়া ভক্তিভাবাশ্রিত কর্মযোগ অবলম্বন করা। ভক্তিসাধনায় প্রার্থনা একটি বিশেষ অঙ্গ, যে প্রার্থনার মূল কথা, 'এ যাত্রা মোর থামাও!'

যখন আমরা বিচার বা ধ্যান করি 'মনোবুদ্ধ্যহংকারচিত্তানি নাহং,...চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্', 'ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ, তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ', 'ব্রহ্মাদয়-মস্ম্যহম্' ইত্যাদি, তখনো আমাদের যা লক্ষ্য, যখন স্তব করি, 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি', 'মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি', 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' ইত্যাদি, তখনও লক্ষ্য তাই—যাত্রা থামাইয়া পরম ধামে পৌঁছানো। যখন প্রার্থনা করি, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়', 'মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়', 'আবিরাবির্ম এধি' অথবা 'দুয়ার খুলিয়া দাও মাতঃ! হেরি পথ আলোকছটায়', 'সংসারদুঃখগহনাৎ জগদীশ রক্ষ', 'জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে', তখন সে প্রার্থনায় এই সুরই অনুসৃত—'এ যাত্রা মোর থামাও!'

'এ যাত্রা মোর থামাও!'—এই আকুতি, এই প্রার্থনাই নানাভাবে নানা ভাষায় উঠিতেছে মন্দিরে, তীর্থে, অরণ্যে, গিরিগুহায় অসংখ্য পথশ্রম-ক্লান্ত যাত্রীর কণ্ঠে জগৎ জুড়িয়া।

স্বামী বিবেকানন্দ-স্মরণে *

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

ভারতমাতার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান, স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি; প্রার্থনা করি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ আমাদের সকলের শিরে বর্ষিত হোক।

আজকের তারিখে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে, স্বামী বিবেকানন্দ এই মহানগরী থেকে সমুদ্রপথে পাশ্চাত্যযাত্রা করেছিলেন - সেখানে ভারতের বাণী, হিন্দুধর্মের সর্বজনীন উদার বাণীর বাহকরূপে। আমেরিকা থেকে লেখা একটি পত্রে তিনি বলেছেন, 'বুদ্ধের যেমন প্রাচ্যের জন্য একটি বাণী ছিল, আমারও তেমনি পাশ্চাত্যের জন্য একটি বাণী আছে।' সে বাণী তিনি দিয়েছিলেন, তা ফলপ্রসূও হয়েছিল। পাশ্চাত্যকে তিনি সহায়তা করেছিলেন ধর্মের অসার ভাগ ত্যাগ ক'রে সারভাগটুকু গ্রহণ করতে; তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, কোন মতবাদ বা অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে বিশ্বাসমাত্র ধর্ম নয়, উপলব্ধিই ধর্ম, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করাই ধর্ম। তিনি প্রচার করেছিলেন ধর্মসমন্বয় ও মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের কথা। পাশ্চাত্যবাসীদের তিনি বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের হিন্দু করতে আসি নাই, যাতে তোমরা আরও ভাল খৃষ্টান হতে পার তার জন্য সাহায্য করতে এসেছি।'

* গত ৩১শে মে বোম্বাই শহরে স্বামীজীর মূর্তি-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় প্রদত্ত ভাষণ (মূল ইংরেজী হইতে অনূদিত।)

তাঁর কথা পাশ্চাত্য পরম আগ্রহভরে শুনেছে। তিনি চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর একত্বের বাণী কোন না কোন আকারে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে অসংখ্য প্রচারবেদীতে ও মঞ্চে, সাময়িক পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশনের মাধ্যমে এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক চিন্তাশীল মনীষীদের লেখায়।

ভারতবাসীদের তিনি বলেছেন, ভারতের জাতীয় জীবন অতীতে ধর্ম-ভিত্তিক ছিল, ভারতকে আবার জাগতে হলে ধর্মের মাধ্যমেই তা করতে হবে। জাতির ভাবগত অখণ্ডতার কথা আমরা আলোচনা ক'রে থাকি। এর জন্য প্রয়োজন তিনটি জিনিস—একটি সাধারণ আদর্শ, সাধারণ প্রচেষ্টা ও সাধারণ সাফল্য। ভারতে এই সাধারণ প্রচেষ্টা ও সাফল্য রয়েছে কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে, রাজনীতি বা অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়। তাই বলে রাজনীতি বা অর্থনীতি অবহেলিত হয়নি বা আজ আমরা এগুলিকে অবহেলা করতে পারিও না; তবে পূর্বেও যেমন ছিল এখনো তেমনি এগুলিকে ধর্মের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে হবে।

স্বামীজী ধর্মীয় আদর্শের ওপর জোর দিলেও এ বিষয়ে অন্ধ ছিলেন না যে, ভারতের বিপুলসংখ্যক জনগণ দরিদ্র ও অজ্ঞ, এবং তাদের কাছে ধর্মের কথা বলা পরিহাসেরই তুল্য। জনগণের জাগতিক উন্নতিসাধন তিনি করতে বলেছেন সেবার মাধ্যমে – মানুষের মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন—এই বিশ্বাস নিয়ে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মাধ্যমে; এ ভাবে সেবাকে পূজা বা উপসনায় উন্নীত ক'রে ঐহিক ও পারত্রিকের

মধ্যেকার ব্যবধান তিনি ঘুচিয়ে দিয়েছেন—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।'

আমাদের দৃষ্টিকোণ আজ ফেরাতে হবে দাবী থেকে কর্তব্যের দিকে। অপরের সেবা করার অধিকার ছাড়া আর কিছুই দাবী করার নেই আমাদের। আমাদের প্রত্যেককেই সর্বোচ্চ সামর্থ্য নিয়োগ ক'রে জাতির সেবা করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের নিকট প্রার্থনা, বিশ্বের সঙ্গে নিজের একত্বানুভব করতে এবং এভাবে দ্বন্দ্বদীর্ণ পৃথিবীতে শান্তি ও সামঞ্জস্য স্থাপন করতে তিনি যেন আমাদের অনুপ্রাণিত করেন।

শান্তি, শান্তি, শান্তি!

"যখন আমাদের অহংজ্ঞান থাকে না তখনই আমরা সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারি, অপরকে আমাদের ভাবে সর্বাধিক অভিভূত করতে পারি।...ঈশ্বরই একমাত্র যথার্থ কর্তা–তাঁর কাছে হৃদয় খুলে দাও, নিজে নিজে কিছু করতে যেও না।...তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর, সম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত হও, তাহলেই তোমার দ্বারা কিছু কাজ হবে।...অহং-কে সরিয়ে দাও, নাশ ক'রে ফেলো, ভুলে যাও; তোমার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কাজ করুন—এ তো তাঁরই কাজ। আমাদের আর কিছু করতে হবে না, কেবল স'রে দাঁড়াতে হবে, তাঁকে কাজ করতে দিতে হবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

যোগবাসিষ্ঠসারঃ

[পূর্বানুবৃত্তি]

[অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ]

৭। শুদ্ধিনিরূপণ-প্রকরণ

বহিঃ কৃত্রিম-সংরম্ভো হৃদি সংরম্ভবর্জিতঃ।
কর্তা বহিরকর্তান্ত র্লোকে বিহর রাঘব ॥ ১

বসিষ্ঠ বলিতেছেন, 'হে রাঘব রামচন্দ্র, তুমি অন্তরে উদ্যমরহিত অথচ বাহিরে কৃত্রিম উদ্যমশীল হইয়া এবং অন্তরে অকর্তাবোধ দৃঢ় রাখিয়া বাহিরে কর্তার ন্যায় আচরণকরতঃ সংসারে বিচরণ কর।'

অন্তঃ সন্ত্যক্তসর্বাশো বীতরাগো বিবাসনঃ।
বহিঃ সর্বসমাচারো লোকে বিহর রাঘব ॥ ২

হে রামচন্দ্র, অন্তরে সর্বতৃষ্ণারহিত, বিষয়াভিলাষশূন্য ও সর্ববাসনাবিহীন হইয়া বাহিরে সর্বপ্রকার কর্ম করিতে করিতে তুমি এই সংসারে বিচরণ কর।

পূর্ণাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য ধ্যেয়ত্যাগবিলাসিনীম্।
জীবন্মুক্ততয়া স্বস্থো লোকে বিহর রাঘব ॥ ৩

হে রামচন্দ্র, সংসারচিন্তাত্যাগই যাহার উৎকৃষ্ট শোভা, এমন পরিপূর্ণ জ্ঞানদৃষ্টি আশ্রয়-করতঃ জীবন্মুক্তরূপে স্বস্বরূপে স্থিত হইয়া তুমি সংসারে অবস্থান কর অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহার সম্পাদন কর।

একো বিশুদ্ধবোধোঽহমিতি নিশ্চয়বহ্নিনা।
প্রজ্বাল্য দ্বৈতগহনমেক এব সুখী ভব ॥ ৪

(স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত) আমি এক অদ্বিতীয় বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ—এইপ্রকার দৃঢ়সিদ্ধান্তরূপ অগ্নিদ্বারা যাবতীয় ভেদজ্ঞানরূপ ঘন বন দগ্ধ করিয়া তুমি একক সুখরূপে অবস্থান কর অর্থাৎ পরম সুখে কালাতিপাত কর।

দেহোঽহংমানপাশেন দৃঢ়ং বদ্ধোঽসি সর্বতঃ।
বোধোঽহংজ্ঞানখড়্গেন তং নিকৃন্ত্য সুখী ভব ॥ ৫

হে রাম, আমি দেহ এইরূপ যে মান অর্থাৎ দেহাভিমান তাহাই বন্ধক বলিয়া পাশসদৃশ, উহা দ্বারাই তুমি সর্বতোভাবে বদ্ধ হইয়া আছে। (তাহা হইলে কি কর্তব্য তাহাই বলিতেছেন) 'আমি জ্ঞানস্বরূপ' এই খড়্গসদৃশ দৃঢ় জ্ঞান দ্বারা এই দেহাভিমান বিচ্ছিন্ন করিয়া সুখী হও অর্থাৎ স্বস্বরূপভূত আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হও।

অনাত্মনি রতিং ত্যক্ত্বা নির্বিভাগো জগৎস্থিতৌ।
একনিষ্ঠতয়ান্তঃস্থঃ সচ্চিন্মাত্রপরো ভব ॥ ৬

হে রামচন্দ্র, তুমি জগৎস্থিতি অর্থাৎ প্রাণিস্থিতি জগৎস্থিরতা বা জগজ্জন্ম ইত্যাদি বিভাগরহিত হও অর্থাৎ জগদ্রূপ ভেদকল্পনারহিত হও। এক আত্মাতেই নিশ্চলরূপে স্থিত এবং বহিরিন্দ্রিয়-ব্যাপার-রহিত হও। অতএব নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে তৎপর হও অর্থাৎ তুমি তাঁহার সহিত একীভূত হও। (যদি বল কি প্রকারে আমি ঐরূপ হইব তবে শোন—দেহাদিতে আসক্তিত্যাগ না হইলে জ্ঞানোদয় হইতেই পারে না, সুতরাং) তুমি দেহাদিতে আসক্তি বা অভিমান পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মরূপতালাভের প্রযত্ন কর।

অজাগ্রৎস্বপ্ননিদ্রস্য যত্তে রূপং সনাতনম্।
সচেতনং বিশুদ্ধং চ তন্ময়ো ভব সর্বদা॥ ৭

হে রামচন্দ্র, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয়াতীত তোমার যে তুরীয় নিত্য জ্ঞানময় বিশুদ্ধ স্বরূপ, তুমি সর্বদা সেই ব্রহ্মরূপ হও।

মা ভব গ্রাহ্যভাবাত্মা গ্রাহকাত্মা চ মা ভব।
ভাবনামখিলাং ত্যক্ত্বা যন্ময়স্তন্ময়ো ভব॥ ৮

গ্রাহ্যরূপ হইও না, গ্রাহকরূপও হইও না; গ্রাহ্যগ্রাহকাত্মক যাবতীয় ভাবনা পরিত্যাগপূর্বক তুমি বস্তুতঃ যেরূপ সেরূপই অর্থাৎ তাহাই হও অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ হও।

সংকল্পেনৈব সংকল্পং মনসৈব মনো মুনে।
ছিত্ত্বা স্বাত্মনি তিষ্ঠ ত্বং কিমেতাবতি দুষ্করম্॥ ৯

হে মননশীল (অর্থাৎ বিচারকুশল) রামচন্দ্র, গ্রহণ বা ত্যাগরূপ (ত্যাজ্য-গ্রাহ্য) কোন সংকল্পই তুমি করিও না; নির্বাসন মন দ্বারাই সংকল্পাত্মক মনকে ছেদন করিয়া অর্থাৎ তাহাকে সংকল্পরহিত করিয়া স্বস্বরূপে (আত্মাতে) অবস্থান কর। সংকল্প ত্যাগ করা এমন কি দুষ্কর? (অর্থাৎ ইহা অতি অনায়াসসাধ্য—ইহাই ভাবার্থ)

কস্তবায়ং জড়ো মূকো দেহো ভবতি রাঘব।
যদর্থং সুখদুঃখাভ্যামবশঃ পরিভূয়সে॥ ১০

হে রামচন্দ্র, যে দেহের জন্য পরবশ হইয়া তুমি বিচিত্র সুখদুঃখাদির অধীন হইতেছ, সেই অচেতন মূক দেহ তোমার কে? অর্থাৎ তুমি দেহসম্বন্ধরহিত।

ক্ব মাংসরুধিরাদীনি ক্ব ত্বং চৈতন্যবিগ্রহঃ।
বিজানন্নপি দেহেঽস্মিন্নাত্মধীং ন জিহাসি কিম্॥ ১১

মাংসরুধিরাদিপূর্ণ এই দেহই বা কোথায় আর চৈতন্যমূর্তি (চৈতন্যস্বরূপ) তুমিই বা কোথায়? (অর্থাৎ সম্পূর্ণবিপরীতধর্মী এই উভয়ের কোন সম্বন্ধই নাই।) ইহা জানিয়াও তুমি এই দেহে আত্মাভিমান কেন ত্যাগ করিতেছ না?

এতাবতৈব দেবেশঃ পরমাত্মাবগম্যতে।
কাষ্ঠলোষ্টসমত্বেন দেহোঽয়মবগম্যতে॥ ১২

দেহকে কাষ্ঠ বা উপলখণ্ডতুল্য মনে করায় যে জ্ঞান, তদ্দ্বারাই জ্যোতির্ময় পরমাত্মা জ্ঞাত হন।

অহো নু চিত্রং যৎ সত্যং ব্রহ্ম তদ্বিস্মৃতং নৃণাম্‌।
যদসত্যমবিদ্যাখ্যং তৎ পুরঃ পরিবল্গতি ॥ ১৩

বিচার করিলে ইহা বড়ই আশ্চর্য বলিয়া মনে হয় যে, ব্রহ্ম যাহা সদা সদ্‌রূপ তাহাকেই লোকে ভুলিয়া বসিয়াছে এবং অসদ্‌রূপ অবিদ্যা অগ্রে স্ফুরিত হইতেছে। (স্বীয় স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া দেহকেই লোকে আত্মা মনে করিতেছে, ইহা বড়ই বিচিত্র।)

অন্যচ্চিত্রং যৎ পরমং ব্রহ্ম তদ্‌ বিস্মৃতং নৃণাম্‌।
যন্মমেদমবিদ্যাখ্যা তৎ পুরঃ প্রবলায়তে ॥ ১৪

ইহাও আশ্চর্য যে (স্বয়ংসিদ্ধ ও সদাস্বপ্রকাশ) পরব্রহ্মকে লোকে বিস্মৃত হইয়া আছে, আর অহঙ্কার-ও মমতাস্পদ যাবতীয় আবিদ্যাক পদার্থই অগ্রে অতি প্রবলরূপে (দৃঢ় সত্যরূপে) প্রতিভাত হইতেছে।

সর্বং ব্রহ্মেতি যস্যান্তর্ভাবনা সা বিমুক্তিদা।
ভেদবুদ্ধিরবিদ্যেয়ং সর্বথা তাং পরিত্যজ ॥ ১৫

ইতি যোগবাসিষ্ঠসার বিবরণে শুদ্ধিনিরূপণং নাম সপ্তমং প্রকরণম্‌ সমাপ্তম্‌।

হে রামচন্দ্র, 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ যে আন্তর্ভাবনা, তাহাই জীবকে বিমুক্তিফল প্রদান করিয়া থাকে। ক্রিয়াকারকাদি ভেদবুদ্ধিই অবিদ্যা, তুমি ঐ ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ কর।

যোগবাসিষ্ঠসার গ্রন্থের শুদ্ধিনিরূপণ নামক সপ্তম প্রকরণ সমাপ্ত।

৮। আত্মার্চন-প্রকরণ

বসিষ্ঠ উবাচ—

যদি দেহং পৃথক্‌কৃত্য চিতি বিশ্রম্য তিষ্ঠসি।
তদা তৃণীকৃতাশেষঃ স্বয়মেকো ভবিষ্যসি ॥ ১

বশিষ্ঠ বলিতেছেন—'হে রামচন্দ্র, যদি তুমি দেহকে বিচারসহায়ে পৃথক্‌করতঃ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে চিত্ত একাগ্র করিয়া অবস্থান কর, তাহা হইলে সর্ববিশ্ব তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে এবং তুমি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হইবে।'

যেনেদং বেৎসি তজ্‌জ্ঞাত্বা কুরু প্রত্যঙ্‌মুখং মনঃ।
ততঃ প্রকাশরূপত্বং দ্রক্ষ্যসি স্ফুটমাত্মনঃ ॥ ২

যে আত্মচৈতন্য দ্বারা তুমি এই সর্বজগৎকে জানিতেছ, তাঁহাকে জানিয়া মনকে আত্মাভিমুখী কর। তখন সেই মনসহায়ে তুমি আত্মার প্রকাশরূপতা নিশ্চিতরূপে জানিতে সমর্থ হইবে।

যেন শব্দং রসং রূপং গন্ধং জানাসি রাঘব।
তমাত্মানং পরং ব্রহ্ম জানীহি পরমেশ্বরম্‌ ॥ ৩

বসিষ্ঠ বলিতেছেন, 'হে রামচন্দ্র, যাঁহার দ্বারা তুমি রূপরসাদি বিষয় অবগত হইয়া থাক, সেই আত্মাকে (প্রত্যাগাত্মাকে) তুমি সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর পরব্রহ্মরূপে জান।'

যত্র ভাবা হি স্পন্দন্তে নির্মীয়ন্তে চ যেন চ।
তমেবাত্মানমাত্মানং রূপং জানীহি রাঘব॥ ৪

হে রামচন্দ্র, যে আত্মাতে স্থিত হইয়া সর্বপদার্থ স্পন্দিত হইতেছে এবং যে আত্মা হইতে উহারা উৎপন্ন হইতেছে, সেই আত্মাকেই তুমি পরমাত্মা, নিজের স্বরূপ বলিয়া জানিও।

যদ্ যজ্‌জ্ঞেয়মিদং তত্ত্বং নেতি সংত্যজ্য যুক্তিভিঃ।
প্রাপ্যাবশিষ্ট চিন্মাত্রং সোঽহমস্মীতি ভাবয়॥ ৫

জ্ঞানগোচর যে যে পদার্থকে তুমি তত্ত্ব (যথার্থ) বলিয়া মনে করিতেছ, যুক্তিসহায়ে তাহা নিরাকরণকরতঃ (মিথ্যাবোধে ত্যাগকরতঃ) সর্ব নিষেধের অবধিভূত অবশিষ্ট চিন্মাত্র-বস্তু লাভ করিয়া, এই চিন্মাত্রবস্তুই আমি, এইপ্রকার চিন্তা কর।

জ্ঞানং ন ভবতো ভিন্নং জ্ঞেয়ং জ্ঞানাৎ পৃথঙ্ ন হি।
অতো নাত্মেতরং কিঞ্চিৎ তস্মাদ্ ভেদো ন বিদ্যতে॥ ৬

জ্ঞান তোমা হইতে ভিন্ন নহে, জ্ঞেয়বস্তুও জ্ঞান হইতে পৃথক নহে, অতএব আত্মা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থই নাই। সুতরাং দ্বৈত বা ভেদের একান্তই অভাব অর্থাৎ দ্বৈত বা ভেদ বলিয়া কিছুই নাই।

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেন্দ্রাদ্যাঃ যদ্ যৎ কুর্বন্তি সর্বতঃ।
তদহং চিদ্বপুঃ সর্বং করোমীত্যেব ভাবয়॥ ৭

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্বদা সৃষ্টি, পালন ও সংহারাদি যাহা যাহা কর্ম করিয়া থাকেন, চৈতন্যস্বরূপ আমিই সেই সমস্ত করি—এইরূপ চিন্তা কর।

অহং সর্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমব্যয়ঃ।
ন ভূতং নাস্তি নো ভাবি মত্তোঽন্যদিতি ভাবয়॥ ৮

এই সর্ব বিশ্ব আমারই রূপ। অবিনাশী পরমাত্মাও আমি। অতএব আমা হইতে ভিন্ন কিছু উৎপন্ন হয় নাই, বর্তমানেও নাই এবং ভাবিকালেও থাকিবে না—এইরূপ চিন্তা কর।

একং ব্রহ্ম চিদাকারং সর্বাত্মকমখণ্ডিতম্।
নিষ্কম্পং ভূরি বাশেষমিতি ভাবয় যত্নতঃ॥ ৯

আমি এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ, সর্বস্বরূপ, অব্যয়, কম্পন-বা চলনরহিত, অশেষ সর্বরূপ ব্রহ্ম—সযত্নে এইরূপ চিন্তা কর।

নাহং ন চান্যদস্তীতি ব্রহ্মৈবাস্তি নিরন্তরম্।
আনন্দপূর্ণং সর্বত্রেত্যনুদ্বেগাদুপাস্যতাম্॥ ১০

অহঙ্কার বস্তুতঃ নাই, অন্য কোন পদার্থও বস্তুতঃ নাই। আনন্দস্বরূপ, সর্বত্র নিরন্তর এক ব্রহ্মই বিদ্যমান—বিষয়াদি চিন্তা-ও উদ্বেগরহিত হইয়া সে ব্রহ্মের উপাসনা কর (চিন্তন কর)।

গ্রাহ্যগ্রাহকসম্বন্ধে সামান্যে সর্বদেহিনাম্।
যোগিনঃ সাবধানত্বং যত্তদর্চনমাত্মনঃ॥ ১১

ইতি যোগবাসিষ্ঠসারে আত্মার্চনং নামাষ্টমং প্রকরণম্ ।

(সত্যজ্ঞানে) গ্রাহ্যগ্রাহকসম্বন্ধাত্মক সর্বব্যবহার সকল জীবেই তুল্য। যোগিগণ (তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুগণ) ইহা হইতে বিরত হইয়া অবধানতার সহিত তত্ত্বচিন্তনেই রত থাকেন। ইহাই আত্মার যথার্থ পূজা (পুষ্পাদির দ্বারা পূজা যথার্থ পূজা নহে)।

যোগবাসিষ্ঠসার গ্রন্থের আত্মার্চন বা আত্মপূজা নামক অষ্টম প্রকরণ সমাপ্ত।

নির্ভর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ঝাঁপ দিতে ভয় পাই অকূলে—কূল ডাকে যেই : "কোলে আয়",
যাই ভুলে—তার ঝিকিমিকি হঠাৎ-ঝড়ে নিভে যায়।
অল্প সুখের জল্পনাতে
অবুঝ হৃদয় তবুও মাতে,
জলে সে আল্পনা কাটে তোমার অপরূপ লীলায় :
ঝাঁপ দিতে তাই ভয় পাই—যেই কূল ডাকে : "আয় কোলে আয়।"

অকূলে কোন অচিন কূলে টেনে প্রেমল তুলতে চায়,
নাই জানলাম—জানি যদি—ঠাঁই পাব তার রাঙা পায়।
উঠলে তুফান, ছাইলে নিশা
নাই বা মিলল পারের দিশা,
পায় যে আলোর বর—সে কি আর ডরায় কালো ঢেউয়ের ঘায় ?
ঝাঁপ দেয় সে অকূলে—যেই ডাকে বাঁশি : "আয় রে আয়।"

জাতমাষ্টার শ্রীম দর্শন

শ্রীতরণী পুরকায়স্থ

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার অব্যবহিত পরে খাসিয়া পাহাড়ের পল্লীগ্রাম 'সোবারপুঞ্জী' থেকে জনৈক বন্ধুসহ প্রসিদ্ধ পুণ্যতীর্থ ৺শ্রীক্ষেত্র ও ৺ভুবনেশ্বর দর্শনে গিয়েছিলাম। দিন কয়েক অবস্থান করে ঐ তীর্থস্থান দু'টির পুণ্য দর্শনাদি লাভের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। অতঃপর কলকাতা ফিরে এসে আমরা বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের জনকয়েক ভক্তবন্ধুর ওয়েলিংটন স্ট্রীটস্থ একটি মেসে দিনকয়েক অবস্থান করেছিলাম। ঐ সময় একদিন ভোরবেলা স্নানাদি সেরে যুগাবতার ৺ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাধন্য পার্ষদ পূজনীয় শ্রীম মাষ্টার মহাশয়কে দর্শন করবার মানসে তাঁর আমহার্স্ট- স্ট্রীটস্থ বাসভবনে গিয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছুতে আমাদের প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছিল। দ্বারে দণ্ডায়মান দারোয়ানের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় খবরাদি নিয়ে আমরা তাঁর বাসগৃহের দিকে অগ্রসর হ'লাম। তখন তিনি তাঁর চারতলা বাড়ীতে অবস্থান করতেন।

আশ্রমসদৃশ তাঁর বাসগৃহটি ছিল বেশ প্রশস্ত; কিন্তু তা অতি সাধারণ আসবাবে সজ্জিত। অতি সাধারণ একটি খাটের ওপর ছিল তাঁর বিছানা, তার ওপর বিছানো একখানা মৃগচর্ম। পার্শ্বে একটা টেবিল এবং কাপড়ের একটা ইজিচেয়ার, স্বল্প দূরে ছিল হস্তবিহীন দু'খানা চেয়ার এবং দু'খানা বেঞ্চ। এর কিছু পিছনে ছিল দু'খানা বিছানো কম্বল। ঐগুলির ব্যবহার হ'ত সম্ভবতঃ কীর্তন ও ভজনাদির সময়। টেবিলের ওপর ছিল জলপূর্ণ একটি কাঁচের গ্লাস, সেটির গায়ে লেখা ছিল পতিতপাবন ৺ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নাম। দেওয়ালে টাঙানো ছিল যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো এবং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর একটি ছবি। তা'ছাড়া একটা মৃদঙ্গও তাতে ঝুলানো ছিল। একটা তাকের ওপর ছিল খানকয়েক পুস্তক এবং অপর একটি তাকের ওপর ছিল বাঁশ-বেত-নির্মিত একটি সাজি এবং ঐরূপই বাঁশ-বেত-নির্মিত আরও দু'একটা ছোট পাত্র।

তাঁর বাসগৃহে প্রবেশ করেই তাঁকে দর্শন করবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। রজত-শুভ্র কেশ ও শ্মশ্রু, সৌম্য শান্ত বিনীত ও ভক্তিপ্লুত মূর্তি, তপস্বীর চেহারা, চক্ষু দু'টি তপস্যালব্ধ স্নিগ্ধ জ্যোতিতে উজ্জ্বল। দৃষ্টিতে পড়া মাত্রই মনে পড়ল প্রেমাবতার ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তকুল-চূড়ামণি পার্ষদ-গণের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে উল্লেখ আছে—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবদৃষ্টিতে তাঁকে দেখেছিলেন সেই প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরই দলে। গৃহে তিনি ছিলেন একাকী। আমরা তাঁর জন্য শ্রীক্ষেত্র থেকে আনীত পবিত্র মহাপ্রসাদ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সে কথা তাঁকে বলা মাত্রই তিনি ঐ পবিত্র মহাপ্রসাদ রাখবার জন্য শুদ্ধ পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। দেওয়ালের তাকে রক্ষিত দু'তিনটি পাত্র যাচাই করে একটি পাত্র বাছাই করলেন এবং আমাকে তার মধ্যে ঐ মহাপ্রসাদ রাখতে বললেন। রাখার পর হাত ধুয়ে ফেলতে

বললেন আমাকে। বিশাল এবং বিস্তৃত সৌধের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি মৃৎপাত্রে জল রাখা ছিল। সেগুলির ভেতর থেকেও দেখে দেখে একটি বেছে দিলেন, তা থেকে জল নিয়ে হাত ধোয়ার পর তাঁর সঙ্গে আমরা তাঁর গৃহে প্রবেশ করলাম। 'মহাপ্রসাদের' প্রতি তাঁর এরূপ একান্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা দেখে তো আমরা অবাক! 'মহাপ্রসাদের' প্রতি হৃদয়ে কিরূপ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা পোষণ করতে হয়, আমাদের তা শিক্ষা দেবার জন্যই যেন 'জাতমাষ্টার'-সুলভ প্রকৃতিবশতঃ স্বয়ং আচরণ করে দেখালেন।

এতক্ষণ আমরা তাঁকে প্রণাম করতে পারিনি; যেহেতু আমার হস্তে ছিল পবিত্র মহাপ্রসাদ। এখন হস্ত প্রসাদমুক্ত হওয়ায় আমরা তাঁকে ভক্তিভরে নতশিরে প্রণাম করলাম। বসবার আসন দেখিয়ে তিনি আমাদের বসতে আজ্ঞা করলেন। হাতল-বিহীন দু'খানা কেদারার উপর আমরা দু'জন বসলাম। অতঃপর বললেন, "এখন আপনাদের পবিত্র মহাতীর্থ ৺শ্রীক্ষেত্রদর্শনের পুণ্য কাহিনী বর্ণনা করুন, মানসনেত্রে আমরা ৺পুরুষোত্তম দর্শন করি।" আমরা তখন ঐসকল পুণ্যকাহিনী সংক্ষেপে তাঁর নিকট বর্ণনা করলাম। মনোযোগ সহকারে তিনি তা' শ্রবণ করলেন।

তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মঠ ও মিশনের সাধুদের সঙ্গে আমাদের কেমন আলাপ ও পরিচয় আছে। আমরা ইতিবাচক উত্তর দেওয়ায় আবার জিজ্ঞাসা করলেন, যা'দের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে, এমন দু'চার জন সাধুর নাম বলতে। আমরা তখন আমাদের পরিচিত জনকয়েক বিশিষ্ট সাধুর নাম বললাম। তারপর তিনি আমাদের বললেন, "সাধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা করে অথবা চিঠিপত্রাদি লিখে। অনেক সাধু আছেন যাঁরা বিশেষ ধ্যান-ও তপস্যাপরায়ণ। তাঁরা অধিক চিঠিপত্রাদি লিখে সময় ব্যয় করতে পছন্দ করেন না। অতএব এরূপ তপস্বী সাধুর কাছে পত্র লিখবার কালে লিখে জানাবেন 'পত্রের লিখিত উত্তরপ্রার্থী নই।' তাঁরা পত্র পেয়ে পত্রলেখককে কেবল স্মরণ করলেই লেখকের মহাকল্যাণ হবে। এভাবে সাধুদের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখবেন।" ইত্যাদি। সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য বর্ণনা করে কিভাবে সাধুসঙ্গ করতে হয়, এবার তা' শিক্ষা দিলেন।

অতঃপর খাম থেকে একখানা পত্র বের করে বললেন, "এ পত্রখানা একজন সাধু লিখেছেন। পাঠ করছি আমি, আপনারা শ্রবণ করুন।" বলেই তিনি স্বয়ং পত্রখানা পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। মনোযোগ সহকারে তা' আমরা শ্রবণ করতে লাগলাম। তা'তে লেখা ছিল, "শ্রীচরণকমলেষু, পূজনীয় মাষ্টার মহাশয়! পিতামাতা ও গৃহ ত্যাগ করে সত্যোপলব্ধি এবং ভগবানলাভের আশায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এত কাল করছিলাম কি? কেবল সময়েরই অপব্যয় করেছিলাম মাত্র। এজন্য এখন আর মনে শান্তি পাচ্ছি না, কেবল অনুশোচনাই হচ্ছে। তাই তপস্যা করবার মানসে বর্তমানে '৺উত্তরকাশী' এসেছি। আশীর্বাদ করবেন, শ্রীশ্রী৺ঠাকুরের ইচ্ছায় উদ্দেশ্যের দিকে যেন অগ্রসর হতে পারি" ইত্যাদি। পত্রখানার পাঠ সমাপ্ত করেই তিনি নিজেই বলতে লাগলেন, 'এবার হয়ে যাবে তাঁর, এবার হয়ে যাবে তাঁর। অনুশোচনা যখন মনে এসেছে,

এবার সব ঠিক হয়ে যাবে' ইত্যাদি। পত্র-লেখকের নাম কিন্তু পাঠ করলেন না।

তারপর বললেন, এবার আমরা একটু ধ্যান করি। এই বলেই তিনি ধ্যানে বসবার জন্য আমাদের দিলেন আসনের আকারে ভাঁজ করা দু'খানা কম্বল। তিনি নিজে বসলেন ধ্যান করতে নিজ খাটের উপরিস্থিত মৃগচর্মাসনের উপর। আমরা ধ্যান করতে বসলাম নীরবে নিজ নিজ কাষ্ঠাসনের উপর উক্ত কম্বল দুটি স্থাপন করে। এ ভাবে কিছু সময় ধ্যানে কাটাবার পর যখন ১০টা বাজল তখন তিনি আসন থেকে উঠে আমাদের বললেন—এখন হয়তো আপনাদের আহারের সময় হয়েছে, এবার আসুন। আমরাও তখন উঠে তাঁকে ভক্তিনত শিরে প্রণাম করে আমাদের বাসস্থানে ফিরে এলাম। এইভাবে তিনি তাঁর 'জাত-মাষ্টার'-সুলভ স্বভাববশতঃ স্বয়ং একটির পর একটি আচরণ করে সর্বশেষে কিভাবে ধ্যান করতে হয় তাও প্রদর্শন করে আমাদের বিদায় দিলেন। সঙ্গে করে আমরা নিয়ে এলাম হৃদয়ভরা আনন্দময় পুণ্যস্মৃতি, যা স্মরণ করে এ সুদীর্ঘকাল পরেও হৃদয় আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠে।

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অশেষকৃপাধন্য লীলাসহচর শ্রীমকে ডাকতেন 'মাষ্টার'। এ নাম তাঁর জীবনে সার্থক হয়ে উঠেছিল। তিনি ছিলেন সত্যি 'জাতমাষ্টার', সত্যস্বরূপ ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে মাষ্টার ডাকতেন, তিনি 'জাতমাষ্টার' হবেন বই কি। তাঁর চালচলন, কথা-বার্তা, আচরণ ও যাবতীয় কাজকর্মের মধ্যেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল মাষ্টারসুলভ প্রকৃতি। তাঁর মাষ্টারির গণ্ডি সীমিত ছিল না কেবল বিদ্যালয়ের আবেষ্টনীর মধ্যে। বিদ্যালয়ের বাহিরেও ছিলেন তিনি মাষ্টার। তাঁর জাতমাষ্টারির মাধ্যমে কত যুবকের জীবনপথ সত্যসন্ধানী হয়ে উঠেছিল, কত সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্তেরই বা উদ্ভব হয়েছিল! এমন কি যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ মানস-পুত্র রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), অন্তরঙ্গ পার্ষদ বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ), সুবোধ (স্বামী সুবোধানন্দ), পূর্ণ, তেজচন্দ্র, পল্টু, ক্ষীরোদ এবং নারায়ণও তাঁর এ মাষ্টারির মাধ্যমেই অবতারবরিষ্ঠের প্রথম সন্ধান পেয়েছিলেন।

পূজ্যপাদ শ্রীম মাষ্টার মহাশয়কে দর্শন করবার সৌভাগ্য আমার ইতিপূর্বেও বার কয়েক হয়েছিল। প্রথম হয়েছিল কয়েকবার ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম মহাসম্মেলন-কালে বেলুড় মঠে। তারপর ১৯২৯ খ্রীঃ আবার দর্শন হয়েছিল ঐ মঠেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বর্তমান নূতন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ কর্তৃক প্রথম বার স্থাপন-কালে। ঐ সময় তিনিও মঠে উপস্থিত থেকে ঐ 'ভিত্তিপ্রস্তরে'র উপর সুরকী মসলাদি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এবারের মতো তাঁর পূত সান্নিধ্যলাভ, তাঁর মুখনির্গত পুণ্যকথা-শ্রবণ এবং সর্বোপরি তাঁর নিকট হতে এভাবে দুর্লভ শিক্ষালাভের সুযোগ ও সৌভাগ্য ইতিপূর্বে কখনও হয়নি।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী চেতনানন্দ

পঞ্চম অঙ্ক : বৈরাগ্যোৎপত্তি

দৃঢ়বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলি মন থেকে সরে যেতে আরম্ভ করলে মন নিজেকে লঘু মনে করে। লৌকিক জগতেও দেখা যায় যে উদ্বেগ, দুর্ভাবনা এবং বিভিন্ন ঝামেলা থেকে মুক্ত মানুষ নিজেকে খুব সতেজ ও স্নিগ্ধ মনে করে এবং উদাসী ভাবের লঘুতা তাকে তৃপ্তি এনে দেয়। তাই পঞ্চম অঙ্কের প্রারম্ভে আমরা শ্রদ্ধার খেদোক্তি শুনতে পাই : কাম ক্রোধাদি ভ্রাতৃগণ আমার অপকার করলেও তাদের বিনাশে 'নিকৃন্ততীব মর্মাণি দেহং শোষয়তীব মে' অর্থাৎ আমার মর্ম ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং দেহ শুকিয়ে আসছে। যাহোক দূতীরূপী এই শ্রদ্ধা বিবেক ও মহামোহের সমর-সংবাদ বহন করে নিয়ে চললেন চক্রতীর্থে (সংসার-সাগর-তরণীর কর্ণধার ভগবান শ্রীহরির বাস) বিষ্ণুভক্তির কাছে। প্রিয়জনের জয় বা উন্নতি নিশ্চিত জেনেও অনিষ্টাশঙ্কা মনকে ব্যথিত করে; ইহা প্রিয়ানুরাগের গভীরতারই ফল। শ্রদ্ধার মুখে বিজয়বার্তা শুনে দেবী বিষ্ণুভক্তির সেই উদ্বেগ দূর হল

শ্রদ্ধা যুদ্ধকাহিনী বলে চললেন : মহারাজ বিবেক কাশী অবরোধ করে ন্যায়দর্শনকে দূত করে মহামোহের কাছে পাঠালেন। মহামোহ রেগে বিকট ভ্রুকুটি বিস্তার করে অতি পাষণ্ড-দের সঙ্গে পাষণ্ডশাস্ত্রসকলকে যুদ্ধে পাঠাল। এদের রোধ করবার জন্য বাগ্‌দেবী সরস্বতী, বেদ-বেদাঙ্গ-পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস, বৈষ্ণবশাস্ত্র, শৈবশাস্ত্র, মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য এবং মহাভাষ্যাদিতে পরিবৃতা হয়ে বিপক্ষদের পর্যুদস্ত করে দেশান্তরী করে ছাড়লেন। এখানে কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয় : প্রথমতঃ বেদান্ত ব্যবহারে ন্যায় ও ভট্টমত প্রয়োগ করে থাকেন; তাই তর্কবহুল ন্যায়শাস্ত্রের দূতের ভূমিকা। দ্বিতীয়তঃ বিবেকপক্ষে শাস্ত্রসমূহের মধ্যে তত্ত্ববিচারে অবান্তর বিরোধ থাকলেও বেদ-সংরক্ষণ ও নাস্তিকপক্ষ-খণ্ডনব্যাপারে সবাই একমত। তৃতীয়তঃ এ সংগ্রাম আস্তিক্য-দর্শন ও নাস্তিক্যদর্শনের মধ্যে।

তারপর বস্তুবিচারের দ্বারা কাম হত হল। ক্রোধ, হিংসা ও নিষ্ঠুরতাদের সংহার করলেন ক্ষমা। লোভ, তৃষ্ণা, দৈন্যাদি, চৌর্য, মিথ্যাবাদ, প্রতিগ্রহ—এদের দমন করলেন সন্তোষ। আর অনসূয়া জয় করলেন মাৎসর্যকে ও পরোৎকর্ষকামনা জয় করলেন মদকে। শত্রুর শেষ মহামোহ যোগব্যাঘাতের সঙ্গে গুপ্তস্থানে লুকিয়ে পড়লেন। এখানে লেখক নাটকের মধ্যে দেখিয়ে গেলেন জ্ঞানলাভের সাধনগুলি।

বিষ্ণুভক্তি মনের সংবাদ জানতে চাওয়ায় শ্রদ্ধা বললেন, 'দেবি, তিনিও পুত্রপৌত্রাদির বিনাশজনিত শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে জীবন বিসর্জন করতে উদ্যত হয়েছেন।' এ কথা শোনামাত্র বিষ্ণুভক্তি বৈরাগ্য-উৎপাদনের জন্য ব্যাস-সরস্বতীকে (বেদান্তদর্শন) মনের কাছে পাঠালেন।

এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মন নিজের পুত্র কাম, ক্রোধ ও অহংকারকে, পৌত্র লোভ, রাগ, দ্বেষাদিকে, অসূয়া প্রভৃতি কন্যাকে এবং আশা,

তৃষ্ণাদি পুত্রবধূদের হারিয়ে হাহুতাশ করতে লাগলেন। এমন সময় মনের মন্ত্রী এসে সংবাদ দিল যে পুত্রশোকানলে দগ্ধ হয়ে মনের প্রিয়তমা পত্নী প্রবৃত্তি দেবী প্রাণত্যাগ করেছেন। মন তা শুনে পাগলের ন্যায় আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে ব্যাস-সরস্বতী এসে বাধা দিয়ে বললেন, 'বৎস, তুমি তো জান, সংসারের সকল বস্তুই অনিত্য; তাই বলি, সংসারের অনিত্যতা চিন্তা কর। নিত্যা-নিত্যবস্তুদর্শীকে শোকাবেগ স্পর্শ করতে পারে না। শাস্ত্র বলেছেন, "একমেব সদা ব্রহ্ম সত্যমন্যদ্বিকল্পিতম্। কো মোহস্তত্র কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥" স্নেহের দোষেই এরূপ বৈকল্য দেখা দেয়; আর তা ছাড়া আত্মহত্যা মহাপাপ। এভাবে সরস্বতী মনকে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করলেন।

তারপর সরস্বতী মনকে বললেন, 'দেখ বৎস, গৃহী ব্যক্তির ক্ষণকালও অনাশ্রমী হয়ে থাকতে নেই; অতএব আজ থেকে নিবৃত্তিই তোমার সহধর্মিণী হবে। শম, দম, সন্তোষ প্রভৃতি পুত্রেরা তোমার সেবা করবে; যম, নিয়মাদি তোমার সহচর হবে; তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র বিবেক তোমার অনুগ্রহে উপনিষদ্ দেবীর সহিত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হোক; মৈত্রী, দয়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা—এই চার ভগিনী তোমার পরিচারিকা হল। তুমি সুস্থ থাকলে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ আত্মাও প্রকৃতিস্থ হবেন।' মন এ সব কিছু মাথা পেতে গ্রহণ করল এবং অবসাদরূপ বিকলতা থেকে মুক্ত হয়ে খুশী হল।

ষষ্ঠ অঙ্ক : জীবন্মুক্তি

স্বামী বিবেকানন্দ থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে শিষ্যশিষ্যাদের বলেছিলেন: "'প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে' আছে মহামোহ ও বিবেক এই দুই রাজার লড়াই বেধেছিল। বিবেক-রাজার সম্পূর্ণ জিত আর হয় না। অবশেষে বিবেকরাজার সঙ্গে উপনিষদ্ দেবীর পুনর্মিলন হয় এবং তাঁদের প্রবোধরূপ পুত্রের জন্ম হল। আর সেই পুত্রের প্রভাবে তাঁর শত্রু বলে আর কেউ রইল না। তখন তাঁরা পরম সুখে বাস করতে লাগলেন। আমাদের প্রবোধ বা ধর্মসাক্ষাৎকাররূপ মহৈশ্বর্যবান পুত্র লাভ করতে হবে। ঐ প্রবোধরূপ পুত্রকে খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করতে হবে, তা হলেই সে মস্ত একটা বীর হয়ে দাঁড়াবে।" (দেববাণী—পৃঃ ১০৬)

এই শেষ অঙ্কের নামকরণটি সত্যই সুন্দর। শাস্ত্র বলেন—'জীবন্মুক্তিসুখপ্রাপ্তি-হেতবে জন্মধারিতম্। আত্মনা নিত্যমুক্তেন ন তু সংসারকাম্যয়া॥' অর্থাৎ নিত্যমুক্ত আত্মা যে জন্মগ্রহণ করেন তা জীবন্মুক্তিসুখভোগ করবার জন্য, সংসারকামনায় নহে। এই জীবন্মুক্তির সাধন-প্রসঙ্গে শ্রীমৎ বিদ্যারণ্য মুনি তাঁর 'জীবন্মুক্তিবিবেক' গ্রন্থে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উপশম প্রকরণ থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনা-ক্ষয়—জীবন্মুক্তির ত্রিবিধ সাধন এবং ওগুলি সাপেক্ষ। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার উপায়—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। প্রশ্ন উঠবে—কি শ্রবণ করতে হবে?—না তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য। ঐ মহাবাক্য কোথায় থাকে?—না উপনিষদে। উপনিষদ্ বা শ্রুতিকে শাস্ত্রকারেরা মহাকল্যাণ-ময়ী জননী বলে সম্বোধন করেছেন। আর একমাত্র উপনিষদ্ই জীবব্রহ্মৈক্যবোধক মহাবাক্য প্রসব করেছেন। ঐ সব মহাবাক্যের মর্মার্থই হচ্ছে মুক্তি। এ বোধ সাধারণ বোধ নয়, প্রবোধ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বোধ। রাহুর শিরের ন্যায় এই প্রবোধ ও মুক্তি অভেদ। বিবেক (অর্থাৎ হেয় বস্তু হতে উপাদেয় বস্তুর

পৃথক্করণ) ছাড়া উপনিষদ্ প্রবোধকে উৎপন্ন করতে পারেন না। ইহাই দার্শনিক দিক।

রাজ্যজয়ের পর রাজা বিবেক শান্তিকে উপনিষদ্ দেবীকে আনতে পাঠালেন। পথে শান্তির সঙ্গে তাঁর মা শ্রদ্ধার দেখা। শ্রদ্ধার মুখে শান্তি শুনলেন যে, হতভাগ্য মহামোহ দুর্দশাপন্ন হয়েও, সাংসারিক সুখে পুরুষকে প্রলোভিত করবার জন্য 'মধুমতী' নামক সর্বসিদ্ধির সঙ্গে যোগবিঘ্নদের তাঁর নিকট পাঠিয়েছিল। তারা পুরুষকে ভেল্কি দেখিয়ে অপ্সরাদের রূপ ধরে বলতে লাগল, 'তুমি এখানে এস। এখানে জরা নেই, মৃত্যু নেই—এ স্থানটি স্বভাবতই রমণীয়। এই দেখ বিদ্যাধরীরা মঙ্গলার্ঘ্য হাতে নিয়ে তোমার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে।' এই দারুণ মোহ থেকে তর্ক পুরুষকে বাঁচিয়ে দিল এবং পুরুষ বিবেকের সঙ্গে যুক্ত হতে চললেন। নাটকের এই অংশটুকুর সহিত পাতঞ্জল যোগদর্শনের বিভূতিপাদের ৫১ সূত্রের যথেষ্ট মিল আছে। দেবতারা পর্যন্ত মুক্তিপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। ঐ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান ব্যাসদেব লিখেছেন, 'তত্র মধুমতীং ভূমিং সাক্ষাৎ কুর্বতো ব্রাহ্মণস্য স্থানিনো দেবাঃ সত্ত্বশুদ্ধিমনুপশ্যন্তঃ স্থানৈরুপনিমন্ত্রয়ন্তে, ভোঃ ইহাস্যতাং, ইহ রম্যতাং, কমনীয়োঽয়ং ভোগঃ, কমনীয়েয়ং কন্যা, রসায়নমিদং জরামৃত্যুং বাধতে, বৈহায়সমিদং যানং, অমী কল্পদ্রুমাঃ পুণ্যা মন্দাকিনী, সিদ্ধা মহর্ষয়ঃ, উত্তমা অনুকূলা অপ্সরসঃ, দিব্যে শ্রোত্রচক্ষুষী, বজ্রোপমঃ কায়ঃ, স্বগুণৈঃ সর্বমিদমুপার্জিতায়ুষ্মতা, প্রতিপদ্যতামিদমক্ষয়মজরমমরস্থানং দেবানাং প্রিয়মিতি।' ঈশ্বরের পথে যে সাধক চলতে শুরু করেছে তার যোগবিঘ্ন ঘটাবার একখানি অপূর্ব চিত্র তুলে ধরেছেন শ্রীকৃষ্ণমিশ্র যতি ও ব্যাসদেব। যে সাধক ঐ মধুমতী নামক ভূমি অতিক্রম করতে পারে সেই ক্রমে যোগে সিদ্ধ হয়।

নির্বাসিতা উপনিষদ্ শান্তিকে নিজের বেদনার কথা বললেন, 'সখি, যিনি ইতরলোকের স্ত্রীর ন্যায় বহুদিন হতে আমাকে একলা ফেলে চলে গিয়েছিলেন, সেই নিষ্ঠুর স্বামীর মুখ আমি কি করে দেখব?' মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী সখীর ন্যায় শান্তি উপনিষদ্‌কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'কেন তাঁকে ভর্ৎসনা করছো? অত্যন্ত বিপদে পড়েছিলেন বলেই তিনি তোমার কাছে যেতে পারেননি। এসব মহামোহের দুশ্চেষ্টা। আর দেখ, স্বামী কোন বিপদে পড়লে, তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করে থাকাই কুলবধূদের নৈসর্গিক ধর্ম।' তারপর উভয়ে রাজা বিবেকের নিকট গিয়ে নমস্কার করে উপবেশন করলেন।

পুরুষ ও স্বামী বিবেকের কাছে উপনিষদ্ বলে চললেন নিজ নির্বাসিত জীবনের সব বেদনার কথা। কি করে তিনি আশ্রয়ের জন্য দুয়ার থেকে দুয়ারে ঘুরে বেড়িয়েছেন; কিন্তু কেউ তাকে আশ্রয় দেয়নি। কেন উপনিষদ্ মীমাংসক তার্কিক প্রভৃতিদের কাছে আশ্রয় পাননি, শ্রীকৃষ্ণমিশ্র যতি তা উপনিষদের মুখ থেকে বলিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা এই উপনিষদ্ বা বেদান্তের সর্বোৎকৃষ্টতা দেখিয়েছেন। আশ্রয়ের জন্য উপনিষদ্ আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন এভাবে :

যস্মাদ্বিশ্বমুদেতি যত্র রমতে যস্মিন্ পুনর্লীয়তে
ভাসা যস্য জগদ্বিভাতি সহজানন্দোজ্জ্বলং
যন্মহঃ।
শান্তং শাশ্বতমক্রিয়ং যমপুনর্ভবায় ভূতেশ্বরং
দ্বৈতধ্বান্তমপাস্য যান্তি কৃতিনঃ প্রস্তৌতি
তং পুরুষম্॥

অর্থাৎ যাঁর থেকে এই বিশ্বের জন্ম এবং যাঁতে

স্থিতি ও লয়; যাঁর জ্যোতিতে জগৎ জ্যোতিষ্মান, যিনি উজ্জ্বল তেজোময়, আনন্দ-স্বরূপ, শান্ত, শাশ্বত, অক্রিয়, সর্বভূতের ঈশ্বর; পুনর্জন্মরোধ এবং দ্বৈত-অন্ধকার নাশ করবার জন্য যোগীরা যাঁর ধ্যান করেন—আমি সেই পুরুষের গুণকীর্তন করি

উপনিষদ্ যে কেবলমাত্র পরমপুরুষের গুণকীর্তন করবেন তা মীমাংসকদের পছন্দ হল না। তারা বলল, 'যদি পাপপুণ্যের কর্তা ভোক্তা জীবাত্মার স্তবস্তুতি করতে পার তবে তোমাকে স্থান দিতে পারি। আর তা ছাড়া তোমার সংসর্গে আমাদের ছাত্ররা বাসনা ত্যাগ করে কর্মকাণ্ডে শ্লথাদর হবে। অতএব তুমি স্বচ্ছন্দে যেতে পার।' তার্কিকেরাও (ন্যায়মত) উপনিষদের ঐ আত্মপরিচয় শুনে বলল, 'না, তোমাকে আমরা চাই না। কারণ আমাদের মতে জীবাত্মা ও ঈশ্বর ভিন্ন। পরমাণু হতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে; ঈশ্বর নিমিত্ত-কারণ মাত্র।' আর এক তার্কিক (সাংখ্যমত) সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী তার্কিককে সক্রোধে বলল, 'আরে পাপিষ্ঠ! যেমন দুধের বিকার দই, সেরকম ঈশ্বরকে কেন বিকারী বলে দাঁড় করাচ্ছিস?—না রে না, প্রকৃতিই জগৎ-উৎপত্তির প্রধান কারণ।' এভাবে বিভিন্ন মতবাদীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে উপনিষদ্ গীতার আশ্রমে আশ্রয় নিলেন।

উপনিষদের কথা শেষ হলে নিদিধ্যাসন দেবী বিষ্ণুভক্তির দূতরূপে এসে উপনিষদ্‌কে চুপি চুপি বললেন, 'দেখুন দেবি, দেবতারা সঙ্কল্প-উদ্ভূত, মনেতেই তাঁদের সন্তান-উৎপত্তি হয়। আর ধ্যানযোগেও আমি জেনেছি, আপনি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন। আপনার গর্ভে বিদ্যা নামে এক কন্যা এবং প্রবোধচন্দ্রোদয় নামে একটি পুত্র বর্তমান। এখন আপনি সঙ্কর্ষণ-বিদ্যার দ্বারা কন্যাটিকে মনেতে সংক্রামিত করে পুত্রটিকে পুরুষের নিকট সমর্পণ করুন।' উপনিষদ্ সম্মতি জানিয়ে স্বামী বিবেকের সঙ্গে বিদায় নিলেন।

তারপর প্রবোধচন্দ্র প্রবেশ করে নিজ অদ্বৈতানুভূতির আভাস উল্লেখ করে পুরুষের সঙ্গে মিলিত হলেন। পুরুষ প্রবোধরূপ জীবন্মুক্তি লাভ করে দেবী বিষ্ণুভক্তিকে বলে উঠলেন, 'ভগবতি, এর চেয়ে আমার আর কিছু প্রিয় নেই। সব শত্রু শেষ করে বিবেক কৃতার্থ হয়েছে এবং আমিও নির্মল হয়ে সদানন্দপদে অধিষ্ঠিত হয়েছি।' শ্রীকৃষ্ণমিশ্র যতি জীবন্মুক্ত পুরুষকে স্বার্থপর অর্থাৎ নিজের মুক্তিতে খুশী থাকতে দেননি। তিনি তাঁর মুখ থেকে নাটকের উপসংহারে বলিয়ে নিয়েছেন সমগ্র পৃথিবীর জন্য মঙ্গলকামনা:

পর্জন্যোঽস্মিন্ জগতি মহতীং বৃষ্টিমিষ্টাং
বিধত্তাং
রাজানঃ ক্ষ্মাং গলিতবিবিধোপপ্লবাঃ
পালয়ন্তু।
হৃত্বোন্মেষোপহততমসস্তৎ প্রসাদান্মহান্তঃ
সংসারাব্ধিং বিষয়মমতাতঙ্কপঙ্কং তরন্তু॥

—অর্থাৎ জগতের মঙ্গলের জন্য মেঘ যেন যথোচিত বৃষ্টি বর্ষণ করেন; রাজারা যেন নানাবিধ উৎপাত উৎখাত করে পৃথিবী পালন করেন; এবং যোগীরা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তমঃ নাশ করে বিষয়-মমতা-আতঙ্ক-পঙ্কসদৃশ এই ভবসিন্ধু পার হতে পারেন।

প্রবোধচন্দ্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বৈদান্তিক নাট্যানুষ্ঠানের উপর যবনিকা পড়ল। সর্ব দর্শনের সার এবং সকল রসের সংমিশ্রণে নাটকখানিতে মানবের দুটি দিক—আধ্যাত্মিক ও জাগতিক—সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। নাটকখানির বিষয়বস্তু আমরা রসের

দিক থেকে না দেখে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা করেছি। পরিশেষে নাটকটির নামকরণ যে কত কবিত্বপূর্ণ তার কিঞ্চিৎ আভাস স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীকৃত বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস থেকে তুলে ধরছি: "প্রবোধচন্দ্রোদয়—এই গ্রন্থের নামের অর্থ পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, চন্দ্রের উদয়ে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেরূপ জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান দূর হয়। চন্দ্রের কিরণ যেমন সুশীতল ও স্নিগ্ধ, জ্ঞানও তেমনই স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত। বোধ হয় 'চন্দ্র' শব্দটির ব্যবহার 'জ্ঞান ও আনন্দের' অভিন্নতা প্রদর্শন করবার জন্য। জ্ঞানই আনন্দ। ইহা সূর্যকিরণের ন্যায় কেবল উজ্জ্বল নহে, কিন্তু চন্দ্রকিরণের ন্যায় স্নিগ্ধও বটে। চন্দ্রে যেমন ঔজ্জ্বল্য ও স্নিগ্ধতা বর্তমান, চন্দ্র যেমন অমৃতের আকর, চন্দ্র যেমন মূর্তিমান আনন্দ, সেরূপ জ্ঞানানন্দের উদয়ে অবিদ্যারূপ অন্ধকার-নিবৃত্তি ও আনন্দলাভ হয়। শঙ্করের মতে জ্ঞানানন্দ-উদয়ে অবিদ্যারূপ অন্ধকার নিরস্ত হয়। এই মতের ব্যাখ্যাকল্পে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' প্রণীত হয়েছে।"

প্রত্যক্ষ

'অবধূত চট্টোপাধ্যায়'

দুঃখেরে করি না ভয় ;
কেহ না লভিয়া থাক্ তার পরিচয়
আমি লভিয়াছি ; তার সে রুদ্র মূর্তিরে
প্রত্যক্ষ করেছি হেথা বার বার ফিরে।
তার রুক্ষ রৌদ্রহীন পিঙ্গল জটারে
বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়া, মোর গৃহদ্বারে
বহুবার এসেছে সে শূন্য পাত্র হাতে
হিংস্রদৃষ্টে লেলিহান ক্ষুধারে জানাতে !
আমারে গেছে সে দিয়ে রুদ্রাক্ষমালার
ভয়হীন তেজোদ্দীপ্ত বীজমন্ত্র তার।
তাই আমি মর্ত্য হতে মোক্ষের আলোকে
সূর্যলিপ্ত অসি সম ঝলকি পলকে
জেগে জেগে উঠি ; আমি মৃত্যুর শঙ্কারে
চূর্ণ করি তূর্ণ বেগে প্রচণ্ড হুঙ্কারে।

উপনিষদে শক্তিতত্ত্ব ও শক্তিবাদ

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে

ভূমিকা

ব্রাহ্ম ও শাক্ত উপনিষদ্

উপনিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যারূপী মোক্ষশাস্ত্র। গুরু-শিষ্যপরম্পরা উপলব্ধ সত্যই উপনিষদের বিষয়-বস্তু। এই পরম ও চরম সত্যকে যিনি যেভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি সেইভাবেই তাহা লোকশিক্ষার্থ বলিয়া গিয়াছেন। যিনি সেই মহান সত্যকে নিগুর্ণ তত্ত্বরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তিনি তটস্থ লক্ষণ সাহায্যে সে তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন, এবং তৎসহ সে তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার প্রণালীর উপদেশও দিয়াছেন। এই শ্রেণীর উপনিষদ্‌গুলি ব্রাহ্ম উপনিষদ্। আবার যিনি সেই সত্যকে নিগুর্ণাশক্তিরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে সেই মতই উপদেশ করিয়া গিয়াছেন; এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপনিষদ্‌গুলি শাক্ত বা শক্তিবাদী উপনিষদ্। এতদ্ব্যতীত আরও বহু যোগতত্ত্ব, সন্ন্যাসধর্ম প্রভৃতি বিষয়ক, তথা সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্ও আছে।

বৈদিক যুগে প্রত্যেক বৈদিক শাখার এক একখানি উপনিষদ্ ছিল; তখন উপনিষদের মোট সংখ্যা ছিল ১১৮০ †, কিন্তু তাহার প্রায় সবই কালের করাল গর্ভে বিলীন হইয়াছে। বর্তমানকালে উক্ত সংখ্যার অতি সামান্য ভগ্নাংশমাত্র আছে। মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ খানি 'উত্তম' উপনিষদের উল্লেখ আছে ‡, তাহার মধ্যে ঋগ্বেদীয় ১০, যজুর্বেদীয় ১৯, কৃষ্ণযজুর্বেদীয় ৩২, সামবেদীয় ১৬ এবং অথর্ববেদীয় ৩১ খানি। বহুকাল যাবৎ এইগুলিই বিদ্বৎসমাজে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত। ইহা ছাড়া অদ্যাবধি আরও ১৭২ খানি উপনিষদ্ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইরূপে বর্তমানে সমগ্র উপনিষদ্‌সংখ্যা ২৮০ দাঁড়াইয়াছে।† নবাবিষ্কৃত উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে আরও প্রায় ১৩।১৪ খানি উপনিষদ্ প্রামাণিকপঙ্‌ক্তিভুক্ত হইয়াছে, অবশিষ্টগুলি পণ্ডিতমণ্ডলীর পরীক্ষানিরীক্ষাধীনে আছে।

মুক্তিকোপনিষদুক্ত ১০৮ খানি উপনিষদের মধ্যে ঈশ, কঠ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় এবং শ্বেতাশ্বতর এই একাদশখানি উপনিষদের ভাষ্য জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য লিখিয়া গিয়াছেন; রামানুজাচার্য, মধ্ব প্রভৃতি আচার্য যে-সব উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহাও এই এগারখানিরই অন্তর্গত। সেজন্য এই এগারখানি উপনিষদ্ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই এগারখানির মধ্যে প্রথম দশখানি উপনিষদে 'শক্তি' অভিধানে শক্তির কোন অবতারণা নাই; কেবল শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে স্পষ্টতঃ ব্রহ্ম-

† "তাশ্চ চতুর্ণাং বেদানামশীতিসহিত-শতাধিকসহস্রসংখ্যাঃ, তত্র ঋচঃ ২১, যজুষঃ ১০৯, সাম্নঃ ১০০০, অথর্বণঃ ৫০ সন্তি।"—১৯১০ খৃষ্টাব্দে বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে প্রকাশিত 'অষ্টাত্রিংশদুপনিষদে'র প্রস্তাবনা।

‡ মুক্তিকোপনিষদ্ ১।৩০-৪০

† 'Introduction' to "Discourses on Kaivalya Upanishad" published by Chinmay Publishing Trust, Madras.

শক্তির প্রসঙ্গ আছে, এই প্রবন্ধের মধ্যে যথাস্থানে উহা আলোচিত হইবে। অবশিষ্ট উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে বহ্বৃচ, দেবী, সীতা, সাবিত্রী, তারাসার, অন্নপূর্ণা, ত্রিপুরা, ত্রিপুরাতাপনী, সৌভাগ্যলক্ষ্মী এবং সরস্বতী-রহস্য এই দশখানি উপনিষদের বিষয়বস্তু শক্তি ; এছাড়া মহোপনিষদে চিৎশক্তির প্রসঙ্গ আছে। এতদ্ব্যতীত উত্তরপ্রদেশাস্তর্গত 'বেরিলী সংস্কৃতি সংস্থান' হইতে প্রকাশিত উপনিষদাবলীর মধ্যে রাধা, তুলসী এবং গায়ত্রীরহস্য এই তিনখানি শক্তিবিষয়ক উপনিষদ্ আছে ; সম্ভবতঃ এই তিনখানি ইদানীন্তন প্রামাণিকশ্রেণীভুক্ত।

প্রধান প্রধান ব্রাহ্ম উপনিষদের মধ্যে যে যে উপনিষদে যেরূপ ভাবে শক্তিতত্ত্ব বিবৃত আছে, এবং শাক্ত উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে যে যে উপনিষদে শক্তিই চরম তত্ত্বরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ঈশাদি প্রধান প্রধান দশখানি উপনিষদে শক্তি অভিধানে শক্তির কোন অবতারণা না থাকিলেও, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও প্রশ্ন উপনিষদে প্রাণতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে ; এবং মুণ্ডক ও কঠোপনিষদে সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে প্রাণের স্থান নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ব্রহ্মোপনিষদে ও কৌষীতকী উপনিষদে প্রাণপ্রসঙ্গ, এবং মহোপনিষদে চিৎশক্তির বিবরণ আছে।

এইখানে একটি আবশ্যকীয় বিষয়ের স্পষ্টীকরণ উচিত বিবেচনা করি। প্রধান উপনিষদ্‌গুলির যেখানে যেখানেই প্রাণের প্রসঙ্গ আছে, ভগবান ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য সেখানে সেখানে প্রাণশব্দে হিরণ্যগর্ভ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভও প্রাণাভিধানে অভিহিত হন, যেহেতু তিনি প্রাণোপহিত চৈতন্য। আর বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি কার্য হিরণ্যগর্ভদ্বারেই সম্পাদিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সে-সকল কার্যের প্রকৃত কর্তা বা কর্ত্রী কে? চৈতন্য তো চিরনিষ্ক্রিয়, নির্বিকার এবং নির্লিপ্ত সাক্ষিমাত্র। চৈতন্যাধিষ্ঠিতা শক্তি বা উপাধিই তো যাবতীয় ক্রিয়ার আশ্রয়। তাহা হইলেই তো দাঁড়াইল যে, এই স্তরে প্রাণই সে সকল ক্রিয়ার কর্তা। স্বামীজী তাঁহার রাজযোগে † প্রাণকেই বিশ্বশক্তি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া বলিয়াছেন, "কোন্ শক্তির প্রভাবে আকাশ এই প্রকারে জগৎরূপে পরিণত হয়? এই প্রাণের শক্তিতে। যেমন আকাশ এই জগতের কারণীভূত অনন্ত সর্বব্যাপী মূল পদার্থ, প্রাণও সেইরূপে জগদুৎপত্তির কারণীভূতা অনন্ত সর্বব্যাপিনী বিকাশিনী শক্তি। কল্পের আদিতে ও অন্তে সমুদায়ই আকাশরূপে পরিণত হয়, আর জগতের সমুদায় শক্তিগুলিই প্রাণে লয়প্রাপ্ত হয়; পরকল্পে আবার এই প্রাণ হইতেই সমুদায় শক্তির বিকাশ হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন,—এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথবা চৌম্বুকাকর্ষণশক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই প্রাণই স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহ (nerve current) অথবা চিন্তাশক্তিরূপে, দৈহিক সমুদায় ক্রিয়াশক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। চিন্তাশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সামান্য দৈহিক শক্তি পর্যন্ত সমুদায়ই প্রাণের বিকাশমাত্র। বাহ্য ও অন্তর্জগতের সমুদায় শক্তি যখন তাহাদের মূলাবস্থায় গমন

† স্বামীজীর 'রাজযোগ', তৃতীয় অধ্যায়, প্রাণ। অবশ্য এই প্রাণ ও আকাশ একটি মূল পদার্থ হইতে উদ্ভূত এবং তাহাও মূল জগন্নিয়ামিকা শক্তি বা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত ; তিনিই আসল কর্ত্রী

করে, তখন তাহাকেই প্রাণ বলে।" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত স্বর্গীয় অধ্যাপক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার "উপনিষদের আলো" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"একই শক্তি প্রাণ-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হয়েছে। উপনিষদে এই শক্তিকে প্রাণ,—কখনও বা অব্যক্ত বলা হয়েছে। এই প্রাণ বা অব্যক্ত পরমাত্মা দ্বারা বশীভূত হয়ে বিশ্বরূপে পরিণত হয়। ব্রহ্ম ছাড়া এর কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কার্যরূপে নানাভেদ-সম্পন্ন হলেও কারণরূপে এক।" অধ্যাপক কোকিলেশ্বর শাস্ত্রীর 'উপনিষদের উপদেশ' নামক গ্রন্থে আছে "এক প্রাণ-শক্তিই আধিদৈবিক সূর্যাদিরূপে এবং জীবদেহে আধ্যাত্মিক প্রাণোমেন্দ্রিয়াদিরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রাণের আধিদৈবিক বিকাশগুলি বিশ্বব্যাপী, অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন, আর জীব-দেহস্থ আধ্যাত্মিক বিকাশগুলি দেহবদ্ধ, সসীম এবং পরিচ্ছিন্ন" ইত্যাদি। সুতরাং ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ্‌গুলিতে প্রাণের অভিধানে যে শক্তিতত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল আচার্য ও অধ্যাপকমাত্রই স্বীকার করেন। সৃষ্টির আরও নিম্ন বা স্থূল স্তরে বর্তমান বিজ্ঞানও এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছে যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে জড় বলিয়া কিছুই নাই, সবই শক্তি। অবশ্য এই শক্তি প্রাণের স্থূলতর বিকাশমাত্র। পরমাণুও যৌগিক পদার্থ, মূল পদার্থ নহে। পরমাণু কতকগুলি ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি শক্তিকেন্দ্রের সমষ্টি দ্বারা সংগঠিত। প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি সমন্বিত একটি স্থির বিন্দুর চারিপাশে ইলেক্‌ট্রন সর্বদা অতি তীব্রবেগে ঘুরিতেছে বলিয়াই পরমাণুর এবং তাহা হইতে বিশ্বের সমস্ত জড়বস্তুর অস্তিত্ব রহিয়াছে। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, এই গতির মূল উৎস কোথায়? নিশ্চয়ই প্রাণে। শাস্ত্রও বলেন, "ন হি প্রাণাদন্যত্র চলনাত্মকত্বোপপত্তিঃ।" (বৃহদাঃ উপঃ ১।৫।২১ ভাষ্য)। প্রাণ ব্যতীত আর কাহারও বা কিছুরই গতি ও স্পন্দনশক্তি নাই। তাহা হইলে ইহাই সারসিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে যে, এই নামরূপাত্মক অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য ঘনীভূত স্পন্দনশীল প্রাণশক্তি-পুঞ্জের সমষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। মানব-ইতিহাসের স্মরণাতীত কোন এক মঙ্গল উষায় সত্যদ্রষ্টা কাঠক ঋষি এই সত্যেরই ঘোষণা করিয়াছিলেন—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্" (কঠঃ উপঃ ২।৩।২); জগৎব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে সমস্তই প্রাণে স্পন্দিত, ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। অতএব ইহা নিঃসন্দেহ যে, বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদে বিবৃত প্রাণতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে শক্তিতত্ত্বেরই বিবরণ, সে শক্তি মূলতঃ যাহাই হউক।

মুখ্য মুখ্য ব্রাহ্ম উপনিষদে বিবৃত প্রাণতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব :

(১) **ছান্দোগ্য উপনিষদ্ :** সামবেদীয়

(ক) এই উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে সংবর্গ প্রকরণে বলা হইয়াছে (৪।৩।৪) যে, বায়ু প্রাণেরই স্থূল অভিব্যক্তি, বহির্বিশ্বে যাহা বায়ু, অন্তর্বিশ্বে তাহাই প্রাণ; এই দুইটিই একই তত্ত্বের স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ।

(খ) "যদা সূর্যোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা চন্দ্রোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি" (৪।৩।১): ইহার ভাষ্য—"প্রলয়ে সূর্যচন্দ্র-মসোঃ স্বরূপভ্রংশে তেজরূপয়োর্বায়াবেব অপি গমনং স্যাৎ।" প্রলয়কালে যখন সূর্য ও চন্দ্রের স্বরূপ ধ্বংস হয় তখন তাহারা তাহাদের

কারণীভূত বায়ুতে (প্রাণে) বিলীন হয়।

(গ) "প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্বাণি ভবতি" (৫।১।১৫)। এখানে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়াদি যাবতীয় করণবর্গ প্রাণেরই অভিব্যক্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

(ঘ) "যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্বং সমর্পিতম্। প্রাণঃ প্রাণেন যাতি, প্রাণঃ প্রাণং দদাতি" (৭।১৫।১), ইত্যাদি দ্বারা দেখানো হইয়াছে যে, 'নাম' হইতে 'আশা' পর্যন্ত মূর্তামূর্ত সমস্তই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত আছে। আচার্য ভাষ্যকার ইহার ভাষ্যে প্রাণকে মহারাজের সর্বাধ্যক্ষ মন্ত্রীর ন্যায় পরমেশ্বরের সর্বার্থসম্পাদক অপরতন্ত্র, তথা ক্রিয়া-কারক-ফলভেদজাত সমস্তই প্রাণ, এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(ঙ) "প্রাণো বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং (৩।১৫।৪) ; ভাষ্য—"প্রাণো বা ইদং সর্বভূতং যদিদং জগৎ।" যাহা কিছু নাম-রূপাত্মক দৃশ্যরূপে অবস্থিত,—সমস্ত জগৎই প্রাণের বা শক্তিরই অভিব্যক্তি।

(২) **কঠোপনিষদ্ : কৃষ্ণযজুর্বেদীয়**

(ক) "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্" (২।৩।২), পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

(খ) "যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন॥" (২।১।৯), ভাষ্য—"তং প্রাণমাত্মানং দেবাঃ সর্বেঽগ্ন্যাদয়ঃ অধিদৈবম্, বাগাদয়শ্চাধ্যাত্মম্ সর্বে বিশ্বে অরা ইব রথনাভৌ অর্পিতাঃ সম্প্রবেশিতাঃ স্থিতিকালে ; সোঽপি ব্রহ্মৈব ; তদেতৎ সর্বাত্মকং ব্রহ্ম" ইত্যাদি। ['সূর্য' এখানে সৃষ্ট বিশ্বপ্রপঞ্চের উপলক্ষিত শব্দ]। ভাষ্যার্থ—দেবাধিকারে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, আর দেহাধিকারে বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ সেই প্রাণরূপী আত্মাতে অর্পিত আছে, অর্থাৎ অবস্থিতিকালে তাঁহারই মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। উল্লিখিত প্রাণও নিশ্চয় ব্রহ্মস্বরূপ ; সেই ব্রহ্মই সর্বাত্মক বা সর্বময়।"† ইত্যাদি। এখানে বলা হইল যে সমস্ত বিশ্ব-প্রপঞ্চই প্রাণ হইতে সৃষ্ট হয়, স্থিতিকালে প্রাণেই অবস্থান করে, এবং প্রলয়ে প্রাণেই বিলীন হয়। সেইজন্য সর্বাত্মক প্রাণই ব্রহ্মস্বরূপ।

(৩) **বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ : শুক্ল-যজুর্বেদীয়**

(ক) ১।৩।২২ মন্ত্রের ভাষ্যে প্রাণকে অমূর্ত ও সর্বব্যাপী ("অমূর্তত্বাৎ সর্বগতত্বাচ্চ") বলা হইয়াছে। পরবর্তী মন্ত্রে (১।৩।২৩) প্রাণকে শ্রুতি বিশ্ববিধারিণী শক্তি বলিয়াছেন, "প্রাণেন হীদং সর্বমুত্তব্ধম্"। গীতাতেও ভগবদ্মুখে এই সত্যই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে "যয়া ইদং জগৎ ধার্যতে (তাং) মে পরাং প্রকৃতিং বিদ্ধি।" (৭।৫)

(খ) ১।৩।৭ মন্ত্রের ভাষ্যে মন্ত্রার্থ পরিস্ফুট করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"যথা পূর্ব-কল্পেন···অদোষাস্পদং মুখ্যং প্রাণং আত্মত্বেন উপগম্য বাগাদ্যাধ্যাত্মিকা-পিণ্ডমাত্র-পরিচ্ছিন্না-ত্মাভিমানং হিত্বা, বৈরাজপিণ্ডাভিমানং বাগা-দ্যাগ্ন্যাদ্যাত্মবিষয়ং বর্তমানপ্রজাপতিত্বং শাস্ত্র-প্রকাশিতং প্রতিপন্নঃ ; তথৈবায়ং তেনৈব বিধিনা ভবতি প্রজাপতিস্বরূপেণ আত্মনা।" পূর্বকল্পীয় যজমান যেমন যথোক্তক্রমে বাগাদি দেবতাকে পাপদোষে দূষিতহেতু পরিত্যাগ-পূর্বক নির্দোষ মুখ্য প্রাণকে আত্মস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং দৈহিক বাগাদিতে দেহমাত্ররূপ পরিচ্ছিন্ন আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ

---

† ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ-কৃত।

করিয়া বিরাটের ভাবনা করত: শাস্ত্রোপদিষ্ট বর্তমান প্রজাপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি বর্তমানকালীন যজমানও পূর্বোক্ত পদ্ধতিক্রমে উপাসনা দ্বারা প্রজাপতিত্ব লাভ করিতে পারেন।

(গ) ৩।৯।৯ "কতম একো দেব ইতি"—শাকল্য মুনির এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "প্রাণ ইতি, স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে।" এখানে মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য শক্তি-শক্তিমানের অভেদত্ব প্রতিপাদন করিয়াই প্রাণকেই ব্রহ্ম অভিধানে অভিহিত করিয়াছেন। ভাষ্যকারও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "স প্রাণো ব্রহ্ম সর্বদেবতাত্মকত্বাৎ মহদ্‌ব্রহ্ম, তেন স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে …প্রাণস্যৈব চৈকস্য সর্বোঽনন্তসংখ্যাত্বোবিস্তরঃ। এবমেকশ্চানন্তশ্চ অবান্তরসংখ্যাবিশিষ্টশ্চ প্রাণএব।" প্রাণ সর্বদেবতাময় বলিয়া মহদ্‌ব্রহ্ম। এক প্রাণেরই উক্ত অনন্তসংখ্যক বিস্তার। এইরূপেও এক অনন্ত যাহা কিছু সমস্তই প্রাণ।

(৪) **মুণ্ডকোপনিষদ্ঃ** অথর্ববেদীয় "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্॥" (১।১।৮) এই মন্ত্রের ভাষ্যে দেখি "যদ্ ব্রহ্মণঃ উৎপদ্যমানং বিশ্বং তদনেন ক্রমেণ উৎপদ্যতে, ন যুগপদ্‌বদরমুষ্টিপ্রক্ষেপবৎ, ইতিক্রমনিয়মবিবক্ষার্থোঽয়ং মন্ত্র আরভ্যতে।" অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে যে বিশ্ব সৃষ্টি হয় তাহা এই ক্রমানুসারে সৃষ্ট হয়, এক মুষ্টি কুল ছড়াইয়া দিবার মত একসঙ্গে নহে; এই জন্য সেই ক্রমনিরূপণার্থ এই মন্ত্র আরব্ধ করা হইয়াছে। মন্ত্রোক্ত সৃষ্টির ক্রম এইরূপ – ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে মন, তাহা হইতে ক্রমানুসারে পঞ্চভূত, চতুর্দশ ভুবন, তত্তৎস্থানের অধিবাসী, তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম এবং সেই সমষ্টি কর্মফল, যাহা পরকল্পের বীজরূপে সঞ্চিত থাকে। সুতরাং মুণ্ডক শ্রুতির এই মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মশক্তি প্রাণই যে নিখিলবিশ্বপ্রপঞ্চনায়িকা তাহা বলা হইয়াছে।

(৫) **প্রশ্নোপনিষদ্ঃ** অথর্ববেদীয়

(ক) এই উপনিষদের দ্বিতীয় প্রশ্নে (এবং ছান্দোগ্যোপনিষদের ৫।১।৭-১৫) যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিবাদ ও তাহার মীমাংসার প্রসঙ্গ আছে, তদ্দ্বারা ইহাই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়নিচয় প্রাণেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশমাত্র। "অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ (২।৬)।" ইহা দ্বারাও প্রাণকে বিশ্ববিধারিণী শক্তি বলা হইয়াছে। ২।৫ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, মূর্তামূর্ত, সদসৎ যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই প্রাণ দ্বারা সৃষ্ট। "প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্" (২।১৩)। এই মন্ত্রার্থের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ইহা দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, প্রাণই প্রজাপতি, "প্রাণঃ প্রজাপতিরেবাবধৃতম্।" শক্তি ও শক্তিমান অভেদ।

(খ) "আত্মনঃ এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়ৈতস্মিন্নেতদাততম্" (৩।৩)। প্রাণ আত্মা হইতে জাত, আত্মাতেই ব্যাপ্ত, ছায়ার ন্যায় অনুগত হইয়া আত্মাকে অনুসরণ করে ("প্রাণশ্ছায়াবদীশ্বরমনুগচ্ছতীতি"—আনন্দগিরি)। এখানেও মুণ্ডকোপনিষদের ১।১।৮ মন্ত্রের ন্যায় প্রাণকে ব্রহ্মশক্তি বলা হইয়াছে। 'উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা। অধ্যাত্মঞ্চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে" (৩।১২)। এখানে প্রাণ উপাসনার দ্বারা বিশ্বপ্রাণের সহিত তাদাত্ম্য উপলব্ধির ফল যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি, তাহা বলা হইয়াছে। (এই প্রবন্ধের ৩ (খ) দ্রষ্টব্য, সেখানেও একথা বলা হইয়াছে)।

(গ) "স প্রাণমসৃজত প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ম্ মনোঽন্নমন্নাদ্বীর্যং তপোমন্ত্রাঃ কর্ম লোকাঃ লোকেষু চ নাম চ।" এই মন্ত্রে প্রাণের বিশ্বকারিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। (৬।৪)

দেখা গেল, প্রাণ আত্মার (বা ব্রহ্মের) শক্তি। বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ, ভাব, ভাষা, চিন্তা, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, প্রেম, ঘৃণা প্রভৃতি অমূর্ত যাহা কিছু আছে সমস্তই প্রাণের বিকাশ। প্রাণ বিশ্ববিধারিণী শক্তি। প্রাণের উন্মেষাত্মক স্পন্দনে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাধিষ্ঠানে ভাসিয়া উঠে, স্থিতি লাভ করে এবং নিমেষাত্মক স্পন্দনে সে সব প্রাণেতেই বিলীন হয়। প্রাণাত্মবিদ্ পুরুষ অমৃতত্ব লাভ করেন।

(৬) **ব্রহ্মোপনিষদ্ :** কৃষ্ণযজুর্বেদীয় ‡ "প্রাণো হ্যেষ আত্মা। আত্মনো মহিমা বভূব দেবানামায়ুঃ স দেবানাং নিধনমনিধনম্।... যথা মাক্ষিকৈকেন তন্তুনা জালং বিক্ষিপতি তেনাপকর্ষতি তথৈব এষ প্রাণো যদা যাতি সংসৃষ্টমাকৃষ্য" (মন্ত্র ১)। এখানে প্রাণ ও আত্মা (ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি) অভেদ—এই সত্যই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। প্রাণ আত্মার মহিমাস্বরূপ, ইন্দ্রিয়নিচয়ের নিধনানিধনের কর্তা; সৃষ্টিকালে মাকড়সার জাল-বিস্তারের ন্যায় জগৎব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে, তথা প্রলয়কালে সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড নিজের মধ্যেই সংহরণ করে। এই শ্রুতি প্রাণকেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্তা বলিয়া প্রাণ ও আত্মার অভেদত্বজ্ঞানে প্রাণকেই আত্মা বলিয়া উপদেশ দিয়েছেন।

(৭) **কৌষীতকী উপনিষদ্ :** ঋগ্বেদীয় "প্রাণো ব্রহ্মেতি হ স্মাহ কৌষীতকী" (২।১); "প্রাণো ব্রহ্মেতি হ স্মাহ পৈঙ্গঃ" (২।২); ঋষি কৌষীতকী এবং পৈঙ্গ উভয়েই 'প্রাণই ব্রহ্ম' এই প্রকার বলিয়াছেন। "প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" (৩।২)। ক্রিয়াশক্তিবোধক প্রাণই জ্ঞানে প্রবৃত্তকারী প্রজ্ঞাত্মা। প্রাণও যাহা, প্রজ্ঞাও তাহা; প্রাণ ও প্রজ্ঞা উভয়েই দেহে একত্র নিবাস করেন, এবং প্রজ্ঞাত্মা প্রাণের সাহায্যে দেহকে উত্থাপিত করেন। "যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণ (৩।৩); এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ" (৩.৯); এখানে শ্রুতি প্রাণকে,—শক্তি, শক্তিমান আত্মার সহিত অভেদ বলিলেন। প্রাণ ও জ্ঞান, আত্মা ও শক্তি, একই তত্ত্বের দুই পিঠ,—দ্বিবিধ প্রকাশ; ইহারা বিভিন্ন তত্ত্ব নহেন, ইহাই এতদুপদেশের মর্মার্থ।

(৮) **শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ :** কৃষ্ণযজুর্বেদীয়। এই উপনিষদেই স্পষ্টাক্ষরে বিশ্বশক্তিকে "দেবাত্মশক্তি",—ব্রহ্মশক্তি অভিধানে অভিহিত করা হইয়াছে। "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" (১।৩); জগতের মূল কারণ-অন্বেষী ঋষিগণ তর্কবিচারদ্বারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। এবং ধ্যানযোগের সাহায্যে পরমাত্মার স্বগুণাবৃত শক্তিকে জগতের মূল

---

‡ অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'Eight Minor Upanishads' গ্রন্থে ব্রহ্মোপনিষদ্ অথর্ববেদীয় বলা হইয়াছে, কিন্তু মুক্তিকোপনিষদে ১।৪৯ মন্ত্রের পরবর্তী তৃতীয় মন্ত্রে আছে — "কঠবল্লীতৈত্তিরীয়ব্রহ্মকৈবল্যশ্বেতাশ্বতরগর্ভ-নারায়ণামৃতবিন্দু......স্বরসতীরহস্যানাং কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গতানাং দ্বাত্রিংশৎসংখ্যকানাং উপনিষদাং সহনাববীতি শান্তিঃ।"

'বেরিলী সংস্কৃতি সংস্থান' হইতে প্রকাশিত উপনিষদাবলীতেও ইহার কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শান্তিপাঠ আছে।

কারণ বলিয়া জানিতে পারিলেন। এই শক্তি "অজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা (১।৯),—অনাদি অজন্মা মায়া, একমাত্র ইনিই ভোক্তা জীবের ভোগসাধনের জন্য ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি করেন। জীব যখন নিজেকে, এই মায়াকে এবং ঈশ্বরকে ব্রহ্মভাবে উপলব্ধি করে, তখন সে মুক্ত হয়,—"ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ" (১।৯)। এই মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে ; এই মায়ীর (কল্পিত) অঙ্গসমূহ দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত আছে, "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্বান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। তস্যাবয়ব-ভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥" (৪।১০); এই মায়ী স্বীয় শক্তিরূপা মায়ার সাহায্যে ব্রহ্মাধিষ্ঠানে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন,—"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ।" (৪।৯); বিশ্ববিধাতার এই পরাশক্তি "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া-ত্মিকা" (৬।৮); আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া যেরূপ স্বাভাবিকভাবে সম্পাদিত হয়, তাহার জন্য যেমন আমাদিগকে কোন প্রয়াস পাইতে হয় না, বিশ্ববিধাত্রী অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড-নায়িকা এই ব্রহ্মশক্তি মহামায়াও সেই প্রকার স্বাভাবিকভাবে, কোন প্রকার আয়াস না করিয়া অখণ্ড জ্ঞান ও অচিন্তনীয় বলের সহিত হেলায় এই জগৎলীলা সম্পাদন করেন ; ইহার কোথাও কোন ভুল ভ্রান্তি নাই, অথবা কোন ইতস্তত: ভাব নাই ; সর্বত্র সর্বদা সর্ব কার্যই যথানিয়মে ঘড়ির কাঁটার মত (with mathematical accuracy) নির্ভুলভাবে নিষ্পন্ন হইয়া চলিয়াছে। আমাদের মত নিম্নাধিকারীদিগকে করুণাময়ী শ্রুতি বারংবার জীব-জগৎ-ঈশ্বর এই ত্রয়ীকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিতে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেন, "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" (১।১২)। শাঁস, বীচি, খোলা তিনটা নিয়াই সমগ্র বেল ; বীচি ও খোলা বাদ দিলে ওজনে কম পড়ে—শ্রীশ্রীঠাকুরের এই উক্তিতে উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

(৯) **মহোপনিষদ্** : সামবেদীয় † ইহা একখানি ব্রাহ্ম উপনিষদ্। ইহা ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং ইহাতে সর্বশুদ্ধ ৫৩৭টি মন্ত্র আছে। এতন্মধ্যে চতুর্থ অধ্যায়ের ৫৮, পঞ্চমাধ্যায়ের ৯৯-১০৩ ও ১০৭, ১০৮, এবং ষষ্ঠাধ্যায়ের ৭৭, ৭৯-৮১, মোট এই দ্বাদশটি মন্ত্রে 'চিৎ' শক্তির প্রসঙ্গ আছে। সেই মন্ত্রগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—"চিত্তাকাশং চিদাকাশমাকাশঞ্চ তৃতীয়কম্। দ্বাভ্যাং শূন্যতরং বিদ্ধি চিদাকাশং মহামুনে।" (৪।৫৮); হে মহামুনে! তিন প্রকার আকাশ আছে—চিত্তাকাশ, চিদাকাশ ও আকাশ ; এই তিনটির মধ্যে 'চিৎ' আকাশ অপর দুইটি হইতে সূক্ষ্মতর (ইহাই পরমাত্মা)। কারণ মনকে সম্পূর্ণরূপে সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত করিয়া এই চিদাকাশে নিবিষ্ট করিতে পারিলে সর্বাত্মকত্ব ও শান্ত পরমপদ লাভ হয়,—"তস্মিন্ নিরন্ত-নিঃশেষসঙ্কল্পস্থিতিমেষি চেৎ। সর্বাত্মকং পদং শান্তং তদা প্রাপ্নোষ্যসংশয়ঃ॥" (৪।৬০)

চিত্তের বিবরণ—"যথা সৌক্ষ্মাচ্চিদাভাস্য আকাশো নোপলভ্যতে। তথা নিরংশশ্চিদ্ভাবঃ সর্বগোঽপি ন লক্ষ্যতে॥ সর্বসঙ্কল্পরহিতা সর্বসংজ্ঞাবিবর্জিতা। সৈষা চিদবিনাশাত্মা স্বাত্মেত্যাদি কৃতাভিধা॥ আকাশশতভাগাচ্ছা জ্ঞেষু নিষ্কলরূপিণী। সকলামলসংসার-স্বরূপৈকাত্মদর্শিনী॥ নাস্তমেতি ন চোদেতি নোত্তিষ্ঠতি ন তিষ্ঠতি। ন চ যাতি ন চায়াতি

---

† মুক্তিকোপনিষদ্ ১।৪৯-এর পরবর্তী চতুর্থ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। কাহারও কাহারও মতে মহোপনিষদ্ অথর্ববেদীয়, কিন্তু তাহা নহে।

ন চ নেহ ন চেহ চিৎ　সৈষা চিদমলাকারা
নির্বিকল্পা নিরাস্পদা ॥ (৫।৯৯-১০৩),
সতি দীপ ইবালোকঃ সত্যর্ক ইব বাসরঃ ।
সতি পুষ্প ইবামোদশ্চিতি সত্যাং জগত্তথা ॥
১০৭ ॥

প্রতিভাসত এবেদং ন জগৎ পরমার্থতঃ ।
জ্ঞানদৃষ্টৌ প্রসন্নায়াং প্রবোধে বিততোদয়ে ।।"
১০৮ ।।

সূক্ষ্মতাহেতু যেমন চিৎ শক্তির দ্বারা উদ্ভাসিত স্থূল মহাকাশ দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ নিরংশ চিৎ সর্বব্যাপিনী হওয়া সত্ত্বেও দৃষ্টিগোচর হন না। সর্বসঙ্কল্পবিহীনা, সর্ব-সংজ্ঞাবিবর্জিতা এই চিৎ অবিনাশিনী, আত্মা ইত্যাদি সংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞিতা হন। জ্ঞানিগণ এই চিৎশক্তিকে আকাশাপেক্ষা শতগুণ স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম নিষ্কলরূপে উপলব্ধি করেন ; আবার ইনি নির্মল বিশ্বরূপেও নিজেকে প্রকাশিত করেন। এই চিৎশক্তির উদয়াস্ত, উত্থানোপবেশন বা গমনাগমন কিছুই নাই। তিনি আছেন বা নাই এমনও বলা যায় না। (একথার তাৎপর্য এই যে যিনি আকাশের ন্যায় সর্বস্থানই ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, তাঁহার উদয়াস্ত, উত্থানোপ-বেশনের স্থান কোথায় ? আবার এখানে আছেন বলিলে এমন সন্দেহ হইতে পারে যে, কোন এক সময় এখানে ছিলেন না, এখন আছেন ; সুতরাং তিনি এখানে আছেন ইহা ভ্রমোৎপাদক উক্তি, এবং তিনি এখানে নাই একথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা)। এই চিৎ বিমলাকারা, নির্বিকল্পা (নির্বিকারা) এবং নিরাস্পদা (তাঁহার কোন আশ্রয় বা অধিষ্ঠান নাই, যেমন আকাশের ; তিনি স্বাধিষ্ঠানসম্পন্না)। (এখানে চিৎকে নিরাস্পদা বলিয়া এই উপনিষদের ঋষি চিৎকে স্বতন্ত্রা ও চরমতত্ত্বরূপে উপদেশ দিলেন কি ? পরবর্তী দুইটি মন্ত্রে এই ভাবটি আরও পরিস্ফুট)। যেরূপ প্রদীপ থাকিলে আলোকের, সূর্য থাকিলে দিবসের, এবং পুষ্প থাকিলে সৌরভের প্রতীতি জন্মে, তদ্রূপ চিৎ শক্তির সত্তা দ্বারা জগতের প্রতীতি হইয়া থাকে। আর জ্ঞানদৃষ্টি নির্মল হইলে যখন প্রবোধের,— সর্বব্যাপী আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, তখন দৃশ্যমান প্রাতিভাসিক জগতের পারমার্থিক সত্তার বিলুপ্তি ঘটে, কেবলমাত্র চিৎই স্ব-স্বরূপে উদ্ভাসিত থাকেন (অর্থাৎ আমিই চিৎস্বরূপ এই প্রকার উপলব্ধি হয়)।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে মন্ত্র ৭৭, ৭৯-৮১ দ্বারা গ্রন্থ উপসংহার করিয়া ঋষি বলিয়াছেন—
"চিচ্চৈত্যকলিতো বন্ধস্তন্মুক্তৌমুক্তিরুচ্যতে ।
চিদচৈত্যাখিলাত্মেতি সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহঃ ।।" ৭৭
চিৎ ও চৈত্যের (বিষয়ের) ঐকাত্ম্যজ্ঞানই বন্ধন, এবং তাহার বিনাশই মুক্তি। বিষয়-মুক্ত চিৎই আত্মা, ইহাই শাস্ত্রের সারসিদ্ধান্ত ।।
চিদহং চিদিমে লোকাশ্চিদাশাশ্চিদিমাঃ প্রজাঃ ।
দৃশ্যদর্শননির্মুক্তঃ কেবলামলরূপবান্ ॥ ৭৯ ॥
নিত্যোদিতো নিরাভাসো দ্রষ্টা সাক্ষী চিদাত্মকঃ ।
চৈত্যনির্মুক্তচিদ্রূপং পূর্ণজ্যোতিঃ স্বরূপকম্ ॥ ৮০
সংশান্তসর্বসংবেদ্যং সম্বিন্মাত্রমহং মহৎ ॥ ৮১
আমি চিৎ, এই সমস্ত লোক চিৎ, দিক্‌সমূহ চিৎ, এবং সমস্ত জীবই চিৎস্বরূপ। আমি দৃশ্যদর্শনমুক্ত, প্রশান্তকামনা, নির্মলরূপবান্ নিত্য উদিত (সদা প্রকাশমান্), নিরাভাস, দ্রষ্টা, সাক্ষী, চৈত্যমুক্ত চিদাত্মা, সংবিৎমাত্র, পূর্ণজ্যোতির্ময় চিদ্রূপ ব্রহ্মস্বরূপ ।। ৭৯-৮১ ॥

মহোপনিষদের ঋষি ব্রহ্মের চিদ্‌স্বরূপতার প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া, চিৎই আত্মা স্পষ্টাক্ষরে এই উপদেশ দিয়াছেন ; † শক্তিকে শক্তিমানের

† শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "চিচ্ছক্তি আর বেদান্তের ব্রহ্ম অভেদ।"—কথামৃত, ২য় ভাগ, ৮ম সংস্করণ, পৃঃ ১৮৫

সহিত অভিন্নভাবে উপলব্ধি করিতে বলিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ঋষি বরুণ বলিয়াছেন "রসো বৈ সঃ", আর ইনি বলিলেন "চিদ্ বৈ সঃ", শুধু ভাষার তফাত মাত্র। শ্রীশ্রীঠাকুরও উন্মুক্ত নেত্রে মা-ভবতারিণীর মূর্তি, মন্দির, মন্দিরতল, কোশাকুশী, জীবজন্তু পর্যন্ত চিন্ময় দেখিয়াছিলেন। বোধের এই চরম স্তরে শক্তি নিশ্চল, নিষ্কম্প, নিত্যস্থির, অচিন্ত্যঘন জ্যোতির মূর্তিতে অবস্থিত,—শক্তি শক্তিমানের সহিত ঐকাত্ম্যপ্রাপ্ত জ্যোতির্ময় মূর্তিতে বিরাজমান। শ্রুতিতে নানাভাবে ব্রহ্মের জ্যোতির্ময় বর্ণনা প্রাপ্ত হই। যথা—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং দিবীব চক্ষুরাততম্ (ঋকবেদ ১।২২।২০) যদ্‌ব্রহ্ম তজ্জ্যোতিঃ (মৈত্রায়ণী ৬।৩); সচ্চিদানন্দঘনজ্যোতিঃ (নৃসিংহোত্তরতাপনী, খণ্ড ৬); নারায়ণঃ পরাজ্যোতিঃ (মহানারায়ণ ২।১০); তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ (মুণ্ডক ২।২।৯); তদ্‌ব্রহ্ম জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৬); যদাত্মা রাজতে তত্র যথা ব্যোম্নি দিবাকরঃ (ধ্যানবিন্দু ১০৪); এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদ্বিদ্যুদ্বিদ্যোততে (কৌষীতকী ২।১২); ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।। (কঠ, ২।২।১৫ : মুণ্ডক, ২।২।১০ : শ্বেতাশ্বতর, ৬।১৪)।

প্রামাণিক ব্রাহ্মোপনিষদ্ কয়খানিতে শক্তিতত্ত্ব কিভাবে বিবৃত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। শক্তি-উপাসনার উপদেশ কোথাও বর্জিত হয় নাই। বিশ্বপ্রপঞ্চ শক্তিরই অভিব্যক্তি; শক্তিই সৃষ্ট্যাদি প্রপঞ্চ কার্যের অধিশ্বরী; শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন; প্রায় সর্বত্র এই প্রকার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সেই শক্তিমান কোথাও হিরণ্যগর্ভ, কোথাও অব্যাকৃতা প্রকৃতি বা মহদ্‌ব্রহ্ম, কোথাও বা ব্রহ্মই :

ব্রহ্ম উপঃ ১; ছান্দোগ্য ১।১১।৫ ও ৪।১০।৫; মুণ্ডক ৩।১।৪; বৃহদারণ্যক ৪।৪।৭, ৩।৯।৯; কৌষীতকী ২।১, ২।২, ৩।২, ৩।৩ ও ৩।৯)। প্রাণোপাসনা (শক্তি-উপাসনা) দ্বারা প্রজাপতিত্ব বা হিরণ্যগর্ভপদ লাভ হয়, ইহাও বলা হইয়াছে; হিরণগর্ভপদপ্রাপ্তি অথবা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইলে সেখানে হইতে আর পুনরাবর্তন হয় না, কল্পান্তে তাহার নির্বাণমুক্তি লাভ হয়। অতএব শক্তিউপাসনার আশুফল যে ক্রমমুক্তি, এবং অন্তিম ফল নির্বাণমুক্তি, তাহা যে ব্রাহ্ম-উপনিষদসমূহেরও সিদ্ধান্ত, ইহা দেখিয়া আসিলাম। [ক্রমশঃ]

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

৮। কার্যক্রমের আপেক্ষিকতা

ত্যাগ ও সেবাকে—সম্প্রসারণ-সেবাকে—সমাজধর্ম বলে অভিহিত করলে প্রশ্ন ওঠে যে, এই ধর্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতির (rituals) প্রকৃতি ঠিক কি? অর্থাৎ কোন্ কার্যক্রমের ভিত্তিতে সম্প্রসারণ-সেবাকে সংগঠিত করা হবে? এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দকে স্পষ্টতই আপেক্ষিকতা অনুসরণ করতে দেখা যায়। তাঁর মতে, কার্যক্রম সর্বদাই হবে বিশেষ সমাজের প্রয়োজনের আপেক্ষিক।

ভারতে কার্যক্রমের লক্ষ্য হবে জনগণের উন্নতিসাধন, কারণ জনগণের দুঃখ-দুর্দশাই ভারতের অধোগতির মূল কারণ

জনগণের উন্নতিসাধন বিশেষ কঠিন কার্য নয়। এর জন্যে যা প্রয়োজন তা হ'লো শিক্ষা-প্রসারের মাধ্যমে তাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্বের পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা। এই শিক্ষা হবে ধর্মীয় ও লোকায়ত শিক্ষার সংমিশ্রণ এবং এর প্রসারের জন্য ভারতের চিরন্তন ভ্রাম্যমাণ শিক্ষাগুরু[১]—সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের ওপরই নির্ভর ক'রতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি আমেরিকা থেকে মহীশূরের মহারাজাকে লিখেছিলেন :

"আমাদের দেশে স্বার্থত্যাগী, পরহিতব্রতী হাজার হাজার সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা পদব্রজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গমন করে ধর্মশিক্ষা দিয়ে বেড়ান। এঁদের মধ্যে কিছুসংখ্যককে যদি লোকায়ত জ্ঞানের শিক্ষাদাতা হিসেবে সংগঠিত করা যায়, তা হলে তাঁরা স্থান থেকে স্থানান্তরে, দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করে শুধু প্রচার-কার্যই নয়, শিক্ষাদানকার্যও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ক'রতে পারেন।" সকল দিক থেকে বিচার করে দেখলে সন্ন্যাসীদিগকেই এই কার্যভার গ্রহণ ক'রতে হবে, কারণ "ভারতে দারিদ্র্য এত কঠোর যে, দরিদ্র সন্তানরা বিদ্যালয়ে যাওয়া অপেক্ষা ক্ষেতখামারে পিতামাতাকে সাহায্য করাই অধিক প্রয়োজনীয় মনে করবে।" সুতরাং প্রত্যেক গ্রামে একটি করে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করলেও কোন লাভ হবে না।

অতএব, ভারতের ক্ষেত্রে কার্যক্রম হবে সম্প্রসারণাভিমুখী (growth-oriented), সংস্কারাভিমুখী নয়। প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের সমাজাদর্শ ছিল 'সম্প্রসারণ, বৃদ্ধি, উন্নয়ন' ('growth, expansion, development'[৪])—সংস্কার নয়। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "সংস্কারপন্থীদের আমি জানাতে চাই যে, আমি তাঁদের প্রত্যেকের চেয়ে বড় সংস্কারপন্থী। তাঁরা খণ্ড খণ্ড সংস্কারের পক্ষপাতী, আর আমি চাই আমূল সংস্কার ...আমি সংস্কারে বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস

১ Letter to the Maharaja of Mysore (C. W., IV, 362)

২ Rhys-Davids : Buddhist India, 62-63

৩ Letter to the Maharaja of Mysore, above

৪ C. W. III, 195

৫ C. W. III, 195

করি সম্প্রসারণে।"[৬] ভগিনী নিবেদিতার কাছে স্বামীজী এই আশা পোষণ করেছিলেন যে, প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি ঘটবেই, যে পুনরাবৃত্তিতে অবশ্যই থাকবে বর্তমান দিনের প্রয়োজনীয় উপাদানের ভূমিকা। এবং এই বলে উপসংহার করেছিলেন যে নবোদ্ভূত পরিবেশে সম্প্রসারণ কিন্তু হবে সম্পূর্ণ অন্তঃশক্তিপ্রসূত।[৬] ভারতীয় রেনেসাঁর দিক থেকে বলা যায়, এখানে হ'লো স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর পূর্বসূরিগণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।

তা বলে দেখা গেল যে, সমন্বয়ই (synthesis) সমাজের সম্প্রসারণের মূলমন্ত্র। প্রাচীন গ্রীকদের মত স্বামী বিবেকানন্দেরও অন্যতম মূল জীবন-নীতি ছিল 'সর্বক্ষেত্রেই আধিক্যকে পরিহার করা' ('nothing in excess')। উদাহরণস্বরূপ, ভাবপ্রবণতাকে তিনি অপছন্দ করতেন, কিন্তু তবুও তিনি পাঞ্জাবীদের উপদেশ দিয়েছিলেন একটু উচ্ছ্বাসের অনুবর্তী হতে যাতে তারা তাদের বলবত্তাকে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। অনুরূপভাবে বাঙালীদের ক্ষেত্রে ভাবপ্রবণতাকে সীমিত রাখবার জন্যে তাঁর নির্দেশ হ'লো মাংসভোজন।

স্বামীজীর এই মধ্যপন্থার ব্যবস্থাকে মীমাংসা বা আপস বলে মনে করলে ভুল করা হবে,[৭] এ হলো সমন্বয়তত্ত্বেরই প্রযুক্ত রূপ। এতে অংশত এ্যারিস্টটলের 'কাঞ্চনমার্গের' (golden mean) এবং অংশত স্টোইক দার্শনিকদের 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের' (Theory of Checks and Balance) প্রতিফলন দেখাতে পাওয়া যায়।

৯। সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান ও নীতিবৈশিষ্ট্য

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম অবদান হ'লো ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বস্তুত, স্বামীজীই প্রথম ঘোষণা করেন যে, জাতিভেদপ্রথা, অস্পৃশ্যতা, স্ত্রীজাতির অবরোধ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদিকে আমাদের ধর্মের অঙ্গীভূত বলে মনে করা হ'লেও আসলে তারা প্রথা প্রতিষ্ঠান জাতি-বৈশিষ্ট্য (customs, institutions and modes) ছাড়া আর কিছুই নয়, ধর্মের সঙ্গে তারা সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন, সুতরাং তাদের বিলোপসাধনের প্রশ্ন হ'লে, সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে, ধর্মসংস্কারের দিক দিয়ে নয়। সর্দার পানিক্করের মতে, এইভাবে ধর্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে স্বামীজী ভারতে সামাজিক ন্যায়ের (social justice) সঠিক পন্থা নির্দেশ করেছিলেন।[৮]

ভারতের সামাজিক ইতিহাস থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাই লাভ করা যায়। অন্যতম শিক্ষা হ'লো যে সামাজিক সম্পর্ককে (social relations) ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ করতে যাওয়া ভুল, কারণ এর ফলে ধর্ম ও সমাজ উভয়েরই সম্প্রসারণ ব্যাহত হয়।

৬ The Master as I saw him, 196

৭ মীমাংসা বা আপসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : "A compromise is a bargain, a transaction of interests between two conflicting powers; it is not a true reconciliation."—The Life Divine I, 24

৮ Panikkar : In Defence of Liberalism, 3-4

স্বামী বিবেকানন্দ সামাজিক ন্যায়ের পথনির্দেশ করেছিলেন এই শিক্ষারই পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতে ব্যক্তি যতদিন তার সামাজিক কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে গেছে ততদিন তাকে তার ইষ্টদেবতার উপাসনার জন্য, অজ্ঞেয়বাদের জন্য, এমন কি নিরীশ্বরবাদের জন্যও কখনও পীড়ন করা হয়নি। সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করলে সমাজ ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়েছে সত্যি, কিন্তু কারও ক্ষেত্রে কখনও মোক্ষের পথ রুদ্ধ করা হয়নি। সুতরাং সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাসকে অভিন্ন মনে করার মত ভুল আর নেই।[৯]

সমাজকে পূর্ণাঙ্গতার সন্ধানে তীর্থযাত্রা বলে বর্ণনা করলে সামাজিক সম্পর্কের বিচার করতে হয় বিশুদ্ধতার মাপকাঠিতে। সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান ও জাতিবৈশিষ্ট্য বা স্বামীজীর নিজের ভাষায় 'প্রথা, ক্রিয়াকর্ম ও আচারানুষ্ঠান' ('customs, rites and ceremonies') যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিশুদ্ধতার পরিপূরক ততক্ষণই তারা মূল্যবান বলে গণ্য হতে পারে। পরিপূরক এবং ফলে মূল্যবান হবার জন্য যা প্রয়োজন তা হ'লো প্রথা ইত্যাদির সময়োপযোগিতা। বিশুদ্ধরূপে এগুলি স্বাধীনতা এবং একত্ববোধেরই (liberty and unity) সূচক। হিন্দুধর্ম বলে অভিহিত বিরাট জটিলব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'লো অসীম অভিব্যাপ্তি। সুতরাং যৌথ জীবনযাত্রায় সংগতিসাধনের যে সর্তাবলী যাজকসম্প্রদায় নির্ধারণ করেছিলেন তা কখনই ধর্মীয় অনুশাসনের রূপে প্রকাশিত হয়নি; সকল সময় তা রূপ গ্রহণ করেছে সামাজিক প্রথার। কালক্রমে এগুলো কঠিন, দুষ্পরিবর্তনীয় হয়ে উঠলেও হিন্দু মনের অপার স্বাধীনতাকে কখনও ব্যাহত করতে পারেনি। অতএব, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, আচারানুষ্ঠান ইত্যাদির উৎস হ'লো সামাজিক প্রয়োজনীয়তা এবং এদের অস্তিত্বের মূলে আছে সামাজিক ঐতিহ্য।[১০]

অন্যভাবে বলতে গেলে, এগুলো একত্ববোধেরই বন্ধনসূত্র, যে একত্ববোধকে (unity) সমাজজীবনের সত্তা বলে অভিহিত করতে হয়। সমাজ পরিবারেরই বৃহত্তর রূপ বলে ভালবাসাকেই অবশ্য প্রাথমিক বন্ধনসূত্র বলে গণ্য করতে হবে, কিন্তু বহিঃস্থ বন্ধনসূত্রেরও প্রয়োজন আছে। এগুলোই হ'লো প্রথা-প্রতিষ্ঠান-আচারানুষ্ঠান। এগুলো যে শুধু সমাজের সংহতি বজায় রাখে তাই নয়, অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে সতর্ক প্রহরী হিসেবেও কার্য করে। ফলে সমাজের সম্মুখে সকল সময় প্রতিবিম্বিত থাকে নিজস্ব মৌল চরিত্র ('its own theme of life')।

কিন্তু অনেক সময়ই অধঃপতনশীল শাসকসম্প্রদায়ের স্বার্থপ্রণোদিত কার্যের ফলে প্রথা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিকৃত রূপ ধারণ করে। এগুলো তখন সমাজের সংহতি-পরিপূরক না হ'য়ে সংহতির হন্তারক হ'য়ে দাঁড়ায়। তখন শুধু যাদের জন্য এই সকল বন্ধনরজ্জু নির্মাণ করা হয়েছে, মাত্র তারাই নয়—যারা নির্মাণ করেছে তারা নিজেরাও আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে। ফলে সমগ্র সমাজ মগ্ন হ'য়ে পড়ে গভীর মোহনিদ্রায়।[১১] তখন প্রয়োজন হয় এগুলোর সংস্কারের বা সম্পূর্ণ বিলোপসাধনের।

---

৯ C. W., IX, 342

১০ cp. Hobhouse: Social Evolution and Political Theory, 94

১১ Modern India (C. W., IV, 456)

১০ সমাজের মুক্তি

প্রথা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির এই সংস্কার বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিলোপসাধনকে সমাজের মুক্তি বা সামাজিক মুক্তি (social liberation) বলে অভিহিত করা যায়; একে আবার ন্যায়ের দ্যোতক বলেও গণ্য করা চলে। কারণ ন্যায় (justice) বলতে বোঝায় সঙ্গত ব্যবস্থাপনা (just ordering of things)। ন্যায়কে লক্ষ্য হিসেবে, আবার পদ্ধতি হিসেবেও দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ন্যায় লক্ষ্য ও পদ্ধতি উভয়ই নির্দেশ করে। সামাজিক সম্পর্কের বিশুদ্ধতার দ্যোতক হিসাবে ন্যায় হ'লো লক্ষ্য বা আদর্শ ; অপরপক্ষে ব্যক্তি ও সমাজের সম্প্রসারণের সূত্র হিসেবে ন্যায় হল অন্যতম পদ্ধতি।

প্রকৃতপক্ষে বেদান্তপূজারীর ধারণায় ন্যায় বলতে সকল অন্যায়, অন্যায্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরতিবিহীন সংগ্রাম বোঝাতে বাধ্য। ফলে কোন কিছু প্রবর্তিত রয়েছে বলেই গ্রহণীয় বিবেচিত হ'তে পারে না,[১২] অপর দিকে আবার ব্যক্তির ওপর পূর্ণ সামাজিক কর্তৃত্বও সমর্থিত হতে পারে না। অতএব, ন্যায়ের লক্ষ্য হ'লো ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সমন্বয়সাধনের সূত্রগুলি খুঁজে বের করা যাতে উভয়েই পূর্ণাঙ্গতার পথে দূর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারে।

বেদান্তবিশ্বাসী হ'লেও স্বামী বিবেকানন্দ জগৎকে চূড়ান্তভাবে নির্ণীত বা স্থিতিশীল বলে মনে করেননি। তাঁর বেদান্তের ব্যাখ্যায় যতক্ষণ প্রত্যেকটি মানুষ পূর্ণাঙ্গতায় না পৌঁছুবে ততক্ষণ জগৎকে অসমাপ্ত বলেই গণ্য করতে হবে।

এই অসমাপ্ত জগতে শুধু যে ব্যক্তিজীবন সমাজ-ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয় তা নয়; সমাজ-ব্যবস্থাও ব্যক্তির দ্বারা নিয়মিত ও নির্ণীত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ যে এই দ্বিতীয়োক্ত সামাজিক সূত্রের ওপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সে-বিষয়ে তর্কের বিশেষ অবকাশ নেই

এই তত্ত্বকে মুক্তিদর্শন (liberation philosophy) বলে অভিহিত করা যায়। এর লক্ষ্য হ'লো ব্যক্তিকে সমাজযন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত করা এবং তারপর ব্যক্তির সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজকেও তথাকথিত অমোঘ আয়ত্তের বাইরে আনা। স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের ভাষায়, "স্বামী বিবেকানন্দের অবস্থান সংকীর্ণ ব্যবস্থা ও নির্ণীত অবস্থা থেকে দূরতম প্রদেশে। যে প্রশ্নের মীমাংসা হ'য়ে গেছে, যে প্রথা রীতিনীতি মতবাদ তত্ত্ব বা আদর্শ প্রবর্তিত রয়েছে, তিনি তাদের সকলেরই যৌক্তিকতার প্রশ্ন তুলেছেন, ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দিয়েছেন।"[১৩] এবং যে সকল শক্তি ব্যক্তির মধ্যে আলোড়ন তুলে সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করে, বিবেকানন্দের গতিশীল সেই শক্তিসমূহের রূপ ও বিকাশ সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।[১৪]

সামাজিক পরিবর্তনের সূচনাই যথেষ্ট নয়; পরিবর্তনের লক্ষ্য (direction) যেন অভ্রান্ত হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। এর জন্যে ব্যক্তিকে প্রথমত ভয়শূন্য এবং দ্বিতীয়ত বিবেক-সম্পন্ন হতে হবে। বেদান্তভিত্তিক শিক্ষাই ব্যক্তিকে এইভাবে গুণসম্পন্ন করে তুলতে

১২ বিবেকানন্দের সমসাময়িক দার্শনিক Darkheim প্রবর্তিত যা কিছু তাকেই নৈতিক বলে বর্ণনা করেছিলেন।

১৩ Sarkar : Creative India, op. cit, 677

১৪ Ibid

পারে। ব্যক্তিকে তার অন্তর্নিহিত ঐশীশক্তির সহায়তা করে এবং তাকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করে বেদান্ত তাকে নির্ভীক ও বিবেকসম্পন্ন (discriminating) করে তোলে।[১৫] এই দুটি গুণে গুণবান হয়ে ব্যক্তি নচিকেতার মতই দ্বিধাহীনভাবে যমেরও সম্মুখীন হ'তে পারে। সে সামাজিক বিধিনিষেধ বা ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি মোটেই অন্ধ আনুগত্য জানায় না। এগুলির মধ্যে মাত্র প্রয়োজনীয়গুলিকেই নির্বাচিত ও যুক্তিসিদ্ধ করে সে তার সত্যের অভিযানে অগ্রসর হয়।

১১। সমাজজীবনের মৌল প্রকৃতি

অবশ্য এই নির্বাচন ও যুক্তিসিদ্ধকরণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সমাজজীবনের মৌল প্রকৃতি ('the theme of social life') যেন হারিয়ে না যায়। এই মৌল প্রকৃতির ধারণার উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন: 'সমাজজীবনের মৌল প্রকৃতি বলতে স্বামী বিবেকানন্দ কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায় তাঁর একটি বিখ্যাত বক্তৃতায়।[১৬] সমাজ (society) এবং জাতিকে (nation) সমার্থকভাবে ব্যবহার করে তিনি বলেছেন, "ব্যক্তির মত প্রত্যেক জাতিরও একটা নিজস্ব চরিত্র আছে, যাকে মূল সুর বা কেন্দ্রবিন্দু বলে বর্ণনা করা যায়। একে কেন্দ্র করেই অন্যান্য সুরের সহযোগে সৃষ্টি হয় সুরসঙ্গতি। কোন কোন জাতির ক্ষেত্রে এই জীবনীশক্তির সন্ধান পাওয়া যায় রাজনীতিতে—যেমন ইংল্যাণ্ড, কোন কোন জাতির ক্ষেত্রে শিল্প-সৌন্দর্যে ইত্যাদি। ভারতে কিন্তু ধর্মই হ'ল জাতীয় জীবন-সঙ্গীতের মূল সুর। যদি কোন জাতি তার জীবনীশক্তিকে—যে জীবনীশক্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গৃহীত হ'য়ে নিজস্ব অবিচ্ছেদ্য উপাদানে পরিণত হয়েছে-বর্জনের প্রচেষ্টা করে এবং জাতি যদি ঐ প্রচেষ্টায় সফল হয় তবে ঐ জাতির মৃত্যু অনিবার্য।"[১৭] অন্য এক স্থানে তিনি সমাজজীবনের মৌল প্রকৃতিকে জনগণের 'ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে অধিকৃত চরিত্র' ('historically acquired character')[১৮] বলে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন।

সমাজের মৌল প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বামীজীর এই ধারণাকে অংশত প্রকৃতিবাদী (naturalistic) এবং অংশত হিতবাদী (utilitarian) বা উদ্দেশ্যবাদী (purposive) বলে বর্ণনা করা যায়। প্রকৃতিবাদের লক্ষণ হ'লো ইতিহাসের দর্শন (philosophy of history) সম্বন্ধে ধারণা এবং উদ্দেশ্যবাদের দ্যোতক হ'লো সমাজের পুনর্নবীকরণের (rejuvenation) জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ।

প্রকৃতিবাদের দিকটি জাগতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। একত্ব (unity) হ'লো বেদান্তের আলোকে ব্যাখ্যাত এই জগতের মূল বৈশিষ্ট্য—বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব; সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তাই। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব' (unity in diversity) হ'লো বেদান্তের বাণী, এবং এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই সমাজের পুনরুজ্জীবনের—উন্নয়নের পথে অগ্রসর হ'তে হবে। তত্ত্বটিতে উদ্দেশ্যবাদ

১৫ Nivedita: Aggressive Hinduism, 12

১৬ My Plan of Campaign

১৭ C. W., III, 220

১৮ Mission of the Vedanta (Ibid, 195)

অনেকাংশে স্বামীজীর ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞান দ্বারা রঞ্জিত। সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশের দিক দিয়ে উনিশ শতক ছিল একরূপ তুলনাবিহীন। বিশেষ বেদনার সঙ্গেই স্বামীজী তা লক্ষ্য করেছিলেন এবং আদিষ্ট পুরুষ হিসেবে এর গতিরোধে যত্নবান হয়েছিলেন। এর ফলেই অংশত রূপ গ্রহণ করেছিল 'সমাজজীবনের মৌল প্রস্তুতি' সম্বন্ধে তাঁর ধারণা।

১২ জাতিভেদপ্রথা—বিশুদ্ধ ও বিকৃত রূপ

সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা তাঁর জাতিভেদ-প্রথার পর্যালোচনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই পর্যালোচনা তিনি করেছেন ভারতেরই পরিপ্রেক্ষিতে।

স্বামীজীর ধারণায় জাতি বা বর্ণ (caste) অন্যতম স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান (institution), যদিও আধুনিক অর্থে জাতিভেদ বলতে যা বোঝায় তা নয়। "সমাজের ধর্মই হ'লো বিভিন্ন গোষ্ঠিতে (groups) বিভক্ত হওয়া... মানুষ গোষ্ঠিতে বিভক্ত হবেই...যেখানেই যাওয়া যাক না কেন, জাতি বা বর্ণের দেখা পাবেই।"[১৯] আবার "সত্ত্ব রজঃ বা তমো-গুণের স্বল্পতা বা আধিক্য অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি জাতি বা বর্ণ সকল সভ্য সম্প্রদায়ে সকল সময় বর্তমান থাকবেই।"[২০]

স্বামী বিবেকানন্দের এই শেষোক্ত ধারণা গীতায় শ্রীকৃষ্ণের ঘোষণারই মোটামুটি প্রতিধ্বনি। শ্রীকৃষ্ণের বাণী হ'লো: "গুণ ও কর্মের তারতম্য অনুসারে চতুর্বর্ণ-ব্যবস্থা আমারই সৃষ্টি।"[২১] ধারণাটি আবার Republic-এ প্লেটো-বর্ণিত 'জাতিভেদ-ব্যবস্থার' সহিত তুলনীয়। প্লেটোর মতে, বৃত্তিনিচয়ের অসামঞ্জস্যহেতু সমাজের সভ্যগণকে (রাষ্ট্রের সভ্যগণকেও বটে, কারণ প্রাচীন গ্রীকদের কাছে সমাজ ও রাষ্ট্র ছিল অভিন্ন) সকল ক্ষেত্রেই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে: বুদ্ধি-জীবী (intellectuals), যুদ্ধজীবী (warriors) এবং উৎপাদক (producers)। এই উৎপাদক-শ্রেণী আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—বণিক-ব্যবসায়ী এবং কায়িকশ্রমশীল ক্রীতদাস।[২২]

প্রকৃতপক্ষে জাতিভেদপ্রথা বিশেষীকরণের (specialisation) সুবিধাভোগের জন্য কোন অনুপ্রাণিত ব্যক্তির আবিষ্কার নয়।[২৩] প্রথাটি আবার মাত্র প্রাচীন সভ্যতারও বৈশিষ্ট্য নয়।[২৪] জাতিভেদপ্রথা সর্বকালেরই মানব-সমাজের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এর বিলোপ-সাধনের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কার্য। যা করণীয় তা হলো যুক্তিসিদ্ধকরণের মাধ্যমে একে উদারনৈতিক করে তোলা।

কিন্তু যুক্তিসিদ্ধকরণের পদ্ধতি কি? পদ্ধতির সন্ধান স্বামীজী পেয়েছেন প্রাচীন ভারতের জাতিভেদপ্রথায়। আর্যদের লক্ষ্য ছিল সকলকে উন্নীত করা, এমন কি নিজের চেয়েও উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা—ইয়োরোপীয়দের মত সকলকে ধ্বংস করে নিজে বাঁচা নয়।

১৯ Vedanta and Indian Life, (C. W., III, 245)

২০ C. W., IV, 449

২১ গীতা, ৪।১৩

২২ Republic (Jowett's Translation), Vol. I, 434-35

২৩ জেমস্ মিল জাতি বা বর্ণকে ঐরূপ আবিষ্কার বলেই অভিহিত করেছেন।

২৪ অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শ্যালের ধারণার উল্লেখ করা হয়েছে।

ইয়োরোপীয় সভ্যতার বাহন হ'লো তরবারি। কিন্তু আর্য-সভ্যতার হ'লো জাতিভেদপ্রথা। আর্যরা সভ্যতার পথে পদসঞ্চার করেছিলেন সম্প্রদায়কে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করে। এর ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতির সমানুপাতেই প্রত্যেকে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হ'তে পারত। ইয়োরোপ সর্বদাই শক্তিমানের জয় এবং দুর্বলের বিনাশের নীতি অনুসরণ :করে এসেছে। ভারতভূমিতে কিন্তু প্রত্যেক সামাজিক নিয়মই প্রণয়ন করা হয়েছে দুর্বলের সংরক্ষণের জন্য।[২৫]

স্বামী বিবেকানন্দের এই অভিমতের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়: প্রথমত, জাতিভেদপ্রথা ব্যক্তিগত বৈষম্যের দ্যোতক মাত্র। এবং দ্বিতীয়ত, এই প্রথা দুর্বলেরই সংরক্ষণের জন্য, সবলের সহায়তার জন্য নয়। দ্বিতীয় তাৎপর্যটি মেনে নিলে বর্ণাশ্রম-প্রথাভিত্তিক হিন্দুসমাজকে 'সমাজতান্ত্রিক, সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক' [২৬] বলেই আখ্যা দিতে হয়। যেহেতু জাতি জৈব প্রকৃতির, সেইহেতু জাতির কোন সভ্যের উন্নতি বা অবনতি অন্যান্য সকলেরও উন্নতি বা অবনতি নির্দেশ করে।[২৭]

ফলে এর থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, ব্যক্তি-উন্নয়নের পরিকল্পনা করতে হবে সমগ্র জাতির ভিত্তিতে, এবং এই পরিকল্পনার সূত্র হলো 'পারস্পরিক সহায়তা' (mutual aid)।

স্বামীজীর চক্ষে জাতিভেদপ্রথার আরও একটি বিশেষ গুণ আছে। ব্যক্তি-প্রকৃতির সর্বপ্রধান ও চূড়ান্ত নিয়ামক হ'লো জাতি। "জাতির মতামতই ব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত কাম্য নিয়ন্ত্রণপাশে আবদ্ধ রাখে।"[২৮]

পরিশেষে, স্বামীজীর মতে, আর্যদের বর্ণাশ্রমধর্ম সমাজের উদ্দেশ্যবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণকে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান ক'রে জাতিভেদপ্রথা সমগ্র ভারতে আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পরিশোধিত বুদ্ধিবৃত্তিকেই সমাজের প্রধান শক্তি করে তুলেছিল।[২৯] চূড়ান্ত মূল্যায়নে এরূপ সমাজই কাম্যতম সমাজ।

যদি জাতিভেদপ্রথার উপরি-উক্ত গুণাবলীই নির্দেশ করা যায় তবে বর্তমান দিনে ঐ প্রথার সঙ্গে এত ত্রুটি, এত অমঙ্গল জড়িত কেন? উত্তর হ'লো, সমাজ-বিবর্তনের ধারায় জাতিভেদপ্রথার বিকৃতির দরুনই হ'লো যত কিছু দোষ ত্রুটি অকল্যাণ।

[ক্রমশঃ]

---

২৫ The East and The West (C. W., V, 537)

২৬ Women of India (C. W. VIII, 62)

২৭ C. P: Dr. Roma Choudhury's artical in the C. V.

২৮ The Master as I saw Him, above, 281

২৯ C. W., IV, 297

স্বামী বিবেকানন্দের অনুবাদ-গ্রন্থ ঃ 'শিক্ষা'

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ

হার্বার্ট স্পেন্সার ও স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান ও ধর্ম

আধুনিক কালে ধর্মচেতনাকে যাঁরা শুধুমাত্র পৌরাণিক কল্পনা ও প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজনে সৃষ্ট বিশ্বাসের ফল বলে মনে করেন তাঁদের সঙ্গে বিজ্ঞাননিষ্ঠ হার্বার্ট স্পেন্সারের চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য। স্পেন্সারের মতে বিজ্ঞানই মানুষকে আরো গভীরভাবে ধর্মজিজ্ঞাসায় প্রণোদিত করে। প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু মহত্তম সত্যের অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক অন্বেষণবৃত্তি মানুষের পরম সহায়ক।

বেদান্তবাদী বিবেকানন্দের অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁর পরিণত মননে বিজ্ঞানও পরমসত্যলাভের অন্যতম পন্থারূপে গৃহীত। অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিচার ও যুক্তিধর্মের প্রয়োগ তাঁর আকাঙ্ক্ষিত। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য—"Is religion to justify itself by the discoveries of reason through which every other science justifies itself? Are the same methods of investigation, which we apply to sciences and knowledge outside, to be applied to the science of religion? In my opinion this must be so, and I am also of opinion that the sooner it is done the better.

"If a religion is destroyed by such investigation, it was then all the time useless, unworthy superstition; and the sooner it goes the better. I am thoroughly convinced that its destruction would be the best thing that could happen. All that is dross will be taken off, no doubt, but the essential parts of religion will emerge triumphant out of this investigation."[১]

"অন্যান্য বিজ্ঞান যেভাবে যুক্তি-আবিষ্কারের দ্বারা নিজেদের সমর্থন করে চলেছে, ধর্মকেও কি তাই করতে হবে? বহির্জগতের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা যে অনুসন্ধান-পদ্ধতির অনুসরণ করি, ধর্মের ক্ষেত্রেও কি তাই করণীয়? আমার মতে তাই করণীয়। আর এও আমার মত যে, যত তাড়াতাড়ি তা করা যায় ততই মঙ্গল।

তার ফলে যদি কোনো ধর্ম ভেঙে পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে সে-ধর্ম এতকাল অর্থহীন অযোগ্য কুসংস্কার ছিল। যত তাড়াতাড়ি তা বিনষ্ট হয় ততই ভাল। আমি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, এ জাতীয় বস্তুর বিনাশেই সবচেয়ে বেশী কল্যাণ। যুক্তিমূলক অনুসন্ধানের ফলে ধর্মের অন্তর্লীন খাদ যা আছে তা দূর হয়ে

১ Reason and Religion: Complete Works of Swami Vivekananda: Vol. 1: p 367, Centenary Edn.: যুক্তি ও ধর্ম: বাণী ও রচনা: ১ম সং: ৩য় খণ্ড: পৃঃ ১৩৩ দ্রষ্টব্য।

ধর্মের সারসত্য দ্বিগুণ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে।"

তারপর স্বামীজী যুক্তিভিত্তিক ধর্মসম্বন্ধে এমন একটি মন্তব্য করেছেন যা সাধারণ বস্তু-ধর্মী যুক্তির উর্ধ্বে। তিনি বলেছেন— "Not only will it be made scientific—as scientific, at least, as any of the conclusions of physics or chemistry—but will have greater strength, because physics or chemistry has no internal mandate to vouch for its truth, which religion has."

"ধর্ম যে শুধু পদার্থ-বা রসায়ন-শাস্ত্রের মতো যুক্তিসম্মত হবে তা নয়, বরং আরো বেশী শক্তিসম্পন্ন হবে। কারণ, পদার্থবিদ্যা বা রসায়নশাস্ত্রের প্রকাশিত সত্যের সপক্ষে সাক্ষ্য দেবার মতো অন্তরতম নির্দেশ কিছু নেই, যা ধর্মের রয়েছে।"

স্বামীজী যে 'internal mandate' বা অন্তরতম নির্দেশের কথা বলেছেন, স্পেন্সার তাঁর 'বিজ্ঞান ও ধর্ম' বিষয়ক আলোচনায় সে-জাতীয় কিছু বলেননি। কিন্তু বিজ্ঞানের নিয়মাবলীর অনুধাবন থেকেই অনন্ত সত্যের রহস্যানুভূতি তাঁর চিন্তালোকে আভাসে দেখা দিয়েছে। স্বামীজীর সংক্ষেপিত অনুবাদে স্পেন্সারের বক্তব্য—"বৈজ্ঞানিকই যে কেবল ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতে সমর্থ, তাহা নহে, দিবানিশি [ঈশ্বরের] নিয়মাবলীর আলোচনা করিয়া, তাহাদের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য, অসীম দয়াভাব, অথচ অপ্রতিহত অবশ্যম্ভাবী ফল চিন্তা করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রত্যেক সুকার্য-কুকার্যের ফল অনিবার্য বলিয়া অপেক্ষা করে, অথচ সমস্তই মঙ্গলের নিমিত্ত করিতেছে, তাহা মনে করিয়া আনন্দিত হয়। বিশেষতঃ এই অনন্ত দুর্ভেদ্য জগতের মধ্যে আমরা কে এবং অগণ্য সত্তাপূর্ণ জগতের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধই বা কি, বিজ্ঞান ইহাও স্থির করে।"[২]

২ বন্ধনীস্থিত অংশ লেখকের প্রদত্ত। স্পেন্সারের মূল ভাষা—Nor is it thus only that true science is essentially religious. It is religious, too, in as much as it generates a profound respect for, and implicit faith in, those uniformities of action which all things disclose. By accumulated experiences the man of science acquires a thorough belief in the unchanging relations of phenomenon—in the variable connexion of cause and consequence—in the necessity of good or evil result. Instead of rewards and punishments of traditional belief, which people vaguely hope that they may gain, or escape, spite of their disobedience, he finds that there are rewards and punishments in the ordained constitution of things; and that the evil results of disobedience are inevitable. He sees that the laws to which we must submit are both inexorable and beneficient. He sees that in conforming to them, the process of things is ever towards a greater perfection and a higher happiness. Hence he is led constantly to insist on them, and is indignant when they are disregarded. And thus does he, by asserting the eternal principles of things and the necessity of obeying them, prove himself intrinsically religious.

বিজ্ঞানের নিয়মাবলীর মাধ্যমে ঈশ্বরের বিধান লক্ষ্য করার এ মনোবৃত্তি নিঃসংশয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই তথাকথিত নিয়মাবলী যে একান্ত বহিরঙ্গ, নূতন নূতন আবিষ্কারের দ্বারা যে এদের পরিবর্তন হয়, সেকথাও স্মরণীয়। আপাতদৃষ্টিতে শুধুমাত্র মঙ্গলময় বিধানের চিন্তা যতই মহৎ হোক, পূর্ণসত্যের দৃষ্টিতে এই আপেক্ষিক মঙ্গলবোধের ধারণা কখনই স্বীকার্য নয়। বিশ্বসৃষ্টিতে সুখের সঙ্গে দুঃখ, মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গল, পুণ্যের সঙ্গে পাপের ধারণা অপরিহার্য। স্পেন্সারের আপাত অজ্ঞেয় নিরাকার সগুণ ঈশ্বর মূলতঃ মঙ্গলের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু স্বামীজীর বেদান্তবাদী বিচারে ঈশ্বরের এই প্রকাশও আপেক্ষিক। নিরুপাধি ব্রহ্মসত্য মানুষের সাধারণ মঙ্গল-অমঙ্গল-বিচারের ঊর্ধ্বে।

স্বামীজী তাঁর 'যুক্তি ও ধর্ম' বক্তৃতায় ধর্মের সারসত্য (essential parts of religion) বলতে যা বুঝিয়েছেন, বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত বস্তুজগতের নিয়মাবলী কখনই তা নয়। বেদান্তের যে অদ্বৈতবাদ স্বামীজীর লক্ষ্য, তার সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ নেই একথা যেমন সত্য, তেমনি বৈজ্ঞানিক মাত্রেই ধার্মিক বা অদ্বৈতবাদী হ'তে পারেন না—একথাও স্মরণীয়। সর্ববস্তুর অন্তর্লীন অদ্বয় সত্তার চৈতন্যময় উপলব্ধি আর বৈজ্ঞানিকের একদৃষ্টি কখনই এক অর্থে গ্রহণীয় নয়। তবে স্পেন্সারের চিন্তাধারা-অনুসারে এটুকু স্বীকার্য যে, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে বস্তুবিশ্বের অন্তরালে এক বা অখণ্ডের ধারণা আরো সহজসাধ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ মানবসভ্যতাকে বিশ্বরহস্যের কত বেশী গভীরে নিয়ে এসেছে। তবু কি আমরা বলতে পারি যে, ইন্দ্রিয়াতীত সত্যোপলব্ধিতে ভারতীয় অধ্যাত্ম-আদর্শের উপযোগিতা বিন্দুমাত্র কমেছে? বরং বস্তুবাদী চিন্তাধারার আত্মক্ষয়কারী পরিণতি কি মানুষকে একথাই মনে করিয়ে দেয় না যে, মানুষের অন্তর্লোকের অমেয় গভীরতার পরিমাপে কোনো বৈজ্ঞানিক বা সামাজিক যন্ত্রই যথেষ্ট নয়?

কিন্তু একথাও ঠিক যে বিজ্ঞান যতই নব নব আবিষ্কার করুক, তার দ্বারা যথার্থ সত্য-সন্ধানী বিজ্ঞানী জ্ঞানের অনাবিষ্কৃত বিশালতার কথা আরো গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ পান। আমাদের কিছু জানাই মহা অজানার সংকেত এনে দেয়। সন্দেহ কি, বিনয়ই পাণ্ডিত্যের নিশ্চিত অভিজ্ঞান।

এ বিষয়ে স্পেন্সারের বক্তব্য স্বামীজীর অনুবাদের ভাষায়—"এক দিকে বিজ্ঞান জ্ঞাতব্য স্থির করায়, অপর দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া মনুষ্যমনের অগম্য বিষয় নির্দেশ করে। বিজ্ঞানের তুল্য নম্রতা আর কেহই শিক্ষা দেয় না। চারিদিক হইতে মানবের অনেক অলঙ্ঘ্য বাধা দেখাইয়া, তাহার অণুত্ব বিশেষরূপে প্রমাণ করে। যদিও বিজ্ঞান সত্যের অনুরোধে

And lastly the further religious aspect of science, that it alone can give us true conceptions of ourselves and our religion to the mysteries of existence." Education : Spencer : p 52 : 1st edn.

'শিক্ষা' : অনুবাদক : স্বামী বিবেকানন্দ : পৃঃ ৪৪, বসুমতী-প্রকাশিত, শশিভূষণ-দত্ত মুদ্রিত সংস্করণ।

নির্মম(ভাবে) প্রাচীন কুসংস্কার পদদলিত করে, তেমনি অপর দিকে মনের অতীত নির্দ্বন্দ্ব সনাতন বিষয়ের নিকট মস্তক অবনত করিয়া আপনার অজ্ঞতাও স্বীকার করে। যে শক্তিতে সমস্ত জগৎ চালিত হইতেছে, বিশেষ সমুদয় জীবন, জগতের সমুদয় চিন্তা ; ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি যে মহাশক্তির বিকাশমাত্র, সেই অনন্ত শক্তির নিকট মানুষের জ্ঞান কত ক্ষুদ্র, কত অকিঞ্চিৎকর, তাহা প্রকৃত বৈজ্ঞানিকই বুঝিতে সমর্থ।"৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-সচেতন দার্শনিক স্পেন্সারের বৈজ্ঞানিকের প্রতি এই পক্ষপাত আংশিকভাবে আমাদেরও স্বীকার্য। পরমসত্যের অন্বেষণে বিজ্ঞান যে বিশেষ সহায়ক সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু স্পেন্সারের যুক্তিজাল-বিস্তার মূলতঃ এই কথাটি প্রমাণ করবার জন্য যে, একমাত্র বিজ্ঞানই জীবনের সর্ব প্রয়োজন মিটাবার বিদ্যা। অধ্যাত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান যে একান্ত বহিরঙ্গ সেকথা আগেই আলোচিত। ভাষা, সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প—সব কিছুকে পিছনে ফেলে প্রধানতঃ বিজ্ঞানের সেবাই স্পেন্সারের অভীষ্ট।

এক্ষেত্রে মনে হয়, মানবমানসের বিভিন্ন প্রয়োজনের দিক থেকে শিক্ষার বৈশিষ্ট্যকে বিচার না করে শুধুমাত্র উপযোগিতার দিক থেকেই শিক্ষাকে বিজ্ঞানকেন্দ্রিক করার কথা স্পেন্সারের মনে জেগেছিল। কিন্তু শুধুমাত্র বস্তুবিদ্যা আমাদের জ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ করে না। পরাবিদ্যার অভাবে সব বিদ্যাই ব্যর্থ। পরম-জ্ঞানের পূর্ববর্তী স্তরে ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, জীবিকা—সর্বক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিজ্ঞানই আমাদের সব জিজ্ঞাসা ও অন্বেষণের উত্তর দিতে পারে না। তবে বিজ্ঞান যে অনেক পরিমাণে সহায়ক হ'তে পারে, তাতে সন্দেহ নেই।

স্পেন্সারের বক্তব্যের এই অংশটুকু মানা চলে যে—"যেহেতু বিজ্ঞানের সত্যসমূহ আবশ্যিক

৩ স্পেন্সারের মূল ভাষা—"At the same time that it shows us all which can be known, it shows us the limits beyond which we can know nothing. Not by dogmatic assertion does it teach the impossibility of comprehending the ultimate cause of things ; but it leads us clearly to recognise the impossibility by bringing us in every direction to boundaries we cannot cross. It realises to us in a way which nothing else can, the littleness of human intelligence in the face of that which transcends human intelligence. While towards the traditions and authorities of men its attitude may be proud, before the impenetrable veil which hides the absolute, its attitude is humble—a true pride and a true humility. Only the sincere man of science (and by this title we do not mean the mere calculator of distances, or analyzer of compounds, or labeller of species, but him who through lower truths seeks higher, aad eventually the highest)—only the genuine men of science, we say, can truly know how utterly beyond, not only beyond human knowledge but human conception, is the universal power of which Nature and Life, and Thought are manifestations." Education : Spencer : p 52-53 : 1st Edn.

'শিক্ষা' : পৃঃ ৪৪-৪৫

৬

এবং চিরন্তন, সেহেতু বিজ্ঞানের সব শাখাই চিরকালের মানবজাতির পক্ষে প্রয়োজনীয়। নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে বর্তমানে এবং সুদূর ভবিষ্যতেও বিজ্ঞান সমভাবেই মানবজাতির আচার-আচরণ-নিয়ন্ত্রণে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করবে, যাতে করে মানবজাতি জীবনের বিজ্ঞান—শারীরিক, মানসিক, সামাজিক সর্বপ্রকারের বিজ্ঞানই আয়ত্ত করতে পারবে এবং সব ধরনের বিজ্ঞানই তারা জীবন-বিজ্ঞানের চর্চায় সহায়করূপে গ্রহণ করবে।"[৪]

কিন্তু জীবন-বিজ্ঞানের দুটি দিক—বস্তুবিজ্ঞান এবং অন্তর্বিজ্ঞান। স্পেন্সার মানসিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের কথা ভেবেছেন, কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কথা ভাবেননি। সেদিক থেকে স্পেন্সারের গ্রন্থের তরুণ অনুবাদক নরেন্দ্রনাথের পরিণত মননের পরিচায়ক সিদ্ধান্ত স্মরণীয়—"There are two words, the microcosm and the macrocosm, the internal and the external. We get truth from both of these by means of experience. The truth gathered from internal experience is psychology, metaphysics and religion ; from external experience, the physical sciences. Now a perfect truth should be in harmony with experiences in both these worlds. The microcosm must bear testimony to the macrocosm, and the macrocosm the microcosm ; physical truth must have its counterpart in the internal world, and the internal world must have its verification outside."[৫]

"দুটি শব্দ রয়েছে—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। একটি অন্তর্জগতের, অন্যটি বহির্জগতের। অনুভূতি-যোগে আমরা এই দুই জগৎ থেকেই আন্তর ও বাহ্য সত্য লাভ করে থাকি। আন্তর অনুভূতি দ্বারা সংগৃহীত সত্যসমূহ—মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম নামে পরিচিত। আর বাহ্য অনুভূতি থেকে জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এখন কথা এই—যা পূর্ণ সত্য, তার সঙ্গে এই উভয় জগতেরই অনুভূতির সামঞ্জস্য থাকবে। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সত্যতাবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবে, তেমনি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে।"[৬]

স্পেন্সার তাঁর শিক্ষাদর্শনের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন—macrocosm বা বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড, মূলত: যা জড়বিজ্ঞানের জগৎ। স্বামীজীর

৪ অনুবাদ লেখককৃত। এ অংশটুকুর অনুবাদ স্বামীজীর 'শিক্ষা' গ্রন্থে নেই। মূল ভাষা—
"Necessary and eternal as are its truths, all Science concerns all mankind for all time. Equally at present and in the remotest future, must it be of incalculable importance for the regulation of their conduct, that men should understand the Science of life, physical, mental and social and that they should understand all other sciences as a key to the Science of life."—Education : Spencer : p 53 : 1st Edn.

৫ 'Cosmology' : Complete Works of Swami Vivekananda : Vol. II, p. 432, মূলত: উদ্বোধন কার্যালয়-প্রকাশিত 'The Science and Philosophy of Religion' গ্রন্থের

৬ 'সাংখ্যীয় ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব' : বাণী ও রচনা : ৩য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

শিক্ষাদর্শনের কেন্দ্রসত্য microcosm বা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড অথবা মনোজগৎ। কিন্তু স্পেন্সার যেমন ধর্মচেতনাকেও বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, স্বামীজী তেমনি বিজ্ঞানসাধনাকেও ঈশ্বরীয় সাধনার অন্যতম পন্থারূপে গ্রহণ করেছেন।

'শিক্ষা'—অনুবাদগ্রন্থটি যদি ১৮৮৪ নাগাদ অনূদিত হয়ে থাকে, তাহলে তার ছয় বছর পরে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে হিমালয়-অঞ্চলে পরিব্রজ্যাকালে একদা নৈনিতাল থেকে আলমোড়ার পথে অশ্বত্থতলায় ধ্যানমগ্ন বিবেকানন্দের অনুভূতিলোকে এই সত্য প্রথম উদ্ভাসিত হয়। ধ্যানোত্থিত বিবেকানন্দ তাঁর এই অনুভূতিরাশি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করে অখণ্ডানন্দের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। মূল বাংলায়—"ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ একরকমের গঠন।" ইংরেজী অনুবাদে —The microcosm and the macrocosm are built on the same plan.'[৭]

হার্বার্ট স্পেন্সারের চিন্তাধারা মূলতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও মতবাদের উপর নির্ভরশীল। তরুণ নরেন্দ্রনাথ স্পেন্সারের যুক্তিবাদ, স্বচ্ছ দৃষ্টি ও মৌলিক চিন্তাশক্তির দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু তাঁর নিজস্ব মৌলিকতায় অল্পকালের মধ্যেই বিজ্ঞানের বহিরঙ্গ সত্যের সঙ্গে অধ্যাত্ম-উপলব্ধির অন্তরঙ্গ যোগসাধনের দ্বারা তিনিই আধুনিক ধর্মচিন্তার জগতে বিজ্ঞানের সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেই স্বাগত জানালেন। কারণ, যে মহাসাধকের কাছে তিনি ধর্মবিজ্ঞানের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর সমগ্র জীবনটিই আধ্যাত্মিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-দর্শনের প্রমাণস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে এসে যে অদ্বৈত-উপলব্ধি—তা কোনো বিশেষ জাতি, বর্ণ, মতবাদ বা পৌরোহিত্যের অপেক্ষা রাখে না—পৃথিবীর যাবতীয় বৈজ্ঞানিক বীক্ষণকে স্বীকার করে নিয়েই তা আব্রহ্মস্তম্বব্যাপী এক অদ্বয় সত্তার অনুভবে সমাসীন।[৮]

৭ স্বামী গম্ভীরানন্দ-লিখিত 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' : প্রথম খণ্ড : পৃঃ ২৮৩ (১ম সংস্করণ) ও বর্তমান লেখকের 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য' : ২য় সংস্করণ : পৃঃ ১০০-১০১ দ্রষ্টব্য।

৮ স্বামীজীর অনুবাদগ্রন্থ 'শিক্ষা'র মূল শিক্ষাদর্শনের আলোচনা এখানে শেষ হ'ল। এ গ্রন্থের শেষ অধ্যায় 'শারীরিক শিক্ষা'ও এই সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। 'জ্ঞানশিক্ষা' এবং 'নৈতিক শিক্ষা' অধ্যায় দুটি সম্বন্ধে গ্রন্থাকারেই লেখকের বক্তব্য প্রকাশিত হবে।

স্পেন্সারের গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম—'সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন—বিজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চিন্তাধারায় এই বিজ্ঞান-চেতনাও ব্রহ্মচেতনার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অধ্যাত্মজ্ঞানই ভারতীয় আদর্শে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

'এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও।'

শিবদাস

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।'—(তৈঃ উঃ ৩।৬)

আনন্দ থেকেই জন্মেছি আমরা, যাত্রা করেছি জীবনের পথে। আনন্দ আছে বলেই বেঁচে আছি, আনন্দ পাই বলেই, আনন্দের সন্ধানেই ঘুরে বেড়াই জীবনে জীবনে। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে একদিন আবার ঘরে ফিরতে চাই, যেখান থেকে যাত্রা শুরু সেই আনন্দ-স্বরূপের অভিমুখী হই, আর ফিরে গিয়ে মিশে যাই সেই আনন্দ-পারাবারেই।

(১)

এই অসীম আনন্দ-পারাবারই আমাদের স্বরূপ, ভগবানেরও স্বরূপ। এইটিই আমাদের ঘর। সেই ঘরে যখন ছিলাম এই আনন্দ থেকে নিজেকে আলাদা ভাবিনি কখনো। জীবনও ছিল না তখন, জীবনের পথে চলার যাত্রীও ছিল না। এসবই হল একদিন। 'মন' হল 'কায়া' হল, 'অহংকারের বসন' হল। সেই অহঙ্কারের বসন গায়ে জড়িয়ে, 'মনকে, আমার কায়াকে' আমি বলেই মনে করলাম—'আমারি নাম' তাদের 'সকল অঙ্গে লিখা' হল। আমি অসীম থেকে এভাবে সসীম হয়ে যাত্রী হলাম, বেরিয়ে পড়লাম জীবনের পথে, যাত্রা শুরু হল; কেন হল, তা জানি না—

'ভাবি নাইকো কেন কিসের লাগি
ছুটে চ'লে এলমে পথের 'পরে।'

জীবনপথে নেমেছি 'অহঙ্কারের বসন' গায়ে জড়িয়ে, তাই ভগবানকে, নিজের স্বরূপকে, আনন্দ-পারাবারকে ভুলে গিয়েছি। এই ভুলে যাওয়ার জন্য প্রচণ্ড একটা অভাব বোধ করেছি, আর তা পূরণের জন্য ব্যাকুল হয়ে ছুটে চলেছি জীবনপথে; এ অভাব যে আসলে ঘরের সেই আনন্দেরই অভাব, চলেছি যে তাঁকেই চেয়ে, আনন্দস্বরূপেরই খোঁজে—আনন্দেরই সন্ধানে, আনন্দেরই জয়গান গেয়ে, সে কথা না জেনেই চলা শুরু করেছি—

'ঝরণা যেমন বাহিরে যায়,
জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি করে ধেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে।'

জীবনপথে চলার সময় পথের দুপাশের অনেককিছুর সঙ্গ পেয়ে, বিষয়ের সঙ্গ পেয়ে আমার মন, আমার কায়া সুখী হয়েছে। তাদের সুখে আমি নিজেকেই সুখী মনে করেছি, মজা পেয়েছি, একটা আকর্ষণ অনুভব করেছি এভাবে বিষয় থেকে সুখ আহরণ করে এগিয়ে চলতে—

'পথের নেশা তখন লেগেছিল,
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।'

এ সুখের আশায়, আনন্দের আশায় চলা যে আসলে ভগবানকে চেয়েই চলা, তা কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি। চলতে চলতে ভেবেছি আনন্দ বিষয়েই আছে, যার সঙ্গ করে অমি সুখ পাচ্ছি। বিষয়ের সংস্পর্শে এলে ভেতর থেকে ভগবানেরই, আনন্দস্বরূপেরই একটু ছিটেফোটা যে প্রকাশিত হয়, আনন্দ যে তিনিই, বিষয় নয়, তা তখন বুঝিনি। এই না বোঝার জন্যই ভোগের আনন্দ, নামযশের আনন্দ, অধিকার-

বোধের আনন্দ, ভালবাসার আনন্দ প্রভৃতি কত নাম যে দিয়েছি তাঁর, তার ঠিক-ঠিকানা নেই—

'কতই নামে ডেকেছি যে,
কতই ছবি এঁকেছি যে,
কোন্ আনন্দে চলেছি তার
ঠিকানা না পেয়ে।'

(২)

বেশ আনন্দ আর উৎসাহ নিয়েই চলেছিলাম কত বিচিত্র জন্মের ভেতর দিয়ে জীবনের পথ বেয়ে—

'নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ,
বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক।'

অবশ্য চলার পথে যে একটানা সুখই কেবল আসছিল তা নয়, দুঃখও আসছিল প্রচুর। যা চাইছিলাম—একটানা অসীম আনন্দ, তা কিন্তু পাইনি কখনো. পদে পদে দুঃখ এসে সুখের সুর থামিয়ে দিয়েছে, জীবনকে বিষিয়ে দিয়েছে হতাশায়, যন্ত্রণায়। তবু এ সুদীর্ঘ পথযাত্রায় বরাবরই ভেবে এসেছি, যা চেয়ে পথে নেমেছি, যা খুঁজে বেড়াচ্ছি, সেই অফুরন্ত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ নিশ্চয়ই পাব একদিন। বহু বহু জন্মের অভিজ্ঞতার পর বুঝেছি, এখানে তা হবার নয়, সুখ-দুঃখ এখানে পরস্পর-বিজড়িত, দুঃখ থেকে সুখকে আলাদা করে নেবার কোন উপায় নেই। তবু বুঝেও বুঝিনি, মোহগ্রস্ত হয়ে ভেবেছি এর পরের বার আর এমন হবে না, হঠাৎ এখানকার নিয়মবিরুদ্ধ কিছু নতুনত্ব একটা ঘটে যাবে, অকস্মাৎ পেয়ে যাবো যা চাইছি—

'হঠাৎ যেন দেখতে পাব কাকে,
শুনতে যেন পাব নতুন সুর।'

কিন্তু চলতে চলতে কোন এক দুর্লভ জন্মে, কোন এক পুণ্য লগ্নে এ মোহ আমাদের কেটে যায়—

'অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।'

তখন বুঝতে পারি যে, যাকে চেয়ে জীবন-পথে নেমেছিলাম, যাকে পাবার প্রেরণা আমাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে এতদিন, সে ভগবানই, বিষয় নয়। বুঝতে পারি, বিষয়ে আনন্দ আছে বলে এতদিন ভুল করেছিলাম বলেই তাকে কাছে টানতে চেয়েছি এতদিন, আসলে চেয়েছি ভগবানকেই, আনন্দ তিনিই—

'জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি।'

আর তখনই ফিরতে চাই ঘরে, পরম ধামে, নিজেরই স্বরূপে, আনন্দ-পারাবারে, ভগবানের কাছে—

'এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।'

(৩)

কিন্তু ফিরতে চাইলে কি হবে, যাত্রা থামাতে পারছি কই? যেতে পারছি না তো এ যাত্রা থামিয়ে তোমার কাছে! এতদিন জীবনপথে চলার সময় আনন্দলাভের আশায় ভাল-মন্দ যত কাজ করেছি তার ফল জমে জমে বোঝা হয়ে রয়েছে মাথার ওপর, সেই বোঝার ভারই আমাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে সামনে, জন্ম হতে জন্মান্তরের দিকে—

'ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছে!'

এই কর্মফলের বোঝার হাত থেকে রেহাই পাবার তো কোন উপায় দেখছি না। বোঝা নামাতেও পারছি না, আবার নতুন কাজ না করেও পারছি না—যাতে বোঝা আরো ভারী হচ্ছে। সব কর্মেরই ফল একটা তো হয়ই, ভাল বা মন্দ বা দুই মেশানো—যেমন কর্ম,

তেমনি। আর সে ফল ভোগও করতে হবে আমাকে—আজ হোক, কাল হোক, এ জন্মে বা পরবর্তী যে-কোন জন্মেই হোক। জীবন-পথে চলার সময় আনন্দলাভের আশায় যেখানে যা কিছু পেয়েছি যে-কোন উপায়েই হোক, যে-কোন কাজ করেই হোক তা করায়ত্ত করেছি, ফলে কর্মফল জমিয়েই তুলেছি এভাবে। জমা বেড়েই গেছে; প্রতিজন্মে খরচ যা হয়েছে, জমা পড়েছে তার বেশী। কিন্তু তারা তো ছাড়ে না, কড়ায় গণ্ডায় হিসেব বুঝে নিতে আসেই একদিন, ক্ষমা করে কখনো পাওনা-গণ্ডা ছেড়ে দেয় না—

'যেথানে যা কিছু পেয়েছি কেবলি
সকলই করেছি জমা,
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব,
কেহ নাহি করে ক্ষমা!'

কর্মফলের এই বোঝা মন বুদ্ধি প্রভৃতি দিয়ে গড়া আমাদের সূক্ষ্মদেহের ওপর চেপে থাকে বলে স্থূলদেহের নাশের সময়, মৃত্যুকালে এক দেহ থেকে অন্য দেহে যাবার সময় বোঝা সঙ্গে নিয়েই যেতে হয়, ফেলে যাবার উপায় নেই—

'জীবনে তুই যা নিয়েছিস
মরণে সব নিতে হবে।'

এ ভার নামাতে পারছি না, বরং বাড়িয়েই চলেছি, তাই তার ভারের বেগেই এগিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি—'ভারের বেগেতে চলেছি!'

এ ভার মাথা থেকে নামাবার উপায় এখন জানতে পেরেছি। আমার 'মনকে আমার কায়াকে' আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরকে আমি আমি করে এসেছি বলেই, 'আমারি নাম সকল অঙ্গে লিখা' বলেই এ ভার 'আমার ভার' হয়েছে—আসলে এ বোঝা তো চাপানো ওদেরই ঘাড়ে। এ বোঝা নামাতে হলে এখন 'এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে,...আমার এই মলিন অহংকার।' ঘরে পৌঁছবার আগে তো অহংকার একেবারে যাবে না, কোন-না-কোন আকারে থাকবেই। এই অহংকারকেই তো আমরা 'আমি' বলে জানি, আমাদের আসল 'আমি' যে কিরকম, সে তো ঘরে ফেরার আগে কল্পনাতেই আসবে না। তাই 'আমার এই মলিন অহংকার'-কে, 'ছোট আমি'-কে, 'কাঁচা আমি'-কে ছেড়ে ধরতে হবে 'বড় আমি'কে, 'পাকা আমি'কে—ভগবানের দাস আমি', 'তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র', 'তাঁর তৃপ্তির জন্য কাজ করছি'—এই সব ভাব আশ্রয় করতে হবে। 'আমার' আসনে ভগবানকে এনে বসাতে হবে, তাঁকে দেহমনের কর্তা ক'রে দিয়ে বসতে হবে তাঁর চরণতলে, তাঁর শরণাগত হয়ে।

ভারমুক্তির জন্য আমি তাই চাইছি এখন এই দেহমনের আবরণ থেকে মুক্ত হতে। কেবল দেহেই নয়, মনেও যে আমিত্ব-বুদ্ধি ছায়ার মত অনুসরণ করে আসছে আমাকে, তাকে 'একেবারে মিলিয়ে দিতে চাই।' তাঁর কাছে তাই প্রার্থনা, তুমি আমার আমিতে এসে ব'স 'সরিয়ে দিয়ে...মনকে আমার কায়াকে' - যাদের ঘাড়ে কর্মফলের বোঝা; আর এভাবে বোঝার আধার সমেত 'এ বোঝা আমার নামাও।'

আমি করছি ভেবে যা কিছু কাজ করেছি - আমার মনের আমার কায়ার যত কাজকে আমার কাজ ভেবেছি, সে সব কাজেরই ফল বোঝা হয়ে আমার ঘাড়ে চেপেছে—'আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলি হয়েছে বোঝা' —একথা ঠিক; কিন্তু 'ঈশ্বরই কর্তা আমি অকর্তা, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র—যেমন করাচ্ছেন তেমনি করছি' এই ভাব নিয়ে কাজ করলে

সে কর্মের ফল আর আমার মাথায় চাপতে পারে না, আবার কাজ করার সময় ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় সে কাজ করাও যায় উদ্বেগহীন সহজ ভাবে—

'তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার
করিয়া দিয়েছ সোজা।'

এভাবে চিত্তাসনে নিজের জায়গায় ভগবানকে বসিয়ে যে কাজ করে সে সত্যকেই আঁকড়ে ধরে—আমরা যে দেহ-মন-অহংকার থেকে আলাদা, এই সত্যে সে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, চায় তাঁর 'চরণে গলিয়ে দিতে দলিয়ে দিতে মায়াকে।' অজ্ঞান তাই ক্রমে কেটে যায় তার, অসত্য থেকে সত্যের রাজ্যের, তমসা থেকে জ্যোতির রাজ্যের দিকে ক্রমে সে অগ্রসর হতে থাকে, কর্মজনিত অজ্ঞানদৃষ্টি আর প্রতারিত করতে পারে না তাকে—

'যে তোমার ভার বহে কভু তার
সে ভারে ঢাকে না আঁখি
পথে বাহিরিলে জগৎ তারে তো
দেয় না কিছুই ফাঁকি।
অবারিত আলো ধরে আসি তার হাতে।'

আরো বড় কথা, যখন ঠিক ঠিক বোধ হয় যে, কাজ করার সময় দেহমনাদির চালকরূপে যে-অহংবোধকে এতদিন 'আমি' ভেবেছিলাম, আসলে সে ভগবানই—তখন কোন কাজই আর 'আমার কাজ' থাকে না, সব কাজই তখন সত্যিই হয়ে যায় 'তোমার কাজ।' তখন দেহ-মনাদি কর্মচঞ্চল হলেও আমরা বিন্দুমাত্র চঞ্চল হই না, সে চাঞ্চল্য অসত্যের ধূলি উড়িয়ে চিদাকাশকে আর আবৃত করতে পারে না, দেহমন কর্মরত থাকলেও কাজ থেকে চিরতরে ছুটি পেয়ে যাই—'আমি অকর্তা' এ বোধ সদা-জাগ্রত থাকে, তাই প্রচণ্ড কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যেও আমরা চিরশান্ত থাকি—

'তুমি কাজ দিলে কাজেরই সঙ্গে
দাও যে অসীম ছুটি,
তোমার আদেশ আবরণ হয়ে
আকাশ লয় না লুটি।'

এই জীবনপথ থেকে অনেক উপায়ে ভগবানের কাছে, স্বরূপে, পরম ধামে, ঘরে ফিরে যাওয়া যায়। আমি যে উপায় অবলম্বন করেছি, তা হল ভক্তিভাবাশ্রিত কর্মযোগ। কিন্তু যে উপায়-অবলম্বনেই চলি না কেন, ঘরের পানে কতখানি আমরা এগিয়ে গেলাম, দেহমনে আমিত্ব-বোধ কতখানি আমাদের কমলো তা যাচাই করে নেবার শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর হল দুঃখ। চলার পথেই হোক আর ফেরার পথেই হোক, পথে যতক্ষণ আছি, যতক্ষণ না ঘরে পৌঁছোচ্ছি, ততক্ষণ সুখ-দুঃখ দুই-ই এসে ভিড় করবে আমাদের পাশে। সুখের দিনে বোঝা কঠিন আমি কতখানি সরে এসেছি আমার মন হতে, আমার কায়া হতে, কতখানি গলিয়ে দিয়েছি আমার মায়াকে। দেহমনের সুখকেই সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বাতীত আনন্দ বলে ভুল হতে পারে, ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়, ভুল হয়ও প্রায়ই। কিন্তু দুঃখের দিনে এ বিষয়ে সংশয়ের আর কোন অবকাশই থাকে না। আমি যে ভাব অবলম্বনে ফিরে চলেছি তাতে সুখ দুঃখ উভয়কেই ভগবানের দান বলে হাসিমুখে বরণ করে নিতে হয়, অবিচল থাকতে চেষ্টা করতে হয় উভয় ক্ষেত্রেই। ঠিকমত করতে পারলে এর পরিণাম হয় অমিয়মাখা—দুঃখ যখন আসে, সে দুঃখ আগের মতো আর আমাদের হৃদয়কে 'বজ্রানলে' জ্বালিয়ে 'অঙ্গার করে' রেখে যেতে পারে না ; বরং অধিকতর সজাগ, অধিকতর সত্যাভিমুখী ক'রে, দেহমনে আমিত্ব-বোধকে আরো কমিয়ে আমাদের হৃদয়কে অসীম আনন্দামৃতে সিঞ্চিত ক'রে, সার্থক করে

তার আগমন—

'তুমি যাহা দাও সে যে দুঃখের দান
শ্রাবণধারায় বেদনার রসে
সার্থক করে প্রাণ।'

ভগবান, তুমিই আমাদের সবচেয়ে আপন-জন, চিরকালের আপনার। তোমার ভালবাসা প্রতিদানে কিছু চায় না, শুধু দিয়েই যায়; তুমি যাদের হৃদয়াসনে এসে বস, তাদের ভালবাসাও তাই। আর বাকী সবাই ওই কর্মফলের মতোই কড়া হিসেবী। এতদিন আপনজন ভেবে যাদের কাছ থেকে ভালবাসা গ্রহণ করেছিলাম, দেখছি তারা সবাই বিনিময় চায়, হিসেব বুঝে নেয় কড়ায়-গণ্ডায়, ক্ষমা ক'রে ছেড়ে দেয় না কিছু। তাই অতি আপনার জেনে, চিরদিনের বন্ধু জেনে তোমার চরণে শরণ নিয়ে অকপট প্রার্থনা জানাচ্ছি—তুমি কৃপা ক'রে আমার হৃদয়-সিংহাসনে ব'স আমাকে সেখান থেকে তোমার চরণতলে নামিয়ে দিয়ে, আর এভাবে জন্মজন্মান্তর ধরে জীবনের পথযাত্রায় সঞ্চিত 'এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু নামাও!'

শক্তি দাও

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

চিত্ত মাঝে শুনি তব বাঁশরীর তান
তাই তো তোমারে খোঁজে অশান্ত এ মন
দুর্নীতির কালোছায়া করিতেছে ম্লান
হৃদয় বিদারি ওঠে অব্যক্ত ক্রন্দন।
মিথ্যাচারে দিশাহারা জীবনের আশা
দ্বন্দ্ব চলে অহরহ অন্তরে বাহিরে
পলে পলে দহে তবু নাহি তার ভাষা
পঙ্কিল মনের স্রোতে ভাসি অশ্রুনীরে।

এ দুর্দিনে শক্তি দাও আমাদের মাঝে
ঘুচাতে এ দুঃখ জ্বালা ওগো কর্ণধার
অনন্ত মুক্তির আলো তোমাতে বিরাজে
দুর্জ্জনে হানিতে প্রভু এসো আরবার।

মুক্ত করি দাও এই শত বন্ধডোর
অমৃত সন্ধানী, ভাঙো অমানিশা ঘোর

মাতৃতীর্থ-পরিক্রমা

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা

২১) জয়ন্ত্যাং বামজঙ্ঘা চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ —জয়ন্তীতে সতীর বামজঙ্ঘা পতিত হয়। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী জয়ন্তী, ভৈরব ক্রমদীশ্বর। এই পীঠস্থান বামজঙ্ঘা নামে পরিচিত। শ্রীহট্ট শহরের ৩৮ মাইল উত্তরপূর্বে পর্বতপাদদেশে অবস্থিত। পীঠাধিষ্ঠাত্রী জয়ন্তী দেবীর নামেই এই অঞ্চল জয়ন্তীয়া পর্বত নামে খ্যাত। বারাহী ও বৃহন্নীল তন্ত্রে এই স্থানকে মহাপীঠ নামে অভিহিত করা হয়, 'জয়ন্তং বিজয়ন্তঞ্চ সর্বকল্যাণদং প্রিয়ে'—(বৃহন্নীলতন্ত্রম্, ৫ম পটল) এই মহাপীঠের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে—'কৈলাসে দশলক্ষেণ জয়ন্ত্যাং পঞ্চলক্ষতঃ'—কৈলাসে দশলক্ষ মন্ত্রজপ করলে সিদ্ধি হয়, আর জয়ন্তীতে পঞ্চলক্ষ মাত্র মন্ত্র-জপেই সিদ্ধিলাভ হয়।

২২) ভুবনেশী সিদ্ধিরূপা কিরীটস্থা
কিরীটতঃ।
দেবতা বিমলা নাম্নী সম্বর্তো ভৈরবস্তথা॥

কিরীটকোণায় সতীর মস্তকস্থিত কিরীট (মুকুট) পতিত হয়। সিদ্ধিরূপিণী ভুবনেশ্বরী এখানে বিমলা নামে অধিষ্ঠিতা, ভৈরবের নাম সম্বর্ত। এই মহাপীঠ মুর্শিদাবাদে কিরীটকোণা গ্রামে অবস্থিত। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী বিমলা কিরীটেশ্বরী নামে সমধিক পরিচিতা। গঙ্গাধর দাস (অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দী) কিরীট-কোণার কিরীটেশ্বরীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বাংলা ভাষায় কিরীট মঙ্গলকাব্য রচনা করেন।

২৩) বারাণস্যাং বিশালাক্ষী দেবতা
কালভৈরবঃ।
মণিকর্ণীতি বিখ্যাতা কুণ্ডলঞ্চ জনশ্রুতেঃ॥

বারাণসীতে যে স্থলে সতীর মণিময় কুণ্ডল পতিত হয়, সে স্থানের নাম মণিকর্ণিকা। দেবীর নাম বিশালাক্ষী, ভৈরবের নাম কাল-ভৈরব। এস্থানে দেবীর দুই নয়ন পতিত হয়।

সর্বতীর্থময় বারাণসীধামে মণিকর্ণিকা শ্রেষ্ঠতীর্থ। কাশীখণ্ডে মণিকর্ণিকা নামের তাৎপর্য বর্ণিত—

'সংসারিচিন্তামণিরত্র যস্মাৎ
তং তারকং সজ্জনকর্ণিকায়াম্।
শিবোঽভিধত্তে সহসাঽন্তকালে
তদ্গীয়তেঽসৌ মণিকর্ণিকেতি॥

বিশ্বনাথ অন্তিমকালে জীবের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দেন, অতএব এ তীর্থের নাম মণিকর্ণিকা।

কাশীখণ্ডের ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ে মণিকর্ণিকার উৎপত্তি বলা হয়েছে—বিষ্ণু এখানে সুদীর্ঘকাল কঠোর তপস্যান্তে চক্র দ্বারা এক রমণীয় পুষ্করিণী খনন করেন এবং স্বীয় স্বেদসলিলে সে পুষ্করিণী পূর্ণ হয়। বিষ্ণুর তপস্যায় প্রীত হয়ে মহেশ্বর সেখানে উপস্থিত হন। বিষ্ণুর তপস্যাদর্শনে প্রীত মহাদেব পুনঃপুনঃ স্বশির আন্দোলন করেন এবং তাঁর মণিময় কর্ণভূষণ স্খলিত হয়।

ত্বদীয়স্যাস্য তপসো মহোপচয়দর্শনাৎ
যন্ময়ান্দোলিতমৌলিরহিশ্রবণভূষণঃ॥
তদান্দোলনতঃ কর্ণাৎ পপাত মণিকর্ণিকা
মণিভিঃ খচিতা রম্যা ততোঽস্তু মণিকর্ণিকা॥
(কাশীখণ্ড, ২৬.৬২-৬৩)

সৌরপুরাণে মণিকর্ণিকার মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং বারাণস্যাং বিশেষতঃ।

তত্রাপি মণিকর্ণিকাখ্যং তীর্থং বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ম্ ॥

(সৌরপুরাণ, ৪।৮)

মণিকর্ণিকা মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী। বিশালাক্ষী-মন্দির দ্রাবিড় স্থাপত্য-রীতিতে নির্মিত।

২৪) কন্যাশ্রমে চ পৃষ্ঠং মে নিমিষো

ভৈরবস্তথা

সর্বাণী দেবতা তত্র—

কন্যাশ্রমে দেবীর পৃষ্ঠদেশ পতিত। এই স্থলে ভৈরবের নাম নিমিষ, দেবীর নাম সর্বাণী। এই মহাপীঠ সম্বন্ধে দ্বিমত আছে। মহাভারতের বনপর্বে ৮৩ অধ্যায়ে কন্যাশ্রমতীর্থের উল্লেখ দেখা যায়—

ততঃ কন্যাশ্রমং গচ্ছেন্নিয়তো ব্রহ্মচর্যবান্
ত্রিরাত্রোপষিতো রাজন্নুপবাসপরায়ণঃ।
লভেৎ কন্যাশতং দিব্যং স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥

(বনপর্ব, ৮৩।১৮৯)

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার কন্যাশ্রম মহাপীঠ চট্টগ্রাম জেলার কুমিরা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে কুমারীকুণ্ডে অবস্থিত বলে মনে করেন। সীতাকুণ্ড থেকে প্রায় ৯ মাইল দক্ষিণে কুমিরা রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে পর্বতের সানুদেশে নির্জন কাননে কুমারীকুণ্ড অবস্থিত।

পঞ্চক্রোশাদ্বহির্জ্ঞেয়ং কুমারীকুণ্ডমুত্তমম্।
ততো দক্ষপথা গচ্ছেৎ সংপশ্যেৎ কর্করীং নদীম্।

(বারাহীতন্ত্র, ৭.৩৪)

২৫) কুরুক্ষেত্রে চ গুল্‌ফতঃ

স্থাণুনাম্নী চ সাবিত্রী অশ্বনাথস্তু ভৈরবঃ।

কুরুক্ষেত্রে সতীর গুল্‌ফ পতিত হয়, এস্থানে সাবিত্রীরূপা দেবীর নাম স্থাণু। ভৈরবের নাম অশ্বনাথ। কুরুক্ষেত্র অতি প্রাচীন পবিত্র তীর্থ। বেদের ব্রাহ্মণভাগে এই তীর্থের নাম দৃষ্ট হয়। শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যে আছে—'কুরুক্ষেত্রেঽমী দেবা যজ্ঞং তন্বতে' ৪।১৫।১৩। এস্থানে দেবগণ যজ্ঞ করতেন। মহাভারতের নানাস্থানে কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে—

পুরা চ রাজর্ষিবরেণ ধীমতা
বহূনি বর্ষাণ্যমিতেন তেজসা।
প্রকৃষ্টমেতৎ কুরুণা মহাত্মনা
ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্রথে ॥

(শল্যপর্ব, ৫৩.২)

রাজর্ষি কুরু এই ক্ষেত্রের কর্ষণ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের তীর্থভূমির অন্তর্গত স্থাণু তীর্থের নাম মহাভারতে উল্লিখিত। তীর্থপতি স্থাণু নামক মহাদেবের নামানুসারে এর নাম স্থাণীশ্বর বা থানেশ্বর হয়েছে।

২৬) মণিবন্ধে চ গায়ত্রী সর্বানন্দস্তু ভৈরবঃ।

(তন্ত্রচূড়ামণিঃ)

মণিবন্ধ রাজ্যটি সম্বন্ধে দ্বিমত আছে। কেউ বলেন এ তীর্থ মণিপুর রাজ্যে, কারুর মতে আজমীরের কাছে পুষ্করতীর্থে। মণিবন্ধে দেবীর বাম মণিবন্ধ পতিত হয়। দেবীর নাম গায়ত্রী, ভৈরবের নাম সর্বানন্দ দেবী-ভাগবতে বলা হয়েছে—মহারাজ অশ্বপতি সাবিত্রী বা গায়ত্রীদেবীর উপাসনার্থে পুষ্কর-তীর্থে গমনপূর্বক শতবর্ষ তপস্যা করেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পুষ্করতীর্থ প্রখ্যাত।

২৭) শ্রীশৈলে চ মম গ্রীবা মহালক্ষ্মীস্তু

দেবতা।

ভৈরবঃ সম্বরানন্দো দেশে দেশে

ব্যবস্থিতঃ ॥

শ্রীশৈলে (শ্রীহট্টে) সতীর গ্রীবা পতিত হয়। এখানে দেবীর নাম মহালক্ষ্মী—ভৈরবের নাম সম্বরানন্দ। শ্রীহট্ট প্রাচীনকাল থেকেই শক্তি-সাধনার অন্যতম পীঠস্থানরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা: শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী, এম. এ, ডি. ফিল.। বোধি প্রেস, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত। পৃ: ২১৭+১৬; মূল্য ৮৲ টাকা।

গ্রন্থটিতে ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী ভারতের বিভিন্ন ধর্মগুরু ও সাধকগণের সহিত তুলনা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা উপলব্ধি ও বাণীর বৈশিষ্ট্য দার্শনিকের দৃষ্টিকোণ হইতে সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। গ্রন্থটি পাঠ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও উপলব্ধির সর্বব্যাপকতা সম্বন্ধে এবং সেই সঙ্গে ভারতের প্রচলিত ধর্মমত ও সাধনার মূল কথাগুলি সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট একটি ধারণা পাঠকচিত্তে স্বতই ভাসিয়া উঠে।

গ্রন্থটি সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথমেই 'শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার চারটি স্বাতন্ত্র্য' দেখানো হইয়াছে—তাঁহার 'যত মত তত পথ' বাণী নিজেরই সর্বমতে সাধনলব্ধ উপলব্ধি-প্রসূত; তিনি স্ত্রীকে বর্জন করেন নাই; তাঁহার আশ্বাসবাণী—গৃহস্থাশ্রমেও ভগবানলাভ সম্ভব; এবং সাধনায় ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতার উপর তিনি সর্বাধিক জোর দিয়াছেন।

'শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাতৃসাধনা', 'বাংলার বৈষ্ণবসাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'বিভিন্ন মরমিয়া সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার বাউল সাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ' পরিচ্ছেদগুলিতে তিনি সাধারণভাবে এবং রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ প্রভৃতির প্রসঙ্গ তুলিয়া বিশেষভাবে শাক্ত-ও বৈষ্ণবসাধনা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও বাণীতে সেগুলির সব মূল ভাবই অন্তর্ভুক্ত।

'ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের সমন্বয় ও শ্রীরামকৃষ্ণ' এই পরিচ্ছেদে চরম সত্য সম্বন্ধে সমস্ত ভারতীয় দর্শনের সিদ্ধান্তের সহিত তুলনা করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি ও বাণীতে সে সবই সমন্বিত। শ্রীরামকৃষ্ণ চরম সত্যকে সবভাবেই নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে, বিভিন্ন পথ ধরিয়া সত্যের দিকে অগ্রসর হইলে একই সত্য এই সব বিভিন্ন ভাবে উপলব্ধ হয়; সব মতই একই ঈশ্বরলাভের পথ, রুচি ও অধিকারি-ভেদে গ্রহণীয়। লেখক দেখাইয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন আচার্য শঙ্করের মতো লীলা ও শক্তিকে 'পরমার্থত: মায়া' বলেন নাই, বলিয়াছেন 'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ; দুই-ই সত্য', তেমনি রামানুজাচার্যের মতো শঙ্করাচার্য-প্রচারিত অদ্বৈতানুভূতিকেও অস্বীকার করেন নাই। কেবল সাকার বা কেবল নিরাকার বা অন্যরূপ বলিয়া তিনি চরমসত্যের ইতি করেন নাই, বলিয়াছেন—তিনি সাকার, নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারের পারেও।

গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি শব্দ এবং প্রয়োজনমত তৎসংশ্লিষ্ট ভাবও পরবর্তী সংস্করণে একটু পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া ভাল। যেমন, শ্রীরামকৃষ্ণ 'স্ত্রীকে সাধন-সঙ্গিনী' করিয়াছিলেন (পৃ: ৮, ১০, ১১), ইহার পরিবর্তে 'সন্ন্যাসী হইয়াও স্ত্রীকে ত্যাগ করেন নাই' লেখাই ভাল; কারণ সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শাক্ত, বৈষ্ণব, অদ্বৈত, এমনকি মুসলমান মতে সাধনারও পর। সারদাদেবীকে কাছে রাখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কোন সাধনা করেন নাই, 'সাধনলব্ধ বিজ্ঞানের পরীক্ষা' করিয়াছিলেন এবং পরীক্ষান্তে (ষোড়শীপূজায়) সারদাদেবীর

চরণে নিজসাধনলব্ধ সমস্ত ফল সমর্পণ করিয়াছিলেন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ)। 'সিদ্ধ হইবার পরও অবতারেরা কখনও কখনও দেহত্যাগ করেন না' (পৃ: ১৮৬),—এখানে 'কখনও কখনও' অর্থহীন; কারণ অতীন্দ্রিয় রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেখানকার কথা শুনাইবার জন্যই অবতারের দেহধারণ। 'অসংখ্য অবতার এক ঈশ্বর থেকে রূপ পরিগ্রহ করেন'—এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, 'সচ্চিদানন্দ থেকে' উদ্ধৃত করাই ভাল।

শ্রীঅরবিন্দ: শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ। প্রাপ্তিস্থান: নিউ শরৎ প্রকাশন, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২; পৃ: ৭০; মূল্য: দুই টাকা মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীতে জাত যে মহাপুরুষদের শত বা সার্ধশতবর্ষ-উদ্‌যাপনে আমাদের বিংশ শতাব্দীর বৎসরগুলি ধন্য তাঁদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবর্ষপূর্তি আসন্ন। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাংলা ও ভারতের ইতিহাসে যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব নিয়ে যাঁদের আবির্ভাব আমাদের কর্ম ও ধর্মজীবনকে প্রভাবিত করেছে, তাঁদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ অন্যতম। ইংরেজ সরকারের দৃষ্টিতে মানিকতলা বোমার মামলার আসামী শ্রীঅরবিন্দের সপক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছিলেন, "...যখন এই সব আন্দোলন আর হুলুস্থুল স্তব্ধ হয়ে যাবে, এই শ্রীঅরবিন্দও যখন দেহত্যাগ করবেন, তারও পরে জগতের লোক বলবে যে, ইনি ছিলেন দেশপ্রেমের এক অমর কবি, ইনি ছিলেন জাতীয়তার অগ্রদূত আর মানবজাতির নিঃস্বার্থ প্রেমিক।" (পৃ: ৪৯) সে ভবিষ্যদ্বাণী যে কতদূর সত্য প্রমাণিত হয়েছে, তা আর বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না।

ছোট্ট এই জীবনীটিতে শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ ভক্তিস্নিগ্ধ ভাষায় এই মহাপুরুষের জীবন ও সাধনার মনোজ্ঞ পরিচয় তুলে ধরেছেন। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরীবাসকালীন সাধকজীবনের আরো বিস্তৃত পরিচয় আমাদের আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু সে কাজ বোধ করি শ্রীঅরবিন্দের শেষজীবনের অনুক্ষণ সঙ্গী ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কর্মী ও সাধক-এই দুই রূপে প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দ-জীবনের প্রথমটি জীবননাট্য-কৌতূহলের দিক থেকে অসাধারণ। আবার যেখানে তিনি কবি, মনীষী, সাধক—সেখানে তাঁর বাণীময় অনুভূতিজগৎ আর এক অসীম লোকের সন্ধানী। ধর্মনীতি থেকে রাজনীতির কোলাহলই আজ যখন সর্বত্র শুনতে পাওয়া যায়, তখন একথা মনে রাখা ভালো যে, রাজনীতির আপাত সাফল্য থেকে অনায়াসে আপনাকে সংহরণ ক'রে এই বিংশ শতাব্দীরই একজন শ্রেষ্ঠ জননায়ক চিরন্তন ভারতীয় আদর্শে অধ্যাত্মানুভবের জগতে ফিরে যাওয়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য মনে করেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের গভীরতম প্রভাবের কথা লেখক অল্পের মধ্যে ভালোভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধের কথা লেখক অতি সামান্যই উল্লেখ করেছেন। এদিকে আরো একটু আলোকপাত প্রয়োজন। তাছাড়া শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম-প্রত্যয় ও দর্শনের মর্মবাণী এজাতীয় গ্রন্থে অবশ্যই প্রত্যাশিত। আশা করবো, পরবর্তী সংস্করণে এ অপূর্ণতা মোচন হবে। আকারে ক্ষুদ্র হ'লেও আলোচ্য জীবনীগ্রন্থটিতে লেখকের শ্রদ্ধা ও সযত্ন প্রয়াস বিশেষ সাধুবাদের যোগ্য। বাংলা সাহিত্যে শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগ-সমন্বিত সমগ্র জীবনসাধনার পূর্ণাঙ্গ পরিচায়ক একটি গ্রন্থের আজ বিশেষ প্রয়োজন।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উদ্বাস্তু-সেবা

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুগণের সেবায় রামকৃষ্ণ মিশন গত ১০ই এপ্রিল হইতে ব্রতী রহিয়াছেন। বর্তমানে এই সেবাকার্য নিম্নলিখিত স্থানসমূহে ১১টি ক্যাম্পে পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে:

শিলং আশ্রম-পরিচালিত : ডাউকী (২টি ক্যাম্প)
চেরাপুঞ্জি আশ্রম-পরিচালিত : শেলা ও ইছামতী
জলপাইগুড়ি আশ্রম-পরিচালিত : সাকাটি
কাটিহার আশ্রম-পরিচালিত : ডালিমগাঁও
করিমগঞ্জ আশ্রম-পরিচালিত : ফকিরাবাদ
নরেন্দ্রপুর আশ্রম-পরিচালিত : গাইঘাটা, কালাসীমা, বকাচোরা ও লক্ষ্মীপুর।

কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানের একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা-কেন্দ্র (মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট) নরেন্দ্রপুর আশ্রম-পরিচালিত ক্যাম্পগুলিতে নিয়মিতভাবে প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার সেবারত থাকে।

বিবিধ

স্যাক্রামেণ্টো বেদান্ত সোসাইটির (আমেরিকা) অধ্যক্ষ, উদ্বোধন পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মাস তিনেকের জন্য ভারতে ফিরিতেছেন। আগামী ১৭ই আগস্ট নাগাদ তাঁহার বোম্বাই এবং ৩১শে আগস্ট নাগাদ বেলুড় মঠে পৌঁছিবার কথা।

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাটির অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ একই উদ্দেশ্যে আগামী ৪ঠা জুলাই বোম্বাই এবং ১৮ই জুলাই বেলুড় মঠে পৌঁছিবেন।

আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-পরিচালিত স্কুলের ১১ জন ছাত্র সর্বভারতীয় মেধাপ্রতিযোগিতায় (N. S. T. S. Scheme) সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়াছে।

কার্যবিবরণী

কোয়েম্বাতুর জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর অকুণ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে কোয়েম্বাতুরে বিশাল ভূখণ্ডের উপর নিম্নলিখিত শিক্ষায়তনগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে:

(১) শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ :—

(i) টিচার্স কলেজ—শিক্ষার্থীর সংখ্যা : ১০০ জন বি. টি., ১৪ জন এম. এড, ১ জন পি. এইচ. ডি। পরীক্ষার ফল : এম. এড ১০০% এবং বি. টি ৯০% উত্তীর্ণ।

টিচার্স কলেজের গবেষণা এবং এক্সটেনশন সারভিস প্রভৃতি বিভাগের কার্য বিশেষ প্রশংসনীয় ও সাফল্যমণ্ডিত।

(ii) বেসিক ট্রেনিং স্কুল : প্রথম বর্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭ ও ৩৯। পরীক্ষার ফল ৯২% উত্তীর্ণ।

(iii) শারীর শিক্ষা কলেজ—১৪ বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে ২২৫ জন শিক্ষক হায়ার গ্রেডে এবং ৯৩৫ জন শিক্ষক লোয়ার গ্রেডে শারীর শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(২) মডেল স্কুলসমূহ :

(i) আবাসিক বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় : ছাত্রসংখ্যা—১৯৫, তন্মধ্যে ৩৭ জন ফ্রি স্কলার।

পরীক্ষার ফল ১০০% উত্তীর্ণ।

(ii) স্বামী শিবানন্দ হাই স্কুল (চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির ছাত্রদের জন্য)—টিচার্স কলেজের আদর্শ বিদ্যালয়: ছাত্রসংখ্যা—২১৫ পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

(iii) কলানিলয় (চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের ছাত্রছাত্রীদের জন্য)—বেসিক ট্রেনিং স্কুলের আদর্শ বেসিক স্কুল: ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ৬১৪ ও ২২১।

(৩) গ্রামীণ বিদ্যায়তনসমূহ:

(i) উচ্চতর গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ: ছাত্রসংখ্যা ২৪৭; পরীক্ষার ফল, গবেষণা এবং পরিবিস্তৃতি সন্তোষজনক।

(ii) কৃষিবিদ্যালয়: ছাত্রসংখ্যা ১৩২, তন্মধ্যে প্রথম বর্ষে ৬০ এবং দ্বিতীয় বর্ষে ৭২। ৭৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৮ জন উত্তীর্ণ, তন্মধ্যে ১৫ জন ফার্স্ট ক্লাস।

(iii) ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল: তিন বৎসরের কোর্সে মোট ছাত্রসংখ্যা ৬০; প্রথম বর্ষে ১৭, দ্বিতীয় বর্ষে ২১ এবং তৃতীয় বর্ষে ২২। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক।

ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের অটোমোবাইল সেকশনে ২০০ জন ট্রেনিং পাইয়াছেন। কৃষি ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অগ্রগতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(৪) আর্টস ও সায়েন্স কলেজ: এই এই মহাবিদ্যালয়ে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স এবং বি. এ., বি. এসসি. পড়িবার ব্যবস্থা আছে। সর্ববিভাগেই পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। বহু ছাত্রকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়।

এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, যথা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, বিদ্যালয় প্রেস, রুর্যাল ডিস্পেন্সারী (চিকিৎসিতের সংখ্যা ২৮,৮৭২), কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (পুস্তকসংখ্যা ৩৬,২৫৮), পুস্তক প্রকাশন বিভাগ। এই সমস্ত বিভাগেরও অগ্রগতি এবং কর্মপ্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

কাটিহার: (পূর্ণিয়া, বিহার) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৬৮-৬৯ এবং ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে আশ্রমের উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৬০৫ ও ৬৪১।

ছাত্রদের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। ১৯৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে ১০০% উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে ১৬ জন ছাত্রকে বিনা-বেতনে এবং ৫ জনকে অর্ধবেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হয়।

গ্রন্থাগারে ২,১০০ খানি পুস্তক আছে; পাঠাগারে ৩টি দৈনিক এবং অনেকগুলি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে ছাত্রাবাসে ১৩ জন বিদ্যার্থী ছিল, ইহাদের মধ্যে ৪ জন সম্পূর্ণ বিনা-খরচায় থাকে।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয় মতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ২৭,৯০৯ (অ্যালোপ্যাথিক—১৫,৮৩৭) ও ২৩,৮৪৭ (অ্যালোপ্যাথিক—১৩,২০০)।

আশ্রমে নিয়মিত পূজা পাঠ ভজনাদি, সাময়িক তিথিকৃত্যাদি এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

কাটিহার আশ্রম পরিচালিত ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের বন্যার্ত-সেবাকার্য উল্লেখযোগ্য।

উৎসব-সংবাদ

বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৮, ২৯ ও ৩০শে মে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। ৩১শে বোম্বাই-এর 'গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়ায়' স্বামীজীর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের বহু সাধু আশ্রমে সমবেত হইয়াছিলেন। উৎসবের কয় দিন আশ্রমে তাঁহাদের উপস্থিতি আশ্রমকে আনন্দ-মুখর করিয়া রাখিয়াছিল।

২৮, ২৯ ও ৩০শে মে আলোচনা-সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী কৈলাসানন্দ ও স্বামী রঙ্গনাথানন্দ; বক্তৃতা করেন সমাগত সন্ন্যাসীদের মধ্যে স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, স্বামী বীতশোকানন্দ প্রভৃতি অনেকেই।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বার্ষিক উৎসব ১১ই, ১২ই ও ১৩ই জুন উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ১১ই জুন সন্ধ্যায় স্বামী অনুপমানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতার বিষয় ছিল—'শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী ও নারীজাতির আদর্শ'। ১২ই জুন সন্ধ্যায় স্বামী পরশিবানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতার বিষয় ছিল—'স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুগ'। এই দিন সকালে ও অপরাহ্ণে ভক্ত-সম্মেলন হইয়াছিল; সম্মেলনে স্বামী বীতশোকানন্দ ও স্বামী অনুপমানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী ভক্তদের নিকট বিশেষভাবে তুলিয়া ধরেন। ১৩ই জুন পূজাপাঠাদির পর মধ্যাহ্নে প্রায় ১২০০ জন ভক্তকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ১৩ই জুন সন্ধ্যায় স্বামী পরশিবানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতার বিষয় ছিল—'শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম'। স্বামী পরশিবানন্দ সভার প্রারম্ভে আশ্রমের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। মালদহ আশ্রমের নবাগত অধ্যক্ষ স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ও স্বামী বীতশোকানন্দ তিনদিনই সভায় যুগোপযোগী ও মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। তিনদিনই সভান্তে বেতারশিল্পী শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রামায়ণগান পরিবেশন করেন।

এই উৎসব উপলক্ষে মালদহ জেলার বিভিন্ন গ্রাম ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, হাওড়া প্রভৃতি জেলা এবং বিহারের পূর্ণিয়া, কাটিহার, ঠাকুরগঞ্জ ও দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রায় ২৫০ জন ভক্ত নরনারী সমবেত হইয়া উৎসবের কয়েকদিন আশ্রমেই ছিলেন।

স্বামী হরিপ্রেমানন্দের দেহত্যাগ

দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২৫শে জুন সন্ধ্যায় স্বামী হরিপ্রেমানন্দ ৭৬ বৎসর বয়সে বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বল্পকাল মধ্যেই, সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটের সময় দেহত্যাগ করিয়াছেন। দীর্ঘকাল হইতেই তাঁহার খুব উচ্চ রক্তচাপ ও ডাইবিটিস ছিল।

স্বামী হরিপ্রেমানন্দের পূর্বনাম হরিপদ, পূর্বাশ্রম বাঁকুড়া জেলার মৌলেন গ্রামে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন, কোয়ালপাড়া মঠে। এই বৎসরই তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কোয়ালপাড়া হইতে জয়রামবাটী আশ্রমে কর্মিরূপে আসেন। এখানে এবং কোয়ালপাড়ায় থাকাকালীন শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় দুর্লভ অধিকার তিনি

লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জয়রামবাটী হইতে উদ্বোধনে আসিয়া ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। পরে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন অদ্বৈত আশ্রমে কর্মিরূপে আসিয়া শেষদিন পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন।

তাঁহার সরল, অনাড়ম্বর জীবনের জন্য সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত এবং শ্রদ্ধা করিত।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ জন্মোৎসব ৬ হইতে ৮ মার্চ পর্যন্ত রামায়ণগান, অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন, নর-নারায়ণসেবাসহ উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় স্বামী স্বানুভবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ আলোচনা করেন।

আশ্রম কর্তৃক একটি ছাত্রাবাস, একটি পুস্তকালয় এবং একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে।

শান্তিপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী সাধনকুঞ্জে গত ৮ই জুন দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এইদিন সকালে ভজনসহ শহরপরিক্রমা, শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন শান্তিপুর পুরাণ পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন (সভাপতি), স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ এবং স্থানীয় শিক্ষাবিদ্ শ্রীকমলাক্ষচরণ ভট্টাচার্য। আরাত্রিকের পর শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল লীলাকীর্তন পরিবেশন করেন।

পরলোকে কা হাই ভবানী

মেঘালয়ের শেলাগ্রামনিবাসী উ সোগেন্দ্র রায়ের পত্নী কা হাই ভবানী গত ২৯শে মে ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। দুই বৎসর যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন।

কা হাই ভবানী স্বামী শিবানন্দজীর নিকট হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রদীক্ষা পাইয়াছিলেন। খাসী পাহাড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যারম্ভের প্রাথমিক অবস্থায় স্বামী প্রভানন্দকে (কেতকী মহারাজ) এই দম্পতী যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

ভ্রম-সংশোধন

গত আষাঢ় সংখ্যা উদ্বোধনের ২৮৫ পৃঃ ২য় কঃ ৩১ লাইনে এবং ৩৩২ পৃঃ ২য় কঃ ১০ম লাইনে '৬৮' স্থলে '৭৮' হইবে; ৩১৩ পৃঃ ৮ম লাইনে 'অবধূত' স্থলে 'অবধূত চট্টোপাধ্যায়' হইবে। ৩০২ পৃঃ ২৭ লাইনে 'নমি' স্থলে 'মমি' পড়িবেন এবং ৩০ লাইনে 'এই' স্থলে 'এক' পড়িবেন।

দিব্য বাণী

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥ ৯

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৩১

জ্ঞানিগণস্তুত তোমার কথামৃত
শান্ত করে প্রাণ, জুড়ায় সন্তাপ,
শ্রবণে (ঢালে মধু,) আনে তা শুভ শুধু,
(শুদ্ধ করে চিত)—বিনাশে যত পাপ।
সে-কথা জগজ্জনে প্রচার করে যারা
অতুল-বৈভব-প্রদায়ী দাতা তারা॥

কথাপ্রসঙ্গে

কংস-কারাগারে

মথুরায় কংসের কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কংস তাঁহার মাতাপিতা দেবকী-বসুদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং দেবকীর এক-একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তাহাদের বধ করিতেছিলেন। কারণ দেবকীর বিবাহের দিনই তিনি দৈববাণী শুনিয়াছিলেন, তাঁহার অষ্টম গর্ভে কংসহন্তারক শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করিবেন। সব সন্তানকে বিনষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, তবুও কংস ভয়ে তাহা করিয়াছিলেন, পরিকল্পনাকে নিশ্ছিদ্র করিবার জন্য। কিন্তু মানুষের সব চেষ্টা, সব পরিকল্পনা সব সময় সফল হয় না। ভগবান দেবকীর অষ্টম গর্ভেই জন্মলাভ করিয়াছিলেন এবং নির্বিঘ্নে গোপনে অন্যত্র নীত ও বর্ধিত হইয়া যথাকালে কংসকে বধও করিয়াছিলেন।

কোন আবাস বা পরিবেশের যেমন কোন নিজস্ব মাহাত্ম্য নাই, উহাতে কোন চরিত্রবান ও গুণী মানুষের অবস্থানই উহাকে মহিমান্বিত করে, তেমনি ভগবান যেখানে অবতীর্ণ হন, সে প্রাসাদই হউক বা অশ্বশালাই হউক বা পর্ণকুটীরই হউক, সেস্থানই মহাতীর্থ হইয়া উঠে—সর্ব দেবতার সমাগম ঘটে সেখানে। মথুরার কারাগার ইহার ব্যতিক্রম নয়।

মথুরার কারাগার কংসের মুক্তিরও কারণ হইয়াছিল—ভীতির মাধ্যমে শ্রীভগবানে তাঁহার মনকে পূর্ণ একাগ্র করিবার উপলক্ষ্য হইয়া। দৈববাণী শোনার দিন হইতেই কংসের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল সত্য, কিন্তু দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের জন্মকাল যতই সন্নিকটবর্তী হইতেছিল, সে ভয় ততই বাড়িয়া চলিয়াছিল। বিশেষ করিয়া দেবকীর তৎকালীন অপরূপ দিব্য রূপলাবণ্য দেখিয়া কংস নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিলেন যে, শ্রীভগবানই দেবকীর গর্ভে শিশুরূপে রহিয়াছেন। দেবকীর এই দিব্য রূপলাবণ্য বসুদেব, কংস এবং কারারক্ষীরা ছাড়া আর কাহারো দেখার সুযোগ হয় নাই, কারণ সেখানে অন্য কেহ যাইতে পারিতেন না। শ্রীমদ্‌ভাগবতে অপূর্ব ভাষায় ইহার বর্ণনা রহিয়াছে: 'যেমন কোন পাত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখা অগ্নির আলোক চতুর্দিক আলোকিত করিতে পারে না, বিদ্যাবিতরণে বিরত থাকেন—এরূপ জ্ঞানীদের হৃদয়ে আবির্ভূত সরস্বতীর পরিচয় যেমন কেহ পায় না, কারারুদ্ধা দেবকীর এই দিব্য রূপলাবণ্য দেখিয়া আনন্দিত হইবার সুযোগও তেমনি সকলে পায় নাই।' কংস দেবকীকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পূর্বে আরো বহুবার দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এরূপ দেবদুর্লভ রূপলাবণ্য আর কখনো দেখেন নাই—দেবকীর রূপের প্রভায় কারাকক্ষ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে! ভগবান হরিকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন বলিয়াই দেবকীর এই পরিবর্তন, ইহা বুঝিয়া কংস দৈববাণীর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছিলেন এবং ফলে তাঁহার ভয় চরমে উঠিয়াছিল। ভীত কংস দেবকীকে হত্যা করিয়া তখনই তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রাণহন্তাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। দৈববাণী শোনার দিনও একই ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল।

সেদিন বসুদেব তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন প্রতিটি সন্তানের জন্মের পরই তাহাকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া। এদিন কিন্তু কংস নিজ হইতেই নিরস্ত হইলেন এই ভাবিয়া যে, গর্ভবতী স্ত্রীলোককে হত্যা করিলে যে অপবাদ রটিবে, লোকে যে-সব দুর্বাক্য বলিবে, তাহা শুনিয়া বাঁচিয়া থাকা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়াবহ। দেবকীকে হত্যা করা হইতে কংস নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু যে-শিশুরূপে শ্রীহরির আবির্ভাব আসন্ন তাহাকে কি করিয়া বিনাশ করিবেন দিবারাত্র তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন—'উপবেশন, পানাহার, শয়ন সব সময়েই শ্রীহরির চিন্তা তাঁহার মন অধিকার করিয়া রহিল, জগৎকে তিনি হরিময় দেখিতে থাকিলেন।' কংস যে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা সর্বক্ষণ এভাবে ভগবচ্চিন্তার ফলেই

এখানে শ্রীমদ্ভাগবত মুক্তিলাভ বা শ্রীভগবানকে লাভ করিবার সাধনার একটি সর্বজনীন সত্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। যে ভাবেই হউক, আমাদের রিপুতাড়িত, ভোগ-বাসনার জন্য সর্বক্ষণ বিষয়চিন্তায় রত মনকে ভগবানে একাগ্র করিতে পারিলেই ভগবান-লাভ হয়। মন একই সঙ্গে একাধিক চিন্তা করিতে পারে না। সর্বক্ষণ যদি মন ভগবচ্চিন্তায় লিপ্ত থাকে, তাহা হইলে স্বতই সেখানে আর বিষয়চিন্তা আসিতে পারে না, ভোগ হইতেও নিবৃত্তি ঘটে।

ভগবানকে সারা মন দিয়া ভালবাসার মতো তাঁহাকে সারা মন দিয়া ভয় করাও তাঁহাতে মন স্থির করিবার একটি উপায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, এভাবে ভয়ে ভগবানে মনকে সম্পূর্ণ একাগ্র করিয়া মুক্তি-লাভ করার উদাহরণ বিরল হইলেও একেবারে যে নাই তাহা নহে, কংসের বেলা তাহাই হইয়াছিল—'কাম, দ্বেষ, ভয় অথবা স্নেহের ভাব অবলম্বনে ভগবানে মনোনিবেশ করিয়া অনুক্ষণ তাঁহার চিন্তার ফলে বহু ব্যক্তি কামদ্বেষাদির অতীতে যাইয়া ভগবানলাভ করিয়াছেন। যেমন গোপীগণ কামভাবে, কংস ভয়ে, শিশুপাল প্রভৃতি বিদ্বেষে, যাদবগণ সখ্যে, তোমরা (পাণ্ডবগণ) স্নেহে এবং আমরা (নারদাদি) ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে পাইয়াছি।'

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের জন্য মথুরার কারাগারই বৈকুণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। জন্মের পূর্বক্ষণে ব্রহ্মাদি দেবগণ দেবকীর কক্ষে আসিয়া তাঁহার গর্ভস্থ ভগবানের স্তব করিলেন এবং দেবকীকে অবতারের জননী হওয়া রূপ পরম সৌভাগ্যের কথা জানাইয়া এবং ভগবান যখন তাঁহার পুত্ররূপে আসিতেছেন তখন কংসকে আর ভয় করিবার কোন কারণ নাই—এই আশ্বাস দিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

শুভক্ষণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে বসুদেব এবং দেবকী উভয়েই কারাকক্ষে তাঁহাকে চতুর্ভুজ-নারায়ণ-মূর্তিতে দেখিয়া-ছিলেন, এবং তাঁহাকে জগৎকারণ সচ্চিদানন্দ জ্ঞানে স্তব করিয়াছিলেন। দেবকীর প্রার্থনায় ভগবান দ্বিভুজ মানবশিশুর রূপ ধারণ করেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে, কংস তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তাঁহাকে গোপনে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিবার কথা তিনিই বসুদেবকে বলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত 'দেবরূপিণী' দেবকীর এই সব দেবদর্শন এবং নিজ পুত্রকে নারায়ণ-মূর্তিতে দর্শন সম্বন্ধে আধুনিক যুক্তিবাদী যুগে মনে সংশয় জাগা অস্বাভাবিক নয় যে, ভক্তেরা

সাধারণ ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়া অস্বাভাবিক রূপ দিয়াছে। কিন্তু এই যুগ-প্রারম্ভেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময়ে তাঁহার জননী চন্দ্রাদেবীর জীবনে অনুরূপ ঘটনাই ঘটিয়াছিল এবং স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, পূর্বগ অবতারগণের লীলা সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে-সব কথা বর্ণিত আছে সে-সব বিশ্বাস করা তাঁহাদের পক্ষেও কঠিন হইত, যদি না শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে অনুরূপ ঘটনায় পরিচয় তাঁহারা পাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে গর্ভে ধারণকালে চন্দ্রাদেবী দেবকীর মতোই অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী হইয়াছিলেন, 'দেবরূপিণী' হইয়াছিলেন—আজন্ম সাধনার ফলে অতি বিরল কোন ভক্ত সাধক যে-অবস্থায় উন্নীত হন (যেমন গোপালের মা), স্বতই সে অবস্থায় উন্নীত হইয়াছিলেন—সাধারণ অবস্থায় খালি চোখেই স্বগৃহে তিনি দেবতাদের আসিতে দেখিতেন, তাঁহাদের সহিত কথাও বলিতেন। একদিন হংসবাহন রক্তবর্ণ ব্রহ্মাকে গৃহাগত দেখিয়া চন্দ্রাদেবী তাঁহাকে 'হাঁসে-চড়া ঠাকুর' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

কারাগারের এই স্বল্পক্ষণটুকুই ছিল দেবকী ও বসুদেবের পরম সৌভাগ্যকে, সন্তানরূপে আবির্ভূত ভগবানকে তাঁহার বাল্যলীলায় নিকটে পাইবার একমাত্র ক্ষণ। ইহার পর কংসবধের পূর্বে তাঁহাকে একবার চোখে দেখিবার সুযোগও তাঁহারা পান নাই। সেই জন্যই বোধ হয় অন্যান্য অবতারে বাল্যলীলায় মাতাপিতার সহিত ভাবের সম্পর্কে এখানে বিশেষ একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। প্রায় সকল অবতারের জনকজননীরাই জানিতেন যে ভগবান তাঁহাদের গৃহে মানুষ হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু শ্রীভগবান মায়ায় তাঁহাদের সে কথা ভুলাইয়া দিতেন, পুত্র-জ্ঞানই প্রকট রাখিতেন তাঁহাদের মনে। নতুবা লীলা হয় না। কিন্তু দেবকী-বসুদেবকে জন্মকালেই তিনি জানাইয়া দিলেন যে, তিনিই সচ্চিদানন্দ নারায়ণ এবং বলিলেন, তাঁহাকে ব্রহ্ম-জ্ঞানে বা পুত্র-জ্ঞানে—যে-কোন ভাবে একবার মাত্র চিন্তা করিলেই তাঁহারা পরম-গতি প্রাপ্ত হইবেন; তিনিই যে ভগবান, একথা ভুলাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন না। যাঁহাদের লইয়া তাঁহার বাল্যলীলা, সেই যশোদা-নন্দঘোষের বেলা কিন্তু ইহার বিপরীত করিয়াছিলেন। যশোদা বহুবার এই শিশুটিকে ভগবানরূপে, ব্রহ্মরূপে দেখিয়াছেন, নতমস্তকে তখন তাঁহাকে প্রণিপাতও করিয়াছেন, কিন্তু পরক্ষণেই শ্রীকৃষ্ণ মায়াপ্রভাবে তাঁহাকে সবই ভুলাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীভগবানকে আরও এক অবতারে, যীশু-অবতারে রাজভয়ের জন্য বাল্যজীবনে জন্মস্থান হইতে দূরে রাখা হইয়াছিল, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁহার পিতামাতাই সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার লালনপালন করিয়াছিলেন।

এই কারাগারেই বসুদেব কর্তৃক আনীত যশোদার কন্যারূপিণী মহামায়াকে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানজ্ঞানে বধ করিতে উদ্যত হইয়া কংস তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার হন্তারক জন্মিয়াছেন। ইহাতে কংসের ভয় দূর হয় নাই, কিন্তু তিনি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়াছিলেন এই ভাবিয়া যে, দৈববাণী মিথ্যা হইল!—দেবকীর অষ্টম গর্ভে তাঁহার হন্তারক তো নয়ই, পুত্রসন্তানও জন্মিল না!

মথুরার কারাগারের গোপন রহস্য জানাজানি হইয়াছিল বহু পরে—কংসবধের দু-এক দিন পূর্বে।

শ্রীকৃষ্ণ অবতার

শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ-মজুমদার

যাহা নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয় তাহা অচিন্ত্যস্বরূপ, মনোবাক্যের অতীত—"মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্।" "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর, ভগবান, প্রভু কিছুই বলা যায় না। সাধারণ মানুষ ভগবানের এই নির্গুণ স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে না, তাঁহার সহিত ভাবভক্তির সম্বন্ধও স্থাপন করিতে পারে না। অথচ তাঁহাকে নির্গুণ রূপে উপলব্ধি করিবার সাধনাও প্রচলিত। অর্জুন নরদেহধারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—সর্বদা তদ্গত চিত্তে যে-সব ভক্ত তোমার (সগুণ ব্রহ্ম বা অবতারাদির) উপাসনা করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন, এই উভয়বিধ ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক কাহারা—"তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ" (গীতা —১২।১)। তখন শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন—যাঁহারা আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠসাধক"—"মে যুক্ততমা মতাঃ" (ঐ—১২।২)। তবে যাঁহারা আমার নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অব্যক্ত অক্ষর স্বরূপের উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকে লাভ করিতে পারেন, কিন্তু অব্যক্তের উপাসনা দেহাভিমানী নরনারীর পক্ষে আয়াসসাধ্য— "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্" ইত্যাদি (ঐ -১২।৫)। অতএব হে অর্জুন, তুমি আমাতেই (অর্থাৎ নরদেহধারী শ্রীকৃষ্ণে) মনস্থাপন কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই স্থিতিলাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই—"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়" ইত্যাদি (ঐ ১২।৮)।

অতএব বুঝিতে কষ্টকল্পনার প্রয়োজন হয় না যে, তত্ত্বে যিনি নির্গুণ নিরাকার, লীলায় তিনিই সগুণ সাকার অবতার [১]।

"নির্গুণ ব্রহ্ম লীলাবশে গুণ-ও ক্রিয়াযুক্ত হন"—"লীলয়া বাপি যুঞ্জেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ" (শ্রীমদ্ভাগবত—৩।৭।২)। "যিনি সৎ-স্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম তিনিই প্রকৃতির ক্ষোভজনিত-সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতুভূত ঈশ্বর"—"সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্ গুণোর্মিসৃষ্টি-স্থিতিকাল-সংলয়ঃ"। (বিষ্ণুপুরাণ—১।১।২)। ব্রহ্মের দ্বিবিধ ভাব যথা—অমূর্ত ও মূর্ত—"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তঞ্চৈবামূর্তঞ্চ" (বৃহ. উ. ২।৩।১)। জীবের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যেই তিনি মনুষ্য-

১ "অবতার মানে নামিয়া আসা, যে রেখা ভাগবতকে মানবীয় স্তর হইতে পৃথক করিতেছে, সেই রেখার নীচে ভগবানের নামিয়া আসাই অবতার। শ্রীকৃষ্ণ-অবতার মানবদেহে মনুষ্যের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম গ্রহণ করিয়া তদনুসারে লীলা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর ও কলি যুগের সন্ধিক্ষণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কল্প কল্পে সেই সন্ধিস্থলে ভগবান পূর্ণাংশে অবতীর্ণ হন। অবতার সকল সময়ই ভাগবত ভাব ও মানুষ-ভাব, এই দুই ভাব-সমন্বিত। ভগবান যখন মানবরূপে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি মানবীয় প্রকৃতিকে তাঁহার সমস্ত বাহিক অপূর্ণতা এবং অক্ষমতা সহ গ্রহণ করেন। অবতার একজন আশ্চর্যকর্মা। বাজিকরের মত আসেন না, তিনি আসেন মানবজাতির দিব্যনেতারূপে, তিনি আসেন দিব্য মানবতার আদর্শ-স্বরূপ। এমন কি তাঁহাকে মানবোচিত দুঃখ এবং শারীরিক যন্ত্রণাও গ্রহণ করিতে হইবে।"—শ্রীঅরবিন্দ

দেহ ধারণ করিয়া লীলা করিয়া থাকেন, জীব এসব লীলাকথা শ্রবণ কীর্তন করিয়া যাহাতে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে, ভক্তিমান হইতে পারে—"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" (শ্রীমদ্‌ভাগবত—১০।৩৩।৩৬) "যিনি অরূপ হইয়াও বহুরূপী, সেই আশ্চর্যকর্মা শ্রীভগবানকে নমস্কার—"অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্যকর্মণে" (ঐ ৮।৩।৯)।

শ্রীহরি কখনও অংশ, কখনও অংশের অংশ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমূর্তিতে স্বয়ং পূর্ণতমরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অন্যান্য অবতার শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা কলা -"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" (ঐ -১।৩।২৮)। ইনিই অব্যক্ত মূর্তিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, ইনিই লীলাবশে বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ—"সর্বভূতাদিবাসশ্চ বাসুদেবস্ততোঽহম্।" (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৪১)। তিনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন, তাই তিনি কৃষ্ণ—"ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ।" তিনি সকলের হৃদয় হরণ করেন এবং সর্বপ্রকারে অমঙ্গল হরণ করেন তাই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীহরি; তিনি নরের অয়ন, সর্ব দেহীর আত্মা তাই কৃষ্ণ নারায়ণ "নারায়ণস্ত্বং সর্বদেহিনামাত্মা।" কৃষ্ণ সব কিছু ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া তিনি বিষ্ণু, ব্রহ্ম।

কৃষ্ণ সর্বভূতে বাস করিয়া থাকেন, তাই তিনি বাসুদেব—"সর্বভূতাদিবাসশ্চ বাসুদেবস্ততো-ঽহম্" (মহাভারত, শান্তিপর্ব)। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তিনি নিজেকে জগৎরূপে পরিণত করিয়াছেন—"জগৎ সর্বং শরীরং তে।" "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত।" সব কিছু বিনষ্ট হইলেও তিনি বিনষ্ট হন না।—"বিনশ্যৎ-স্ববিনশ্যন্তং" (গীতা—১৩।২৭)।

তিনিই জীব সাজিয়াছেন।—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত" (ঐ—১৩।২)। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (ঐ—১৫।৭)। নিত্যস্বরূপে কৃষ্ণ নির্গুণ ব্রহ্ম, লীলায় তিনিই গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত নরদেহধারী শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী, লোক-হিতার্থ তিনি মায়ায় দেহধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন -"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্ম-মায়য়া।" (গীতা—৪।৬), কংসকারাগারে জন্মের পরক্ষণে তিনি বসুদেব ও দেবকীকে নিজ ঈশ্বরীয় রূপ দেখাইয়াছিলেন—"তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্" ইত্যাদি (শ্রীমদ্‌ভাগবত—১০।৩।৮)।

অবতারের উদ্দেশ্য এবং কার্য সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্বার জন্ম প্রাপ্ত হন না - তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন"—(গীতা ৪।৭।৯)

আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ভগবান যখন নররূপে অবতীর্ণ হন, তখন অজ্ঞানীরা তাঁহাকে চিনিতে পারে না এবং ভগবান বলিয়াও স্বীকার করেনা। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাকে অবজ্ঞাও করিয়াও থাকে। রাজা শিশুপাল জরাসন্ধ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলিয়াই জানিতেন, আর কুন্তী, বিদুর, পাণ্ডবগণ, কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মদেব প্রভৃতি বহু জন তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানিতেন—"কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ। কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্"

(মহাভারত, সভাপর্ব)।

কৃষ্ণ সাকার না নিরাকার, নির্গুণ না সগুণ, কর্তা না অকর্তা—এ-সব বিষয় নিয়া তর্ক-জালের সৃষ্টি করা নিরর্থক। কেহ কেহ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তা করেন, কেহ কেহ সগুণ নিরাকার চিন্তা করেন, আবার কেহ কেহ সগুণ সাকার ভগবানের চিন্তা করেন, যাঁহার যেমন নিষ্ঠা—"একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত প্রকাশ।" এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অভয়-বাণী—যাহারা আমাকে যেভাবে ভজন করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকে সেইভাবে তুষ্ট করিয়া থাকি।—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব
ভজাম্যহম্।
মমবর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥"
(গীতা—৪।১১)

যে-সাধক যে-পথ অনুসরণ করিয়া চলিবেন, তিনি সে-পথেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিবেন।

সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র স্বরূপ—তিনি অজ অব্যয় আত্মা হইয়া আত্মমায়ার বলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকেন—"সম্ভবামাত্মমায়য়া" (ঐ—৪ ৬)। তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, ভূতধারক হইয়াও তিনি ভূতস্থ নহেন—"মমাত্মা ভূতভাবনঃ" (ঐ—৯।৫)। তিনি অব্যক্ত মূর্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন—"জগদব্যক্তমূর্তিনা" (ঐ—৯।৪)। তিনি কর্তা হইয়াও অকর্তা—"তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্" (ঐ—৪।১৩)। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরমতত্ত্ব অন্য কিছু নাই। সূত্রে গাথা মণিমালার মতো সর্ব ভূতের অধিষ্ঠান-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে—"সূত্রে মণিগণাইব" (ঐ—৭।৭)। শ্রীকৃষ্ণের দেহে চরাচর সমগ্র জগৎ অবস্থিত—"পশ্যাদ্য সচরাচরম্" (গীতা—১১।৭)। তিনি সর্বত্র মুখবিশিষ্ট—"বিশ্বতোমুখম্" (ঐ—১১।১১)। সর্বদিকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তপদ, সর্ব-দিকে তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্বদিকে তাঁহার কর্ণ। এভাবে এই লোকে সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া তিনি অবস্থিত আছেন—"সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্" ইত্যাদি (—১৩।১৪)। এ-সবই হইল কৃষ্ণের ঐশ্বরিক শক্তি—"পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" (ঐ—১১।৮)।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিয়াছেন—যদি কেহ পৃথিবীর ধূলিকণাসমূহ গণনা করিতে সমর্থ হয়, তথাপি সে আমার জন্ম ও কর্ম বহু জন্মেও সংখ্যা করিতে পারিবে না। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান আমার জন্ম ও কর্ম মহর্ষিগণও সংখ্যা করিতে গিয়া অন্ত পান নাই—"গুণকর্মাভিধা-নানি ন মে জন্মানি কর্হিচিৎ" ইত্যাদি (শ্রীমদ্-ভাগবত—১০।৫১।৩৭-৩৮)। আমি কালক্রমে পৃথিবীর পরমাণুর সংখ্যা গণনা করিতে পারি, কিন্তু কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডসৃজনকারী আমার বিভূতির সংখ্যা কেহ গণনা করিতে পারিবে না—"সংখ্যানং পরমাণূনাং কালেন ক্রিয়তে ময়া। ন তথা মে বিভূতীনাং সৃজতোঽণ্ডানি কোটীশঃ" (ঐ—১১।১৬।৩৯)।

কাজেই তর্ক-বিচারে 'ভগবানের ভাবের ইতি' করিবার । চেষ্টায় কালক্ষেপ না করিয়া আমাদের নিজ নিজ রুচিসামার্থ্যানুযায়ী তাঁহাকে লাভ করার পথে অগ্রসর হওয়াই আসল কাজ। আমাদের এই কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই শ্রীভগবান বার বার দেহধারণ করিয়া আসেন।

গঙ্গা মা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এসো এসো মা আজ বিশ্বরমা,
করুণাময়ী তিলোত্তমা,
সুষমা তব বিছায়ে কল্লোলে।
এসো তিমির নাশি' জ্যোতির্ময়ী,
ক্লান্তিবুকে মরণজয়ী
ছন্দের বসন্ত ফুলদোলে।

দেখ, জগতে আজ ঘনায় কালো
হিংসা দ্বেষ—তোমার আলো
ভাসায়ে দিক তাদেরে বরদানে।
তুমি এসো মা আশা সঞ্চারিয়া
শান্তিকলি মঞ্জরিয়া,
অশিস্ তব ঝঙ্কারিয়া গানে।

যেন তোমায় সুখে বেদনে দেখি,
বাদলে শশিকিরণে দেখি,
নিরাশাবুকে দুরাশা যেন জাগে।
যেন কখনো তব চরণছাড়া
না হই—চাই আপনহারা
সুরে তোমায় বরিতে অনুরাগে।

দেবি! প্রার্থি আজ তব চরণে:
তোমার ঢেউ অনুসরণে
ঘুমাতে নীল সিন্ধুর শিথানে।
যেন দিনান্তে অতৃপ্ত হিয়া
ওঠে মা প্রেমে উচ্ছলিয়া
চরণে তব শরণাগতি-তানে।

মাতৃতীর্থ-পরিক্রমা

[ ]

প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা

২৮) কাঞ্চীদেশে চ কঙ্কালো ভৈরবো রুরু
নামকঃ দেবতা দেবগর্ভাখ্যা।

সতীর কঙ্কাল যেখানে পতিত হয় তার নাম কাঞ্চী। ভৈরবের নাম রুরু, দেবীর নাম দেবগর্ভা। দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীপুরমই কাঞ্চী নামে প্রসিদ্ধ। দেবী এস্থানের কামাক্ষী এবং শিব একাম্রনাথ। যে সাতটি মহাতীর্থ মোক্ষপ্রদ নামে কীর্তিত, কাঞ্চী তাদের অন্যতম।

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥
—স্কন্দপুরাণ

২৯) নিতম্বঃ কালমাধবে
ভৈরবশ্চাসিতাঙ্গশ্চ দেবী কালী সুসিদ্ধিদা।
দৃষ্টা দৃষ্টা নমস্কৃত্য মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
কুজবারে ভূততিথৌ নিশার্ধে যস্তু সাধকঃ।
নত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥

কালমাধবে সতীর বাম নিতম্ব পতিত হয়। ভৈরবের নাম অসিতাঙ্গ, দেবীর নাম কালী। শোননদের কাছে এই পীঠস্থান অবস্থিত।

৩০) শোণাখ্যা ভদ্রসেনস্তু নর্মদাখ্যে
নিতম্বকঃ।

নর্মদায় দেবীর দক্ষিণ নিতম্ব পতিত হয়, এখানে ভৈরবের নাম ভদ্রসেন। দেবীর নাম শোণা বা শোণাক্ষী। প্রাণতোষণীতন্ত্রে উল্লেখ আছে—

'শোণাখ্যে ভদ্রসেনস্তু নর্মদাখ্যা নিতম্বকে'
—নর্মদা নদীতটে এ মহাপীঠ অবস্থিত। জব্বলপুর শহর থেকে ১২।১৩ মাইল দূরে ভৃগুক্ষেত্র বা ভেড়াঘাট স্থানে সুবিখ্যাত নর্মদা প্রপাত অবস্থিত। নর্মদার উভয়তটে শ্বেতমর্মর শৈল বিরাজিত। এই শৈলশৃঙ্গে গৌরীশঙ্কর মন্দির স্থাপিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে বৃষভাসনে হরগৌরী মূর্তি বিরাজমান। বাইরের মণ্ডপে চতুঃষষ্টি যোগিনীমূর্তিসমূহ ভগ্ন অবস্থায় দৃষ্ট হয়।

স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডে নর্মদার উৎপত্তি বর্ণিত আছে—নর্মদা তিনবার পৃথিবীতে অবতরণ করেন। প্রথমবার রাজা পুরূরবা, দ্বিতীয়বার সোমবংশীয় হিরণ্যতেজা নামে এক রাজা এবং তৃতীয়বার ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা পুরুকুৎস—এই তিনজনই মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করে নর্মদাকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে এনেছিলেন। দেবী মহাদেবের অনুরোধেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং বিন্ধ্যগিরি তাঁর বেগ ধারণ করেছিলেন।

৩১) রামগিরৌ স্তনান্যঞ্চ শিবানী
চণ্ডভৈরবঃ।

রামগিরিতে দেবীর দক্ষিণস্তন পতিত হয়, সেখানে দেবীর নাম শিবানী, ভৈরবের নাম চণ্ড।

মধ্যপ্রদেশের নাগপুর ও বিলাসপুরের ৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমকোণে পর্বতোপরি পীঠস্থান অবস্থিত, আধুনিক নাম রামটেক। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত চিত্রকুট পর্বতের নামান্তর রামগিরি। মহাকবি কালিদাস মেঘদূত কাব্যে রামগিরির নাম অক্ষয় করে রেখেছেন। টীকাকার মল্লিনাথের মতে রামায়ণোক্ত চিত্রকূট পর্বতই রামগিরি 'স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু

বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু।'

৩২) বৃন্দাবনে কেশজালমুমানাম্নী চ দেবতা।

ভূতেশো ভৈরবস্তত্র সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥

বৃন্দাবনে সতীর কেশজাল পতিত হয়। তথায় দেবী উমা নামে অধিষ্ঠিত এবং ভূতেশ নামে ভৈরব অবস্থান করেন। বৃন্দাবনের যে স্থানে সতীর শেকজাল পতিত হয় সেই স্থান কেশজাল নামে অভিহিত।

৩৩) সংহারাখ্য ঊর্ধ্বদন্তে দেবী নারায়ণী শুচৌ।

শুচি নামক দেশে দেবীর ঊর্ধ্বদন্তপঙ্‌ক্তি পতিত হয়। এখানে দেবীর নাম নারায়ণী, ভৈরবের নাম সংহার। এ মহাপীঠ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না।

৩৪) অধোদন্তে মহারুদ্রো বারাহী পঞ্চসাগরে।

পঞ্চসাগরে দেবীর অধোদন্তপঙ্‌ক্তি পতিত হয়—তথায় দেবী বারাহী, ভৈরব মহারুদ্র। এ মহাপীঠ সম্বন্ধে প্রমাণভিত্তিক কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হরিদ্বারের নিকটস্থ পঞ্চকুণ্ডই উক্ত পীঠস্থান।

৩৫) করতোয়াতটে···

বামনভৈরবঃ।

অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা॥

করতোয়া নদীর বামতটে দেবীর বামকর্ণ পতিত হয়। এখানে ভৈরবের নাম বামন দেবীর নাম অপর্ণা। উত্তরবঙ্গে বগুড়া জেলার ভবানীপুর নামক স্থানে এই মহাপীঠ অবস্থিত। হরপার্বতীর পরিণয়কালে দেবাদিদেব মহাদেবের করচ্যুত জল থেকে করতোয়া উৎপত্তি হয়। বর্ষাসমাগমে সকল নদীর জলই অপবিত্র হয়, কিন্তু করতোয়া নদীর জল অশুচি হয় না।

৩৬) শ্রীপর্বতে দক্ষগুল্‌ফস্তত্র শ্রীসুন্দরী পরা।

সর্বসিদ্ধীশ্বরী সর্বা সুন্দরানন্দভৈরবঃ॥

শ্রীপর্বতে দেবীর দক্ষিণ গুল্‌ফ পতিত হয়। তথায় দেবীর নাম শ্রীসুন্দরী, ভৈরবের নাম সুন্দরানন্দ। মাদ্রাজের কার্নুল জেলায় কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন তীর্থ। মহাভারত, শিবপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও ভাগবতে এই তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। শ্রীশৈল হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়বিধ তান্ত্রিক সাধনার অন্যতম কেন্দ্রস্থানরূপে প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণকালে শ্রীশৈলতীর্থে আগমনপূর্বক মল্লিকার্জুন শিব দর্শন করেছিলেন (চৈতন্যচরিতামৃত, ৯ম পরিচ্ছেদ)। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম শ্রীমল্লিকার্জুন শ্রীশৈলে বিরাজমান। শৃঙ্গোপরি অধিষ্ঠিত এই অনাদিলিঙ্গ অর্জুন দর্শন করেছিলেন এবং প্রস্ফুটিত মল্লিকা কুসুমরাশি দিয়ে দেবাদিদেবের পূজা করে সিদ্ধমনোরথ হয়েছিলেন। তদবধি এই শিবলিঙ্গ মল্লিকার্জুন নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে।

৩৭) কপালিনী ভীমরূপা বামগুল্‌ফো বিভাসতে।

ভৈরবশ্চ মহাদেবঃ সর্বানন্দঃ শুভপ্রদঃ॥

বিভাসকে দেবীর বামগুল্‌ফ পতিত হয়। দেবী ভীমরূপা কপালিনী। ভৈরবের নাম সর্বানন্দ। মেদিনীপুর জেলার তমলুক বা তাম্রলিপ্তিতে এই পীঠস্থান অবস্থিত। বৌদ্ধযুগের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলরূপে তাম্রলিপ্তির প্রসিদ্ধি ছিল। এই বন্দর থেকে আর্যাবর্তের শত শত বণিক, ধর্মপ্রচারক ও যোদ্ধা সিংহল, দক্ষিণভারত, ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করত বাণিজ্য ও

সংস্কৃতির সম্প্রসারণ উদ্দেশ্যে। পীঠাধিষ্ঠাত্রী কপালিনী দেবী এবং ভৈরব সর্বানন্দ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তমলুকের বর্গভীমা দেবী অতি জাগ্রতা। একটি প্রস্তরে বর্গভীমা মূর্তি খোদিত। বর্গভীমার মন্দির ৬০ ফুট এবং ভিত্তিস্থল ৩০ ফুট উঁচু। যদিও মন্দিরটির গঠনপ্রণালী উড়িষ্যার মন্দিরের মত কিন্তু মন্দিরের অন্তর্ভাগ বৌদ্ধবিহারসদৃশ। বর্গভীমা দেবীর বেদীর নীচে ভূতনাথ ভৈরব আছেন। মন্দিরের উত্তরদিকে একটি কুণ্ড বা পুষ্করিণী আছে।

৩৮) উদরঞ্চ প্রভাসে মে চন্দ্রভাগা
যশস্বিনী, বক্রতুণ্ডভৈরবশ্চ।

প্রভাসে দেবীর উদরদেশ পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম যশস্বিনী চন্দ্রভাগা, ভৈরবের নাম বক্রতুণ্ড। প্রভাসের বর্তমান নাম সোমনাথ। মহাভারত, শিবপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে এই তীর্থের উৎপত্তি ও ক্ষেত্রমাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এই প্রভাস-তীর্থে যদুবংশীয়গণ দ্বাপর যুগের অবসানে পরস্পর আত্মঘাতী সংগ্রামপূর্বক ধ্বংস হয়েছিলেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১২।২)। প্রভাস তীর্থে চন্দ্র শিবলিঙ্গ সোমেশ্বর প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বাদশজ্যোতির্লিঙ্গস্তোত্রে বলা হয়েছে—

সৌরাষ্ট্রদেশে বিশদেঽতিরম্যে
জ্যোতির্ময়ং চন্দ্রকলাবতংসম্।
ভক্তিপ্রদানায় কৃপাবতীর্ণং
তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্যে॥

সোমনাথের বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেন রানী অহল্যাবাঈ (১৭৩৫—১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ)। দিল্লীর সুলতান মামুদ ১০২৪, ১২৯৭ খৃঃ দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজি, ১৩৯৫ খৃঃ গুজরাটের সুলতান মুজফর খাঁ সোমনাথের মন্দির পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করেন। সুলতান মামুদ শিবলিঙ্গ ভগ্ন করে দেখেন যে লিঙ্গের অভ্যন্তরে অগণ্য মণিমুক্তা রয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্ন একত্র করলেও সোমনাথের সম্পদের সমকক্ষ হয় না। মন্দিরের মধ্যপ্রকোষ্ঠে বিরাট শিবলিঙ্গ বিরাজমান—১০ হাত দীর্ঘ, ৩ হাত প্রস্থ এবং শূন্যগর্ভ। দেবতার সেবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ পুরোহিত, তিনশত বাদ্যকার এবং পাঁচশত দেবদাসী নর্তকী। দেবতার অভিষেকের জন্য প্রত্যহ গঙ্গার পবিত্র সলিল আনা হতো এবং কাশ্মীরের অপূর্ব পুষ্পসম্ভার দ্বারা তাঁর পূজা হত। সহস্র সহস্র লোক মন্দির প্রাঙ্গণে প্রত্যহ প্রসাদ পেত। স্বাধীন ভারতে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩৯) উর্ধ্বোষ্ঠো ভৈরবপর্বতে
অবন্ত্যাঞ্চ মহাদেবী লম্বকর্ণস্তুভৈরবঃ।

অবন্তীদেশে ভৈরবপর্বতে দেবীর উর্ধ্বওষ্ঠ-পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম মহাদেবী, ভৈরবের নাম লম্বকর্ণ। অবন্তীদেশে সিপ্রা নদীর তীরে ভৈরবপর্বতে এই পীঠস্থান অবস্থিত, বর্তমান নাম উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী মধ্যভারতস্থিত গোয়ালিয়রের অন্তর্গত।

স্কন্দপুরাণে অবন্তীকে সপ্তমোক্ষপ্রদপুরীর অন্যতম বলা হয়েছে—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

উজ্জয়িনী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী-রূপে সুপরিচিত। বিক্রমাদিত্যের সময় কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন উজ্জয়িনী অলঙ্কৃত করেছিলেন। উজ্জয়িনীর মহাকাল শিবলিঙ্গ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখ আছে—

মহাকালং ততো গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
কোটিতীর্থমুপস্পৃশ্য হয়মেধফলং লভেৎ॥

মহাকবি কালিদাস তাঁহার মেঘদূতকাব্যে (পূর্বমেঘ, ৩৫—৩৭) উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির, মন্দিরের আরতি, দেবদাসীদের নৃত্য এবং মহাকালের তাণ্ডব নৃত্যের বর্ণনা করেছেন—

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলে নাভিনীলং
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা॥

'শঙ্করদিগ্বিজয়' গ্রন্থে বলা হয়েছে, শঙ্করাচার্য বেদান্তপ্রচারের জন্য অবন্তী রাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৪০) চিবুকে ভ্রামরী দেবী বিকৃতাক্ষো…
ভৈরবঃ সর্বসিদ্ধীশস্তত্র সিদ্ধিরনুত্তমা॥

জনস্থানে দেবীর চিবুক পতিত হয়। দেবীর নাম ভ্রামরী, ভৈরবের নাম বিকৃতাক্ষ। রামায়ণে উল্লিখিত দণ্ডকারণ্যের অংশবিশেষ পঞ্চবটী বা নাসিক জনস্থানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দণ্ডকারণ্যের যে অংশে রাবণ-নিয়োজিত সৈন্য-বাহিনী অবস্থান করত তার নাম জনস্থান,—'জনস্থানং নাম দণ্ডকারণ্যে রাবণবলনিবেশ-স্থানম্'। পঞ্চবটীর আধুনিক নাম নাসিক, এইস্থানে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসিকা ছেদন করেন। নাসিকের সপ্তশৃঙ্গী দেবীতীর্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

নাসিক শহরের ৩০ মাইল উত্তরে সহ্যাদ্রি-পর্বতমালার অন্তর্গত সপ্তশৃঙ্গ পর্বতের ওপর পীঠস্থান। সপ্তশৃঙ্গবিশিষ্ট পর্বতের নামানুযায়ী অধিষ্ঠাত্রীদেবী সপ্তশৃঙ্গী নামে অভিহিতা। দেবী সপ্তশৃঙ্গী দর্শনার্থে চৈত্রের শুক্লাপঞ্চমী এবং শারদীয়া পূর্ণিমাতে লোকসমাগম হয়।

৪১) গণ্ডো গোদাবরীতীরে বিশ্বেশী
বিশ্বমাতৃকা, দণ্ডপাণির্ভৈরবস্তু।

গোদাবরী নদীতীরে যেখানে দেবীর গণ্ডস্থল পতিত হয় তথায় দেবীর নাম বিশ্বেশী বিশ্ব-মাতৃকা, ভৈরবের নাম দণ্ডপাণি। গোদাবরী নদীর অপর নাম গৌতমীগঙ্গা। নাসিক পঞ্চবটীর নিকটবর্তী ব্রহ্মগিরি পর্বত থেকে পূতসলিলা গোদাবরী উৎপন্ন। মহর্ষি গৌতমের তপস্যা দ্বারা গোদাবরী প্রবাহিতা, অতএব গৌতমীগঙ্গা নাম হয়েছিল। শিব-পুরাণের জ্ঞানসংহিতায় ৫২—৫৪ অধ্যায়ে এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের গৌতমী-মাহাত্ম্য-প্রকরণে গোদাবরীর উৎপত্তিকথা বর্ণিত। গোদাবরীর উৎপত্তিস্থলের সন্নিকটে ত্র্যম্বকেশ্বর বিরাজমান ব্রহ্মগিরি পর্বতের পাদদেশে ত্র্যম্বকেশ্বরের মন্দির অবস্থিত।

৪২) রত্নাবল্যাং দক্ষস্কন্ধঃ কুমারী
ভৈরবঃ শিবঃ।

রত্নাবলী প্রদেশে সতীর দক্ষিণ স্কন্ধ পতিত হয়। তথায় দেবীর নাম কুমারী, ভৈরবের নাম শিব। ইতিহাসে এই পীঠস্থান সঠিক-ভাবে নির্ণীত হয়নি। হুগলী জেলার অন্তর্গত রত্নাকর (কানানদী) নদীর তীরে খানাকুল কৃষ্ণনগরে পীঠস্থান অবস্থিত বলে ঐতিহাসিক-গণ অনুমান করেন। কারুর মতে আবার নেপালের বাগমতী ও রত্নাবলী নদীর সঙ্গম-স্থলে প্রমোদাতীর্থে এই পীঠস্থান অবস্থিত। বাগমতী নদীর পশ্চিম তীরে সুপ্রসিদ্ধ পশুপতি-নাথের মন্দির বিদ্যমান।

৪৩) মিথিলায়ামুমা দেবী বামস্কন্ধো
মহোদরঃ।

মিথিলায় সতীর বামস্কন্ধ পতিত হয়। তথায় দেবীর নাম উমা, ভৈরবের নাম মহোদর। নেপালের তরাইয়ের জনকপুর রোড ষ্টেশনের

কাছে মিথিলা পীঠস্থান অবস্থিত এখানে দেবী শিলারূপিণী; এর সন্নিকটে গৌতমাশ্রম। ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গৌতমঋষি রাজর্ষি জনকের পুরোহিত ছিলেন। মিথিলা বা বিদেহরাজ্য বিহার প্রদেশের অন্তর্গত বর্তমান ত্রিহুত (তীরভুক্তি) শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বিদেহ বা তীরভুক্তি রাজ্যের সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে,—

গণ্ডকীতীরমারভ্য চম্পারণ্যান্তকং শিবে।
বিদেহভূঃ সমাখ্যাতা তৈরভুক্ত্যভিধঃ স তু॥

বিদেহ বা তীরভুক্তি দেশ গণ্ডকী নদীতীর থেকে আরম্ভ করে চম্পারণের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

৪৪) নলাহাট্যাং নলাপাতো যোগীশো
ভৈরবস্তথা।
তত্র সা কালিকাদেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা॥

নলাহাটীতে দেবীর নলাপাত হয়, তথায় ভৈরবের নাম যোগীশ, দেবীর নাম কালিকা। বীরভূম জেলার নলহাটী গ্রামে এই পীঠস্থান অবস্থিত। উঁচু টিলার ওপর দেবীর মন্দির বিরাজিত। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রাচীর গাত্রে কালিকাদেবীর মূর্তি সর্বদা সিন্দূরমণ্ডিত থাকে। দীপান্বিতা কালিকাপূজার রাত্রে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়।

৪৫) কালীঘাটে মুণ্ডপাতঃ ক্রোধীশো
ভৈরবস্তথা।
দেবতা জয়দুর্গাখ্যা নানাভোগপ্রদায়িনী॥

কালীঘাটে দেবীর মস্তক পতিত হয়,—ভৈরবের নাম ক্রোধীশ, দেবীর নাম জয়দুর্গা। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার সন্নিকটে জুরনপুরে এই পীঠস্থান অবস্থিত।

৪৬) বক্রেশ্বরঃ মনঃপাতো বক্রনাথস্তু
ভৈরবঃ।
নদী পাপহরা তত্র দেবী মহিষমর্দিনী॥

বক্রেশ্বরে সতীর ভ্রূমধ্যস্থল পতিত হয়। ভৈরবের নাম বক্রনাথ, দেবী মহিষমর্দিনী। এই মহাপীঠ বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের নিকট অবস্থিত। মহামুনি অষ্টাবক্র এখানে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। পীঠস্থানের চতুর্দিক প্রাচীরবেষ্টিত। দেবী অষ্টধাতু নির্মিত। সন্নিকটে পাপহরা নদী প্রবাহিতা। এই পীঠস্থানে তান্ত্রিক সন্ন্যাসী অঘোরী বাবা সিদ্ধিলাভ করেন।

বক্রেশ্বর একটি প্রাচীন শৈবশাক্ততীর্থ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত বক্রেশ্বরমাহাত্ম্য-প্রকরণে বক্রেশ্বর তীর্থের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে,—

গৌড়দেশে মহৎ ক্ষেত্রং বক্রেশ্বরসুসঙ্গকম্।
যন্নামস্মরণেনাপি মুচ্যতে সর্বকিল্বিষাৎ॥

গৌড়দেশে বক্রেশ্বর নামে মহৎক্ষেত্র আছে; যার নাম স্মরণমাত্র মানব সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়। বক্রেশ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—সত্যযুগে মহাতপা অষ্টাবক্রের প্রথম নাম ছিল 'সুব্রত'। একদিন লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর সভায় দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি সকলে উপস্থিত, সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র লোমশমুনিকে সর্বপ্রথমে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় অর্পণ করেন। ক্রোধবশতঃ সুব্রতমুনির অষ্টাঙ্গ বক্র হয়ে পড়ে—তারপর থেকে মুনির নাম হয় অষ্টাবক্র। মুনিবর সুব্রত বক্রাঙ্গ হয়ে এইক্ষেত্রে এসে মহাদেবের উদ্দেশে দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করেন। মহাদেব প্রসন্ন হয়ে তাঁকে অভীষ্ট বর দান করেন,—

তমুদ্দিশ্য তপস্তেপে স চ বক্রো মহাতপা।
তং মুনিং সুপ্রসন্নোঽভূৎ স স্বয়ং পার্বতীপতিঃ॥

৪৭) যশোরে দেবীর করকমল পতিত হয়—
যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী।
চণ্ডশ্চভৈরবস্তত্র যত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥

দেবীর নাম যশোরেশ্বরী এবং ভৈরবের নাম চণ্ড। এই তীর্থস্থান খুলনা জেলার অন্তর্গত ঈশ্বরীপুরে অবস্থিত। হাসনাবাদ রেলস্টেশন থেকে ঈশ্বরীপুর পীঠস্থান প্রায় ১৫ মাইল দূরে। এখানেই প্রাচীন যশোর রাজ্যের রাজধানী ছিল। যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ঈশ্বরীপুর বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত স্থান। যশোরেশ্বরীর পীঠমূর্তি কষ্টিপাথরে নির্মিত লোলরসনা ভীষণা কালীমূর্তি। এ মূর্তির কণ্ঠের নিম্নে হস্তপাদ বা নিম্নাঙ্গ কিছুই নেই। মূর্তিটা একটি প্রস্তর পিণ্ডমাত্র। মূর্তিদেহের নিম্নভাগ মাটিতে প্রোথিত রয়েছে। নিম্নাঙ্গ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। মূর্তি অতিভীষণা হলেও বদনমণ্ডলে করুণাময়ী মাতৃভাবের প্রকাশ দেখা যায়। প্রতাপাদিত্যের রাজ্যকালে দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হন এবং প্রতাপাদিত্য তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা মহাশক্তির পূজা আরম্ভ করেন। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাঁর সিদ্ধিদাত্রী ভগবতী যশোরেশ্বরী দেবীর পূজাদি ক্রিয়া মহাসমারোহে অনুষ্ঠান করতেন। যুদ্ধে পরাজিত মানসিংহের সঙ্গে মহারাজ প্রতাপাদিত্য সন্ধি করেন। রাজা মানসিংহ যখন যশোর পরিত্যাগ করেন তখন তিনি জয়পুর রাজ্যের রাজধানী অম্বর নগরীতে নিয়ে যান যশোরেশ্বরী দেবীপ্রতিমাকে। অম্বর নগরীতে প্রতিষ্ঠিত দেবীর নাম সল্লাদেবী বা শিলাদেবী। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে অম্বর নগরীতে প্রতিষ্ঠিত শিলাদেবী প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী নন। ইনি বারভূঞার অন্যতম শ্রীপুরের (বিক্রমপুরের) অধিপতি কেদার রায়ের ইষ্টদেবী। মানসিংহ কেদার রায়কে পরাভূত করে শিলাদেবীকে জয়পুরে নিয়ে যান। ইনি অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী দুর্গামূর্তি।

৪৮) অট্টহাসে চৌষ্ঠপাতো দেবী সা
ফুল্লরা স্মৃতা।
বিশ্বেশো ভৈরবস্তত্র সর্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ॥

অট্টহাসে দেবীর ওষ্ঠপাত হয়। তথায় দেবীর নাম ফুল্লরা এবং ভৈরবের নাম বিশ্বেশ। অট্টহাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত; লাভপুর গ্রামের নিকটে এই মহাপীঠ অবস্থিত। দেবীর অধরোষ্ঠ এখানে পতিত হয়। প্রস্তরময় অধরোষ্ঠই দেবীপীঠরূপে পূজিত। মন্দিরের পশ্চাতে নীচুপ্রাচীরঘেরা কতকটা স্থান আছে, সেখানে শিবাবলি ভোগ দেওয়া হয়। এই পীঠস্থানে রটন্তী চতুর্দশীর দিন মেলা ও জনসমাগম হয়।

৪৯) হারপাতো নন্দিপুরে ভৈরবো
নন্দিকেশ্বরঃ।
নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ॥

নন্দিপুরে দেবীর কণ্ঠহার পতিত হয়। ভৈরবের নাম নন্দিকেশ্বর এবং দেবীর নাম নন্দিনী। নন্দিপুর বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ার সন্নিকটে। এখানে দেবীর কোন মূর্তি নেই বা মন্দিরও নেই। দু'টি বিশাল বটবৃক্ষ আছে, তার মধ্যস্থানে প্রস্তর বাঁধা বেদী বা আসন। চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত পীঠস্থানের কালীবাড়ী সর্বদা নির্জন সাধনার স্থান। শনিবার বা বিশেষ পর্ব উপলক্ষ্যে যাত্রিসমাগম হয়।

৫০) লঙ্কায়াং নূপুরঞ্চৈব ভৈরবো
রাক্ষসেশ্বরঃ।
ইন্দ্রাক্ষী দেবতা তত্র ইন্দ্রেণোপাসিতা পুরা॥

লঙ্কায় দেবীর নূপুর পতিত হয়, তথায় ভৈরবের নাম রাক্ষসেশ্বর এবং দেবীর নাম ইন্দ্রাক্ষী। প্রাচীন লঙ্কার অবস্থিতি কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। 'সিংহলান্ বর্বরান্ ম্লেচ্ছান্ যে চ লঙ্কা-

নিবাসিনঃ।' (মহাভারত, বনপর্ব ৫১।১২)

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।৩০) দেবীপুরাণে (৪২।৪৬) ও বৃহৎসংহিতায় (১৪।১১,১৫) সিংহল ও লঙ্কা দু'টি পৃথক স্থানরূপে উল্লিখিত হয়েছে। খৃষ্টীয় ৭ম শতকে প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসান সিংহলে যান। তিনি লিখেছেন—'সিংহল দ্বীপের দক্ষিণপূর্বে একটি পর্বত আছে, ঐ পর্বতকে লঙ্কা বলা হতো।'

রামায়ণে লঙ্কার বর্ণনায় আছে—

'দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ত্রিকুটো নাম পর্বতঃ।
সুবেল ইতি চাপ্যন্যো দ্বিতীয়ো রাক্ষসেশ্বরঃ॥
শিখরে তস্য শৈলস্য মধ্যমেঽম্বুদসন্নিভে।
শকুনৈরপি দুষ্প্রাপে টঙ্কচ্ছিন্নচতুর্দিশি॥
ত্রিংশদযোজনবিস্তীর্ণা শতযোজনমায়তা।
স্বর্ণপ্রাকারসংবীতা হেমতোরণসংবৃতা।
ময়া লঙ্কেতি নগরী শক্রাজ্ঞপ্তেন নির্মিতা॥
(উত্তরকাণ্ড—৫।২৩-২৫)

হে রাক্ষসগণ! দক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকুট পর্বত আছে এবং তদ্রূপ আর একটি সুবেল নামে পর্বত আছে। সেই ত্রিকুট শৈলের মধ্যম শিখর মেঘসদৃশ, বিশেষতঃ পাষাণসকল চারিদিকে বিকীর্ণ হওয়ায় এ তীর্থ পক্ষীদিগেরও দুর্গম। লঙ্কার পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী ইন্দ্রাক্ষী।

৫১) বিরাটদেশমধ্যে তু পাদাঙ্গুলিনিপাতনম্।
ভৈরবশ্চামৃতাখ্যশ্চ দেবী তত্রাম্বিকা স্মৃতা॥

মহাভারতে বর্ণিত বিরাট বা মৎস্যদেশ রাজপুতনার জয়পুর আলোয়ার ভরতপুর অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। পাণ্ডবেরা ১২ বছর বনবাসান্তে এক বছর এইস্থানে অজ্ঞাতবাস করেছিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাসের জন্য গমনকালে ভগবতী দুর্গার স্তব করেছিলেন। দেবী যুধিষ্ঠিরের স্তবে পরিতুষ্টা হয়ে তাঁকে দর্শন দিয়ে অভীষ্ট বর প্রদান করেন—

ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় মহিষাসুরনাশিনি।
প্রসন্না মে সুরশ্রেষ্ঠে দয়াং কুরু শিবা ভব॥
জয়া ত্বং বিজয়া চৈব সংগ্রামে চ জয়প্রদা।
মমাপি বিজয়ং দেহি বরদা ত্বঞ্চ সাম্প্রতম্॥

জগজ্জননী ভগবতী দুর্গা যুধিষ্ঠিরকে অভীষ্ট বর প্রদান করেছিলেন—

যে চ সঙ্কীর্তয়িষ্যন্তি লোকে বিগতমৎসরাঃ।
তেষাং তুষ্টা প্রদাস্যামি রাজ্যমায়ুর্বপুঃ সুতম্॥
প্রবাসে নগরে বাপি সংগ্রামে শত্রুসঙ্কটে।
অটব্যাং দুর্গকান্তারে সাগরে গহনে গিরৌ॥
যে স্মরিষ্যন্তি মাং রাজন্ যথাহং ভবতা স্মৃতা।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিদস্মিল্লোঁকে ভবিষ্যতি॥
(বিরাটপর্ব, অধ্যায়—৬)

হে রাজন্! যে সকল ব্যক্তি দ্বেষ পরিত্যাপূর্বক আমার নাম সংকীর্তন করে, আমি প্রসন্না হয়ে তাদের রাজ্য, আয়ু, সুন্দর দেহ ও পুত্র দান করি। যারা প্রবাসে, নগরে, সংগ্রামক্ষেত্রে, শত্রুসঙ্কটে অথবা অরণ্যে, দুর্গমকান্তারে, সাগরে এবং গহন গিরিশিখরে বিপন্ন হয়ে আমাকে স্মরণ করে, ইহলোকে তাদের কিছুই দুর্লভ হয় না।

এক অদ্বিতীয়া দেবীই এই বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন—'ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ' (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৬)। দেবী-উপনিষদে কথিত আছে—

একৈব সর্বত্র বর্ততে তস্মাদুচ্যতে একা।
একৈব বিশ্বরূপিণী তস্মাদুচ্যতে নৈকা॥

তিনি একা হয়েও বিশ্বজগৎ পরিচালনার জন্য নানামূর্তি বিগ্রহ ও বিভূতি ধারণ করে থাকেন। এই বিশ্বে অনন্তরূপের মধ্য দিয়ে দেবী নিজের অনন্তশক্তি প্রকট করছেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'The Mother' গ্রন্থে লিখছেন—'প্রত্যেক ভুবন বা লোক মহাশক্তির

একটি খেলা। এই মহাশক্তি বিশ্বমাঝে বিশ্বাতীতা আদ্যাশক্তিরই এক একটি রূপ। আমরা যে বিশ্বের অন্তর্গত, এই বিশ্বের শিখরে রয়েছে সৎ, চিৎ ও আনন্দের লোক—জগন্মাতা সেখানে শাশ্বত শক্তিরূপে সাক্ষাৎ বিরাজমানা।' (The Mother by Sri Arabinda Page—41-43)

সেই মহাশক্তি থেকে আমাদের উদ্ভব, স্থিতি ও লয়। ভারতভূমির প্রতিটি ধূলিতে সেই শক্তিরই বিকাশ। তীর্থে তীর্থে সেই মহাশক্তির অপূর্ব জয়গান। স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'ভারতে শক্তিপূজা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: 'ভারতের ঋষি শক্তির স্বাধীন কার্যকারিতার অভাব স্বীকার করিলেও চৈতন্যময় পুরুষের সহিত নিত্যসংযোগে তাঁহাকে নিত্যচৈতন্যময়ী দেখিয়াছেন।...বাহ্য ও আন্তর জগৎ একই শক্তিপ্রসূত বলিয়া অনুভব করিয়া পরিশেষে সেই শক্তিকেই শক্তিমানের সহিত নিত্যযুক্ত দেখিয়াছিলেন—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।'

পুণ্যভূমি ভারতের মাটিতে জন্মলাভ করে আমরা ধন্য। কবিকণ্ঠে উচ্চারিত ছন্দ আমাদের চিরকালের অনুধ্যানের বিষয়—

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।

জন্মভূমি ও জননীর সত্তা ভারতবাসীর কাছে অভিন্ন, এবং জননীর সত্তা জগজ্জননীরূপে পরিদৃষ্ট এবং অনুভূত সত্য। এই অনুভূতির মাধ্যমে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি তীর্থে তীর্থে আজও চিরজাগরূক।

প্রাবৃটে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

এত জল ব্রহ্মপুত্র-সিন্ধু-গঙ্গোত্রীর;
যমুনা-নর্মদা-তাপ্তি-কৃষ্ণা-কাবেরীর
বক্ষে তুমি ঢালি দাও অকৃপণ-হাতে!
এত বারি তব জল-প্রপাতে, প্রপাতে,
সপ্ত সমুদ্রের গর্ভে! হায়রে, আমারই
নয়নে ঢালিতে অনুরাগ-অশ্রু-বারি
তোমার কার্পণ্য এত। তব করুণায়
দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত পঙ্গু পার হ'য়ে যায়!
বোবাও সোচ্চার হয়! দস্যু ধরে বাঁশি!
শুষ্কলতা রাশি রাশি পুষ্পে ওঠে হাসি!
কৃপার পরশমণি তুমি না ছোঁয়ালে
আমার এ লৌহ স্বর্ণ হবে কোন কালে?
তোমার আষাঢ়-মেঘে এত জল! হায়,
ভরিয়া দিবে না আঁখি প্রেমাশ্রুধারায়?

উপনিষদে শক্তিতত্ত্ব ও শক্তিবাদ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে

২। শাক্ত উপনিষদে—শক্তিবাদ

(১) বহ্বৃচ উপনিষদ্—ঋগ্বেদীয়।

ইহাতে মন্ত্রসংখ্যা নয়টি মাত্র। সুধী পাঠকের রসাস্বাদনের জন্য সমগ্র উপনিষদ্‌খানিই উদ্ধৃত হইল।

ওঁ দেবী হ্যেকাগ্রে আসীৎ।…॥ ১ ॥ তস্যা এব ব্রহ্মা অজীজনৎ। বিষ্ণুরজীজনৎ। রুদ্রোঽজীজনৎ। সর্বে মরুদ্‌গণা অজীজনন্। গন্ধর্বাপ্সরসঃ কিন্নরা বাদিত্রবাদিনঃ সমন্তাদজীজনন্। ভোগ্যমজীজনৎ। সর্বমজীজনন্। সর্বং শাক্তমজীজনৎ। অণ্ডজং স্বেদজমুদ্ভিজ্জং জরায়ুজং যৎ কিঞ্চৈতৎ প্রাণিস্থাবরজঙ্গমং মনুষ্যমজীজনৎ ॥ ২ ॥ সৈষা পরা শক্তিঃ। সৈষা শাম্ভবী বিদ্যা কাদিবিদ্যা ইতি বা হাদি বিদ্যেতি বা…রহস্যম্। ওমোং বাচি প্রতিষ্ঠা ॥ ৩ ॥ সৈব পুরত্রয়ং শরীরত্রয়ং ব্যাপ্য বহিরন্তরবভাসয়ন্তী দেশকালবস্তুন্তরামঙ্গাম্মহাত্রিপুরসুন্দরী বৈ প্রত্যক্‌চিতিঃ ॥ ৪ ॥ সৈবাত্মা ততোঽন্যদসত্যমনাত্মা। অত এষা ব্রহ্মসংবিত্তির্ভাবাভাবকলাবিনির্মুক্তা চিদাদ্যাদ্বিতীয়া ব্রহ্মসংবিত্তিঃ সচ্চিদানন্দলহরী মহাত্রিপুরসুন্দরী বহিরন্তরনুপ্রবিশ্য স্বয়মেকৈব বিভাতি। যদস্তি সন্মাত্রম্। যদ্বিভাতি চিন্মাত্রম্। যৎপ্রিয়মানন্দম্ তদেতৎ সর্বাকারা মহাত্রিপুরসুন্দরী। ত্বং চাহঞ্চ সর্বং বিশ্বং সর্বদেবতা। ইতরৎ সর্বং মহাত্রিপুরসুন্দরী। সত্যমেকং ললিতাখ্যং বস্তু তদদ্বিতীয়মখণ্ডার্থং পরং ব্রহ্ম ॥ ৫ ॥ পঞ্চরূপপরিত্যাগাদস্বরূপপ্রহাণতঃ। অধিষ্ঠানং পরং তত্ত্বমেকং সচ্ছিষ্যতে মহৎ ॥ ৬ ॥ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মেতি বা অহং ব্রহ্মাস্মীতি বা ভাষ্যতে। তত্ত্বমসীত্যেব সম্ভাষ্যতে। অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি বা…ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি বা ॥ ৭ ॥ যোঽহমস্মীতি বা ভাষ্যতে সৈষা ষোড়শী শ্রীবিদ্যা পঞ্চদশাক্ষরী শ্রীমহাত্রিপুরসুন্দরী বালাম্বিকেতি বগলেতি বা মাতঙ্গীতি স্বয়ংবরকল্যাণীতি ভুবনেশ্বরীতি চামুণ্ডেতি চণ্ডেতি বারাহীতি তিরস্করিণীতি রাজমাতঙ্গীতি বা শুকশ্যামলেতি বা লঘুশ্যামলেতি বা অশ্বারূঢ়েতি বা প্রত্যঙ্গিরা ধূমাবতী সাবিত্রী সরস্বতী গায়ত্রী ব্রহ্মানন্দকলেতি ॥ ৮। ঋচো অক্ষরে পরমেব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিং ঋচা করিষ্যতি য ই তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ইত্যুপনিষৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র দেবীই একাকিনী অবস্থিতা ছিলেন।… ॥১॥ বিষ্ণু, রুদ্র, মরুদ্‌গণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, কিন্নর, বাদকগণ, সর্ববিধ ভোগ্য, মনুষ্য, স্থাবর জঙ্গম জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, সব কিছুই সেই দেবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শক্তি হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২ ॥ তিনিই পরাশক্তি এবং অপরাশক্তি। তিনি শাম্ভবীবিদ্যা, কাদিবিদ্যা, হাদিবিদ্যা, সাদিবিদ্যা ও রহস্যবিদ্যা নামে প্রখ্যাত। তিনিই সেই অক্ষরতত্ত্ব যাহা দ্বারা প্রণব প্রতিপাদিত হয়; তিনিই প্রণব-স্বরূপা; তিনিই প্রত্যেক প্রাণীতে বাক্‌রূপে অবস্থিতা ॥ ৩ ॥ তিনি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ে, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-শরীরত্রয়ে ব্যাপ্ত থাকিয়া তৎসমুদায় প্রকাশিত করেন। তিনি দেশকালবস্তুর সীমার ভিতরে থাকিয়াও তত্তদ্দ্বারা অস্পৃষ্টা মহাত্রিপুরসুন্দরী।

তিনিই প্রত্যেক জীবে চৈতন্যরূপে বর্তমান ॥ ৪ ॥ তিনিই আত্মাশব্দে অভিহিত হন; তিনি ব্যতীত অন্য সবই অসত্য ও অনাত্মা। তিনি ভাবাভাবকলাবিনির্মুক্তা ব্রহ্মবোধকারিণী চিদ্বিদ্যা, আবার তিনিই স্বয়ং ব্রহ্মসংবিত্তি-স্বরূপা, তথা নিখিল জীবজগতের বহিরন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শোভমানা একা অদ্বিতীয়া সচ্চিদানন্দলহরী মহাত্রিপুরসুন্দরী। তাঁহার অস্তি-ভাতি-প্রিয় এই রূপত্রয় সৎ, চিৎ এবং আনন্দের বোধক। এই প্রকার তিনি সর্বাকারা বিশ্বরূপিণী। তুমি, আমি, দেবতানিচয়, সমগ্র সংসার এবং সংসারেতর যাবতীয় যাহা কিছু আছে, তাহা এই দেবীত্রিপুরসুন্দরী। তিনিই একমাত্র সত্যতত্ত্ব অখণ্ড অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম ॥ ৫ ॥ নামরূপাত্মক পাঞ্চভৌতিক বিশ্ব প্রলয়গর্ভে বিলীন হইলে যে এক অদ্বিতীয় মহৎ অধিষ্ঠানতত্ত্বমাত্র অবশিষ্ট থাকে, ইনি তাহাই ॥ ৬ ॥ এই দেবীই "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", "অহং ব্রহ্মাস্মি, "তত্ত্বমসি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "অহং ব্রহ্মাস্মি", অথবা "ব্রহ্মৈবাহমস্মি" ইত্যাদি মহাবাক্যের দ্বারা নির্দেশিত হন ॥ ৭ ॥ এই পঞ্চদশাক্ষরী মহাদেবীই বালা, অম্বিকা, বগলা, মাতঙ্গী, স্বয়ংবরকল্যাণী, ভুবনেশ্বরী, চণ্ডা, চামুণ্ডা, বারাহী, তিরস্করিণী, রাজমাতঙ্গী, শুকশ্যামলা, লঘুশ্যামলা, অশ্বারূঢ়া, প্রত্যঙ্গিরা, ধূমাবতী, সাবিত্রী, সরস্বতী, ব্রহ্মানন্দকলা প্রভৃতি নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। ॥ ৮ ॥ যে অবিনাশী পরম আকাশে (সর্বব্যাপিনী এই চিদ্রূপা শক্তিতে) দেবতাবৃন্দ প্রতিষ্ঠিত আছেন, যাঁহাতে বেদচতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত, সেই পরম আকাশকে (সর্বব্যাপিনী ব্রহ্মরূপা পরা শক্তিকে) যিনি সম্যক্‌রূপে জানেন না (যিনি আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করেন নাই), শুধুমাত্র বেদবিহিত কর্ম দ্বারা বা বেদবিদ্যা দ্বারা তিনি কি ফল প্রাপ্ত হইবেন? পরন্তু যিনি সেই পরম আকাশকে (চরম সত্যকে) উপলব্ধি করেন, তিনি অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁহাতেই ব্যাপকভাবে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। ॥ ৯ ॥

(২) **দেব্যুপনিষদ্** —অথর্ববেদীয়। ইহাতে মোট মন্ত্রসংখ্যা ৩২, তন্মধ্যে ২৮টি মন্ত্রে দেবীর স্বরূপ বর্ণিত, মাহাত্ম্য কথিত ও স্তোত্রপ্রণামাদি বিহিত আছে। অবশিষ্ট ৪টি মন্ত্র জপ, পুরশ্চরণ এবং ফলশ্রুতি-বিষয়ক।

দেবতাবৃন্দ দেবীকে তাঁহার স্বরূপজ্ঞান জানিবার প্রার্থনা জানাইলেন; তদুত্তরে দেবী বলিলেন—"অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতি-পুরুষাত্মকং জগৎ, শূন্যঞ্চাশূন্যঞ্চ। অহমানন্দা নানন্দাঃ। বিজ্ঞানাবিজ্ঞানেঽহম্। ব্রহ্মাব্রহ্মণী বেদিতব্যে ॥ ২ ॥ অহং পঞ্চভূতান্য-পঞ্চভূতানি। অহমখিলং জগৎ। বেদোঽহমবে-দোঽহম্। বিদ্যাহমবিদ্যাহম্। অজাহমনজাহম্। অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ তির্যক্ চাহম্ ॥৩॥ অহং রুদ্রেভি-র্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥৪॥ অহং সোমং ত্বষ্টারং পূষণং ভগং দধাম্যহম্। বিষ্ণুমুরুক্রমং ব্রহ্মাণমুত প্রজাপতিং দধামি ॥ ৫ ॥ অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে। অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসুনা-মহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্ ॥ ৬ ॥ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে। য এবং বেদ স দেবী-পদমাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

ভাবানুবাদ—আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী। আমা হইতেই প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। শূন্যাশূন্য, আনন্দানন্দ, বিজ্ঞানা-বিজ্ঞান সবই আমি। আমি ব্রহ্ম তথা ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ। আমিই অপঞ্চীকৃত তথা পঞ্চীকৃত মহাভূত; পরিদৃশ্যমান জগৎ আমারই স্থূল মূর্তি। বিদ্যাবিদ্যা, বেদাবেদ, অজানজা

অধোধ্বর্ তির্যগাদি দিক সবই আমি হইয়াছি। (সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মারূপে) আমিই রুদ্র, বসু, আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি। মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, সোম, ত্বষ্টা, পূষা, ভগ, উরুক্রম বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং প্রজাপতি আমার দ্বারাই বিধৃত। আমিই যজমানের জন্য প্রচুর হবির্যুক্ত সোম-যাগাদির কালান্তর ফলপ্রসূ দ্রবিণকে ধারণ করিয়া রাখি। আমি ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয়া অধিশ্বরী ও ধনদাত্রী। আমি জগৎপিতারও জননী। ‡ জগৎপিতারও উপরে আনন্দময় কোষের অভ্যন্তরস্থ বিজ্ঞানময় কোষে আমার কারণশরীর অবস্থিত; যিনি আমাকে এইভাবে জানেন তিনি আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হন।

মন্ত্র ৮-১১ —প্রণামমন্ত্র

মন্ত্র ১২—দেবীগায়ত্রী ইত্যাদি।

(৩) **সৌভাগ্যলক্ষ্মী উপনিষদ্** — ঋগ্বেদীয়। তিন খণ্ডে বিভক্ত; মন্ত্রসংখ্যা ৪১। এই উপনিষদে এই দেবীকে তুরীয়াতীতা বলা হইয়াছে। যথা—"তুরীয়রূপাং তুরীয়াতীতাং সর্বোৎকৃষ্টাং সর্বমন্ত্রাসনাগতাং (১।২), বাকী সমস্ত উপনিষদ্খানি দেবীর মূর্তি, ধ্যান, জপ, পুরশ্চরণ, পীঠবর্ণন, এবং যোগসাধন-প্রণালী প্রভৃতির বিবরণপূর্ণ।

(৪) **ত্রিপুরা উপনিষদ্**, —ঋগ্বেদীয়। মন্ত্রসংখ্যা ১৭। এই দেবী যাবতীয় সৃষ্ট স্থাবরজঙ্গমাত্মক জীবজগতে অনুপ্রবিষ্ট। সর্ববিধ শক্তির উৎস, শিবের সহিত একাত্মভূতা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধাত্রী, মহামোক্ষপ্রদায়িনী মূলা বিদ্যা, চিৎশক্তিরূপে উপদিষ্টা হইয়াছেন।

ত্রিপুরা নামের তাৎপর্য —

তিস্রঃ পুরাস্ত্রিপথা বিশ্বচর্ষণা অত্রাকথা অক্ষরাঃ সন্নিবিষ্টাঃ। অধিষ্ঠায়ৈনা অজরা-পুরাণী মহত্তরা মহিমা দেবতা নাম ॥ ১ ॥ ইনি কল্পিত ব্যষ্টি সমষ্টি ভেদযুক্ত স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণরূপ ত্রিপুর (ত্রিবিধ সৃষ্টিরূপে, অথবা ত্রিবিধ শরীর-রূপে) বিরাজিতা; দেবযান-পিতৃযানাদি-ভেদে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড দ্বারা লভ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রজ্ঞানরূপে ত্রিবর্ত্মাকারে কল্পিতা; "অকাদি শ্রীপীঠ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে শ্রীচক্রে অ হইতে ক্ষ পর্যন্ত অক্ষরে সন্নিবিষ্টা। এই ত্রিপুর, ত্রিবর্ত্ম এবং এই অক্ষরসকল জীব-ঈশ্বর প্রত্যগাত্মাতে অধিষ্ঠিত করিয়া মহামহি-মময়ী সৃষ্ট্যাদি-সামর্থ্যরূপিণী ত্রিবিধ শরীরাদি হইতে বিলক্ষণ জরাবিহীনা নিত্যসনাতনী সর্বোত্তমা চিৎ-শক্তিরূপে বিরাজমানা আছেন।

পরিভূতা হবিষা ভাবিতেন প্রসঙ্কোচে গলিতে বৈমনস্কঃ। শর্বঃ সর্বস্য জগতো বিধাতা ধর্তা হর্তা বিশ্বরূপত্বমেতি ॥ ১৫ ॥

নিষ্কামবুদ্ধিতে এই চিচ্ছক্তির ধ্যানোপাসনা করিলে ইনি জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রজ্ঞানরূপ হবি-দ্বারা পরিতৃপ্তা ও প্রসন্না হইয়া সাধকের বিক্ষেপরূপ আবরণ বিগলিত করিয়া দিয়া, তাহার আত্ম-স্বরূপে প্রকটিতা হন। এই প্রকারে সাধক অজ্ঞানদৃষ্টিজাত কল্পিত প্রপঞ্চ হইতে বিমনস্ক হইয়া নিখিল বিশ্বের বিধাতা ধর্তা ও হর্তা শিবের সহিত বিশ্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়া (অনন্ত-ব্যাপী আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া) কৃতকৃত্য হয় ॥

(৫) **সরস্বতীরহস্যোপনিষদ্** — ঋগ্বেদীয়। দেবী সরস্বতী ব্রহ্মের অদ্বৈতা শক্তি, "অদ্বৈতা ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ" (১০)। ইনি "অন্তর্যাম্যাত্মনা বিশ্বং ত্রৈলোক্যং যা নিযচ্ছতি রুদ্রাদিত্যাদিরূপস্থা" (১৯), অন্তর্যামি-রূপে, (বিশ্বশক্তিরূপে মাত্র নহে, বিশ্বনিয়ন্তা-রূপেও) লোকত্রয় (স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণরূপ ত্রিবিধ

‡ এই অংশটি 'সাধনসমর' হইতে গৃহীত

সৃষ্টি) নিয়ন্ত্রিত করেন, তথা রুদ্র-আদিত্যাদি-রূপে অধিষ্ঠিতা আছেন (এখানে 'রুদ্রাদিত্য' শব্দটি উপলক্ষণে ব্যবহৃত, অতএব 'রুদ্রাদিত্য' অর্থে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড বুঝিতে হইবে)। ইনি 'নির্বিকল্পাত্মনাব্যক্তা।' (২৫), নির্বিকল্প অব্যক্তও ইনি। ইহাকে ব্রহ্মসংবিত্তিরূপে উপলব্ধি করিয়া সাধক বা যোগী সর্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়া সেই ব্রহ্মসংবিত্তিস্বরূপ পূর্ণোম্মুক্ততোরণ-মার্গ দিয়া পরমপদে প্রবিষ্ট হয়।—"যাং বিদিত্বাখিলং বন্ধং নির্মথ্যাখিলবর্ত্মনা যোগী যাতি পরং স্থানং" (৩১)।

এই মন্ত্রগুলি হইতে আমরা দেখিতেছি, শ্রুতি বলিলেন যে, দেবী সরস্বতী বা জ্ঞানরূপিণী শক্তিই অদ্বৈতা ব্রহ্মশক্তি, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী। শ্রুতি সেই শক্তির অভিব্যক্তির পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, এই শক্তি একাধারে দ্বিবিধ মূর্তিতে প্রপঞ্চলীলা সম্পাদন করেন। এক-রূপে তিনি স্বয়ং বিশ্বজগৎরূপে অভিব্যক্ত, এইটি তাঁহার বাহ্যমূর্তি (ভূমিকায় "শক্তিই বিশ্বজগৎমূর্তিতে প্রকটিতা" দেখুন); আবার ইনিই অন্তর্যামিরূপে বিশ্বজগতের নিয়ন্তা,—এখানে শক্তির মূর্তি অর্ধনারীশ্বর। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড যে জ্ঞানেই বিধৃত এবং জ্ঞান দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত তাহা সর্ববাদিসম্মত। একই সত্তা কখনো জ্ঞানরূপে, আবার কখনও বা শক্তিরূপে, আবার কখনও বা উভয়াত্মকরূপে অভিব্যক্ত হয়, ইহাই এই শ্রুত্যুক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য।

শাক্তোপনিষদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ হইল। লীলান্তরে যে শক্তিই সর্বেসর্বা—এ বিষয়ে ব্রাহ্ম ও শাক্ত উভয় শ্রেণীর উপনিষদ্‌ই একমত। নিত্যস্তরে শক্তির বর্তমানতা সম্বন্ধে একমাত্র মহোপনিষদ্ ব্যতীত অন্য সমস্ত ব্রাহ্মোপনিষদ্ নীরব। মহোপনিষদে ব্রহ্মের চিৎ-স্বরূপতার প্রাধান্য বিবৃত। শক্তি-উপাসনা দ্বারা হিরণ্যগর্ভলোক (প্রচলিত ভাষায় ব্রহ্ম-লোক, শৈবভাষায় শিবলোক, বা কৈলাস এবং বৈষ্ণবীয় ভাষায় বৈকুণ্ঠ) প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ক্রমমুক্তি লাভ হয়, ইহা ব্রাহ্মোপনিষদ্-স্বীকৃত। শাক্তোপনিষদের মধ্যে বহ্বৃচ, দেবী ও সৌভাগ্যলক্ষ্মী—এই তিনখানিতে শক্তিকেই চরম তত্ত্ব বলা হইয়াছে ; অন্যান্যগুলিতে শিব বা ব্রহ্ম স্বীকৃত হইলেও শক্তিরই সর্বকারিতা ঘোষিত। পরামুক্তি পর্যন্তও ব্রহ্মসংবিত্তিরূপে শক্তি, সাধককে মোক্ষ-মন্দিরে প্রবেশ করাইয়া দেন। এই সব হইতে ধারণা হয়, তুরীয় অবস্থাতে যে ভূমানন্দস্বরূপ একাত্মপ্রত্যয়সার-বোধের কথা আছে, তাহাকে নির্গুণ ব্রহ্মের বা নির্গুণা শক্তির সহিত নিজের অদ্বয়ানুভূতি —দুই-ই বলা যাইতে পারে।

চরম সত্য যে কি, তাহা কোনও ভাষা দিয়া প্রকাশ করা যায় না, মনে ধারণা করা যায় না ; শ্রুতি বলিতেছেন, সে তত্ত্ব "অচিন্ত্য অব্যপদেশ্য", "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদি। যে ভাষা যুঁই ফুল ও বেলফুলের গন্ধের পার্থক্যটুকুও প্রকাশ করিতে অক্ষম, মনাতীত সত্যকে প্রকাশ সে করিবে কিরূপে ? ভাষা ও মন মনাতীত সত্তার নাগালই তো পায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে, সেখান হইতে বহু নীচে নামিয়া আসিয়া তবে কথা বলা সম্ভব হয়। একদিন তাঁহার সন্ন্যাসী সন্তানগণের কয়েকজন (তখন সব স্কুল-কলেজে পড়েন) তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া-ছিলেন যে, চরম সত্যের সহিত একত্বানুভূতির কথা তাঁহাদের নিকট বলিতে হইবে। শ্রীরাম-কৃষ্ণ উহা বলিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিয়াও অসমর্থ হইয়া সস্নেহে বলিয়াছিলেন যে, উহা সম্ভব নয়।

কাজেই প্রত্যক্ষদর্শীরা, ঋষিরা উপনিষদে

যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আভাসে-ইঙ্গিতে যতটুকু বলা সম্ভব, তাহাই মাত্র। আমরা দেখিলাম, তাঁহারা চরম সত্যকে নির্গুণ ব্রহ্মও বলিয়াছেন, নির্গুণা শক্তিও বলিয়াছেন। ইহা লইয়া বাদ-বিতণ্ডায় কোন লাভ নাই;—নিজ নিজ রুচিমতো সেই চরম সত্যকে 'মা' বলিয়া ডাকিয়াই হউক, অথবা নিজেরই স্বরূপজ্ঞানে ধ্যান বা বিচার করিয়াই হউক—বাক্যমনাতীত সেই সত্যলাভের পথে অগ্রসর হইবার জন্য যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, লাভবান হইবে সেই-ই।

তুমি আর আমি

শ্রীভিখারীশঙ্কর রায়চৌধুরী

আমি তরঙ্গ, তুমি মাগো নদী
হাসি খেলি কলতানে,
অনিবার তুমি টানিছো আমারে
অসীম সিন্ধুপানে।

আমি যে কমল, তুমি মাগো দীঘি
তোমারি অঙ্কে ঠাঁই,
পঙ্কের মায়া তুচ্ছ করিয়া
তোমার মহিমা গাই।

তুমি তরুবর, আমি যে পুষ্প,
তোমার শাখায় দুলি
আমি যে ধন্য, পরিণতি মোর
তোমার চরণ-ধূলি।

বিরাট বিশ্ব তোমারই প্রতিমা
আমি সেথা ধূলিকণা,
তুমি অনন্ত, আমি যে সান্ত,
করো মা নির্বাসনা।

সুদীর্ঘ পথ তোমারই প্রতীক,
পথিক আমি যে মাগো,
তুমিই লক্ষ্য এ মরু-জীবনে
ধ্রুবতারা সম জাগো।

নিত্যানন্দময়ী যে মা তুমি
আমি যে কান্না-হাসি,
জীবনমৃত্যুঘেরা খেলাঘরে
বারে বারে যাই আসি।

সন্তান আমি, তুমি গো জননী,
খেলি তব স্নেহছায়ে,
চিরতরে ভাঙি' এই খেলাঘর
তুলে নিও রাঙা পায়ে॥

শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত-বাণী

স্বামী জীবানন্দ

বাণী তাকেই বলা যায় যা কর্ণে প্রবেশ ক'রে মর্ম স্পর্শ করে ; যা মানুষকে শুভ চিন্তা করতে শেখায়, সৎকর্মে উদ্দীপনা দেয়। আর তা-ই হ'ল অমৃত-বাণী যা অমৃতত্ব-লাভের সন্ধান প্রদান করে। যে বাণী আত্মার অবিনশ্বরত্ব, শুদ্ধত্ব, বুদ্ধত্ব, আনন্দস্বরূপত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দিয়ে পরমানন্দ-প্রাপ্তি ঘটায় তাকেই বলে অমৃত-বাণী।

সারাদিনে যে সব কথা কর্ণগোচর হয়, তা বাণী নয়, অমৃত-বাণী তো নয়ই। যদিও সাধকের কণ্ঠে গীত হয়েছে, 'যাহা শুনি কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে।' কিন্তু এ হ'ল অনুভূতিমান মাতৃভক্ত সিদ্ধমহাপুরুষের হৃদয়-নিঃসৃত সঙ্গীত-সুধা—সংসারের সাধারণ মানুষের সাধারণ কথা নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অমৃত বাণী। এ বাণী শ্রবণমঙ্গল, শ্রুতিসুখকর, কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হ'লে কল্যাণ হবেই। এ বাণী সন্তপ্তদিগের জীবনে, অনিত্য জগতে শোক-তাপ-জ্বালা-যন্ত্রণা-অশান্তির অনলে দগ্ধ মানুষের প্রাণে সর্বকলুষ-হারী শান্তিবারি! শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত-বাণী মহামন্ত্র, মনন করলে মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে, ভবভয় দূর করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শিখিয়েছেন সীমার মধ্য দিয়ে অসীমকে স্পর্শ করতে, অল্পের মাধ্যমে ভূমাকে উপলব্ধি করতে, প্রত্যক্ষের ভিতর দিয়ে পরোক্ষের পরিচয় লাভ করতে, নিকটের মধ্যে সুদূরের আহ্বান শুনতে, নিরর্থকের মধ্যে সার্থককে আবিষ্কার করতে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিটি উক্তিই সরস—রসের নির্ঝরিণী। তাঁর কথা কাব্যধর্মী। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।' রসাত্মক বাক্যই কাব্য। 'রসো বৈ সঃ'—তিনি রসস্বরূপ। সেই রস-স্বরূপ, পরম আনন্দস্বরূপকেই নানা সরস উক্তি ও কাহিনীর মাধ্যমে বুঝিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ভাষায় স্বচ্ছতা, তীক্ষ্ণতা, গতিশক্তি, প্রাণশক্তি, দিব্যানুভূতি।

পাঁচখণ্ড 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে' শ্রীরামকৃষ্ণের যে বাণী আমরা পাই তার বেশির ভাগই যথাযথ সংরক্ষিত (recorded) হয়েছিল লেখকের diary-তে। লেখক নিজেকে অলক্ষ্যে রেখেছেন ; অনেক স্থলে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন ; 'মাষ্টার', 'শ্রীম', 'ভক্ত' ইত্যাদি তাঁর ছদ্ম নাম. যেখানে নিজেকে যত প্রচ্ছন্ন রাখা যায়, যেখানে 'ক্ষুদ্র অহং' যত গোপনে থাকে, সেখানে মহিমার প্রকাশ তত বেশি। বিশ্বস্রষ্টা এত সুন্দর এই জগৎসৃষ্টি ক'রে সকলের মাঝে নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রেখেছেন. তাইতো তাঁর এমন মহিমা! শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচুর স্নেহ ভালবাসা পেয়েও লেখকের একটুও অহঙ্কার অভিমান হয়নি। আবার কিছুই গোপন করেননি শ্রীম ; যখন বকুনি খেয়েছেন, উপহসিত হয়েছেন, তাও লিখে রেখেছেন। 'কথামৃতে' স্থান, কাল, পাত্র সবই উপস্থাপিত, পরিবেশ সুন্দরভাবে চিত্রিত। শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী সন-তারিখসহ লিপিবদ্ধ। সাল, তারিখ—ইংরেজী বাংলা, দিন ক্ষণ তিথি, বিশেষ ঘটনা সমস্তই উল্লিখিত—মনোজ্ঞ বর্ণনা, সবই নিখুঁত। কোন প্রকার সংশয়েরই অবকাশ নেই।

লেখকের স্বকীয় চিন্তাধারা যেখানে ভাষারূপ পেয়েছে, সেখানে পাঠকের উপর প্রভাব বিস্তারের আদৌ প্রচেষ্টা নেই, সহজ সরল-ভাবে নিজস্ব ভাবই সুপরিস্ফুট হয়েছে। পাঠকের মনে 'কথামৃত'-পাঠকালে এমন একটি ভাব জাগে যেন তিনিও তদানীন্তন শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন, অপরের সঙ্গে তাঁকেও উদ্দেশ ক'রে 'কথামৃত' পরিবেশিত। আমরা যারা 'কথামৃত' পাঠ করি বা শুনি, তারাও যেন সেই পরিবেশের মধ্যে তাঁর শ্রীমুখের অমৃতময়ী বাণী শুনছি, আমাদের উদ্দেশ করেও যেন শ্রীরাম-কৃষ্ণ এই সব সুন্দর সুন্দর কথা বলছেন, তাই হৃদয় মন তাঁর ভাবে অভিভূত হয়, আর জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবিয়ে তোলে, যার উদ্দেশ্য হ'ল ভগবানলাভ- আত্মানুভূতি। 'কথামৃতে' বার বার এ কথারই প্রতিধ্বনি।

যে প্রশ্ন অহরহ সকলেরই মনে উদিত হয়, যে-সব সমস্যা কোন-না-কোন সময়ে অধিকাংশ মানুষেরই জীবনে দেখা দেয় এবং যেগুলির সমাধান করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, সে-সব বিষয়ের অবতারণাও 'কথামৃতে' যথেষ্ট আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সরস উক্তিগুলি অতি সুন্দরভাবে লিখিত হয়েছে; 'কথামৃত' যত পাঠ করা যায় ততই ভাল লাগে, পড়া হয়ে গেলেও পুরানো হতে চায় না। আজ পাঠ ক'রে এক রকম মানে বোঝা গেল, কাল পাঠ করে আবার আর এক রকম নতুন আলো পাওয়া যাবে। তার উপর পাঠের পর অনুধ্যান করলে প্রতিটি উপদেশের গভীর মর্মার্থ উপলব্ধি হ'তে থাকবে। নিত্য নব নব আলোকবর্ষী শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী। 'কথামৃতের' স্বাধ্যায় নিত্যই প্রয়োজন। স্বাধ্যায়ের পর যেটি পড়া হ'ল সেটি নিয়ে একাগ্রভাবে চিন্তা করতে হবে, তাতে যে অমৃতের আস্বাদ উপলব্ধি হ'তে থাকবে তার কাছে অন্য জিনিস অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাবে। 'কথামৃত'-পাঠ বা শ্রবণের সময় শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যমূর্তি যেমন আমরা ফটোয় দেখি, আমাদের চিত্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তখন শ্রীভগবানের জ্যোতির্ময় রূপ আমাদের চিত্তে, তাঁর অমৃত-নিস্যন্দী বাণী আমাদের কর্ণে! কী সুন্দর! যতই শোনা যায় মধু মধু মধু—মধুরং মধুরং মধুরম্।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে কতকগুলি সার্বভৌম, কতকগুলি ব্যক্তিগত। সার্বভৌম বাণীগুলি সর্বদেশে সর্বকালে সকলের কল্যাণের জন্য। ব্যক্তিগত বাণীগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন প্রযুক্ত হয়েছে, অনুরূপ ক্ষেত্রে অনুসৃত হ'লে অত্যন্ত কঠিন সমস্যারও সহজ সরল সমাধান পাওয়া যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আদ্যাশক্তি জগজ্জননীরই বাণী। লীলাময়ী মা-কালী যুগ-প্রয়োজনে তাঁর বিশুদ্ধসত্ত্ব শরীরকে অবলম্বন ক'রে কী অপূর্ব মাধুর্যময়ী লীলা করেছেন! শ্রীরামকৃষ্ণ যা কিছু করেছেন, সবই মায়ের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে। তিনি বলেছেন: "আমি কিছু জানি না, তবে এসব বলে কে? আমি বলি, 'মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরনী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন চালাও তেমনি চলি; নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।' তাঁরই জয়; আমি কেবল যন্ত্র মাত্র।"

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে দেখা যায় অজস্র উপমা। উপমা অর্থালঙ্কার। উপমা হ'ল একরূপ গুণসম্পন্ন ভিন্নজাতীয় দুটি বস্তুর সাদৃশ্য কথন। সাধারণ লোকের ধারণা উপমা কবিদের বিলাস। উপমা-প্রয়োগে সাহিত্যিক ও কবির নৈপুণ্যের প্রকাশ। উপন্যাসেও এর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যদিও কাব্যের মতো উপন্যাসে প্রয়োগ-বাহুল্য নেই। ধর্মের

ক্ষেত্রে, শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বোঝাতে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রয়োগ করেছেন উপমা, ঝকঝকে সার্থক উপমা। আধ্যাত্মিকতার কঠিন বিষয়, শাস্ত্রের অতি দুর্বোধ্য জটিল বিষয় সহজ সরল মনোজ্ঞ উপমার প্রয়োগে অতি প্রাঞ্জল সহজবোধ্য হয়ে ফুটে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যেকটি উপমা বাস্তবধর্মী, একটিও কাল্পনিক নয়।

যে-কোন দুরূহ বিষয় বোঝাতে শ্রীরামকৃষ্ণ অতি সাধারণ জিনিসের উপমা দিয়েছেন—যা আমাদের জানাশোনা, ঘরের জিনিস। যে-সব জিনিস আমরা হয় দেখেছি, নয় যে-সকলের কথা শুনেছি, সে-সব তাঁর উপমার জিনিস। একটিও উপমা অপরিচিত নয়, অজানা নয়, আমাদের ঘরে বাইরে যা যা ছড়িয়ে আছে।

যোগীর চক্ষু কেমন? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝিয়েছেন—যখন পাখী ডিমে তা দেয়, তখন তার চোখ দুটি যেমন। কী অপূর্ব সার্থক উপমা!

ভক্তের কথা বলতে গিয়ে উপমা দিয়েছেন শুকনো দেশলাই-এর। শুকনো দেশলাই একটু ঘসলেই জ্বলে ওঠে, আগুন বেরোয়। প্রকৃত ভক্ত যিনি, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হলেই—ভগবানের কথা শুনলেই তাঁর উদ্দীপনা হয়।

মানুষের মন যখন সংসারের বিষয়ে ছড়িয়ে পড়ে তখন তার সঙ্গে কিসের উপমা দেওয়া যায়? বড় সহজ কথা নয়। এ যেন মনোবিজ্ঞানের বড় কঠিন প্রশ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ অতি সহজ উপমা দিয়েছেন। বলেছেন মানুষের ছড়িয়ে-পড়া মন যেন খুলে-দেওয়া সরষের পুঁটলি। সরষের পুঁটলি খুলে ফেললে যেমন সমস্ত সরষে একসঙ্গে ক'রে আবার পুঁটলিবাঁধা কঠিন ব্যাপার, তেমনি সংসারের নানা বিষয়ে ছড়িয়ে-পড়া মনটিকে গুটিয়ে এনে ভগবানের পাদপদ্মে দেওয়া, তাঁর চিন্তায় তন্ময় হওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। অতুলনীয় এ উপমা!

সংসারে সব কাজের মধ্যে, নানা ঝামেলার মধ্যে, দুঃখ দারিদ্র্য অভাব অভিযোগ শোক তাপ জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে অবস্থান করেও কিভাবে ভগবানের পাদপদ্মে মন রাখতে হবে তা নানাভাবে বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। সংসারে আনন্দ ও বেদনা পাশাপাশি। কখনো হাসি, কখনো কান্না। কখনো পূর্ণিমার আলো, আবার কখনো অমানিশার অন্ধকার। নানা ধরনের উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণ, যদি শোকদুঃখপ্রপীড়িত মানুষের মনে কোন একটি ঠিক ঠিক লেগে যায় তো জীবন মধুময় হয়ে যাবে। বলেছেন—সংসারে থাকতে হবে পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকাল মাছের উপমা দিয়েছেন। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে কিন্তু গায়ে পাঁক লাগে না। পাঁক মানে আবিলতা মলিনতা। মালিন্যের মধ্যে থেকেও মালিন্য থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা, অনাসক্ত অসংপৃক্তভাবে অবস্থান করা। গীতার ভাষায় 'পদ্মপত্রমিবাম্ভসা'। কারও দৃষ্টি হয়তো পাঁকাল মাছের উপর প'ড়ল, দেখামাত্রই হয়তো মনে হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণদেব তো বলেছেন পাঁকাল মাছের মতো থাকতে, সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগল নির্লিপ্ততা-অভ্যাসের সঙ্কল্প। জানা-শোনা-দেখা জিনিসের উপমা তাই—এত চমৎকার, জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপরিহার্য এর শক্তি। অচিন্তনীয় এর মহিমা।

সংসারী লোকদের বলেছেন, সংসারে থাক বড় মানুষের দাসীর মতো। মনিবের বাড়ীর সব কাজ করেও কিন্তু দাসীর মন পড়ে থাকে নিজের দেশে, তেমনি সংসারে অজস্র কর্ম ক'রেও ভগবানের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখতে বলেছেন। আরও কত দৃষ্টান্ত! হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গা, পশ্চিমে মেয়েদের কথা বলতে বলতে পথ চলা, মাথায় বাসন নিয়ে

নর্তকীর নৃত্য—এমনি সব। যে-কোন একটি মনে রাখতে পারলেই হ'ল, সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, জীবনের গতি পরিবর্তিত হবে। সকল কর্মের মধ্যে অনাসক্তির অভ্যাস আর ঈশ্বরের স্মরণ-মনন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মায়ার আবরণশক্তি বুঝিয়েছেন অভিনব উপায়ে। পানাপুকুরে ঢাকা জলের উপমা দিয়ে, দুর্বোধ্য জিনিসটি অতি সহজবোধ্য করেছেন, পানা ঠেইয়ে দিলেও আবার ফিরে এসে জল ঢেকে ফেলে; ব্রহ্মের স্বরূপও তেমনি আবৃত হয়ে আছে মায়ার আবরণশক্তিতে, বারবার সরাতে চেষ্টা করলেও সরতে চায় না। একেবারে হটিয়ে দিতে না পারলে পানাও যায় না, মায়াও যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানীর উপমা দিয়েছেন পোড়া দড়ির সঙ্গে। দড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আকারটি শুধু দেখা যাচ্ছে। পোড়া দড়িতে বন্ধনের কাজ হবে না। জ্ঞানের অনলে সব অভিমান অহংকার দগ্ধ হয়ে গেছে, জ্ঞানীর শরীরটি আছে কিন্তু তার দ্বারা জগতের অহিত হবে না কোন দিন।

উপমার মতো শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পগুলিও অতি সুন্দর। সবই জানা শোনা দেখা জিনিস নিয়ে। প্রতিটি গল্প যেন হীরকখণ্ডের মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে 'কথামৃতে'। অতি দুর্বোধ্য বিষয়বস্তু জলের মতো সোজা হয়ে গেছে গল্পের মাধ্যমে, ছোট ছেলেও বুঝতে পারে। আবার বলার ভঙ্গিতে গল্পগুলি অন্তরস্পর্শী। এক একটি গল্প যেন যীশুখৃষ্টের এক একটি 'parable'। যীশুখৃষ্ট গল্প ব'লে ব'লে যেমন উচ্চতত্ত্ব পরিবেশন করতেন, শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি সরস গল্পের মাধ্যমে শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করেছেন। 'কথামৃতে'র গল্পের কথা মনে হ'লেই বাইবেলের গল্পের বিষয় মনে হয়। আবার অনেক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের গল্পগুলির প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থের ছোট ছোট গল্পের কথাও স্মৃতিতে জাগে।

কথামৃতের অতুলনীয় গল্পগুলি হৃদয় মন অধিকার ক'রে থেকে চরম কল্যাণের পথ দেখায়। হাতি-নারায়ণ আর মাহুত-নারায়ণ, রামের ইচ্ছা, বিষ না ঢেলে ফোঁস করা, বহুরূপী, অন্ধের হাতি দেখা, আঁশ চুপড়ির গন্ধ, একই গামলায় নানা রঙে কাপড় ছোপানো, কাপড়ের খুঁটে রামনাম লেখা, খবরের কাগজে বাড়ী ভাঙার কথা, গভীর বনে শবসাধনা, গুরুর ঔষধে শিষ্যের সংসারের স্বরূপ-জ্ঞান, কেশব কেশব গোপাল গোপাল হরি হরি হর হর, চার বন্ধুর পাঁচিলে ওঠা, খানা কেটে জল আনা, চিলের মুখে মাছ, ছাগলের পালে বাঘ, ছোট ছেলের ভোগ দেওয়া, মধুসূদন দাদা, মাস্তুলে পাখি বসা, ঢেঁকিতে চিড়ে কোটা, কৌপীনকা ওয়াস্তে, লাঙ্গল-হেলেগরু-ওয়ালা ভাগবতের পণ্ডিত, যার ভিতর গণেশের ব্রহ্মাণ্ড দেখা, বনের পথে তিন ডাকাত, পদ্মলোচনের শাঁখ বাজানো প্রভৃতি গল্প—প্রত্যেকটি অনুপম এবং বৈশিষ্ট্যে অনন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি গল্প অনুধ্যান করলে প্রশ্ন জাগে, আখ্যায়িকায় বর্ণিত মুখ্য চরিত্রটি কাকে লক্ষ্য ক'রে? মনে হয়, যিনি কাহিনী পরিবেশন করেছেন, তিনিই যেন গল্পের নায়ক। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের 'বহুরূপী' গল্পটি প'ড়ে মনে প্রশ্ন ওঠে—কে এই গাছতলার মানুষ, যিনি বহুরূপীকে দেখেছেন নানা রঙ ধরতে, আবার দেখেছেন তার কোন রঙ নেই? নিজের মনেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে—যিনি এই সংসাররূপী বৃক্ষের তলে

উপবেশন ক'রে ঈশ্বরকে নানা মত ও পথের মাধ্যমে উপলব্ধি ক'রে ঘোষণা করছেন—ঈশ্বর সাকার, নিরাকার আবার সাকার-নিরাকারের পার, সেই সর্বধর্মসমন্বয়কারী সর্বদ্বন্দ্ব-নিরসনকারী শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং হচ্ছেন 'গাছ-তলার মানুষ'।

আর সেই অদ্ভুত রঞ্জক, যাঁর কাছে অদ্ভুত পাত্র, সাদা কাপড় ডোবালেই যে-কোন রঙে ছুপবে। কে সেই রঞ্জক? শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং নয় কি? তাঁর সর্বসংস্কারবিমুক্ত শুদ্ধসত্ত্ব মন। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত যে ভাবেরই সাধক আসুন না কেন, তাঁর কাছ থেকে নিজ নিজ ভাব পেয়ে শান্তচিত্তে সাধনপথে অগ্রসর হচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূত সত্য বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শ্রীমুখ থেকে। তাঁর বহু উপদেশের সঙ্গে মিল রয়েছে এমন সব শ্লোক পাওয়া যাবে শাস্ত্রগ্রন্থে—বেদে, পুরাণে, রামায়ণ-মহাভারতে, তন্ত্রে বা অন্যত্র। আবার বাইবেলে, কোরানে ও বৌদ্ধ জৈন গ্রন্থ প্রভৃতিতে তাঁর বাণীর সমার্থক বা অনুরূপ বাণীও মেলে। হয়তো নানক, কবীর, চৈতন্য-দেব ও শঙ্করাচার্য বা অন্য কোন মহাপুরুষের বাণীর সঙ্গে তাঁর কোন কোন উপদেশের মিল পাওয়া যাবে।

এখন আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি অমিয়-বাণীর আলোচনায় দেখব শাস্ত্রবাণীর সঙ্গে সেগুলির কী সুন্দর মিল! শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন: জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথাই রয়েছে ছন্দোবদ্ধ হয়ে:

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: দেখলাম সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছে সব আসছে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে। যেমন এই কালীবাড়ীতে আসতে হ'লে কেউ নৌকায়, কেউ গাড়ীতে, কেউ বা হেঁটে আসে। ভিন্ন ভিন্ন সব নদী নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে সব এক।

শিবমহিম্নঃস্তোত্রের একস্থলে এই ভাবটি পরিস্ফুট:

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাম্।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥

শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত-বাণী: এক পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে। হিন্দুরা কলসী ক'রে এক ঘাটে জল নিচ্ছে—বলছে 'জল'। মুসলমানেরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে—বলছে 'পানি'। খৃষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে—বলছে 'ওয়াটার'। যদি কেউ বলে এটা জল নয়, 'ওয়াটার'; কি ওয়াটার নয়, 'পানি'; কি পানি নয়, 'জল'; তাহ'লে হাসির কথা হয়ে পড়ে। ধর্ম নিয়ে দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া, লাঠালাঠি, মারামারি, কাটাকাটি—এ সব ভাল নয়।

ঋগ্বেদের মন্ত্রে এই ভাবটি বিদ্যমান:

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো
দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং
যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: জ্ঞানী দেখে—অন্তরে বাহিরে সেই পরমাত্মা। যেমন অনন্ত সমুদ্র, জলের অবধি নাই। উপরে নীচে, সম্মুখে পিছনে, ডাইনে বামে জল পরিপূর্ণ। সেই জলের মধ্যে একটি ঘট রয়েছে। ঘটের

বাইরে জল, ভিতরে জল।

এই কথাই উপনিষদের ভাষায়:

অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে।

'কথামৃতে' আছে: চাতকের তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। সাত সমুদ্র, যত নদী, পুকুর সব ভরপুর, তবু সে জল খাবে না, বৃষ্টির জন্য হাঁ ক'রে আছে।

এইরূপ নিষ্ঠার কথাই পদ্মপুরাণে বর্ণিত হয়েছে:

সরঃসমুদ্রনদ্যাদীন্ বিহায় চাতকো যথা।
তৃষিতো ম্রিয়তে চাপি যাচতে বা পয়োধরম্॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি: ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। ভগবান সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তহৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। ভক্তহৃদয় তাঁর আবাসস্থান।

ভাগবতেও একথা রয়েছে একটু অন্যভাবে:

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: যে তাঁকে লাভ করে, সে-ই মায়া পার হ'তে পারে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষায় এই তত্ত্বই বিধৃত:

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।

আমরা শুনেছি রত্নাকর দস্যু 'মরা মরা' জপ ক'রে মহামুনি বাল্মীকি হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই প্রসঙ্গে বলেছেন: এর একটু মানে আছে; 'ম' মানে ঈশ্বর, 'রা' মানে জগৎ। আগে ঈশ্বর তার পরে জগৎ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যাখ্যাই দেবভাষায় শ্লোকনিবদ্ধ:

রাশব্দো বিশ্ববচনো মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে-সব উপদেশ দিয়েছেন, সবই তাঁর অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে বলেছেন, শ্রোতারা তাঁর কথার সঙ্গে শাস্ত্রবাক্যের অপূর্ব মিল দেখে অবাক্ হয়ে যেতেন। তিনি ছিলেন আবাল্য স্মৃতিধর, শ্রুতিধর। একবার যা শুনতেন তা তাঁর স্মৃতিতে চিরমুদ্রিত থেকে যেত। ছেলেবেলায় যাত্রা-কথকতার পালা-গান থেকে শুরু ক'রে দক্ষিণেশ্বরে বিভিন্ন সময়ে সমাগত সিদ্ধ সাধকগণের কাছে শোনা নানা বাণী—সমস্তই তাঁর স্মৃতি থেকে যথাকালে উপযুক্ত ক্ষেত্রে মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে নিঃসৃত হ'ত। মা ভিতর থেকে তাঁর রাশ ঠেলে দিতেন, জ্ঞানী গুণী বিদ্বন্মণ্ডলী বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে যেতেন!

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: 'পড়ার চেয়ে শোনা ভাল। শোনার চেয়ে দেখা ভাল।' 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।' স্কুল-কলেজের তথাকথিত শিক্ষার দিক দিয়ে না গেলেও তিনি ছিলেন বহুশ্রুত। আর তাঁর শোনা প্রত্যেকটি কথা 'দর্শনের' দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে প্রোজ্জ্বল। সাধারণ অসাধারণ যে-কোন ব্যক্তিরই নিকট তিনি যা শুনতেন, তাই কিন্তু আবার বলতেন—এটি অমুকের কাছে শুনেছি, অমুক জায়গায় শুনেছি, অমুক ব'লত ইত্যাদি। 'কথামৃতে'র বহু স্থলে এরূপ উক্তি দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন অন্যত্র শোনা কথা অনুভূতির আলোকে ভাস্বর ক'রে হুবহু প্রকাশ করতেন তখন অনুপম আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্ট হ'ত।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হৃদয়ের বাণী, মস্তিষ্কের বাণী নয়। মস্তিষ্কের বাণীতে বুদ্ধির কসরত, হৃদয়ের বাণীতে অনুভূতি। হৃদয়ের বাণী সকলেই বোঝে, তা নিকটে ও দূর-দূরান্তরের মানুষের প্রাণ আকর্ষণ করে; শুধু মানুষই বা কেন, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বৃক্ষলতা সকলকেই, সব কিছুকেই যেন কাছে টেনে নিতে চায়। তাই দেশে বিদেশে জগতের সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত-বাণীর দুর্বার আকর্ষণ!

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীতে যেমন রয়েছে পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা, তেমনি আছে যথার্থ মানবিকতা ও সমাজবোধ। বাণীগুলির পশ্চাতে রয়েছে সত্যানুভূতি—তাঁর বিচিত্র উপলব্ধি। প্রতিটি বাণী যেন দার্শনিক বা বিজ্ঞানীর যুক্তি-বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই-করা। তাই তাঁর সমসাময়িক কালে বাণীগুলির আবেদন মানবমনে যেমন অপ্রতিরোধ্য ছিল, এই আধুনিককালেও তেমনি আছে এবং ভবিষ্যতেও সেইরূপ থাকবে।

রামকৃষ্ণের অমিয়বাণী সবার চিত্তে
ধ্বনিয়া নিরন্তর,
তুলিবে রাগিণী উদারভাবে সারাটি বিশ্বে
ভরিবে দিগন্তর।

ঘন বরষায়

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর

বিরামবিহীন বরষা-ধারায়
বাহির দুয়ার বন্ধ,
অন্তর মাঝে রহি রহি বাজে
তোমার নূপুর-ছন্দ।
কর্মবিহীন বেলা মন্থর
তব মিলনের এই অবসর,
নাহি কোন রীতি, শুধু অনুভূতি
নাহি কোন বাধাবন্ধ।
তোমার বুকের মালিকা-সুবাস
বকুল কেতকী বনে,
হৃদি যমুনায় তোলে তরঙ্গ
মানস-বৃন্দাবনে।
অপরূপ মেঘ-কাজল ছায়ায়
ধরণীর কায়া-মায়া মুছে যায়,
চির অসীমের সাগর-বেলায়
চিত ধায় মৃদুমন্দ।
গভীর বেদনে নীরব রোদনে
একি এ পরমানন্দ।

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

জাতিচক্র ও সমাজ-বিবর্তন

সমাজ-বিবর্তনে জাতি বা বর্ণের ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত কোঁতের (Comte) তত্ত্বই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সমাজ-বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী অধ্যায় হ'ল তিনটি: ব্রহ্মবিদ্যাচর্চা সহ জংগী theological military) শাসকের যুগ। সমালোচক ও অধিবিদ্যাবিদ্‌দের (critical-metaphysical) নিয়ন্ত্রণের যুগ এবং শিল্প-বিজ্ঞানের (industrial-scientific) যুগ।[১] অভিমতটির বিশ্লেষণে হার্বার্ট স্পেন্সারের বিবর্তন-দর্শনেরও (evolutionary vision) কিছুটা প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।[২] তবে সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর ধারণায় স্বামী বিবেকানন্দ যে হিন্দু-সমাজচিন্তা দ্বারাই মূলত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সে-বিষয়ে তর্কের অবকাশ নেই।

স্বামীজী হিন্দু 'কল্পতত্ত্বে' (theory of cycles) বিশ্বাসী ছিলেন। তত্ত্বটি অনুসারে সমগ্র বিশ্ব ঊর্মিমালার ন্যায় চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে উত্থান এবং পতন এই আবর্তনের স্বাভাবিক নিয়ম। পতনের পর কিছুক্ষণ শূন্যগর্ভে অবস্থান, তারপর আবার উত্থান ইত্যাদি। "সমগ্র বিশ্বের ক্ষেত্রে যে নিয়ম সত্য, বিশ্বের প্রতিটি অংশে তা কার্যকর হতে বাধ্য। মানুষের জীবনযাত্রাও এর ব্যতিক্রম নয়।"[৩]

মানুষের জীবনযাত্রায় জাতিচক্র (the cycle of caste) চার অঙ্কের এক হৃদয়গ্রাহী নাটক রচনা করে, যার প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল সমাজ বিবর্তনের বিশ্লেষণ। চার অঙ্কের হ'লেও নাটকটির শেষ অঙ্কের অভিনয় এখনও সমাপ্ত হয়নি। এই চার অঙ্কে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র পর্যায়ক্রমে মুখ্য ভূমিকা অভিনয় করে মাত্র।

সমাজ-বিবর্তনের প্রথম স্তর ব্রাহ্মণের দ্বারা—ত্যাগের প্রতীক ও সংস্কৃতির বাহক ব্রাহ্মণের দ্বারা—সমাজ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। এই স্তরেই ঘটে 'সভ্যতার উন্মেষ' এবং দেখা যায় ঐশী সত্তা কর্তৃক পশুবৃত্তি-বিজয়। ফলে লোকায়ত দৃষ্টিভঙ্গি হয় পারত্রিকতা-অভিমুখী।[৪]

অবশ্য অবনতির বীজ সঙ্গে সঙ্গেই উপ্ত হয়। ক্ষমতা আস্বাদন করার পর ব্রাহ্মণের প্রধান প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়ায় ঐ ক্ষমতার উৎসকে গোপন রাখা। কালক্রমে ঐ প্রচেষ্টার ফল ব্রাহ্মণকেই গিয়ে আঘাত করে, এবং তখন শুরু হয় জাতি-সংঘর্ষ। এর সুযোগ নিয়ে নবজাগ্রত ও শক্তিশালী বর্ণ ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের সরিয়ে শাসন-ক্ষমতা দখল করে।

শুরুতে ক্ষত্রিয়রা অবশ্য অন্যান্য বর্ণের

১ Encyclopaedia Britannica, 6,250

২ Dr. Brown: White Umbrella,

৩ C. W., IV, 120

৪ বর্তমান ভারত (Modern India, C. W., IV, 453)

সমবায়ে সমাজ শাসন করতে থাকে এবং শাসিতের প্রতি পিতৃবাৎসল্য প্রদর্শন করতে কার্পণ্য করে না। কিন্তু ক্রমে তারা পালন-প্রবৃত্তি জলাঞ্জলি দিয়ে শাসিতের রক্তশোষণ ক'রতে শুরু করে। সমাজ যদি স্বাস্থ্যবান ও সবল হয় তবে এরূপ ক্ষেত্রে শাসক-শাসিতে বেধে ওঠে এক ভয়ানক সংঘর্ষ, এবং ফলে 'অনেক রাজদণ্ড ও মুকুটই ধূলায় লুণ্ঠিত হয়।'[৫]

ক্ষত্রিয়দের পর আসে বৈশ্যরা। বিত্তশালী বৈশ্যদের হস্তস্থিত ধাতব মুদ্রার ঝংকার সকলেরই মনে এক অপূর্ব মোহের সৃষ্টি করে। ধনবৈভবের অদৃষ্টপূর্ব প্রদর্শনী এবং দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্যের আধিক্য হ'ল বৈশ্য-শাসনের বৈশিষ্ট্য এবং আত্মরক্ষার জন্য বৈশ্যদের মধ্যে ঐক্য সম্পূর্ণ অতুলনীয়।[৬] এর ফলে জনগণের বাকী অংশ শূদ্রস্তরেই অপনীত হয়।

শেষ অঙ্কে মুখ্য ভূমিকা হ'ল শূদ্রদের, যখন শূদ্ররা শূদ্র হিসাবে সমগ্র সমাজের উপর পূর্ণ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে।[৭]

এই হ'ল সমাজ-বিবর্তনের নাটক, এবং এতে আমাদের সকলেরই ভূমিকা নির্দিষ্ট আছে। চতুর্থ বা শেষ অঙ্কটি এখনও অভিনীত হয়নি সত্য, তবে স্বামী বিবেকানন্দ যেন এর চূড়ান্ত মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানতেন সমাজ-বিবর্তনের শেষ স্তর কি।

কিন্তু স্বামীজী চক্রের আবর্তনের অবশ্য-ম্ভাবিত্ব মেনে নিলেও চক্রের কোন পর্যায়েই অবনতি বা পতনের লক্ষণ খুঁজে পাননি। বরং তাঁর আশাবাদ তাঁকে এর মধ্যে সমাজের অগ্রগতিরই সন্ধান দিয়েছে। চক্রাবর্তনের ফলে প্রত্যেক স্তরেই উন্মার্গগামী জাতির (perverted caste) হাত থেকে সমাজের শাসনভার আসে যোগ্যতর জাতি বা বর্ণের হাতে। সুতরাং জাতিচক্র উদ্দেশ্যবাদের অনুপন্থী। এদিক থেকে বলা যায়, স্বামীজী বিবর্তন ও প্রগতিকে অভিন্ন বলেই নির্দেশ করেছেন। ফলে তাঁর প্রত্যয় মানুষের যাত্রা হ'ল মিথ্যা থেকে সত্যে নয়, নিম্নস্তরের সত্য থেকে উচ্চস্তরের সত্যে—সমাজ-বিজ্ঞানের দিক দিয়েও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, বলা যায়। এই প্রসঙ্গে অবশ্য একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, স্বামীজী তাঁর সমাজদর্শনে মানুষের জন্য কখনও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা—মাত্র দর্শকের ভূমিকা নির্দেশ করেননি। করলে বেদান্ত-বিশ্বাসের বিরোধী কার্যই করা হ'ত। যেহেতু স্বামীজীর উদ্দেশ্য হ'ল সমাজ-বিবর্তনের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করা ছাড়াও ঐ গতি ত্বরান্বিত করা এবং প্রতি নবযুগের জন্মজনিত প্রসববেদনাকে পরিহার করা, সেইহেতু তাঁর সমাজদর্শনে মানুষের সক্রিয় ভূমিকা থাকতে বাধ্য।

গতি ত্বরান্বিত করার এবং বেদনামুক্তির পথ তিনি পেয়েছেন বেদান্তের আলোকে সংস্কৃত ও পুনর্গঠিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে, মাত্র যে শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমেই সমবায়ী সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব। স্বামীজীর এই মতবাদ প্লেটো ও এ্যারিস্টলের তত্ত্বই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সুপরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থাই সমাজ-বিপ্লবের প্রতিষেধক।[৮]

সমাজের বিভিন্ন রূপ

সমাজের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে স্বামীজীর

---

৫ Ibid

৬ Ibid, 466

৭ Ibid, 468

৮ Hearnshaw Development of Political Ideas, 12

ধারণা জাতিচক্রতন্ত্রের (theory of the cycle of caste) মধ্যেই নিহিত। দেখা গেছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি জাতি বা বর্ণ দ্বারা সমাজ পর্যায়ক্রমে শাসিত হয়। ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতি অথবা যুদ্ধবৃত্তি অথবা বৈশ্যের মনোভাব অথবা শূদ্রত্ব সমাজজীবনের মূল সুর বা প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এই মূলসুর বা প্রধান বৈশিষ্ট্যই নির্ধারণ করে বিশেষ সমাজের রূপ। অতএব চরিত্রের দিক দিয়ে সমাজ হ'ল—হয় ব্রাহ্মণ্য সমাজ, না হয় জংগী সমাজ, না হয় বণিক সভ্যতার সমাজ, না হয় নিরবলম্ব শ্রমজীবী সমাজ।

বিশুদ্ধরূপে প্রথমোক্ত দুই সমাজ সর্বজনীন কল্যাণসাধনেই নিয়োজিত থাকে, কিন্তু বিকৃত (perverted) হ'লে শাসকগোষ্ঠী উত্তরোত্তর বিশেষ সুবিধা-আহরণেই যত্নবান হয়। আদর্শ-ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণরা তন্ত্রমন্ত্রের জাল বিস্তার ক'রে নিজেদেরই স্বার্থসাধন ক'রতে থাকেন, আর আদর্শভ্রষ্ট নরপতি নিজেকে আর জিম্মাদার (trustee) ব'লে মনে না ক'রে প্রজাপুঞ্জের রক্তশোষণ ক'রতে শুরু করেন। বণিক-সভ্যতাভিত্তিক সমাজ সর্বদাই বিকৃত—এর আদর্শ রূপ ব'লে কিছু নেই, কারণ বৈশ্যরা সব সময়ই স্বার্থান্বেষী। এই জাতির শোষণের প্রকৃতি সূক্ষ্ম কিন্তু গভীরতর। অনেক সময় বৈশ্যরা রাজসিংহাসনের বা জনগণের সরকারের পশ্চাতে অবস্থান ক'রেই কার্য করে। কেবলমাত্র নিরবলম্ব শ্রমজীবী সমাজ বা শূদ্র সমাজই বিকৃতির কবল থেকে মুক্ত, কারণ এরূপ সমাজে শূদ্ররাই সংখ্যাধিক। অপরদিকে আবার শূদ্রত্ব বলতে মূল্যাবনতি বোঝায় ব'লে শূদ্রপ্রধান সমাজ বিকৃতিরই নামান্তর।[৯]

দেখা গেল যে, স্বামী বিবেকানন্দের মতে, সমাজের রূপ নির্ধারিত হয় প্রথমত শাসক বর্ণের (ruling caste) প্রকৃতিদ্বারা এবং দ্বিতীয়ত সমাজের উদ্দেশ্যের প্রতিফলনের পরিমাণ দ্বারা। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-সাপেক্ষ, এই হ'ল আবার তাঁর সরকারের রূপ (forms of government) সম্বন্ধেও ধারণা। বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য-নির্দেশের সচেতন প্রচেষ্টা স্বামীজীর বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হ'লেও দেখা যায় যে, অতীতের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি সমাজ-রাষ্ট্রের (society-state) ধারণাই প্রধানত ব্যাখ্যা করেছেন। বর্তমানের ক্ষেত্রেও যে সমাজ-রাষ্ট্রের বর্ণনা তাঁর বিশ্লেষণে স্থান পায়নি, সে কথাও বলা যায় না।[১০]

১৫। সামগ্রিক সমাজ ও সামাজিক গোষ্ঠী

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-রাষ্ট্রের ধারণা বিশেষভাবে ঐক্য-সমস্যার (problem of unity) সম্মুখীন। তত্ত্বের দিক দিয়ে এই সংস্থা (entity) ঐক্যবদ্ধ কিন্তু কার্যক্ষেত্রে একটা দ্বিমুখী সমস্যা ঐক্য বা সমন্বয়কে ব্যাহত করে—যথা; (১) ব্যক্তি বনাম সমাজ, (২) সঙ্ঘ বনাম সমাজ (individual v. society and group v. society)।

স্বামী বিবেকানন্দের সময়ে রাষ্ট্র (state) সমাজকে গ্রাস করতে উদ্যত হ'য়েছিল ব'লে বিতর্কের বিষয় ছিল ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র, সঙ্ঘ বনাম রাষ্ট্র—এই সমস্যাটি রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠেনি। সচেতনভাবে রাজনীতি এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টার দরুন স্বামীজী তাঁর সমাজদর্শনে সমাজকে রাষ্ট্রের

৯ Modern India, 466 ff

১০ Ibid, 467 ff

পরিবর্ত (substitute) হিসেবে ব্যবহার ক'রে সমস্যাটির পর্যালোচনা করেছেন।

সমাজ ব'লতে স্বামীজী আজকের দিনের জাতীয় সমাজের (national society) পরিবর্তে পরিবার, ধর্মীয় সঙ্ঘ এবং স্বেচ্ছায় সংগঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সমবায়ে গঠিত ক্ষুদ্রতর সঙ্ঘই নির্দেশ করেছেন।

পরিধিতে ক্ষুদ্রতর হ'লেও এই সমাজ-প্রকৃতির রূপ বর্তমানে কম জটিল নয়। এতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে কিন্তু ঐকতানের সৃষ্টি হয়নি। সমস্যার যে সমাধান স্বামীজী নির্দেশ করেছেন তা হ'ল প্রয়োজনীয় শুদ্ধিকরণের পর বিভিন্ন সুরের সঙ্গতিসাধন, প্রকারভেদহীন পূর্ণ ঐক্যসাধন নয়। স্বামীজীর এই ধারণায় আধুনিক সমাজ-বিদ্যার একটি তত্ত্বের সুস্পষ্ট পূর্বাভাষ পাওয়া যায়। তত্ত্বটি হ'ল: কোষসমূহের (cells) প্রকারভেদহীনতা জীবদেহের সম্প্রসারণের পরিপন্থী; সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন হল পরস্পরের সহিত সঙ্গতির ভিত্তিতে কোষ-সমূহকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হ'তে দেওয়া।[১১]

অতএব, সাধারণ মানুষের প্রাথমিক সংস্থা পরিবার বা অন্য সঙ্ঘকে দমন করা চলবে না। বরং প্রত্যেকটি সংস্থার স্বাস্থ্যোদ্ধার করে সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমন্বয়ের পথ প্রস্তুত করতে হবে।

সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমন্বয় এবং সামাজিক ঐক্য একই ব্যাপার নয়। সামাজিক ব'লতে সমাজ-ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গতাই বোঝায়। এই পূর্ণাঙ্গতাই হ'ল লক্ষ্য এবং উক্ত সমন্বয়-সাধন হ'ল মাধ্যম বা পন্থা।

এই মাধ্যমের কার্যকারিতা নির্ভর করে কলাকৌশলের প্রকৃতির ওপর। স্বামীজী এই কলাকৌশলের সন্ধান পেয়েছিলেন বৈদান্তিক নীতি, স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়, যুক্তিসিদ্ধ ভেদবিচার (rational discrimination) এবং ভালবাসা দ্বারা নির্ধারিত 'পারস্পরিক সহায়তার' (mutual aid) মন্ত্রের মধ্যে। যুক্তিসিদ্ধ ভেদবিচার অন্যতম নির্ধারক বলে কলাকৌশলটিও প্রকারভেদহীন নয়; প্রকৃত পক্ষে কলাকৌশল বিশেষ সামাজিক অবস্থার আপেক্ষিক। তবুও কিন্তু সাম্য, ন্যায় এবং বিশেষ করে ভালবাসার আদর্শ স্বামীজীকে বিশ্বজনীনভাবে প্রযোজ্য এক অভিন্ন কলা-কৌশলের সন্ধান দিয়েছিল, নৈতিক ও সামাজিক ব্যাপ্তির দিক দিয়ে যে কলাকৌশল, প্রিন্স ক্রপটকিনের বিশ্রুত তত্ত্বকেও ছাড়িয়ে যায়।

ক্রপটকিন জীবন-সংগ্রামের অমোঘ নীতির বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রাম শুরু করবার প্রায় তিন দশক পূর্বে হার্বার্ট স্পেন্সার সকল সামাজিক অকল্যাণের প্রতিবিধানের সন্ধান পেয়েছিলেন শিল্প-সমাজের (industrial society) উদ্ভবের মধ্যে।[১২] স্পেন্সারের মতে, শিল্পপ্রসার মানুষকে 'সামাজিক মর্যাদার স্তর থেকে চুক্তির স্তরে' ('from status to contract') উপনীত করে গণতন্ত্রের পথ প্রস্তুত করে, এবং গণতন্ত্রে যে পারস্পরিকতা কার্যকর হয় তাকে বলা যায় 'স্বাধীনতামূলক সমবায়' (co-operation in liberty), যার সঙ্গে সামরিক শাসকের যুগের 'আবশ্যিক সমবায়ের'

১১ Hobhouse : Social Evolution and Political Theory, 90

১২ Durant : The Story of Philosophy, 380

(compulsory co-operation) পার্থক্য সহজেই অনুমেয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধিক্য (over-government) সমাজ-বিবর্তনের এই পথে প্রতিবন্ধকতা করে। সুতরাং প্রয়োজন হ'ল বিধিনিয়মের পরিমাণ-হ্রাসের এবং সমবায় আন্দোলনে (co-operative movement) আস্থাস্থাপনের। এ দুটিই শিল্প-সমাজ-প্রবর্তন ক'রে 'ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র' (man v. state) সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করে।[১৩]

স্বামী বিবেকানন্দের পারস্পরিক সহায়তার ব্যবস্থাও অন্যতম সমবায়িক আদর্শ, কিন্তু এখানে সমবায় বলতে সৌভ্রাত্র (fraternity) বোঝায় না, কারণ এর উৎস স্বাধীনতা, সাম্য, এবং ন্যায় ছাড়াও হ'ল ভালবাসা। এই কারণে এর ভিত্তি হ'ল ত্যাগ ও সেবা renunciation and service), জীবন-দর্শনের মূল সূত্র হিসাবে যা সাধারণ গৃহস্থের পক্ষেও অনুসরণীয়। এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সমাজ ত' অসংখ্য গৃহস্থকে নিয়েই গঠিত! স্বামীজীর মতে, অন্য কোন প্রকার সমবায়িক উদ্যোগ 'জ্যোতিষশাস্ত্রের মতই মূল্যহীন'[১৪] ব'লে গণ্য হবে। স্বামীজী-পরিকল্পিত এই ব্যবস্থায় বর্ণ বা জাতি-সমস্যার (the problem of caste) সমাধান আপনা থেকেই হয়ে যায়। কারণ, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এই ব্যবস্থা কার্যত: জাতিহীন, শ্রেণীহীন সাম্যভিত্তিক সমাজেরই দ্যোতক, যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হবে বৈদান্তিক নীতি একত্ববোধের (unity) উপলব্ধি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ঐ উপলব্ধির সম্প্রসারণ দ্বারা। স্বামীজীর মতে, এই উপলব্ধি ও সম্প্রসারণই 'প্রকৃত স্বাধীনতার' (true freedom) লক্ষণ।

এই পরিকল্পনার কার্যকারিতা সম্বন্ধে কারও কারও সংশয় থাকতে পারে, কেউ বা এর মধ্যে কল্পনাবিলাসের (utopia) সন্ধানও পেতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু এই সব সংশয় ইত্যাদিকে প্রশ্রয় দিতে মোটেই রাজী নন, কারণ তাঁর মতে এর তাৎপর্য হ'ল মানুষের অন্তর্নিহিত ঐশীশক্তিকে অস্বীকার করা। সংশয়ের সন্ধান পেলে বুঝতে হবে যে সংশয়িতা নিজেই অমুক্ত

১৭। সমাজ-সংস্কার

দেখা গেল যে, স্বামী বিবেকানন্দের মতে, সমাজ-সংস্কার বলতে সকল প্রকার বন্ধনমুক্তির অভিযানই বোঝায়। এই অভিযান আবার সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ (internal)—প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক জাতিকেও স্বীয় মুক্তি-সাধন ক'রতে হবে ("Each individual has to work out his own salvation···so also nation's,"[১৫])। অপরে পারস্পরিক সহায়তার ভিত্তিতে সাহায্য করতে পারে মাত্র, কিন্তু ব্যক্তিকেই তার মুক্তির পথ প্রস্তুত ক'রে নিতে হবে। স্বামীজী একে বলেছেন 'আমূল সংস্কার' (radical reformation[১৬])। এই ধারণার (concept) প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল যে, 'নগণ্য' ব'লে অভিহিত মানুষ অপর কারও ওপর—এমনকি ঈশ্বরের ওপরও—নির্ভর না ক'রে স্বীয় প্রচেষ্টার দ্বারা আত্মশক্তিকে

১৩ Barker: Political Thought in England (1848-1914), 79 ff, also Chambers's Encyclopaedia, 579

১৪ 'As futile as astrology'—Spencer

১৫ Swami Vivekananda on India and Her Problems, 44

১৬ Ibid, 45

বিকশিত করবার সাহস রাখে, প্রয়াস করে।[১৭] ব্যক্তিকে এরূপ অনন্যসাধারণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা বেদান্তেরই অন্যতম নীতি।

১৮। সামাজিক প্রগতি

ব্যক্তি তার আত্মশক্তিকে বিকশিত করতে সমর্থ হ'লে সমাজও প্রগতির পথে চলে। ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ হ'লে তবেই সমাজ সার্থক হ'তে পারে। এ-সম্পর্কে স্বামীজীর দ্ব্যর্থহীন উক্তি হ'ল: "অবস্থা-ব্যবস্থার কোন উন্নয়ন ঘটে না, তারা যে রকম আছে সেই রকমই থাকে, কেবল তাদের পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা নিজেদের উন্নয়ন সাধন করি" ("Things do not grow better, they remain as they are, and we grow better by the changes that we make in them."[১৮])।

প্রকৃতিগত সঙ্গপ্রিয়তার জন্য মানুষের পক্ষে সমাজ অপরিহার্য। আবার মানুষের জীবন-যাত্রায় চিন্তা বা যুক্তির স্থান রয়েছে ব'লে ব্যক্তি সমাজের মাধ্যমে জীবনকে উপলব্ধি করতে চায়, সত্য ও সুন্দরের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হ'তে চায়। এর জন্যে সমাজকে যথোপযুক্ত-ভাবে সংগঠিত করা প্রয়োজন, যা সম্ভব ক'রতে হ'লে ব্যক্তিকেও পর্যাপ্ত সংগঠন-সামর্থ্যের অধিকারী হ'তে হবে। সুতরাং ব্যক্তির আত্মোন্নয়ন এমন কি সমাজোন্নয়ন ঊর্ধ্বগতি-সম্পন্ন চক্রাকারেরই মত, যার প্রাথমিক স্তর অবশ্য হ'ল ব্যক্তির আত্মসংস্কার (self-reform starting from the individual)।

১৯। সংস্কারের গতি

সংস্কার বলতে স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকগুলির অপসারণ বোঝায় ব'লে সংস্কারের ধারণা স্থান ও কালের আপেক্ষিক হ'তে বাধ্য। অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে, মৌল প্রকৃতিতে সংস্কার সকল প্রকার বন্ধনের বিরুদ্ধে জেহাদ ছাড়া কিছু নয়। আর বন্ধন বলতে বৈষম্য, অন্যায় (injustice), আত্মকেন্দ্রিকতা, যুক্তিহীন ভেদ-জ্ঞান প্রভৃতিকেই বোঝায়, যা বৈদান্তিক নীতির অস্বীকারের সূচক।

সংস্কার শুরু করতে হবে বন্ধনের প্রকৃতি-বিশ্লেষণ থেকে—ব্যক্তিকে জানতে হবে কোন্ কোন্ বন্ধন তার ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রতিবন্ধকতা করছে। এই নির্ধারণকার্য সম্পাদনের পর তাদের বিলোপসাধনে উদ্যোগী হ'তে হবে। এর জন্যে প্রয়োজন হ'ল 'চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতা' ('liberty of thought and action') যাকে কল্যাণ ও সম্প্রসারণের একমাত্র সর্ত ব'লে অভিহিত করা যায়।[১৯]

সমাজ-জীবনে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার (special privileges) অস্তিত্ব স্বাধীনতার অন্যতম প্রতিবন্ধক। সুতরাং সংস্কারকের পক্ষে নিজের জন্য কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দাবি করা চলবেই না, অপরেও যাতে এই দাবির মোহে না পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক হ'ল সহায়হীনতার ভাব এবং ফলে পরনির্ভরশীলতা। এর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে—সেই 'শ্রদ্ধাই' বাড়িয়ে তুলতে হবে যাকে বলে

---

১৭ cp. C, V., 381

১৮ Nivedita: The Master as I saw Him, 106. এই প্রসঙ্গে মহাকবি গেটের বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে: "What you call the spirit of the age is in reality one's own spirit, in which the age is mirrored."

১৯ C. W., V, 29

[শেষাংশ ৪২৭ পৃষ্ঠায়]

যোগবাসিষ্ঠসারঃ

[পূর্বানুবৃত্তি]

[অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ]

৯। আত্মনিরূপণ-প্রকরণ

বসিষ্ঠ উবাচ--

তস্মিন্ দেহেন্দ্রিয়াদীনাং সংঘাতে স্ফুরতি স্বতঃ।
অয়ং সোঽহমিতি ভাবঃ স জীবো মলগুণ্ঠিতঃ॥ ১

বসিষ্ঠ বলিতেছেন—সেই দেহেন্দ্রিয়াদির সংঘাতে (সমষ্টিতে) এই যে হস্তপদাদিযুক্ত পুরুষ 'সেই আমি'--এইরূপে স্বতঃই যে ভাব স্ফুরিত হয়, তাহাই (কৃত্রিম) মল দ্বারা আবৃত জীব।

সর্বমেব চিদাকাশং ব্রহ্মেতি ঘননিশ্চয়ে।
স্থিতিং যাতে শমং যাতি জীবো নিঃস্নেহদীপবৎ॥ ২

দৃশ্যমান সর্ববিশ্বপ্রপঞ্চ চিদ্রূপ আকাশের ন্যায় নির্মল ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয়ে স্থিতিলাভ হইলে তৈলরহিত দীপশিখার ন্যায় জীবত্ব স্বতঃই শান্ত হইয়া যায়। (অতএব ঐ জীবত্ব ত্যাগ করিবে। অথবা তৈলরহিত দীপ যেরূপ দীপত্ব পরিত্যাগপূর্বক

[৪২৬ পৃষ্ঠার পর]

আত্মবিশ্বাস। "পুরাতন ধর্মে বলা হয়েছিল, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না তাকে বলে নাস্তিক, কিন্তু নবধর্ম বলে যে, সেই হ'ল নাস্তিক যার আত্মবিশ্বাস নেই।"[২০] এই শ্রদ্ধায় বলীয়ান্ হয়ে ব্যক্তি নচিকেতার মতই ঘোষণা করে: "আমি অনেকেরই উর্ধ্বে, মাত্র কতিপয়ের নিম্নে, কিন্তু কখনও নিম্নতম স্থানাধিকারী নই। আমিও কিছু সম্পাদন করতে সমর্থ।"[২১]

তৃতীয়ত, দেখা যায় যে, অনেক সময় সামাজিক নিয়ন্ত্রণাদি ব্যক্তি, শ্রেণী বা বর্ণ-বিশেষের অনুকূলই নয়। এর বিরুদ্ধেও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রতে হবে। বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিলোপসাধন এবং প্রভেদাত্মক সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অবসান ঘটাতে পারলে সাম্যের পরিবেশই সৃষ্ট হয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, সামাজিক স্বাধীনতা ও সামাজিক সাম্যের মধ্যে হ'ল অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।

এই পরিবেশকে আবার সামাজিক ন্যায় (social justice) আখ্যাও দেওয়া যায়, কারণ ন্যায়ভিত্তিক সমাজ (a just society) সম-সুযোগসুবিধার অধিকারী স্বাধীন ব্যক্তি-সমুদয়কেই নিয়ে গঠিত হ'তে পারে—পরাধীন ও পরাশ্রয়ীদের নিয়ে নয়। (ক্রমশঃ)

২০ C. W., II, 301

২১ C. W., III, 319

মহান ব্যাপক তেজোরূপ ধারণ করে অর্থাৎ স্বকারণে বিলীন হয় বা একীভূত হয়, তদ্রূপ উপাধিবিলয়ে জীবও স্বভাব অর্থাৎ পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হয়)।

স্বমহত্ত্বং যথোপেক্ষ্য কশ্চিদ্বিপ্রো জুগুপ্সয়া।
অঙ্গীকরোতি শূদ্রত্বং তথা জীবত্বমীশ্বরঃ ॥ ৩

কোন ব্রাহ্মণ যে প্রকার নিজের মহত্ত্ব উপেক্ষাপূর্বক দুষ্ট চেষ্টা অর্থাৎ নীচসেবাদিপরায়ণ হইয়া শূদ্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া থাকে, পরমাত্মাও সেই প্রকার মায়াসহায়ে জীবত্বভাব প্রাপ্ত হন।

অসত্যমেব সংকল্প্য ভ্রমেণেদং শরীরকম্।
জীবঃ পশ্যতি মূঢ়াত্মা বালো যক্ষমিবোত্থিতম্ ॥ ৪

জীব এই অসত্য শরীর কল্পনা করিয়া মূঢ়তাবশতঃ সেই শরীরকেই 'আমি' এইরূপ মনে করিয়া থাকে, বালক যেমন সকল্পনোত্থিত মিথ্যাভূত ভূত দর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ।

মৃৎস্নেভকে যথেভত্বং শিশুরধ্যস্য বল্গতি।
অধ্যস্যাত্মনি দেহাদীন্ মূঢ়স্তদ্বদ্বিচেষ্টতে ॥ ৫

শিশু যেমন উদ্রমমৃত্তিকানির্মিত হস্তিশাবকে গজত্ববুদ্ধি আরোপ করিয়া বিবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে, অজ্ঞানীও তদ্রূপ আত্মাতে দেহাদি অধ্যাসকরতঃ নানা প্রকার ক্রিয়া চেষ্টাদি করিয়া থাকে।

চিত্রসর্পঃ পরিজ্ঞাতো ন সর্পভয়দো যথা।
জীবসর্পঃ পরিজ্ঞাতস্তথা দুঃখে ন দুঃখদঃ ॥ ৬

চিত্রাঙ্কিত সর্প (ইহা চিত্রে অঙ্কিত মাত্র, বাস্তব নহে, এইরূপে) পরিজ্ঞাত হইলে উহা যেমন আর সর্পভয় প্রদান করে না, জীবরূপ সর্পও তদ্রূপ (ব্রহ্মরূপে) পরিজ্ঞাত হইলে (দুঃখানুভবকালে) শোক, বিষাদাদিরূপ দুঃখ উৎপন্ন করে না।

স্রজি সর্পোঽয়মধ্যস্তো মালায়ামেব লীয়তে।
আত্মনি প্রোত্থিতো ভেদ আত্মন্যেব বিলীয়তে ॥ ৭

মালাতে কল্পিত সর্প যেমন (ইহা মালা—এইরূপ জ্ঞানের অনন্তর) মালাতেই বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ আত্মাতে ভ্রমবশতঃ উৎপন্ন বিবিধ দ্বৈতভেদ (আত্মজ্ঞানানন্তর) আত্মাতেই বিলীন হইয়া থাকে।

নৈকমপ্যঙ্গদাদ্যং চ যথৈকং হেম সংস্থিতম্।
উপাধিভিরনেকোঽপি তথাত্মৈকঃ স্বরূপতঃ ॥ ৮

অঙ্গদ, কুণ্ডল কঙ্কনাদিরূপে যে বহু ভূষণ বিদ্যমান তাহা যেমন এক সুবর্ণই, সুবর্ণ ছাড়া আর কিছু নহে, সেই প্রকার উপাধিভেদে বহুরূপে প্রতীত হইলেও আত্মা স্বরূপতঃ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে এক।

শরীরেঽবয়বা যদ্ যদ্ বিকারাশ্চ যথা মৃদঃ।
অদ্বৈতং দ্বৈতবদ্ ভাতি তথা স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৯

একই শরীরে যেমন হস্তপদাদি নানা অবয়ব দৃষ্ট হয় ও একই মৃত্তিকার যেমন বহুবিধ ঘটশরাবাদি বিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু তাহারা শরীর ও মৃত্তিকারূপে একই, তদ্রূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই স্থাবরজঙ্গমরূপ দ্বৈতের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন।

মণিতোয়ঘৃতাদর্শেষ্বেকমপ্যাননং যথা।
ভাত্যনেকমিবাত্মাপি তথা ধীম্বম্বুবিম্বিতঃ॥ ১০

যেমন একই মুখমণ্ডল মণি, জল, ঘৃত ও আদর্শে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ স্বরূপতঃ এক আত্মাও বুদ্ধিরূপ উপাধিসমূহে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহুর ন্যায় প্রতিভাত হয়।

ধূলিধূমাম্বুদৈর্যদ্বন্মলিনীক্রিয়তে নভঃ।
পরামৃষ্টস্তথৈবাত্মা বিশুদ্ধঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ॥ ১১

নির্মল আকাশ যেমন ধূলি, ধূম ও মেঘের দ্বারা মলিন হইয়া থাকে (অর্থাৎ বস্তুতঃ মলিন হয় না), বিশুদ্ধ আত্মাও তদ্রূপ প্রকৃতিসম্বন্ধিগুণসমূহ দ্বারা মলিন হইয়া থাকেন, এরূপ বলা হয়। (ভ্রান্তিবশতঃ এরূপ বলা হয় মাত্র, আত্মা বস্তুতঃ বিশুদ্ধই থাকেন।)

অগ্নিসঙ্গাদ্ যথা লোহমগ্নিত্বমুপগচ্ছতি।
আত্মসঙ্গাত্তথা গচ্ছত্যাত্মতামিন্দ্রিয়াদিকম্॥ ১২

অগ্নির সঙ্গবশতঃ লৌহ যেরূপ অগ্নিস্বভাব (দাহকত্বগুণ) প্রাপ্ত হয়, আত্মার সাহচর্যবশতঃ ইন্দ্রিয়াদিও তদ্রূপ আত্মভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চৈতন্যবান্ বলিয়া মনে হয় (এবং ইন্দ্রিয়াদির ধর্মও আত্মাতে প্রতিভাত হয়। ইহাই অন্যোন্যাধ্যাস বা পরস্পরাধ্যাস। 'অতস্মিংস্তৎবুদ্ধি'র নামই অধ্যাস। অর্থাৎ যাহা যে বস্তু নহে, তাহাতে সেই বস্তুর আরোপ ও তাহার জ্ঞান। যেমন—রজ্জুতে সর্পের আরোপ ও সেই সর্পের জ্ঞান—ইহাই অধ্যাস।)

অদৃশ্যো দৃশ্যতে রাহুগৃহীতেন যথেন্দুনা।
তথানুভবমাত্রাত্মা দৃশ্যেনাত্মাবলোক্যতে॥ ১৩

রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের সহিতই যেমন অদৃশ্য রাহু দৃষ্টিগোচর হয়, অনুভবমাত্রস্বরূপ আত্মাও তদ্রূপ দৃশ্য শরীরাদি সহ অনুভূত হইয়া থাকেন।

আত্মনো জড়সঙ্গাৎ স্যাদনাত্মত্বং জড়স্য তু।
স্যাদাত্মসঙ্গাদাত্মত্বং জলাগ্ন্যোঃ সঙ্গবন্মিথঃ॥ ১৪

জল ও অগ্নির পরস্পর সঙ্গের ন্যায় (সঙ্গবশতঃই যেমন জলের অগ্নিত্ব ও অগ্নির জলত্ব প্রতীত হয়, তদ্রূপ) আত্মসঙ্গবশতঃ জড়দেহাদির আত্মত্ব ও জড়সঙ্গবশতঃ আত্মার অনাত্মত্ব-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

. অসত্যজড়চিত্তাংশনয়নাচ্চিদ্বপুর্জনুঃ।
মহাজলগতো হ্যগ্নিরিব রূপং স্বমুজ্ঝতি॥ ১৫

(উষ্ণ জল) মহান জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইলে (ঐ উষ্ণজলগত) অগ্নি যেরূপ নিজের অগ্নিত্ব

পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ অসত্য জড় অন্তঃকরণরূপ অংশের চিদ্রূপত্বভাবনা করিলে চিদ্রূপ আত্মাও (কল্পিত) জন্মমরণাদিভাব পরিত্যাগ করেন ও মুক্ত হন।

ইক্ষৌ গুড়ো তিলে তৈলং কাষ্ঠে বহ্নির্ঘৃষ্যয়ঃ।
ধেনাবাজ্যং বপুষ্যাত্মা লভ্যতে চৈব যত্নতঃ॥ ১৬

ইক্ষুখণ্ডে বর্তমান গুড়, তিলে বিদ্যমান তৈল, কাষ্ঠে স্থিত অগ্নি, ধেনুতে বিদ্যমান ঘৃত যেমন যত্নের দ্বারাই লাভ হয় এবং পাষাণে স্থিত লৌহ যেরূপ দাহাদি প্রযত্নবলেই পাওয়া যায়, তদ্রূপ এই শরীরে বর্তমান আত্মাও (শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপ) প্রযত্ন সহায়েই লব্ধ হইয়া থাকেন।

স্ফটিকাত্মনি নিরন্ধ্রে স্থিতং খং বীক্ষ্যতে যথা।
তথা সর্বপদার্থেষু চিদ্রূপঃ পরমেশ্বরঃ॥ ১৭

নিশ্ছিদ্র স্বচ্ছ স্ফটিকরূপে স্থিত আকাশ যেরূপ দৃষ্টিগোচর হয়, চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাও সেইপ্রকার সর্বপদার্থে অনুস্যূতরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকেন।

বহিরন্তঃ স্ফুরজ্জ্যোতীরত্নকুম্ভপ্রদীপবৎ।
স্বপ্রকাশাৎ যথৈবৈকং স্বরূপমাত্মনস্তথা॥ ১৮

রত্ন (স্বচ্ছস্ফটিক)-নির্মিত কুম্ভমধ্যস্থ প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ নিজের প্রকাশ দ্বারা বাহিরে ও ভিতরে প্রকাশ করিয়াও সদা একরূপেই বিদ্যমান, আত্মার স্বরূপও তদ্রূপ অন্তরে মন-আদিতে ও বাহিরে সর্ববিষয়ে ভাসমান থাকিয়াও সদা একরূপ।

দর্পণে বিম্বিতো হ্যর্কঃ প্রকাশং কুরুতে যথা।
তথা প্রকাশয়ত্যাত্মা স্বচ্ছধীষ্বনুবিম্বিতঃ॥ ১৯

সূর্য যেরূপ নির্মল দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া দর্পণকে ও তৎপ্রকাশিত বস্তুগুলিকে প্রকাশ করিয়া থাকে, আত্মাও তদ্রূপ নির্মল চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিষয়সমূহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

যত্র স্থিতেয়ং বিশ্বশ্রীঃ প্রতিভামাত্ররূপিণী।
রজ্জ্বাং ভুজঙ্গবদ্ ভাতি স্বয়মাত্মা সদোদিতঃ॥ ২০

যে আত্মাতে স্থিত হইয়া প্রতীতিরূপা এই সংসারশোভা সত্তাবিশিষ্টা হয় ও রজ্জুতে (অজ্ঞানবশতঃ) সর্পের ন্যায় প্রকাশিত হয়, সেই আত্মা নিজে সদা প্রকাশমান। (রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞান যেরূপ সর্পভ্রমের উৎপাদক, তদ্রূপ আত্মাবিষয়ক অজ্ঞানই সংসারপ্রতীতির উৎপাদক,—ইহাই ভাবার্থ।)

আদ্যন্তরহিতঃ সত্যশ্চিদ্রূপো নির্বিকল্পকঃ।
আত্মা নিরূপিতাকাশো জীবস্যাদ্যঃ পরাৎপরঃ॥ ২১

আত্মা উৎপত্তি-ও নাশরহিত, সত্য অর্থাৎ ত্রিকালে বিদ্যমান, চৈতন্যস্বরূপ, সর্বভেদরহিত, আকাশাদিরও কারণরূপে নিশ্চিত, জীবের স্বস্বরূপ এবং সর্ব উত্তম বস্তু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

আত্মা বিশুদ্ধচৈতন্যস্বরূপঃ শাশ্বতো বিভুঃ।
নির্বিকারঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বভাবোঽর্কপ্রকাশবৎ॥ ২২

আত্মা বিশুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ, নিত্য ব্যাপক, বিকাররহিত, স্বয়ংপ্রকাশ এবং সূর্যের প্রকাশের ন্যায় স্বসত্তাবান্।

আত্মানুভবমাত্রাত্মা সর্বগঃ সর্বসংশ্রয়ঃ।
প্রকাশানন্যচৈতন্যাব্যতিরিক্তোঽনলোষ্মবৎ ॥ ২৩

আত্মা অনুভবমাত্রস্বরূপ, সর্বব্যাপী, সর্ববস্তুর আধার এবং অগ্নি ও তাহার উষ্ণতা যেরূপ অভিন্ন, সেইরূপ সদা সকল হইতে অভিন্ন, প্রকাশ ও চৈতন্যস্বরূপ (অর্থাৎ প্রকাশ ও চৈতন্যসহ আত্মা সদা অভিন্ন)।

চিত্তবর্জিতচিন্মাত্রঃ পরমাত্মাবভাসকঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরব্যাপী নিষ্কলো নিশ্চলাশ্রয়ঃ ॥ ২৪

পরমাত্মা অন্তঃকরণচতুষ্টয় হইতে ভিন্ন চৈতন্যস্বরূপ, সকলের প্রকাশক, বাহ্যাভ্যন্তরব্যাপী, কলা বা অবয়বাদিরহিত ও নিশ্চল আশ্রয়স্বরূপ।

য আত্মা চিন্ময়ঃ স্বস্থঃ প্রবুদ্ধোঽপচয়চ্যুতঃ।
হেয়গ্রাহ্যোজ্ঝিতো দেশকালজাত্যাদ্যসঙ্গতঃ ॥ ২৫

আত্মা চিদ্‌রূপ, নির্মল, জ্ঞানস্বরূপ, ক্ষয়রহিত, ত্যাজ্যগ্রাহ্যভাববিহীন, এবং দেশকালজাতি আদি সহ সম্পর্কশূন্য।

ব্রহ্মাণ্ডে চ যথা বায়ু সর্বভূতগতস্তথা।
স এব ভগবানাত্মা তনুমুক্তো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৬

এই ব্রহ্মাণ্ডে বায়ু যেরূপ সর্বভূতে বিদ্যমান থাকিয়াও অসঙ্গ, পরমেশ্বরও তদ্রূপ সর্বপ্রাণীতে ব্যাপক থাকিয়াও সর্বপ্রাণি-শরীর হইতে মুক্ত অর্থাৎ অসঙ্গরূপে স্থিত। তিনিই আত্মা।

এবং চিদ্‌গগনাভোগে ভূষণে ব্যোম্নি ভাস্করে।
ধরাবিবরকোশস্থা সৈব চিৎ কীটকোটরে ॥ ২৭

যে চৈতন্য বিশাল গগন-বিস্তারে ও (ক্ষুদ্র) ভূষণে; যাহা আকাশস্থ সূর্যে ও পৃথিবীর গহ্বরে বিদ্যমান, সেই চৈতন্যই কীটমধ্যেও বিরাজমান। (শ্রুতি বলিয়াছেন—'আত্মা মশকে ও হস্তীতে তুল্যরূপে বিদ্যমান।—বৃহঃ ১।৩।২২)

ন বন্ধোঽস্তি ন মোক্ষোঽস্তি ব্রহ্মৈবাস্তি নিরন্তরম্।
নৈকমস্তি ন চ দ্বৈতং সংবিৎ স্ফারং বিজৃম্ভতে ॥ ২৮

বস্তুতঃ বন্ধ-মোক্ষ, একত্ব-দ্বৈত কিছুই নাই, উহা সবই কল্পিত মিথ্যা ব্যবহারমাত্র। এক ব্রহ্মই নিরন্তর বিদ্যমান। সর্ববৃহৎ (ও জ্ঞানস্বরূপ) সেই ব্রহ্মই একমাত্র প্রকাশমান।

ব্রহ্ম চিদ্ ব্রহ্ম ভুবনং ব্রহ্ম ভূতপরম্পরা।
ব্রহ্মাহং ব্রহ্ম মচ্ছত্রু র্ব্রহ্ম মন্মিত্রবান্ধবাঃ ॥ ২৯

ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। সর্বলোকসকল, প্রাণিনিচয়, আমি স্বয়ং, আমার (দেবদত্তাদি) শত্রু এবং আমার মিত্র ও বান্ধববর্গ—সবই ব্রহ্ম (এইরূপ অবধারণ কর)।

চিচ্চেত্যকলনা বন্ধস্তন্মুক্তির্মুক্তিরুচ্যতে।

চিচ্চেত্যখিলমাত্মেতি সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহঃ॥ ৩০

ভাস্য-ভাসক অর্থাৎ প্রকাশ্য-প্রকাশক ইত্যাদি কল্পনাই বন্ধ। ঐ কল্পনার অভাবের নামই মুক্তি। প্রকাশ্য প্রকাশক যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয় সবই আত্মা। আত্মা ভিন্ন কিছুই নাই—ইহা সর্ববেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

চিদিহাস্তীহচিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ।

চিত্ত্বং চিদহমেবেতি লোকাশ্চিদিতি সংগ্রহঃ॥ ৩১

এখানে (এই পরিদৃশ্যমান জগতে) চিৎ (চৈতন্য আছে, একমাত্র চিৎই আছে। যাহা কিছু দেখা যাইতেছে তাহা চিন্ময় চিতের, বিবর্ত।) তুমি, আমি, এই সব লোক চিৎই—ইহাই সার সিদ্ধান্ত। (চিৎ ভিন্ন আর কিছুই নাই; প্রতীতি ও প্রতীয়মান চিৎই চিৎ।)

যদস্তি যস্তাতি তদাত্মরূপং

যচ্চান্যতো ভাতি ন চান্যদস্তি।

স্বভাবসংবিৎ প্রতিভাতি কেবলো

গ্রাহ্যং গ্রহীতেতি মৃষা বিকল্পঃ॥ ৩২

ইতি যোগবাসিষ্ঠসারে আত্মনিরূপণং নাম নবমং প্রকরণম্।

যাহা কিছু সত্তা এবং প্রকাশ তাহাই আত্মস্বরূপ, অন্যের দ্বারা বা অনুরূপে যাহা প্রতীত হয় (যেমন নাম-রূপ) তাহা নাই। কেবল বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ সংবিৎ বা জ্ঞানমাত্রই বিরাজমান। গ্রাহ্য-গ্রহীতা ইত্যাদি কল্পনা মিথ্যা—এইরূপ বোদ্ধব্য।

যোগবাসিষ্ঠসার গ্রন্থের আত্মনিরূপণ নামক নবম প্রকরণ সমাপ্ত।

পথিকের ডায়েরী

স্বামী চেতনানন্দ

আজ, ৩১শে মে, ১৯৭১, বোম্বাই শহরের 'গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়ায়'[১] স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা উৎসব দেখে শেষ রাত্রে প্লেন-এ উঠলাম। আমার গন্তব্যস্থল আমেরিকার দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ার বেদান্ত সোসাইটি।[২]

বোম্বাই থেকে যখন রওনা হলাম তখন বৃষ্টি। সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। পথঘাট ভেসে গেছে। কোনমতে একটা জীপে করে হাইওয়ে দিয়ে সান্তাক্রুজ বিমান বন্দরে এলাম। আমার সঙ্গে তিনজন সন্ন্যাসী ছিলেন। রাজকোট আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্থানন্দজী আশ্রমের গেটের কাছে এসে বললেন, 'গাড়ী থেকে ঠাকুরকে প্রণাম কর। ঐ দেখ মঙ্গলারতি হচ্ছে। তোমার যাত্রামঙ্গল হয়ে গেল।' তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি। জামাকাপড় আধভেজা।

যাহোক এয়ার ইণ্ডিয়ার বোয়িং ৭০৭-এ উঠলাম। প্লেনের নম্বর AI 503। প্লেন ছাড়ল সাড়ে ছটায়; ৫৮০ মাইল বেগে ছুটে চলল। বোম্বাই থেকে প্রথমে আরব সাগর, ইরান, কাস্পিয়ান সাগর হয়ে প্লেন ঢুকল রাশিয়ার মধ্যে। প্লেনের ঘোষক সব বলতে লাগলেন, আমরা কত হাজার ফুট উঁচু দিয়ে, কত বেগে, কোন্ কোন্ দেশের উপর দিয়ে চলেছি।

ইরানের উপর দিয়ে আসবার সময় নীচে দেখলাম বিস্তীর্ণ মরুভূমি। কেবল বালুকার পাহাড়। কাস্পিয়ান সাগরের উপর যখন এলাম তখন দুপুরের খাবার পরিবেশন সবে শুরু হয়েছে, এমন সময় প্লেন প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়ল। বেল্ট বাঁধার নির্দেশ ঘোষিত হল। আমরা দুর্যোগের মধ্যে পড়েছি। কিছুক্ষণ পরে প্লেনটি একবার উপরে, একবার নীচে এমনি করতে করতে ঝড় পার হল। আরব সাগরের উপরেও ঝড় হয়েছিল, তবে এতটা নয়।

ঝড় থামলে দুপুরের খাওয়া হল। ভারতীয় বেলা তখন আড়াইটা। আর মস্কোর সময় প্রায় ১২টা। প্লেন থেকে নেমে আমরা চললুম লাউঞ্জে—১ ঘণ্টা সব ঘুরে দেখলাম। এয়ারপোর্ট থেকে বাইরে বেরুবার অনুমতি মেলে না। টুরিস্টদের জন্য সব দোকান সাজানো রয়েছে। কেনাকাটা করতে পারে। দেখাশোনা চলতে পারে। ঘড়ি, রেডিও, পোশাক, খেলনা, খানাপিনা সব সাজানো রয়েছে। লোকগুলি ধবধবে ফরসা। মুখে হাসি নেই। কথাও খুব কম। কিন্তু কর্মে খুব পটু এবং কর্তব্যপরায়ণ। রোগা চেহারা একটিও দেখলাম না। মানুষগুলি যেন মেশিনের মতো চলছে।

মস্কো থেকে ১ ঘণ্টা পরে আবার প্লেন ছাড়ল। সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে পৌঁছাল প্যারিসে। এয়ারপোর্টের নাম Orly। যেমন কলকাতার এয়ারপোর্টের নাম দমদম।

Orly-তে এসে দেখি আমাকে কেউ নিতে আসেনি। জিনিস নিয়ে ট্যাক্সী-স্ট্যাণ্ডে

১ এখান থেকেই ৭৮ বৎসর পূর্বে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য জাহাজে উঠেছিলেন।

২ লেখক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃক হলিউড বেদান্ত সোসাইটির কর্মরূপে প্রেরিত হইয়াছেন—স:

ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। মস্কো থেকে ভারতীয় দূতাবাসের একজন কর্মী আসছিলেন। তাঁকে বললাম—আমি নূতন এসেছি। আমাকে একটু সাহায্য করুন। তিনিও প্যারিসে সবে প্রথম আসছেন একটা বিমানবহরের একজিবিসন দেখতে। তাঁকে নিতে এসেছিলেন প্যারিসের ভারতীয় দূতাবাসের মিস্টার ও মিসেস সহায়। ভদ্রলোকের বাড়ী গোরখপুর, শ্বশুরবাড়ী লক্ষ্ণৌ। ভদ্রলোক একটু ফরাসী জানেন। তিনি আমার অবস্থা দেখে ফোন করতে গেলেন আশ্রমে। আশ্রম প্যারিস থেকে ২০।২৫ মাইল দূরে Gretz নামে একটি সুন্দর শহরতলীতে। অতি কষ্টে প্রায় ১ ডলার ব্যয় করে যোগাযোগ করা গেল। কথা বলতে গিয়ে দেখি একজন মহিলা কথা বলছেন ফরাসী ভাষায়। কিছুই বুঝলাম না। তারপর ভদ্রলোককে দিলাম। তিনি খবর নিয়ে জানলেন যে, আশ্রমের দুজন স্বামীজীই বেরিয়ে গেছেন। ফিরবেন সন্ধ্যা ৬-৩০ টা অর্থাৎ ভারতীয় সময় রাত ১১ টা। মিঃ সহায় তাঁর বাসার ঠিকানা ও আমার সংবাদ দিয়ে দিলেন আশ্রমস্থ মহিলার কাছে। যাহোক ২ ঘণ্টা এয়ারপোর্টে থেকে মিঃ সহায়ের সঙ্গে তাঁর প্যারিসের বাসায় চলে গেলাম। সেখান থেকে দূতাবাসের মারফত আবার ফোন করা হল। মিঃ সহায়ের ফোনে যোগাযোগ করে আশ্রমে কথা বললাম স্বামী বিদ্যাত্মানন্দজীর সঙ্গে। ইনি আমেরিকান সন্ন্যাসী। তিনি বললেন যে, তিনি Orlyতে ২ ঘণ্টা থেকে সবে আশ্রমে ফিরেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখা হয়নি। অথচ আমার পরনে ছিল গেরুয়া। তিনি অন্য গেট-এ দাঁড়িয়েছিলেন। যাহোক ফোন পাওয়ামাত্র তিনি ২ ঘণ্টার মধ্যে মিঃ সহায়ের বাসায় ছুটে এলেন আমাকে নিতে।

ফ্রান্সে ঘোরা খুব মুস্কিল। ভাষা না জানলে বিপদ। কেউ ইংরেজী বলবে না। এতই ভাষা-প্রীতি। এয়ারপোর্টে ট্যাক্সি ভাড়া করতে গিয়েছিলাম। চাইল ১২০ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় ২০০ টাকা। পথ তো প্রায় ২০ মাইল। মিঃ সহায় বললেন—'ওটি করবেন না। একে আপনার পরনে গেরুয়া, তারপর ভাষা জানেন না—বিদেশী। আপনার পথে গিয়ে মুস্কিল হতে পারে। আমার সঙ্গে চলুন। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

বোম্বাই ছাড়ার পরে ২০ ঘণ্টা হয়ে গেছে। আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর। পকেটে ১০০ ডলারের চেক। ফরাসী মুদ্রা নেই। ভাগ্যিস বোম্বাই থেকে ৬২ টাকা দিয়ে ৮টা ডলার কিনে এনেছিলাম—নতুবা ফোন করতে পারতুম না। ফ্রান্সে জল বড় একটা কেউ খায় না; কেবল মদ চলে। যাহোক মিসেস সহায় আমাকে যত্ন করে জল, চা, বিস্কুট, বাদাম, ফল খেতে দিয়েছিলেন।

প্যারিসে নামার আট ঘণ্টা পরে আমি আশ্রমে পৌঁছাই। তখন প্যারিসের সময় রাত ১০টা আর ভারতীয় সময় রাত আড়াইটা। আশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী ঋতজানন্দজী এগিয়ে এলেন। রাতের খাওয়া খেয়ে শুতে গেলাম। ক্লান্তিতে তখন দেহ-মন অবসন্ন।

তারপর দিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে ঋতজানন্দজীর সঙ্গে গোটা আশ্রম ঘুরে দেখলাম। অপূর্ব পরিবেশ। ৮ জন ব্রহ্মচারী, ৪ জন ব্রহ্মচারিণী রয়েছেন। ব্রহ্মচারীরা কেউ বৃটিশ, কেউ ডাচ, কেউ ফরাসী, কেউ জার্মান। আশ্রমের চাষবাস থেকে রান্না পর্যন্ত সব কাজ

ওঁরা করেন। সকাল-সন্ধ্যায় ১ ঘণ্টা করে ধ্যান, পাঠ, ভজন চলে। আর বেলা ১১টায় ঠাকুরের পূজা একজনে করে। কাজ সব সময় পালাক্রমে চলে – যাতে একঘেঁয়ে না হয়। কী কর্মঠ আর উৎসাহী ওঁরা! গানবাজনার জন্য একটা ঘর আছে। তবলা, তানপুরা হারমনিয়াম, খঞ্জনী দিয়ে ওঁরা ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের সঙ্গীত গান। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিব-শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক অনেক গান ওঁরা জানেন। বেশ গান। রাতে খাওয়ার পর সঙ্গীত, পাঠ ও নানারকম আলাপ হয়। আমি কি করে সাধু হলাম—বলতে হল একটি ডাচ ব্রহ্মচারীর অনুরোধে। আমি ইংরেজীতে বললাম। ঋতজানন্দজী ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে বলে দিলেন। কয়েকজন ইংরেজী জানেন না।

একজন মহিলা বললেন—বাংলাভাষায় 'রামকৃষ্ণ' উচ্চারণটা কেমন হবে? আমি বললাম। তিনি বারবার আমার মতো উচ্চারণ করে আবৃত্তি করতে লাগলেন।

মেয়েদের বাসস্থান আশ্রমের আর এক প্রান্তে। একজন ৮০ বছরের বৃদ্ধা আছেন। তিনি একজন ফরাসী রাজদূতের স্ত্রী ছিলেন। তাই তাঁর নাম 'আম্বা'। তিনি ফরাসী ভাষায় আমাদের 'Vedanta' পত্রিকার কাজ দেখেন। পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক।

একজন বছর খানেক হল আশ্রমে এসেছেন, নাম বারবারা। বিরাট ধনীর মেয়ে। কিন্তু ভবঘুরে হিপিদের দলে মিশে আমেরিকা থেকে চলে আসেন। তারপর ভাগ্যক্রমে আশ্রমে এসে পড়ে। তাঁর বাপ-মা এসেছিলেন মেয়েকে দেখতে। তাঁরা দুজনেই খুশী যে তাঁদের মেয়ে একটা সৎ প্রতিষ্ঠানে এসেছে। এঁরা আশ্রমকে নানাভাবে সাহায্য করছেন।

এবার পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্টিকেন্দ্র প্যারিস ভ্রমণের কথা। আজ ৩রা জুন, ১৯৭১। সকালে চললাম গাড়ীতে Provins-এ। ফরাসী ভাষায় 'প্রভাঁ'। আশ্রম থেকে ২৫।৩০ কিলোমিটার দূরে। খুব প্রাচীন শহর। ভাঙ্গা গীর্জা। পুরো পাড়াগাঁ। চাষের ক্ষেত। সবুজ শস্যক্ষেত্র। প্রভাঁর গোলাপ খুব বিখ্যাত। ফুলের অপূর্ব শোভা। এই প্রভাঁতে জোয়ান অব আর্ক তদানীন্তন ভগ্নপ্রায় ফরাসী সম্রাটকে অভিষেক করেন এবং যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দেন। একটা গীর্জা দেখলুম যার নীচে পূর্বে প্রজারা ১০% শস্য মজুত রাখত এবং যুদ্ধের সময় তা ব্যবহার করত। তার নীচে আবার সুড়ঙ্গপথ আছে —যেখান দিয়ে দূরে পালিয়ে যাওয়া যায়।

বিকালে চললুম ঋতজানন্দজীকে Orly এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে। তিনি ২ মাস অন্তর ৩।৪ দিনের জন্য Wiesbaden-এ (জার্মানির একটি শহর) যান। জার্মানিতে যদিও আমাদের আশ্রম নেই তবুও সেখানে বেদান্তের ও শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু অনুরাগী ভক্ত আছেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করতে যান।

এয়ারপোর্টে ঋতজানন্দজীকে পৌঁছে দিয়ে আমি ও বিদ্যাত্মানন্দজী (ইনি আমেরিকান সন্ন্যাসী, পূর্বাশ্রমের নাম জন ইয়েল, ইনিই ছিলেন আমার সঙ্গী) চললুম ভার্সাই-এর (Versailles)-এর রাজপ্রাসাদ দেখতে। আমি যে কয়টি রাজপ্রাসাদ দেখেছি, ভারতে ও বিদেশে, তার মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ। সঙ্গী বলছিলেন—এটি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পরে একদিন হলিউডে ক্রস্টফার ইশারউড বলছিলেন যে ভিয়েনার রাজপ্রাসাদ নাকি আরও সুন্দর।

ভার্সাই প্যারিস থেকে বেশ কিছুটা দূরে।

ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ লুই-এর অনুপম কীর্তি এই ভার্সাই। এই রাজপ্রসাদের বিলাসবৈভব অতুলনীয়। এত বিরাট আকারে করার পিছনে ফরাসী রাজাদের আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। সেটা হল ছোট ছোট লর্ড বা ব্যারনদের বশীভূত করা।

এই প্রাসাদে আছে অজস্র সুসজ্জিত কক্ষ। কক্ষগুলির নীচ থেকে ছাদ পর্যন্ত অজস্র চিত্রে ভরা। এর মধ্যে কি নেই! অপেরা, গীর্জা, সঙ্গীত, ক্রীড়া, লাইব্রেরী, শান্তি, শয়ন, ভোজন, বিলাস প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক কক্ষ। মন্ত্রি-সভার জন্যও আলাদা কক্ষ। কথিত আছে, ভার্সাই-এর রয়াল চাপেলে রাজা লুই খ্রীষ্টের দিকে তাকিয়ে উপাসনা করছিলেন। আর প্রজারা খ্রীষ্টের দিকে পিছন ফিরে রাজার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। কারণ তাদের কাছে রাজাই ছিল ঈশ্বরের চেয়ে বড়।

ফরাসী প্রজাদের রক্ত চুষে এই ঐশ্বর্য। মাদাম পোম্পাডুর ও মেরী অ্যানটয়েন্ট প্রভৃতি সম্রাজ্ঞীদের খেয়াল ও বিলাসের চরিতার্থতা। আর এর ফলে হল ফরাসী বিপ্লব। ক্ষিপ্ত ফরাসীরা রাজা ও রানীর শিরশ্ছেদ করল। দীর্ঘ শত শত বছর ধরে ফরাসী শিল্পীরা যে প্রাসাদ রচনা করেছিল, বিপ্লবীরা তা ভেঙ্গে তছনছ করল। আসবাবপত্র সব বেচে দিল।

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টি কিন্তু এ ব্যাপারে তীক্ষ্ণভাবে পড়েছে। তাঁর ভাষায়: "এই ফ্রান্স স্বাধীনতার আবাস। প্রজাশক্তি মহাবেগে এই পারী নগরী হতে ইউরোপ তোলপাড় করে ফেলছে; সেই দিন হতে ইউরোপের নূতন মূর্তি হয়েছে। সে 'এগালিতে, লিবার্তে, ' (Equality, Liberty, Fraternity) ধ্বনি ফ্রান্স হতে চলে গেছে, ফ্রান্স অন্য ভাব, অন্য উদ্দেশ্য অনুসরণ করছে, কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য জাত এখনও সেই ফরাসী বিপ্লব মক্স করছে।"

এই প্রাসাদের প্রমোদকক্ষে (২৪৩ ফুট দীর্ঘ ও ৩৪টি বিরাট কাচের জানালা) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তারিখটি ছিল ২৮শে জুন, ১৯১৯। একেই বলে ভার্সাই-এর সন্ধি।

আজ ৪ঠা জুন, ১৯৭১। সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে বিদ্যাত্মানন্দজীর সঙ্গে প্যারিসের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে বেরুলাম। গ্রেজ থেকে প্যারিসে পৌঁছাতে ট্রেনে ৪৫ মিঃ লাগে। গাড়ী নেওয়া হয়নি, কারণ প্যারিসে গাড়ী চালানো খুব বিপজ্জনক; তা ছাড়া পার্ক করা আরও মুস্কিল। সঙ্গী বলছিলেন—এখানে সপ্তাহে দুর্ঘটনায় মরে ৪০।৫০ এবং আহত শতখানেক। কি বেপরোয়া গাড়ী চালায়—দেখলে মাথা ঘুরতে থাকে! ঘণ্টায় ৮০ থেকে ১২০ মাইল হল সাধারণ গতি। ঘণ্টায় ১৪০ মাইলও কেউ কেউ চালায়।

যাহোক প্যারিসে নেমে টিউব ট্রেন ধরে শহরের মধ্যস্থান এবং ফরাসী দেশের বিখ্যাত গীর্জা নটার ডাম (Notre Dame) দেখতে চললাম। Notre Dame কথাটার অর্থ হল Our Lady Virgin Mary. সাত-আটশো বছরের পুরানো এই গীর্জা। পুরানো হলেও নটার ডাম জীবন্ত। সে এখনও বেঁচে আছে গ্রীষ্মের সূর্যালোকের ন্যায়, বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায়, বসন্তের সবুজ বনানীর মতো আর ক্রীড়াচঞ্চল প্রকৃতির মতো। নটার ডাম দেখতে দেখতে ক্লান্তি আসে না—যেমন পুরীর জগন্নাথ-দর্শন পুরানো হয় না। ফরাসীদেশের যে কোন রাস্তা শেষে মিলিত হয়েছে এই কেন্দ্র-বিন্দু নটার ডামে।

বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত নটার ডামের কাচের

জানালাগুলি অপূর্ব। অত বড় জানালা পাশ্চাত্যদেশের কোন গীর্জায় নেই—সঙ্গী বললেন। গীর্জার চারপাশে রয়েছে বহু বিশপের সমাধিস্থান। একপাশে দেখলাম কতকগুলি Confessional booth অর্থাৎ দোষ-স্বীকারের স্থান। ছোট ছোট ঘর—মাঝখানে পর্দা বা কাঠের দেওয়াল। একটা ঘরে পুরোহিত বসেন, আর একটা ঘর থেকে জনৈক ব্যক্তি তার নিজের জীবনের পাপ ও অপরাধ স্বীকার করে। তখন পুরোহিত তাকে উপদেশ দেন বা খ্রীষ্টের নামে ক্ষমা করেন। কেউ কারো মুখ দেখতে পান না।

নটার ডামের উপর ভিক্টর হিউগো তাঁর এক বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করেছেন। এর পর একটা প্রাচীন গ্রীক চার্চ দেখতে গেলাম। উভয় গীর্জাতে রয়েছে প্রাচীন Gothic স্থাপত্যের ছাপ।

সঙ্গী বললেন—এ গীর্জার Mass (খ্রীষ্টের নৈশ ভোজনোৎসবপর্ব) উদ্‌যাপিত হয় একটা পর্দার আড়ালে কিন্তু অন্য সব গীর্জায় হয় সকলের সামনে। আর একটা বিশেষত্ব হল একটা শবাধার রাখা হয়। তখন কল্পনা করা হয়—ওটা খ্রীষ্টের মৃতদেহ। তখন সবাই শোকে মুহ্যমান। তারপর হঠাৎ ওটা সরিয়ে দেওয়া হয় এবং বেদীর উপরে কল্পনা করা হয় Resurrection অর্থাৎ খ্রীষ্ট আবার বেঁচে উঠেছেন।

তারপর চললাম সোরবন প্রাসাদে। ১২৫৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—"এই পারী বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের আদর্শ। দুনিয়ার বিজ্ঞানসভা এদের একাডেমীর নকল। এই পারী ঔপনিবেশ সাম্রাজ্যের গুরু। সকল ভাষাতেই যুদ্ধশিল্পের সংজ্ঞা এখনও অধিকাংশ ফরাসী। এদের রচনার নকল—সকল ইউরোপী ভাষায়। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পের এই পারী খনি। সকল জায়গায় এদের নকল।"

এখানকার ধর্মেতিহাস সভায় ১৯০০ খৃঃ স্বামীজী বক্তৃতা করেন। কোন্ ঘরে সভাটি হয়েছিল তা দেখবার জন্য আমি ও সঙ্গী খুব ঘুরলাম। বিদ্যাত্মানন্দজী প্রবুদ্ধ ভারতে (১৯৬৯ সালের মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যায়) 'Vivekananda at the Paris Congress, 1900' এই শীর্ষে একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বললেন যে, তিনিও সঠিক ঘরটি বের করতে পারেননি।

বাঙালীদের মতো ফরাসী ছেলেমেয়েদের মধ্যেও ধর্মঘটের হিড়িক লক্ষ্য করলাম। সোরবনের ভিতরে সব প্লাকার্ড নিয়ে ছেলে-মেয়েরা বসে আছে।

সোরবনে 'ভারতীয় কৃষ্টি' বিভাগেরও একটি শাখা আছে। সব দেখার পর একটা পার্কে বসলাম, কারণ তখনও লাঞ্চের সময় হয়নি। সঙ্গী বলছিলেন—'এত ভোগী যে ধর্মকথা শুনতে চায় না। এরা তিনবার চার্চে যাবে—জন্মকালে, বিবাহের সময় আর মৃত্যুর সময়।' স্বামীজীর ভাষায়—"এ ফরাসীর লোক কেবল মস্তিষ্কচর্চা, ইহলোক-বাঞ্ছা ; ঈশ্বর বা জীব—কুসংস্কার বলে ধারণা, ওসব কথা কইতেই চায় না !!! আসল চার্বাকের দেশ ! তবে এদেশ হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার শীর্ষ। পারী নগরী পাশ্চাত্য সভ্যতার রাজধানী।"

তারপর চললুম এক হোটেলে খেতে। মিঃ হো নামে এক ভিয়েতনামবাসী এর মালিক! তিনি ছিলেন না, তাই তাঁর মেয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করল। ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল—'কি খাবেন ?' তারপর

ভাত, বীনের শিকড় দিয়ে চীজ-মেশান ঝোল, চাটনী, লঙ্কা প্রভৃতি দিল। ঝোল একটু মুখে দিতেই বমি হবার যোগাড়। কী গন্ধ! সঙ্গী তো সব খেলেন। তারপর মেয়েটি আমার অবস্থা দেখে আর এক বাটি সাদা ভাত এনে দিল। শুধু ভাত নুন দিয়ে খেতে লাগলাম। তারপর শেষে ময়দার গোলা মাখিয়ে ভাজা একটা কলা দিল। তার উপর মদ ছড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারপর খায়। আমি বললুম—মদ ও আগুনের দরকার নেই। এমনিই খেতে পারব। জল বোতলে করে কিনে খেতে হয়। ফরাসীরা জল বড় একটা খায় না—মদ খায়। তবে বিভিন্ন রকমের জল বোতলে করে বিক্রী হয়—লিভারের জন্য, কিডনির জন্য, হজমের জন্য ইত্যাদি

খাওয়ার পর টাকা দিতে গেলে মেয়েটি ফরাসী ভাষায় বলল—'না, টাকা নেব না। আপনারা হিন্দু সন্ন্যাসী। আমার বাবা আজ বাইরে গেছেন—যদি দয়া করে কাল এসে আমার বাবার সঙ্গে দুপুরে খান তবে আমরা বিশেষ গৌরববোধ করব।' আশ্চর্য! আমার পরনে ছিল গেরুয়া। পরে সঙ্গী বললেন -'এরা ঠাকুরের ভক্ত। ঠাকুরের উৎসবের সময় মিঃ হো সপরিবারে গ্রেজ আশ্রমে যান এবং উৎসবের দিন ভক্তদের খাওয়া-দাওয়ার ভার নেন।'

তারপর ল্যাটিন কোয়াটারের ভিতর দিয়ে সেন্ট মাইকেল মূর্তির সামনে দিয়ে বাজারের দিকে এগিয়ে চললাম। রাস্তার দুপাশে অসংখ্য হোটেল ও রেস্তোরাঁ। সব বসে বসে খাচ্ছে আর গল্প করছে। আমি সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলাম—'এত ছেলে মেয়ে, নারী পুরুষ যে রেঁস্তোরাতে খাচ্ছে? এদের বাড়ী ঘর দোর নেই?' সঙ্গী বললেন—'এরা বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে। বিভিন্ন জায়গায় এরা ঘরভাড়া করে থাকে কিন্তু নিজেদের রান্নার ব্যবস্থা নেই। এরা বছরের পর বছর এই সব রেস্তোরাঁতে খেয়ে কাটায়।' পরে শুনলাম যে, স্নানের ব্যবস্থাও নেই। সপ্তাহে একবার কি দুবার পাবলিক বাথ-এ স্নান করে আসে। আজব দুনিয়া!

মনে দীর্ঘ দিনের একটা ইচ্ছা ছিল যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মিউজিয়ম দেখব। সিয়ান নদী পেরিয়ে চললুম লুভারের দিকে (Louvre—তবে এরা উচ্চারণ করে 'লুভ')। শিল্পের পরাকাষ্ঠা এই লুভ। পৃথিবীর বিখ্যাত সংগ্রহশালা। খুব বিফলমনোরথ হলাম। গিয়ে দেখি দরজায় বড় করে কাগজে লেখা—'STRIKE'। কতকগুলি কর্মী গেট বন্ধ করে অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন। দাবী—বেতনবৃদ্ধি। হুবহু বাঙ্গালী-চরিত্র। দেশ-বিদেশের লোক ফিরে যাচ্ছে।

সঙ্গী খুবই দুঃখিত হলেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "মহাপুরুষেরা মরবার সময় একটা বাসনা রেখে মরে, যাতে জগৎকল্যাণে তিনি আবার ফিরে আসতে পারেন। তোমাকেও তেমনি আবার প্যারিসে আসতে হবে এই লুভারের মিউজিয়াম দেখতে।" ফ্রান্স ছাড়বার সময় সঙ্গী তাঁর 'The Masterpieces of Painting in the Louvre' নামে মূল্যবান গ্রন্থখানি দিয়ে দিলেন।

লুভারের চিত্রশালার উপর বারান্তরে কিছু লিখবার ইচ্ছা রইল। মোটকথা ইটালিয়ান, স্পানিশ, ফ্লেমিশ, ডাচ, জার্মান, ইংলিশ ও ফ্রেঞ্চ—এই সাতটি স্কুলের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের শিল্পনৈপুণ্য ছড়ানো রয়েছে এই লুভারের চিত্রশালায়। শিল্পী রং ও তুলি দিয়ে কি করে নিষ্প্রাণের মধ্যে প্রাণ, ছন্দ ও গতি আনতে

পারে লুভারের চিত্রাবলী তার জলন্ত উদাহরণ।

এগিয়ে চললাম লুভারের সামনে দিয়ে। বিরাট উদ্যান। তারপর ফরাসী প্রেসিডেন্টের বাসভবন। আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল ছিল—6 Place Def Etats Unis। এটি ছিল মিঃ লেগেটের প্যারিসের ভাড়াটিয়া বাড়ী। স্বামীজী ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এই বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। বাড়ীটির বর্তমান মালিক মিঃ উইকার্ট (Mr. Wicart)। ইনি মেয়েদের মাথার চুলের ব্যবসা করে এখন কোটি-কোটি-পতি। তারপর ও-ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এখন Art Gallery খুলেছেন। বাড়ীটির একতলা ও দোতলা অপূর্ব সাজে সজ্জিত। রং-বেরং কার্পেট। দেওয়ালের গায়ে অজস্র Painting। শিল্পপ্রিয় ফরাসীজাতির ঘরে ঘরে Painting থাকবেই থাকবে।

বাড়ীটির দোতলায় উঠলাম। সঙ্গীর সঙ্গে রাস্তার দিকের গ্যালারীতে বসলাম। তারপর দুজনে ঐ বাড়ীর ইতিবৃত্ত আলোচনা করতে লাগলাম। স্বামীজী কোন্ ঘরে ছিলেন এবং কোথায় বসে 'খেয়ালী কংগ্রেসের' সভা হয় (স্বামীজীর পত্র : ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ দ্রষ্টব্য)—সব ভাবতে লাগলাম।

মিঃ উইকার্টের সঙ্গে আমার সঙ্গীর কি-ভাবে যোগাযোগ হল—সে এক ইতিহাস। বিদ্যাত্মানন্দজী তখন 'ফ্রান্সে স্বামীজী' এই পর্যায়ে গবেষণা করছিলেন। তারপর এই বাড়ীতে এলেন। বিবেকানন্দের কথা শুনে উইকার্ট খুব উৎসাহ দেখালেন এবং ঐরূপ এক মহামানবের সঙ্গে তাঁর বাড়ীর যোগ রয়েছে জেনে তিনি খুশী হলেন। তিনি বিদ্যাত্মা-নন্দজীকে ঐ বাড়ীর সর্বত্র ঘোরাফেরার ও গবেষণা করবার অনুমতি দিলেন। শুধু তাই নয়—তার আর্ট গ্যালারীর নিচের হল সপ্তাহে একদিন ক্লাশের জন্য ছেড়ে দিলেন। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বামী ঋতজানন্দজী গ্রেজ থেকে প্যারিসে ফরাসী ভাষায় ক্লাস করতে আসেন। ৩০।৪০ জন বেদান্তের অনুরাগী ভক্ত আসেন।

বাড়ীটি প্যারিসের ভদ্র-ও ধনিপল্লীর উপর। সামনে একটা পার্ক। বাড়ীর বাইরে এসে রাস্তা পেরিয়ে পার্কে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলুম। 6 No.টা বড় অক্ষরে লেখা। সঙ্গী জিজ্ঞাসা করলেন—"কি ভাবছ ? এ বাড়ীটি তোমার মনে ভবিষ্যতের কোন কল্পনাকে কি নাড়া দিচ্ছে ? বল—এ বাড়ীটি আমরা যদি পাই তবে কি করা যেতে পারে ? তবে মনে রেখ—এ বাড়ীটির মূল্য লক্ষ লক্ষ ডলার—যা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।"

আমি একটু থেমে বললাম—'ক্ষমতার বাহিরে ঠিকই। তবে স্বামীজীর ইচ্ছায় হয়তো কালে এ বাড়ী আমাদের এসে যেতে পারে। আর কল্পনা ?—হাঁ, এই ভোগোন্মত্ত, ইন্দ্রিয়-সুখে তৎপর ফরাসীদের জন্য এখানে একটি বেদান্তকেন্দ্র খুললে তাদের মহাকল্যাণ হতে পারে। ইন্দ্রিয়সুখ যে চরম সুখ নয়—এ মহান বাণী বেদান্তই ঘোষণা করছে।'

কথা বলতে বলতে আমরা এগুতে লাগলাম। এরপর যাব ইফেল টাওয়ারে। গগনচুম্বী লোহার গম্বুজ। ৯৮৪ ফুট উঁচু আলেকজাণ্ডার গুস্তাভ ইফেল নামে এক ফরাসী ইঞ্জিনিয়র ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রদর্শনীর সময় তৈরি করেন। লিফটে উপরে উঠলাম। প্রথমতলায় বিরাট হোটেল আছে। স্বামীজী নিবেদিতা ও ম্যাকলাউডের সঙ্গে এখানে একদিন ভোজন করেন। তারপর উপরের তলায় উঠলাম, সেখান থেকে গোটা প্যারিস

শহর অপূর্ব দেখায়!

প্যারিসে আরও অনেক দর্শনীয় স্থান দেখলাম। তার মধ্যে পার্লামেণ্ট, নেপোলিয়নের সমাধিস্থান, বিজয়তোরণ, ন্যাশনাল একাডেমী অব মিউজিক। একটা আমেরিকার চার্চ দেখিয়ে সঙ্গী বললেন—'এখানে মিঃ লেগেটের সঙ্গে ম্যাকলাউডের বোনের বিয়ে হয়। আর সে বিয়েতে স্বামীজী উপস্থিত ছিলেন।'

স্বামীজীকে অবলম্বন করে আমার প্যারিস-ভ্রমণ, তাই আবার তাঁর কথাতে ফিরে যাই: "এ ইউরোপ বুঝতে গেলে, পাশ্চাত্ত্য ধর্মের আকর ফ্রান্স থেকে বুঝতে হবে। পৃথিবীর আধিপত্য ইউরোপে, ইউরোপের মহাকেন্দ্র পারী।"

"এ পারী এক মহাসমুদ্র—মণি মুক্তা, প্রবাল যথেষ্ট, আবার মকর কুম্ভীরও অনেক।"

"এ পারী নগরী সে ইউরোপীয় সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ। এ বিরাট রাজধানী মর্ত্যের অমরাবতী, সদানন্দ নগরী। এ ভোগ, এ বিলাস, এ আনন্দ না লণ্ডনে, না বার্লিনে, না আর কোথাও।...এ অদ্ভুত ফরাসীচরিত্র প্রাচীন গ্রীক মরে জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছ্যাবলা আবার অতি গম্ভীর। সকল কার্যে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু নৈরাশ্য ফরাসীমুখে বেশীক্ষণ থাকে না, আবার জেগে উঠে।"

আজ ৫ই জুন। প্যারিস এয়ারপোর্টে এলাম সকালে। লণ্ডনের প্লেন দুঘণ্টা দেরীতে পৌঁছুবে, খবর পেলাম। দিব্যাত্মানন্দজীর সঙ্গে ইউরোপে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। একটা ফরাসী পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও গ্রেজ সম্বন্ধে এক বিরাট ছবিসহ প্রবন্ধ ছেপেছে, পত্রিকাটি খুব জনপ্রিয়, প্রচার লক্ষ কপির কাছাকাছি: ক্রমাগত বক্তৃতা, ক্লাস, গ্রন্থ, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ধ্যানধারণার উপর জিজ্ঞাসা ইত্যাদি লেগেই রয়েছে! চাই আরো ভারতীয় সন্ন্যাসী। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা

Pasupata-sutram with Pancharthabhasya of Kaundinya (translated with an Introduction to the study of Saivism in India) : শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী, এম. এ. (ডবল), পি. এইচ-ডি.। প্রকাশক—অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা ৯। পৃঃ ২২৩; মূল্য ২০৲ টাকা।

কৌণ্ডিন্যের ভাষ্যসংবলিত পাশুপতসূত্রে শৈবতত্ত্ব প্রপঞ্চিত হয়েছে। ইহা সর্বদর্শনসংগ্রহে লকুলীশ পাশুপতদর্শনরূপে অভিহিত। ভাষ্যে সূত্রের অন্তর্গূঢ় মর্মার্থ বিবৃত। এই অমূল্য গ্রন্থ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে Trivandrum Sanskrit Series-এ প্রকাশিত হয়েছিল। শৈবদর্শনের তত্ত্ব ও চর্যাসম্বন্ধে সম্যগ্‌জ্ঞানের পক্ষে গ্রন্থখানির মূল্য অপরিসীম। বর্তমান গ্রন্থকার কঠোর পরিশ্রম স্বীকার ক'রে সূত্র ও ভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করলেন। ভাষ্যের ভাষা খুব প্রাচীন ব'লেই তেমন স্বচ্ছ ও সাবলীল নয়। সেইজন্যই বোধ হয় পণ্ডিতসমাজে ভাষ্যখানির দীর্ঘ-অনাদৃতি। গ্রন্থকারের সুনিপুণ ইংরেজী অনুবাদ দুর্বোধ্যতার কঠিন আবরণকে দূর করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

সুদীর্ঘ ভূমিকাতে শৈবতত্ত্ব সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য সমাবিষ্ট হয়েছে। শৈবদর্শনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী এই বিবৃতিতে পরিস্ফুট। শৈবদর্শনের এবংবিধ সামগ্রিক আলোচনা বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না। শৈবসম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধেও এই গ্রন্থ থেকে অনেক কিছু জানা যায়। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার সহজ পথ পরিহার ক'রে দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথই বেছে নিয়েছেন। সূত্র ও ভাষ্যের বিষয়বস্তুর সাধারণ উপস্থাপন দ্বারাও তিনি আমাদের প্রভূত উপকার সাধন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। গভীর তত্ত্ব-উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে তিনি ভাষ্যের দুরূহতার সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। গ্রন্থখানি গভীর পাণ্ডিত্য ও কঠোর পরিশ্রমের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে।

কৌণ্ডিন্যের ভাষ্য সংস্কৃতে রচিত। বইখানির বাগ্‌ভঙ্গী অনেকটা পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যের মতো। ভাষা সাধারণভাবে সহজ হ'লেও স্থানে স্থানে দুরূহ। আচার্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য থেকে অনুমিত হয় পঞ্চার্থ-ভাষ্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। আনন্দগিরি তৎকৃত 'শঙ্করবিজয়ে' বিভিন্ন শৈব-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে পাশুপতদের কথাও আছে। পাশুপতগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রাধান্য লাভ করেন। 'শঙ্করবিজয়ে' আচার্য শঙ্করের সহিত কাপালিকগণের সাক্ষাৎকারের কথা আছে। এরা পাশুপতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

দীর্ঘ ভূমিকার পর সূত্র ও ভাষ্য আরব্ধ হয়েছে। অসংখ্য সূত্রের আলোচনা সম্ভব নয়; তবু কয়েকটি পাঠকবর্গের গোচরীভূত করছি। 'হর্ষাপ্রমাদী' (২।১২)—পাশুপত সাধক হর্ষসম্বন্ধে (হর্ষ = অণিমাদি সিদ্ধি) অবহিত হবেন; অলৌকিক শক্তির গর্বে উল্লসিত হবেন না। অলৌকিক সিদ্ধি সাধনমার্গের অবান্তর ফল। 'অতিদত্তমতীষ্টম্' (২।১৫)—আত্মদানের নিকট গবাদি অন্নদান তুচ্ছ, তাই আত্মদান

অভিদান, আত্মদান করলে অন্যদানের প্রয়োজন হয় না। 'নান্যভক্তিস্তু শঙ্করে' (২।২০)—সাধক শঙ্করের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিমান হবেন। যারা 'হর্ষা'দিতে প্রমত্ত তারা শঙ্কর থেকে দূরে চ'লে যায়। শঙ্কর সর্বানন্দের হেতুভূত এবং মোক্ষদাতা। সুতরাং তাঁতে ঐকান্তিকী ভক্তি হ'লে পরমপুরুষার্থ করতলগত হয়।

পাশুপত-চর্যাসম্পন্ন সাধক সমাজবিগর্হিত হবেন। লোকে তাঁকে অপমান করবে—'অবমতঃ (৩।৩)। মনুসংহিতাও বলেছেন—'সম্মানাৎ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্‌বিজেত বিষাদিব' (২।১৬২)। তথাপি 'পরিভূয়মানশ্চরেৎ' (৩।৫)—অন্যকর্তৃক যষ্ট্যাদি দ্বারা তিনি নিগৃহীত হবেন, শারীরিক কষ্টে জর্জরিত হয়েও বিবিক্তভাবে বিচরণ করবেন। ঐরূপে তিনি হন 'অপহতপাপ্‌মা' (৩।৬)। অন্যত্র বলা হয়েছে 'পরিভূয়মানো হি বিদ্বান্ কৃৎস্নতপা ভবতি' (৩।১৯)—যে সাধক অন্য কর্তৃক নিগৃহীত হন তিনি জ্ঞানী ও সর্বতপঃকর্মা হন। সাধক 'গূঢ়ব্রতঃ' হবেন (৪।২)—তাঁর সমস্ত চর্যা হবে 'মনে বনে ও কোণে'। সাধক উন্মত্তবৎ লোকে বিচরণ করবেন।

তিনটি পরিশিষ্টে লিঙ্গপূজা, পাশুপতধর্ম ও দর্শন এবং শৈবসম্প্রদায়ের অবান্তরবিভাগ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা গ্রন্থের মর্যাদা সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। গ্রন্থের সর্বত্রই গ্রন্থকারের গভীর মননশীলতা পরিস্ফুট। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট গ্রন্থখানি অমূল্য তত্ত্বমঞ্জুষারূপে সাদরে গৃহীত হবে ব'লে মনে করি। —শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চন্দ

সন্দীপন (একাদশ সংখ্যা, ১৩৭৮): রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণমন্দির, বেলুড় মঠ। পৃষ্ঠা ৮৫+৩২।

বাংলা সংস্কৃত ও ইংরেজী রচনায় সমৃদ্ধ 'সন্দীপন' পত্রিকাখানি পূর্ব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। স্বামী তেজসানন্দের 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' প্রবন্ধটি পত্রিকার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। 'পল্লীর কবি কুমুদ' প্রবন্ধে কবির পল্লীপ্রীতি সুষ্ঠুভাবে পরিস্ফুট। কয়েকটি সুলিখিত রচনা: বর্তমান সমাজ ও প্রকৃত শিক্ষা, স্বামীজী স্মরণে (কবিতা), বেদপরিচিতি (সংস্কৃত), Vivekananda, The Great Educator.

উত্তিষ্ঠ (১৩৭৭): রামকৃষ্ণ বালকাশ্রম বহুমুখী বিদ্যালয়, রহড়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৯৪।

'উত্তিষ্ঠ' পত্রিকায় প্রকাশিত ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতাগুলি যত্নসহকারে লিখিত। তাহাদের ইংরেজী ও সংস্কৃত রচনাও সুন্দর। শিক্ষক মহাশয়গণের প্রবন্ধগুলি সময়োপযোগী এবং সুলিখিত। নবম শ্রেণীর বিজ্ঞানশাখার ছাত্র ভাস্কর চক্রবর্তীর রচনা 'একটি নাটকীয় আবিষ্কার' (নাটিকা) আমাদের খুব ভাল লাগিল

ব্রতী: (১৯৭০) নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘের বার্ষিক পত্রিকা (ব্লক 'এ', ফ্লাট নং ২, গভর্ণমেণ্ট হাউসিং এস্টেট, কলিকাতা-১৪); অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত।

সম্পাদকীয়তে ব্রতীসঙ্ঘের উদ্দেশ্যের কথা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে: 'শুভ কর্ম দিয়ে অশুভ শক্তিকে, শ্রেয় দিয়ে প্রেয়কে, প্রেম দিয়ে অপ্রেমকে জয় করবার সংগ্রাম'-এ স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার আদর্শকে আঁকড়ে

ধরে 'ঝাঁপিয়ে পড়া'। তিন বৎসর পূর্ব হইতে চলিল এই সংগ্রামে, এই সেবাব্রতে ব্রতী হইয়াছে একদল ছাত্রী ভগিনী নিবেদিতার এই বাণী স্মরণে রেখে: 'আমাদের এত করবার আছে যে, আমাদের একটি মুহূর্তও অপচয় করা চলে না।' এই ব্রতীসঙ্ঘের আদর্শ ও কার্যবিবরণীর সহিত ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ ঝরণা ভট্টাচার্য, আশাপূর্ণা দেবী, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ প্রভৃতির কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ বিধৃত হইয়াছে পত্রিকাটিতে।

কল্যাণ (হিন্দী বিশেষাঙ্ক—অগ্নিপুরাণ, গর্গসংহিতা, নরসিংহপুরাণ) — গোরখপুর গীতা প্রেস হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১০৬+ সূচীপত্র। মূল্য দশ টাকা।

হিন্দী ভাষায় সনাতন হিন্দুধর্ম-প্রচারে 'কল্যাণ' পত্রিকার স্থান সর্বোচ্চ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রতি বৎসর কল্যাণ পত্রিকার সুযোগ্য পরিচালকমণ্ডলী একখানি করিয়া বৃহদায়তন বিশেষাঙ্ক প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই বৎসরও বহুসুদৃশ্যচিত্র-সংবলিত সুমুদ্রিত একখানি সংরক্ষণযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিশেষাঙ্কে অগ্নিপুরাণের মাহাত্ম্য সহিত ১৮৩টি অধ্যায়, গর্গসংহিতার শেষাংশ এবং নরসিংহপুরাণের অধিকাংশ স্থান পাইয়াছে।

অগ্নিপুরাণে রাজধর্ম, রাজনীতি, ধনুর্বেদ, যুদ্ধবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ প্রভৃতির কথা যেমন পাওয়া যায়, তেমনি ধর্মশাস্ত্র, মন্ত্রশাস্ত্র, দেবপূজার বিষয়ও প্রচুর পরিমাণে আছে। এই সকল বিষয় মনোজ্ঞ ভাষায় স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

গর্গসংহিতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রসময়ী লীলার অপূর্ব কাহিনীসমূহ বৈষ্ণবমাত্রেরই চিত্তকে ভক্তিভাবে আপ্লুত করে। সুসাহিত্যিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের লেখনীমুখে গর্গসংহিতার মর্মার্থ পরিবেশিত হওয়ায় এই বিশেষাঙ্কের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে, প্রদত্ত চিত্রগুলির অধিকাংশই গর্গসংহিতা-সম্বন্ধীয়।

নরসিংহপুরাণে মুখ্যতঃ অবতারলীলাকথা বিবৃত। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন, নরসিংহ এবং রাম অবতারের কথা নরসিংহ পুরাণের মূল শ্লোকগুলিসহ প্রাঞ্জল অনুবাদ আলোচ্য গ্রন্থখানির আর একটি বিশেষ আকর্ষণ। ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের প্রতি ভগবান নরসিংহদেবের কৃপা-প্রকাশক চিত্রখানি অতি সুন্দর।

বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন পত্রিকা (অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭)—বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন, ৭৫ ও ৭৭ স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া ৪ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৪।

কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদের রচনায় সমৃদ্ধ পত্রিকাখানি সুন্দর হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে রচনাগুলি সুসম্পাদিত। কবিতাগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'আমাদের কথা'য় বিদ্যালয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় এবং সারা বৎসরের কর্মধারা বিজ্ঞাপিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বন্যার্তসেবা: গত ৭ই আগষ্ট হইতে রামকৃষ্ণ মিশন মালদহে বন্যার্তদের সেবায় ব্রতী হইয়াছেন।

উদ্বাস্তুসেবা: পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীদের সেবায় রামকৃষ্ণ মিশন গত ১৪ই এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত ১১টি বিতরণ-কেন্দ্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ বিতরণ করিয়াছেন:

চাল ৭,৯৭০'১৫ কুইণ্ট্যাল, আটা ৩৯০'৩৮ কু., ডাল ১,২৮৭'০৫ কু., সবজি তরিতরকারি ১,২০২'৯৬ কু., লবণ ২২৫'৩০ কু., সরিষার তৈল ৪১'১৫ কু., মসলা ১২'৮১ কু., আলানি ৬৪৯ কু., চিড়া ৮৪'২১ কু., গুড় ১৭'৭৭ কু., চিনি ২০'৯৪ কু., গুঁড়া দুধ ১০৯'৩৯ কু., বার্লি ১২৫'৩৩ কু., গ্লুকোজ ০'৭১ কুইণ্ট্যাল, রুটি ১,২৭,৫০০ পাউণ্ড, বিস্কুট ৩২ কেজি, কাপড় জামা প্রভৃতি ৪,৯৮০টি নূতন ও ৩৮৯টি পুরাতন, পশমের কম্বল ৯৮ খানি, তুলার কম্বল ২১৬৯ খানি, সোয়েটার ২২৮টি, বাসন ৮৬৪টি, লণ্ঠন ১২৬টি, মাদুর ৫৪ খানি, সাবান ৪,৩৭২টি, বই ৩০৭ কপি, এক্সারসাইজ বুক ৪৮টি, শ্লেট ও পেনসিল ৩৬, লেড পেনসিল ২০টি।

১৭,১২৬ জনকে চিকিৎসা-সাহায্য দেওয়া হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-ক্যাম্পগুলিতে মোট শরণার্থীর আছে—১,৩০,৩০০ জন।

আসামের রাজ্যপাল শ্রীবি. কে. নেহরু গত ১০. ৬. ৭১ রামকৃষ্ণ মিশনের ডাউকী সেবা-শিবির পরিদর্শন করিয়াছেন। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রীজি. এস. পাঠক গত ১. ৭. ৭১ উক্ত সেবা-শিবির পরিদর্শন করেন এবং উদ্বাস্তু শিশুগণকে পুস্তক বিতরণ করেন।

গারো পাহাড় অঞ্চলে শিলং কেন্দ্রের পরিচালনায় একটি নূতন সেবা-ক্যাম্প খোলা হইয়াছে।

ছাত্রাবাস-উদ্বোধন

চণ্ডীগড় আশ্রমে গত ১৮. ৭. ৭১ স্বামী চিদাত্মানন্দ নবনির্মিত বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করিয়াছেন। হরিয়ানার রাজ্যপাল শ্রীবি. এন্. চক্রবর্তী আয়োজিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন।

ছাত্রের কৃতিত্ব

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম স্কুলের জনৈক ছাত্র এই বৎসর ভারত সরকারের 'অল ইণ্ডিয়া ন্যাশন্যাল সায়েন্স ট্যালেণ্ট সার্চ স্কলারশিপ' লাভ করিয়াছে।

শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেণ্টস্ হোমের জনৈক ছাত্র আসাম উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বৎসর চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে।

কার্য-বিবরণী

বোম্বাই খার-এ (Khar, Bombay-52 AS) অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন ও আশ্রমের ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী (এপ্রিল হইতে মার্চ) প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষের উল্লেখযোগ্য কার্যধারা:—

আশ্রম বিভাগ: আশ্রমে নিয়মিত পূজা, উপাসনা ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত এবং অবতার ও মহাপুরুষগণের জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে আশ্রমের সাধুগণ ধর্মালোচনা করেন। হিন্দীতে

ভাগবত এবং ইংরেজীতে গীতা ব্যাখ্যা উল্লেখ-যোগ্য।

একাদশী তিথিতে রামনাম-সংকীর্তন হয়। অন্যান্য বৎসরের মতো এই বৎসরেও বিবিধ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের সহিত প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

মিশন বিভাগ: ছাত্রাবাসে ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে ৮০ জন কলেজের ছাত্র রাখা হইয়াছিল। ছাত্রগণের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা—১৩,৭০০। পাঠাগারে ১৪৩টি দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত লওয়া হয়। প্রতিদিন বহু আগ্রহশীল পাঠক পাঠাগারে সমবেত হন এবং পুস্তকাবলী ও পত্রপত্রিকার যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করেন।

মিশন-পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে আউটডোর ও ইনডোর উভয় বিভাগই আছে। আলোচ্য বর্ষে আউটডোর ডিস্পেন্সারীতে অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক সেকশনে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৫,৩১৬ ও ১,০৩,৮৩১। ইনডোরে ২০টি বেড আছে, এখানে ৪৬৭ জন রোগী চিকিৎসিত হন; ৪৫৯ জন রোগীর অস্ত্রোপচার করা হয়, তন্মধ্যে ১৭৫টি মেজর অপারেশন।

সেবাকার্য: বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কেন্দ্র কর্তৃক এ পর্যন্ত ২৭টির বেশী সেবাকার্য বিস্তৃতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৬৮-৭০ খৃষ্টাব্দে সুরাটে মিশন কর্তৃক যে বন্যার্তসেবা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কয়নায় ভূমিকম্প রিলিফে, বাংলায় বন্যার্তসেবায়, কচ্ছ খরাত্রাণকার্যে সহায়তার জন্য নগদ টাকা জিনিসপত্র উপযুক্ত পরিমাণে পাঠানো হয়।

জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির গত বৎসরের (১৯৭০-৭১) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

আশ্রম কর্তৃক (ক) ১১টি বিদ্যালয়, (খ) একটি গ্রন্থাগার, (গ) বুক ব্যাঙ্ক ও (ঘ) দুইটি ছাত্রাবাস পরিচালিত, এবং (ঙ) নিয়মিতভাবে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

(ক) বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ৫টি উচ্চ-মাধ্যমিক (ছাত্র ১,৮৩৩, ছাত্রী ২,০৩৮)—দুটি বালকদের জন্য, দুটি বালিকাদের জন্য এবং একটিতে প্রাতে ও দ্বিপ্রহরে দুইভাগে বালক ও বালিকাদের পড়ানো হয়; ৪টি মাধ্যমিক (ছাত্র ২,৫৭৫, ছাত্রী ১,৯৩৭); দুইটি উচ্চ প্রাথমিক (ছাত্র ৩৫৯, ছাত্রী ২৭৪)। সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা—৯,০১৬। প্রতি বিদ্যালয়ে একটি করিয়া গ্রন্থাগার আছে (মোট পুস্তকসংখ্যা ২৭,৯৭২)। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে হাতের কাজ শিক্ষার ও সবাক চলচ্চিত্র সহায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয়গুলিতে প্রায় ৬০০ জন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী বিনা-বেতনে বা আংশিক বেতনে পড়িবার সুযোগ পায়। আলোচ্য বর্ষে আশ্রম হইতে হরিজন বিদ্যার্থীদের জন্য ৫,০০০৲, এবং আদিবাসী বিদ্যার্থীদের জন্য ৪,০০০৲ টাকা সাহায্যদান করা হইয়াছে।

(খ) গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা ৩,৯১৬। পাঠকক্ষে কয়েকখানি করিয়া মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদপত্র রাখা হয়।

(গ) বুক ব্যাঙ্কটির কাজ চলিতেছে ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে।

(ঘ) দুটি ছাত্রাবাসে মোট ৪১ জন ছাত্র

আছে। ছাত্রাবাসে বিহার গ্রামাঞ্চলের অনুন্নত সম্প্রদায় ও আদিবাসী ছাত্রদেরই রাখা হয়। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে বিনাব্যয়ে থাকিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। সুবর্ণরেখা নদীতীরস্থ দ্বিতল ছাত্রাবাসটিতে আদিবাসী ছাত্রগণ খুব কম খরচে থাকার সুযোগ পায়। গত দশ বৎসরে ৪০০ জনের অধিক ছাত্র বিহারের গ্রামাঞ্চল হইতে আসিয়া আশ্রমের ছাত্রাবাসে থাকিয়া কলেজে উচ্চ শিক্ষার সুযোগও পাইয়াছে।

(৬) আশ্রমে নিয়মিতভাবে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে সাপ্তাহিক ক্লাস, একাদশী তিথিতে রামনাম এবং মহাপুরুষদের জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষে জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি, খৃষ্টমাস ইভ প্রভৃতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, ও স্বামীজীর জন্মতিথি বিশেষ উৎসব সহ পালিত হইয়াছে; শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালী-পূজা প্রভৃতিও অতি সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে সুবর্ণরেখা নদীতীরস্থ দ্বিতল ছাত্রাবাসটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী নির্বাণানন্দজী ২.১.৭১ তারিখে। আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের সূচনা করেন টাটা ইস্পাত কারখানার জেনারেল ম্যানেজার শ্রীপি. অনন্ত। লেডি ইন্দ্র সিং স্কুলের জন্য বিজ্ঞানাগার-নির্মাণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী নারায়ণচৈতন্যের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি, ব্রহ্মচারী নারায়ণচৈতন্য (নীরেন) গত ১৭ই জুলাই, ১৯৭১ বেলা ১১টার সময় মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে দেওঘর বিদ্যাপীঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বহুদিন হইতেই তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বিকল হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

তিনি স্বামী মাধবানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে রহড়া আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর নিকট ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হন। তিনি রহড়া আশ্রমে ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কর্মী ছিলেন; ইহার পর তাঁহাকে রামহরিপুর আশ্রমে কর্মিরূপে পাঠানো হয়, সেখানে প্রায় এক বৎসর থাকেন। গত ১১ই জুলাই তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠে প্রেরিত হন।

তাঁহার অকাল প্রয়াণে সঙ্ঘের একজন সম্ভাবনাপূর্ণ কর্মীর অভাব ঘটিল।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

সৈয়ুজ—১১

অতীব মর্মান্তিক দুর্ঘটনা—মহাকাশে ভাসমান রাশিয়ার মহাকাশ-গবেষণা-যান 'সাল্যুট'-এর সহিত সংযুক্ত হইয়া, উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া এবং সাফল্যের সহিত দীর্ঘ তেইশ দিন উহার মধ্যে বহুপ্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি চালাইবার পর পৃথিবীতে অবতরণ-কালে পথে তিনজন মহাকাশচারী কম্যাণ্ডার জর্জি ডব্রোভলস্কি, স্টেট ইঞ্জিনীয়ার ভিকতর পাত সাইয়েভ এবং ফ্লাইং ইঞ্জিনিয়ার ভ্লাদিস্লাভ অজ্ঞাত কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অবতরণের পর যানটির ডালা খোলা হইলে তাঁহাদের প্রাণহীন অবস্থায় দেখা যায়। ইহার আধঘণ্টা পূর্বে তাঁহারা পৃথিবীর পরিচালন-কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে সঠিকভাবে এখনো কিছু জানা যায় নাই, তবে রাশিয়ার বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন, যান্ত্রিক গোলোযোগের ফলে হয়তো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশকালে যানটির ভিতর বায়ু ঢুকিয়া ভিতরের চাপের বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছিল, মহাকাশচারীদের দেহের রক্তচলাচলের উপর যাহার প্রতিক্রিয়া এই মৃত্যু ঘটাইয়াছে।

মহাকাশ-গবেষণায় একটি বিরাট সাফল্যের ইতিহাস রচনা করিয়া ও বহু মূল্যবান তথ্য ও অভিজ্ঞতা লইয়া এই মহাকাশচারিত্রয় ফিরিতেছিলেন। তথ্যগুলি অবশ্য পূর্বেই কিছু পৃথিবীতে জানানো হইয়াছিল, কিছু যানের মধ্যেই বিভিন্ন যন্ত্রাভ্যন্তরে ছিল, সেগুলি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের অমূল্য জীবন আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না।

গত ১৯শে এপ্রিল, ১৯৭১, 'সাল্যুট' মহাকাশে একটি নির্দিষ্ট কক্ষে স্থাপিত হইয়াছিল। সৈয়ুজ ১১ গত ৬ই জুন পূর্বোক্ত তিনজন মহাকাশচারী সহ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উহার সহিত মিলিত হয়। মহাকাশে ভাসমান কোন যানের সঙ্গে এত সাফল্যের সহিত মনুষ্যবাহী অপর যানের মিলন ইতিপূর্বে আর হয় নাই।

সাল্যুটের মধ্যে দীর্ঘ দিন থাকিয়া তাঁহারা নক্ষত্রমণ্ডলী, পৃথিবীর আবহাওয়া প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। মহাকাশে যানটির মধ্যে উদ্ভিদের বীজ বপন করিয়া চারা তৈরি করিয়াছেন, নিজেদের দেহের রক্ত প্রভৃতির এই ভারহীন পরিবেশে কি অবস্থা থাকে, সে-সব বিষয়ে এবং আরো বহু বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন।

সাল্যুট প্রায় ৬৫ ফুট দীর্ঘ, দুটি মিলিত যানের ওজন প্রায় ২৫ টন। সাল্যুটের ভিতরে স্বচ্ছন্দে বাস ও গবেষণার কাজ চালাইবার জন্য যথেষ্ট স্থান ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আছে। ভিতরের আয়তন ১,০০০ ঘন ফুটেরও বেশী; সর্বাধিক প্রশস্ত অংশের ব্যাস ১৩ ফুটের মতো। সাধারণ পোশাক পড়িয়াই মহাকাশ-চারীরা সেখানে ছিলেন। গরম খাবার তৈরি করার ও রেফ্রিজারেটারে রাখার ব্যবস্থা সেখানে ছিল। যাহাতে পৃথিবীতে থাকার অভ্যাসমতো সেখানকার জীবনযাত্রা যতদূর সম্ভব চলিতে পারে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখিয়াই সাল্যুট নির্মিত।

মানুষের মহাকাশ-অভিযানের অগ্রদূত রাশিয়া। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল য়ুরি

এ. গ্যাগারিন সর্বপ্রথম মহাকাশে বিচরণ করেন ভোস্টক-এ চড়িয়া। তিনি একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রার ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট পরে ভূপৃষ্ঠে নামিয়া আসেন। ইহার পর এবং সৈয়ুজ-১১-র অভিযানের পূর্বে আরো ১৬ বার রাশিয়ার মহাকাশচারীরা বিভিন্ন সময়ে মহাকাশে উঠিয়াছেন; উহার মধ্যে ১. ১৯. ১৯৭০ তারিখের অভিযানে মহাকাশচারিদ্বয় নিকোলাভ ও সেবাস্তানভ ১৭ দিন ১৬ ঘণ্টা মহাকাশে কাটাইয়া রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ইতিপূর্বে মানুষের মহাকাশ অভিযানে রাশিয়ার আর একজন মহাকাশচারীকে পৃথিবীতে অবতরণকালে দুর্ঘটনায় প্রাণ দিতে হইয়াছিল। রাশিয়ার নবম অভিযানে, ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের ২২-২৩শে এপ্রিলের অভিযানে মহাকাশে ২৬ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে পৃথিবীকে ১৮ বার পরিক্রমা করিয়া নামিবার সময় প্যারাসুট না খোলার দরুন সৈয়ুজ-১ পৃথিবীর বুকে আছড়াইয়া পড়ায় মহাকাশচারী কোমারভ প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

আজ পর্যন্ত রাশিয়া হইতে মহাকাশচারীদের লইয়া মহাকাশে উঠিয়াছে ১৮টি যান—ভোস্টক ১-৬; ভোস্কদ ১, ২ এবং সৈয়ুজ-১, ৩-১১। এগুলির মধ্যে ৬ষ্ঠ অভিযানে (১৬. ১৯. ৬৩) সৈয়ুজ-৬-এ চড়িয়া মহাকাশে উঠিয়াছেন পৃথিবীর প্রথম মহিলা-মহাকাশচারী ভ্যালেন্টিনা ডি. টেরেস্কোভা।

উৎসব-সংবাদ

আলিপুর দুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৮ই জুলাই 'গুরুপূর্ণিমা' উপলক্ষে পূর্বাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা এবং অপরাহ্ণে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রভৃতি পাঠ এবং আলোচনাশেষে হাতে হাতে প্রসাদবিতরণ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সংসদ (কলিকাতা) কর্তৃক গত ৮ই মে হইতে চারদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব-উৎসব যথারীতি বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে সম্পন্ন হইয়াছে। ৮ই মে সকালে বিশেষ পূজা-পাঠাদির পর দুপুরে দুইশত ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে স্বামী নিরভ্রানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও আলোচনা করেন। ৯ই হইতে ১১ই মে রামনাম-সংকীর্তন, ভাগবত ও শ্রীমা এবং স্বামীজী সম্বন্ধে সময়োচিত মনোজ্ঞ আলোচনা দ্বারা উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

পরলোকে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ২৯শে জুলাই, ১৯৭১, রাত্রি ৪টা ১০ মিনিটে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কলিকাতার বাটীতে ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ঢাকা ও কলিকাতার মেসার্স বসু ব্যানার্জি এণ্ড কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অংশীদার, চার্টার্ড একাউন্টেণ্ট ও অডিটার, ঢাকা সলিমুল্লা কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারাররূপে তাঁহার সুনাম ছিল।

কালীপ্রসন্ন বাবু স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলায় বজ্রযোগিনী গ্রামে তাঁহার পৈতৃক বসতবাড়ী ছিল।

শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি ।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥

দিব্য বাণী

আর্যাস্তব

সরস্বতী চ বাল্মীকে স্মৃতির্দ্বৈপায়নে তথা। ঋষীণাং ধর্মবুদ্ধিস্তু দেবানাং মানসী তথা ॥
...ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং সর্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্ ॥
সংগ্রামেষু চ সর্বেষু অগ্নিপ্রজ্বলিতেষু চ। নদীতীরেষু চৌরেষু কান্তারেষু ভয়েষু চ ॥
প্রবাসে রাজবন্ধে চ শত্রূণাং চ প্রমর্দনে। প্রাণাত্যয়েষু সর্বেষু
ত্বং হি রক্ষা ন সংশয়ঃ ॥
ত্বয়ি মে হৃদয়ং দেবি ত্বয়ি চিত্তং মনস্ত্বয়ি। রক্ষ মাং সর্বপাপেভ্যঃ প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥

—হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৩য় অধ্যায়

সরস্বতীরূপে তুমি বাল্মীকি হৃদয়ে,
স্মৃতিরূপে ব্যাস-চিত্তে তুমিই, অভয়ে !
ধর্মবুদ্ধি-প্রভা তুমি ঋষি-হৃদাকাশে,
সদ্বৃত্তি-কমল দেব মানস-সরসে ॥
যা কিছু রয়েছে বিশ্বে স্থাবর জঙ্গম
সে সব জুড়িয়া তুমি, শকতি পরম ॥
সকল সংগ্রামে, দীপ্ত অগ্নির মাঝারে,
নদীতীরে, দস্যুভয়ে, বিজন কান্তারে,
ভীষণ সন্ত্রাস মাঝে, রাজার বন্ধনে,
প্রবাসবাসের কালে, শত্রু-বিমর্দনে—
সর্ব ত্রাসে, সর্ব প্রাণ-সঙ্কট-সময়
তুমি রক্ষাকর্ত্রী দেবি, নাহিক সংশয় ॥
তোমাতেই মগ্ন মোর হৃদি চিত্ত মন,
তুষ্ট হয়ে সর্বপাপ করিও খণ্ডন ॥

কথাপ্রসঙ্গে

'চিকের আড়ালে'

'ভারতে শক্তিপূজা'য় স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "চিকের আড়ালে দেবী সর্বদাই রহিয়াছেন।" শক্তির হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, লোপ তো দূরের কথা। ঘন বা সূক্ষ্ম আবরণের মধ্য দিয়া দেখিয়াই আমরা উহার কখনো হ্রাস, কখনো বৃদ্ধি, আবার কখনো বা একেবারে লোপ কল্পনা করিয়া থাকি।'

এই 'দেবী' আমাদের মা, জগজ্জননী, যাঁহাকে দুর্গা, কালী, মহাশক্তি, প্রকৃতি, অব্যক্ত, সগুণ ব্রহ্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি বহু নামে আমরা অভিহিত করি। আর 'চিক' বা পর্দা, আবরণ হইল সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই—মাটি, জল, আমাদের দেহ, মন প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা দেখি, অনুভব করি, কল্পনা করি, তাহা সবই। মা নিজ শক্তিবলে এই চিকগুলি সৃষ্টি করিয়া তাহা দিয়া নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর মধ্যে তিনিই শুধু রহিয়াছেন, দ্বিতীয় কোন সত্তা বা 'বস্তু' নাই। আমরা এই চিকগুলিকেই বিভিন্ন বস্তুরূপে দেখি, চিকগুলিকেই বস্তু বলিয়া ভাবি, সেগুলির ভিতর সদাবিদ্যমান মাকে দেখিতে পাই না।

কেন দেখিতে পাই না? দেখিবার মতো দৃষ্টিশক্তি নাই বলিয়াই দেখিতে পাই না। স্থূল বস্তুরূপে, স্থূল জগৎরূপে মায়ের যে প্রকাশ আমাদের প্রত্যক্ষ, তাহার ভিতর যাহা সত্য, যাহা বস্তু বলিয়া আজ আমরা বিজ্ঞানীদের কথায় জানিয়াছি, তাহা দেখিবার মতো শক্তিই তো আমাদের নাই। সেখানেও তো শক্তির এই স্বল্পতার জন্য আমাদের চিকগুলিকেই বস্তুরূপে দেখিতে হয়, বস্তুকে দেখিতে পাই না। বিভিন্ন রূপ-গুণ-বিশিষ্ট মাটি জল গাছ জীবদেহ প্রভৃতিকেই তো আমরা সত্য বলিয়া, বস্তু বলিয়া ভাবি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানই বলে, যদি অতি ক্ষুদ্র জিনিস দেখিবার মতো, এক ইঞ্চির দশলক্ষকোটি ভাগের একভাগের চেয়েও কম ব্যাসযুক্ত কণা (ইলেকট্রণাদি) দেখিবার মতো শক্তি আমাদের চোখের থাকিত, তাহা হইলে নানাবস্তু না দেখিয়া আমরা সমগ্র জগৎকে প্রধানতঃ দুইতিন রকমের কণার একটি মহাসমুদ্ররূপে দেখিতাম; দেখিতাম সেই কণার সমুদ্রে স্থানে স্থানে বিভিন্ন সংখ্যায় ও বিভিন্ন বিন্যাসে কণাগুলি বিভিন্ন ধরণের ঘূর্ণি সৃষ্টি করিতেছে মাত্র—বস্তু বলিয়া আর কিছুই নাই। যেটিকে লালফুল-রূপ বা সবুজ-পাতা-রূপ বস্তু বলিয়া এখন দেখিতেছি, তখন দেখিতাম তাহার ভিতরকার 'বস্তু' ঐ কণাগুলি লালও নয়, সবুজও নয়—সব কিছুর ভিতরই একই রকমের কণা। আবার লোহার ভিতরকার কণাগুলি বেশী ভারী বা তূলার ভিতরকার কণাগুলি কম ভারীও নয়—সবই একই ওজনের, তফাৎ শুধু কণাগুলির সংখ্যায় ও বিন্যাসপ্রণালীতে। আমরা বস্তুর যে বিভিন্ন রূপগুণ দেখি, সেগুলি কণাসমুদ্রে এই বিভিন্ন বিন্যাসের, বিভিন্ন ঘূর্ণির উপর শক্তির খেলার ফলেই ফুটিয়া উঠে, সেগুলি আসলে বস্তু নয়, আমাদের প্রতীতি, বস্তু বলিয়া মনে হওয়া মাত্র। যেমন একটি জলন্ত মশালকে খুব জোরে ঘুরাইলে মনে হয় একটি আলোকের

বৃত্ত রহিয়াছে। যেমন খুব জোরে ঘুরিলে পরস্পর হইতে দূরে দূরে থাকা বৈদ্যুতিক পাখার ব্লেডগুলিকে একটি অর্ধস্বচ্ছ নিশ্চিদ্র গোলাকার থালার মতো বলিয়া মনে হয়; উহাতে ঢিল ছুড়িলে তাহা প্রতিহত হইয়াও আসে। অথচ আসলে এই আলোক-বৃত্ত প্রভৃতি বস্তুই নয়, বস্তু বলিয়া মনে হওয়া, বস্তুর প্রতীতি মাত্র। এই প্রতীতি-ই 'চিক', যাহা সত্যকে, কণাগুলিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের দৃষ্টিশক্তি আরো সূক্ষ্ম বস্তু দেখিবার মতো হইলে আমরা এই কণাগুলিকেও আর দেখিতে পাইতাম না, দেখিতাম এগুলিও 'চিক', যাহা ইহার ভিতরকার শক্তির (এনারজির) সমুদ্রকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে; জগৎটাকে এই শক্তির একটি মহাসমুদ্ররূপে দেখিতাম তখন, দেখিতাম এনারজিই একমাত্র বস্তু, এনারজি ছাড়া বস্তু বলিয়া আর কিছুই নাই,—বাকী সবই, কণাগুলিও, বস্তুর প্রতীতিমাত্র,—বস্তু নয় অথচ বস্তু বলিয়া মনে হয়।

জড়বিজ্ঞানের আজ-পর্যন্ত-আবিষ্কৃত সত্যের ভিত্তিতেই এতদূর পর্যন্ত বলা চলে। বিজ্ঞানের সত্য-আবিষ্কারের সীমা এখনো পর্যন্ত মায়ের স্থূলতম বিকাশের রাজ্যেই সীমিত, যেখানে আমরা 'চিকের আড়ালে' মায়ের, চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তির 'একেবারে লোপ কল্পনা করিয়া থাকি'—শক্তিসমুদ্রের ভিতর চেতনাকে দেখি না।

যাঁহারা আরো সূক্ষ্ম সত্তা 'দেখিয়াছেন', যাঁহাদের আমরা সত্যদ্রষ্টা, ঋষি প্রভৃতি বলি, তাঁহারা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, আরো সূক্ষ্ম সত্তা দেখিবার মতো শক্তি আসিলে আমরা দেখিতে পাইতাম এই জগৎটা অচেতন ইচ্ছাহীন শক্তির সমুদ্রমাত্র নয়, ভাবের সমুদ্র, চিন্তার সমুদ্র, মানস সমুদ্র। জড়বস্তুর প্রতীতিরূপ চিক যেমন এনারজি-সমুদ্রকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, এনারজির-প্রতীতিরূপ চিক তেমনি মানস-সমুদ্রকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। আরো সূক্ষ্মদর্শী হইলে দেখা যাইবে, মানস-সমুদ্রও চিক, যাহা বুদ্ধি বা অহঙ্কারকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অহঙ্কারেরও ভিতর দেখিবার মতো সূক্ষ্মদর্শী হইলে দেখা যাইবে অহঙ্কারও চিক, যাহা মাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; মা-ই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র সত্তা, একমাত্র 'বস্তু', সত্য; আর সবই চিক, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'অবস্তু'। মাকেই আমরা অহঙ্কার, মন, শক্তি, জড়বস্তু প্রভৃতি মনে করিতেছি মাত্র। তখন প্রত্যক্ষ হইবে, এই সব 'চিকের আড়ালে দেবী সর্বদাই রহিয়াছেন', মা ছাড়া আর কিছুই নাই, মাকেই আমরা বহু-বিচিত্র জগৎরূপে দেখিতেছি।

এ সত্য যুগে যুগে অসংখ্য সত্যদ্রষ্টা প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের যুগেই, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকলের ভিতর, কোষাকুষি, মার্বেল, চৌকাঠ প্রভৃতি সব কিছুর ভিতর এই মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মাকালী-রূপে, আবার চৈতন্য-রূপেও। কাশীপুরে কল্পতরু দিবসে বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল শ্রীরামকৃষ্ণরূপে এই মাকে দেখিয়াছেন আকাশ, বাড়ী, গাছ, মানুষ প্রভৃতি সব 'চিকের'ই ভিতর। গোপালের মা মাহেশের রথের মেলায় এই মাকেই গোপাল-রূপে দেখিয়াছেন রথে স্থাপিত মূর্তি, সমবেত লোকজন, রথ প্রভৃতি সবকিছুর মধ্যে। আরো কতজন, কতভাবে।

যাঁহারা মাকে এভাবে দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ সত্য প্রত্যক্ষ করিবার পদ্ধতিও বলিয়া গিয়াছেন। সে পদ্ধতি অবলম্বনে নিজেকে সূক্ষ্মদর্শী করিয়া আমরা সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ

করিতে পারি। সূক্ষ্মদর্শী হইবার একমাত্র উপায় নিজ রুচি ও সামর্থ্যানুযায়ী পদ্ধতি বাছিয়া লইয়া সংযম ও একাগ্রতার অভ্যাস সহায়ে মনকে শুদ্ধ করা।

মায়ের সকল পূজার, সব শক্তিসাধনার মূলকথা হইল নিজেকে এভাবে সূক্ষ্মদর্শী করিয়া মাকে দেখা। এই আরাধনার ফলে আমাদের দৃষ্টি একের পর এক পর্দা ভেদ করিয়া যত ভিতরে যায়, ভেদদৃষ্টি—'নানাস্তি'-বোধ—ততই কমিতে থাকে। নিজের এবং সকলের ভিতরই—বিভিন্ন দেহ ও মনবুদ্ধি রূপ চিকের আড়ালে—একই মা ততই অধিকতররূপে প্রকট হইতে থাকেন। এই অভেদদৃষ্টি-লাভই যথার্থ সাম্য ও বিশ্বপ্রেমের রাজ্যে প্রবেশের সিংহদ্বার।

আজ সমগ্র পৃথিবী সাম্য ও বিশ্বপ্রেমের আলোচনায় পূর্ণ, সর্বত্র আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ আজ তৃষিত চাতকের মতো ইহার পথ চাহিয়া আছে; অথচ কার্যক্ষেত্রে ভেদদৃষ্টি এবং মানুষের হৃদয়হীনতার নগ্নরূপই প্রতিদিন অধিকতর প্রকট হইয়া চলিয়াছে। দেহমনবুদ্ধি-রূপ চিকের ভিতরে তাকাইবার প্রবণতা আমাদের ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে বলিয়াই এই অবস্থা। চিকের আড়ালে মাকে দেখিবার জন্য মানুষকে সচেষ্ট করা ছাড়া আমাদের কাম্য লক্ষ্য লাভের দ্বিতীয় আর কোন পথ নাই।

আজ মহাশক্তির শারদীয়া আরাধনার দিনে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, 'মা, আমরা দেখিতে পাই আর না পাই, সবার ভিতর বুদ্ধিরূপ চিক তো তুমিই! সবার ভিতরকার এ চিকটিকে একটু স্বচ্ছ করিয়া দাও, যাহাতে উহার আড়ালে তোমার অস্তিত্বের একটু আভাস অন্ততঃ যেন সকলেই পায়—মানুষকে বিনাশী জড়দেহসীমিত মাত্র না ভাবিয়া যাহা সত্য তাহাই ভাবিতে, মানুষকে অবিনাশী চেতন সত্তারূপে ভাবিতে শিখে!'—মানুষকে জড়দৃষ্টিতে দেখিয়া আজ তাহার কল্যাণ-সাধনেরই প্রচেষ্টায় তাহাকে পশুর প্রায় সম-পর্যায়ে নামাইবার, তাহার মহা অকল্যাণকে, মহা বিনাশকেই কল্যাণ ভাবিয়া বরণ করিবার যে প্রবণতার উচ্ছ্বাস আজ ক্রমবিস্তৃত হইয়া বিশ্বমনকে প্লাবিত করিতে উদ্যত, এ সত্যদৃষ্টি ছাড়া আর কে তাহার গতিরোধ করিবে, মা!

"যে শক্তিরই উপাসনা কর, অতি পবিত্রভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। স্বার্থানুসন্ধানের নাম-গন্ধ পর্যন্ত মন হইতে দূরে রাখিতে হইবে। নতুবা উপাসনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব এবং অনেক সময় বিপরীত ফলেরও উদয় হইয়া উপাসককে অবসন্ন করে।"

(ভারতে শক্তিপূজা)

—স্বামী সারদানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসোপদেশাবলী

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

(১)

যথা বিলিপ্তে তু রসৈঃ প্রকাশতে
কাচস্য পৃষ্ঠে প্রতিরূপসঞ্চয়ঃ।
হৃল্লগ্নশুক্রে চ তথোর্ধ্বরেতসাম্
আদর্শবৎ সর্ববিভুঃ প্রকাশতে॥

(২)

বাষ্পালোকা যথৈবেহ পুরবর্ত্মগৃহাদিকম্
নানারুগ্‌ভির্দ্যোতয়ন্তি
হ্যেককোষাৎ সমাগতাঃ।
নানা জাতিকুলোদ্ভূতা অবতারাস্তথা ভৃশম্
সর্বান্ দেশান্ ভাসয়ন্তি
হ্যবয়েশাৎ সমাগতাঃ॥

(৩)

যথা স্পর্শমণিং স্পৃষ্ট্বা লৌহঃ কাঞ্চনতাং গতঃ
স্থাপিতং যত্র কুত্রাপি
বিকৃতিং নৈব গচ্ছতি।
তথা সদ্‌গুরুসংসর্গাৎ যদা নির্মলতাং ব্রজেৎ
শুভান্বিতো জনঃ কোঽপি
ন পুনঃ কিল্বিষী ভবেৎ॥

(৪)

যথা স্পর্শমণিস্পর্শাৎ তরবারোহ্যয়োময়ঃ।
হিরণ্ময়ত্বমাসাদ্য ন তু রূপং ত্যজেৎ স্বকম্॥
তথাপি পূর্ববন্নান্যদ্ধিংসিতুং ক্ষমতে ত্বসৌ।
তথা হরিপদস্পর্শাৎ
কশ্চিৎ পুণ্যবতাং বরঃ॥
নির্মলত্বং সমাসাদ্য পূর্বদেহং সমাশ্রয়েৎ।
তথাপ্যসৌ পুনর্নেহ
গচ্ছেদ্ বৈ রিপুবশ্যতাম্॥

(৫)

অয়স্কান্তগিরির্গুপ্তঃ সমুদ্রসলিলান্তরে।
বিশ্লেষয়ত্যয়ঃকীলান্
পোতেভ্যঃ ক্ষণমাত্রতঃ॥
তথা হরিকৃপাকর্ষৎ নরো বিগতবন্ধনঃ।
তৎপ্রেমার্ণবগর্ভে বৈ
হ্যাত্মারামো নিমজ্জতি॥

(৬)

সিদ্ধকন্দমূলাদীনি ভজন্তে মৃদুতাং যথা।
অসিদ্ধানি যথা তানি সন্ত্যেব কঠিনানি চ॥
নিষ্ঠুরোঽপি তথা সিদ্ধঃ
পুরুষো জায়তে যদা।
কোমলত্বমবাপ্নোতি কাঠিন্যং সংবিহায় সঃ॥
অসিদ্ধঃ স্বল্পসিদ্ধো বা
স্বভাবাৎ বিকৃতো ভবেৎ।
মৃষাচারী মৃষাভাষা সুদুষ্টো জায়তে ধ্রুবম্॥

(৭)

স্বপ্নমন্ত্রহঠকৃপানিত্যত্বাদিবিভেদতঃ।
সিদ্ধাঃ পঞ্চবিধা জ্ঞেয়াঃ
পৃথ্বীশোভাবিবর্ধনাঃ॥
স্বপ্নকালে যদা কোঽপি
মন্ত্রং প্রাপ্য তু চেতনং।
তেনৈব সিদ্ধিমাপ্নোতি
স্বপ্নসিদ্ধঃ স উচ্যতে॥
গুরুদত্তং শুভং মন্ত্রং
সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।
যো জপ্ত্বা সিদ্ধিমাপ্নোতি
মন্ত্রসিদ্ধঃ স এব হি॥

হঠাৎ প্রাপ্য ধনং দীনো
ভবেৎ তূর্ণং ধনী যথা।
দুষ্টোঽপি সাধুতামেতি
সহসৈব কচিদ্ ভুবি ॥
দীর্ঘকালতপস্যাভি-
র্যৎফলং প্রাপ্যতে নরৈঃ।
মুহূর্তেনৈব তৎপ্রাপ্য হঠসিদ্ধঃ স জায়তে ॥
দীনং হীনং যথা দৃষ্ট্বা ধনী কৃপাপরায়ণঃ।
তস্যাপনয়তি ক্লেশং ধনদানেন সর্বথা ॥
বীক্ষ্য কঞ্চিৎ দীনচিত্তং
দুরাচারং নরং তথা।
করোতি সাত্ত্বিকশ্রেষ্ঠং
গোবিন্দো দীনবৎসলঃ ॥
তস্যৈব নরদেবস্য সর্বপূজ্যস্য বৈ তদা।
কৃপাসিদ্ধ ইতি খ্যাতির্ভবতীহ ধরাতলে ॥
কুষ্মাণ্ডালাবুবল্লীনাং যথা ফলোদয়াৎ পরম্।
পুষ্পাণি সম্ভবন্তীহ ফলানি চ ততঃ পরম্ ॥

তথা যে নিত্যসিদ্ধাস্তে
জন্মসিদ্ধা ভবন্তি বৈ।
তেষাং আজন্মসিদ্ধানাং
কর্তব্যানীহ সন্তি ন ॥
তথাপি তেঽনুতিষ্ঠন্তি
যানি কর্মাণি সিদ্ধয়ে।
তান্যেব লোকশিক্ষার্থং
নিত্যসিদ্ধাস্ত এব হি ॥

(৮)

যথা দূরতো হট্টকোলাহলোঽয়ং
অবোধ্যঃ সদা ভাতি সর্বৈর্মনুষ্যৈঃ।
সমীপে তু বাণিজ্যকার্যোত্থশব্দাঃ
ক্রয়াদ্যর্থসত্যার্পিতা ভান্তি নিত্যম্ ॥
তথা সৃষ্টিকাণ্ডমনন্তং বিলোক্য
অনীশং স্বতন্ত্রং বদন্তীহ মূঢ়াঃ।
সুধীঃ সূক্ষ্মদর্শী তু জানাতি নিত্যং
বিধাতাস্য নেতা প্রভুর্বিশ্বকর্তা ॥ *

* রচনাটি 'বিদ্যোদয়' পত্রিকার ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুআরি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেখানে রচয়িতার কোন নাম নাই। কিন্তু স্বামী অখণ্ডানন্দ-রচিত 'স্মৃতিকথা' হইতে জানা যায় যে, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইহার রচয়িতা।

'স্মৃতিকথা'য় ('আলমবাজার মঠ'-প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৪০-১৪২) আছে :

ভাটপাড়ার পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতিরত্নের জ্যেষ্ঠপুত্র হৃষীকেশ শাস্ত্রী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন; তিনিই তখনকার একমাত্র সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা 'বিদ্যোদয়'-এর সম্পাদক ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় মাঝে মাঝে বরাহনগর মঠে আসিতেন, এবং বহুদিন পর্যন্ত ঐ পত্রিকা মঠে পাঠাইতেন। আলমবাজার মঠেও উহা আসিত। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সানন্দে উহা পাঠ করিতেন। "সুরেশচন্দ্র দত্তের সঙ্কলিত Sayings of Paramhansa Ramakrishna Dev—গ্রন্থে ঠাকুরের ৫৯৫টি উপদেশ ছিল। এই গ্রন্থের পূর্বে ঠাকুরের কথা সম্বন্ধে আর কোন গ্রন্থই প্রকাশিত হয় নাই। আহারাদির পর অবসরকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রত্যহ ঐ পুস্তক হইতে ঠাকুরের উপদেশামৃত অনুষ্টুপ' ছন্দে রচনা করিয়া 'বিদ্যোদয়' পত্রে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। 'বিদ্যোদয়ে'র অনেকগুলি সংখ্যায় ঠাকুরের উপদেশ বাহির হইয়াছিল।"

ধর্ম*

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

ধর্ম বলতে কি বোঝায়? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, উপলব্ধিই ধর্ম। অন্যত্র, 'রাজযোগ'-গ্রন্থের প্রারম্ভে বলেছেন, 'আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত ক'রে আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—এগুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সব উপায় দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ এর গৌণ অঙ্গমাত্র।' ধর্মের প্রথম সংজ্ঞা অনুযায়ী আমাদের ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হবে, ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে হবেই—এই হ'ল যথার্থ ধর্ম। দ্বিতীয় সংজ্ঞায় স্বামীজী বলছেন, আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধনই ধর্ম; ঈশ্বরই আমাদের প্রত্যেকের স্বরূপ এবং এই স্বরূপের অভিব্যক্তিই জীবনের লক্ষ্য। কাজেই জীবনের উদ্দেশ্য সত্যোপলব্ধি, অন্য কিছু নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: মানুষজন্ম পেয়ে প্রথম কর্তব্য হ'ল ভগবানলাভ; বাকী সব পরে। স্বামীজীও সেই কথা বলেছেন—আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধনকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলেছেন, আর বলেছেন, জ্ঞানকর্মাদি চারটে পথের যে-কোন একটা, দুটো বা সবগুলিই অবলম্বন ক'রে, অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ-সাধন ক'রে মুক্ত হতে হবে।

মন্দির-মতবাদ-অনুষ্ঠানাদিকে তিনি ধর্মের গৌণ অঙ্গ বলেছেন। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ ধর্মের এইসব গৌণ অঙ্গগুলিকেই—মন্দিরে যাওয়া, কোন অনুষ্ঠান ব্রত উপবাস প্রভৃতি করাকেই ধর্ম ব'লে মনে করি, এগুলির ওপরই গুরুত্ব আরোপ করি, এবং ভাবি এগুলিই বুঝি ধর্মের সব। এগুলিকেই ধর্ম ভেবে আমরা ভুলে যাই—চরম সত্যকে ধারণা ও উপলব্ধি করার চেষ্টাই হল ধর্ম। ফলে কখনো কখনো আমরা এত সংকীর্ণমনা হয়ে যাই যে, আমরা যেভাবে চলেছি সেভাবে যারা চলে না, অথচ অন্য উপায়ে আসল ধর্মাচরণ, সত্যোপলব্ধির চেষ্টা করে, তাদের আমরা অধার্মিক ভাবি। আমাদের সৌভাগ্য, মাঝে মাঝে পৃথিবীতে মহাপুরুষগণ আসেন, ধর্ম বলতে আসলে কি বোঝায় তা তাঁরা বুঝিয়ে দেন এবং ভগবান-লাভের রাজপথে আমাদের তুলে দিয়ে যান। সর্ববিধ কুসংস্কারের এবং ধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সঞ্চিত গ্লানি কাটিয়ে দিয়ে তাঁরা আমাদের সামনে তুলে ধরেন শাস্ত্রের সঠিক ব্যাখ্যা—যা আমরা ভুলে যাই। তাঁদের জীবন ও বাণীতে শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা ভাস্বর হয়ে ওঠে; শাস্ত্রের যে-সব কথা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হত, তারও অর্থ প্রাঞ্জল হয়। যথার্থ ধর্ম বলতে কি বোঝায় সেকথা তখন বোধগম্য হয় আমাদের। এরূপ একজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ একবার পেলে তখন আর ধর্মের নামে যারা যথেচ্ছাচার ক'রে বেড়ায় তাদের দ্বারা আমাদের প্রতারিত হতে হয় না।

---

* মহীশূর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ১৬.৫.৭১ তারিখে প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতা হইতে সংকলিত ও অনূদিত।—সঃ

স্বামীজী বলেছেন, পূর্বোক্ত চারটি পথের যে-কোন একটি পথ ধরে মুক্ত হওয়াই ধর্মের সব কিছু। কি থেকে মুক্ত হওয়া? বন্ধন থেকে। আমাদের বন্ধনের স্বরূপ কি? শ্রীশঙ্কর তাঁর বেদান্তসূত্রের প্রসিদ্ধ ভাষ্যে বলেছেন, 'আত্মা ও অনাত্মার, চৈতন্য ও জড়ের প্রকৃতি আলোক এবং অন্ধকারের মতোই পরস্পর-বিরুদ্ধ। তা সত্ত্বেও আমরা আত্মা-অনাত্মা গুলিয়ে ফেলি—আত্মার ধর্ম অনাত্মায় এবং অনাত্মার ধর্ম আত্মায় চাপিয়ে ব'লে থাকি, 'আমি এই ঘরের ভিতর রয়েছি', 'আমি ভুগছি', 'আমি অজ্ঞান' ইত্যাদি। আমি ঘরের ভিতর রয়েছি—এ কি ক'রে হতে পারে? স্বরূপতঃ আমি অসীম আত্মা, আমি এই ঘরের মধ্যে সীমিত হতে পারি না। দেহকে 'আমি' ব'লে ভাবি বলেই আমরা ব'লে থাকি, 'আমি ঘরের ভিতর রয়েছি।' ঠিক এইজন্যই, মনের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম ভাবি বলেই মন সুখ-দুঃখাদি ভাবগ্রস্ত হলে ভাবি, 'আমি 'আমি দুঃখী।' এভাবে আমরা নিজেদের আসল স্বরূপ আত্মাকে অনাত্মার সঙ্গে এক ভেবে, অনাত্মাকে আত্মা ভেবে বদ্ধ হয়ে পড়েছি ও ভুগছি। অজ্ঞানের জন্যই এটা হয়েছে। অজ্ঞান আমাদের জ্ঞানকে আবৃত ক'রে রেখেছে বলেই এই দুর্ভোগ।

এখন প্রশ্ন হল, এ বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় কি? ধর্মজীবন আরম্ভ করতে হলে সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হল বৈরাগ্য, অর্থাৎ ত্যাগের ভাব। এ বৈরাগ্যের অনুশীলন করা যায় কিভাবে? সদসৎ-বিচারের দ্বারা তা সম্ভব। এই বিচারের ফলে আমরা জানতে পারি কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা অসত্য; বুঝতে পারি যা অসত্য বা অনিত্য তা মূল্যহীন। যা সত্য একমাত্র সেই জিনিসই আমাদের চির-শান্তি দিতে পারে। আমাদের এ বোধ আসা চাই যে, এ জগতের সবকিছুই দুঃখপূর্ণ, যথার্থ সুখ ব'লে এখানে কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণ যে কথা বলেছেন: 'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।' দুঃখপূর্ণ এই জগতে যখন জন্মেছ, আমার ভজনা ক'রে দুঃখরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হও। বুদ্ধদেবও একই কথা বলেছেন। তাঁরও বৈরাগ্য এসেছিল। একদিন তিনি নগরভ্রমণে বেরিয়ে মানুষের রোগ ও জরাভোগ এবং পরিণাম মৃত্যু দেখলেন। দেখে তাঁর মন ত্যাগের ভাবে পূর্ণ হল। গীতাও জীবনের দোষপূর্ণ দুঃখময় দিকটিতে চোখ খুলে রাখতে বলেছেন: 'জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানু-দর্শনম্।' জীবনটা যে কিছুই নয়, সেটা বুঝতেই হবে আমাদের। জন্মের পর মানুষ দুঃখ ব্যাধি ও জরায় ভুগে শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কাজেই জীবনটাই দুঃখময়; অবশ্য জীবনে যে মাঝে মাঝে একটু-আধটু সুখের দেখা পাওয়া যায় না তা নয়, তবে জীবনের অধিকাংশই দুঃখময়। এভাবে বিচার ক'রে আমাদের দেখতে হবে এ জগতে আসক্ত থেকে কোন লাভ আছে কি না। উপনিষদে আছে, পরলোকের—স্বর্গের সুখও স্থায়ী নয়। যজ্ঞাদি কর্মের ফলে লব্ধ স্বর্গসুখ স্থায়ী হয় না, তারও একটা শেষ আছে, পুণ্যক্ষয় হলে আবার পৃথিবীতে ফিরে এসে জন্মজন্মান্তর-চক্রে ঘুরে বেড়াতে হয়; একথা বুঝে জ্ঞানী ব্যক্তিরা স্বর্গলাভেচ্ছাও ত্যাগ করেন। অনন্ত জীবন বা মুক্তি জন্ম-মৃত্যু-সীমিত অস্তিত্বের মধ্যে নেই, যতক্ষণ না আমরা ভগবানলাভ বা জ্ঞানলাভ করছি, ততক্ষণ তা পাবার নয়।

বিচার ক'রে এভাবে আমরা জগতের আসল রূপ জানতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'যদি জানতাম যে, জগৎটা সত্য

তাহলে কামারপুকুর সোনা দিয়ে মুড়ে দিতাম।' জনৈক নবাবের কোন উজীর সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। খুব দুর্যোগ একদিন, মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে, শহরের রাস্তায় একহাঁটু জল জমে গেছে। ঘরে শুয়ে এক রজক-দম্পতী দুপুর রাতে শব্দ শুনে বুঝল, কে যেন রাস্তা দিয়ে জল ভেঙে হেঁটে যাচ্ছে। ঐ উজীরই যাচ্ছিলেন, নবাব তাঁকে একটা জরুরী কাজে ডেকেছেন। তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল, উজীর তাই কিছুক্ষণের জন্য ঐ রজকদের ঘরের দাওয়াতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাইরে শব্দ শুনে রজকের স্ত্রী স্বামীকে বলল, 'নিষুতি রাতে এই দুর্যোগে রাস্তা দিয়ে কে যাচ্ছে গো?' রজক উত্তর দিল, 'কে আবার—রাস্তার কুকুর বা কোন বড়লোকের চাকর কেউ হবে! তাছাড়া এই দুর্যোগের রাতে কে আর বাইরে বেরুবে?' উজীর সব শুনলেন; বুঝলেন, বড়লোকের কর্মচারী ব'লে তাঁকে রাস্তার কুকুরের সমপর্যায়ে ফেলা হয়েছে। নিজের পদমর্যাদার ওপর তাঁর বিরক্তি এল, উজীরের পদ ত্যাগ ক'রে তিনি ভগবানলাভের জন্য তপস্যা করতে চলে গেলেন। জীবনে এরকম কঠিন আঘাত এলে তখন মানুষের মন ত্যাগের ভাবে ভরে যায়, সমগ্র জীবনধারার গতিই পালটে যায়, সে ভগবদারাধনায় ব্রতী হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, জীবনের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরোপলব্ধি, নিজের ঈশ্বরস্বরূপতার বিকাশসাধন, বা অন্য ভাষায় বন্ধনমুক্তি। স্বামীজী ধর্মের সংজ্ঞা-প্রসঙ্গে জ্ঞানকর্মাদি যে চারটি পথের কথা বলেছেন, তার একটি বা একাধিক পথ অবলম্বনে অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধন ক'রে মুক্ত হবার জন্য আমাদের চেষ্টা করতেই হবে। 'আমি-আমার'-বোধই বন্ধন। অজ্ঞানের জন্য আমরা আত্মা-অনাত্মা একাকার ক'রে ফেলি এবং উভয়ের সেই মিশ্রণকেই 'আমি' বলি, 'আমার' বলি। এই 'আমি'-'আমার'-বোধরূপ, অহঙ্কাররূপ বন্ধন থেকে মুক্তির জন্যই জ্ঞানাদি চারটি পথ বিবৃত। গীতাতেও এই চারটি পথের কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক পথেই অহঙ্কার বিনষ্ট হয়। চারটি পথেরই উদ্দেশ্য হল অহঙ্কারকে নাশ ক'রে বন্ধনমুক্ত করা। সাধারণতঃ আমরা একাধিক পথই অবলম্বন করি, কারণ আমাদের মনের প্রবণতা এমনি যে, একটা মাত্র পথ তার পক্ষে যথেষ্ট হয় না। আমাদের মনের গঠন মিশ্রিত ভাব নিয়ে—ভক্তি, বিচার, কর্ম ও ধ্যানের ভাব, সবই কিছুটা ক'রে রয়েছে আমাদের প্রকৃতিতে। এইসব ভাব একসঙ্গে নিয়েই মুক্তিলাভের পথে চলা যেতে পারে। সেজন্যই স্বামীজী 'এগুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সব উপায়ের দ্বারা' মুক্ত হবার কথা বলেছেন।

আধুনিক যুগে দেখা যায়, ধর্মকে হেয়জ্ঞান করা হচ্ছে। ঈশ্বর আছেন ব'লে লোকে বিশ্বাস করে না। তারা বলে, 'ঈশ্বর নেই, কারণ বৈজ্ঞানিক সত্যগুলির মতো ঈশ্বরাস্তিত্বের সত্যতা প্রমাণ করা যায় না। কাজেই ঈশ্বরকে মেনে নেওয়া চলে না। তাছাড়া ধর্ম তো আর একটা নয়, অনেক; সেই বিভিন্ন ধর্মগুলি আবার পরস্পর বিবাদে রত। কাজেই কোন্ ধর্ম সত্য, তাও তো বলা যায় না!' এভাবে যুক্তি দেখিয়ে তারা বলে, 'ধর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই, ঈশ্বর ব'লে কিছু নেই, ঈশ্বরাস্তিত্বের কোন প্রমাণই নেই। বড়জোর বলা যায়, ধার্মিক ব্যক্তিদের দিয়ে একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—পরকালে শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে দাবিয়ে রাখা যায়, তাদের ঠিকমতো চালানো যায়। তাছাড়া ধর্মের আর কোন

তাৎপর্য বা উপযোগিতা নেই।' এই হল আধুনিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী।

এখন ধর্ম বলতে যদি উপলব্ধি—ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা, সাক্ষাৎভাবে তাঁকে জানা বোঝায়, তাহলে তো তা বৈজ্ঞানিক সত্যের পর্যায়েই পড়ছে। বিজ্ঞান বলে, প্রত্যেক সত্যকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে সাক্ষাৎভাবে জানতে পারলে তবেই তা প্রমাণিত সত্য ব'লে স্বীকৃত হবে। ধার্মিক ব্যক্তিরা বলেন, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায়। 'ঈশ্বরকে দেখেছেন কি?'—স্বামীজীর (তখন নরেন্দ্রনাথ) এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাই বলেছিলেন। স্বামীজী যেন আধুনিক জগতের সব মানুষের প্রতিনিধিরূপেই এ প্রশ্নটি করেছিলেন—আধুনিক যুগের মানুষের যে সন্দেহ, সে সন্দেহ-ই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্যদর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তার সঙ্গে পরিচিত স্বামীজীর মনে জেগেছিল। ঈশ্বরের অস্তিত্বে তিনি তখন সন্দিহান হয়েছিলেন। এই সন্দেহ-নিরসনের জন্য তাঁর পরিচিত প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তিকে তিনি প্রশ্ন করতেন, 'ঈশ্বরকে দেখেছেন কি?' কিন্তু সোজাসুজি কোন উত্তর কোথাও পাননি। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, ঈশ্বরকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। তুই যদি চাস, তোকেও দেখাতে পারি।' শ্রীরামকৃষ্ণ এমন জোর দিয়ে কথাগুলি বলেছিলেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ স্বামীজীর চলে গিয়েছিল। ধর্মীয় উপলব্ধি যে সত্য, শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে অতিচেতন স্তরে উন্নীত হয়ে স্বামীজী তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

এখন বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন, যুক্তি দিয়ে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। সত্যিই তো তা করা যায় না। যুক্তি সীমিত—আমাদের চেতন-স্তরের সীমার মধ্যেই যুক্তি ক্রিয়াশীল। যা অসীম, যুক্তি তাকে জানতে বা তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। মন দিয়ে আমরা অসীমকে ধরতে পারি না। যুক্তি মনের একটি বৃত্তি মাত্র, কাজেই যুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরকে যদি আমরা 'জানতে' পারি—চিন্তার মধ্যে সীমিত করতে পারি—তাহলে তাঁকে আর ঈশ্বর বলা চলে না; তিনি তখন আর অসীম নন, আমাদের মতোই সসীম। আমাদের চিন্তায় জ্ঞানে যা কিছু ধরা পড়ে, আমরা যা কিছু 'জানি', তা সবই সসীম। কাজেই মন বা যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়। আমরা যদি যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করি, আমাদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান অপর কেউ যুক্তি দিয়েই তা খণ্ডন ক'রে দিতে পারে। প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই ঈশ্বরাস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ। অতি-চেতন স্তরে আমাদের পূর্ণ সত্তা দিয়ে আমরা যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি উপলব্ধি করি, তা মনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে; মন আমাদের পূর্ণ সত্তার অংশমাত্র। কাজেই পূর্ণ সত্তা দিয়ে অতিচেতন স্তরে আমরা যা উপলব্ধি করি, চেতন স্তরে সীমিত যুক্তি দিয়ে তা বোঝানো যায় না; তবে একথাও ঠিক যে, তা যুক্তিবিরোধীও হয় না, কারণ যুক্তিরূপ-বৃত্তিসমন্বিত আমাদের মন আমাদের পূর্ণ সত্তারই অন্তর্ভুক্ত। সত্যোপলব্ধি না করেও কেউ তা করেছি ব'লে আমাদের ধাপ্পাও দিতে পারে না; কারণ সে সত্যলাভ করেছে কি না, তার আচরণেই তা বোঝা যাবে, সে মানবপ্রেমিক হবে। ধর্মীয় উপলব্ধি, অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি আত্ম-ভিত্তিক, বাহ্যবস্তু-ভিত্তিক নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে,

অমুক যে সত্যোপলব্ধি করেছে, তার প্রমাণ কি? তার জীবনে, বাহ্য আচরণেই তা প্রকাশ পাবে, তার জীবন ও আচরণ দেখেই বোঝা যাবে সে ভগবানলাভ করেছে কি না। এ ছাড়া বুঝবার আর কোন উপায় নেই। অতীন্দ্রিয় স্তরে উন্নীত হয়ে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায়—এটাই তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। এখন বিজ্ঞানীরা যদি অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিই না মানতে চান, তাহলে অবিচার করা হবে। কোন বিজ্ঞানীর কাছে যদি কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রমাণ চাওয়া যায়, তাহলে তিনি বলবেন, 'আমি যেভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, আমার ল্যাবরেটারীতে এসে তুমি নিজে সেভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখ আমি যা বলছি তা ঠিক কি না।' একজন অতীন্দ্রিয়-উপলব্ধিমান ব্যক্তিও একই কথা বলতে পারেন: 'আমার কাছে এস, আমি যেভাবে চলেছি সেভাবে চল; সংযত জীবন যাপন কর; মনকে সংযত, একাগ্র কর; তাহলেই তুমি সত্য উপলব্ধি করবে।' উভয় ক্ষেত্রে উত্তর একই। আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখতে রাজী নই, অথচ ব'লে বেড়াব—'সব বাজে কথা!'

ভগবান আছেন, একথা অতি সত্য। মহাপুরুষগণ তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন, শাস্ত্রও তাঁর কথা ঘোষণা করছে। ধর্ম আমাদের জীবনে অবশ্যপ্রয়োজনীয়, ধর্ম ছাড়া আমরা কিছু করতে পারি না। কাজেই জীবনের চরমলক্ষ্য চরমসত্যোপলব্ধির জন্য আমাদের প্রত্যেককে কিছু করতেই হবে। প্রাচীন কালে আমাদের জীবনে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চতুর্বর্গলাভের আদর্শ ছিল। মোক্ষ চরম আদর্শ, ধর্ম অর্থ ও কামের স্থান তার নীচে। মুক্তিলাভ বা ভগবানলাভই আমাদের চরম লক্ষ্য—একথা না ভুলে কিছুটা ভোগ এবং একটা সীমা পর্যন্ত অর্থসঞ্চয় করার বিধান দেওয়া ছিল। কিন্তু আজকাল আমরা সে আদর্শ বিস্মৃত হয়ে যে-কোন উপায় অবলম্বনে ভোগ ও অর্থসঞ্চয়ের পথে উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছি। পৃথিবীর সর্বত্রই এইটাই আজকাল ধর্ম হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরোপলব্ধিই যে জীবনের মূল আদর্শ, এজন্য যে প্রতিদিন কিছুটা সময় আমাদের ঈশ্বরারাধনায় দিতেই হবে, সে কথা আমরা ভুলে গেছি। ভগবান থেকে সরে এসেছি বলেই জগতে আজ এত বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে।

এ বিশৃঙ্খলা দূর করতে হলে ভগবানকে আবার জীবনের কেন্দ্রে এনে বসাতে হবে; যে কোন উপায় অবলম্বনে হোক, আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধনের জন্য নিয়মিত চেষ্টা করতে হবে।

কালরাত্রি-মহারাত্রি-মোহরাত্রি

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

মধুকৈটভ অসুরদ্বয়ের ভয়ে দিশাহারা হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষ্ণুর ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য বিষ্ণুকেও যিনি জাগান আবার ঘুম পাড়ান সেই আদ্যাশক্তি মহামায়ার স্তব করিতেছেন—

মা, তুমি কালরাত্রি, মহারাত্রি, আবার মোহরাত্রি—দারুণা মোহরাত্রি (চণ্ডী ১।৭৮)।

দিন ও রাত্রি লইয়া কালের প্রবাহ। দিনের বেলায় আমরা খাই-দাই ছুটাছুটি করি হাসি কাঁদি। কিন্তু সর্বক্ষণ তো জাগিয়া থাকা চলে না। জাগরণের ক্লান্তি কাটাইবার জন্য নিদ্রার প্রয়োজন হয়। দিবাশেষে রাত্রি আসে। রাত্রির অন্ধকারে দিনের আলো লয় পায়, আমাদেরও ছুটাছুটি সুপ্তির বিরামে চুপ হইয়া যায়। সংসারে দিনের ন্যায় রাত্রির অপরিহার্য প্রয়োজন। নিদ্রার প্রশান্তি হইতে আমরা পরের দিনের ছুটাছুটির শক্তি পাই। দিবারাত্রির, জাগরণ-সুপ্তির এই আবর্তন আমাদের প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতার মধ্যে। কিন্তু যাহা আমাদের লৌকিক অভিজ্ঞতার গোচর নয় সেই সত্য শাস্ত্র হইতে জানিতে হয়। তাই চণ্ডীশাস্ত্র আমাদিগকে শুনাইতেছেন—দিন ও রাত্রি, জাগরণ ও নিদ্রা যাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেতে আবর্তিত হইতেছে, তিনি চৈতন্যময়ী মহামায়া। উপনিষদ্ তাঁহাকে বলিয়াছেন সগুণ ব্রহ্ম।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি
কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি
কশ্চন॥ (কঠ উপঃ ২।২।৮)

"বিশ্বসংসার নিদ্রাচ্ছন্ন হইলেও যিনি জাগিয়া থাকেন, জীবের ভোগানিচয়কে জিয়াইয়া রাখেন, তিনিই জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম অমৃতস্বরূপ। সব কিছু তাঁহাতেই আশ্রিত। তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।"

জাগরণ ও নিদ্রা—আবির্ভাব ও তিরোভাব—কার্য ও কারণ দুই-ই ব্রহ্মময়ীর শক্তি-বিলাস, এই সত্যটি মনে রাখিলে আমাদের চিত্ত সমতা লাভ করে। আমরা মৃত্যুতেও ভয় পাই না। মৃত্যু আমাদের সুপরিচিত নিদ্রারই মতো মহামায়া কালরাত্রির এক কালভঙ্গিমা। বহুতর জন্ম ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া কালাতীতা মহাজননীর চরণস্পর্শ ঘটে।

দৈনন্দিন নিদ্রা এবং জীবনোত্তর মৃত্যুর ন্যায় মহাশক্তি কালরাত্রির অন্য বিপুলতর ব্যঞ্জনা পুরাণে বর্ণিত আছে। ৪৩২১ কোটি মানবীয় বৎসরে প্রজাপতি ব্রহ্মার একটি দিন হয়। মানুষের হিসাবে ব্রহ্মার এক দিন আমাদের এক কল্প। এক কল্প ধরিয়া সৃষ্টির অভিব্যক্তি চলে। তাহার পর আর এক কল্প পর্যন্ত চলে ব্রহ্মার একরাত্রির নিদ্রা। আমাদের দৃষ্টিতে উহার নাম খণ্ডপ্রলয়। আমাদের জীবনগতির মতো ব্রহ্মারও জীবনগতি দিবা-রাত্রির আবর্তনে বহিয়া চলে। ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মার এক মাস, ৩৬০ কল্পে তাঁহার এক বৎসর। তাঁহার জীবনকাল তাঁহার ১০০ বৎসর, অর্থাৎ আমাদের হিসাবে ৩৬,০০০ কল্প। ব্রহ্মার দিনান্ত রাত্রি এবং জীবনান্ত মৃত্যু মহামায়া কালরাত্রির বিচিত্র লীলা-বিলাস। কিন্তু পুরাণ বলেন অবাক হইও

না। মায়ের আরও মহিমা শোন। ব্রহ্মা একটি নন। অনন্ত সৃষ্টিতে অনন্ত ব্রহ্মা। ঈশোপনিষদ্‌ও বলিয়াছেন—"যাথাতথ্যতোঽর্থান্‌ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।" সংবৎসরাখ্য অসংখ্য প্রজাপতিকে পরমেশ্বর যথাযথ শক্তি দিয়াছেন। ব্রহ্মার জীবনকাল ফুরাইলে তিনি মুক্তি লাভ করেন। মহামায়া কালরাত্রির জীবনও নাই, মৃত্যুও নাই। তিনি পরব্রহ্মস্বরূপিণী। অসংখ্য জীবের, অসংখ্য ব্রহ্মার জীবন-মৃত্যু কালরূপিণী তাঁহাতেই ঘটিতেছে।

যিনি কালরাত্রি তিনি আবার মহারাত্রি। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, সমস্ত সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের আবর্তন থামিয়া গিয়াছে। মা কালকেও নিজের চৈতন্যস্বরূপে টানিয়া লইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় গিন্নীর টুকটাক জিনিস রাখিবার হাঁড়ির মতো মহামায়া সৃষ্টির সব বীজ কুড়াইয়া একটি অলৌকিক পেটিকায় সঞ্চিত রাখিয়াছেন। এবার তিনি পরব্রহ্মের সহিত এক হইয়া থাকিবেন। ইহার নাম পৌরাণিক ভাষায় মহাপ্রলয়। মহাপ্রলয়ের যখন তিনি নায়িকা তখন মায়ের নাম মহারাত্রি।

যিনি কালরাত্রি. মহারাত্রি, তিনি আবার মোহরাত্রি। বেদ-বেদান্তের সিদ্ধান্ত—প্রত্যেক জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ। 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বেদান্তবাক্যের ইহাই তাৎপর্য। জীব যতক্ষণ এই মহাসত্য জানে না ততক্ষণ সে জীব—ঘুমন্ত জীব। তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলে তাহার আত্মস্বরূপে অবস্থান। সেই অবস্থানে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় নাই। জীব মুক্ত—চিরমুক্তি লাভ করিয়া শিব হইয়াছে। জীবের অজ্ঞান অবস্থার নাম মোহরাত্রি। ক্ষুদ্রতম জীব হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্যন্ত সকলেই মোহরাত্রিতে নিদ্রাচ্ছন্ন। মোহরাত্রির আবরণ কে অখিল সৃষ্টিতে বিস্তার করেন? মা। তাই মায়ের নাম মোহরাত্রি। কালরাত্রি এবং মহারাত্রি মায়ের ইঙ্গিতে কালের নিয়মে আপনা-আপনি ঘটিয়া চলে। কিন্তু মোহরাত্রির অবসান বড় কঠিন। মুক্তি সুদুর্লভ। তাই চণ্ডী বলিতেছেন—মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।

দারুণা মোহরাত্রি কাটিবে কি করিয়া? চণ্ডী বলিতেছেন, তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্‌—হে মহারাজ (সুরথ), মোহরাত্রির নায়িকা পরমেশ্বরীর শরণ লও। তিনি প্রসন্ন হইলে ঘুম ভাঙ্গিবে। একান্ত ভক্তি, একনিষ্ঠ উপাসনা দ্বারা দেবীর প্রসন্নতা লাভ করা যায়। মোহরাত্রির ঘন অন্ধকার তাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে তিরোহিত হইতে পারে। বেদের প্রার্থনা—আবিরাবির্ম এধি—হে জ্যোতির্ময়, অজ্ঞানাচ্ছন্ন আমার হৃদয়কে আলোকিত কর।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় গান—

শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি।

মা ঘুড়ি খেলিতেছেন। প্রত্যেকটি জীব এক একটি ঘুড়ি। ঘুড়ি উড়িতেছে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মহাকাশে উড়িতেছে। জীব হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, বাসনাবশে ছুটিতেছে, আশা-নিরাশা উল্লাস-বেদনা সম্পদ-বিপদ জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে অবিরত ঘুরিতেছে। পরিত্রাণ নাই। মা মজা দেখিতেছেন। সুতা তাঁহার হাতে।

কচিৎ কখনো সুতায় সুতা লাগিয়া এক একটি ঘুড়ির সুতা কাটিয়া যায়। ঘুড়িটি মুক্তি লাভ করে। মা হাসিয়া উঠেন। "হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।" বলেন, 'ঐ রে, ঐ ঘুড়িটা কেটে গেল!' একটি জীব মুক্তিলাভ করিল। তাহাতে মায়ের আনন্দই।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় গান—"শ্যামা মা কি

কল করেছে!” যন্ত্র ও যন্ত্রীর উপমা। চৈতন্যময়ী মহামায়া মোহরাত্রির পটভূমিকায় জীবকে আমি-আমার বোধে যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন। জীব ভাবিতেছে আমি আপনিই ঘুরিতেছি। “জানে না কে ঘুরাতেছে।” বিবেক-বৈরাগ্য-ভক্তি-বিশ্বাস-মুমুক্ষুতা আসিলে জীব আবিষ্কার করিতে পারে চৈতন্যময়ীর চৈতন্যেই সে ঘুরিতেছে। তখন মা হাসিয়া উঠেন। বলেন, ‘ঐ রে, এর ঘুম তো ভেঙ্গে গেল! এ তো আর আমার ‘কলডুরিতে’ ঘুরবে না।’

সঙ্গীত-রচয়িতা সাধক বলিতেছেন, তখন জগজ্জননীই সেই পাশমুক্ত জীবের হাতে কল হইয়া পড়েন।

“কোন কলের ভক্তিডোরে আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।” ভক্তের ফাইফরমাস খাটিতে তখন তাঁহার বিপুল আনন্দ। জ্ঞান-ভক্তির এমনই শক্তি।

সনাতনী

শ্রীকালিদাস রায়

অন্নপূর্ণা, তব করে ভিক্ষা লভিবারে,
সাধ করে’ হইয়াছি শাশ্বত ভিখারী।
যাচিয়া লয়েছি কণ্ঠে অনন্ত তৃষারে,
লভিবারে তব প্রেম-ঝরণার বারি।
তোমার অঞ্চল-স্নেহ লভিতে, নয়ন
হ’য়ে আছে যুগে যুগে অশ্রুর নিলয়।
ব্যাধিরে করেছি সাধি এ দেহে বরণ,
তব কর-কিসলয়ে হ’তে নিরাময়।
মধুবাণী শুনিবারে করি অভিমান,
মমতা লভিতে করি বিরহ-সৃজন,
শয়নে নয়নে শুধু করি নিদ্রা-ভাণ,
জাগিয়া উঠিতে তব লভিয়া চুম্বন।
ঝরাইতে অশ্রুবারি তোমার নয়নে,
জনমে জনমে আমি বরি যে মরণে।

মহাশক্তিরূপে দেশমাতৃকা

অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, শাস্ত্রী

মানবশিশু জন্মগ্রহণের পর হইতেই প্রত্যক্ষ শক্তিরূপিণী জননীর অকৃপণ স্নেহের অফুরন্ত দানেই জীবনের পথে অগ্রসর হয়। মায়ের দান মানুষের জীবন ও প্রাণ। ভারতীয় সাধক জগতে বিভিন্ন রূপে দেখিয়াছেন মহাশক্তির প্রকাশ। মহাশক্তিই মহামাতৃকা।

"সর্বপ্রসূর্জন্মভূমিঃ জননী গৌঃ পয়স্বিনী।
মহাশক্তের্জগন্মাতুঃ প্রতিরূপা সুশোভনা॥"

"সকলের জন্মদাত্রী দেশমাতৃকা, দুগ্ধামৃতদানে মানবশিশুর প্রাণরক্ষয়িত্রী পয়স্বিনী গো এবং গর্ভধারিণী জননী একই পরমাশক্তির রূপ-বিশেষ।" তাই জন্মদায়িনী মাতা, গোমাতা এবং দেশমাতাকে সমভাবেই বন্দনা করে ভারতীয় হিন্দু। মাতৃপ্রেমেরই আর একটি রূপ দেশপ্রেম। বঙ্গ-ভারতের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের অন্তরালে এই সনাতনী চেতনাই অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছিল। তাই উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম যুগপুরুষ মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থে (১৮৭৬ খৃঃ) জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'আধিভারতীকে' অন্নদানরতা দুর্গতিনাশিনী মহাদেবীরূপে আর্ষদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া রচনা করিয়াছিলেন এক অভিনব স্তুতি।

"মাতর্নমামি ভবতীং সতীদেহরূপাং
মাতর্নমামি বসুধাতলপুণ্যতীর্থাং।
মাতর্নমামি পদযুগ্মধৃতসমুদ্রাং
মাতর্নমামি হিমগৌরকিরীটভূষাম্॥
হেমাভা হরিদম্বরা পদতলে নীলাম্বুলীলাঞ্চিতা
স্নিগ্ধস্নিগ্ধতরঙ্গিণী সুরধুনীপীযূষনিঃস্যন্দিনা।
সূর্যেন্দুপ্রতিবিম্বিতাম্বরলসৎ-প্রালেয়-মৌলিজ্বলা·
সৌম্যা 'স্যাদধিভারতী' ভয়হরা নিত্যান্নদা
শান্তয়ে॥"

"যে মহাশক্তি সতীদেহ ধারণ করিয়া আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, যিনি পুণ্যতীর্থ ধরিত্রীস্বরূপিণী, সাগর তরঙ্গভঙ্গে যাঁহার চরণযুগল স্পর্শ করিতেছে এবং তুষারের শুভ্র কিরীটে যিনি ভূষিতা, সেই মহামাতৃকাকে প্রণাম করি। স্বর্ণবর্ণা যে ভারতমাতা শ্যামলবসনপরিহিতা, নীল সমুদ্র যাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়ে, যাঁহার বক্ষে প্রবাহিত হইতেছে স্নিগ্ধতরঙ্গিণী অমৃতময়ী গঙ্গানদী, ললাটস্থিত সূর্য এবং চন্দ্রের উজ্জ্বল প্রতিবিম্বে যাঁহার মৌলিদেশ ভাস্বর, ভয়বিদূরণকারিণী, নিত্য অন্নদানরতা, সৌম্যা সেই অধিভারতী দেবীকে বন্দনা করি।" আধুনিক বাংলার জাতীয় জীবনে দেশকে এই প্রথম মাতৃরূপে দর্শন। তাহার পরে ভূদেবের মন্ত্রশিষ্য ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পলোকে মাতৃদর্শন, যাহার পরিণতি—

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্॥
বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী, নমামি ত্বাম্।"

ভারতের মুক্তিযজ্ঞের মহামন্ত্র এই 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটি সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব ঋষিদৃষ্টি এবং ভূদেব-প্রদর্শিত

মাতৃবন্দনারই এক অনবদ্য সুরমূর্ছনা ও রূপ-কল্পনা ঝঙ্কৃত ও মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাহা মনন করিলে ত্রাণ পাওয়া যায় তাহাই তো মন্ত্র। 'বন্দে মাতরম্' আমাদের সার্থক মন্ত্র। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এইভাবে একটি মন্ত্রের বৈদ্যুতিক প্রভাবে জাতীয় জাগরণের অস্বাভাবিক ঘটনা পরিলক্ষিত হয় না। কারণ, এই মহামন্ত্রে মহাশক্তির আরাধনার বাণীই স্পষ্টভাবে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।

এই মহতী চেতনার উৎস-সন্ধানে আমাদের যাত্রা করিতে হইবে বৈদিক ঋষির ভাবলোকে। পৃথিবীর আদি জ্ঞানসিন্ধু ঋগ্বেদে দেখি মাতা পৃথিবীর কত অপূর্ব স্তুতি। এই মাতা ধরিত্রীকে ঋষিরা কখনো পৃথগ্‌ভাবে, আবার কখনো 'দ্যৌ'-এর সঙ্গে একত্র ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রে বন্দনা করিয়াছেন। প্রাণদায়িনী, অন্নদায়িনী এবং স্তন্যদায়িনীরূপে বর্ণনা করিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে মাতা বসুন্ধরার উদ্দেশ্যে আহুতি অর্পণ করিয়াছেন বৈদিক ঋষি। তাঁহাদের স্থির প্রত্যয় ছিল "মাতা পৃথিবী মহীয়ং"—"বিস্তীর্ণা এই পৃথিবী যে আমাদের মাতা"। এই বৈদিক আকুতিরই অনুসরণ পরবর্তী কালে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডীতে দেখি।—

"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।"

"এই মাতা বসুন্ধরা অসীম স্নেহে আমাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। নিন্দনীয় পাপ হইতে তিনি যেন সর্বদাই আমাদের রক্ষা করেন। তাঁহারই উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞার সাহায্যে কতই না স্তুতি আমরা রচনা করিয়া চলিয়াছি।" ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে এই কথাই তো মন্ত্রচ্ছন্দে ঝঙ্কৃত হইতেছে।—

"ভূরিং দ্বে অচরন্তী চরন্তং
পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে।
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে
দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ।
ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা
অভিশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ।
পাতামবদ্যাদ্দুরিতাদভীকে
পিতা মাতা চ রক্ষতামবোভিঃ॥"

(ঋগ্বেদ—১।১৮৫।২,১০)

জীবনের যাহা কিছু প্রয়োজন যথা—প্রভূত শস্য, প্রচুর অন্ন, পর্যাপ্ত ধন, বাঞ্ছিত সুখ শান্তি, ঈপ্সিত শৌর্য বীর্য বিজয়, সন্তান এবং সুদীর্ঘ আয়ু এই শক্তিরূপিণী পৃথিবীমাতার কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন ঋগ্বেদের ঋষি। আর্ষদৃষ্টি-সম্পন্ন এই কবিকুল মাতা পৃথিবীর মধ্যে অনুভব করিয়াছেন অপূর্ব বাৎসল্য, অপরিসীম স্নেহ, অনাবিল ঔদার্য এবং অনন্ত ক্ষমা। মাটি তো তাই স্নেহময়ী 'মা'টি। ধরণীর অন্তহীন বিস্তার, অনন্ত রূপবৈচিত্র্য, নিসর্গের বহুবিচিত্র লীলাবিলাস, বসুন্ধরার অন্নদা এবং ধনদা রূপ, সর্বোপরি এই পৃথিবীর বুকে অনন্ত প্রাণশক্তির নিরন্তর প্রকাশ ও নব নব রূপে নিত্য ক্রীড়া দর্শন করিয়া বৈদিক ঋষিরা বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সেই বিস্ময়ের স্ফূর্তি সূক্তরচনার মাধ্যমে শ্রদ্ধার বন্দনায়। জীবনের অবসানে মৃত্যুর পরে এই ধরিত্রীমাতাই যেন তাঁহার স্নেহাঙ্কে ধারণ করিয়া মানুষকে সকল দুঃখ হইতে রক্ষা করেন—এই জন্য ঋষি কবি জানাইয়াছেন আকুল প্রার্থনা। পরবর্তী কালে বাংলার কবি দ্বিজেন্দ্রলালের "এই দেশেতে জন্ম মা গো, যেন এই দেশেতে মরি" গানে এই কথাই তো কালান্তরে ধ্বনিত হইতেছে। ঋগ্বেদে যে দেবী অদিতিকে পৃথগ্‌ভাবে স্তুতি করা হইয়াছে, অথর্ববেদে ও তৈত্তিরীয়

সংহিতাতে তাঁহাকেই বন্দনা করা হইয়াছে মাতা পৃথিবীরূপে।

অথর্ববেদের 'পৃথিবী'সূক্ত মাতৃবন্দনার অনুপম স্তুতি। ধরিত্রীমাতা সেখানে পূর্ণ-বিকশিতা মহিমময়ী মহাদেবী। "এই পৃথিবী সত্য, ঋত, তপঃ, ব্রহ্ম, যজ্ঞ সব কিছুই ধারণ করিতেছেন। তিনি বিশ্বকে ভরণ করেন, বসু অর্থাৎ রত্নরাজিকে ধারণ করেন এবং সুবর্ণকে করেন রক্ষা। চলিষ্ণু সব কিছুর তিনিই হইলেন নিবেশনী। বৈশ্বানর অগ্নিকে বহন করেন তিনি। ইন্দ্র তাঁহার ঋষভ।" ঋষি আরো বলিতেছেন—"যাহা কিছু শক্তি, তাহা তোমা হইতে উদ্ভূত। ধর্মের দ্বারা ধৃতা তুমি ধ্রুবা, শিবা এবং সুখদা। তুমি আমাদের সুরভিত কর। আমাদের যেন কেউ বিদ্বেষ না করে। শ্রী এবং সম্পদে তুমি আমাদের প্রতিষ্ঠিত কর। ইহাই ঋষির প্রার্থনা—

"বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠাং হিরণ্যবক্ষা
জগতো নিবেশনী।
বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্রঋষভা
দ্রবিণে নো দধাতু॥
যত্তে মধ্যং পৃথিবী যচ্চ নাভ্যঃ যাস্ত
ঊর্জস্তন্বঃ সম্বভূবুঃ।
তাসু নো ধেহ্যভি নঃ পবস্ব মাতা
ভূমিং পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ।
যস্তে গন্ধঃ পৃথিবী সম্বভূব যং
বিভ্রত্যোষধয়ো যমাপ
যং গন্ধর্বা অপ্সরশ্চ ভেজিরে তেন
মাং সুরভিং কৃণু।
মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন॥
(অথর্ববেদ—১২।১।৬৯)

বেদের 'রাষ্ট্রমঙ্গলম্' সূক্তে স্বকীয় রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা উদ্গীত হইয়াছে। "ওঁ মা ব্রহ্মণ্ ব্রহ্মবর্চসো জায়তাম্ আরাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূরো ইষব্যো অতিব্যাধো মহারথো জায়তাম্…বর্ষন্তু।" মহাশক্তি ধরিত্রী তথা দেশমাতৃকারূপে এইভাবে ভারতে যুগে যুগে পূজিতা হইয়াছেন। গোব্রাহ্মণপ্রতিপালক মহারাষ্ট্রপতি ছত্রপতি শিবাজীর আরাধ্যা দেবী ভবানী এই মহাশক্তিরই দেশমাতৃকারূপ। তাই ভারতের বিপ্লব-আন্দোলনে 'ভবানীমন্দির'-রচনার সূত্রে ঋষি অরবিন্দের 'ভবানী'-বন্দনার ধারার পুনঃপ্রবর্তন। সেইদিন মুক্তিপাগল তরুণেরা ভারতীয় শাশ্বত সাধনার অনুসরণে দেশমাতৃকাকে মহাশক্তির সঙ্গে একীভূতা করিয়া দেখিয়াছিলেন। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—তাই প্রতিটি জাতীয়তাবাদী ভারতীয়ের মনের কথা। "দেশদেখা-চোখহারানো" দেশহিতৈষীদের নীতিহীন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তে তাই সেদিন দেখিয়াছিলাম শক্তিসাধকদের দেশসেবায় সাধনার শুচিতা, আরাধনার আর্তি এবং আত্মোৎসর্গের আকুলতা। নারায়ণীয় উপনিষদে ঋষি অসুরবিনাশের জন্য যে অগ্নিবর্ণা মাতা দুর্গাকে বন্দনা করিয়াছিলেন, দেশের দুর্গতিদূরীকরণে এবং অসুরনিধনে মহাশক্তি এবং দেশমাতৃকার অনাবির্ভূতমূর্তির উদ্দেশে সেই মঙ্গলমন্ত্রই আমাদের কণ্ঠে আজিও ধ্বনিত হইয়া উঠুক—

"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
অসুরান্ নাশয়িত্র্যৈ তে নমঃ॥"

এই মহতী ভাবধারা-অনুবর্তনে ভারতীয় সংস্কৃতির ধাত্রী সংস্কৃত ভাষায় বর্তমানের বরেণ্য সংস্কৃত কবি শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণের কণ্ঠে শক্তিরূপিণী দেশমাতাকে জানাই প্রণতি—

"মাতস্ত্বং শ্রীর্ভুবনজননী নৈব মৃন্মাত্ররূপা

পুণ্যোদ্ভূতা মহিমনিকরৈ,
স্বর্গলক্ষ্মীঃ পরাহসি।
সাক্ষাদ্ভূতিং জলধিমমিতাং চিন্ময়ীং বিষ্ণুশক্তিং
নানারত্নপ্রভবমধুরাং শ্যামলাং ত্বাং নমামি ॥
এবং ত্বাং বহুপুণ্যকীর্তিনিলয়াং

সৌন্দর্যরত্নোজ্জ্বলাং
ভক্ত্যা ভারতমাতৃকে চ ললিতে
বন্দে চিরং প্রাঞ্জলিঃ।
ত্বং মূর্তির্হৃদি সংস্থিতা নয়নয়োরানন্দপদ্মোপমা
ধ্যানে চেষ্টপরাত্মদৈবতময়ী যাচে ত্বদঙ্কাশ্রয়ম্ ॥

শ্রীদুর্গা শক্তিময়ী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

চায় যে-ই মা শরণ তব সে-ই পায় নব নব
আঁধার-পরীক্ষায় শক্তি-জ্যোতি।
সেই শক্তিই মা আমার বাঞ্ছিত—বরে যার
হব জয়ী করি পায়ে তোমার নতি।

দেখ, হিংসার অনীকিনী ছায় দিকে দিকে—জিনি'
সে-চণ্ড-হুঙ্কার রৌদ্র ত্রিশূলে তোমার
এসো দেবী-দুন্দুভি স্বনি' অম্বিকা অমরণী!
ঝঞ্ঝায় জ্বালি' দিশা তোমার তারার।

তুমি দুর্গতিহারিণী মা, ত্রিতাপনিবারিণী মা,
ঝরাও শান্তিপ্রেমধারা করুণায়,
দাও অজেয় বীর্য তারে যে এসে তোমার দ্বারে
অরুণ-অভয় চায় নিরাশানিশায়।

তুমি প্রতি অন্তরে রাজো, প্রতি মূর্ছনে বাজো,
প্রতি হিল্লোলে নাচো, বিশ্বময়ী!
জ্বলে তোমারি দীপ্তি প্রতি স্ফুলিঙ্গে, শিবসতী!
তোমারি প্রভায় ঊষা নিশীথজয়ী।

সেই দ্যুমণিদীক্ষা চাই, প্রার্থনা করি তাই:
"যত না আসুক বাধা জীবনে আমার,
যেন তোমার চরণ চেয়ে শক্তিমন্ত্র গেয়ে
মুক্তি লভি মা তরি' তুফান পাথার।"

জীবের দ্বৈধ সত্তা

স্বামী আদিনাথানন্দ

জীবের স্বাধীনতা ব'লে সত্যি কিছু আছে কি না, এ প্রশ্ন চিরকাল মানুষের মনে আলোড়ন তুলে আসছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু নৈতিক ও দার্শনিক চিন্তানায়ক সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। জীবনসংগ্রামে ব্যর্থতায় হতবুদ্ধি প্রত্যেক মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে—সত্যিই কি আমি স্বাধীন? না কালস্রোতে কামনা-বাসনার তরঙ্গে তৃণখণ্ডের মতো অসহায়ভাবে আন্দোলিত হয়ে, মহাজাগতিক অমোঘ বিধানচক্রের আবর্তনে আবর্তিত হয়ে চলেছি? তাই-ই যদি হয়, তাহলে একে অতিক্রম করার, এর হাত থেকে অব্যাহতি-লাভের উপায় কি কিছু নেই? যদি থাকে সে উপায় কী?

অদৃষ্টবাদ বলতে কি বোঝায়, আগে তা নিয়ে একটু আলোচনা ক'রে দেখা যাক।

বিজ্ঞানের ভাষায় অদৃষ্টবাদের অর্থ কার্য-কারণ-নিয়ম, যা স্বীকার ক'রে নেয় যে, প্রকৃতিতে কারণ ছাড়া কোন কার্য হতেই পারে না; জগতে যা কিছু ঘটে তার পিছনে কারণ-রূপে কতকগুলি ঘটনা-পরম্পরা থাকবেই, সেই ঘটনাটিও আবার অনিবার্যভাবে ফল প্রসব করবেই, যা হবে পরবর্তী একটি ঘটনার কারণ। আধুনিক বিজ্ঞান একটি মহাজাগতিক নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছে; এই নিয়ম দিয়েই সে বিশ্বে সংঘটিত সব ঘটনারই ব্যাখ্যা ক'রে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই নজরে পড়েছে যে, অতি-পারমাণবিক স্তরে শক্তির বিচ্ছুরণের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও এই কার্যকারণ-সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ ব্যতিক্রম সত্ত্বেও কার্যকারণ নিয়ম বলবৎ আছে।

এই কার্যকারণ-বিধানই ব্যক্তির নৈতিক জীবনে প্রযুক্ত হয়ে ভারতীয় দার্শনিকগণের কর্মবাদের রূপ নিয়েছে। মীমাংসকগণ এই মতবাদ প্রচার করেন। সাংখ্যের বিশ্ব-জনীন কার্যকারণ-সম্বন্ধ দ্বারা ইহা সমর্থিত। বুদ্ধদেবও, যিনি বেদ অস্বীকার করেছেন, যিনি ব্রহ্ম আত্মা ঈশ্বর পরকাল ইত্যাদি অচিন্ত্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে অজ্ঞেয়বাদীর ভাব পোষণ করতেন, তিনিও এই কর্মবাদ স্বীকার করেছেন। এই কর্মবাদের অর্থ হ'ল, তুমি যেমন কর্ম করবে ফলও পাবে তেমনি। ভাল, মন্দ বা গতানুগতিক যে-কোন কাজই আমরা করি না কেন, প্রত্যেকটি কর্মই তদনুরূপ ফল প্রসব করবে, এবং সে ফল আমাদের ভোগ করতেই হবে—এ জন্মেই হোক আর পরজন্মেই হোক। এ ফল আমাদের সূক্ষ্ম শরীরে সঞ্চিত থাকে এবং মৃত্যুকালে স্থূলশরীর ছেড়ে যাবার সময় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যায়। নতুন জন্মে আমাদের সেই-সব পূর্ব পূর্ব জন্মে সঞ্চিত কর্মফল ভোগ করতে হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কার্যকারণনিয়মের দার্শনিক ভিত্তি বর্ণিত হয়েছে এভাবে: 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।'—সব কাজই হয় প্রকৃতির গুণে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে। গীতামতে সত্ত্ব রজ ও তম—এই ত্রিগুণসমন্বিত বিশ্বনিয়ামিকা শক্তিই সর্ববিধ প্রাকৃতিক ঘটনার—মন ও জড়ের সর্ববিধ ক্রিয়ার পিছনে ক্রিয়াশীল। এই মহাজাগতিক শক্তিপ্রক্রিয়ায়

জড়িত মানুষ অজ্ঞানবশে নিজেকে কর্তা ব'লে মনে করে এবং তার ফলে মহাজাগতিক কার্যকারণবিধান-চক্রে জড়িত হয়ে যুগ যুগ ধরে আবর্তিত হতে থাকে। কল্পান্তে সৃষ্টি কারণে লীন না হওয়া পর্যন্ত চক্রের এই আবর্তন থামে না। কল্পান্তে কারণে কিছুকাল লীন হয়ে থাকার পর নতুন কল্পে পরিদৃশ্যমান বিশ্বসহ জীবসমূহ আবার দেহ নিয়ে আবির্ভূত হয়—অতীত কল্পের কর্মফল ভোগ করার জন্য।

এ আবর্তন জন্মজন্মান্তর ধরে, যুগযুগ ধরে, কল্প-কল্পান্ত ধরে চলতেই থাকে। ভগবান-লাভ বা আত্মজ্ঞানলাভ—ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের অভেদজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত জন্মমৃত্যুর এই আবর্তনের হাত থেকে কারো পরিত্রাণ নেই।

আচার্য শঙ্কর জগতের আপেক্ষিক সত্তায় এই কার্যকারণ-সম্বন্ধ স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, ব্রহ্মের সহিত নিজের অভেদত্ব প্রত্যক্ষ করা ছাড়া বদ্ধ জীবের কর্মপাশ থেকে মুক্তিলাভের অন্য আর কোন উপায় নেই।

বুদ্ধদেব নৈতিক কার্যকারণ-সম্বন্ধ আবিষ্কার ক'রে এর আখ্যা দিয়েছেন 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'। এ হল নৈতিক কর্মবাদ, যা পরিদৃশ্যমান অস্তিত্বে জীবাত্মাকে আবদ্ধ রাখে। এ মত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে—প্রত্যেক ঘটনারই একটি কারণ আছে, সুতরাং মানুষের জীবন কতকগুলি কার্যকারণ-সম্বন্ধের দ্বারা বদ্ধ, যার ফলে জীবাত্মা দেহমধ্যে আবদ্ধ হয়—যে দেহ জন্ম, মৃত্যু, রোগ, বিফলতা, নৈরাশ্য, অতৃপ্ত ভালবাসা, উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা প্রভৃতি বহুবিধ ক্লেশের অধীন। এ সবই নির্ধারিত হয় নৈতিক কার্যকারণ-বিধান দ্বারা। এই কার্যকারণ-পরম্পরার প্রারম্ভে রয়েছে বাসনা, যা দুঃখময় জীবনধারণের মূল কারণ। বুদ্ধদেব আত্মার এই বন্ধন ছিন্ন ক'রে পূর্বোক্ত সর্ববিধ বেদনা ও দুঃখের হাত থেকে মুক্তিলাভের পথ দেখিয়ে গেছেন। সে মুক্ত অবস্থার নাম নির্বাণ। এ অবস্থায় জীবের জন্মজন্মান্তরক্রম সঞ্চিত কর্মফল নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যায়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান মানব-ব্যক্তিত্বকে মন ও শরীরের মিশ্রণ বলে মনে করে। এ হল একটা শারীর-মানস যন্ত্রের যান্ত্রিক পদ্ধতি-বিশেষ—যা কতকগুলি কর্মক্ষমতা ও ক্রিয়া-সম্পাদক যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত কতকগুলি বাসনা ও প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ বাসনা ও প্রবৃত্তির তরঙ্গাঘাতে বিক্ষুব্ধ একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রবিশেষ। যুক্তি (বা অন্য যে নামই দিই না তার) হ'ল চৈতন্যের অবচেতন বা অচেতন স্তরের বাসনা-তরঙ্গে ভাসমান একখণ্ড তৃণমাত্র। মানুষ এই-সব বাসনা ও প্রবৃত্তির ক্রীতদাস। চেতন 'অহং' সেগুলিকে পরিচালিত করতে চেষ্টা করে বটে কিন্তু সে নিজেই মনের অবচেতন ও অচেতন স্তরের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত।

এই নিয়তিবাদের মতে মানুষের ইচ্ছার গঠন হয় তার ওপর সামাজিক প্রভাব যেমন পড়ে তদনুরূপ। সমাজের চিরাচরিত প্রথা দ্বারাই তার বিবেক নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি কতকগুলি মানসিক প্রবণতা ও প্রবৃত্তি নিয়েই জন্মায়; এ জীবনে সেগুলির বিকাশ ঘটে মাতা-পিতার নিকট থেকে পাওয়া শারীর-মানস যান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে। কাজেই পূর্ব হতে বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা মানুষ অন্তরে বাইরে সর্বতোভাবে পূর্ব হতেই আবদ্ধ। একে আত্মার বদ্ধাবস্থা বলা হয়। মানুষ অদৃষ্টকর্তৃক পূর্বনির্ধারিত অবস্থার মধ্যে পূর্বোক্ত ত্রিগুণের বাধ্যতামূলক শক্তির অধীনে নিজের

কর্ম ক্ষয় করতে জন্মগ্রহণ করে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাই যদি হয় তাহলে আত্মার স্বাধীনতা কোথায় ? আত্মা কি সত্যই পরিবেশের দ্বারা চালিত একটি যন্ত্রবিশেষ ? বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে অবশ্য হতাশার কোন কারণ নেই ; বেদান্তের সিদ্ধান্ত হ'ল প্রকৃতির বন্ধন ছিন্ন ক'রে মুক্তাবস্থা লাভ করার ক্ষমতা বদ্ধ জীবের আছে। বেদান্তমতে মানুষের ব্যক্তিত্বের বহু দিক আছে। এক দিক দিয়ে সে যে প্রকৃতির গুণত্রয়চালিত দেহমনের মিশ্রণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই, আর এ-দিক দিয়েই সে পূর্ব হতে বর্তমান পরিবেশের পরিকল্পনাধীন। কিন্তু মানব-ব্যক্তিত্বের আর একটি দিক আছে, সেটি তার আধ্যাত্মিক দিক, যা ঘটনাপ্রবাহ বা প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। গীতা দৃঢ়কণ্ঠে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন. 'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।' আমাদের ব্যক্তিত্বের অপর দিকটি হ'ল ভগবানের পরা প্রকৃতি, যা জীবচৈতন্যরূপে প্রতিভাত. যা তাঁর অপরা প্রকৃতি থেকে অর্থাৎ জগতের সমস্ত স্থূল পদার্থ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ, এবং এসবের মূল কারণ ত্রিগুণময়ী অব্যক্ত প্রকৃতি থেকেও পৃথক। এটাই আমাদের ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক দিক, আমাদের দেবস্বরূপতা, যা ঈশ্বরের মধ্যেও বিদ্যমান ; শ্রীরামানুজের অনুপম জীবনদর্শন-মতে ইহাই পরমপুরুষ নারায়ণকে দেহধারণ করায়। গীতা বলছেন, 'ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।' শ্রীভগবানই সমস্ত জীবের অন্তরস্থ চৈতন্যসত্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ। কাজেই আমরা স্বরূপত মুক্ত ;. আর আমাদের এই স্বরূপ, আমাদের ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক দিকটি প্রকৃতি দ্বারা চালিত বা বিনষ্ট হতেই পারে না ; কারণ প্রকৃতির অস্তিত্বই নির্ভর করে ব্যক্তির স্বানুভূত চেতনার ওপর। আত্মার চৈতন্যালোক ব্যতীত কিছুই অনুভূত বা জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। আত্মা সাক্ষিরূপে রয়েছেন বলেই প্রকৃতির বস্তুনিচয়ের অস্তিত্ব রয়েছে।

সুতরাং জন্মগত অধিকাররূপেই জীবের মধ্যে এই মুক্ত স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে। নিজের এই মুক্তস্বভাব সম্বন্ধে সচেতন ও তাতে প্রতিষ্ঠিত হলেই প্রকৃতির ওপর আমাদের আধিপত্য আসবে। যে এখন নিজেকে প্রকৃতির ক্রীতদাস বলে মনে করছে, সেই-ই হবে তখন প্রকৃতির অধীশ্বর। ভারতীয় সাংখ্য ও অদ্বৈত-দর্শন মতে এইটাই মায়াপাশ থেকে মুক্ত হবার পথ। আত্মা যে চিরমুক্ত এবং প্রকৃতির পরিবর্তনশীলতার অতীত— এই সত্যোপলব্ধিই বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের উপায়। এই-ই সাংখ্যের 'পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক', এবং যোগের 'দ্রষ্টার স্বরূপজ্ঞান'

ভারতীয় দর্শনের ভক্তিবাদ প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আর একটা পথ দেখিয়েছে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে সে-পথের কথা বলা হয়েছে, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' শ্রীরামানুজাচার্য একে পূর্ণ শরণাগতি বা প্রপত্তি বলেছেন। গীতায় একথাও বলা হয়েছে, 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।' আমার শরণাগত যে হয়, সে মায়াসাগর উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এটি ভক্তিপথ, এ পথে ঈশ্বরের কৃপাসহায়ে বদ্ধ জীব প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

এটা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, সব ভারতীয় মতবাদেই পুরুষকারের স্থান আছে— যদিও তা সীমিত স্বাধীনতা। প্রকৃতির শক্তির কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য জীব আন্তরিক-ভাবে চেষ্টা করতে পারে। যোগবাশিষ্ঠমতে,

আমাদের বদ্ধ করার জন্য প্রাকৃতিক নিয়ম আছে ঠিকই, কিন্তু সে-বন্ধন ছিন্ন ক'রে মুক্তাবস্থা-লাভের শক্তিও আমাদের আছে। যেমন তাসখেলায় হাতের তাস আর একজন ভাগ ক'রে দেয় ঠিকই, কিন্তু সেই তাসগুলি নিয়ে ভালভাবে বা মন্দভাবে খেলার স্বাধীনতা খেলোয়াড়দের থাকে। এই স্বাধীনতাই পুরুষকার। দেখা যায় অসংখ্য সাধু-মহাপুরুষ নিজের চেষ্টাতেই মুক্তাবস্থা লাভ করেছিলেন। তাঁরা হয় জ্ঞানমার্গ অথবা ভক্তিমার্গ অবলম্বনে অন্তঃ ও বহিঃ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য লাভ করেছিলেন। মনে হয় বটে, অদৃষ্ট যেন আমাদের অক্লান্ত চেষ্টা বিফল করতে উঠে পড়ে লেগে আছে। কিন্তু ধর্মাচার্যগণ আমাদের আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন, এতে ভয় পাবার কিছু নেই, পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্টকে খণ্ডন করা যাবেই। শাস্ত্র বলছে, যুগে যুগে অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শী সাধু-সন্তও বলেছেন, আমরা যদি ভগবৎকৃপার ওপর নির্ভর ক'রে নিরন্তর চেষ্টা ক'রে চলি, তাহলে ভগবৎকৃপা ও ভগবানলাভ করতে পারবই।*

* মূল ইংরেজী হতে অনূদিত।

মৃড়ানি স্তোত্রম্

স্বামী হর্ষানন্দ

মৃড়ানি মূর্ধ্না প্রণিপত্য যাচে
ত্বামেবমেকান্তমিয়ন্তমর্থম্।
অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে
সদা-শিবে মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ

হে মৃড়ানি! নতমস্তকে প্রণিপাতপূর্বক তোমার নিকট একান্তে এইমাত্রই প্রার্থনা করি, হে শিবে! তোমার প্রসাদেই যেন তোমারই চরণারবিন্দে আমার অবিরাম স্মৃতি থাকে।

ভগবান সম্বন্ধে মানুষের ধারণা

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

ঈশ্বরের স্বরূপ যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন, তাহা মন-বুদ্ধির অতীত, মনবুদ্ধির পারে না যাইলে তাহা উপলব্ধ হয় না—যুক্তি দিয়া, মন-বুদ্ধি দিয়া তাহা ধারণা করা যায় না। মানুষ কিন্তু যুগে যুগে সে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। একদিকে দার্শনিকগণ যুক্তিসহায়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহিয়াছেন, অপর দিকে মানুষ বিশ্বাসসহায়ে তাঁহাকে ধরিতে চাহিয়াছে।

খুব অল্পসংখ্যক 'নাস্তিক' বাদ দিলে জগতের যাবতীয় মানুষ—শতকরা ৯৯ জন—দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, চরাচর জগৎ—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, জল, স্থল—সকলই ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিশ্বাস বা ধারণার মূলে কতটুকু সত্য আছে তাহা খুব অল্পসংখ্যক বিজ্ঞ ও পণ্ডিত লোকই আলোচনা করেন। ইঁহাদিগকে আমরা দার্শনিক বলি; ধর্মপ্রবর্তকগণের উপলব্ধি-ভিত্তিক এইরূপ দার্শনিক আলোচনা ও তত্ত্বের উপর বিভিন্ন ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দার্শনিকেরাও সকলে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একমত নহেন। যে ষড়্‌দর্শন হিন্দু-ধর্মের ভিত্তি, তাহার মধ্যেও অন্ততঃ একটি দর্শনে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস অসিদ্ধ, কারণ ইহার সমর্থক কোন প্রমাণ নাই (ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ)। আমি দার্শনিক নহি, এ সম্বন্ধে বিচারের শক্তি নাই—কিন্তু আমার বিশ্বাস, দার্শনিকদের মধ্যে ঈশ্বরকে লইয়া যে তর্ক আজ অন্ততঃ দুহাজার বছরেরও বেশী দিন ভারতে প্রচলিত আছে - কোন দিনই ইহার মীমাংসা হইবে না।

কিন্তু দার্শনিকেরা যাহা করিতে অপারগ হইয়াছেন, ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে তাহার উত্তর দেওয়া বর্তমান যুগে কতকটা সম্ভবপর হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই আলোচনা সম্যক বুঝিতে হইলে দশ বিশ হাজার বা তারও বেশী প্রাচীন মনুষ্য-সমাজের সম্বন্ধে উনিশ-বিশ শতকের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে কি জানা গিয়াছে তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রয়োজন। ডারউইন সাহেবের মতানুসারে কীট পতঙ্গ বা পশুজীবনের বিবর্তনের ফলে যেভাবে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা স্বীকার না করিলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দশ-বিশ হাজার বছর আগে মানুষ আকৃতিতে পশু না হইলেও প্রকৃতিতে মানুষের অপেক্ষা পশুরই অধিকতর সগোত্র ছিল। তাহাদের কোন ভাষাজ্ঞান ছিল না, সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে পারিত না, আগুনের ব্যবহার বা কৃষি-কার্য জানিত না—স্বচ্ছন্দজাত ফলমূল এবং বন্যপশু নিহত করিয়া তাহার অসিদ্ধ মাংস খাইয়াই জীবনধারণ করিত, গৃহনির্মাণ করিতে জানিত না, পর্বতের গুহায় বা বৃক্ষতলে বাস করিত, কোন ধাতুর ব্যবহার জানিত না—ইত্যাদি। কিন্তু পশুর সঙ্গে তাহাদের প্রভেদ ছিল—প্রধানতঃ মানসিক বৃত্তির দিক দিয়া—তাহারা পশুর ন্যায় কেবল নিজের দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া পাথর ঘসিয়া তীক্ষ্ণ করিয়া তাহা দ্বারা পশু বধ করিত,

তাহাদের কল্পনাশক্তি ও শিল্পনৈপুণ্য ছিল—তাহার অনুশীলন দ্বারা রঙীন নরম মাটি বা পাথরের সাহায্যে গুহা-গাত্রে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি আঁকিয়াছে, প্রধানত তাহা হইতেই আজ আমরা তাহাদের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিবরণ জানিতে পারিয়াছি। তাহারা যে-সব প্রস্তরের অস্ত্র নির্মাণ করিয়া পশু বধ করিয়া আত্মরক্ষা ও খাদ্যসংগ্রহ করিত, তাহার হাজার হাজার নমুনা পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া গিয়াছে

ক্রমে ক্রমে এইভাবে মস্তিষ্কের অনুশীলনের ফলে তাহাদের মনে যে-সব ধারণা জন্মিল তাহার কিছু বিবরণও আমরা ঐসব চিত্র ও পরবর্তী কালের বিবরণ হইতে জানিতে পারি। তাহারা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিল যে, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিয়া অথবা প্রকৃতির অনুগ্রহের ফলেই তাহারা জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বজ্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টিধারা তাহাদের জীবন দুর্বহ করিয়া তুলিত; আবার বিষম শীতের দেশে সূর্যের উদয়ও পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত অগ্নি-উৎপাদনের কৌশলে তাহারা জীবনধারণ করিত - এই সমুদয়ই তাহাদের মনে বিস্ময় জাগাইত। এ সকলের সাধারণ ব্যাখ্যা তাহাদের জানা ছিল না—সুতরাং তাহাদের ধারণা হইল যে, মানুষের অপেক্ষা বেশী ক্ষমতাশালী কোন অজ্ঞাত শক্তি বা ব্যক্তিই এই সমুদয় ঘটনার সৃষ্টি করে। তাহারা এই শক্তি বা ব্যক্তির নাম দিল দেবতা—এবং তাহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা বা তাহাদের অনুগ্রহলাভের জন্য তাহারা নানা রকমে চেষ্টা করিত। আদিম কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানুষ যে-উপায়ে অন্য মানুষের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহারাও তাহাই করিত। অর্থাৎ এইসব দেবতার অজস্র প্রশংসা এবং তাহাদের বিধানের জন্য তাহারা সর্ববিধ ব্যবস্থা করিত। দেবতার স্তবস্তুতি নানা অত্যুক্তি-পূর্ণ ছিল। কিন্তু সে যুগে টাকাপয়সার প্রচলন না থাকায় মানুষ যাহা পাইয়া নিজে খুশী হইত—সেই আহার্যদ্রব্যই দেবতাকে নিবেদন করিত। কিন্তু এইসকল দ্রব্য দেবতার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া যায় কিরূপে? কোন নির্দিষ্ট জায়গায় ভোজ্য দ্রব্য রাখিলে পরদিনও তাহা যদি অবিকৃত অবস্থায় থাকে তবে দেবতা যে তাহা পাইলেন তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হয়। সুতরাং অগ্নিদেবের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নাই। কোন দেবতাকে খুশী করিতে হইলে আগুন জ্বালাইয়া তাহাতে মানুষের প্রিয় খাদ্য—গম, তণ্ডুল, ঘৃত, দুগ্ধ, ফল, মূল প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার স্তব করা হইত। ঝড়-বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র; সুতরাং বেশী ঝড়বৃষ্টি হইলে অথবা বৃষ্টির অভাব হইলে ইন্দ্র দেবতাকে নানা স্তবস্তুতি করিয়া ভোজ্য দ্রব্য আগুনে নিবেদন করা হইত। ইহারই নাম যজ্ঞ। এইরূপে সূর্য প্রভৃতি অন্যান্য অনেক দেবতার যজ্ঞ করা হইত এবং যখন যাঁহার নামে যজ্ঞ করা হইত তখন তিনিই যে অন্য সকল দেবতার অপেক্ষা বড়, ইহাই স্পষ্ট ভাষায় বলা হইত। ভারতে হিন্দুরা বিভিন্ন দেবতার স্তবস্তুতি করিতেন, তাহার কতকগুলির সংকলনই ঋগ্বেদ নামে পরিচিত।

এইরূপে পৃথিবীর নানা দেশে কত যে দেবদেবীর উদ্ভব হইল তাহার বর্ণনা করা এই প্রবন্ধে অসম্ভব—এ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আছে অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন। কিন্তু কেবল যে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই এইসব দেবতার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা নহে। ইহার

পশ্চাতে উচ্চতর চিন্তাশক্তিরও প্রভাব আছে। যেমন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের দৈহিক মিলনের ফলেই যে নূতন মানুষের সৃষ্টি হয়—এই অতি প্রত্যক্ষ সত্য এবং মনুষ্যের অস্তিত্বের জন্য তাহার গুরুতর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার ফলেই পুরুষ ও স্ত্রীলোকের দৈহিক বৈশিষ্ট্য-চিহ্নই পৃথিবীর সর্বত্র শ্রেষ্ঠ দেবদেবীরূপে কল্পিত হইয়াছে। ভূ-জননী (Mother-Goddess) জগতের সর্বত্র পূজিত হইত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অসংখ্য নগ্ননারীচিত্র—এই দেবীরই প্রতীক। প্রায় পঁচিশ হাজার বৎসর পূর্বে নির্মিত একটি নারীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, ইহা 'Venus of Lepsuges' নামে পরিচিত। পরবর্তী কালে বিভিন্ন প্রাচীন জাতির মধ্যে—এই দেবীমূর্তি 'Neutinugga, Ishtar, Hathor, Isis অথবা Hera' নামে সুপরিচিত। মানুষসৃষ্টির মূলাধাররূপে আদিম মানুষ এই নারীমূর্তিকে শ্রেষ্ঠ দেবীর অর্থাৎ আদ্যাশক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। পশ্চিম এশিয়ায় ও পূর্ব ইউরোপের প্রাচীন বহু জাতির মধ্যে এই দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। ভারতে সিন্ধুদেশে মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পায় এইরূপ দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু দৈহিক মিলনের ঊর্ধ্বে নরনারীর হৃদয়ের প্রেমও আদিম মানুষের কল্পনায় দেবদেবীর আসনভুক্ত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে ভারতের ঋগ্বেদ সংহিতায় কল্পিত ঊষা নামে দেবী ইহার প্রতীক। প্রতিদিন প্রভাতে পূর্ব গগনে সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে যে রক্তিম রাগের অপূর্ব শোভা দেখা যায়, তাহা অপূর্ব সুন্দরী মনোমোহিনী যুবতী রমণী ঊষা-দেবীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রেমিক সূর্যদেব প্রত্যহই তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হন—কিন্তু সূর্য নিকটে আসিলেই ঊষার অন্তর্ধান হয় —সন্ধ্যাকালে সূর্য অস্ত গেলে আবার এই দেবীর আবির্ভাব হয়। মানুষের জগতের ন্যায় এই প্রেমিক দেবদেবীযুগলও আকাশে আদিম কাল হইতে একে অন্যের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্তও সে-মিলন সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু সূর্যদেব ও ঊষাদেবী ভারতের প্রাচীনতম দেবদেবীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। এইরূপে বহির্জগতের পরিবেশ ও অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণায় মানুষ অসংখ্য দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছে। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার যে-সমুদয় প্রাচীন সভ্য জাতির ইতিহাস জানা গিয়াছে, তাহাদের সকলেরই দেবদেবীর ধারণা এইরূপে প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ প্রাকৃতিক দৃশ্য, (সূর্য, চন্দ্র, ঊষা, আকাশ, নদী, সমুদ্র) ও প্রাকৃতিক শক্তি (ঝড় বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে—তাহাদের মনের অভ্যন্তর হইতে দার্শনিক চিন্তার ফলে এইসব দেবতার সৃষ্টি হয় নাই। অতি প্রাচীন সুমের দেশের লোকে বিশ্বাস করিত যে, আকাশ-দেবতা 'অনু', প্রচণ্ড ঝড়ের প্রতীক-দেবতা 'এনলিল' (বজ্রনাদ তাঁহার কণ্ঠস্বর, বিদ্যুৎ তাঁহার শাণিত অস্ত্র) ও ভূ-জননী 'নিন্-তু' (যাহা হইতে নূতন মানুষের অফুরন্ত সৃজন চলিতেছে)—এই তিনজন দেবদেবী স্বর্গে একত্র হইয়া মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করেন—এবং তাঁহাদের খাদ্য পানীয় ও বাসস্থান যোগাইবার প্রয়োজনই মনুষ্য-সৃষ্টির একমাত্র কারণ। পরবর্তী কালে ঋগ্বেদ সংহিতায়ও যে এইরূপ ধারণা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে এবং মানুষ নিজের অভাব মিটাইবার জন্যই দেবতাদের খাদ্য পানীয় দান করিত, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রাচীন মিশরেও এইরূপ সূর্য, আকাশ, বায়ু প্রভৃতি দেবদেবী-রূপে কল্পিত হইয়াছে। হিটাইট জাতির

মধ্যে ঝড়ের দেবতা ছিলেন সর্বপ্রধান এবং তাঁহার স্ত্রী অরিণা ছিলেন সূর্যদেবী। তাঁহাদের পুত্র জাতীয় দেবতার প্রতীকও ছিলেন ঝড়। প্রতি নগরীতেই পৃথক পৃথক ঝড়ের দেবতা ছিলেন—এই সকলের মিলিত রূপই জাতীয় ঝড়ের দেবতা, স্বর্গ-মর্ত্যের সৃষ্টি-কর্তা। ঋগ্বেদেও পর্জন্য নামে এক বিদ্যুৎ ও বৃষ্টির দেবতার নাম এবং স্তবস্তুতি আছে। বর্তমান হিন্দুরা এ দেবতাকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে—কিন্তু ইউরোপের উত্তর-পূর্ব কোণে লিথ্‌য়ানিয়া নামে একটি ক্ষুদ্র দেশের লোক ২।৩ শত বৎসর পূর্বেও অনাবৃষ্টি হইলে এই পর্জন্য (পর্কন্য) দেবের নিকট যে প্রার্থনা করিত তাহা ঋগ্বেদ সংহিতার স্তুতির অনুরূপ। এই সমুদয় বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনার পরে মানুষ কল্পনা করিয়াছে যে, ইঁহারা সকলেই এক ভগবানের বিভিন্ন রূপ সুমের, মিশর প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন নগরীর পৃথক পৃথক দেবদেবী ছিলেন। কিন্তু যখন ইহার কোন একটি জাতি বা নগরীর উপর অপর জাতি ও নগরী আধিপত্য স্থাপন করিত, তখন পরাধীন জাতি ও নগরীর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দেবদবীও উক্ত অধিপতির দেবদেবীর আনুগত্য স্বীকার করিতেন। এইরূপে বহু দেবদেবীর স্থানে এক ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইল। মিশরে সূর্যদেব প্রথমে অনেক দেবের মধ্যে একজন মাত্র ছিলেন, কিন্তু পরে খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্দশ শত বৎসরে ইখনাটন (Ikhnaton) নামে সম্রাটের আদেশে সূর্যদেব কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা নহেন, একমাত্র দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপেই সম্ভবতঃ অন্য স্থানেও একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভগবানের ধারণা সৃষ্ট হইয়াছে। কারণ প্রায় একই সময়ে রচিত ঋগ্বেদেও বলা হইয়াছে যে, যদিও অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা হয় তথাপি তাঁহারা সকলেই বিভিন্ন নামে পরিচিত হইলেও একই ভগবানের বিভিন্ন রূপ মাত্র। কিন্তু এই ধারণা তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই—কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ ঋগ্বেদের সহস্রাধিক সূক্তের বা স্তবের মধ্যে মাত্র তিন-চারিটি সূক্তে এক-ভগবানের উল্লেখ আছে—অন্য সবগুলিই বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যেই রচিত।

ভগবান মানুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন—অনেক দার্শনিক পণ্ডিত একথা, এমন কি ভগবানের অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করিয়াছেন—ইহা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু মানুষ যে নিজের ধারণানুযায়ী ভগবানকে বিভিন্ন রূপে গড়িয়াছে (স্বরূপতঃ তিনি যাহাই হউন), ইতিহাস তাহার স্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছে। কিরূপে মানুষের মনে এই উপলব্ধি হইল তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি।

স্বামী অখণ্ডানন্দ-স্মৃতিসঞ্চয়

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

১৮ই মে, ১৯৩৫। বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিন—সন্ধ্যা ৬টার ট্রেনে একজন সাধুর সঙ্গে ভক্ত তাহার মহাতীর্থে আসিয়া উপস্থিত। আগামী কাল বার্ষিক মহোৎসব।

সমাগত ভক্তেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'বাবা,[1] কেমন আছেন?' বাবা খালি গায়ে হল্-এ চেয়ারে বসিয়া বলিতেছেন, "খুব আনন্দে আছি—এইখান থেকে ওপর সব বেশ ভাল—নীচেতেই যত গোল। কেউ কেটে বাদ দিতে পারত চেঁচে ছুলে—তা বেশ হ'ত, হাঃ হাঃ।" বৃদ্ধ শিশু নিজের রসিকতায় নিজেই বিভোর, ভক্তের মনে হইল: 'অখণ্ডানন্দ' নাম সার্থক।

একটি ছোকরা ভক্ত আসিয়াছে কলিকাতা হইতে। সে বোধ হয় নিজের মনের অবস্থা জানাইয়া চিঠি লিখিয়াছিল। প্রণাম করিয়া উঠিতেই তাহাকে বাবা বলিতেছেন, "আমি কি ক'রব? যা দেবার দিয়েছি একবারেই। এবার তোমার কাজ। শান্তি পাই না—অশান্তি, সংসার ভাল লাগে না—কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে সংসারেই থাকতে বলেছে? বন আছে, জঙ্গল আছে, এত আশ্রম রয়েছে—চলে যাও না। সাধুসঙ্গ চাই, কাজ চাই, তবে শান্তি পাবে, কাজ কর প্রাণভরে। কাল তো ঠাকুরের উৎসব—কাজ কর দেখি, কাজ ক'রে ক্লান্ত হয়ে যাও, এলে যাও, দেখি কেমন না শান্তি পাও—আনন্দ পাও। আজ থেকেই লেগে যাও—দেখ, কি কাজ করতে হবে—জিগ্যেস ক'রে নাও।"

আগামীকাল দুপুরে মহোৎসবের অঙ্গরূপে একটি সভা হইবে, তাহার জন্য একটি ভাষণ বাবা লিখাইতেছেন।[2] সন্ধ্যায় বিনোদ-কুটিরের রকে ক্যাম্প-খাটে শুইয়া বাবা বলিতেছেন, একজন সাধু তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে বাবা উঠিয়া বসিয়া বলিতে লাগিলেন কাছে উপবিষ্ট ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া—"এখানে আসা ঠাকুরের নির্দেশে। ১৮৯৭ সালে দুর্ভিক্ষ। কলকাতা থেকে চন্দননগর আসি। সেখান থেকে নবদ্বীপ আসার ইচ্ছা হয়। তারপর গঙ্গাতীর ধরে ভ্রমণের ইচ্ছা—এইরূপে বেলডাঙ্গা আসি, সেখানে গঙ্গার ধারে দেখি একটি মুসলমানের মেয়ে কাঁদছে—কলসী ভেঙে গেছে। কাছে যা সামান্য পয়সা ছিল, তার থেকেই কলসী কিনে দিই ও কিছু চিঁড়ে। তারপরই আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো দুর্ভিক্ষপীড়িত জন দশবারো—বললে, 'বাবা, খেতে দাও'। সেই থেকে 'বাবা'। বাকী যা অল্প পয়সা ছিল, তাই দিয়ে চিঁড়ে কিনে তাদের দিয়ে আমি এগিয়ে চললাম। সন্ধ্যায় ভাবতা স্টেশনের কাছেই রাত কাটালাম। সকালে উত্তর দিকে যাবার ইচ্ছে—কিন্তু মহুলায় অন্নপূর্ণাপূজার নিমন্ত্রণ। তারপর ঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁর কাজে—এখানেই আটকে গেলাম।

---

১ সাধু-ভক্তগণ স্বামী অখণ্ডানন্দকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেন।

২ 'সেবাব্রত' নাম দিয়া পুস্তিকা পরে ছাপানো হয়।

"দুর্ভিক্ষের দেশে ঠাকুর মা-অন্নপূর্ণা, তাইতো ওদের পেটভরে খাওয়াবার আয়োজন, মন্দির হওয়া—ইচ্ছা ছিল না। তাঁরই ইচ্ছায় হ'ল শেষ পর্যন্ত, ঠাকুরের তিথিপূজার দিন—শত চেষ্টাতেও সব কাজ শেষ হ'ল না। অন্নপূর্ণা-পূজার দিন মন্দিরপ্রতিষ্ঠা হ'ল, ঠাকুর এসে বসলেন। তাইতো ঐদিন দীয়তাং ভুজ্যতাং। খালি পেটে ধর্ম হয় না, দুর্ভিক্ষের দেশে আসল ধর্ম খাওয়ানো পরানো—তারপর লেখাপড়া শেখানো, অসুখ-বিসুখে সেবা করা। তাই এদের চাষবাসের একটু আধুনিক নিয়ম আর স্বাস্থ্যরক্ষার দুচারটে কথা শেখাই।"

১৯শে সকালে বাবা বলিতেছেন, "গুরু-বাক্য বেদান্তবাক্য—সবাই মুখে বলে, কেউ কিছু শোনে না, একটা কথা রাখে না। ঠাকুর আমাদের বেশী কিছু ব'লে যাননি—দুটি কথা: প্রথম—'গালে হাত দিয়ে ভাববি না', আর দ্বিতীয়—'দাঁড়িয়ে জল খাবি না'। দুটিই অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা করেছি। আজকালকার ছেলেরা? যেটি বলবে, ঠিক উলটোটি করবে। তাইতো কিছু বলি না। আমরা তো আমাদের পালা শেষ ক'রে যাই। কখনও গালে হাত দিয়ে ভাবিনি। কেন ভাবব? তাঁর ভালবাসা—তাঁর আশ্রয় পেয়েছি, আনন্দে ভরে আছি।"

সেই ছোকরা ভক্তটিকে একবার দেখিতে পাইয়া বলিতেছেন, "কাজ কর। কাজ কর—বসে থাকা দুচক্ষে দেখতে পারি না। যাহোক একটা কিছু কর। কুটনোও তো কুটতে পারো—তা না পারো, ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দাও—দেখ না কোথায় ময়লা। আশ্রমটি পরিষ্কার কর।"

২১শে মে। বিদায়কালে কেহ কেহ বাবাকে বলিতেছেন, 'আপনি এখানে থাকলে হবে না—মঠে চলুন।'

"বাপ্‌রে! মেরে ফেলতে চাও? এখানে এখন ঠাকুরের বারো মাসের ফুলের বাগান হবে, ফলের বাগান্ হবে—কত কাজ এখানে। তোমরা বরং সব এখানে এসে থাকো" বলিয়া বালকের মতো হাসিতে লাগিলেন। ট্রেনের সময় বলিয়া সকলে একে একে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

* * *

১১ই অক্টোবর। কোজাগরী পূর্ণিমার ভোরে—প্রায় সাড়ে চারটার সময় সামান্য কিছু ফল-মিষ্টি লইয়া ভক্ত বাবাকে বিজয়ার প্রণাম করিতে আসিয়াছে।

ভোরের বেলা চাঁদের আলোয় আশ্রমটির যে কি অপূর্ব শান্ত সৌন্দর্য হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না! বড় রাস্তা ধরিয়া আসিয়া ডিস্পেনসারির দিক দিয়া ঢুকিয়া ভক্ত আশ্রমে পদার্পণ করিয়া নির্জন নীরবতাটুকু খানিকক্ষণ উপভোগ করিতে লাগিল। এখনও হয়তো কেহ উঠে নাই; ইউক্যালিপটাস গাছগুলি প্রহরীর মতো দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের উগ্রমধুর গন্ধ বাতাসকে আরো প্রাণপ্রদ করিতেছে।

বেশীক্ষণ কাটে নাই, এমন সময় বিনোদ-কুটিরে খুট্ করিয়া শব্দ হইল, বাবা উঠিয়াছেন।

মুখ হাত পা ধুইয়া আসিতেই সেই আধ আলো আধ-অন্ধকারে ব্রাহ্মমুহূর্তে ভক্ত বাবাকে প্রণাম করিল। বাবাও অর্ধবিজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার জন্য কি কি এনেছ? দাও—সেগুলি এ-বাড়িতে রাখো। আর ঠাকুরের জন্যে? সে-সব ঠাকুর-ভাণ্ডারে নিয়ে যাও।"

সকাল বেলা। হল্‌-এ চেয়ারে বাবা বসিয়া আছেন—জপভাব, শরীর খারাপ, ভক্ত চেয়ারের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাবা হাতজোড় করিয়া শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণের রীতি অনুসারে দেবীসূক্ত আবৃত্তি করিতেছেন :

"ওঁ অহং রুদ্রেভি র্বসুভি শ্চরাম্য-
হমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
… … …
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিনা সম্বভূব॥"

সন্ধ্যাবেলা বাবা বলিতেছেন :

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
… … …
ন প্রবচনেন ন চেজ্যয়া
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ॥

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—বুঝলে? আগে শরীর শক্ত করতে হবে। Healthy strong body (সুস্থ সবল শরীর) হলে তবে healthy thoughts (সুস্থ চিন্তারাশি) আসবে। তা নইলে শুধু মনের যা তা চিন্তা। দুধ ছানা মাছ মাংস দই ঘোল—সব খাবে। Fruits are gold in morn (সকালে ফল খুব ভাল), মোজাম্বি লেবু খাবে। লিভার ভাল থাকবে। এই তোমার ব্যবস্থা।

ঠাকুর সমষ্টিরূপে 'ঠাকুর'—ব্যষ্টিরূপে এখানে 'অন্নপূর্ণা'। কেউ না খেলে ভাল লাগে না।"

বিজয়ার চিঠি লেখা হইতেছে, বলিলেন, "নিজে লেখ চিঠিখানা পড়ে—যা যা লেখবার। ইংরেজের ইংরিজি লিখবে, ভয়ে ভয়ে নয়। আমি দেখতে চাই তুমি কেমন ভাব বুঝে লিখতে পারো। Full freedom (পূর্ণ স্বাধীনতা) দিচ্ছি। ভুল হোক, উল্‌টো হোক—তুমি লেখ, আমি দেখব।"

…কাহারও আচরণে দুঃখিত বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন; "সব ব্যাটা স্বার্থপর, নিজেদের হলেই হ'ল। আমার কষ্টটা কেউ বোঝে না।"

সন্ধ্যাবেলা ছোট ছেলেদের সঙ্গে বাবা 'Son of Kong' এবং 'কারাকোরাম পর্বতে' গল্প শুনিয়া খুব আনন্দিত। বলিতেছেন, "ভারি আনন্দ হ'ল। আবার শুনব। ওই কারা-কোরাম পার হয়ে Central Asia (মধ্য এশিয়া) চলে যাব ঠিক করেছিলাম।"

"…এবার যখন আসবে বেশী দিনের টিকিট কেটে আসবে—ছ-দিনের রিটার্ন টিকিট আছে একটা। আমার কাজ শেষ না ক'রে যেতে পারবে না।" ৫টায় গাড়ি, বিদায় লইতে আসিয়া ভক্তেরা বলিল, 'আর সময় নেই, ৪॥টা বেজে গেছে।' বাবা বলিলেন, "ঢের সময় আছে—বসো সব আমার কাছে।" বলিয়া বাবা চিঠি লিখিতে বসিলেন। ভক্তেরা উসখুস করিতেছে, বাবা হাসিতেছেন, শেষে বলিলেন, "যাবেই যখন, প্রণাম কর সব, আবার আসবে শীগ্রি।"

* * *

১৫ই জানুআরি, ১৯৩৬—স্বামীজীর তিথি-পূজা। ভোররাত্রি, শীতে কন্‌কন্ করিতে করিতে ভক্ত তাহার বাঞ্ছিতধাম সারগাছি আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিল।

এবারও পূর্বের মতো সেই ভোরের আলো-আঁধারে বাবাকে দর্শন। এবারও প্রথম প্রশ্ন : কি কি এনেছ আমার জন্য, দাও। ঠাকুরের জন্য কি কি? ও বাড়িতে নিয়ে যাও। মুখ হাত পা ধুয়ে যাও।

সকালে কাছে গিয়া বসিতেই বলিতেছেন,

"এখন এখানে নয়—যাও, কাজ করগে ঠাকুর-ঘরে। ফল কাটতে জান তো?"

দুপুরে উৎসবাদি। সন্ধ্যায় একজন পূর্ব-বঙ্গীয় দীক্ষার্থী জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'আপনার ঠাকুরকে বেশ মনে পড়ে?' বাবা বলিলেন, "পড়ে বইকি, বেশ পড়ে। তাঁকে মনে পড়বে না তো কাকে মনে পড়বে?"

দীক্ষার্থী - 'কথামৃতে' তো আপনার কথা নাই, দু-এক জায়গায় নাম আছে শুধু।

বাবা অতএব আমি তাঁর কাছে যাই নাই!

সরল দীক্ষার্থীটি চুপ।

বাবা—আসল ব্যাপারটা কি জানো? মাষ্টার মশাই যেতেন ছুটির দিন, সেদিন গৃহস্থ ভক্তদের ভিড় হ'ত বেশী, আর আমরা যেতুম অন্য অন্য দিন বেশী। রাত্রে থাকতুম, দিনের বেলাও ঠাকুরের ঘরে লোকজন বেশী হ'লে পালাতুম শিবমন্দিরে, কি পঞ্চবটীতে।

পরদিন সন্ধ্যায় ভক্তটি বলিতেছে, 'ঠাকুরের কথা কিছু বলুন।' (ভক্তটির ঐদিনই সকালে দীক্ষা হইয়াছে।)

বাবা—কি ব'লব? বই-এ তো সব আছে, আর সারাদিন বকে বকে পারিও না। কি বলতে হবে বলো।

ভক্তটি - আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই তাঁর কথা। কবে দেখেছেন ও কেমন? এই একদিন বই তো নয়। আবার কবে আসা হবে কিনা।

বাবা যখন প্রথম গেছি—খুব ছেলেমানুষ তখন। কোমরে কাপড় তুলে ঝাউতলায় যাই, তারপর গঙ্গার শৌচে যাচ্ছি - তিনি ছিলেন ঘরে ভক্তবেষ্টিত হয়ে, দেখতে পেয়েছেন। তখন ভাঁটা—অনেকটা নেবে গেছি। তিনি ডাকছেন—'ওরে, ওখানে যাসনি, ওখানে যাসনি, হাঁসপুকুরে যা। গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি—ওতে কি ছোঁচাতে আছে?' আমিও ছাড়বার ছেলে নই, বললাম, 'যেখানে গঙ্গা ছাড়া জল নেই?' ঠাকুর বললেন, 'সেখানকার কথা আলাদা।'

"দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরটি সব সময় ভগবদ্ভাবে ভরে থাকত! সবাই অল্পবিস্তর অনুভব ক'রত. সহজেই ধর্মভাবের উদ্দীপন হ'ত শত শত জন্মের সাধনার ফল সেখানে বসে বসেই লাভ হ'ত। মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধি —এই ভাঙে তো এই হয়। সে-সব কি ভোলবার? তাঁর এক-একটি কথায় বেদবেদান্ত বোঝা কত সহজ হয়ে যেত!

"ঠাকুর বলেছিলেন, 'নরেনকে জানিস? কলকাতার ছেলে, সুমুখ দিকে চোখ ঠেলা—অন্তর্মুখী। ওর সঙ্গে খুব মিশবি।' তার পরদিনই তাঁর কাছে যাই। তিনিও কাছে টেনে নিলেন। পরে ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে ঘুরেছি।

"তখন ছিলাম খুব আচারী, নিরামিষ খেতাম। স্বামীজী বকতেন, বলতেন, 'ও-সব ছাড়ো, মাছ-মাংস খাও। এর সঙ্গে ধর্মের কিছু নেই।' আমিও ছিলুম তেমনি—তিনি পেরে উঠতেন না। তাই তো তাঁর উৎসবে মাছ টাছ না হলে মনে কষ্ট হয়। কিন্তু কি মজা দেখ—কাল কত মাছ জুটে গেল। সবাই খেলে—ভক্তেরা—তাঁর দরিদ্রনারায়ণরা।

"ঠাকুরও বলতেন, 'আচারী হবি কেন?' যা কালীঘরে প্রসাদ খেয়ে আয়।' ইচ্ছে হ'ত না, তাই ঠাকুর আবার দেখতেন—কোন্ ঘরে যাচ্ছি, কালীঘরে না বিষ্ণুঘরে। কালী-ঘরেই যেতাম, প্রসাদ খেতাম আর ভাবতাম —মা, তোমার কি এ-সব না খেলে চলে না? এইরকম কত সব কথা, বলতে গেলে ফুরোয়

না। কতটুকু আর প্রকাশিত হয়েছে—one fourth, কি সিকির সিকি!

স্বামীজীর কথাই বা কত মনে পড়ছে। স্বামীজী যখন যেভাবের ওপর জোর দিতেন, তখনকার মতো সেখানে উপস্থিত সকলের মনে হ'ত—সেইটিই সত্য, আর সব যেন কিছু নয়। বেলুড়ে গঙ্গার ধারে কতদিন কত-ভাবের কথা, যেদিন যেভাবের কথা হ'ত, সে-দিন যেন সারা মঠটি সেইভাবেই ভরে থাকত। যেদিন শিবের কথা, সেদিন মনে হ'ত—স্বামীজীই সাক্ষাৎ শিব, শঙ্কর, সারা মঠে সেই ভাব। আর যেদিন বুদ্ধের কথা, সেদিন মনে হ'ত—এটি বুঝি একটি বৌদ্ধ মঠ, সব শান্ত স্থির। আবার যেদিন তিনি রাধারাণীর কথা পাড়লেন, সেদিন যেন সব বাঁধ ভেঙে যেত—মনে হ'ত তিনি বুঝি সেই ব্রজগোপী সারা মঠ সুমধুর গোপীভাবে ভরপুর। স্বামীজী বলতেন কতদিন—

> Radha was not of flesh and blood,
> Radha was a froth in the ocean
> of love.

—(রাধা রক্ত-মাংসের ছিলেন না, রাধা ছিলেন প্রেম-সমুদ্রের একটি বুদ্বুদ।)

"মৈত্রঃ করুণঃ এব চ"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

চূর্ণ করো অহং-এর এ দুর্গ-প্রাকার!
চূর্ণ করো বাসনার মৃগ-তৃষ্ণিকার
এ পশ্চাৎ-ধাবনের উন্মত্ত মূঢ়তা!
মর্মে কে হেনেছে বজ্র ভুলিও সে কথা।
অন্যেরে দিয়েছ দুঃখ? হায়, সে কাহিনী
ভুলে যেও। চেতনারে রেখো না বন্দিনী
যে-অতীত মৃত তার ভুলভ্রান্তি-জালে!
'আমি'র দুর্ভেদ্য বেড়া দিক্‌চক্রবালে
অবলুপ্ত হ'য়ে যাক! সমস্ত সত্তার
সর্বত্র আনন্দঘন নিঃসীম বিস্তার!
এই ব্রহ্ম-বিহারের মাধুর্যের স্রোতে
বহিয়া যাইতে দাও! অরণ্যে পর্বতে
লোকালয়ে যেথা থাকি, মৈত্রী-করুণায়
পরিপূর্ণ রাখো চিত্ত কানায় কানায়!

বর্ষা—কালী

বনফুল

সূর্য্যের আলো নেই
চারিদিক থমথম
উৎসব চলছেই
নেই তবু কিছু কম
অপূর্ব অনুপম
নাচছে কে ঝমঝম
কার নাচ দোলা দেয়
সারা বুকে হরদম।
ঘুচে যায় সব ভেদ
স্বর্গ ও মর্ত্ত্যর,
আকাশের চত্বর
উন্মাদ সে নাচনে
কাঁপছে যে থরথর।

মা-কালী নাচছে বুঝি
ওড়ে তার এলো কেশ
দুরন্ত ঝটিকায়
উড়ে গেছে বাস বেশ
অদ্ভুত-ভঙ্গিনা
নাচছে উলঙ্গিনী,
কলকল নদীজল
হাসি তার খলখল,
উজ্জ্বল বিদ্যুতে
খড়্গের ঝলমল,
অট্ট বজ্রহাসে
দিগন্ত টলমল।
নাচছে দিগম্বরী
মহা-অম্বর ভরি'
সে নাচে আভাস পাই
জীবনের মরণের ;
আকুলতা মরমের
রক্তজবায় খোঁজে
রক্তিমা চরণের
সেই চির-শরণের
সেই মহা-পরমের।

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীদুর্গাসহায়

৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট

১৬।১০।১৮

প্রিয় বসি (বশীশ্বর সেন),

আমার বিজয়ার আশীর্বাদ, কোলাকুলি, ভালবাসা প্রভৃতি জানিবে। তোমার অসুখ হইয়াছিল জানিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলাম, আশা করি এখন বেশ সারিয়াছ ও স্বচ্ছন্দে আছ। Dr. Bose-এর অসুখ হইয়াছে শুনিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলাম। প্রভুর কৃপায় তিনি নিরাময় হইয়া পূর্ব স্বাস্থ্য লাভ করুন, এই তাঁহার নিকট আন্তরিক প্রার্থনা। পূজার সময় এখানে আসিতে পার নাই তাহার জন্য অবশ্য তোমার দুঃখ হইয়া থাকিবে। কিন্তু Dr. Bose-এর শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলে জানিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। তোমার ভাবনা কি? খেয়ে দেয়ে আনন্দ করে বেড়াও, মা আছেন আর সমস্ত ভার তাঁর। Prof Gades মহাশয় লোক; তিনি Swamiji-র পুস্তক পড়িয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতীব সমীচীন। তিনি স্বয়ং যদি তাঁহার সময়াভাবের মধ্য হইতে উহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন তাহা হইলে যে একটা বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু তাহা কি হইবে? আমি তোমার পুস্তকসকল পড়িয়া প্রায় শেষ করিয়াছি। শরীর আমার অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। এবার ৺কাশীতে অদ্বৈতাশ্রমে খুব ধুমধামের সহিত মার পূজা হইয়া গিয়াছে, মহারাজ যাইতে পারিলে আনন্দের মাত্রা অবশ্যই অনেক অধিক হইত, কিন্তু দৈবাৎ তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় তাহা হইল না, এখন তিনি ভাল আছেন এবং বোধ হয় শ্যামাপূজায় কাশী যাইতে পারেন। এখনও মহারাজ দুর্বল আছেন এবং তাঁহার আহারের নিয়মও খুব চলিতেছে। যুদ্ধ শেষ হইলেই মঙ্গল, কিন্তু তাহা ঘটিবে কি? লক্ষণ দেখিয়া তাহার সম্পূর্ণ আশা সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হয়। মার ইচ্ছা যেমন আছে হইবে। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত গাছের পাতাও নড়ে না। ইহা সত্য কথা। মহাপুরুষদিগের অনুভূতি আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি—সত্যের অপলাপ হইবে না। মা যেমন করিবেন তাহাই মঙ্গল। শ্রীশ্রীমা, শরৎ মঃ প্রভৃতি ও বাড়ির সকলে ভাল আছেন, কেবল যোগীনমার পৃষ্ঠে একটি ফোঁড়া হওয়ায় তাহা অস্ত্র করিতে হইয়াছে এবং খুদুমণি কানের অসুখে একটু কষ্ট ভোগ করিতেছে। মঠে বেশ পূজা হইয়া গিয়াছে। মহারাজের অসুখের জন্য প্রতিমা আনা হয় নাই। কিন্তু ঘটে পূজা হওয়ায় আনন্দের কিছু কসুর ছিল না। এ বাড়ির রামবাবু প্রভৃতি সকলেই ভাল আছেন। সনৎ, প্রিয়নাথ এবং আর আর সকলে তোমাকে বিজয়ার প্রণাম ভালবাসা কোলাকুলি জানাইতেছে। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীতুরীয়ানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবিষ্যৎ ভারত*

শ্রীঅরবিন্দ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি ও তাঁহার সম্বন্ধে যে পুস্তক রচিত হইয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে (তিনি) দেশে যে নূতন ভাব গঠিত হইয়াছে, যে ভাবরাশি সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে, যে ভাবতরঙ্গে মত্ত হইয়া কত যুবক সমস্ত তুচ্ছ করিয়া আত্মাহুতি প্রদান করিতেছে, সে ভাবের কথা তিনি কিছুই বলেন নাই, সর্বভূতান্তর্যামী ভগবান্ তাহা দেখেন নাই, এ কথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? যাঁহার পাদস্পর্শ পৃথিবীতে সত্যযুগ আনয়ন করিয়াছে, যাঁহার স্পর্শে ধরণী সুখমগ্না, যাঁহার আবির্ভাবে বহুযুগসঞ্চিত তমোভাব বিদূরিত, যে শক্তির সামান্যমাত্র উন্মেষে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম-প্রবর্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টিস্বরূপ, তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস যাহা তিনি মুখে বলেন নাই তাহা তিনি কার্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন, এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার নিজের দান, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার পরম পূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান। তিনিও নিজের বলিয়া কিছু দাবী করেন নাই। লোকগুরু তাঁহাকে যে ভাবে গঠিত করিয়াছিলেন তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতকে গঠিত করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা। তাঁহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম বিচার ছিল না,—তাঁহাকে তিনি সম্পূর্ণ বীরসাধকভাবে গঠন করিয়াছিলেন। তিনি জন্ম হইতেই বীর, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিতেন, তুই যে বীর রে।' তিনি জানিতেন যে তাঁহার ভিতর যে শক্তি সঞ্চার করিয়া যাইতেছেন, কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্যকরজালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীর ভাবে সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকে বেপরওয়া হইয়া দেশের কার্য করিতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবদ্‌বাণী স্মরণপথে রাখিতে হইবে, 'তুই যে বীর রে।'

---

*

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

'ধর্ম' ১৯শ সংখ্যা

২৩ শে পৌষ; ১৩১৬

'তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ'

ডক্টর রমা চৌধুরী

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

"অজ্ঞানতিমিরান্ধের যিনি
চক্ষু করেন উন্মীলিত,
জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা,
সেই গুরুকে প্রণাম শত॥"

এটি একটি অতি পরিচিত ও সমাদৃত শ্লোক, যা আমরা গুরুবন্দনামুখে প্রায়ই আবৃত্তি ও অনুধাবন করি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে। কারণ আমাদের ভারতীয় সমাজে গুরু একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন আদ্যন্তকাল, যা জগতের অন্যান্য দেশে সেই-ভাবে একেবারেই নেই। বর্তমান অতি শোচনীয় শিক্ষা-পরিস্থিতিতে যখন গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ বিষয়ে আমাদের নূতন করে চিন্তা করতে হচ্ছে, তখন আমরা এই সম্বন্ধে ভারতীয় মতবাদকেও পুনরায় পরীক্ষা করে দেখতে পারি, তা' থেকে কোনো অভিনব অনুপ্রেরণা-লাভের আশায়। কিন্তু আমাদের নিজেদের সুপ্রাচীন দর্শন-ধর্ম-নীতি-গ্রন্থাদি থেকে এই তত্ত্ব আহরণ না করে, আসুন, আজ আমরা সামান্য চিন্তা করে দেখি একজন প্রখরপ্রজ্ঞা-ধন্যা, পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্তা, স্বাধীনচিন্তাকুশলা, আজন্মশিক্ষাব্রতিনী মহীয়সী মহিলা, ভগিনী নিবেদিতা কিরূপে এই মূলীভূত মহাতত্ত্বটিকে ভারতীয় পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করে-ছিলেন; এবং স্বয়ং কার্যে পরিণত করতে সর্বদাই সচেষ্টা ছিলেন।

আমরা সকলেই জানি যে, জগতের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর একটি মাত্র অভিনব-অপরূপ-অত্যাশ্চর্য শিক্ষা-সংজ্ঞা দ্বারা শিক্ষাজগতে এনে দিয়েছিলেন এক মহাবিপ্লব ও যুগান্তর। যথা—

"Education is the manifestation of the perfection already in man."

"শিক্ষা হল মানবের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ।"

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের জীবনশতদল বহু নূতন রং, নূতন মধু, নূতন সৌরভ, নূতন সৌন্দর্য, নূতন মাধুর্য, নূতন ঐশ্বর্য, নূতন গুণ, নূতন শক্তি, নূতন পূর্ণতা লাভ করে ধন্যাতিধন্য হয়। কিন্তু তথাকথিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানবেরও শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপত্বে চিরবিশ্বাসী স্বামীজী সগৌরবে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করেন যে, প্রত্যেক মানবের মধ্যেই প্রথম থেকে অনন্ত গুণ, শক্তি, এক কথায়, অনন্ত-অসীম-অখণ্ড পরিপূর্ণতা নিহিত হয়ে রয়েছে; শিক্ষার মাধ্যমে তা কেবল প্রকাশিত হয়ে উঠে প্রোজ্জ্বল প্রভায়। যেমন, একটি ক্ষুদ্র বীজ যখন বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়, তখন উদ্যানপালকের কর্তব্য ত কেবল তাকে উপযুক্ত, সরস জমিতে বপন করে, যথাযোগ্য আলোক-বাতাস-জল সার প্রভৃতির ব্যবস্থা করে দেওয়া—যাতে বীজটি অনুকূল পরিবেশে ঠিকমত বর্ধিত হতে পারে নিজেরই শাশ্বত স্বরূপ গুণ শক্তি প্রকাশিত করে। গুরু বা শিক্ষকের কার্যও ত কেবলমাত্র এই উদ্যান-পালকের মতই—তার অধিক কিছুই নয়।

আশ্চর্যের বিষয় যে, সম্পূর্ণ-ভিন্ন ভাবধারায় নিষ্ণাতা নিবেদিতাও তাঁর নিজের পরমারাধ্য

গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার এই মহাদর্শই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন সেই প্রথম দিনটি থেকেই। বস্তুত পাশ্চাত্য জগৎ মানবের সত্তাগত ব্রহ্মত্ব বা দেবত্বে বিশ্বাস করে না। এই মতানুসারে, মানব স্বভাবতঃই পাপী তাপী; এবং সেজন্য তার প্রয়োজন একজন শ্রেষ্ঠ, পরমকরুণাময় উদ্ধারকর্তার, যিনি তাঁকে পরমেশ্বরের কাছে নিয়ে যাবেন। কিন্তু বিদেশিনী হয়েও কত অনায়াসে, কত শ্রদ্ধা-সহকারে ভগিনী নিবেদিতা ভারতের এই পরম সত্যটিকে উপলব্ধি করে বলেছিলেন স্থির বিশ্বাসভরে :—

"The true teacher knows that no one can really aid another. No one can rightly do for another what that other ought to do for himself. All that he can do is to stimulate him to help himself; and remove from his path the real obstacle to his doing so."

অর্থাৎ, "যিনি প্রকৃত শিক্ষক তিনি জানেন যে, প্রকৃতকল্পে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারেন না। যা তাঁর নিজেরই করা অবশ্য-কর্তব্য, তা তাঁর হয়ে অন্য কারো করা সম্পূর্ণ-রূপেই নিষ্ফল ও অসম্ভব। একজন কেবল অন্যজনকে অনুপ্রাণিত মাত্রই করতে পারেন, নিজেকে নিজেই সাহায্য করতে অনুপ্রাণিত মাত্রই করতে পারেন, আর কিছুই না।" কারণ—

"Man is ever divine, ever the embodied Atman of the Universe."

"মানব শাশ্বতকালই দেবস্বরূপ, শাশ্বত-কালই ব্রহ্মাণ্ডের দেহধারী আত্মা।"

আরেকটি অতি সুন্দর কথাও তিনি এই প্রসঙ্গে যথেষ্ট সাহসভরে বলেছেন—

"It was not the form of his knowledge, but its selflessness, that made a man a 'rishi'. The man who has followed any kind of knowledge to its highest point is a 'rishi'. The man who sees truth directly is a 'jnani'. The truth may take the form of Geography. The truth may take the form of History, or Science or the study of society. It is in India, aided by the Doctrine of Advaita, that we ought to know better than in any other land the value of all this. Here alone does our Religion itself teach us that not only that which is called God is Good. It is the vision of Unity that is the Goal, and any path by which man may reach to this is a Religion. Thus, the elements of Mathematics are to the full as sacred as the stanzas of the Mahabharata. A knowledge of Physics is as holy as a knowledge of the 'Shastras'. The truths of Historical Science are as desirable as the beliefs of Tradition. Advaita can be expressed in Mechanics, in Engineering, in Art, in Letters, as well as in Philosophy & Meditation. The true Advaita is the master of the World." ("The Teacher")

অর্থাৎ—"জ্ঞানের বাহ্যিক রূপ নয়, অন্তরের অনাবিল নিঃস্বার্থপরতাই যে কোনো ব্যক্তিকে 'ঋষি'-পর্যায়ে উন্নীত করে। যে ব্যক্তি যে কোনো প্রকারের জ্ঞানেরই উচ্চতম শিখরে উন্নীত হতে পেরেছেন, তিনিই ত ঋষি-

পদবাচ্য। যিনি সাক্ষাৎভাবে সত্যদর্শন করেন, তিনিই ত প্রকৃত 'জ্ঞানী'। এই সত্য হয়ত ভূগোলবিদ্যার মধ্যে প্রকটিত হতে পারে। এই সত্য হয়ত ইতিহাস, অথবা বিজ্ঞান, অথবা সমাজতত্ত্বের মধ্যেও প্রকটিত হতে পারে। এই সবের প্রকৃত মূল্য আমরা ভারতীয়েরা অন্যান্য সকলের অপেক্ষা অধিক উপলব্ধি করতে পারব—যেহেতু কেবল এই পুণ্য দেশেই স্বয়ং ধর্মশাস্ত্রই আমাদের এই মহৎ-মধুর সত্যটি শিক্ষা দেয় যে, যাঁকে আমরা 'ঈশ্বর' বলি, কেবল তিনিই একমাত্র উৎকৃষ্ট তত্ত্ব নন। উপরন্তু, ঐক্যোপলব্ধিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য; এবং যে পন্থা এই লক্ষ্যে উপনীত হতে আমাদের সাহায্য করে, সেই পন্থাই 'ধর্ম'-পদবাচ্য। সেজন্য অঙ্কশাস্ত্রের মূলীভূত অংশসমূহ মহাভারতের শ্লোকসমূহের ন্যায়ই পবিত্র। পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞানের ন্যায়ই পবিত্র। ইতিহাসের সত্যসমূহ ঐতিহ্যগত তত্ত্বসমূহের ন্যায়ই বাঞ্ছনীয়। বস্তুতঃ অদ্বৈততত্ত্ব দর্শনশাস্ত্র বা ধ্যানাদিতে যেরূপ প্রকাশিত হয়, ঠিক সেরূপই প্রকাশিত হতে পারে যন্ত্রবিজ্ঞান, স্থাপত্যবিজ্ঞান, ললিতকলা, সাহিত্য প্রভৃতিতেও। প্রকৃত অদ্বৈতবাদীই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু।"

এক্ষেত্রে একটি অতি সুন্দর, অতি মূলীভূত কথা বলেছেন ভারতদর্শন-নিষ্ণাতা নিবেদিতা। কারণ, ভারতীয় মতে জীবন অথবা জগতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সত্যই কোনোরূপ ভেদ নেই, যেহেতু জগতের প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক ঘটনা, সেই একই মহাতত্ত্বের অর্থাৎ পরব্রহ্মের মূর্ত প্রতিচ্ছবি। সেজন্য, যেমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গাদি থেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণী ভক্ত সাধক মুনি ঋষি পর্যন্ত সকলের মধ্যেই স্বয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম নিহিত হয়ে আছেন, ঠিক তেমনি পৃথিবীর সকল বিদ্যা বা শাস্ত্রই—সাধারণ-অসাধারণ, ব্যবহারিক-পারমার্থিক, সাংসারিক-আধ্যাত্মিক—সকল বিদ্যা বা শাস্ত্রই সেই একই অদ্বৈত-ব্রহ্মের প্রমাণ-স্বরূপ। এই কারণে শ্রীশ্রীমাতৃলীলার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে পরমা জননীকে স্তুতিমুখে দেবগণ বলেছেন: "বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ। স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।" (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৬)

"হে দেবি, সকল বিদ্যাই আপনারই অংশভূতা।"

এরূপে পৃথিবীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে, জ্ঞানে অজ্ঞানে, আমরা সকলেই সেই একই শাশ্বত লক্ষ্যের দিকেই ছুটে চলেছি—মোক্ষের দিকে, মোক্ষের প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মের দিকেই কেবল অহরহ। এই মোক্ষ, এরূপ ব্রহ্ম অবশ্য আমাদের নূতন প্রাপ্য ধন নয়, যেহেতু আমরা অনন্তকাল ধরেই ত মুক্ত, অনন্তকাল ধরেই ত ব্রহ্মস্বরূপ। সেজন্য, বিভিন্ন বিদ্যা পরিশেষে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করে, আমাদের অন্তর্নিহিত অমল-অভয়-অশোক-অরুণ-ব্রহ্মকে প্রকটিত করে তোলে।

সেজন্য শিক্ষার প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলতে হয় যে, শ্রেষ্ঠ গুরু হলেন তিনিই যিনি মুক্ত পুরুষ; এবং শ্রেষ্ঠ শিষ্য হলেন তিনিই যিনি মুমুক্ষু। সেজন্যই যুগযুগান্তব্যাপী ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্যতম মূল ভিত্তি হল—গুরু-শিষ্য-পরম্পরা। মুক্তপুরুষ জগদ্গুরু, মুমুক্ষু তাঁর শিষ্য। এই সম্পর্ক প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত সম্বন্ধ। সূর্য যেরূপ সূর্যমুখী ফুলকে, পুষ্প যেরূপ ভ্রমরকে, চুম্বক যেরূপ লৌহকে আকর্ষণ করে—স্বভাবতঃ সেরূপ গুরুও শিষ্যকে আকর্ষণ করেন তাঁর সমগ্র আত্মা দিয়ে; তাঁর সমগ্র সত্তার ঐশ্বর্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য বিকিরণ করে;

তাঁর সমগ্র স্বরূপের আলোক, আনন্দ, অমৃত বর্ষণ করে। কি মধুর এই সম্পর্ক—আত্মায় আত্মায়, সত্তায় সত্তায়, স্বরূপে স্বরূপে এ' কি সমপ্রাণতা, এ' কি ঐক্যতানতা, এ' কি একরূপতা! সেইজন্যই কি গুরু বিনা দ্বিধায় শিষ্যকে শিষ্যত্বে বরণকালে বিনা দ্বিধায় মন্ত্রোচ্চারণ করে বলেন—

"প্রাণানাং গ্রন্থিরসি, ন মা বিস্রংসঃ। ওজোঽসি, ওজো ময়ি ধেহি; বলমসি, বলং ময়ি ধেহি; ব্রহ্মবর্চসমসি, ব্রহ্মবর্চসায় ত্বা।"

অর্থাৎ গুরু শিষ্যকে বলছেন

"তুমিই আমার প্রাণের গ্রন্থি, তুমি আমাকে কোনদিনও পরিত্যাগ করে চলে যেও না। তুমিই আমার তেজ, আমাকে তেজ দাও; তুমিই আমার বল, আমাকে বল দাও; তুমিই আমার পুষ্টি, আমাকে পুষ্টি দাও; তুমিই ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মশক্তিলাভের জন্যই আজ আমি তোমাকে সাদরে শিষ্যত্বে বরণ করে নিলাম।"

জগতের ইতিহাসে, গুরু কর্তৃক উচ্চারিত এরূপ অপূর্ব স্নেহ-কোমল, স্নিগ্ধ-সুশীতল মন্ত্র আর দ্বিতীয় নেই। মুক্ত পুরুষ হবেন এরূপ আদর্শ গুরু। যে আলোক তিনি স্বয়ং লাভ করেছেন, তারই রশ্মি তিনি চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত করে যাবেন, প্রজ্বলিত করে যাবেন অসংখ্য দীপ নিজের জীবন-প্রদীপের সুবর্ণআলোকে; যে অমৃত তিনি স্বয়ং পান করেছেন, তারই ধারা তিনি চতুর্দিকে বর্ষিত করে যাবেন, পূর্ণ করে যাবেন অসংখ্য শূন্য পাত্র নিজের জীবন-ভাণ্ডের পীযূষ-উৎসে; যে আনন্দ তিনি স্বয়ং অনুভব করেছেন, তারই হিল্লোল তিনি চতুর্দিকে তুলে দিয়ে যাবেন, উজ্জ্বল করে যাবেন অসংখ্য শুষ্ক শাখা নিজের জীবনমলয়ের শীতল প্রবাহে। কত মধুর কত সুন্দর কত মহিমময় গুরুর এই কার্য! যাকে নিবেদিতা বলেছেন "Aggression"—তারই পূর্ণ প্রকাশ এই গুরু। গুরু তিনি যিনি নিজেকে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত করেন, শিষ্যের মধ্যে জীবিত থাকেন, শিষ্যের সঙ্গে মিলিত হন। "জ্ঞানী" অনেকেই আছেন; "গুরু" কিন্তু লক্ষে এক। জ্ঞানী নিজেকে লাভ করেন, কিন্তু সেই লাভ পরিপূর্ণ লাভ নয়, কারণ সেই লাভের অপর দিক অপরকে লাভ নয়। কিন্তু গুরু যেমন এক দিকে নিজেকে লাভ করেন, অপরদিকে তেমনি অপরকেও লাভ করেন সমভাবে। এরূপ বিশ্বলাভকারীই ত প্রকৃত দ্রষ্টা, তিনিই হলেন, নিবেদিতার ভাষায়, "Aggressiveness" এর পূর্ণ প্রতীক।

পুনরায় এক্ষেত্রে রাগদ্বেষের কথাও বিশেষভাবে চিন্তনীয়। সাধারণদর্শনানুসারে, রাগদ্বেষ মানবের দুটি মূলীভূত জৈবপ্রবৃত্তি, যা থেকেই হয়েছে উদ্ভব সকল জৈব-কার্যাবলীর। এরূপে যা আমাদের মনে হয় আমাদের সুখ দান করবে, তা'র প্রতি আমাদের স্বভাবতঃই হয় 'রাগ' বা অনুরাগ, আকর্ষণ, আসক্তি। সুতরাং, আমরা প্রাণপণে তা অর্জন করতে প্রচেষ্টা করি। একই ভাবে, অপর পক্ষে, যা' আমাদের মনে হয় আমাদের দুঃখ দান করবে, তাঁর প্রতি আমাদের স্বভাবতঃই হয় 'দ্বেষ', অথবা বিরাগ, বিকর্ষণ, বিরক্তি। সুতরাং আমরা প্রাণপণে তা বর্জন করতে প্রচেষ্টা করি। এইভাবে, রাগ-দ্বেষ, অর্জন-বর্জনের তাড়নায় আমাদের সাধারণ, সাংসারিক জীবন নিরন্তর বিঘূর্ণিত হয় অশান্ত ভাবে; নিরন্তর ধাবিত হয় পার্থিব বস্তুর প্রতি, বা পলায়ন করে পার্থিব বস্তু থেকে। সেজন্য ভারতীয় শাস্ত্রের মতে, সাধনপথে সর্বপ্রথম আবশ্যক হল রাগ-দ্বেষ-ধ্বংস। অবশ্য, এই

সঙ্গে এই কথাও বলা হয়েছে যে, 'রাগ'-ধ্বংসের অর্থ শুষ্ক, কঠোর কর্কশ জীবন যাপন করা নয়—'রাগ'কে বা স্বার্থপর কামকে উন্নীত করতে হবে প্রীতিতে, নিঃস্বার্থ প্রেমে, নিরলস সেবায়। এরূপে নিম্নতর স্তরে যা রাগ বা কাম উচ্চতর স্তরে তাই প্রীতি বা প্রেম। একই ভাবে, নিম্নতর ক্ষেত্রে যা 'দ্বেষ' বা 'ঘৃণা' উচ্চস্তরে তা স্বতঃস্ফূর্ত পবিত্র ভাব, যার শুভ্র তেজে সকল পাপ কলঙ্ক বিদূরিত হয়ে যায় নিমেষেই।

নিবেদিতাও এই একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, রাগ-দ্বেষ বাধা না হয়ে শক্তি হয় মুমুক্ষু ও মুক্ত পুরুষের নিকট। প্রেমের শক্তিতে তেজের শক্তিতে বলীয়ান তিনি বিশ্বজয়ী হন।

তিনি বলেছেন আরেকটি অপূর্ব কথা—সমগ্র জীবন-লক্ষ্যের দিকের কথা। বস্তুত মুমুক্ষু ও মুক্ত পুরুষের জীবন ও লক্ষ্যের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই—

"And, finally, the life's purpose has become a consuming fire." (P. 31)

"এবং পরিশেষে, জীবনের লক্ষ্য হয় একটি সর্বব্যাপী অগ্নির ন্যায়।"

"জীবনের লক্ষ্য কি?" জীবন ও লক্ষ্যের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি? জীবনের লক্ষ্যের বিষয় বহুবার শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সে লক্ষ্য দুই নয়, কেবল একটিই—'আধ্যাত্মিকতা'। আধ্যাত্মিকতার অর্থ কি? আধ্যাত্মিকতাই আত্মা, আত্মার স্বরূপ, আত্মার স্বভাব, সেজন্য এই আধ্যাত্মিকতাকে লাভ করতে হয় না, প্রকাশ করতে হয়, সৃষ্টি করতে হয় না, আবরণোন্মোচিত করতে হয়। এই কারণেই বলা চলে যে, জীবন ও লক্ষ্যে কোনোরূপ প্রভেদ নেই, যেহেতু এক অর্থে, একদিক থেকে দেখতে গেলে, জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই, যেহেতু জীবন জীবনই শাশ্বত কাল—এর বৃদ্ধি নেই, হ্রাস নেই, রূপান্তর নেই, পরিবর্তন নেই। পুনরায় অন্য দিক থেকে, জীবনই লক্ষ্য, লক্ষ্যই জীবন—জীবনের আর অন্য কি আছে? কারণ জীবন নিত্য গতিশীল, চিরসক্রিয়, অনন্ত কর্মকারী। এই গতির শেষ কোথায়, লক্ষ্য কি? এর শেষ নিজেই, লক্ষ্য নিজেই, নিজেই নিজে সব—নিজেই নিজের স্বরূপ, নিজেই নিজের স্বভাব, নিজেই নিজের সত্তা। শাশ্বতকাল সূর্য আলোক বিকিরণ করছে, সে ত নিঃশব্দে উপবেশন করে নেই, নিশ্চিন্তে শয়ন করে নেই, নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হয়ে নেই। কিন্তু এ তার স্বরূপ, স্বভাব, সত্তা; এ তার লক্ষ্যযুক্ত কোনো সাধারণ কর্ম নয়—কারণ এতে তার আর কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হবে? সাধারণ কর্মে থাকে কোনো একটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ লক্ষ্য। কিন্তু এরূপে লক্ষ্যবিহীন কর্ম ব্যতীতও লক্ষ্যশূন্য কর্মও থাকতে পারে, তা হল স্বভাবজ কর্ম।

মুক্ত পুরুষের কর্মও স্বভাবজ কর্ম—সূর্যের ন্যায় আলোক-বিকিরণ, পুষ্পের ন্যায় গন্ধ-বিতরণ, বায়ুর ন্যায় হিল্লোল-উচ্ছ্বাসন। এরূপ নিঃস্বার্থ সেবাই এই সবের মূলমন্ত্র।

এরূপে পুণ্যশ্লোকা ভগিনী নিবেদিতা দর্শনের মাধ্যমে, ধর্মের মাধ্যমে, নীতির মাধ্যমে যে মহাজীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন আজীবন, তার শাশ্বত রূপ ত সেই একটিই—সর্বত্যাগী অথচ সর্বলাভকারী সন্ন্যাসীর দৃপ্ত রূপ—

"Strong as the thunderbolt, austere as Brahmacarya, great-hearted and selfless—such should be that sannyasin who has taken the service of others

as his sannyasa; and not less than this should be the son of a Militant Hinduism". (Aggressive Hinduism P. 32).

"সন্ন্যাসী" কে? সন্ন্যাসী হলেন তিনিই যিনি বজ্রের ন্যায় বীর্যবান্, ব্রহ্মচারীর ন্যায় তপোযুক্ত উদার ও নিঃস্বার্থ; এবং যিনি পরসেবাকেই তাঁর 'সন্ন্যাস'রূপে গ্রহণ করেছেন। বীর্যবান্—হিন্দুধর্মের প্রত্যেক সন্তানকেই এরূপ বীর্যবান্ হতে হবে নিশ্চয়ই।"

এরূপ মহালক্ষ্যলাভের উপায়ও পরদুঃখ-কাতর নিবেদিতা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন সাগ্রহে—

"Renunciation, Renunciation, Renunciation. In the panoply of renunciation, plunge thou into the ocean of the unknown. Set out to find thyself; and let thy going forth be as a blaze of encouragement to those who have yet to depart."

"ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ—এই ত্যাগের বর্ম পরিধান করেই তুমি সেই অজ্ঞাত সমুদ্রে ঝাঁপ দাও। নিজেকে আবিষ্কার করবার জন্য যাত্রা আরম্ভ কর। তোমার এই শুভ যাত্রা হোক এক মহতী অনুপ্রেরণার উৎসস্বরূপ তাঁদেরই নিকট—যাঁরা এখনও যাত্রা আরম্ভই করেননি।"

আজ আমরা যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের গুরুরূপে পাই, তাহলে, মনে হয়, সকল সমস্যারই সমাধান, সকল অভিযোগেরই ক্ষালন, সকল শূন্যতারই পূর্ণতা হয়ে যাবে, অচিরেই সুনিশ্চিত।

স্বাগত সংগীত

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

প্রাণের পদ্ম-পাপড়ি মেলে ধরি,
প্রণামটুকু রেখেই শুধু যাই,
আসর-ভরা অতিথি জয়গানে
হৃদয়-জাগা জ্যোতির দিশা চাই।
ধ্যানের ধনে ধরিতে আঁখি নাচে,
নিবিড় নীল আকাশে সীমা যাচে;
মাটির ভিতে অজানা লীলাময়
প্রকাশ-রূপে আলোর রেখা পাই;
জবার গাছে জাগছে মোহনীয়
সবুজ ডালে রঙিন হাসি তাই।

আকাশ নীলে ভাসালো কোন্ ভেলা
উদাস চোখে আনন্দ দেয় ধরা,
রাতের তারা জ্বেলেছে কত বাতি
জেগেছে নানা কামনা মনে করা!
চলেছে মেঘ উঠেছে ঢেউ দুলে
গেয়েছে পাখি হেসেছে গাছ ফুলে—
কালোর রাতে আলোর ফুলঝুরি
চমক দিলে বিষাদ-মরু নাই,
ঝরণা ঝ'রে প্রেমের ধারা নিয়ে
জানিয়ে যায় মাধুরী ভরসাই।

ঈশ্বরের সন্ধানে স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক মৌলভী রেজাউল করীম

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পর শতবর্ষ পার হয়ে গেছে। আরও কত শতবর্ষ পার হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি ভারতের তথা জগতের মানুষের জন্য যা করেছেন, যে আদর্শ দিয়েছেন, যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা চিরকাল অম্লান দীপ্তিতে বিভাসিত হয়ে সকল যুগের সকল মানুষকে পথ প্রদর্শন করবে, দিশেহারা মানুষ সেখান থেকে আশার মধুর বাণী শুনতে পাবে। স্বামীজী একাধারে এত অধিক বিষয় নিজের মধ্যে বিকশিত করেছিলেন যে, এক কথায় তাঁর সমগ্র স্বরূপ পরিস্ফুট করে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিনি ছিলেন ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক, তিনি ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। অতীতে হাজার হাজার বছর ধরে ভারতে কত আদর্শ প্রচারিত হয়েছিল—কত শত তত্ত্বদর্শীদের দ্বারা দর্শন ও পরমার্থ-বিষয়ের আলোচনা হয়েছে—এই ভারতে মহৎ ও উন্নত জীবনের যে মানদণ্ড নির্ণীত হয়েছিল—স্বামীজী ছিলেন সেই-সব আদর্শ, দর্শন ও নীতির ফলিত রূপ। ভারতের অমর ভাবকে তিনি দিয়েছেন নবতর রূপ। আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে, "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়"—স্বামীজী তাঁর প্রায় প্রতিটি আদর্শ ও নীতিকে নিজের জীবনে অভ্যাস করেছেন, এবং তাকে নিজের জীবনে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি যে সত্য মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন তা তাঁর জীবনে বহু ভাবে পরীক্ষিত হয়েছিল। বহু দিক দিয়ে তাঁর গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণের তিনি ছিলেন সার্থক উত্তরাধিকারী।

স্বামীজী যে এত বড় হয়েছিলেন, এত বিশাল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তার জন্য তাঁকে বহু সাধনা করতে হয়েছিল। শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞানের সাধনা, কর্মের সাধনা, ভক্তির সাধনা, ধ্যান-চিন্তা, ত্যাগ তপস্যা সব কিছুর মাধ্যমে তিনি নিজেকে মহৎ কর্ম সাধনের জন্য সর্ব-প্রকারে প্রস্তুত করেছিলেন। ধর্ম কর্ম ও চিন্তায় এই উচ্চ আসন লাভ করবার জন্য তাঁকে অশেষ প্রকার কৃচ্ছ্র-সাধনা করতে হয়েছিল। কত বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে—অন্তরে বাহিরে কত দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ দ্বিধা সঙ্কোচের সম্মুখে তাঁকে উপস্থিত হ'তে হয়েছে! অন্য কোন লোক হ'লে হয়ত ভেঙে পড়তেন। কিন্তু তিনি বীরের মতো সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে উন্নত মস্তকে সাফল্যের জয়টিকা ললাটে পরেছেন। তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী জীবনের ইতিহাস আলোচনা করলে এই দেখে স্তম্ভিত হই যে, একটি অর্থশালী অভিজাত বংশের সন্তান—যাঁর সামনে পার্থিব ও সাংসারিক বিষয়ের উন্নতির সমস্ত পথ উন্মুক্ত—তা সত্ত্বেও তিনি কিনা বৈষয়িক উন্নতির সব আশা পরিত্যাগ করে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করলেন। সমবয়স্ক ছেলেদের মধ্যে তিনি যেমন সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন, বিদ্যালয়ে পাঠরত আরও বহু বালকের তিনি যেমন ছিলেন মধ্যমণি, সন্ন্যাসের পথে এসেও তিনি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করলেন। শৈশব বয়স থেকেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও মেধার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। খেলাধুলা,

লাফালাফি, দাপাদাপি, বালকসুলভ দুষ্টামি—এ সব বিষয়েই তিনি ছিলেন সবার সেরা, আবার পড়াশুনাতেও তিনি সকলকে অতিক্রম করেছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি প্রচুর পড়াশুনা করতেন—সব রকমের বই তিনি পড়তেন। বিশেষ করে দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্মপুস্তক—কোন প্রকার বই-ই বাদ দিতেন না। সমাজের রক্ষণশীল লোকেরা অনেক বই ছেলেদের হাতে তুলে দিতে সাহস পেতেন না, কি জানি সে-সব বই পড়ে ছেলেরা যদি নাস্তিক ও ধর্মহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু কিশোর নরেন সে-সব বই আগ্রহের সহিত পড়তেন। জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, ডেভিড হিউম এই-সব বিখ্যাত গ্রন্থকারদের বই অনেক পড়তেন। তা'র ফলে প্রচলিত ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন, স্বামীজী যখন এই-সব বই পড়লেন তখন ত'ার মনের চাঞ্চল্য দেখা দিল। ডেকার্টের মনে প্রথম জীবনে যে সন্দেহ জেগেছিল, ত'ার মনেও সেই প্রকার সন্দেহ জাগল। এবং ডেকার্টের মতই তিনি সত্য সন্ধান করতে লাগলেন এবং সত্যলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

কোথায় গেলে সত্য পাওয়া যাবে—এই চিন্তায় তিনি বিভোর হয়ে উঠলেন। এখানে ওখানে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট গেলেন। কিন্তু তিনি যা চাইছিলেন তা কোথাও পেলেন না। অবশেষে তাঁর এক আত্মীয় রামচন্দ্র দত্ত তাঁকে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে যেতে বলেন। কিন্তু বিপুল সন্দেহ দ্বারা যাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত, সহজে কি তা দূর হয়? সহজে কি তাঁর দ্বিধা কাটে? তাই তিনি ঠাকুরের কাছে যাবার পরও কত ভাবে তাঁকে পরীক্ষা করলেন, কত ভাবে কত দিক দিয়ে তাঁকে যাচাই করলেন। একটু একটু করে তাঁর মহিমা উপলব্ধি করলেন, তাঁর প্রদীপ্ত জ্ঞানের পরিচয় লাভ করলেন। রামকৃষ্ণদেব একজন অর্ধ শিক্ষিত সাধক। দেখতে সাধারণ মানুষের মতো সাজপোশাক জ'াকজমক আড়ম্বরাদি তাঁর কিছুই নাই—এক কথায় অতি সাধারণ লোক। ঠাকুর কিন্তু ত'াকে দেখেই বুঝে ফেললেন—এ এক অসাধারণ যুবক; এর ভেতরে তেজ আছে, শক্তি আছে, প্রাণ আছে এ একটা ছেলের মত ছেলে. স্বামীজী দিনের পর দিন, ঠাকুরের আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন—ত'ার কাছে না গিয়ে থাকতে পারতেন না; ঠাকুর যেন চুম্বকের মত ক্রমেই ত'াকে আকর্ষণ করতে লাগলেন। এইভাবে কিছুদিন চললো। নরেন্দ্রনাথ সরাসরি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ঈশ্বরকে আপনি দেখেছেন?" অন্যান্য অনেকের নিকট তিনি এই প্রশ্নই করেছিলেন। কিন্তু কেউ ত'াকে সোজাসুজি বলতে পারেননি, "হঁ্যা, দেখেছি।" কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের মনে কোন দ্বিধা ছিল না, প্রশ্ন করা মাত্র তিনি অত্যন্ত সহজভাবে বললেন, "হঁ্যা, দেখেছি, যেমন করে তোমাকে দেখছি ঠিক তেমনি করেই ত'াকে দেখেছি।" শুধু তাই নয়, তিনি আরও বললেন, "তোমাকেও তা দেখাতে পারি।" ঠাকুরের উত্তর শুনে তিনি ত অবাক। সঙ্গে সঙ্গে ত'ার সমস্ত দ্বিধা সন্দেহ অবিশ্বাস কর্পূরের মত কোথায় উবে গেল। এক মুহূর্তেই সব মেঘাবরণ কেটে গেল। কোথায় গেল স্পেন্সার ও হাক্সলির রচনাবলী, কোথায় গেল নাস্তিকতামূলক ভাব! সমস্ত দিক দিয়ে ঠাকুরকে পরীক্ষা করে অবশেষে তিনি সুস্থির ভাবে বুঝলেন যে, এই ব্যক্তি এমন একজন মানুষ, যিনি ত'াকে হাত ধরে গন্তব্যস্থানে

নিয়ে যেতে পারেন। বস্তুত ঠাকুরের ব্যক্তিত্বের প্রভাব, তাঁর বিশ্বাসের সরলতা ও আকুল ঈশ্বর-প্রেম নরেনের জীবনে এনে দিল এক অদ্ভুত পরিবর্তন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি দেখলেন এমন একজন মানুষকে যিনি তর্ক করেন না, কথার তুবড়ি দিয়ে মানুষকে অভিভূত করেন না।—যিনি হৃদয় থেকে কথা বলেন, নিজের অন্তরে যা উপলব্ধি করেন তাই শুধু বলেন, এবং এক হৃদয় থেকে অপর হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দেন। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যা বোঝেন তাই তিনি বলেন। কারুর কোন তর্ক খণ্ডন করেন না। কারুর উপর নিজের মতবাদ চাপিয়ে দেন না। তাই তিনি কোন দ্বিধা সঙ্কোচ ও ইতস্তত: ভাবের অবসর না দিয়েই অত্যন্ত স্পষ্ট করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারলেন, "হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি।" বস্তুত তিনি নিজের জীবনে ঈশ্বরের সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করেছেন—তাঁর ধমনীতে ধমনীতে। এই মহাপুরুষের প্রভাব নরেন্দ্রের জীবনে এনে দিল এক বিরাট পরিবর্তন, তাঁকে করলো সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত।

তারপর ক্রমেক্রমে ঠাকুর তাঁকে অনেক কিছু শেখালেন যা তিনি পুস্তক পাঠ করে পেতেন না। ধর্ম ছাড়াও সমাজকল্যাণ, দেশ-সেবা, মানবকল্যাণ, সেবার আদর্শ, ভগবান-পূজার সার্থকতা, অধ্যাত্মবাদের মর্মকথা—সবই তিনি শিখে ফেললেন। ধর্মের মর্মকথা তাঁর আর অবোধ্য রইল না। ঈশ্বরের সন্ধান করতে করতে অবশেষে তিনি বুঝলেন ঈশ্বরকে যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে লাভ করা যায় না। তাঁকে পাওয়া যায় হৃদয় দিয়ে—অন্তরের অনুভূতি দিয়ে। প্রতিটি কর্মের মধ্যে ঈশ্বরের দর্শন মেলে, ও তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। কোন্ ভাবে, কোন্ পথে, কোন্ মার্গ অনুসরণ করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে—এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর তাঁকে শেখালেন : সব পথ সত্য—সবমতই একই লক্ষ্যে মানুষকে নিয়ে যায়। যে পথেই হোক তাঁকে হৃদয়ে অনুভব করতে হবে। সে-অনুভূতি একবার জাগলে তার অন্তর থেকে সমস্ত প্রকার ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়। তাঁর মনে যে এইরূপ মহৎ ভাব, সর্ব মানবের ঐক্যানুভূতি জাগ্রত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাই চিকাগো ধর্মসভায় তাঁর ভাষণে। এই ঐতিহাসিক ভাষণের এক জায়গায় তিনি বলেন, "সমস্ত সাম্প্রদায়িক ঈশ্বরের ঊর্ধ্বে আছেন সর্ব মানুষের এক ঈশ্বর, সাম্প্রদায়িক ধর্মের উপরে আছে একটি ধর্ম, একটা কিছু আছে যা সব আচার-বিচার-ক্রিয়াকাণ্ডের ঊর্ধ্বে অবস্থিত—তা হচ্ছে একটা সর্বজনীন ধর্ম যাকে ভিত্তি করে প্রাচ্য পাশ্চাত্য ও সমগ্র জগৎকে এক করা সম্ভব। গীতার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেন : ঈশ্বর বলেছেন, মানুষ যেমন ভাবে আমার নিকটে আসে, আমিও ঠিক তেমনি ভাবে তাকে গ্রহণ করি। সব মানুষই আমাকে খুঁজছে, আমি মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ করি না ; তারা যে পথে যেভাবেই আমাকে চাক না কেন, আমি সকলকে গ্রহণ করি, কোন পার্থক্য করি না। তাঁর এই সব ব্যাখ্যা থেকে এই প্রমাণ করে যে, ঈশ্বরের সন্ধানে তিনি বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন।

বাস্তবিকই সত্যের সন্ধানে নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে অবশেষে তিনি রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে দিব্য জ্ঞান লাভ করলেন। ঠাকুর যেন পরশপাথর। যাকে স্পর্শ করেন সেই সোনা হয়ে যায়। স্বামীজীর মনে হ'ল তিনি ভেতরের আনন্দের মধ্যে বিভোর হয়ে

থাকবেন—এইভাবে নিজের অহংকে নিঃশেষ করে চিরানন্দের মধ্যে নিমজ্জিত হবেন—অহরহ ধ্যানের আনন্দে বিভোর হয়ে থাকবেন, তার তুলনায় কি ছার এই পার্থিব জীবনের সাধ আহ্লাদ, আশা আকাঙ্ক্ষা! আর স্থূল জগতে ফিরে আসবেন না। এই ভাবেই তো ভারতের বহু সাধক, সন্ন্যাসী, ঋষি মুনি লোক-লোচনের অগোচরে বিলীন হয়ে গেছেন। কজনই বা ত াদের সন্ধান রাখে! কিন্তু যখন তিনি ঠাকুরের নিকট ত ার এই অভিপ্রায় নিবেদন করলেন ও ত াঁর অনুমতি চাইলেন, তখন ঠাকুর ত াকে ধিক্‌কার দিয়ে বললেন: কেন তুমি নিজের মুক্তির জন্য এত ব্যস্ত ও লালায়িত? একাজ তো একপ্রকার স্বার্থ-পরতা। নিজের মুক্তি অতি নগণ্য বিষয়। শিব তো সর্বত্র ব্যাপ্ত। তোমার নাম 'নরেন্দ্র'—এটা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। তুমি হবে নরের প্রতিনিধি, প্রতিমূর্তি। তুমি হবে নরের সেবক। চারিদিকে দেখ দেশের কত দুর্দশা! লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে নিরাশ্রয়ে মরে যাচ্ছে। আজ থেকে এদের সেবাই হ'বে তোমার কাজ। ঠাকুরের এই অমূল্য উপদেশ দৈব-বাণীর মত ত ার মনের ভিতর এনে দিল বিপুল পরিবর্তন। ত ার ঈশ্বর-সেবার মোড় ফিরিয়ে দিলেন নরসেবায়। নরসেবার মধ্যে ঈশ্বর-সাধনার ব্রত তিনি শেখালেন, নিজে করেও দেখালেন। দীনের কুটিরে যে লক্ষ লক্ষ লোক অসহ্য কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করছে, স্বামীজী স্থির করলেন এদের সেবায় আত্মনিবেদন করবেন। আজ তিনি আসল সত্য উপলব্ধি করলেন। এই যে যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি নরনারী দীনদরিদ্র দেশবাসী অনাদরে অবহেলায় পড়ে আছে, কষ্টভোগ করছে, এরাই তো ঈশ্বর—এদের সেবার জন্য ত ার প্রাণ ব্যাকুল হল। ঠাকুরের প্রভাবে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, ঈশ্বর-আরাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে মানুষের সেবা। কোথা থেকে কি হয়ে গেল! ঈশ্বর-সন্ধান থেকে তাঁর যাত্রা আরম্ভ। ঈশ্বরকে পাবার পর নরনারায়ণের রূপে ত াকে দেখতে পেলেন, নরনারায়ণসেবার মধ্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভের পথ দেখতে পেলেন। সত্যি, ঠাকুরের প্রভাবে তিনি অন্য মানুষে রূপান্তরিত হলেন। ত ার নিকট ধর্ম এখন নতুন মহিমায় প্রকটিত হ'ল।

স্বামীজীর জীবনের বিচিত্র ঘটনা থেকে একটা বিষয় বোঝা গেল যে, ধর্ম সম্বন্ধে ত ার মনে জাগল একটা নূতন চেতনা। পৃথিবীর মনুষ্যসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দরিদ্র অভাবগ্রস্ত আশ্রয়হীন অগণিত মানুষের কথা চিন্তা না করে কেবল নিজের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হওয়া—এ খাঁটি ধর্ম হ'তে পারে না, এই অমূল্য শিক্ষা তিনি ঠাকুরের নিকট লাভ করলেন। এই শিক্ষার ফলে ত ার মনে এলো নব জাগরণ। তিনি নূতন মানুষে রূপান্তরিত হ'লেন। ঈশ্বরের পূজা মানে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের সেবা তাদের কল্যাণসাধন—ইহাই আসল ধর্ম। তাই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥"

এই আসল ধর্মলাভ না হ'লে সবই ব্যর্থ। এই হ'ল ঈশ্বরপ্রেম এবং দেশপ্রেমেরও মর্ম-কথা। ত ার দেশপ্রেম কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল না; ত ার ধর্মবোধ ত াকে

বলেছিল জগতের সমস্ত মানুষই একটা পরিবারের অন্তর্গত। আর এই নব ধর্ম তিনি ঠাকুরের নিকট লাভ করলেন। তাঁর এই ধর্মের নাম 'মানবধর্ম'। ধ্যানের জীবনের সহিত মানব-সেবার জীবনের কোন বিরোধ নাই। এই দুটোই একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ। যদি আমরা অন্তরের অভ্যন্তরে সেই মহান্ সত্যকে অনুভব করি, যদি ঈশ্বরের সত্যতাকে উপলব্ধি করি, তাহলে আমাদের কর্তব্য হবে যেখানে যত দুঃখী তাপী আর্ত আতুর মানুষ আছে তাদের সর্ববিধ মঙ্গলসাধনের জন্য অগ্রসর হওয়া। তাই স্বামীজী বললেন, "যখন দেশের লোকের দুর্দশা দেখি তখন হৃদয়ে অসম্ভব যন্ত্রণা অনুভব করি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অগ্নিশিখা বিগুমান। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, সেই অগ্নিশিখাকে বিকশিত করা হচ্ছে না। এই ব্রত আমাদের গ্রহণ করতে হবে—প্রত্যেকে এমনভাবে তৈরি হব যেন এক একজন নিজেই ভগবানের প্রতীক হ'তে পারি।"

আজ জগতের চারিদিকে চক্ষু প্রসারিত করলে কি দেখতে পাই? চারিদিকেই হানা-হানি, রক্তারক্তি। আজ গোটা জগৎ যেন একটা আগ্নেয়গিরির মুখের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। জীবনের মান অত্যন্ত নিম্নস্তরে নেমে গেছে। সংসার থেকে পলাতক মনোভাব দ্বারা অনেকেই বিভ্রান্ত। মানুষ পথের সন্ধান না পেয়ে আশাভঙ্গের আঘাতে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। মানুষের উপর বিশ্বাস-হারানোটা মানুষের প্রকৃতির উপর আঘাত হানা। জগতের এই মোহমুক্তির জন্য, মুক্তবুদ্ধি ও শুদ্ধ চেতনার জন্য স্বামীজী উদাত্ত কণ্ঠে সকলকে আহ্বান করেছেন। মানুষকে তার আধ্যাত্মিক সম্পদের উপর নির্ভর করার মতো জোর দিলেন। মানুষকে তিনি পথের দিশা বলে দিলেন। আজ আমরা স্বামীজীর মহৎ জীবনের আদর্শের কথা বারবার স্মরণ করি। তাঁর নিকট আমাদের অশেষ ঋণের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

করুণা তোমার

শ্রীশান্তশীল দাশ

করুণা তোমার আমার জীবনে
বারে বারে আসে নামি,'
তবু সে তোমার করুণার কথা
কেন ভুলে যাই আমি!
সুখের মাঝারে স্মরি না তোমায়,
দুখ পেয়ে কেঁদে করি 'হায়, হায়';
তুমি সে-সকল দেখে হাস বুঝি
ওগো অন্তরযামী।

আমার এ সুখ, আমার এ দুখ,
সকলি তোমার দান;
তোমার আশিস্ দুয়ের মাঝারে,
হয় না সে কভু ম্লান।
এ-কথাটি যেন ভুলে নাহি যাই,
সুখ দুখ আমি যাহা কিছু পাই,
মাথা পেতে যেন নিই সমাদরে
হে মোর জীবন-স্বামী।

মধুকৈটভবধ

স্বামী জীবানন্দ

সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয়। সৃজন, পালন, সংহার। একটির পর একটি—চক্রবৎ।

কল্পশেষে প্রলয়কালে* জগৎ অপার কারণ-সমুদ্রে পরিণত হ'ল। ভগবান বিষ্ণু তখন অনন্তশয্যায় নিদ্রিত হলেন। শেষনাগকে তিনি শয্যারূপে গ্রহণ ক'রে যোগনিদ্রায় নিমগ্ন। বিশ্বচরাচর যখন সমুদ্রে লীন, তখন পালনকর্তা বিষ্ণুর কোন কাজ নেই। জীবজগৎ যখন নেই, তখন তিনি কি পালন করবেন? দেবী আদ্যাশক্তির সত্ত্বগুণ বিষ্ণুরূপে অভিব্যক্ত, কিন্তু প্রলয়কালে সাত্ত্বিকী পালনী শক্তি নিষ্ক্রিয়, তাই বিষ্ণুও নিষ্ক্রিয়।

'যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভু॥'

শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৬৬

একার্ণবসলিলে শেষশয্যাশায়ী ভগবান বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে দুটি ভয়ঙ্কর অসুর উৎপন্ন হ'ল। এই অসুরদ্বয়ই মধু ও কৈটভ নামে প্রসিদ্ধ। প্রলয়জলে তারা ক্রমশঃ বেড়ে উঠল এবং স্বচ্ছন্দে খেলা করতে লাগল। তারা খেলতে খেলতে দেখতে পেল ব্রহ্মাকে। যোগনিদ্রাভিভূত বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থান করছিলেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মাকে তখন তারা ব'লল বিষ্ণুর নাভিপদ্মাসন ছেড়ে অন্যত্র যেতে। ব্রহ্মা অত্যন্ত ভীত হলেন। কি করবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না! বিকটদর্শন মহাবলশালী তাঁকে হত্যা করবার জন্য এগিয়ে এল। তখন তিনি অনন্যোপায় হয়ে বিষ্ণুকে জাগাবার জন্য যোগনিদ্রার স্তব করতে লাগলেন। এই যোগনিদ্রা হলেন বিষ্ণুর নয়নাশ্রিতা অতুলা তামসী-শক্তি। তিনিই বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, স্থিতি-সংহারকারিণী ভগবতী।

ব্রহ্মা মহামায়াকে ওঁকারবাচ্যা আবার বাক্যাতীতা নির্গুণস্বরূপা, বিশ্বের মূল, বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী, বিশ্বরূপা, বিশ্বজননী—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও জননী প্রভৃতি ব'লে স্তব ক'রে শেষে প্রার্থনা করলেন:

'সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ॥'

ঐ, ৮৪

হে দেবি! হে জগন্মাতঃ! তোমার মহিমার কথা ভাষায় অপ্রকাশ্য হলেও আমি এইভাবে তোমার স্তব করলাম, তোমার উদার অলৌকিক মহিমার বিষয় যথাসাধ্য কীর্তন করলাম। কৃপাময়ি! এই দুর্জয় দুর্ধর্ষ মধু-কৈটভ অসুরদুটিকে তুমি মোহিত কর, তাদের মোহাবৃত ক'রে ফেল।

'প্রবোধশ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ॥'

ঐ, ৮৬

মাগো! শীঘ্র তুমি জগৎপতি বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা থেকে জাগরিত ক'রে মহাসুর দুটিকে বধ করবার জন্য তাঁর প্রবৃত্তি উৎপাদন কর। তুমিই প্রবৃত্তিদায়িনী। তুমিই নিদ্রা-রূপিণী।

* সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—মানুষের এই চার যুগে দেবতার এক যুগ বা দিব্যযুগ বা মহাযুগ। কিঞ্চিদধিক ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর। ১০০০ মহাযুগে এক কল্প বা সৃষ্টিকাল। আবার ১০০০ মহাযুগে প্রলয়-কাল। প্রলয়ে সব কিছুর লয়, আবার প্রলয়ান্তে সৃষ্টি।

ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্তুতা দেবী মহামায়া মহাকালী তখন বিষ্ণুর যোগনিদ্রাভঙ্গের জন্য বিষ্ণুর নেত্র, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষঃস্থল থেকে নির্গত হয়ে ব্রহ্মার নয়নগোচর হলেন। যোগনিদ্রামুক্ত জগৎপ্রভু বিষ্ণু দেখতে পেলেন মহাপরাক্রমশালী মধু ও কৈটভকে। ক্রোধে তাদের চক্ষু রক্তবর্ণ, তারা ব্রহ্মাকে বধ করতে উদ্যত। অনন্তর বিষ্ণু তাদের বধ করবার জন্য তাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। বহুকাল অতীত হ'ল। সেই সংগ্রামে ভগবান শ্রীহরি যোগনিদ্রা থেকে ব্যুত্থিত হয়ে মধু-কৈটভের সঙ্গে পাঁচ হাজার বৎসর বাহুযুদ্ধ করলেন।

সেই মদগর্বিত বলদর্পিত অসুরদ্বয় মহামায়া কর্তৃক বিমোহিত হয়ে বিষ্ণুকে ব'লল, 'আপনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আমরা খুশী হয়েছি, আপনি আমাদের নিকট বর প্রার্থনা করুন। আপনাকে আমরা বর দেবো।'

যুদ্ধে তারা পরাজয় বরণ ক'রল না, এমন শক্তি তারা পেল কোথা থেকে? নিহত হওয়া তো দূরের কথা, পাঁচ হাজার বছর ধ'রে যুদ্ধ! আবার ভগবানকেই বর দিতে চায়!

দেবীভাগবতের বৃত্তান্ত অনুসারে বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে জন্মলাভের পর মধুকৈটভ চারদিকে কারণসলিল দেখে ভেবেছিল, 'এই জলরাশি কোথা থেকে এল, আমরাই কোথা থেকে উৎপন্ন হলাম।' তারা বিচার ক'রে বুঝল অনির্বচনীয়া মহাশক্তিই এর কারণ। তারা একটি অপূর্ব বীজমন্ত্র শুনতে পেয়ে জপ করতে লাগল। কঠোর তপস্যা ও জপের ফলে পরমা চিৎশক্তিরূপিণী দেবী তাদের প্রতি প্রসন্না হয়ে দৈববাণী করলেন, 'ওরে দৈত্যদ্বয়! তোদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি। ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর্।' তারা তখন স্বেচ্ছামৃত্যুবর চাইল। দেবী বললেন, 'তথাস্তু। তোদের ইচ্ছামৃত্যুই হবে, তোরা সুরাসুরের অজেয় হবি।' দেবীর বরের ফলেই তারা অমিত-শক্তিসম্পন্ন!

কিন্তু মহামায়ার মায়া! সেই মায়ায় বিমোহিত হয়ে এখন তারা ভগবানকেই বর দিতে চায়!

ভগবান বিষ্ণু বললেন:

'ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি।
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম॥'

ঐ, ৯৮

'যদি তোমরা আমার যুদ্ধে তুষ্ট হয়ে থাক, তবে তোমরা উভয়েই এই ক্ষণে আমার বধ্য হও, এই আমার একান্ত ইচ্ছা। এখন অন্য বরের কি প্রয়োজন?' মহামায়া কর্তৃক বিমোহিত মধু ও কৈটভ ভাবল—সমগ্র বিশ্ব কারণ-জলে নিমগ্ন, এ অবস্থায় জলশূন্য কোন স্থান পাওয়া যাবে না এবং তাদের মৃত্যুও হবে না, তাই ব'লল, 'আপনার যুদ্ধে আমরা উভয়ে প্রীত হয়েছি, আপনার হাতে আমাদের মৃত্যু শ্লাঘার যোগ্য। তবে পৃথিবীর যে স্থান জলপ্লাবিত হয়নি সেখানে আমাদের বধ করুন।'

'তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভৃতা।
কৃত্বা চক্রেণ বৈ ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ॥'

ঐ, ১০৩

শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান বিষ্ণু 'তাই হোক' ব'লে অসুরদুটির মস্তক জঙ্ঘাপ্রদেশে রেখে সুদর্শন চক্র দ্বারা কেটে ফেললেন।

বিষ্ণুকে তাই মধুকৈটভারি বলা হয়। জন্ম-গ্রহণ করেই মধু পান করতে চেয়েছিল দৈত্য, তাই তার নাম মধু দৈত্য। মধুকে বধ করার জন্য বিষ্ণুর নাম মধুসূদন। দেবীভাগবতে আছে:

মধু ও কৈটভ দানবদুটি মৃত হ'লে তাদের শরীরের মেদে সমুদয় সাগর পরিব্যাপ্ত হ'ল। সেই মেদ থেকে পৃথিবীর জন্ম; তাই পৃথিবীর নাম মেদিনী।

'গতপ্রাণৌ তদা জাতৌ দানবৌ মধুকৈটভৌ।
সাগরঃ সকলো ব্যাপ্তস্তদা বৈ মেদসা তয়োঃ॥
মেদিনীতি ততো জাতা নাম পৃথ্ব্যাঃ সমন্ততঃ।'

১।৯ ৮৩-৮৪

মহামায়া আদ্যাশক্তি দেবীর রজঃশক্তি ব্রহ্মারূপে ক্রিয়াশীল। সৃষ্টি রজোগুণের কার্য। প্রলয়াবসানে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হয়ে সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করবার সংকল্প করেছিলেন। সেই সংকল্প সিদ্ধ হ'ল। বিশ্ব সৃষ্ট হওয়ায় বিশ্বপাতা বিষ্ণুর প্রয়োজন হ'ল। তিনি যোগনিদ্রামুক্ত হয়ে বিশ্ব-পালনকার্যে রত হলেন।

বৈকৃতিক-রহস্যে শ্রীশ্রীমহাকালীকেই বৈষ্ণবী মায়া বলা হয়েছে: 'এষা সা বৈষ্ণবী মায়া মহাকালী দুরত্যয়া।'

ব্রহ্মানন্দ*

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

শত শতাব্দীর ধ্যান পুঞ্জিত মর্মরে
শুদ্ধ তুমি সুগম্ভীর! ভাগীরথী-তীরে।
ছায়ারৌদ্র খেলে যায় শ্যামল প্রান্তরে—
স্বপ্নসম চরাচর হৃদয়-গভীরে
কখনো চকিতে জাগে, কখনো মিলায়,
বিভাসিত রূপে রূপে তবুও অসীম—
লীলার আড়ালে নিত্য নিত্যই লীলায়;
উন্মীলিত দুটি চোখে ধ্যানের নিঃসীম।
বিশ্বাসের বটপত্রে চির-ভাসমান,
নীলাভ শিশুর সত্তা জাগে বুঝি মনে?
শিখিপুচ্ছে বর্ণচ্ছটা—যমুনা উজান,
আজো তুমি নৃত্যরত কৃষ্ণসখাসনে।
বাহিরে তুষার-শুভ্র প্রশান্ত অমল,
অন্তরে তরঙ্গে দোলে কালিন্দী-কমল।

* বেলুড় মঠে ব্রহ্মানন্দ-মন্দিরে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর প্রতিমূর্তি-স্মরণে

নাম

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

চিরকাল পৃথিবীর বুকে ছয় ঋতু বারো মাস আসে।
আসে, শুষ্কমুখ উৎসুক গ্রীষ্ম দুটি মাসে,
আসে, আষাঢ় শ্রাবণে চোখ জলে ভাসে—
বুকে নিয়ে কত জন্ম কত মৃত্যু অশ্রুসিক্ত আঁখি,
যায় ডাকি ডাকি!
আসে আশ্বিন শরৎ ঋতু—হেমন্ত অঘ্রাণ,
জানায় আহ্বান,—
বলে, 'আমি জন্ম।' 'আমি মৃত্যু।' 'আমি আসিলাম!'
'হে পথিক মহাকাল লিখে নাও আমারো এ নাম
মহাশূন্যে চাঁদ তারা তপনের পাশে
ছায়াপথ নক্ষত্র গ্রহের অবকাশে!'
আসে, মৃত্যুসম পাণ্ডুমুখ পীত শীতমাস! চৈত্র ও ফাল্গুন।
শুনাইয়া তিথি-মাস-বর্ষ-বুকে জীবনের মৌমাছির মৃদু গুণ গুণ,
নিমেষে নিমেষে
মিশে যায় অনন্ত আকাশে।

* * *

"রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ব্যাস, বাল্মীকি, জনক, কালিদাস,
শঙ্কর, চৈতন্য, মীরা, তুলসী, নানক, সুরদাস,
রামকৃষ্ণ। কেহ রাজা। রাজপুত্র কেহ। কেহ দস্যু, কেহ মুনি।
জ্ঞানী, ভক্ত, কবি।"
যুগান্তের চিত্তে চিত্তে এঁকেছ লিখেছ তুমি তাহাদের নাম কথা ছবি।
ছোট বড় আরো জন্মমৃত্যু-তিথি-ইতিহাস উঁকি দেয় পাশে
স্নিগ্ধ স্মিত হাসে।
কোন তিথি মৃত তারকার মতো নিবিয়াছে যুগান্তের প্রান্তে।
সন্ধ্যা-তারকার মতো কেহ ফুটিয়াই ঝরিয়াছে সেই রাতে।
ষোলোকলা চাঁদের মতন, ক্ষীণ বড় কলা নিয়ে কত গেছে, আসিয়াছে।
হে কঠিন ইতিহাস, 'মনে রেখো মোরে' অনুনয় করিয়া গিয়াছে!
মহাস্মৃতি-বিস্মৃতির পারে মহাশূন্যে আকাশের গায়
বর্ষ মাস-তিথিদের পাতা ঝ'রে যায়;—
দেখিলাম দাঁড়াইয়া আছ তুমি সেথা, হে নির্মম মহাকাল! সাক্ষী ইতিহাস!
শান্ত স্তব্ধমুখ।—কারো মেলে না আশ্বাস!

শ্রীরামকৃষ্ণের ডক্তার—মহেন্দ্রলাল সরকার*

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

শ্রীম-লিখিত কথামৃত-পাঠে দেখা যায় যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ছাড়াও বহু ব্যক্তির তাঁহার পূত সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল। ইঁহাদের বেশীর ভাগ আসিয়াছিলেন তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায়, তাঁহার অমৃতময় বাণীতে সংসারে তাপিত ক্লান্ত জীবনকে সিঞ্চিত করিবার জন্য। কয়েকজন ঘটনাচক্রে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, আবার কয়েকজনকে আসিতে হইয়াছিল প্রয়োজনের জন্য। বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হইয়া, বিভিন্ন ভাবধারার অধিকারী হইয়া ইঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে আসিয়াছিলেন। শ্রীম তাঁহার অপূর্ব লেখনীর যাদুস্পর্শে তাঁহাদের অনেকেরই সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন।

কবিরাজ বাদে বেশ কয়েকজন সৌভাগ্যবান ডাক্তারকে দেখিতে পাই ঠাকুরের শরীরধারণের শেষ কয়েক বৎসরে। ইঁহারা হইলেন—শ্যাম ডাক্তার, মধু ডাক্তার, প্রতাপ ডাক্তার, নিতাই ডাক্তার, ভগবান রুদ্র, রাখাল ডাক্তার, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার দু'কড়ি, ডাক্তার ভাদুড়ি, উপেন্দ্র ডাক্তার, শ্রীনাথ ডাক্তার, রামনারায়ণ ডাক্তার এবং ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত। ইঁহাদের মাত্র কয়েকজনকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসার ভার লইতে হইয়াছিল। সদানন্দময় ঠাকুর তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও ভগবৎকথা ও কীর্তনগানের মধ্য দিয়া তাঁহাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং তাঁহার অন্তরঙ্গদের বিশেষ করিয়া শ্রীম, স্বামীজী এবং গিরিশচন্দ্রের কথাবার্তা, তর্ক, মান, অভিমান ও হাস্যকৌতুক শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তবৃন্দের মনে যেরূপ গভীর রেখাপাত করে, তেমনি উদ্রেক করে আপাত-কঠোর ডাক্তারটিকে জানিবার আগ্রহ। কে এই ডাক্তার, যিনি অবতারবাদ মানেন না কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যে প্রকৃতির সন্তান এবং প্রকৃতিকে দর্শন করেন, ইহা মানিতেন; ঠাকুরের চিন্তায় যাঁহার মন বিভোর হইয়া থাকিত এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সান্নিধ্যে থাকিয়া অপার আনন্দ পাইতেন, এমনকি ঔষধ দিতে ভুলিয়া যাইতেন; যিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া তাঁহার ক্রিয়াকলাপের কূলকিনারা করিতে পারিতেন না; যাঁহার সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করিতে বা উপদেশ দিতে ঠাকুরের একটুও ক্লান্তি আসিত না; যাঁহাকে ঠাকুর "তা হ'লে তুমি পরমহংসগিরি করছ কেন" বলিবার স্পর্ধা দিয়াছিলেন; যাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন 'স্বভাবটি বেশ', 'তুমি রসবে', 'তুমি খুব শুদ্ধ', 'এঁর খুব বিদ্যা' এবং যাঁহার কোলে ভাব-সমাধির মধ্যে পা বাড়াইয়া দিতে কার্পণ্য করেন নাই? উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে খ্যাতির উচ্চ শিখরে সুপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার

* শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ এম. ডি. লিখিত "Life of Dr. Mahendra Lal Sirkar M. D, D. L, C. I. E" পুস্তক হইতে গৃহীত। ১৯০৪ সালের Hindusthan জীবনী ছাপা হইয়াছিল, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই ঐ পুস্তকখানি রচিত হইয়াছিল।

মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যে কাঠিন্যের আবরণে আবৃত তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে ভাঙিয়াছেন তবু মচকান নাই, তাঁহারই চরিত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবনেও সেই একই দৃঢ়তা বর্তমান।

মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২রা নভেম্বর হাওড়া হইতে আঠার মাইল পশ্চিমে পাইকপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর—তাঁহার মা তাঁহাকে লইয়া কলিকাতা নেবুতলায় মহেন্দ্রলালের মাতুলালয়ে আসেন। ইহার কয়েক দিন পরেই তাঁহার পিতার দেহ-ত্যাগের খবর আসে। সেই সময় হইতেই মহেন্দ্রলাল মাতুলালয়ে বাস করিতে থাকেন। কিন্তু ইহার চার বৎসরের মধ্যে তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। পাড়ার পাঠশালায় তাঁহার বাঙ্গলা শিক্ষা আরম্ভ হয়। স্কুলের শিক্ষা আরম্ভ হয় ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্কুলে ১৮৪০ সালে। সেকালের এই স্কুলে বেতন লাগিত না। ডেভিড হেয়ার দেহত্যাগ করেন ১৮৪২ সালে। ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর মহেন্দ্রলাল জুনিয়ার স্কলারশিপ পাইয়া হিন্দু কলেজে ভরতি হন। এই কলেজের নামই পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ রাখা হয়। ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি অধ্যয়ন করেন। গণিতের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ মিঃ সাট্‌ক্লিফ এবং দর্শনের অধ্যাপক মিঃ জোন্‌স-এর তিনি বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন। এই সময় তাঁহার বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জন্মে এবং তাহা এত প্রবল হয় যে উপরি-উক্ত অধ্যাপকদ্বয়ের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও এই কলেজ ছাড়িয়া মেডিকেল কলেজে ভরতি হন। এই অবাধ্যতার জন্য মিঃ জোন্‌স এবং মিঃ সাট্‌ক্লিফ তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন।

১৮৫৫ সালে তাঁহার বিবাহ হয়। ভগবান রামকৃষ্ণদেবের কৃপাপ্রাপ্ত তাঁহার একমাত্র পুত্র অমৃতলাল জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬০ সালে। এই বৎসরেই তিনি মেডিকেল কলেজ হইতে এল. এম. এস. পাস করেন তিনি মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময় Botany, Physiology, Medicine, Surgery এবং Midwifery-তে বহু পদক ও বৃত্তি লাভ করেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য তিনি জ্ঞানে অনেক সময় তাঁহার অধ্যাপকদেরও ছাড়াইয়া যাইতেন। Medical Jurisprudence-এর পরীক্ষার খাতায় তিনি পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত একটি ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে ভুল দর্শাইয়া দেন। পরীক্ষক অধ্যাপক সমকালীন চিকিৎসা-বিষয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত অভিমত সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন এবং মহেন্দ্রলালের সেই উক্তি ভুল মনে করিয়া তাঁহার প্রাপ্য স্বর্ণপদক হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন

১৮৬৩ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুরূহ এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পূর্বে মাত্র একজন ডাক্তার—চন্দ্রকুমার দে—এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত হন এবং প্রথমে Faculty of Arts এবং পরে Faculty of Medicine-এ তাঁহাকে রাখা হয়। ১৮৮৭ সালে তাঁহাকে Honorary Presidency Magistrate করা হয়। ১৮৮৩ সালে তাঁহাকে C. I. E. উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮৮৭ খৃঃ হইতে পর পর চারবার তিনি Bengal Legislative Council-এ মেম্বার নিযুক্ত হন। ওই বৎসরই তিনি কলিকাতার সেরিফ হন। দশ বৎসর তিনি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের মেম্বার ছিলেন, এবং উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে বহুবার উপাচার্যের কার্য করিতে হইত। তিনি বেশ কয়েক বৎসর Council of Asiatic Society-র মেম্বার ছিলেন। চিকিৎসকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Hony. D. L. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁহার রচিত পুস্তকের মধ্যে 'Hahneman the Father of Scientific Medicine', 'Moral Influence of Physical Science', 'Phisiological Basis of Psychology' উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার চরিত্রে যে দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত কথোপকথনে দেখিতে পাই, তাহার পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছিল তাঁহার এলোপ্যাথিক ছাড়িয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-পদ্ধতি গ্রহণে। ১৮৬৩ সালে যে বৎসর তিনি M. D. পাশ করেন, ঐ বৎসর ভারতীয় চিকিৎসকদের পথপ্রদর্শক ডাঃ গুডিভ্ চক্রবর্তী British Medical Association-এর বঙ্গীয় শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা-দিবসে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার হোমিওপ্যাথির নিন্দা করিয়া একটি বক্তৃতা করেন। ইহার ঠিক অব্যবহিত পরেই তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে একটি পত্রিকায় Philosophy of Homeopathy নামে একটি পুস্তকের সমালোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ডাঃ সরকার হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধ সমালোচনা করিবার ইহা এক মহাসুযোগ মনে করিয়া, মনোমত যুক্তি খুঁজিবার জন্য মনোযোগ সহকারে বইটি পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। তাঁহার মত পরিবর্তিত হইয়া গেল। ১৮৬৭ সালে তিনি তাঁহার মতপরিবর্তন প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-মহলে সাড়া পড়িয়া গেল। কেহই ভাবিতে পারেন নাই যে, যে-চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুশীলনে ডাঃ সরকার কৃতিত্বের উচ্চশৃঙ্গে আরূঢ় এবং প্রচুর অর্থলাভ করিতেছিলেন, তাহা তিনি ছাড়িয়া দিবেন। চিকিৎসা-সমাজে তাঁহার বিরুদ্ধে কঠিন সমালোচনা আরম্ভ হইল। তাঁহার পুরাতন শিক্ষকগণ, বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, এমন কি কেহ কেহ তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে বলিলেন। কিন্তু ডাঃ সরকার অচল অটল থাকিয়া ১৮৬৮ সালে Calcutta Medical Journal স্থাপিত করিয়া হোমিওপ্যাথি-শাস্ত্রকে তুলিয়া ধরিতে লাগিলেন। এ-বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সহায়ক হইয়াছিলেন বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, যাঁহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এবং তখনকার দিনের আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করেন এবং যাঁহার শ্রীরামকৃষ্ণকে চিকিৎসা করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

এদিকে চিকিৎসাধারা হোমিওপ্যাথি হইতে এলোপ্যাথিতে পরিবর্তন করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Medical Faculty-র সদস্যগণ তাঁহার ঐ Faculty হইতে নাম খারিজ করিবার কথা তুলিলেন। বিরক্ত হইয়া ডাঃ সরকার নিজেই ঐ Faculty হইতে পদত্যাগপত্র দাখিল করিলেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ভারতে বিজ্ঞানের উৎকর্ষের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য ভারতবর্ষ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। নানা বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া একার চেষ্টায় ১৮৭৬ সালে তিনি Science Association স্থাপন করেন। রাজা রামমোহন রায় মহেন্দ্রলালের কিছু আগে দেশে বিজ্ঞান-

শিক্ষাপ্রসারের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, মহেন্দ্রলাল তাহারই বাস্তবরূপ দান করিলেন। এই মহৎ কাজে বাংলার আর এক সুসন্তান বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিলেন এবং 'বঙ্গদর্শন'-এ ভারতের বিত্তশালী লোকদের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন প্রচার করিলেন। মহেন্দ্রলালের বন্ধু এবং হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাসী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও তাঁহার সহিত ভিক্ষার ঝুলি লইয়া জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ও অন্যান্যদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছিলেন। কেশব সেনের সাহায্যে তিনি কুচবিহারের মহারাজার নিকট হইতেও অনেক আর্থিক সাহায্য পাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই Association (Indian Association for Cultivation of Science) হইতেই পরবর্তীকালে স্যর সি. ভি. রমন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। মহৎ উদ্দেশ্য, স্থির লক্ষ্য এবং মনের দৃঢ়তা থাকিলে একার পক্ষে কতদূর সাফল্য লাভ করা যায়, ডাঃ সরকারের ঐ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

রাজনীতিতে তিনি উদারমতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, যে-রাষ্ট্র জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নয়। তিনি শৃঙ্খলার ভিত্তিতে উন্নতি চাহিতেন। শেষজীবনে তাঁহার ধর্মবিষয়ে কিরূপ অভিমত ছিল, তাহার সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় তিনি যে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝা যায়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একসপ্ততিতম জন্মদিবস-পালনের বিবরণীতে পাওয়া যায় যে তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, "Every rational creature ought to thank the Creator every moment of his life for the continuance of his existence which he ows to Him and Him alone." এই দিনে তাঁহার পুত্র অমৃত ও কবি কুমুদ মল্লিক স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কয়েকজন মুসলমান ছাত্র কোরানশরিফ হইতে পাঠ করেন এবং মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার প্রার্থনা পাঠ করেন। মহেন্দ্রলাল ধর্মে গোঁড়ামি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাহাতে ভুল করিয়া অনেকে তাঁহাকে নাস্তিক ভাবিতেন। তাঁহার জীবনযাত্রা ছিল অতি সাধারণ। তালতলার চটি ও সাদাসিদা পোশাকে তাঁহাকে গরীব ব্রাহ্মণের মতো দেখাইত। তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন তাহাই করিতেন। মুখে এক ও কাজে অন্য—এই ভাবকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে এইরূপ দোষের একেবারে অভাবই মহেন্দ্রলালকে তাঁহার উপর সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার জীবনের শেষপ্রান্তে, যখন তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কষ্ট পাইতেন, তখন নিজের সান্ত্বনার জন্য মাঝে মাঝে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত একটি গান হইতে তাঁহার তৎকালীন মানসিক ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

জীবন ফুরায়ে এল, তবু ভ্রম ঘুচিল না।
আলো থাকতে দেখতে পেলে না,
আঁধারে কি করবে বল না।
জ্ঞানচর্চা অনেক হোল,
আসল জ্ঞান কি জন্মিল ;
পাপেতে নিবৃত্তি, ধর্মে প্রবৃত্তি (ঈশ্বরে
ভক্তি) ভুলেও হোল না ;
মানব-জনম বৃথা গেল, একবার ভাবিলে না
এখন আর কি আছে উপায়, সেই জগৎ-
পিতার কৃপা বিনা।
তিনি যে কৃপাসিন্ধু, দয়াময়, দীনবন্ধু,
ডাক তাঁরে প্রাণভরে, হয়ে তন্‌মনা,
তরে যাবে অনায়াসে, মুক্তি পাবে অবশেষে,
স্থির থাক সেই আশে,
করো না কোন ভাবনা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাপ্রাপ্ত এই মহান পুরুষ ১৯০৪ সালে ২৩শে ফেব্রুআরি প্রাতঃকালে নশ্বরধাম ত্যাগ করিয়া বাঞ্ছিতধামে গমন করেন।

আমাদের এক পাহাড়িয়া আশ্রম

স্বামী মহানন্দ

'শ্যামলাতালে' এসে আসর-জমাবার প্রথমেই—এর অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সম্ভার বিদগ্ধ-জনকে এক নূতন চেতনায় সচকিত করে তোলে। আধুনিক সহরের কোলাহল ছাড়িয়ে এখানে এলেই, প্রথমে চোখে পড়ে—যতদূর-দেখা য'য়, কেবল পাহাড় আর পাহাড়। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতন পাহাড়ের ঢেউ কোন্-এক মহান যাদুকরের মায়ার-কাঠির স্পর্শে স্তব্ধীভূত হয়ে প্রহর গুনছে। আর সেই সঙ্গে 'শ্যামলা'র সুন্দর শান্ত, শ্যামল বনানীর নির্জন পরিবেশ দেহ-মনে একটা মধুর শিহরণ জাগিয়ে মানুষের সকল প্রগলভতাকেই দেয় ভাসিয়ে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাঁদের আলোতে চোখ মেললে মনে হবে—এ যেন এক প্রহেলিকা। যেখানে স্বর্ণমৃগের মায়াময় আবেদনের পেছনে ছোটবার প্রয়াস অবশ্য নেই;—কিন্তু দূরের ঐ রহস্যময় শৈলমালা কি এক মৌন-নিরুক্ত আশ্বাসে ধীরে ধীরে জেগে উঠে মানুষকে তাদের অন্তরের গোপন-কথা শোনাতে চাইছে। সেই সঙ্গে উপরের নভোমণ্ডলের ঐ সুতীব্র নীল-রহস্যও মনটাকে এক রসোত্তীর্ণ দাক্ষিণ্যে ভরিয়ে তোলে নিশ্চয়ই।

আশ্রমের পূর্ব-দক্ষিণদিকের প্রবহমানা কল্লোলিনী 'কালী-গঙ্গা'র ('সারদা'র) সঙ্গীতময়ী অববাহিকার স্নিগ্ধ দৃশ্যনিচয়ও মনকে মাতিয়ে তোলে। পূবের 'পুণ্যগিরি'র স্বপ্নবিলাসও পথিককে হাতছানি দেয়। এই সেই 'পুণ্য-গিরি' যেখানকার 'মায়ের-ডাকে' শুধু পাহাড়ীরা নয়, উত্তরপ্রদেশের অনেক লোকই চৈত্রের মধুমাসে তীর্থ করতে আসে এখানে। উত্তরের 'পঞ্চচুল্লী' ও 'নন্দাদেবী'র চিরতুহিনাবৃত শিখরগুলিও আপনাকে জড়িয়ে ফেলতে চাইবে এক অননুভূত অসীমতার ইন্দ্র-জালে। আর পশ্চিমের ঐ পাহাড়শ্রেণীর উপরে সূর্যাস্তের নানা রঙের নকসা ও আলপনা দেখে সকলের মনই এক অনবদ্য ছবির রঙ্ মাখে।

তাছাড়া, আপনি তো শীতে কিছু—শ্যামলাতালে আসছেন না—আর এলেই বা কি—এ-শীতে সর্বাঙ্গে অশথ্-পাতার-শিহরণ নিয়ে জমে যাবেন না নিশ্চয়ই, কেবল কোন-কোন দিন তাপাঙ্ক ৩৭° ফারেন্‌হিটে এসে নামবে। তখন শীতবস্ত্রের আরামে গা-মুড়ে, সকালের মিঠে রোদে এদিকে-ওদিকে স্বচ্ছন্দে বেড়িয়ে বেড়িয়ে এখানকার রঙীন কুয়াশার মধ্যে ফ্রস্টের হীরকখচিত বরফের গুঁড়ো কুড়োবেন। বরফ এখানে পড়ে না—দু-এক-বার একটু পড়েছিল, শোনা যায় মাত্র। তবে মনটা যদি আপনার উদাসী হয়, তাহলে ধ্যানের আচ্ছন্নতায় ডুব দিয়ে—হিমালয়ের অসীম আন্তর-সৌন্দর্যের মহিমায় ভরপুর হয়ে যাবেন এক মজ্‌লিসী কায়দায়। আর তখন এক সহজ আত্মস্থ ভঙ্গীতে সঞ্চয় করে নেবেন—ধ্যান জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

বর্ষা বা গ্রীষ্মকালে এখানে এলে, শত নির্ঝরের এবং সহস্র নবজলধারার অবিশ্রান্ত ঝর ঝর শব্দ, বিচিত্র বিপুল গাছের জমাট জটলার মাঝে ক্রীড়াশীল পত্র-পল্লবের বিরাম-হীন মর্মরবাণী, নানান ফুলের অনির্বাণ মরশুম্

এবং হরেক রকম অজানা পাখীর উঁচু-সুরের নিরবচ্ছিন্ন কূজন, পাইন্-ওক্-'তূণে'র কেমন এক সোঁদা মদির গন্ধ, দমকা হাওয়ায় শুকনো পাতার খেয়ালী করতালি, জঙ্গলী-বনানীপশুর দূরাগত ডাক—সব মিলিয়ে আপনি এক সহজ অভ্যর্থনার ইঙ্গিত পাবেন।

ভরা-গ্রীষ্মে, বেলা দ্বিপ্রহরেও, অল্প শীতের আমেজে, চপল দখিন-বাতাসের কুহক-স্পর্শে, সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়েই, আপনি আরামে চোখের পলক বন্ধ করে ফেলবেন। আর যদি তাকিয়ে থাকেন তাহলে তন্ময় হয়ে দেখবেন—পাহাড়ের গা বেয়ে সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে ফসল-ভরা ক্ষেত নেমেছে আর তাতে লেগেছে হরিতের বন্যা। কাছে গেলে বোঝা যাবে—যব-গমের শীষ পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছে ফুলে। আপেল-ন্যাসপাতিও সোনা হ'য়ে ফেটে পড়ার উপক্রম; আর আখরোট গাছের তলা দিয়ে যেতে যেতে যদি দু-একটা ফল পেয়ে যান তো কথাই নেই—ঐ-ফলের উপরকার শক্ত খোলা উপলখণ্ডে ভেঙে ভেতরের শাঁস খেতে আপনি যখন ব্যস্ত, তখন অভিভূত হয়ে দেখবেন হু-হু করা মলয়ানিল গাছের নূতন-উঠা পাতার গায়ে আদরে হাত বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। উপরে তাকালে দেখবেন—নীল, নবীন-নীল, ঘন-নীল আকাশের অজস্রতা। এবং কখনো যদি দীর্ঘ দিনের অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে এখানকার রাতের-আকাশ দেখবার সখ হয়—সখ হয়ত হবেই—তখন এখানকার অদ্ভুত নীলাম্বরের উদার প্রশ্রয়ে নক্ষত্রেরও আলোক-দ্যুতি দেখে অবাক হবেন। আর যদি কখনো নিঃশব্দ, গভীর রাতে ঘুমকে তাড়িয়ে খোলা-জানালার ভেতর দিয়ে -সুদূর আকাশে দৃষ্টি মেলে—অর্ধসচেতন ভাবে—হঠাৎ চাঁদকে দেখে ফেলেন—তাহ'লে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটবে—এখানকার চাঁদের সুতীব্র আলোকে হকচকিয়ে ভুল করে ভাববেন—কোন স্বর্গের বাসিন্দা এক টর্চের আলো আপনার দিকে বুঝি নিশানা করেছে। ঘরছেড়ে সেই নিস্তব্ধ রাতে বাইরে বেরিয়ে এলে, বিস্মিত হয়ে দেখবেন - বিজন বনানীতে ঐ উদাসী চন্দ্রালোক ঝিল্লীর ঝঙ্কারের তানে উৎফুল্ল হয়ে কুয়াশার জাল বুনে চলেছে।

এখানকার ভরা বর্ষার 'শ্রাবণ-সজল-সাঁঝে', ফুলের অপূর্ব-সম্পদময় সম্ভার আপনার মনের সঙ্গে ঠিকই মিতালি পাতাবে। আর আকাশের দিগ্দিগন্ত ঘিরে ক্রন্দসীর আকুল ঘনবেদনা আপনারও উধাও-মনে আধ্যাত্মিক চেতনার এক বরুণ-বলাকা টেনে নিয়ে আসবে নিশ্চয়ই। তখন মাঝে মাঝে দিবা-ভাগেও আপনার খোলা জানলা দিয়ে মেঘপুঞ্জের (পাহাড়ী ভাষায়, 'হাওলা'র) ছায়া-মিছিল হঠাৎ ঘরে ঢুকে মেঘলোক সৃষ্টি করে আপনাকে চুপিসারে এসে বলবে—"তুমি আর বাইরে দেখোনা, বন্ধু। মনের খিল খুলে মহানের চিন্তায় মেতে ওঠ। সকল পার্থিব কাম্যবস্তু ফেলে, নশ্বর চাওয়া-পাওয়া ছাড়িয়ে, তোমার পাথেয় এখানেই কিছু যোগাড় করে নাও, সখা। এখানকার গোপন সিন্দুক খুলে আধ্যাত্মিক ধন-দেউলের কিছু আহরণ কর। ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে দিব্য-জ্যোতির সেই শক্তিকে সংগ্রহ কর যার অভাবের কথা স্মরণ করেই উপনিষদের ঋষিপত্নী বলেছিলেন: যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্ (যাতে অমৃতের আস্বাদন নেই, তা নিয়ে আমি কি করব)। হে পথিক, তুমি আমারি মতন সমুদ্রকে পাবার জন্য—ভূমাকে লাভ করবার জন্য, অতৃপ্তি জাগিয়ে অঝোরে কাঁদ, তবেই তোমার শ্যামলাতালে আসা সার্থক

হবে।"

তাই বলি, "শ্যামলা"র ভৃঙ্গারে আনন্দ-উৎসের আর শেষ নেই।

কয়েকদিনের 'মুসাফির' হলেও আপনার এই আশ্রমের ইতিহাস জানতে ইচ্ছা হবে। তার সবিস্তার আলোচনার দিকে না গিয়েও অতি সংক্ষেপে বলা যায়:

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের ভারতে প্রথম সন্ন্যাস-যজ্ঞে দীক্ষিত চারজন সন্ন্যাসীর অন্যতম স্বামী বিরজানন্দের (কালীকৃষ্ণ মহারাজের) জন্ম হয় কলকাতায় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন, মঙ্গলবার সকাল ৮টায়—৺জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পুণ্যদিনে। গৃহের নিশ্চিন্ত আরাম ভাল লাগে না, তাই কালীকৃষ্ণ মহারাজ বরাহনগর মঠে যাতায়াত আরম্ভ করলেন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাস থেকেই। এবং কয়েকমাস পরেই মা-বাবার অনুমতি নিয়ে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে যোগ দিলেন; তখন তাঁর বয়স সতের বছর হতে চলেছে এবং এনট্রান্স পাস করে এফ্. এ. পড়ছেন কলকাতার রিপন কলেজে। ১৮৯৩ খৃঃ গ্রীষ্মান্তে শ্রীশ্রীমা সারদামণি তাঁকে মহামন্ত্র দান করেন। তিনিই পরে ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৫১ সালের ৩০শে মে পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষষ্ঠ সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন।

নানান কর্মব্যস্ততার মধ্যে সাধনভজনের শিখাকে অম্লান জ্বালিয়ে রাখার প্রয়াসে স্বামী বিরজানন্দ হিমালয়ের এই নিভৃত কোণে তপস্যানুকূল "শ্যাঁলা" গ্রামের একটুকরা পাহাড়ী জমি ও ভাঙা বাড়ী কেনেন ১৯১৪ সালে। এবং পরে, সেদিনকার সামান্য সঙ্গতিতে গড়ে তোলা তাঁর সেই কবিত্বপূর্ণ নামকরণ ['শ্যাঁলা'কে 'শ্যামলা' এবং তার কিছু নীচের 'তাল' (হ্রদ) জুড়ে—শ্যামলা-তাল] নিয়ে—ঘটনাস্রোতে, নানাভাবে রূপ ও সজ্জা বদলিয়ে, আজকের 'শ্যামলাতাল' আশ্রম আপনার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হবার পরও এখানে স্বামী বিরজানন্দ বহুবার এসেছেন তাঁর নিভৃত সাধনের দিন কাটাতে। শেষবার যখন এখান থেকে চলে যান তখনকার তারিখ হচ্ছে ৩রা মে, ১৯৫০। শরীর তাঁর তখন খুবই অসুস্থ। পীড়ার উপসর্গগুলি অক্টোপাসের মতো ভয়াবহরূপে তাঁর নশ্বর দেহকে তখন আঁকড়ে ধরেছে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আর ফিরবেন না। তাই অনাড়ম্বর অথচ পরিচ্ছন্ন গৃহসজ্জা সেই ভাবেই রাখতে বললেন। তাঁর বাংলোর নীচে বাহকরা ডাণ্ডী নিয়ে তখন অপেক্ষা করছে। মহারাজকেও পাহাড়ীদের এই শেষ দর্শন। বেলা তখন দুটো বেজে দশ মিনিট—বিরজানন্দজী ধীর মন্থর পদক্ষেপে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলেন। গাছে একটা পাখী ডাকছিল উদাসী ভৈরোঁর করুণ গুঞ্জন তুলে। সেবককে বললেন—"শুনছিস, কেমন মিষ্টি ডাকছে?" আস্তে আস্তে মহারাজ ডাণ্ডীতে এসে উঠলেন—'জয়, গুরু মহারাজজীকী জয়' ধ্বনি দিয়ে বাহকেরা ডাণ্ডী কাঁধে তুলে নিল। দেওদার বেষ্টিত তাঁর বহুস্মৃতি-বিজড়িত বাংলোটি নাটকীয় স্তব্ধতায় পেছনে দাঁড়িয়ে রইল—চিরবিচ্ছেদের কি-এক অব্যক্ত ইঙ্গিত পেয়ে। আর ও-ধারে "সুখীঢাং"-এর পাহাড়িয়া সর্পিল পথের জঙ্গল রেখার গভীর গহনের বাঁকে তাঁর বড় বড় চোখের সরল, উদার, বিদ্যুৎ-ঝলকান দৃষ্টি ক্ষণিক জ্বলে উঠে চিরদিনের মতো ঘনবেদনায় হারিয়ে গেল।

প্রতিষ্ঠাতার সুসংক্ষিপ্ত জীবনী জানার পরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্যামলাতালের বর্তমান গৃহাদির জীবনপ্রবাহও আপনার জানবার ইচ্ছা হবে স্বাভাবিক কারণেই। তালের বা হ্রদের দিক থেকে চড়াই করে এখানে এসে উঠলেই প্রথমে যে বাড়িটা চোখে পড়বে ওটাই হ'ল এই পিপাসার্ত আশ্রমের "বিরজানন্দ-জলাধার", ওখানে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার গ্যালন জল রয়েছে। এটা তৈরি শেষ হয়েছে ১৯৭০ সালে বর্তমান শ্যামলাতাল কর্মাধ্যক্ষের অতন্দ্র পরিশ্রমে। তার পাশেই ঐ একতলা বাড়িটা গবাদি পশুর চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট। তার কাছেই ঐ উত্তর-পূর্ব দিকের সুন্দর দোতলা বাড়িটা হ'ল - হাসপাতাল, যার নাম 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম'। এর উত্তরে একটু নীচে যে দোতলা বড় বাড়িটা রয়েছে তার নাম 'বিবেকানন্দ আশ্রম'—বর্তমান অগাধ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন নিয়ে আকার ও রঙ বদলাচ্ছে। এই আশ্রম-বাড়ির পশ্চিমে একটু ওপরের আবাসগৃহটির নাম 'ব্রহ্মানন্দ-ধাম'। এরই সুমুখের রাস্তা দিয়ে প্রথমে পশ্চিমে ও পরে উত্তর দিকে গেলে, ঐ যে পাইনঘেরা নির্জন দোতলা বাড়িটা 'বিরজানন্দ-স্মৃতি'র আকুলতা নিয়ে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরই এখনকার নাম —'বিরজানন্দ-ধাম'। বিরজানন্দ-ধামের পূবের দোতলা গৃহটির নাম, 'বিবেকানন্দ-ধাম'। এবং এরই কিছু পূবের ঘরগুলি হ'ল গোয়ালঘর এবং তার উপরে একটি বাসগৃহের নাম 'ভগবতী-ধাম'। মহারাজ নিজে খুব ফল-ফুলের গাছ লাগাতে ভালবাসতেন। তাঁর স্বহস্তরোপিত আম, আখরোট, আলুবকরা, আপেল, ন্যাশপাতি, পাইন প্রভৃতি গাছের সমারোহের মধ্যে এখন আবার নানানজাতীয় বহু গাছ-গাছড়া এই নূতন আবহাওয়ায় নিজেদের মানিয়ে নিয়ে সুখে সহাবস্থান করছে। পুষ্পবৃক্ষের সংগ্রহও এখন এখানে অভাবনীয়-রূপে গেছে বেড়ে। প্রায় ২৫০ রকমের অভিজাত গোলাপ, ১৫০ রকমের ক্রিসান্থিমাম, ৪০।৪৫ রকমের গ্ল্যাড়িয়োলিস, ২৫০ রকমের ডালিয়া, ৩০।৪০ রকমের লিলি এবং আরো এটা-ওটা-সেটা গ্রীষ্ম ও বর্ষায় প্রস্ফুটিত হ'য়ে আশ্রমের সুপরিচ্ছন্ন পরিবেশকে মনোরম করে রাখে।

শেষে এসে আবার বলি: পৃথিবীর সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে হিমালয়ের একান্ত নিভৃতে এই আশ্রমটির অন্তরতম প্রদেশ ঘিরে এখনো কেমন-এক মুগ্ধ তন্ময় ভাব। মনে হয় যেন হঠাৎ কোন প্রিয়-স্মৃতির ছবি আশ্রমটির মনের গতিরোধ করায় সে যেন থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তবে এই আশ্রমটি তার দীর্ঘদিনের জীবন-বন্ধু স্বামী বিরজানন্দজীর স্থূল শরীরের সান্নিধ্য হারিয়ে একটা অভাব বোধ করছে নিশ্চয়ই। তা সত্ত্বেও, মাঝে মাঝে যখন খেয়ালী হাওয়ায় ভেসে আসা চল্‌তি-মেঘ (হাওলা) আশ্রমটিকে জড়িয়ে তার মৌন ব্যথিত দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেয় তখন তার হয়ত সেই বিরজানন্দ-স্মৃতি মনে পড়ে—যিনি তাঁর আধ্যাত্মিক উজ্জ্বলতার ছোঁয়া দিয়ে তাঁর নিষ্কম্প দীপশিখার মতো চিরপ্রদীপ্ত স্বকীয়তাটি তুলে ধরে থাকতেন সকল সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে। শিশুর মতো সরল ও মধুর হাসি ছিল তাঁর মুখে, যা একমাত্র অন্তরের পরম-আনন্দের প্রসন্ন প্রতিফলনটুকুরই দ্যোতক। ভূমার গতিপথে ছিল তাঁর যাত্রা। "পৃথিবীর বাপী-কূপে অগস্ত্যের পিপাসা মেটে না"—তাই তিনি স্বল্পকে ছেড়ে ভূমায় চলে গেলেন। আর তারই রেশ ধরে আশ্রমটি

যেন বারবার জিজ্ঞাসা করে—

'পথিক, এখানে এসে, এখানকার অন্তরের সৌন্দর্য-দেউলের সকল কথা কি আপনার জানা শেষ হয়েছে? কখনো কি তা শেষ হয়! শুধু শেষ কথা শোনাবার জন্য, তথা নিজ-জীবনের শেষ কথাটি বোঝবার জন্যই তো আপনার এখানে আসা। যে কথার সুরে হৃদয়ের অনাহত তারে অহরহ ফুটে উঠছে—

তবু একদিন আশাহীন পন্থ, রে—
অতি দূরে দূরে, ঘুরে ঘুরে, শেষে ফুরাবে।
দীর্ঘ ভ্রমণ, একদিন হবে অস্ত, রে—
শান্তিসমীর শ্রান্ত শরীর জুড়াবে।'

এ সবের পরও কি, পথিক, আপনার চিন্তার তটে কিছু ঢেউ লাগল? না লাগুক—তবুও ঐ ঢেউ গোনার জন্যই তো আপনার শ্যামলাতালে আসা সার্থক। 'শ্যামলা' তো ঐ জন্যই অতুলনীয় !!

এখানে

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

এখানে বাতাসে গন্ধ বিলায় আকন্দফুল,
অন্তহীনের স্বপ্নে মগ্ন শূন্যনীল,
এ চরে সোনালী হাওয়ায় দুলছে দোদুল দুল
কাশের গুচ্ছ, তিৎপল্লার হলদে ফুল।
অন্তহীনের স্বপ্নে মগ্ন—শূন্যনীল,
কূলে কূলে ভরা অথই ঝিল!

এখানে বাতাসে গন্ধ বিলায় আকন্দফুল,
বনকলমীর দলে ছেয়ে গেছে অনেক জল,
কেঁয়ে ঝাঁকা আর সাঁইবাবলার কী জঙ্গল,
বনকচুফুলে শিস শুনে জাগে ভুঁইকমল!
নদীর প্রান্তে বাতাসে দুলছে দোদুল দুল
চাঁদাঘাসদের বেগুনীফুল:
বাবুইয়ের কত বাসস্থল!

এখানে বাতাসে গন্ধ বিলায় আকন্দফুল,
নটকান আর শিমুল ধুঁধুল—মাটিতে চিড়।
পালতে মাদার বাগানে লালের কী সমাবেশ,
গাঙশালিকেরা কচি বাঁশবনে ছিন্নমূল!
বাবলাগাছের ফুলে ভরা ডালে ফিঙের ভিড়,
বট-অশথের ছায়ায় বাউল-গানের রেশ।
অন্তহীনের স্বপ্নে মগ্ন—শূন্যনীল,
আয়নার মতো ঝকঝক করে সিন্ধু-ঝিল!

ধর্ম ও সমাজ

শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়

যে কোন বিষয়কেই বহু দিক থেকে বহু দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখা যেতে পারে। এক জনের এক সময় এক ভাবে দেখাই বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে না। তাই এক বিষয়ে বহু জনের আলোচনার সার্থকতা। উপস্থিত এ বিষয়টি আমি যেভাবে দেখতে চাইছি তা সংক্ষেপে বলি।

আমি সমস্ত বিষয়টিকে খুব সরলভাবে দেখতে চাইছি। অর্থাৎ ধর্ম কি, সমাজবাদ কি, আর তাদের সম্পর্কটা কেমন বা আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কি না।

আমরা ধর্ম শুনলেই religion-এর সঙ্গে তাকে সাধারণতঃ মিশিয়ে ফেলি। আমার মনে হয়, সেটা আদৌ ঠিক নয়। Religion-এর সঙ্গে সংস্কৃতে বা বাংলাতে ভাবের মিল আছে এমন শব্দ যেটি সেটি 'ধর্ম'। আমাদের চতুর্বর্গের চিন্তায় আছে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এখানে ধর্মটা কিন্তু মোটের ওপর ভোগ – ইহলোকে ভোগ, পরলোকে ভোগ। এই ভোগটা ঠিক হয় অর্থ ও কাম (কামনা)-কে সুসংযত রাখলে, নিয়মের মধ্যে দিয়ে চালালে, কর্তব্যের মধ্যে বাঁধলে। এই সংযম, এই চালনা, এই কর্তব্যের নামই ধর্ম।

মহাভারত তাই ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন :

ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

যা ধারণ করে তাই ধর্ম। তাই প্রজাগণকে ধর্মই ধারণ করে। এইখান থেকেই আমরা ধর্মের সঙ্গে সমাজবাদের যোগটা খুঁজে পাই। এই প্রজাবর্গই তো সমাজ। আর সেই সমাজকে যে ধরে রাখে সংযমের মধ্যে দিয়ে, সুপরিচালনার মধ্যে দিয়ে—তাকেই বলি ধর্ম। তাই মোক্ষমার্গী ব্যক্তির সঙ্গে ধর্মশীল সামাজিকের তফাত।

সমাজ একটি অদ্ভুত সংগঠন। এটি একটি সমগ্র যার এককে পাই ব্যক্তিকে। কিন্তু ব্যক্তির সমাহার মাত্রই সমাজ নয়। সমাজ বৌদ্ধ মিলিন্দপঙ্‌হোর রাজা ভদন্তসেনের রথের মত।—রথ যেমন শুধু চাকা নয়, লাগাম নয়, অশ্ব নয়, রথী নয়, রথাসন নয়, আবার সবগুলির সংযোগ নয়, অথচ এই সবগুলির সংযোগের ওপর যেন একটা কিছু নিয়ে রথ, তেমন সমাজেও বিচিত্র ব্যক্তির সমাহারের ওপর আর একটা কিছু আছে যার যোগই হয় সম্বদ্ধ সমাজ। বিখ্যাত ঐতিহাসিক Dr. Toynbee-র ভাষায় তাই :

"The human social animal's relation to his society is evidently not that of an arithmetical integer to an arithmetical sum." এই যে নিছক যোগফলের ওপরের জিনিসটা যা সমাজকে সত্যিকারের গড়ে তোলে তাই হল ধর্ম। Animal (পশু) social (সামাজিক) হলেই human (মনুষ্য) হয়। ঠিক এই কথাই আমাদের শাস্ত্র বলছেন :

"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
একো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

পশুত্বের ওপর মানুষকে যা সামাজিক করে তাই ধর্ম। আর এ ধর্মের ফল যদিও ভোগ, মূল কিন্তু ত্যাগ। পশু শুধু নিজের অস্তিত্ব দেখে। মানুষ যতক্ষণ সামাজিক নয় ততক্ষণ স্বার্থপর। সামাজিক মানুষ স্বার্থত্যাগ করলেই তবে গড়ে ওঠে সমাজ। তাই সমাজবাদ (সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র নয়—সরলতম অর্থে) প্রতি সামাজিকের ভোগ-সরঞ্জাম যোগালেও তাকে ত্যাগের পথেই উদ্বুদ্ধ করে যা ছাড়া সমাজই হয় অচল। আর এই পথের নামই ধর্মের পথ।

Social Evolution গ্রন্থে সমাজতত্ত্ববিদ্ Kidd ঠিক অনুরূপ মন্তব্য করেছেন: "A difference in his (man's) case is that by the possession of reason he has become equipped with the power to obtain satisfaction of such instinct without entailing the consequence." এখানে দেখা যাচ্ছে reason ধর্মের স্থান নিয়েছে। আর দেখতে পাই আমরা ধর্মের যে সংজ্ঞার আলোচনা করছি তা বিচার, যুক্তি ও কর্তব্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। Kidd-এর কথাগুলি যেন পূর্বোক্ত শ্লোকের প্রতিধ্বনি। ধর্ম বা বিচারবোধ মানুষের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ক্ষমতা, যা তাকে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সুসংযত ভোগের অধিকার দেয়। কাজেই সমাজে যে নিয়ন্ত্রণ, সংযম ও ত্যাগ দরকার—যা ছাড়া কোন সমাজই গড়ে উঠতে পারে না—তা আসে এই বিচারবোধ বা আমাদের সংজ্ঞিত ধর্ম থেকে। কাজেই এই বিচারে ধর্ম ছাড়া সমাজের অস্তিত্বই আসে না। আবার সমাজ ছাড়া ধর্মের কল্পনাও করা যায় না।

সমাজ শুনলেই সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদে লাফিয়ে পড়ে ধর্মের ('religion' এই অর্থে) সঙ্গে সংগ্রাম করার প্রয়োজন দেখি না। আমাদের আলোচনার সমাজবাদ যদি 'socialism'-ও হয়, তবে কিন্তু তা নিছক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির বিপরীত গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষের সমাজকে ইঙ্গিত করে। অন্ততঃ স্বামী বিবেকানন্দ এই অর্থেই 'socialism'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। অর্থনীতির দিক থেকে ধনতন্ত্রবাদের বিপ্রতীপ হয় সমাজতন্ত্রবাদ (socialism)। কিন্তু সমাজবাদকে (socialism) সমাজতত্ত্বের বিচার থেকেও দেখা যেতে পারে। এইখানেই সমাজ গড়ে ওঠা ও তার বাঁধন বজায় রাখার প্রশ্ন। আর আমাদের আলোচিত ধর্মেরও প্রয়োজনীয়তা ঠিক সেইখানেই। স্বামীজী বলেন: "The doctrine which demands the sacrifice of individual freedom to social supremacy is called socialism, while that which advocates the cause of the individual is individualism."

যে সমাজে ব্যক্তি বড় হয়ে ওঠে সে সমাজ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। অর্থাৎ সেখানে এই ধর্মবোধের অভাব। এবং তাই এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক (individualistic) সমাজ বস্তুতঃ সমাজ হিসেবে স্ববিরোধী সংজ্ঞা। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির আর প্রত্যেক অংশের—তারা সমগ্র সমাজদেহের প্রয়োজনীয় পরিপূরক এই বোধ থেকে—ত্যাগ ও সংযমের মধ্যে দিয়ে (ধর্মবোধের পথে) এগিয়ে যাওয়াই (socialistic) সমাজবাদ বা সমাজের তত্ত্ব। আমাদের দেশের সমাজবিদ্‌রা ঋক্, যজুঃ ও অথর্ববেদে তাই বলেছেন:

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাম্ শূদ্রো অজায়ত॥"

এখানে সমগ্র সমাজদেহকে সমাজপুরুষের রূপ

দেওয়া হয়েছে। সে পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, উরু বৈশ্য ও পা শূদ্র। একটি সচল বিচারপূর্ণ ও কর্মক্ষম জীবদেহের যা প্রয়োজন এই সমাজপুরুষে তাই আরোপ করা হয়েছে। এই কল্পনায় শূদ্রকে নীচে ফেলার জল্পনা হাস্যকর। কারণ, এ সমগ্র জীবদেহে (organic whole) মুখ বা জ্ঞানের যেমন প্রয়োজন (যাকে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ), তেমনই প্রয়োজন সোৎসাহ কর্মপ্রযত্নের বাহু (যা ক্ষত্রিয়), আবার সেইভাবেই প্রয়োজন এই সমাজদেহ-বহনক্ষম উরু (কিনা বৈশ্য) আর সমাজের সচলতার প্রতীক পাদস্বরূপ শূদ্রকুল। এই অংশগুলির যৌথ সহযোগ ও স্বপ্রাধান্য-ইচ্ছাত্যাগ ভিন্ন সমগ্র সমাজদেহ কখনই প্রাণবান্, বর্ধিষ্ণু ও সুস্থ হ'তে পারে না। এই ত্যাগ ও সহযোগিতাই ধর্মের মূল কথা আর তাই সমাজবাদ বা তত্ত্বের কেন্দ্রস্বরূপ।

আমাদের বিচারে তাই ধর্ম ও সমাজবাদ পরস্পরবিরোধী তো নয়ই, বরং ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত এবং একে অপরের অস্তিত্ব ছাড়া মূল্যহীন। অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রত্যেকের পরি-পূরক। সমাজ না থাকলে ধর্ম নিরর্থক আর ধর্ম ভিন্ন সমাজও অসম্ভব।

মা আমার আসবে ব'লে

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

মা আমার আসবে ব'লে চেয়ে থাকি শেফালির দিকে,
চেয়ে থাকি শরতের সৌন্দর্যের পানে :
আমার মায়ের স্নেহ সবুজের আলপনা এ কে
আমাকে বুঝিয়ে দেয় মা রয়েছে সুন্দরের তানে !

দিনের ললিত ভঙ্গী আবার আসুক ফিরে কাছে :
মার কাছ থেকে আজ অনেক আনন্দ নিয়ে এসে
ছড়িয়ে পড়ুক চারিদিকে ; সব মন জেগে উঠে
জীবনের আহরণ ক'রে নিক নতুন আবেশে।

জীবনকে নিতে হয় বার বার মার কাছ থেকে,
স্নেহের মণ্ডপে গিয়ে পূজার প্রণামে
বিনম্র হৃদয়টুকু ঢেলে দিয়ে বলতে হবে তাঁকে—
'সব উজ্জ্বলতা নিয়ে এসো মাগো সন্তানের ধামে !'

আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচার

ডক্টর মুরলীমোহন বিশ্বাস

এক সময় আমেরিকায় শিকাগো সম্মেলনে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কয়েক মিনিট বক্তৃতা দেবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে সুপারিশ খুঁজতে হয়েছিল। আর হালে কারল্ টমাস্ জ্যাকসন নামে এক আমেরিকান ইতিহাসে প্রি-এচডি ডিগ্রীর জন্য থিসিস লিখেছেন 'The Swami in in America—A History of the Ramakrishna Movement in the United States 1893-1960' এই বিষয়ের উপর। এ-থিসিস ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লস অ্যানজেলেস্ ক্যাম্পাসে জমা দেওয়া হয়। রামকৃষ্ণ-প্রচারের ফলে আমেরিকায় বর্তমানে প্রধানত: চৌদ্দটি বেদান্ত-প্রচার-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সবই ভারতে বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারা পরিচালিত। এসব বেদান্ত সোসাইটিতে উপনিষদ্, গীতা, বাইবেলের ক্লাস হয় নিয়মিত। তাছাড়া হয় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, খৃষ্ট, বুদ্ধাদির উৎসব।

আমেরিকায় 'টেম্প্লের' গড়ন চার্চের মতো। ভারতীয় প্রথায় নাটমন্দির ও গর্ভমন্দির বলে কিছু নেই। আছে লম্বা হল। ভিতরে দুপাশে সারিবন্দি চেয়ার আর মাঝে যাওয়া-আসার একটু রাস্তা। মেঝে কারপেট দিয়ে ঢাকা। হলের সামনে আড়াআড়ি ডায়াস। ডায়াসে রয়েছে কোনো টেম্প্লে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি, কোথাও বা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর ফটো। আর রয়েছে বক্তৃতা দেবার জন্য টেবিল চেয়ার ইত্যাদি টুকিটাকি সাজসরঞ্জাম। এই হলো টেম্প্লের মোটামুটি ছবি।

হারভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন বোস্টন সহরে 'দি রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি' দেখার সুযোগ হয়েছিল। সোসাইটি চারল্স্ নদীর ধারে, ৫৮ নম্বর ডিয়ারফিল্ড্ স্ট্রীটে। এখানে স্বামী সর্বগতানন্দজী অন্য দিনের ক্লাস ছাড়াও রবিবার সকাল এগারোটার সময় 'সানডে সারভিস' পরিচালনা করেন, যেমন চার্চে সানডে সারভিস হয়। সারভিসে যে-কোনো মতবাদের ব্যাখ্যা বেশ সর্বমতাপন্ন, উদার ও হৃদয়স্পর্শী হয়ে ওঠে। স্থানীয় ভারতীয়রা ক্লাসে রীতিমতো যোগদান করেন। যে-স্তব পাঠ করে সারভিস সমাপ্ত করা হয় তা হলো,—

"May He Who is Father-in-heaven of the Christians, Holy one of the Jews, Alla of the Muslims, Buddha of the Buddhists, Tao of the Chinese, Ahura Mazda of the Zoroastrians, and Brahman of the Hindus lead us from the unreal to the real, from darkness to light, from disease and death to immortality. May the all-loving Being manifest Himself unto us and grant us abiding understanding and all-cousuming divine love.

Peace, peace, peace be unto all."

"তুমি খৃষ্টানদের স্বর্গস্থ পিতা, ইহুদীদের পবিত্র আত্মা, মুসলমানদের আল্লা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, চীনাদের তাও, পার্শীদের আহুর মাজদা

এবং হিন্দুদের ব্রহ্ম; তুমি আমাদের অসৎ হইতে সতে, অন্ধকার হইতে আলোকে, মৃত্যু হইতে অমৃতে নিয়ে যাও; প্রেমস্বরূপ তুমি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে আমাদের নিত্য জ্ঞান ও সর্বাত্মক প্রেমের অধিকারী কর। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।”

এ-প্রার্থনা যে-কোনো পথে একই গন্তব্যে পৌঁছনোর ইঙ্গিত। এ-ধরনের সানডে সারভিসে কোন্ ধর্মের লোক না এসে পারে? কে না বলতে চায়,—অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।

শিকাগোতে থাকার সময় ৫৪২৩ নম্বর সাউথ হাইড পার্ক বুলেভারডে ‘বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি’ ও ‘বিবেকানন্দ টেম্প্ল’-এ গিয়েছিলাম। স্বামী ভাষ্যানন্দজী এখানকার সানডে সারভিসে পৌরোহিত্য করেন। টেম্প্লের দু’একখানা বাড়ীর পরে ‘সারদা কুটির’ নামে আশ্রমের আরেকটি বাড়ী। বাড়ীটিতে ছোটদের জন্য লাইব্রেরী ও পড়াশুনা করার ব্যবস্থা রয়েছে। সারভিসের সময় মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের সারদা কুটিরে রেখে যান। ফলে ক্লাসে গোলমাল হয় না। ছেলে সামলাবার জন্য মা-বাবাকে অন্যমনস্ক হতে হয় না। অনেক চার্চে এ-ধরণের ‘বেবিসিটিং’-এর ব্যবস্থা রয়েছে। সারভিসের পর সোসাইটির তরফ থেকে একজন একটি ডালা প্রত্যেকের সামনে বাড়িয়ে দিতে দিতে চলে যান। ডালাতে যার যে-রকম খুশি অর্থ দেন। এই-ই এদেশের প্রথা। এ-প্রথা বেদান্তপ্রচারের সব কেন্দ্রে চলে। চার্চেও রয়েছে। আমাদের দেশের চল অবশ্য অন্য। প্রণামী নির্দিষ্ট বাক্সে বা রেকাবে কি মনিঅর্ডার করে দেওয়ার রেওয়াজ। সারভিসের পর স্বামীজী অডিটোরিয়মের বাইরে এসে দাঁড়ান। আর অভ্যাগতরা একে একে বেরিয়ে এসে তাঁকে অভিনন্দন করে যান। কেউ দু-এক মিনিট আলাপ-আলোচনা করেন, বা ক্লাসের বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু প্রশ্ন করেন। কেউ বা কোনো বিষয়ে উপদেশ চান। এদেশের সারভিসের এরকম রীতি। সেদিন ছিল গুরু-নানকের জন্মদিন। সানডে সারভিসের পর ভাষ্যানন্দজী ভারতীয়দের দিয়ে সারদা কুটিরে নানকের জন্মদিনপালনের জন্য ক্লাস করতে গেলেন। ভারতীয়রা বিদেশে থেকেও এসব সোসাইটির মাধ্যমে নিজেদের ধর্মের আচার পালন করতে পাচ্ছেন। বিদেশ-বিভুঁয়ে এসব জায়গায় যেন একটা আঁতের টান খুঁজে পান।

শিকাগো থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে এ সোসাইটি আশি একর জমি কিনেছে। এখানে আশ্রম ও ‘রিট্রিট’ তৈরী হচ্ছে। রিট্রিটে ভক্তেরা কয়েকদিনের অবসর নিয়ে সাধন-ভজন করতে পারবেন। অনেক চার্চেরও রিট্রিট রয়েছে। আমাদের দেশের কোন কোন আশ্রমে যেমন গৃহস্থেরা দিনকয়েকের জন্য বসবাস করে মনটাকে তাজা করে নিয়ে আসতে পারে, ওদেশে আশ্রমে বা চার্চে সেরকম থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া নেই কাশী কাঞ্চী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, হৃষীকেশ। এদেশে চলে পিলগ্রিমেজ, ওদেশে টুরিজম্। যে জায়গায় রিট্রিট হচ্ছে—তার নাম গ্যানজেস টাউন। এ নাম অবশ্য বহুদিন থেকে চলে আসছে। এক স্বামীজীর কাছে নামটির ইতিহাস শুনলাম। বহু পূর্বে ওখানকার এক গভর্নর ভারতবর্ষে আসেন। তাঁর ‘গ্যান্জেস’ ও ‘নির্বাণ’ কথা দুটি ভাল

লাগে। তাই নিজেদের দেশে এ নামে দুটি জায়গার নাম দেন। সেই থেকে স্থানটির নাম গ্যান্‌জেস টাউন। নিকটেই নির্বাণ নামে শহর।

ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বারকূলে ক্যামপাসে থাকাকালীন বারকূলে-র বেদান্ত সোসাইটি ও সানফ্রানসিসকো শহরে 'বেদান্ত সোসাইটি অফ্ নরদার্ন ক্যালিফোরনিয়া' যাই। সানফ্রানসিসকো শহরে দুটি টেম্‌প্‌ল রয়েছে। একটি পুরনো,—২৯৬৩ নম্বর ওএবস্‌টার স্ট্রীটে; অন্যটি নূতন তৈরী, ২৩২৩ নম্বর ভালেহো স্ট্রীটে। দু-জায়গাতেই ক্লাস হয়। নূতন টেম্‌প্‌ল সমন্বয়ের মন্দির। বেদীতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী, যীশুখৃষ্ট ও বুদ্ধের মূর্তি। মা ও ঠাকুর মাঝে। ঠাকুরের ডাইনে বিবেকানন্দ, মায়ের বাঁয়ে বুদ্ধ, বিবেকানন্দের ডাইনে খৃস্ট। বেদীর সামনে যথারীতি লম্বা হল। পৃথিবীর আর কোনো স্থানে সর্বধর্মভাবসমন্বিত মন্দির আছে কি-না জানা নেই, তবে দেখা যাচ্ছে ধর্মজগতে মানুষের চিন্তাধারার গতির অগ্রগতি। এক সময় এক ধর্মের লোক দলবেঁধে অন্য ধর্মকে ছোট প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। এর জন্য তর্কবিতর্ক করেছে; যুদ্ধবিগ্রহও হয়েছে। আজ পৃথিবীর অন্তত এক জায়গায় দেখলাম বিশ্বমন্দির তৈরী হয়েছে, যেখানে জনসাধারণ নির্বিচারে যাওয়া আসা করে। যাই হোক, নূতন মন্দিরের আশ্রম এলাকার দুটি ভাগ। মন্দির, লাইব্রেরী, অফিস, বই-বিক্রী কেন্দ্র ও লবী নিয়ে একভাগ। এখানে সকলের অবাধ গতি। এর সংলগ্ন সাধুব্রহ্মচারীদের থাকার ঘর; ভিতরে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। সুদূর ভারতবর্ষ ছেড়ে আমেরিকায় সাধুব্রহ্মচারীদের মঠ দেখার কৌতূহল চাপতে না পেরে অনুরোধ জানাতেই মঠাধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দজী রাজী হলেন। ভিতরে একটি ছোট ঠাকুরঘরও রয়েছে। সাধুব্রহ্মচারিগণ এখানে নিজের ভাবে পূজা জপ ধ্যান করেন। এ সোসাইটিরও অলিমা নামে এক জায়গায় 'বেদান্ত রিট্রিট' তৈরী হচ্ছে।

বিশে ডিসেম্বর (১৯৭০) মায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে সানফ্রানসিসকোর নূতন মন্দিরের উৎসব হল। অবশ্য প্রায় সব আশ্রমেই কিছু না কিছু প্রোগ্রাম হয়েছে।

যে-সেক্রেটারী সানফ্রানসিসকো আশ্রমের এই উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র লিখেছেন—তিনি কোন সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী নন। এডিট সুলে নামে এক ভক্ত মহিলা। এখানে মেয়েরা আশ্রমের বহু কাজ করেন। অফিসের কাজ ও লাইব্রেরী চালান, বই বিক্রী করেন, অতিথি-অভ্যাগতের সঙ্গে কথা বলেন, উৎসবের বন্দোবস্ত ও পূজোর কাজ কর্ম করেন। এমন কি অনেকে যথাসর্বস্ব আশ্রমে দান করে দিয়ে দীনভাবে জীবনযাপনও করছেন। প্রায় সব আশ্রমে মেয়েরা অনেক কিছু কাজ চালান।

নিমন্ত্রণচিঠিতে আশ্রমের ঠিকানা Vallejo স্ট্রীট বলে লেখা আছে। Vallejo-র উচ্চারণ ভালেহো। শব্দটি স্প্যানিশ। এ ভাষায় জ-কে হ বলা হয়। San Francisco শব্দের San-ও স্প্যানিশ; অর্থ সেন্ট। আর Santa কথার অর্থ মহিলা-সেন্ট। ক্যালিফোরনিয়া এলাকায় অনেক জায়গার নাম সাধুসন্তদের নামে। তাই নামের প্রথমে সান আর সান্তা কথার যোগ দেখা যায়। যেমন San Diego, San Mateo, San Jose, San Bernardino, Santa Barbara, Santa Cruz, Santa Monica, Santa Clara, Santa Rosa. এ-রকম রয়েছে আরও অনেক। ক্যালিফোরনিয়া

নামও নাকি এক স্প্যানিশ নভেল থেকে এসেছে। ক্যালিফোরনিয়া স্টেটের ইতিহাস শুরু হবার প্রথমে এ অঞ্চলে স্প্যানিশদের আধিপত্য ছিল। অনেক স্প্যানিশ মিশনও ছিল, তাই এদিকে স্প্যানিশ নামের এত ছড়াছড়ি।

নিমন্ত্রণপত্রে আরো লক্ষ্য করার বিষয় যে, অনেক শব্দের বানান গতানুগতিক হতে পৃথক। আমেরিকান মতে honour-কে honor লেখা হয়। এ রকম color, laber ইত্যাদিও। প্রোগাম-কে program লেখা হয়, programme নয়। শব্দের যে-বর্ণ উচ্চারণ করতে লাগে না, লেখার সময় তার বোঝা টানা হয় না। Through শব্দের লিখিত বানান ঘরোয়াভাবে thru লেখার চল হয়েছে। আমেরিকায় ট্র্যাডিসনাল ইংরেজী বানানকে দরকার মতো কেটে ছেঁটে ফেলা হয়েছে বা হচ্ছে। অবশ্য অকারণ বোঝা অনেক সময় ভাষাকে ভারাক্রান্তই করে দেয়। সময়ও নষ্ট হয়। আমেরিকান ভাষা ইংরেজী থেকে ক্রমে পৃথক হয়ে যাচ্ছে! কোনো জাতির ভাষা থেকে তার নাড়ীর অনেক খবর বের করা যায়; জাতির গতিশীলতাও।

সকাল এগারোটায় সানফ্রানসিসকো আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসব আরম্ভ হল। ভক্তেরা প্রায় সকলে এ সময়ের মধ্যে এসে মন্দিরের হলে চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন। সকলের হাতে জন্মোৎসবের প্রোগ্রাম দেওয়া হল। আশ্রমের সাধুব্রহ্মচারীরা প্রথম সারির চেয়ারে বসলেন। ওঁদের অন্যদিনও দেখেছি। তখন পরনে যেমন-তেমন একটা ফুলপ্যাণ্ট ও ফুলশার্ট। মায়ের উৎসব উদ্‌যাপনের সময় ওঁদের ফুলড্রেস—দিনটির সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য যে মনের কানায় কানায় উপছে পড়েছে—পোশাকেও যেন তার প্রকাশ। ব্রহ্মচারিণী চিন্ময়ীর (আমেরিকান মহিলা) ভজনের পর প্রায় দশ-বারো মিনিট সকলে চেয়ারে বসে ধ্যান করলেন। তারপর স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ বই থেকে মায়ের জীবনী কিছু পাঠ ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা করলেন। 'লেডি সারদা' গানের পর প্রবুদ্ধানন্দজী আসনে বসে ফুলচন্দন দিয়ে পূজো করলেন, অবশ্য খুবই সংক্ষেপে। পরে আশ্রমের আমেরিকান ব্রহ্মচারীরা সুন্দর সুর করে গাইলেন—"প্রকৃতিং পরমাং"...। ঈশোপনিষদ্ ও ললিতসহস্রনাম থেকেও কিছু পাঠ করলেন। পাঠান্তে ভক্তেরা পুষ্পাঞ্জলি দিলেন—প্রথমে সাধুব্রহ্মচারীরা, পরে গৃহস্থ ভক্তেরা। তিন-চার জন করে বেদীর সামনে উঠে গিয়ে এক পাত্র থেকে ফুল নিয়ে নতজানু হয়ে বসে মনে মনে মায়ের চরণে অর্পণ করে পাশের পাত্রে রাখলেন। এঁরা বেদী হতে নীচে নেমে এলে আবার তিন-চার জন গেলেন অঞ্জলি দিতে। অঞ্জলি দেবার বা ফুল নেবার জন্য কোন তাড়াহুড়ো নাই—তাতে যত সময়ই লাগুক। সবশেষে পাত্রে পাত্রে সমবেত ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হল। যে-সব ভক্ত আসতে পারেননি তাঁদের জন্য অনেকে প্রসাদ নিয়ে গেলেন। প্রসাদ হল খিচুড়ি তরকারি চাটনি, মায় সুজির পায়েস পর্যন্ত। আর ছিল মিষ্টি—ওদেশী ক্যানডী। প্রায় ১২৫ জন ভক্ত প্রসাদ পেলেন। বেলা আড়াইটা নাগাদ প্রসাদ খাওয়া, রান্নাঘর-সমেত বাড়ীঘর পরিষ্কার করা হয়ে গেল। সকলেই চলে গেলেন। আশ্রম আবার চুপচাপ হয়ে গেল। উৎসবের নামগন্ধ রইল না।

প্রোগ্রাম মতো অরগান-যোগে যে গান গাওয়া হল,—তা শুনতে যেমনি মধুর, অনুভবে তেমনি দরদী। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে

বলেছিলেন—মা ব'লে ডাকার মতো তোমার অনেক সন্তান হবে। আজ পৃথিবীর এ প্রান্ত ছেড়ে সে-প্রান্তেও কতো মানুষ মা ডেকে গান গাইছে! কোনোদিন কেউ শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষার গানগুলি সংগ্রহ করলে কাজে লাগবে।

বারকলে-তে ২৪৫৫ নম্বর বাউডিচ স্ট্রীটে বেদান্ত সোসাইটি, ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বারকলে ক্যামপাসের কাছেই। এখানেও মায়ের জন্মোৎসব পালিত হল। প্রায় তিনটার সময় পূজো আরম্ভ হয়; শেষ হয় সাড়ে চারটা নাগাদ। স্বামী স্বাহানন্দজী পূজা করলেন। উৎসবের কর্মসূচী প্রায় অনুরূপ। সানফ্রানসিসকো থেকে বারকলে নিকটে। অনেক ভক্ত সানফ্রানসিসকোর উৎসব সেরে সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের গাড়ীতে করে চলে এলেন বারকলের উৎসবে যোগ দিতে। আমারও সুযোগ হয়েছিল সানফ্রানসিসকো হতে স্বামী প্রবুদ্ধানন্দজী ও কয়েকজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আশ্রমের গাড়ীতে করে বারকলে চলে আসতে। এখানে প্রায় একশ-সওয়াশো ভক্ত প্রসাদ নিলেন

এই যে ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রচার চলেছে—এর ইতিহাস শুরু হয়েছে বহুপূর্বে। খৃষ্টযুগের প্রথমের দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়—কম্বোডিয়া মালয় সুমাত্রা জাভা বোর্নিও প্রভৃতি স্থানে হিন্দুধর্মের প্রচার হয়েছে। তারপর বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়েছে এসব জায়গায়। তৈরী হয়েছে বিহার ও প্যাগোডা। বৌদ্ধধর্ম সারা দুনিয়াকে এমন প্রভাবিত করেছে—তা বিহার আর প্যাগোডা ছেড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে ঢুকে পড়েছে।

এ যুগে পৃথিবীর এ প্রান্ত এশিয়া ছেড়ে সে-প্রান্ত ইউরোপ-আমেরিকায় হিন্দুদর্শনের শেষকথা বেদান্ত প্রচারিত হচ্ছে। ওদেশের বেদান্ত সোসাইটিতে বক্তৃতা হয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কেন্দ্রে বছরের পর বছর ক্লাস হচ্ছে। ফলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-উদ্বোধিত ভারতের সনাতন ভাবধারা যে ধীরে ধীরে আশ্রম আর মন্দিরের গণ্ডি ছেড়ে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে শুরু করেছে—কারল টমাস জ্যাকসনের থিসিসের বিষয়বস্তু থেকে তা প্রকাশ পাচ্ছে।

ভগবান আলো জ্বালো

সেখ সদর উদ্দীন

চারিদিকে আজ গভীর আঁধার, ভগবান, আলো জ্বালো
প্রেমবিশ্বাস-মঙ্গলদীপ ঘুচাক রাতের কালো।
বুদ্ধির দীপ জ্বলে চারিদিকে—কতটুকু তার আলো?
হৃদয়ের দীপ নাহি যদি জ্বলে, ঘুচেনা বিভেদ-কালো।
উদয় হউক নব প্রভাতের, পুরানো রাত্রির শেষে!—
কোন পথ, কোন মতবাদ নয়—মানুষকে ভালবেসে
মানুষের কাছে আসুক মানুষ, মনকে চিনুক মন,
নতুন আলোয় নবীন প্রাণের হউক উদ্বোধন!

যোগবাসিষ্ঠসারঃ

[পূর্বানুবৃত্তি]

[অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ]

১০। শূন্যাশূন্যপদ-প্রকরণ

বসিষ্ঠ উবাচ—

দৃশ্যদর্শনসম্বন্ধান্ন ভবেৎ পরমং সুখম্।
তদেবৈকান্তসংচিন্ত্যা মনোনাশঃ পরং পদম্ ॥ ১

বসিষ্ঠ বলিতেছেন—বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধবশতঃ যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা পরম সুখ নহে। নিরন্তরমননোদ্ভূত 'আমি ব্রহ্ম'—এইরূপ জ্ঞান দ্বারা যে মনোনাশ-অবস্থা হয়, উহাই পরম পদ।

দৃশ্যদর্শনসংবন্ধে সুখসংবিদনুত্তমা।
দৃশ্যসংবলিতো বন্ধ স্তন্মুক্ত্যা মুক্তিরুচ্যতে ॥ ২

যে চিদানন্দস্বরূপ সর্বোত্তম বস্তু সদা বিরাজমান তাহাই যখন বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধকালে দৃশ্যসম্বন্ধযুক্ত হয়, তখন সেই অবস্থাকেই বন্ধ বলে। উক্ত দৃশ্যসম্বন্ধের অভাব ঘটিলে চিদানন্দ-স্বরূপই অবশেষ থাকে, তাহাই মুক্তি।

শুদ্ধং সদসতোর্মধ্যে পদং লব্ধ্বাহবলম্ব্য তৎ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং বিশ্বং মা গৃহাণ বিমুঞ্চ মা ॥ ৩

অজড় ও জড়ের মধ্যে বর্তমান শুদ্ধ বস্তুকে লাভকরতঃ তাহাই অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ তাহাতেই স্থিতি লাভ করিয়া বাহ্য ও আভ্যন্তর সহ এই বিশ্বকে (সমগ্র বিশ্বকে) গ্রহণ বা ত্যাগ কিছুই করিও না। (বিশ্ব কালত্রয়েই বস্তুতঃ নাই—ইহাই ভাবার্থ।)

জড়াজড়দৃশোর্মধ্যে যত্তত্ত্বং পারমার্থিকম্।
অনন্তাকাশহৃদয়ং তৎ সদাশ্রয় সর্বদা ॥ ৪

জড় পদার্থের জ্ঞান ও অজড় জ্ঞানের মধ্যে যে পারমার্থিক তত্ত্ব অনন্ত ব্যাপক আকাশের ন্যায় সর্ব হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেই সদ্বস্তুকেই সর্বদা আশ্রয় কর অর্থাৎ তন্নিষ্ঠ হও।

দ্রষ্টুর্দৃশ্যস্য সত্তাঙ্গ বন্ধ ইত্যভিধীয়তে।
দ্রষ্টা দৃশ্যবশাদ্ বদ্ধো দৃশ্যাভাবে বিমুচ্যতে ॥ ৫

হে প্রিয়, দৃশ্যের যে সত্তা অর্থাৎ সম্বন্ধ, তাহাই দ্রষ্টার বন্ধ নামে অভিহিত হয়। দৃশ্যের কবলিত হওয়াই চেতন দ্রষ্টার বন্ধনদশা এবং পুনঃ দৃশ্যের অভাব ঘটিলেই উহা মুক্ত হয়।

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যানি ত্যক্ত্বা বাসনয়া সহ।
দর্শনং প্রথমাভাসমাত্মানং সমুপাস্মহে ॥ ৬

বাসনা সহ দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য—এই তিনটি পরিত্যাগপূর্বক, দর্শন যাঁহার দ্বারা প্রথম প্রকাশিত হয়, সেই আত্মার আমরা উপাসনা করিয়া থাকি।

দ্বয়োর্মধ্যে গতং নিত্যমস্তিনাস্তীতি পক্ষয়োঃ।
প্রকাশনং প্রকাশানামাত্মানং সমুপাস্মহে ॥ ৭

অস্তি-নাস্তি অর্থাৎ জড়-অজড় এই উভয়ের মধ্যে নিত্য অনুগত এবং সূর্যাদি প্রকাশেরও প্রকাশক আত্মাকে আমরা উপাসনা করিয়া থাকি।

নিদ্রাদৌ জাগরস্যান্তে যো ভাব উপজায়তে।
তং ভাবং ভাবয়ন্ সাক্ষাদক্ষয়ানন্দমশ্নুতে ॥ ৮

জাগ্রদবস্থার অন্ত ও নিদ্রাপ্রাপ্তির আদিকালে যে অবস্থা উদিত হয়, সেই ভাবটি সদা স্মরণ রাখিলে প্রত্যক্ষ অক্ষয় আনন্দ লাভ হইয়া থাকে।

প্রশান্তসর্বসংকল্পা যা শিলাবদবস্থিতিঃ।
জাগ্রন্নিদ্রাবিনির্মুক্তা সা স্বরূপস্থিতিঃ পরা ॥ ৯

সর্বসংকল্প-বা চিন্তারহিত এবং যাহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি-অবস্থাও নহে, এমন শিলা-খণ্ডের ন্যায় সর্বব্যাপারবিহীন যে অবস্থিতি, তাহাই পরমস্বরূপস্থিতি।

জড়তাং বর্জয়িত্বৈকাং শিলায়া হৃদয়ং চ যৎ।
অমনস্কং মহাবাহো তন্ময়ো ভব সর্বদা ॥ ১০

বসিষ্ঠ বলিতেছেন—'হে দীর্ঘবাহু রামচন্দ্র, জাড্য পরিত্যাগ করিলে যে শিলাখণ্ডের মনোব্যাপারবিহীন অবস্থিতি অর্থাৎ সত্তামাত্ররূপে যে নির্ব্যাপার স্থিতি, তুমি সর্বদা তাহা (তন্ময়) হও।'

সত্যানন্দচিদাকাশস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।
মৃদ্ভাজনেষু মৃদিব সর্বত্রাস্ত্যপৃথক্ স্থিতিঃ ॥ ১১

সচ্চিদানন্দ, আকাশের ন্যায় ব্যাপক পরমাত্মা সর্বত্র সর্বপদার্থে অভিন্নরূপে বিদ্যমান, মৃত্তিকানির্মিত পাত্রসমূহে মৃত্তিকা যেমন অভিন্ন হইয়া থাকে তদ্রূপ।

অপারাবারবিস্তারাসংবিৎসলিলবল্গনৈঃ।
চিদেকার্ণব একোঽয়ং স্বয়মাত্মা বিজৃম্ভতে ॥ ১১

সমুদ্রের জলের চাঞ্চল্য দ্বারা যেমন এক শান্ত সমুদ্রই পরিলক্ষিত হয়, তদ্রূপ উভয়তীর-বিহীন বিস্তৃত ব্যাপক জ্ঞানরূপ জলরাশির (সৃষ্টিতরঙ্গরূপ) চাঞ্চল্যদ্বারাও (অর্থাৎ চাঞ্চল্য-মধ্যেও) এক চিৎসমুদ্ররূপ অদ্বিতীয় আত্মাই স্বয়ং বিরাজমান। (ক্রমশঃ)

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

২০। সমাজ-শিক্ষা

উক্ত সংস্কার-পদ্ধতির সমগ্রটাই স্বামী বিবেকানন্দ যাকে 'শিক্ষা' বলে অভিহিত করেছেন তার উপর নির্ভরশীল। এই কারণে এই শিক্ষাকে 'সমাজ-শিক্ষা' (social education) আখ্যা দেওয়া যায়।

স্বামীজী শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন, বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে শিক্ষাকে বর্ণনা করেছেন[১] মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণাঙ্গতার (perfection) পরিস্ফুটন বলে এবং অন্তর্নিহিত দেবত্বের ঐশী সত্তার বিকাশ বলে।[২] এখন যদি দেবত্বকে পূর্ণতাস্বরূপ, কল্যাণস্বরূপ (the perfection itself, the goodness itself) বলে অভিহিত করা হয় তবে শিক্ষা ও ধর্মকে অভিন্ন বলেই গ্রহণ করতে হবে। স্বামীজীর ভাষায় শিক্ষা ও ধর্ম উভয়েরই উদ্দেশ্য 'লোকায়ত মানুষ থেকে ঈশ্বরের ক্রমবিকাশ সম্ভব করা' ('to evolve God out of the material man')।[৩]

স্বামীজী অবশ্য এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর এই অত্যুচ্চ ধারণা (super concpet) সাধারণ লোকের বোধগম্য হ'তে পারে না। উপরন্তু বিপদ হ'ল যে, ধারণাটি ব্যক্তির মনকে অন্তর্মুখী করতে গিয়ে তার সামাজিক প্রকৃতিকে বিনষ্ট ক'রতে পারে। এই দুই কারণে স্বামীজী শিক্ষার আর একটি 'সংজ্ঞা' নির্দেশ করেছেন, যার ব্যাখ্যা তাঁর অনেক উক্তিতেই পাওয়া যাবে। সংজ্ঞাটি হ'ল এইরূপ: 'যে অনুশীলন দ্বারা মানুষের ইচ্ছার প্রবাহ ও প্রকাশ নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ফলপ্রসূ হয় তাকেই বলা হয় শিক্ষা'—('The training by which the current and expression of will are brought under control and become fruitful is called education.')।[৪]

সংজ্ঞাটির বিশ্লেষণ করলে এইরকম দাঁড়ায়: প্রথমত, ব্যক্তির সুপ্ত ইচ্ছাকে জাগ্রত করে প্রবাহিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ঐ প্রবাহকে সামাজিক উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, কারণ সমাজ-ব্যবস্থা ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্বই অকল্পনীয়।[৫] তৃতীয়ত, শিক্ষা হ'ল অনুশীলন, যার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে ব্যক্তিত্ব-পরিস্ফুটন ও সমাজ-উন্নয়ন উভয়ই সম্ভব করা।

ব্যক্তি-ইচ্ছার যে নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে তা ঠিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নয়, ব্যক্তির নিজের দ্বারাই স্বীয় ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ। ব্যক্তির ইচ্ছাকে জাগ্রত করার অর্থ হচ্ছে তার আত্মশিক্ষার পথে সকল বাধা অপসারিত করা—তার মধ্যে

১ স্বামীজী সংজ্ঞা-নির্দেশ খুব কম করতেন।

২ C. W., IV, 358

৩ শিক্ষা ও ধর্মের অভিন্নতার নির্দেশ স্বামীজীর বাণী ও রচনায় সুপরিস্ফুট। তাঁর চিকাগো ধর্মসভায় অন্যতম বক্তৃতা 'হিন্দুধর্ম' ('Hindusim') বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

৪ C. W., IV, 490

৫ C. W., IV, 463

প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মকে জাগ্রত করা। এতে শিক্ষার ভূমিকা মাত্র সহায়তার। সাধারণ মানুষ যেন মেষপালের মধ্যে পালিত সিংহশাবকের মতো; নিজেকে সে মেষ বলেই মনে করে। প্রকৃতপক্ষে সে যে পশুরাজ, একথা জানেই না। সুতরাং তার আসল প্রকৃতির পরিচয় তাকে জানতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তার বিবেক বা বিচার-শক্তিকেও (power of discrimination) জাগ্রত করতে হবে। শিক্ষার ভূমিকা এইটুকুই। এই প্রসঙ্গে প্রচলিত শিক্ষার ত্রুটির উল্লেখ করে স্বামীজী প্রশ্ন করেছেন: "যে শিক্ষা সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রামের সহায়ক হয় না, তার চরিত্রবিকাশের দিকে দেয় না, তাকে পরের দুঃখে কাঁদতে শেখায় না এবং তার মধ্যে সাহসিকতার উন্মেষের উপযোগী হয় না—তাকে কি শিক্ষা নামে অভিহিত করা যায়?"[৬]

অতএব, স্বামীজীর মতে, শিক্ষার আদর্শ হ'ল ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ও সমাজের প্রগতি—উভয়ের মধ্যে সার্থক সমন্বয়সাধন করা। অবশ্য তিনি এই সমন্বয়কেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে পারেননি। মনে হয়, তাঁর সন্দেহ ছিল যে, কোনক্রমে এইরূপ শিক্ষার ব্যক্তিগত দিকটাই প্রাধান্য লাভ করবে এবং সামাজিক দিকটা উপেক্ষিত হতে থাকবে। ফলে অবহেলিত জনগণ অবহেলিতই থেকে যাবে। এই কারণে দেখা যায় যে, তিনি জনশিক্ষাকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "জাতীয় সমৃদ্ধি জনগণের মধ্যে শিক্ষা-ও বুদ্ধিমত্তা-প্রসারের সমানুপাতিকই হয়। এ আমার নিজের চোখে দেখা। ভারতের দুঃখদুর্দশার মূল কারণ হ'ল ··মুষ্টিমেয়ের দ্বারা সমগ্র শিক্ষা-সংস্কৃতির একচেটিয়া অধিকার আয়ত্তীকরণ। যদি আমরা পুনরুত্থানে আগ্রহশীল হই তবে সমাজের উক্ত ব্যবস্থাই অবলম্বন করতে হবে—অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করতে হবে।"[৭]

দেখা যাচ্ছে, অন্তত প্রাথমিক স্তরে স্বামী বিবেকানন্দ-কল্পিত সমাজশিক্ষা হল জনশিক্ষা—সমাজে যারা অবহেলিত তাদের জন্য শিক্ষা, এবং এই শিক্ষা লোকায়ত ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার সংমিশ্রণ।[৮] অবশ্য এই দুইটি দিকের কোন্‌টিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে তা নির্ভর করবে অবস্থাবিশেষের উপর।

অতএব, সন্নিহিত অজ্ঞ জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারই হ'ল প্রাথমিক কার্য। দুস্থ, হতভাগ্য প্রতিবেশীর আরাধনার মধ্য দিয়েই বিশ্ববিরাটের আরাধনায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

আবার এই জনশিক্ষার স্তর মূলত দু'টি: ব্যক্তিসত্তার মধ্যে আত্মার উদ্বোধন এবং উদ্বুদ্ধ শক্তিকে সমাজস্বার্থে নিয়োগ। আমাদের মত দেশে দ্বিতীয়টির জন্য সাধারণ লোকায়ত প্রয়োজনীয়তার দিকে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে

জনশিক্ষা-বিস্তারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে।

পৌরাণিক কাহিনী, উপকথা ইত্যাদি আশ্রয় গ্রহণ করা চলবে, যদি অবশ্য ঐ সকল কাহিনী ইত্যাদি মানুষ-গড়া কাজের (man-making) সহায়ক হয়। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন: 'কখনও কখনও

৬ C. W, VII, 147-48

৭ C. W., IV, 482

৮ The Master as I Saw Him, 290

৯ C. W., IV, 484

তিনি (স্বামীজী) ঘণ্টার পর ঘণ্টা হিন্দু পুরাণ ইত্যাদি থেকে উপাখ্যান বিবৃত করে যেতেন, যে, সকল উপাখ্যানের সঙ্গে আমাদের ঘুম-পাড়ানো গল্পের কোন মিলই নেই; মিল আছে প্রাচীন গ্রীসের মানুষ গড়ার সহায়ক পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে।"[১০] এই দৃষ্টিকোণ থেকেই স্বামীজী আবার ধারণার পূর্ণতাকে (completeness of idea) ঐতিহাসিক সত্যের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন।[১১]

জার্মানীর মত আবশ্যিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এদেশে বর্তমানেই সম্ভব নয়।[১২] এদেশে সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমেই জনশিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং এই কাজ হবে ধর্মশিক্ষকদের। যুগ যুগ ধরে তাঁরা স্থান হ'তে স্থানান্তর ভ্রমণ করে ধর্মশিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। এখন পদ্ধতির সামান্য পরিবর্তন করতে হবে মাত্র; উপযুক্ত সংগঠন সৃষ্টি ক'রে তাঁদের নূতন কাজের উপযোগী ক'রে তুলতে হবে।

শিক্ষার বাহন হবে কথ্য ভাষা; নচেৎ জনশিক্ষা-প্রসারের প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না। প্রাচীনকালে বুদ্ধদেব এবং আধুনিক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এই হ'ল মোটামুটি সমাজশিক্ষা-পরিকল্পনার রূপরেখা। এ সম্পর্কে একটা বিষয় কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে: প্রত্যেক সমাজ-ব্যবস্থারই একটা নিজস্ব জীবন-পদ্ধতি আছে। শিক্ষা-ব্যবস্থা অবশ্যই হবে এই জীবন-পদ্ধতির সামিল। এই প্রচেষ্টায় সফলতা হ'ল স্বাধীনতার সূচক। অসফল হলে বুঝতে হবে জাতি এখনও অন্ধ অনুকরণের মোহে আছে।

(ক্রমশ:)

১০ 'Notes of Some Wwanderings with the Swami Vivekananda in the Himalayas,' 28

১১ Ibid ; also 'The Master as I Saw Him' 254 and 176

১২ C. W., VII, 382

"কীটাৎ ব্রহ্মাণ্ডপর্যন্তং সর্বং শক্তিময়ং জগৎ।
শক্তিসংপূজনাদ্দেবি ব্রহ্মাণ্ডং পূজিতং ভবেৎ

—শক্তিসঙ্গমতন্ত্র

কীট হতে সারা বিশ্ব অবধি
সৃষ্টিতে সবই শক্তিময়।
শক্তির পূজা করিলে তাতেই
ব্রহ্মাণ্ডও পূজিত হয়॥

পথিকের ডায়েরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী চেতনানন্দ

প্যারিস থেকে লণ্ডন আসতে ১ ঘণ্টা সময় লাগল। এয়ারপোর্টে স্বামী যোগেশানন্দ (আমেরিকান সন্ন্যাসী) ও ব্রহ্মচারী তারক (ইংরেজ ব্রহ্মচারী) আমাকে নিতে এসেছিল। আশ্রমে পৌঁছুলুম দুপুরে। আমাদের আশ্রম লণ্ডনের এক ভদ্রপল্লীতে। অঞ্চলটির নাম হল্যাণ্ড পার্ক। বিকালে আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভব্যানন্দজীর সঙ্গে পার্কে বেড়াতে বেরুলাম। প্যাণ্ট কোট পরে বেরুতে হল—নতুবা হিপিরা পিছু নেয়।

পরদিন (৬ই জুন) গোটা লণ্ডন শহর ঘুরে দেখলুম। প্রথমে গেলুম হাইড পার্কে। লণ্ডনের সর্ববৃহৎ পার্ক। এদিন ছিল রবিবার। তাই পার্কের রেলিং-এ বহু শিল্পী তাদের আঁকা ছবি বিক্রীর জন্য সাজাচ্ছে দেখলুম। তারপর চললুম বাকিংহাম প্যালেসের দিকে। এটি ইংলণ্ডের রানীর বাসভবন। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাড়ীর ইতিবৃত্ত কত শুনেছি। কিন্তু দেখে খুব হতাশ হলুম। ভারতবর্ষের মহীশূরের রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির কথা ছেড়েই দিলুম—কলকাতার মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটে মল্লিকদের বাড়ী বাকিংহাম প্যালেস থেকেও জমকাল ও সুন্দর। লণ্ডনের টেমস নদী আমাদের জলভরতি কালীঘাটের গঙ্গার মত।

লণ্ডনের পথেঘাটে, পার্কে সব জায়গায় বীরদের মূর্তি। কে কোন্ উপনিবেশ জয় করেছে—তাদের সব কীর্তিকথা জড়ানো রয়েছে ঐসব মূর্তির সঙ্গে। গোটা পৃথিবী থেকে শোষণ করা লণ্ডনের ঐশ্বর্য। তবে এ ইংরেজজাতি আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান। 'আমরা সব কিছু করতে পারি'- এ বিশ্বাস তারা রাখে। ইংরেজী সাহিত্যে এসবের প্রাচুর্য: যুদ্ধবিগ্রহ, কোন একটা অজানা দ্বীপ, সে দ্বীপটা থাকবে মণিমুক্তায় পূর্ণ, সেখানকার আদিম অধিবাসী, জাহাজে করে কোন ইংরেজ বীরের সমুদ্রযাত্রা, নানারকম জলদস্যু, দ্বীপজয় ও মণিমুক্তালাভ।

রানীর রক্ষীদের বেশভূষা কিন্তু অপূর্ব। তাদের ডিউটি বদল রীতিমত অনুষ্ঠান করে হয়। অশ্বারোহী রক্ষীদের চেহারাও বেশ আভিজাত্যপূর্ণ। রানীর ব্যাণ্ডপার্টির তুলনা হয় না। সেদিন সকালে আমার ঐ বাজনা শুনবার সুযোগ হয়েছিল।

তারপর চললুম ট্রাফালগার স্কোয়ার। ট্রাফালগার যুদ্ধে নেপোলিয়ানকে হারিয়ে দেন ইংরেজবীর নেলসন। এখানে নেলসনের ১৭ ফুট উঁচু মূর্তি আছে। বিস্তর পায়রা দেখলুম। যত কিছু বিক্ষোভ, আন্দোলন এখানে হয়। তারপর চললুম ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীট। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন। কলকাতার কাগজে এ বাড়ীটির বিষয়ে অনেকবার পড়েছি।

বৃটিশ পার্লামেণ্ট, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার অ্যাবে, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ক্যাথেড্রাল, অপেরা হাউস প্রভৃতি দেখে চললুম বৃটেনের সর্বাপেক্ষা উঁচু গম্বুজের দিকে। এর নাম পোষ্ট অফিস টাওয়ার। ৬২৫ ফুট উঁচু। এ টাওয়ার থেকে গোটা লণ্ডনের দৃশ্য চোখে পড়ে; সারা পৃথিবীর সঙ্গে বেতার-সংযোগ রক্ষিত হয়। এর উপর ঘূর্ণায়মান রেস্তোরাঁ আছে। তৈরি করতে খরচ হয়েছিল ২৫ কোটি টাকা।

পরদিন (৭ই জুন) সকালে লণ্ডন থেকে ক্যানটারবেরী চার্চ দেখতে চলুলম। প্রায় ৬০।৭০ মাইল দূর। ক্যানটারবেরী ইস্ট স্টেশনে পৌঁছে হাঁটতে লাগলুম। স্টেশন থেকে ১৫ মিনিটের পথ। চার্চের পূর্বে দেখলাম একটা দুর্গপ্রাকার। তার গায়ে সব ছিদ্র। যুদ্ধের সময় রক্ষীরা বন্দুক নিয়ে এই সব জায়গা থেকে গীর্জাকে পাহারা দিত। এটিই ইংলণ্ডের সর্বাপেক্ষা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চার্চ। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু শতাব্দীর ইতিহাস। সেণ্ট অগাস্টাইন ৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে পদার্পণ করেন। এ গীর্জা একসঙ্গে গড়ে ওঠেনি। খানিকটা অংশ গড়ে ওঠে নর্মানদের রাজত্বকালে, কতকটা স্যাক্সনদের কালে। তারপর বিভিন্ন শতাব্দীতে এর উৎকর্ষ আবার ধ্বংস এইভাবে চলেছে।

দ্বিতীয় হেনরির রাজত্বকালে এই ক্যানটারবেরী চার্চের মধ্যে এখানকার আর্চবিশপ টমাস বেকেটকে তরবারির দ্বারা ছিন্নভিন্ন করা হয়। এতে সমস্ত খ্রীষ্টজগৎ আতঙ্কিত হয়ে উঠে। দ্বিতীয় হেনরি পরে নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন। যে জায়গায় টমাস বেকেট নিহত হন, সেখানে প্রাচীরগাত্রে লেখা রয়েছে: "Thomas Becket - Archbishop-Saint Martyr Died Here : Tuesday 29th December 1170"।

এ গীর্জার মাঝখানে রয়েছে ভারতীয় শিল্পের একটি নিদর্শন। Canterbury Cathedral গ্রন্থ থেকে তুলে ধরছি: The carpet in front of the Nave altar was especially made for the Cathedral by carpet-weavers of India : Seven men worked continuously on it for nine months before it was completed to special designs supplied to them." অপূর্ব কারুকার্যময় এ কার্পেটখানি।

আজ ৮ই জুন। লণ্ডন থেকে বিদায়ের পালা। সকলেই তৈরী হয়ে নিলুম। স্বামী ভব্যানন্দজী বললেন—"চল, রানীর Windsor প্যালেস ঘুরে দেখে তোমাকে airport-এ পৌঁছে দেব।" ব্রহ্মচারী তারকও সঙ্গে। প্যালেসটি একটা উঁচু জায়গায়। পাশ দিয়ে টেমস নদী বয়ে গেছে। চারদিকে সবুজ বনানী। জায়গাটি বেশ সুন্দর। এই Wind-ors প্যালেসের মধ্যে একটা Royal Church আছে। এসব চার্চের একটা বিশেষত্ব হল যে, এগুলিই রাজারানীদের সমাধিস্থান। রাজার শরীরত্যাগের পর কবর দিয়ে সেখানে বেদীর উপর একটা শায়িত প্রতিমূর্তি করা হয়; আবার যখন রানী মরেন তখন তাঁর স্বামীর পাশে ঐভাবে কবর দিয়ে প্রতিমূর্তি করে রাখা হয়। এ ব্যাপার ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকার সর্বত্র দেখলুম। রাজা, রানী বা কোন প্রসিদ্ধ ধর্মযাজক প্রভৃতির কবরস্থান ঐ গীর্জার মধ্যেই।

লণ্ডন এয়ারপোর্টে এসে টিকিট ঠিক করে নিয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার ১০৩ নং ফ্লাইটে উঠলুম। লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক প্রায় ৭ ঘণ্টা লাগল। প্লেন চলল ৩৩,০০০ ফুট উঁচু দিয়ে। ঘোষক বললেন—আমরা স্পেন, আটলান্টিক মহাসাগর, কানাডার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, সেণ্টলরেন্স নদী, বোস্টন হয়ে নিউইয়র্ক যাব। এ প্লেন একটানা চলল। কোথাও থামল না।

নিউইয়র্কে পৌঁছে পাশপোর্ট-ভিসার ব্যাপার শেষ করে বাইরে এসে দেখি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টারের স্বামী আদীশ্বরানন্দজী

ও বেদান্ত সোসাইটি থেকে এরিক জন ও জ্যাক এসেছে আমাকে নিতে। আমার বাসস্থান বেদান্ত সোসাইটিতে নির্দিষ্ট ছিল। সেখানেই চললুম। জ্যাকের গাড়ীখানা বিরাট ও শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। জ্যাক খুব জমাটী লোক। জিজ্ঞাসা করল—

আমাদের দেশ থেকে আপনাদের দেশের কোন্ পার্থক্যটা আপনার কাছে বেশী মনে হচ্ছে? আমি বললুম—'তোমাদের গাড়ী জোরে চলে আর আমাদের গাড়ী আস্তে চলে।' কারণ আমেরিকায়, ফ্রান্সে, লণ্ডনে গাড়ী চালাতে গেলে কোমরে ও কাঁধের উপর দিয়ে বেল্ট বাঁধতে হয়। জ্যাক আমাকে বেঁধে ফেলল। আমি বললুম—আমাদের আস্তে গাড়ী চলার কারণ—একই রাস্তা দিয়ে মানুষ, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা, বাস, ট্রাম লরী সবই চলবে প্রত্যেকের নিজের গতিতে। সুতরাং গতি আসবে কোথেকে?

বেদান্ত সোসাইটিতে স্বামী পবিত্রানন্দজীর কাছে ছিলুম। তিনি গোটা নিউইয়র্ক শহর ঘুরে দেখবার ব্যবস্থা করে দিলেন। সোসাইটির একজন সভ্য তারপর দিন (৯ই জুন) আমাকে নিয়ে বেরুলেন এই বিরাট শহর দেখাতে। নিউইয়র্কের টিউবরেল ধরে হাজির হলুম পৃথিবীর সুউচ্চ বাড়ীর পাদদেশে। বাড়ীটির নাম—Empire State Building। ১০২ তলা। দেখলুম অদূরে একটা বাড়ী তৈরী হচ্চে, তার নাম 'World's Trade Centre'। সঙ্গী বললেন—তা নাকি ১১০ কি ১১৫ তলা হবে।

যাহোক এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর উচ্চতা ১৪৭২ ফুট। (প্যারিসের আইফেল টাওয়ার ৯৮৪ ফুট এবং লণ্ডনের পোস্ট অফিস টাওয়ার ৬২৫ ফুট।) এ গগনচুম্বী বাসভবন দেখবার মত। প্রথমে ৮৬ তলায় উঠে দেখলুম, তারপর লিফট বদলে ১০২ তলায় উঠে গোটা নিউইয়র্ক শহর।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাড়ী, তাই দু-চার কথা লিখছি। স্বচ্ছ দিনে ৮০ মাইল দূরের বস্তু দেখা যায়। ৭২টি লিফট আছে এবং তাদের গতি ৬০০-১,২০০ ফুট প্রতিমিনিটে। ১,৮৬০টি সিঁড়ি আছে। ৬৫০০ জানালা প্রতি মাসে দুবার সাফ করতে হয়। ১৬,০০০ লোক এই বাড়ীতে কাজ করে। বাড়ীটি পরিষ্কার রাখবার জন্য ২০০ লোক আছে।

যাহোক ৩৪ নং রাস্তা ছেড়ে চললুম ৩৩ নং রাস্তায় যেখানে স্বামীজী ছিলেন। বাড়ীটির গায়ে লেখা রয়েছে 54 অর্থাৎ 54 West 33rd Street, New York। সঙ্গী বললেন—এ জায়গাটি ছিল আগে একটা বস্তী। খুব গরীবদের আস্তানা। স্বামীজীর তখন পয়সার অভাব। তাই একটা সস্তা দরে বাড়ী ভাড়া করলেন এই দরিদ্র পল্লীতে। ধনী বন্ধুরা বললেন—এখানে ক্লাস করলে ঠিক ঠিক লোক পাওয়া যাবে না। বেপরোয়া স্বামীজী মিসেস ওলি বুলকে চিঠি (১১.৪.৯৫) লিখে পাঠালেন: "আমার বন্ধুরা সবাই ভেবেছিলেন, একলা একলা দরিদ্র পল্লীতে এভাবে থাকলে এবং প্রচার করলে কিছুই হবে না; আর কোন ভদ্রমহিলা কখনই সেখানে যাবেন না। কিন্তু যথার্থ 'ঠিক ঠিক লোক' ঐ স্থানে দিনরাত আসতে লাগল। হে প্রভো, মানুষের পক্ষে তোমার ও তোমার দয়ার উপর বিশ্বাস-স্থাপন—কি কঠিন ব্যাপার!!! মা, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ঠিক ঠিক লোকই বা কোথায়, আর বে ঠিক বা মন্দ লোকই বা কোথায়? সবই যে তিনি!! হিংস্র ব্যাঘ্রের মধ্যেও তিনি, মৃগশিশুর ভেতরও তিনি; পাপীর

ভেতরও তিনি, পুণ্যাত্মার ভেতরেও তিনি—সবই যে তিনি।"

স্বামীজীর বাসস্থান দেখে চললুম United Nations Organisation (U. N. O.) দেখতে। ৩৯ তলা বিরাট বাড়ী। সামনে পৃথিবীর সব স্বাধীন দেশে নানাবর্ণে রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উড়ছে। সঙ্গীর সঙ্গে ভেতরে ঢুকলুম। টিকিট কেটে অপেক্ষা করতে লাগলুম। এক এক গ্রুপে ১৫ জন হ'লে গাইড এসে সব ঘুরিয়ে দেখায়। U. N. O.-র এ-কয়টি প্রধান বিভাগ—General Assembly, Security Council, International Court, Economic and Social Council, Trusteeship Council and Secretariat. এছাড়া U. N. O. পরিবারে UNICEF, WHO, ILO, IFC এরকম ২২টি শাখা আছে। আমাদের গাইড General Assembly ও দু-তিনটি Council-এর ভিতর নিয়ে গেল এবং সব দেখাল। অধিবেশনের সময় জনসাধারণের জন্য আলাদা বসবার জায়গা আছে এবং তারা earphone দিয়ে কথাবার্তা শুনতে পারে। ভাষণ যুগপৎ চাইনিজ, ইংলিশ, রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ ও স্প্যানিশ—এই ৫টি ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রচারিত হয়। পৃথিবীর সব দেশের কর্মী U. N. O.-তে আছে। স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরা ও বিদেশীরা দলে দলে দেখতে আসে।

তারপর খুব বড় বড় কয়েকটি চার্চ দেখলুম। ৭০তলা-বিশিষ্ট রকফেলার সেণ্টার দেখে পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ ৫৯ তলা-বিশিষ্ট অফিস বাড়ী দেখলুম। বাড়ীটির নাম Pan Am Building।

তারপর দিন (১০ই জুন) এরিক ও জ্যাকের সঙ্গে আবার নিউইয়র্ক শহর ঘুরে দেখলুম। প্রথমে দেখলুম (অবশ্য একটু দূর থেকে) Statue of Liberty. ১৫১ ফুট উঁচু তাম্রমূর্তি। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের স্বাধীনতাপ্রিয় লোকেরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে উপহার দেয়। মূর্তিটিতে দেখানো হয়েছে—এক বিরাট নারীমূর্তি জগৎকে স্বাধীনতার দীপশিখা দেখাচ্ছে। একেই বলা হয়—The Gateway of America।

তারপর চললুম নিউইয়র্কের বিখ্যাত Metropolitan Museum of Art দেখতে। এরিক বিখ্যাত শিল্পী ও মিউজিয়মের একজন সভ্য। সব ঘুরিয়ে দেখাল।

দুপুরে গেলুম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে। সেখানেই দুপুরে ভারতীয় খিচুড়ি, তেলেভাজা ও চাটনী খেলুম। পূজনীয় স্বামী নিখিলানন্দজীর সঙ্গে অনেক কথা হল।

সন্ধ্যায় বেদান্ত সোসাইটির সভ্যদের সঙ্গে এক প্রশ্নোত্তরের ক্লাসে মিলিত হলুম। স্বামীজীর প্রতি তাঁদের কত অনুরাগ! সত্যি তাঁদের দেখে খুব আনন্দ হল।

তার পরদিন (১১ই জুন) এরিক ও জ্যাক গাড়ী করে কেনেডি বিমান-বন্দরে পৌঁছে দিল। আমি চললুম আটলাণ্টিক থেকে প্যাসিফিক মহাসাগরের কূলে—আমার নতুন কর্মস্থলে।

লস এঞ্জেলিস এয়ারপোর্টে দেখি মহা ভিড়। প্রায় ৪০।৫০ জন আমেরিকান ভক্ত এবং আমাদের হলিউড কেন্দ্রের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা এবং স্বামী অসক্তানন্দজী এগিয়ে এলেন। স্যাক্রামেণ্টো থেকে পূজনীয় শ্রদ্ধানন্দজী এসে-ছিলেন এক দিনের জন্য। প্রায় ১৪।১৫ বছর পরে তাঁকে দেখে খুব আনন্দ হল। ক্যামেরার ফ্লাসে ঝালাপালা হবার জোগাড়। এই গেরুয়াপরা সাধুকে দেখবার জন্য এত ভিড়—এ লক্ষ্য করে এক আমেরিকান ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন: 'আমি আগন্তুক। জানি না আপনি কে? একবার করমর্দন করতে চাই।' আমি হাত বাড়িয়ে দিলুম।

শব্দ ও অতিশব্দ

শ্রীবাসুদেব সিংহ

প্রকৃতির যে মুখ আমরা দেখি তার সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য যেমন অনন্ত, প্রকৃতির যে সুর শুনি তাও তেমনি কম মনোহারী নয়। আমাদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রকৃতি দেবী শব্দ ও সুরের অন্তহীন নাটকের অবতারণা করেছেন—মেঘের গুরু গুরু গর্জন, সমুদ্রের কল্লোল, ঝরণাধারার কলতান, কোকিলের কুহুতান, ভ্রমরের গুঞ্জন, অরণ্য প্রান্তরের বিচিত্র ধ্বনি-সুষমা, নিশীথের ক্ষীন শব্দ—আরও কত শ্রুতিতরঙ্গ কানের পর্দায় প্রতিনিয়ত ভেসে আসে।

শব্দ একটা শক্তি—আলো, তাপ, বিদ্যুৎ, চুম্বকের সমগোত্রীয়। শব্দের সংজ্ঞা: যে বাহ্যিক কারণে আমাদের কানে শ্রবণ-অনুভূতি জাগ্রত হয়, তাকেই বলে শব্দ।

শব্দবিদ্যার সঙ্গে মানুষের পরিচয় আজকে নয়। ভারতের সত্যদ্রষ্টাগণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণানুসারে জগতের উপাদানগুলির পাঁচটি ভাগ করেছেন; স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদানগুলির নাম স্থূল পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। ক্ষিতির লক্ষণ (গুণ) হ'ল, তাতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি গুণই থাকবে, তবে বিশেষ গুণ গন্ধ, যা অপ্ প্রভৃতিতে নেই। অপ্—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস—এই চারগুণযুক্ত; বিশেষ গুণ রস। তেজ শব্দ, স্পর্শ, রূপ—এই তিনগুণযুক্ত; বিশেষ [illegible] রূপ। মরুৎ—শব্দ-ও স্পর্শগুণযুক্ত; বিশেষ গুণ স্পর্শ। আর ব্যোম—কেবলমাত্র শব্দগুণযুক্ত। পঞ্চভূতেই যে সাধারণ লক্ষণ বা গুণটি বর্তমান, তা হচ্ছে এই শব্দ।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের পাতা ওলটালে স্তম্ভিত হতে হয়, সে বিজ্ঞানে কত দূর অগ্রণী ছিল! শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে কণাদের তরঙ্গবাদ মৌলিক একটি আবিষ্কার। বায়ু-তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে শব্দের প্রসারণ হয়, সে কথা কণাদ দু-হাজার বছরেরও আগে ঘোষণা করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত, "সেই প্রাচীন যুগের এই অভিনব সিদ্ধান্ত যুগপৎ আমাদের মনে সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে।" প্রখ্যাত ঐতিহাসিক পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 'প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান-চর্চা' গ্রন্থে লিখেছেন, "গতি ও শ্রুতির মূল তত্ত্বগুলি (Theories of the motion and acoustics) সম্বন্ধেও প্রাচীন হিন্দুগণ উচ্চ স্তরের বৈজ্ঞানিক ধারণা পোষণ করিতেন।" ভারতীয় বিজ্ঞানীরাই প্রথম বলেছেন, ধ্বনি ও বর্ণের (অক্ষর) মূল এই আকাশ বায়ুতে আহত হলে সুরাদির উদ্ভব হয়।

পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানধারায় শব্দবিদ্যার চর্চা বেশীদিনের নয়। কিন্তু নব্য বিজ্ঞানের জয়-যাত্রা লক্ষ্য করলে মনে হয় শব্দ-বিদ্যার চর্চা আজ অতি উচ্চস্তরে উপনীত। শব্দবিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের মূলে বহু সাধকের সাধনা মিলিত হয়েছে। এই সাধনার ক্ষেত্রে পিথাগোরাসকে (জন্ম খৃঃ পূঃ ৫৮২) পথিকৃৎ বলা যায়। তারপর নিউটন, লেপলাস, হেল্মহোজ, কুণ্ড, রামন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই শব্দ নিয়ে নতুন নতুন গবেষণা করে গেছেন। পিথাগোরাস বলেন, শব্দ এক ধরণের স্পন্দন। স্প্রিং-এর দোলার মত তা জল-বাতাস বা যে-কোন

বস্তুকে আশ্রয় করে আলোড়িত হয়। এর নাম শব্দতরঙ্গ। শব্দতরঙ্গ প্রবাহিত হওয়ার জন্য যে-কোন বস্তু মাধ্যমরূপে প্রয়োজন। চাঁদের দেশে বায়ুমণ্ডল নেই, তাই চাঁদ নিঝুম-পুরী ; চাঁদের পিঠে অবিরাম অবিশ্রাম উল্কাপাত হয় ভীমবেগে, কিন্তু নিঃশব্দে, কারণ কোন শব্দই শোনা যায় না বায়ুর অভাবে—চাঁদের মাটিতে কান রেখে শুয়ে পড়লে কিন্তু শব্দ নিশ্চিত শোনা যাবে, মাটি-পাথরের ভেতর দিয়ে। কথাবার্তা চলে বেতার-প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র দিয়ে। আলোর মতো শব্দ পদার্থ-হীন শূন্য মাধ্যমের ভেতর দিয়ে সঞ্চালিত হতে পারে না। আলোকের তুলনায় শব্দের বেগ অতি নগণ্য। শব্দ প্রতি সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট অর্থাৎ ৩৪১'৩৭ মিটার পথ যায়—এখানে শব্দের মাধ্যম শুষ্ক বায়ু আর তার উষ্ণতা ০° সেন্টি-গ্রেড। আর আলোক প্রতি সেকেণ্ডে যায় ১৮৬,০০০ মাইল অর্থাৎ ২,৯৯,৩ ৮ কিলো-মিটার—আলোকের মাধ্যম শূন্যস্থান বা বায়ু। গতিবেগের এই বিরাট তারতম্যের ফলে আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিকের বেশ কিছুক্ষণ পরে আমরা মেঘের গুরু গুরু ডাক শুনতে পাই। বায়ুতে জলকণা থাকলে শব্দতরঙ্গের বেগ যায় বেড়ে ; তরল পদার্থের মধ্যে শব্দ চলে আরও দ্রুত। কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে শব্দের গতিবেগ তার থেকেও বেশী। একটা কথা মনে রাখতে হবে, শব্দসঞ্চালনের জন্যে কেবল পদার্থ-মাধ্যম থাকলেই চলবে না, এই মাধ্যম নিরবচ্ছিন্ন আর স্থিতিস্থাপক হওয়া চাই। স্থিতিস্থাপকতাহীন পদার্থ বাস্তব জগতে নেই। অতি কম স্থিতিস্থাপক পদার্থ হল কাঠের গুঁড়ো, তুলো, ফেল্ট ইত্যাদি। এদের মধ্য দিয়ে শব্দের দ্রুত শক্তিহ্রাস ঘটে, শব্দ বেশী দূর এগোতে পারে না। সেজন্য সভাগৃহ, আকাশ-বাণীর স্টুডিও-র দেওয়াল প্রভৃতি এইজাতীয় মন্দ-পরিবাহক দিয়ে মোড়া থাকে—যাতে শব্দ প্রতিধ্বনিত না হতে পারে।

শ্রুতিগোচর শব্দের ভেতরেও ছোট-বড় নানা ধরনের ঢেউ রয়েছে। ঢেউয়ের কম্পনাঙ্ক যত বড় তার দৈর্ঘ্য তত ছোট। শব্দের কম্পনাঙ্ক যত বাড়ে, স্বরগ্রাম তত উঁচুতে ওঠে। শ্রুতির গোচরে আসে সেই শব্দ-গুলো, যেগুলো নিতান্ত কানের একটা বাঁধা-ধরা সীমার মধ্যে। যেখানে কোন শব্দ শুনতে পাই না, সেই শব্দহীন বলে মনে-হওয়া স্থানেও খুব কম শব্দ অথবা অতিশব্দ—ইন্‌ফ্রাসোনিক অথবা সুপারসোনিক শব্দতরঙ্গ রয়েছে। এই-জাতীয় শব্দতরঙ্গের কম্পনাঙ্ক সাধারণ শব্দের কম্পনাঙ্ক থেকে কম বা বেশী। মানুষের শ্রুতিযন্ত্র সেকেণ্ডে ২০ থেকে ২০,০০০ কম্পনাঙ্কের মতো শব্দের অনুভূতি পায়। ২০ থেকে কম কম্পনাঙ্কের শব্দতরঙ্গকে বলে ইনফ্রাসোনিক এবং ২০,০০০ থেকে বেশী কম্পনাঙ্কের শব্দতরঙ্গকে বলে সুপারসোনিক। ফ্রিজ্যান্ট পাখী শুনতে পায় ইনফ্রাসোনিক শব্দ। আবার বাদুড় ও চামচিকে সৃষ্টি করে, অনুভবও করে সুপারসোনিক বা শব্দোত্তর তরঙ্গ। এ ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের কত শত শব্দ আমাদের শ্রুতির অগোচরে থেকে যাচ্ছে, তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। শ্রুতিগোচর শব্দেই তরঙ্গগুলি আকারে বড়, তার জন্যে প্রতিফলকপৃষ্ঠের আকারও বড় হওয়া চাই আর তরঙ্গগুলির প্রতিফলনের পর তার জোরও যায় কমে। কিন্তু শব্দোত্তর তরঙ্গের বেলায় তা হবার জো নেই। তাই প্রতিফলন-প্রক্রিয়ার সাহায্যে যেসব কাজ করা সম্ভব তাতে শব্দোত্তর তরঙ্গ বিশ্বাসী ভৃত্যের মতো মানবসেবায় লেগে গেছে।

প্রতীচ্যের প্রবাদ—প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছিল, যার মধ্যে র‍্যাডার আর অতিশব্দ অন্যতম। শত্রুপক্ষের বিমানের অবস্থান-নির্ণয়ের কাজে লাগে প্রথমটি, আর শত্রুপক্ষের ডুবো জাহাজের অবস্থান-নির্ণয়, হিমবাহ ও সমুদ্রতলের প্রবাল-প্রাচীর অনুসন্ধানে অতিশব্দ-তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। পরে মানবকল্যাণের কাজেও একে লাগানো হয়েছে।

আলোকের উপস্থিতিতেই আমরা আমাদের চারিদিকে নানারকম জিনিস দেখতে পাই। অথচ ঘুটঘুটে অন্ধকারে কোথাও ধাক্কা না খেয়ে বাদুড় স্বচ্ছন্দগতিতে উড়ে বেড়ায়। এটা সম্ভব হয় কেমন করে? আগেই বলেছি, বাদুড় ওড়বার সময় এক ধরনের অতিশব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই অতি-উচ্চ কম্পনাঙ্কবিশিষ্ট তরঙ্গ, আশ-পাশের বাধা থাকলে তা থেকে প্রতিহত হয়ে আবার ফিরে আসে। ফিরে-আসা শব্দ থেকেই বাদুড় বুঝে নেয় বাধার উৎসটির অবস্থান,—বাধা এড়িয়ে সঠিক পথে উড়ে চলে। বাদুড়ের বাধা এড়াবার এই বিশেষ গুণকে কাজে লাগিয়ে রুশ বিজ্ঞানীরা একটি যন্ত্র তৈরি করেন। অতিশব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে নির্মিত যন্ত্রটিকে অন্ধদের পথ চলবার কাজে লাগানো হল। আবিষ্কৃত হল ওরিয়েণ্টার। মাত্র ২৩০ গ্রাম ওজনের এই যন্ত্রটিকে গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় নিয়ে যাওয়া যায়। ওরিয়েণ্টার জানায় শব্দের সঙ্কেত—অন্ধরা বুঝে নেয় বাধার আকৃতি ও প্রকৃতি। আজকের দিনে ওরিয়েণ্টার অন্ধের যষ্টি। যষ্টিটি আবিষ্কৃত হল মানুষের প্রকৃতি-পরিচয় থেকে।

অতিশব্দ-তরঙ্গ নব্য বিজ্ঞানীদের অন্যতম হাতিয়ার। সমুদ্রের গভীরতা মাপে ল্যাঙ্গেভিন যন্ত্র। এই যন্ত্রটির কার্যনীতি হল অতিশব্দ-তরঙ্গ প্রেরণ করা আর সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসা ওই তরঙ্গকে আবার ধরা। অতিশব্দ-তরঙ্গের গতিবেগ তো জানা থাকে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত যাওয়া-আসার সময়টুকু থেকে হিসেব করে গভীরতা পাওয়া যায়। অথৈ সমুদ্রে মাছধরার কাজেও অতিশব্দ-তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। এই শব্দহীন শব্দ আরও কত কি কাজে লেগে গেছে! তেল জলে ভাসে, মেশে না। জল ও তেলকে শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে একটি স্থায়ী সমসত্ত্ব অবদ্রবরূপে পরিণত করা সম্ভব। খাবার জল, দুধ, অন্যান্য পানীয় জীবাণুমুক্ত করতে, স্নেহ পদার্থ ও মোম তৈরীর কাজে একে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞান-মন্দিরে। শুধু তাই নয়, জামা-কাপড়ের ধুলো-ময়লা ঝেড়ে পরিষ্কার করে দিতে পারে এই শব্দহীন শব্দ।

থাইল্যাণ্ড ও সন্ন্যাসিসংঘ

স্বামী তথাগতানন্দ

পৃথিবী পরিবর্তনশীল। কিন্তু বর্তমান জগতের চিন্তাধারা এত দ্রুতবেগে পরিবর্তিত হচ্ছে যে, আমরা অনেকেই তা মেনে নিতে পারছি না। জৈবিক জীবনে উড়োজাহাজের গতিতে পরিবর্তন এলেও মানসিক জগতের পরিবর্তন যেন গরুর গাড়ীরই মতন। তবুও এই যুগে —বিশেষ এই দশকে—সর্বত্র দেখা যাচ্ছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সুর আমাদের মনে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সন্ন্যাসিসঙ্ঘ-জীবন কিরূপ হওয়া দরকার এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি সভা ডাকা হয় ব্যাংককে। ১৯৬৮-র ডিসেম্বরে (৯-১৫) দূরপ্রাচ্যের সন্ন্যাসি-প্রধান-বৈঠকে এইটি আলোচিত হয়। অনেক জ্ঞানবৃদ্ধ বিদেশী ধর্মনেতাও যোগ দিয়েছিলেন। সবারই এক উদ্দেশ্য—এই উন্মাদ, মদ-মত্ত জৈবিক সভ্যতার যুগে ধর্মচর্চা কিরূপে করা যায়, ধর্মের বাণী সাধারণের মধ্যে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা আজ অনেক বেশী। এঁদের মতে সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ই চিরদিন ধর্ম-আন্দোলনের নেতৃত্ব করে এসেছেন, "Monasticism is religious leadership" কিন্তু যুগের সঙ্গে তাল রাখার জন্য ধর্মজীবনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা দরকার। এসব গভীর তত্ত্ব এঁরা দরদ দিয়ে আলোচনা করেন। এইসব তথ্যপূর্ণ আলোচনা নিয়ে একটি পুস্তক রচিত হয়েছে ('A New Charter for Monasticism', University of Notre Dame Press, 1970, London), যাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূর-প্রাচ্যের বহুস্থানের ধর্মচিন্তা, সন্ন্যাস-জীবন, সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের কার্যকলাপ পাওয়া যায়।

থাইল্যাণ্ডে দঃ-পূঃ এশিয়ার কৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হয়েছে চীন ও ভারতের সভ্যতা। কাম্বোডিয়ার মাধ্যমে ভারতের কৃষ্টি থাইল্যাণ্ডে এসেছে এবং আজও এর প্রভাব সর্বত্র সুস্পষ্ট। আধুনিক অনেক পাশ্চাত্য দেশও তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের গভীর ছাপ রেখেছে জন-জীবনে। নিচু জমিতে ধান চাষই এদের প্রধান কৃষিকর্ম, প্রায় শতকরা নব্বই জন একাজে জীবিকা অর্জন করে। চীনের মত এদের পারিবারিক জীবন কঠিন নিয়মে আবদ্ধ নয়। পরন্তু এদের পারিবারিক জীবন আধুনিক মনের খুবই উপযোগী। আইন-শৃঙ্খলার এত বাড়াবাড়ি নেই। রাজনৈতিক জীবন দেশের রাজাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। রাজার প্রভাব সমাজ-জীবনেও বেশ স্পষ্ট। রাজা ধর্মের প্রতীক, জনগণের পিতৃ-স্থানীয়। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সর্বত্র এবং এই ধর্মের অনুশাসন নৈতিক ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করেছে। প্রেতাত্মার উপর এদের বিশ্বাস আছে। প্রধানতঃ শান্তপ্রকৃতির মানুষ এরা। কোন উগ্র, রক্তাক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ আসেনি। এসেছে সহজ ভাবেই।

গ্রাম নিয়েই এই দেশ। প্রায় ৩০০-৩০০০ লোক নিয়ে এক একটা গোষ্ঠী-জীবন দেখা যায়। সবার সঙ্গে এরা বিশেষ পরিচিত। কাজেই গোষ্ঠী-জীবনে এদের পারস্পরিক ঐক্যবোধ বেশ জাগ্রত। প্রতি গ্রামের মধ্যস্থলে একটি সন্ন্যাসিসঙ্ঘ। এরা বলে wat। ১৯৬৬-তে

এদেশে ২৪,১০৫টি ওয়াট ছিল। সবই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। ১৯৬২-তে ২৩৮,৫৭০ জন বৌদ্ধভিক্ষু ছিল। ১৯৬৪ তে ৭৩% স্কুল ওয়াটের মাধ্যমে পরিচালিত হোত। এখন আর সে প্রভাব নাই। পূর্বে সন্ন্যাসীরাই শিক্ষক-রূপে কাজ করতেন। ১৯৮৮-তে ৩০,০০০ সন্ন্যাসীর দ্বারা ২০০,০০০ ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সে সময় মাত্র ৪৭১ জন সাধারণ শিক্ষক ছিল গোটা দেশে। ১৯১৭-তে 'ওয়াটে'র অধীনে ছিল ২১,০৫৩ ছাত্র আর অন্যত্র ১৪৬,৭৩৪ জন। আজ সব স্কুলই সরকার-পরিচালিত। অবশ্য বেশির ভাগ, প্রায় ৭০% স্কুল 'ওয়াটে'র বাড়ীতে বসে আজও। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এদের সামাজিক জীবনে খুবই প্রবল।

ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সবই এই 'ওয়াট'কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। গ্রাম্য-জীবন বলতে এই 'ওয়াট'। পারিবারিক জীবনের শোক, দুঃখ, আনন্দ, সবই একে কেন্দ্র করে। সমাজের শান্তি-ও শৃঙ্খলারক্ষায় মঠাধ্যক্ষের প্রভাবও রয়েছে: "It is the centre of village life, feasts of various kinds and funerals take place there. It is the centre in sickness and distress and in joyful family events. The wat, the monastery is the principal institution of the villages. Its support is considered a very inportant responsibility of the town, and this by the villages themselves. The abbot of the village monastery is often a community leader whose influence is directed towards peace and harmony." শহরের লোক আজকাল কম যাতায়াত করে 'ওয়াটে'। সেটা নানান কারণে: পাশ্চাত্যের আদর্শে ভোগ-জীবন-দর্শন এবং আধুনিক নাগরিক জীবনে সময়ের অভাব।

'ওয়াটে' দু-ধরণের সাধু থাকেন, এক যাঁরা চিরদিনের জন্য এই জীবন নিয়েছেন, আর যাঁরা স্বল্প দিনের জন্য আশ্রমবাস করছেন। শেষের দল কয়েক দিন, কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক বছরের জন্যও আশ্রমবাস করতে পারেন! পুরুষরাই বেশী, যদিও নারীদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা আছে।

অনেক সময় সাধারণ-লোক আসে পুণ্য-অর্জনের জন্য; আশ্রমবাসের পুণ্য পিতা-মাতা বা গুরুজনদের প্রাপ্য, তাছাড়া জন-জীবনে প্রতিষ্ঠার মাপকাঠি এই আশ্রমবাস; বেশীদিন বাস করলে বেশী সম্মান পায়। নেতৃত্বপদে এই সব ব্যক্তিকেই বরণ করা হয়। বিবাহের সময়ও এর মূল্য অনেক, মঠে কিছুদিন বাস না করলে তাকে গ্রাহ্যই করবে না কেউ: They will not trust a youngman who has not spent some time in a monastery He is not yet considerd to be mature." দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যও অনেকে আসে। সৌভাগ্যের দিনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যও আসে এখানে। চাকরিতে বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কাজ পাওয়া সহজ হয় এখানে জীবন কাটালে কিছুদিন। শুধু বাস করা নয়, আশ্রমে নানা বিদ্যার চর্চা হয়। কাজেই যারা কিছুদিন আশ্রমবাস করে তাদের শিক্ষাদীক্ষার মান স্বভাবতই উঁচু। বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান, বৌদ্ধ শিক্ষা ও বৌদ্ধ বিশ্বাস সমাজ-জীবনকে এক সুদৃঢ় ভিত্তিতে বেঁধে দেয়। এই ধর্ম জন জীবনে এনেছে শান্তি ও সপ্রেম ব্যবহার। শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে ধর্ম-পালনের

উপর। কাজেই ধনী ব্যক্তি প্রথমে দান করেন 'ওয়াটে', সেটা এদের পক্ষে সবচেয়ে পুণ্য কাজ, তারপর পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজন, সর্বশেষে জন-হিতকর কাজে দান। কারণ পুণ্যের ভাগ সেখানে কম, কাজেই পুণ্য-অর্জন জীবনের বড় লক্ষ্য।

দান বড়-নয়। দানের গ্রহণ বড় জিনিস। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দান গ্রহণ করলেই অন্যেরা দান গ্রহণ করে থাকে। নচেৎ কেউ দান গ্রহণ করবে না! জন-সাধারণের সঙ্গে সঙ্ঘের বেশ ভাল সম্পর্ক—"The villagers are in contact of the monks every day. The monks are invited to meetings and asked for counsel in secular problems. There is great correspondence between the affluence of the wat and the affluence of the villages, because the monastery belongs to the villages, it is something the villages take pride in." (P 65)

এ-ধরনের সম্মান পাবার যোগ্যতা সন্ন্যাসীদের আছে, কারণ তাঁরাই গোটা গ্রামের অভিভাবক। তাঁদের কর্মতৎপরতা, পারদর্শিতা ও ধর্মজীবন খুবই উন্নত। গ্রামের শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থনৈতিক জীবন, সবকিছুর জন্য এঁরা প্রচুর পরিশ্রম করেন। ধর্মীয় জীবন ছাড়াও জীবনের বহু সমস্যায় এঁরা এগিয়ে আসেন। আর সাধুদের জীবন খুবই পবিত্র ও শান্ত, আদর্শস্থানীয়। সাধুবিহীন সমাজ এঁরা কল্পনা করতে পারেন না। "If there were no monks, Buddhism would become meaningless to its lay adherents.··· Monks are connected with marriage ceremonies, with house-warming ceremonies, with sickness, with death and with protetion against, all evil omens. শুধু তাই-নয়, সাধুদের আশীর্বাদ ভিন্ন সরকারী জন হিতকর কাজও শুভ নয়। "Endorsement by the monks of Govt. Project is necessary for their success."

জগতে দেখা যায় শ্রদ্ধেয় না হলে শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না, থাই অর্থাৎ বৌদ্ধরা সম্মান দেয়, সব কাজে ডাকে সাধুদের, কারণ সাধুরা গোটা গ্রামবাসীর মঙ্গলের জন্য চিন্তা করেন, পরিকল্পনা করেন, উৎসাহ দিয়ে কাজে লাগান মানুষকে এবং গ্রামে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শারীরিক পরিশ্রম ও কর্মকুশলতা দিয়ে জন-হিতকর পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করেন। তাঁরাই গ্রামের মধ্যমণি। তাঁদের সাহচর্যে এদের সর্বপ্রকার উন্নতি হয়। সে জন্যই এরা তাঁদের এত মানে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এঁদের দান অসীম। অর্থকরী, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনের সব কিছু প্রেরণা ও সক্রিয় সাহায্য আসে সাধুদের কাছ থেকে। সাধুদের জীবনও সত্যিই উন্নত। "Monks cannot mix intimately with the lay population—not, certainly, on the same terms. But on the other hand, their presence is essential for the peace of mind and the tranquility of society.... It is the ability of the monk to serve as a vehicle for merit by his own personal holiness that makes him really useful to the village population, and this monastic aspect of monkhood serves as the ultimate cultural reason for the monk's existence. They cultivate merit so that they also may improve

their lives with merit." (p 66)

থাইল্যাণ্ডে পাদ্রীদের প্রভাব কম। থাইদের কাছে বুদ্ধের অনুশাসনই সব, তাদের জীবনে অন্য ধর্মের প্রয়োজনও নেই। "The Church in Thailand and in many other Theravada Buddhist countries is not felt to be needed by the Buddhist population. True Buddism offers a total and satisfactory answer to their religious needs. You will not find any Buddhist community in Thailand that will make a special call to a western monastic organisation to found a Christian monastery in Thailand." (p 68)

পাঠক যেন মনে না করেন যে, বেশীরভাগ লোকই সেখানে সন্ন্যাসী। আসলে তা নয়; সন্ন্যাসিসঙ্ঘে "temporary-monks" (সাময়িক সন্ন্যাসী) অনেক। সারা জীবন সন্ন্যাসিসঙ্ঘে কাটান এমন লোকের সংখ্যা কম। বর্তমানে প্রায় ১৫১,৫৬০ জন সন্ন্যাসী আছেন। ৮৭,০.০ জন বিদ্যার্থীও এঁদের সঙ্গে বাস করেন। ২২,৪০২ প্যাগোডায় তাঁরা সব ছড়িয়ে আছেন। খৃষ্টান (ক্যাথলিক)-দের সংখ্যা নগণ্য।

সন্ন্যাসীরা প্রাচীন কালের মতো শুধু অধ্যাত্মচর্চায় জীবন কাটান—এটা বর্তমান যুগের অভিপ্রেত নয়। অধ্যাত্ম-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনের সর্ব স্তরে সন্ন্যাসীদের সক্রিয় সাহায্য দেওয়া হয় এখানে। এইভাবেই জনগণ ও সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছে।

এযুগ এইটাই চাইছে।

"আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে,
আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে
তুলে নিতে হবে?"

-শ্রীশ্রীমা

বেলুড় মঠে প্রথম দুর্গাপূজা

শ্রীশঙ্কর রায়চৌধুরী

তখন পূজার বাকি কয়দিন রবে,
বেলুড়েতে স্থির হ'ল দুর্গাপূজা হবে।
দশভুজা আসিছেন হাঁটি গঙ্গা দিয়া—
প্রভুর সন্তান এক স্বপ্নেতে দেখিয়া
কহিতে স্বামীজী কন, এইবার তবে
মঠেতে মায়ের পূজা করিতেই হবে।
শ্রীশ্রীমার অনুমতি চাহিবারে গেলে,
সানন্দ সম্মতি তাঁর সাথে সাথে মেলে।
স্বামীজী করিলা স্থির সকল তখন,
ব্রহ্মানন্দ করিলেন পূজা আয়োজন।
নীলাম্বর-বাটীটিরে লইয়া ভাড়ায়,
নারীভক্তসহ সবে আনিলেন মায়।
বোধনের পূর্বদিনে মৃন্ময়ী প্রতিমা
আনিয়া মঠেতে নাই আনন্দের সীমা।
শ্রীশ্রীমার নামে হয় সঙ্কল্প পূজার,
শ্রীঈশ্বর ভট্টাচার্য্য হন তন্ত্রধার।
কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী পূজার পুরুত,
মহাপূজা মাঝে নাহি রহে কোন খুঁত।
অধিবাস সন্ধ্যায় বিল্বমূলে হয়,
আজও বেলুড় মঠে সেই পীঠ রয়।
কলাগাছ দিয়া সাজে শ্রীদ্বার তোরণ,
জননী সারদা-মার হল আগমন।
'জয় মহামায়া জয়' গম্ভীর নিস্বন,
সন্তানেরা জয়রবে পূরিল গগন।
গৃহী সাধু সকলের অন্তরেতে হাসি,
মঠের প্রতিটি বৃক্ষ দুলিছে উল্লসি।
নহবত বাজি ওঠে মধু তান ধরি,
গঙ্গা বহি যায় সেই আনন্দলহরি।
ভক্তগণ শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ পূজে,
মহামায়া নরদেহে, ভাগ্যবানে বুঝে।
মায়ের আদেশে মঠে বলি নাহি হয়,
রাশি রাশি মণ্ডা ভোগ শোভা করি রয়।
নারায়ণ জ্ঞানে সেবা দরিদ্রেরা পায়,
গরীব কাঙ্গাল যত মহাভোজ খায়।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কিছু হ'লো নিমন্ত্রণ,
অপার আনন্দে ভরে সবাকার মন।
শ্রীপ্রভু নবমী রাতে গাহিতা যে গান,
স্বামীজী গাহিলা তার দুই চারি খান।
দিব্যানন্দময় মহাপবিত্র উল্লাসে
বেলুড় মঠের 'পরে স্বর্গ নামি আসে।
পূজাকালে মূরতিতে আবির্ভূ'তা যিনি,
পূজার মণ্ডপে নরদেহে ব'সি তিনি
আপনারি মহাপূজা করিয়া দর্শন,
অপার আনন্দে ভরি' সন্তানের মন,
আশীর্বাদ করি সবে, একাদশী দিনে
কলিকাতা ফিরিলেন অতি হৃষ্ট মনে।

সমালোচনা

ঋগ্‌বেদ (প্রথম হইতে নবম খণ্ড)—সম্পাদক: শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ, নবদ্বীপ, নদীয়া। মোট পৃষ্ঠা ৩৫৮; মূল্য প্রতি খণ্ড দুই টাকা।

বেদ জ্ঞানের ভাণ্ডার। বেদ সম্বন্ধে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন: "শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত 'বেদ' বুঝা যায়। ধর্ম-শাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম। পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য—যে পর্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্যন্ত। 'সত্য' দুই প্রকার—(১) যাহা মানবসাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত; (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য। প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারে সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়। 'বেদ' নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং উহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন। ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তি দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম 'বেদ'।"

প্রাচীনতার দিক হইতে ঋক্ সাম যজুঃ অথর্ব—এই বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে ঋগ্‌বেদ প্রাচীনতম। সুপণ্ডিত শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় বেদপ্রচারে বিশেষ আগ্রহী। তিনি মূল ঋগ্‌বেদ-সংহিতার মন্ত্র ও সায়ণাচার্যের ভাষ্যানুমোদিত বঙ্গানুবাদ-প্রচারে দীর্ঘকাল বিশেষভাবে ব্রতী থাকিয়া প্রযত্ন করিয়া চলিয়াছেন। ভগবৎকৃপায় সম্প্রতি তাঁহার সম্পাদিত ঋগ্‌বেদ সুমুদ্রিত হইয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া আমরা খুবই আনন্দিত। আশা করি অশীতিপর বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় সুস্থশরীরে সম্পূর্ণ বেদ প্রকাশ করিয়া তাঁহার জীবনের মহত্তম ব্রত-উদ্‌যাপনে সমর্থ হইবেন।

অধুনা-প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের প্রথম খণ্ডে ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সূক্ত 'ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্' হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ সূক্ত পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রথম মণ্ডলের প্রথম অধ্যায়টি সম্পূর্ণ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বিংশ সূক্ত হইতে দ্বাত্রিংশ সূক্ত স্থান পাইয়াছে। এইভাবে অষ্টম খণ্ড পর্যন্ত প্রত্যেকটি খণ্ডে এক একটি অধ্যায় পরিবেশিত হইয়া প্রথম মণ্ডলের প্রথম অষ্টক ১২১টি মন্ত্রে সমাপ্ত হইয়াছে। নবম খণ্ডে প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় অষ্টকের প্রথম অধ্যায়টি স্থান পাইয়াছে।

অনুবাদ মূলানুগ, সুন্দর এবং আচার্য সায়ণের ভাষ্যানুযায়ী। দুরূহ শব্দার্থের তাৎপর্য প্রত্যেক পৃষ্ঠার নিম্নে সন্নিবেশিত হওয়ায় পাঠকগণের বিশেষ সুবিধা হইবে।

পরিশিষ্টে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি একত্র পরিবেশিত। প্রত্যেক গ্রন্থাগারে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এবং সজ্জনগণের গৃহে এই গ্রন্থাবলী বিরাজ করুক এবং সাদরে পঠিত হউক, ইহাই আমাদের কাম্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বন্যার্তসেবা: গত ৭ই আগস্ট হইতে রামকৃষ্ণ মিশন বন্যার্তসেবায় ব্রতী হইয়াছে। বর্তমানে বিহারের পাটনা ও মনিহারীতে এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার মানিকচক থানার সাতটি গ্রামে, মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও নিকটবর্তী অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে এবং ময়নাথানার বাকচা গ্রামে, মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছিতে, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর-অঞ্চলে শিমূলগাছি প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে এবং হাওড়া জেলার ঠিলা গ্রামে এই সেবাকার্য চলিতেছে।

উদ্বাস্তুসেবা: গত ১৪ই এপ্রিল হইতে রামকৃষ্ণ মিশন পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীদের সেবা করিতেছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে মোট ১১টি শিবিরে এই সেবাকার্য চলিতেছে। এই শিবিরগুলিতে মোট ১,৩৮,১২৭ জন শরণার্থী রহিয়াছেন। খাদ্য-বস্ত্রাদি ছাড়া ইঁহাদের চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্যও যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে; ডাউকী শিবিরে একটি প্রাইমারী স্কুল খোলা হইয়াছে, ১৫,২৪৮ জন শরণার্থীকে চিকিৎসা-সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। গত জুলাই মাসে শিবিরগুলিতে বিতরিত হইয়াছে :

চাল—	৭,২৫৯'৭৪	কুইণ্টাল
গম—	৫৯১'৯৮	"
ডাল—	৯৭৫'৭২	"
চিড়া—	১'৪২	"
সরিষার তেল—	১'৯৩	"
মশলা—	০'৮৭	"
লবণ—	১৩'১৮	"
গুড় ও চিনি—	১'০৭	"
সবজি—	১,৪৮৫'৩৩	কুইণ্টাল
জ্বালানি কাঠ—	১৭০'১০	"
গুঁড়া দুধ—	১৯'৪৬	"
বার্লি—	২'৮৯	"
গ্লাক্সো—	০'২৫	"
শিশুখাদ্য—	১'২১	"
বাসন—	৫৩৭	খানি
ত্রিপল—	৪২৬	"
মাদুর—	৫০	"
কাপড় জামা ইত্যাদি	৯,১৭৫	"
কম্বল—	২০০	"
লণ্ঠন—	৩০	টি
বই—	৩৫৯	খানি
জুতা—	৮	জোড়া

ভিত্তিস্থাপন

গত ১৬ই আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ রাজকোট আশ্রমে পরিকল্পিত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

বিবিধ

স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটির (আমেরিকা) অধ্যক্ষ, 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গত ১৭ই আগস্ট বোম্বাই এবং সেখান হইতে গত ৩১শে আগস্ট বেলুড় মঠে পৌঁছিয়াছেন।

কার্যবিবরণী

খেতড়ি (রাজস্থান) রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরের কার্যবিবরণী (এপ্রিল ১৯৬৯-মার্চ ১৯৭০) প্রকাশিত হইয়াছে। যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ খেতড়িতে যে ভবনে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই

স্থানেই রামকৃষ্ণ মিশনের এই শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে এই কেন্দ্র কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, একটি নার্সারি স্কুল, একটি মাতৃসদন (Maternity Home) পরিচালিত হইতেছে।

ফ্রি লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ৪,৫৭০, আলোচ্যবর্ষে সংযোজিত গ্রন্থসংখ্যা ৬৬৬। পাঠাগারে ৮টি দৈনিক, ৯টি সাপ্তাহিক ৪টি পাক্ষিক, ১৯টি মাসিক পত্রিকা লওয়া হয়। পাঠাগারে গড়ে দৈনিক উপস্থিতি ৩৮। গ্রন্থাগার হইতে গ্রাহকগণ আলোচ্য বর্ষে ৪,৯৬১ খানি পুস্তক পড়িতে লইয়াছিলেন

৩ হইতে ৮ বৎসরের শিশুদিগকে 'সারদা শিশুবিহার' নার্সারি স্কুলে ভরতি করা হয়। মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৫৬ (বালিকা ৫০)। ৫০টির বেশী ছেলেমেয়ে হরিজন ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের। মাতৃসদনে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১৩৬।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। জন্মাষ্টমী, বুদ্ধপূর্ণিমা, শঙ্করজয়ন্তী প্রভৃতিও উদ্‌যাপিত হয়।

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন বন্যাত্রাণ কার্য

জনসাধারণ অবগত আছেন যে, সম্প্রতি বিধ্বংসী বন্যায় পশ্চিম বঙ্গ ও বিহারে অবর্ণনীয় ক্ষতি হইয়াছে। মানুষের দুঃখ-কষ্টের সীমা নাই।

গত এপ্রিল মাস হইতে রামকৃষ্ণ মিশন তিনটি রাজ্যে এগারটি শরণার্থী শিবিরে ১,৩০,০০০ শরণার্থীদের মধ্যে সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকিলেও, বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে বিহারে পাটনার নিকটবর্তী অঞ্চল ও মনিহারীতে, পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার সাতটি গ্রামে, মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং ময়না থানার বাকচা গ্রামে, মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছিতে, এবং নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর অঞ্চলে বন্যাসেবাকেন্দ্রস্থাপনে বাধ্য হইয়াছেন। সহস্র সহস্র বন্যাপীড়িত শিশু ও নরনারী সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন লইয়া ত্রাণকেন্দ্রে আসিতেছেন। ধুতি, শাড়ী, কম্বল, ঔষধপত্র বাসন, শিশুখাদ্য প্রভৃতির একান্ত প্রয়োজন।

সহৃদয় দেশবাসীর নিকট এই ত্রাণকার্যে সাহায্যের জন্য আমরা সনির্বন্ধ আবেদন জানাইতেছি। এই উপলক্ষে যে-কোন সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় ধন্যবাদের সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। 'চেক' Ramakrishna Mission এই নামে লিখিবেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন
পোঃ বেলুড় মঠ, (হাওড়া)
ফোন: ৬৬-২৩৯১

২০ আগষ্ট, ১৯৭১

পরলোকে বশীশ্বর সেন

দুঃখের সহিত জানাইতেছি, ভারতের কৃষিবিজ্ঞানের অন্যতম অগ্রণী বৈজ্ঞানিক বশীশ্বর সেন গত ৩১শে আগষ্ট ৮৪ বৎসর বয়সে রাণীক্ষেত সামরিক হাসপাতালে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর তাঁহার জীবন প্রধানতঃ কলিকাতাতেই অতিবাহিত। পাঠ্য জীবনেই তিনি শ্রীশ্রীমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সকলেরই বিশ্বাস ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন তিনি। কলেজে পড়িবার সময় প্রায় প্রতিদিনই তিনি বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাটী আসিতেন; মন্ত্রদীক্ষা পাইয়াছিলেন স্বামীজীর প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দের নিকট হইতে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি লাভ করেন। ভগিনী নিবেদিতা, ক্রিষ্টিন ও ম্যাকলাউডের স্নেহপাত্র ছিলেন তিনি। নিবেদিতার কাজকর্মে নানাভাবে সহায়তাও করিয়াছেন। ভগিনী নিবেদিতাই তাঁহাকে স্যর জগদীশ বসুর সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। পরে তিনি শ্রীবসুর একজন বিশেষ সহকারী হইয়া উঠেন এবং তাঁহার পরিচালনায় ১২ বৎসর গবেষণা করেন। ডক্টর বসুর ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান ভ্রমণের সময় তাঁহার সঙ্গেও গিয়াছিলেন। কিছুদিন তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত ছিলেন। ভারতের কৃষি-গবেষণার (উদ্ভিদের মূল দেহতত্ত্ব বিষয়ক) অন্যতম অগ্রণী গবেষণাকেন্দ্র 'বিবেকানন্দ রিসার্চ লেবরেটরী'-র তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে গবেষণাকেন্দ্রটি কলিকাতার ৮নং বোসপাড়া লেনে প্রথম স্থাপন করিয়া পরে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সেটিকে আলমোড়ায় স্থানান্তরিত করেন। জীবনের পরবর্তিকাল তিনি এই গবেষণাগারের কাজেই নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে গবেষণাগারটি সরকারের হস্তে অর্পিত হইবার পর তিনি উহার ডিরেক্টররূপে কাজ করিতেছিলেন। বিবেকানন্দ ল্যাবরেটরীর গবেষণার ফলেই ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম উন্নত জাতের ভুট্টা উৎপন্ন করা সম্ভব হয়। উন্নত ধরনের ধান ও গম উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই ল্যাবরেটরীর গবেষণা মূল্যবান বলিয়া স্বীকৃত।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারত সরকারের পদ্মভূষণ উপাধি এবং ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ওয়াটুমল ফাউণ্ডেশন এ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। ভারত সরকারের কৃষিবিষয়ক উপদেষ্টা, ইংলণ্ডের ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটির এবং আমেরিকার বোটানিক্যাল সোসাইটির সভ্যও ছিলেন তিনি।

তাঁহার কর্মতৎপরতা, উৎসাহ ও সরল ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করিত। শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

বিবিধ সংবাদ

এ্যাপোলো—১৫

আমেরিকার চতুর্থ চন্দ্রাভিযান পূর্বনির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী সুসম্পন্ন করিয়া ডেভিড আর. স্কট (অভিযানের অধিনায়ক), আলফ্রেড এম. ওরডেন (চন্দ্রযান-চালক) এবং জেমস ডি. আরউন (মূলযান-চালক) গত ৭ই আগষ্ট রাত্রি ২টা ১৬ মিনিটে (ভারতীয় সময়) প্রশান্ত মহাসাগরে নির্বিঘ্নে অবতরণ করিয়াছেন। গত ২৬শে জুলাই রাত্রি ৭টা ৪ মিনিটে তাঁহাদের লইয়া অ্যাপোলো ১৫ কেপ কেনেডি হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

গত ৩০শে জুলাই রাত্রি ৩-৩৬ মিঃ সময়ে চন্দ্রযান 'ফ্যালকন' স্কট ও ওরডেনকে লইয়া চন্দ্রপৃষ্ঠে অ্যাপিনাইন পর্বত (১২,০০০´ উঁচু) এবং গিরিখাদ হ্যাডলীর (১,২০০´ গভীর) মধ্যবর্তী স্থানে অবতরণ করে। স্কট ও ওরডেন চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেন ৩১শে জুলাই, সন্ধ্যা ৬-৪৮ মিনিটে। এবারের অভিযানের বৈশিষ্ট্য—তাঁহারা একটি মোটরগাড়ীও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহাতে চড়িয়া তিন দফায় চন্দ্রপৃষ্ঠে ঘুরিয়াছেন। গাড়ীটি ঘণ্টায় ৫ মাইল বেগে চলিয়াছিল। এখান হইতে যে শিলাখণ্ড লইয়া তাঁহারা ফিরিয়াছেন, বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস তাহা সৌরমণ্ডলের প্রাচীনতম শিলা।

এবারের অভিযানে অভিযাত্রিদ্বয় চন্দ্রপৃষ্ঠে মোট ৬৭ ঘণ্টা কাটাইয়াছেন; চন্দ্রযানের বাহিরে আসিয়া চন্দ্রপৃষ্ঠে তিন দফায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন মোট ১৯ ঘণ্টা।

ভ্রম-সংশোধন

এই সংখ্যায় ৪৭০ পৃষ্ঠায় 'মৃড়ানিস্তোত্রম্' শিরোনামটি 'মৃড়ানীস্তোত্রম্' হইবে। গত ভাদ্র সংখ্যায় ৪৩৯ পৃঃ, ১ম কঃ, ৮ম লাইনে '১৯০৩' স্থলে '১৯০০' এবং ৪৪২ পৃঃ, ১ম কঃ, ৩১শ লাইনে 'চত্ত' স্থলে 'দত্ত' হইবে।

দিব্য বাণী

তব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ।
মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্বং গ্রসিষ্যতি ॥
কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥
কাল সংগ্রসনাৎ কালী সর্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে ॥

— মহানির্বাণতন্ত্র, ৪।৩০-৩২

জগৎ সংহার করে যে মহাকাল,
তোমারি রূপ সে তো, একথা সুবিদিত !
মহাপ্রলয়কালে সকলি গ্রাসে ব'লে
বিশ্বে মহাকাল নামে সে কীর্তিত।
সে মহাকালকেও তুমি যে কর গ্রাস—
কালেরও আদিতে যে তুমি মা, কালিকে !
মহাকালের সাথে সকলি এ জগতে
এসেছে তোমা হতে বিশ্বপালিকে !
মহাপ্রলয়কালে সর্বনাশী তব
করাল গ্রাসে পুনঃ সকলি চ'লে যায় !
(বিশ্ব ভাসে ডোবে সৃজনে সংহারে
তোমাতে—অবিনাশী নিত্য মূলাধারে,)
আদি কারণ তুমি, আদ্যাকালী তাই !

জায়ন্তে চ ক্ষিতৌ বৃক্ষো
যথা পৃথ্ব্যাং বিলীয়তে।
তোয়াত্তু বুদ্বুদং জাতং
যথা তোয়ে বিলীয়তে।
জলদে তড়িদুৎপন্না
লীয়তে চ যথা ঘনে।
তথা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ
কালিকায়াং প্রজায়তে।
তথা প্রলয়কালে তু
পুনঃ তস্যাং প্রলীয়তে॥

—নির্বাণতন্ত্র, পটল ১০

ধরণী হতেই জনমি বৃক্ষ
ধরণীরই কোলে লুটে,
বুদ্বুদ মেশে সলিলে যেমন
সলিল হতেই উঠে,
জলদের বুকে ফুটিয়া দামিনী
মেশে জলদেরি গায়,—
তেমনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ-
আদি সব দেবতাই
কালিকা হইতে জনমি, প্রলয়ে
মেশে পুনঃ কালিকায়॥

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী, অনুরাগী প্রভৃতি সকলকেই আমরা ৺বিজয়ার শুভেচ্ছা ও প্রীতিসম্ভাষণ জানাইতেছি।

সকলেরই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য জগন্মাতার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি।

তান্ত্রিক সাধনা

যে-কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য আন্তরিক প্রযত্নের নামই সাধনা; তবে সাধারণতঃ সাধনা বলিতে চরম সত্য বা ভগবানলাভের জন্য অনুষ্ঠিত প্রচেষ্টাকেই বুঝায়।

তান্ত্রিক সাধনা বলিতে ব্যাপকভাবে ইহলোক ও পরলোকে ভোগ্যবস্তুলাভের সাধনা হইতে শুরু করিয়া ভগবানলাভের সাধনা পর্যন্ত সব কিছুই বুঝাইলেও সাধারণতঃ ভগবানলাভের জন্য সাধনাই বুঝায়। তান্ত্রিক সাধনার বৈশিষ্ট্য— ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, উচ্চ অধিকারী নিম্ন অধিকারী, সকলের জন্যই ইহার দ্বার উন্মুক্ত। জীবনের সর্ববিধ স্তর হইতেই মানুষকে লইয়া যাইতে হইবে জীবনের পরমতীর্থে—চরম সত্যে। যাত্রাপথ সকলের এক হইতে পারে না, একই সময়ে সকলে সেখানে পৌঁছাইতেও পারিবে না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কাহাকেও বাদ দেওয়া চলিবে না। পথে চলিবার শক্তি এবং সাহস কাহারো অপরিমেয়, কাহারো বা প্রায় নাই; তন্ত্রের কথা, তাহাতে কিছুই আসে যায় না— সকলেরই চলার মতো পথ আছে, যাত্রা আরম্ভ কর—যাত্রাপথেই ক্রমশঃ শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিতে পারিবে। কামক্রোধাদি পাশবিক ভাবের প্রাবল্য তোমার মধ্যে রহিয়াছে? ভোগেচ্ছা প্রবল? কি আর হইয়াছে তাহাতে—ভোগ তোমাকে ছাড়িতে তো বলিতেছি না। ভোগ ও মুক্তি একসঙ্গে থাকে না, একটি না ছাড়িলে অপরটি পাওয়া যায় না, 'যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষঃ, যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ' এই কথা শুনিয়াছ বলিয়াই সাধনায় অগ্রসর হইতে ভয় পাইতেছ তো? কোন ভয় নাই, ভোগও কর, মাকেও ডাক—দেবীর ভক্ত ভোগ ও মোক্ষ দুই-ই পায়; তাঁর ইঙ্গিতেই তো নিয়ম সৃষ্ট, তাঁর ইচ্ছাই তো নিয়ম, তিনি যে মা—সন্তান চাহিলে দুই-ই তিনি দেন—'শিবাপদাম্ভোজযুগার্চকানাং, ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব।' এই পরম আশ্বাস দিয়াই তন্ত্র অতি নিম্ন অধিকারীকেও মায়ের কাছে টানিয়া আনে। আবার মাকে কেন্দ্রে রাখিয়া চলিতে চলিতে যখন তাহার সাহস ও শক্তি বাড়িয়া যায় তখন শোনায়, 'তুমি বীর, তুচ্ছ ভোগের প্রলোভন তোমার কি করিবে? ওগুলির সহিত সংগ্রাম করিয়া ওগুলিকে পরাজিত করিয়া উচ্চতর আনন্দ-লাভের সাধনায় প্রবৃত্ত হও।' এই সাধনার

ফলে আরো সবল, আরো সাহসী হইলে তন্ত্র শেষে বলে, 'তোমার দেহমনবুদ্ধিরও অতীত, সৃষ্টির অতীত তোমার স্বরূপ। সেখানে তুমি ও মা এক। তোমার সেই স্বরূপ-উপলব্ধিই তোমার সাধনার মূল লক্ষ্য—সেখানে চল।'

সাধনায় মানুষকে প্রবৃত্ত করাইতে হইলে দুটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেই হইবে,—তন্ত্র তাহা রাখিয়াছেও। প্রথমতঃ, সাধকের ধারণাশক্তি যতটুকু তাহার মধ্য দিয়াই তাহাকে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে। তন্ত্র তাই চরম সত্যকে, যাকে 'আদ্যা' 'নির্গুণা' 'বাচ্যাতীতা' প্রভৃতি বলিলেও, যাহার উহা ধারণা করিবার মতো ক্ষমতা নাই (আমরা প্রায় সকলেই এই দলে, মনবুদ্ধির অতীত প্রদেশে না যাইলে উহা ধারণাই হয় না, শব্দ-মাত্ররূপেই থাকে,) তাহাকে বলিতেছেন, তিনি তোমার আমার মতই সাকারা, সগুণা, সন্তানের প্রতি অশেষ স্নেহময়ী 'মা'। তুমি যাহা চাহিবে, মা তোমাকে তাহাই দিবেন। দ্বিতীয়তঃ, ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য যতটুকু করিবার সামর্থ্য যাহার আছে ততটুকু সাধনার কথাই তাহাকে বলিয়া তাহাতে উৎসাহিত করিতে হয়। সাধনে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য এই উৎসাহই বড় কথা। সাধ্যাতিরিক্ত সাধনায় প্রবৃত্ত না হইলে ভগবানলাভ হইবে না, একথা শুনিলে সাধকের চিত্ত অবসন্ন হইবে, সাধনায় আঁট কমিয়া যাইবে, 'আমার দ্বারা ভগবানলাভ অসম্ভব' ভাবিয়া অবশেষে সে চেষ্টাই ছাড়িয়া দিবে।

আমরা যদি সকলেই প্রাথমিক পর্যায়েই সর্ববিধ ভোগ ও সর্ববিধ কর্ম হইতে বিরত হইয়া, বহির্বিষয় হইতে সব মন গুটাইয়া আনিয়া নির্গুণা নিরাকারা বাচ্যাতীতা পরাৎপরা মায়ের সঙ্গে নিজের একত্বের ধ্যানে মনকে স্থির করিতে পারি, তাহা হইলে আর অপর কোন ক্রিয়াকলাপবহুল সাধনাই আমাদের প্রয়োজন হয় না, উহাতেই আমরা বস্তুলাভ করিতে পারি, সত্য কথা। কিন্তু আমরা কয় জন ইচ্ছা- বা চেষ্টা-মাত্র মনকে বাসনাশূন্য করিতে পারি বা সর্ববিধ কর্ম হইতে বিরত হইয়া সর্বক্ষণ ধ্যান করিতে পারি? কিন্তু কাজ আমরা করিতে পারি সকলেই, বরং বলা যায় সাধারণতঃ কাজ ছাড়া থাকাই আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ। তন্ত্রে তাই ক্রিয়ার বাহুল্য, পূজা জপ ও অন্যান্য বহুবিধ ক্রিয়ার বিধান। কাজ কর, বাসনানুযায়ী কিছু ভোগও কর, কারণ প্রবল ভোগেচ্ছা যখন আছে, জোর করিয়া সর্ববিধ ভোগ হইতে সরিবার চেষ্টা করিলেও তুমি পারিবে না, কপটাচারী হইবে, যাহা সত্য-লাভের পথ হইতে তোমাকে আরো দূরেই সরাইয়া দিবে। তবে সবকিছু করো মাকে অবলম্বন করিয়া। আর একেবারে বেপরোয়া-ভাবে ভোগ নয়; শাস্ত্রবিধিমত ভোগ কর; উহাতে যে সামান্য সংযমের প্রয়োজন, তাহা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। এই মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাজ করা ও যথাসাধ্য সংযম-অভ্যাসের ফলেই মন ক্রমশঃ বাসনাশূন্য, ভোগবিমুখ এবং একাগ্র হইয়া উঠিবে। এ সাধনা অবশ্য সকলেরই জন্য নয়, সাধনার একেবারে প্রাথমিক স্তর এটি, পশুভাবের সাধনা। তারপর এভাবে চলিয়া মন উন্নত হইলে, অথবা পূর্ব পূর্ব জন্মের শুভসংস্কারবশে উন্নত মন লইয়াই জন্মিলে ভিন্ন সাধনায় ব্রতী হইবার কথা বলিয়াছেন তন্ত্র—বীরভাবের সাধনা।

বীরভাবের সাধনার মূল কথা হইল—

বাসনাজনিত দুর্বলতাকে ভয়ে পরিহার করিতে হইবে না, বীরের মত উহার সম্মুখীন হইয়া উহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, উহাকে পরাজিত করিয়া, উহা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। পাশবিক প্রবৃত্তি দ্বারা অসহায়ভাবে চালিত দুর্বল মানুষ আর নও তুমি, এখন তুমি বীর হইয়াছ। বুক ফুলাইয়া সংগ্রামে নাম, মা সহায় আছেন, ভয় কি? প্রচণ্ড ভয়ের পরিবেশে, দেহসুখভোগের দারুণ প্রলোভনের মধ্যে বসিয়াই মায়ের চিন্তায়—সত্যের চিন্তায় মগ্ন হও; ভুলিও না—তুমি দুর্বল নও তুমি বীর,—জোর করিয়া ভয়ত্রস্ত বা প্রলুব্ধ মনকে অভয়ের রাজ্যে, সুখদুঃখাতীত পরমানন্দের রাজ্যে—মায়ের চরণে—টানিয়া আনিয়া ধরিয়া রাখ। এ সাধনায় অতি শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। কারণ সব সাধনার যাহা মূল লক্ষ্য, মনকে সত্যে একাগ্র করা, তাহা ইহাতে শীঘ্র হয়। ভীষণ সন্ত্রাসের সময়, প্রচণ্ড প্রলোভনের সময় আমাদের মন ভয় বা ভোগেচ্ছায় স্বাভাবিকভাবেই খুব একাগ্র হয়; মনকে এইসব উপায়ে একাগ্র করিয়া, উহার দিক্-পরিবর্তন করিয়া মায়ের দিকে ফিরাইয়া দেওয়াই এ সাধনার উদ্দেশ্য। তবে এ সাধনায় যেমন শীঘ্র বস্তুলাভ হয়, তেমনি প্রলোভন ও সন্ত্রাসের জিনিস লইয়া সাধনা বলিয়া ইহাতে অনধিকারীর পক্ষে পতনের ভয়ও খুব বেশী। পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠিতে হইবে; পাহাড় বেড়িয়া বেড়িয়া উঠিয়া বেশ ঢালু পথ দিয়া সেখানে পৌঁছানো যায় সত্য, অধিকাংশের জন্য সে-পথই প্রশস্ত। কিন্তু যে এজন্ম- বা পূর্বজন্ম-কৃত সাধনার ফলে অধিকতর শক্তিমান ও কুশলী হইয়াছে, সে এত সময় নষ্ট করিবে কেন?—সে খাড়া পথ দিয়াই স্বল্প সময়ে সেখানে উঠিয়া যাইবে। যথাযথ শক্তিসঞ্চয়ের পূর্বেই যাহারা এ খাড়া পথে উঠিতে যায়, পতনের ভয় তাহাদেরই সমধিক।

যাঁহারা এইসব সাধনার ফলে আরো উন্নত মনের অধিকারী হইয়াছেন, অথবা সেরূপ মন লইয়াই জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য তন্ত্রে দিব্যভাবের সাধনার ব্যবস্থা। সাধনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরের সাধনা এই দিব্যভাবের সাধনা: 'পশুভাবং প্রথমকে, দ্বিতীয়ে বীরভাবকম্, তৃতীয়ে দিব্যভাবঞ্চ ইতি ভাবত্রয়ং ক্রমাৎ।' এ জন্মকৃত সাধনাতে হউক বা পূর্বপূর্বজন্মকৃত সাধনাতেই হউক, পশুভাবের সমাপ্তিতে বীরভাবের আরম্ভ, বীরভাবের সমাপ্তিতে দিব্যভাব শুরু। এগুলির মধ্যে ক্রমপরিণতির সম্পর্ক। অতি নিম্ন হইতে অতি-উচ্চভাবাপন্ন কোন মানুষকেই বাদ দেওয়া হইবে না, সকলকেই তাহার সাধ্যমত চলিতে শিখাইতে হইবে মহাতীর্থের পথে, চরম সত্য লাভের পথে ইহাই তন্ত্রের কথা। পথে চলিতে চলিতে, সাধনা করিতে করিতে সে উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবে উন্নীত হইতে হইতে চলিবে। ভাবের, মানসিক অবস্থার এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাধনপদ্ধতিও পরিবর্তিত হইবে, অনিবার্য কারণেই; যেমন দৈহিক উন্নতিসাধনার ক্ষেত্রে ব্যায়াম অভ্যাসের পদ্ধতি, যেমন বৌদ্ধিক উন্নতিসাধনার ক্ষেত্রে পাঠ্য বিষয় পরিবর্তিত হয়। যতক্ষণ আমাদের মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তি প্রবল, ততক্ষণ পশুভাবের সাধনার বিধান। এই সাধনায় আমরা পশুভাব অতিক্রম করিয়া 'মানুষ' হই; তখন বীরভাবের সাধনা। সে সাধনায় যখন আমরা দেবভাবাপন্ন হই, দেবতা হইয়া যাই, তখন দিব্যভাবের সাধনা আমাদের পৌঁছাইয়া দেয় ভাবাতীত রাজ্যে, মায়ের নিরাকার নির্গুণ

স্বরূপে, চরম সত্যে—যেখানে পশু-মানব দেবাদিসমন্বিত সমগ্র বিশ্বভুবন মা, ছেলে সবই এক চরম পরম নিত্য চেতন আনন্দে একীভূত, যাহা শিবশক্তির একীভূত অদ্বয় অবস্থা।

বেদান্তোক্ত চরম সত্যলাভের পথকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিবার জন্যই তান্ত্রিক সাধনার উদ্ভব, কেহ কেহ এরূপ মনে করেন। কারো কারো মতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পথ। সে যাহাই হউক, তন্ত্র যে একাই আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির পথে অতি নিম্ন হইতে অতি উচ্চ পর্যন্ত সব অধিকারীকেই বাহুপাশে বাঁধিয়া একই পরম-তীর্থের পথে লইয়া চলিয়াছে জ্ঞানালোক-উদ্ভাসিত কর্ম ও ভক্তির মধ্য দিয়া, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। হয়ত বলা খুব বেশী অসঙ্গত হইবে না, বিভিন্ন রুচি- ও অধিকারি-ভেদে সনাতন ধর্মে বহুবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব বিভিন্ন সাধনা ছড়ানো রহিয়াছে, সেগুলি সবই বীজাকারে সমন্বিত হইয়াছে তান্ত্রিক সাধনায়—জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ, সবই। বাহ্যপূজা, বিবিধ ক্রিয়া, মানসপূজা প্রভৃতির সহিত তান্ত্রিক সাধনায় আছে মায়ের সহিত নিজের অভেদত্ববোধক ধ্যানের এবং কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ও সুষুম্নামার্গে তাঁহাকে সহস্রারে লইয়া যাইবারও বিস্তারিত নির্দেশ।

বিজয়া

বনফুল

চাই শক্তি, চাই সিদ্ধি
চাই জ্ঞান, চাই ঋদ্ধি
তারুণ্যও চাই
মনের কামনাগুলি
ধরে দেবতার রূপ
বাহিরেও ভাই।

তাহাদেরই উদ্বোধন
চলিতেছে সর্বক্ষণ
বিসর্জন সেটা শুধু ভান
সত্য বিসর্জন হলে*
সৃষ্টির সহস্রদলে
মূর্ত হইবেন ভগবান।

মোদের বিজয়া তাই
সাময়িক খেলা ভাই;
তবু তাহা বড়ই মধুর
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম সেথা
বাজায় যে সুর।

* পূজার বিধান মতো মাকে বিসর্জন দিতে হয় হৃদয়ে।

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

(১)

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
লাক্‌সা, বারাণসী
১৫ই এপ্রিল, ১৯২০

প্রিয় বশী (বশীশ্বর সেন),

তোমার ১১ই এপ্রিল তারিখে লিখিত পত্রখানা পেয়েছি, ধন্যবাদ। জেনে খুব খুশী হ'লাম, তুমি ইস্টারের ছুটির দিনগুলি মহারাজের সঙ্গে ভুবনেশ্বরে পরম আনন্দে কাটিয়েছ। স্বামী সারদানন্দ পূর্বেই আমাকে সেখানকার মঠের পরিবেশ ও অবস্থার কথা জানিয়েছেন; তোমার পত্রেও সে-সব কথা জেনে আনন্দিত হয়েছি। মহারাজ সেখানে পরমানন্দে দিব্যভাবে স্বস্থ হয়ে ও সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে ছিলেন জেনে কতই না সুখী হয়েছি! ভক্তদের অপ্রীতিকর হস্তক্ষেপে ব্যাহত না হওয়া আপন মনের আনন্দ ও স্বাধীনতা যেন তিনি উপভোগ করতে থাকেন—এই প্রার্থনা। ভুবনেশ্বর মঠের নতুন পাকা বাড়ি তৈরির সব কৃতিত্ব তুমি অমূল্যকে দিচ্ছ—এটা ঠিক ঠিক তারই প্রাপ্য, কারণ সে নাম-যশের কোন আকাঙ্ক্ষা না রেখে সফলতালাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। বিরুদ্ধ বা অনুকূল সমালোচনায় সে কোনরূপ মনঃক্ষুণ্ণ হয় না। সেই কাজে অমূল্য নিজেকে কর্মযোগী বলে প্রমাণিত করেছে। সে মহারাজের আশীর্বাদই চায় আর মহারাজের আশীর্বাদ পেয়েছেও যথেষ্ট; তাতেই তার পরিপূর্ণ আনন্দ। এখানে সম্প্রতি কবিরাজী চিকিৎসায় সে কিছুটা ভাল আছে। তোমার চিঠি সে পেয়েছে এবং শীঘ্রই জবাব দেবে। দুঃখের বিষয়, আমার স্বাস্থ্য বর্তমানে তত ভাল যাচ্ছে না। কিন্তু মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হয়; তাঁর বিধান মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট আছি। তুমি বলেছ, গত চিঠিতে আমি তোমায় লিখেছি যে আমাদের দ্রষ্টা হিসেবে থাকতে হবে; হাঁ, সম্পূর্ণ সত্য কথা। এটা কেবল তোমার পক্ষে নয়, আমাদের সবারই জন্য। আমরা যদি ঠিক এভাবে থাকি, তা হলেই এ সংসারের মজা ও কৌতুক উপভোগ করতে পারি, অন্য কোন উপায়ে নয়। কিন্তু আমরা যা-কিছু করি তার সাক্ষিস্বরূপ থাকা খুব কঠিন। আমরা কর্মের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে ফেলি এবং সুখ-দুঃখ অনুভব করি। মহামায়া যেন আমাদের সর্বদা তাঁর সান্নিধ্যে রাখেন এবং তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে মায়াপাশে বদ্ধ না করেন। আমি ধন্য হয়ে যাব যদি জগজ্জননীর কৃপায় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি যথার্থ সাক্ষিরূপে কাটাবার সুযোগ লাভ করতে পারি।

* ইংরেজী হইতে অনূদিত

তোমাদের সকলেরই মায়ের সন্তান ও স্বামীজীর ঠিক ঠিক একনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবে নিজেদের স্বার্থ অথবা সম্পদলাভকে গ্রাহ্য না ক'রে বহুজনহিতায় জীবন উৎসর্গ ক'রে বীরের ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত যেহেতু স্বয়ং জগজ্জননী তাদেরই ভার নেন যারা তাঁর আর্ত ও সাহায্যপ্রার্থী সন্তানদের মঙ্গলের জন্য ব্রতী থাকে। অচিরেই ইহা কর্মে রূপায়িত হোক —এই আমার ইচ্ছা।

আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা সতত জানবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
তুরী

(২.)

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
লাক্‌সা, বারাণসী
৫ই মে, ১৯২০

প্রিয় বশী (বশীশ্বর সেন),

লাটু মহারাজের ভাণ্ডারার জন্য প্রণামী বাবদ মনি-অর্ডারযোগে তোমার প্রেরিত দশটি টাকা গত পরশু পেয়েছি। ভাণ্ডারার সব আয়োজন পূর্ণোদ্যমে চলছে। চন্দ্র সঙ্গে পরামর্শ ক'রে অমূল্য কার্যনির্বাহের ভার নিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, প্রভুর কৃপায় ভাণ্ডারা ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালিত হবে। ইতিমধ্যে মিষ্টান্নাদি তৈরী হয়ে গিয়েছে। আজ রাত্রেই পুরি কচুরি তৈরী হবে। আগামীকাল পাঁচ শতেরও অধিক সাধু ভাণ্ডারায় যোগদান ক'রে ভোজন করবেন। তার পরদিন দরিদ্রনারায়ণদের ভূরিভোজন হবে—তাদের সংখ্যাও সাধুদের চেয়ে কম হবে না। আশা করি ভাণ্ডারা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। পরে তোমাকে বিস্তারিত লিখে জানাবার চেষ্টা করব। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা সতত জানবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
তুরীয়ানন্দ

দশমহাবিদ্যা

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী

একা অদ্বিতীয়া পরমেশ্বরী ভগবতী চণ্ডিকা একাধারে বিশ্বাতিরিক্তা আদ্যা পরাশক্তি, আবার তিনি বিশ্বব্যাপিনী বিশ্বরূপিণী। তিনি একা অদ্বিতীয়া হইলেও বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন শক্তি ও মূর্তি, বিগ্রহ ও বিভূতি পরিগ্রহপূর্বক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনা করিয়া থাকেন। নিত্যা হইয়াও তিনি যুগে যুগে অসুরশক্তি ধ্বংস করিয়া দেবশক্তির রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ভক্তজনকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিনিই নানা মূর্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হন। একই নট যেমন বেশ পরিবর্তন করিয়া রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ পরাশক্তি অদ্বিতীয়া ভগবতী চণ্ডিকা লীলার নিমিত্ত বহুমূর্তি ধারণ করেন। দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

ত্বং শক্তিরেব জগতাম্ অখিলপ্রভাবা,
ত্বন্নিমিত্তঞ্চ সকলং খলু ভাবমাত্রম্।
ত্বং ক্রীড়সে নিজ-বিনির্মিত-মোহজালে,
নাট্যে যথা বিহরতে স্বকৃতে নটো বৈ॥

(দেবীভাগবতম্, ১।৭।৪২)

হে মাতঃ! আপনিই নিখিল জগতের শক্তি-স্বরূপা ও অনন্তপ্রভাবসম্পন্না। এই বিশ্বে উৎপদ্যমান যাবতীয় বস্তুই আপনা হইতে উৎপন্ন। নট যেমন একব্যক্তি হইয়াও রঙ্গালয়ে নানা মূর্তিতে অভিনয় করে, তদ্রূপ আপনিও একা অদ্বিতীয়া হইলেও নিজ-বিরচিত সংসার-রঙ্গালয়ে বিবিধরূপে ক্রীড়া করিয়া যাইতেছেন।

আদ্যাশক্তি ও দশমহাবিদ্যাঃ দশ-মহাবিদ্যাতে এক অখণ্ড বিশ্বশক্তিরই দশবিধ প্রকাশ—যে শক্তিসমূহদ্বারা পরাশক্তি বিশ্ব-জগৎকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬।৮)

ব্রহ্মের পরাশক্তি বিবিধা বলিয়াই শ্রুতিতে কীর্তিত হইয়াছে, সেই শক্তি ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া।

মহানির্বাণতন্ত্রে মহেশ্বর এই পরাশক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, কালী তারা প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্যা একা অদ্বিতীয়া আদ্যা শক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ।

ত্বমাদ্যা সর্ববিদ্যানাম্ অস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎ সর্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন॥
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্বদেবময়ী তনুঃ॥

(মহানির্বাণতন্ত্রম্, ৪।১২-১৪

তুমিই সমুদয় বিদ্যার আদিভূতা এবং আমাদেরও (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও) উৎপত্তিস্থল, তুমি সমগ্র জগৎকে অবগত আছ, কিন্তু তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। তুমিই কালী, তারা, দুর্গা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ভৈরবী ও ছিন্নমস্তা। তুমিই অন্নপূর্ণা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী; তুমি সর্বশক্তি-স্বরূপিণী, তোমার দেহ সর্বদেবতাময়।

শাক্তশাস্ত্রে পরাশক্তির বহুবিধ দিব্যমূর্তি-

সমূহমধ্যে দশমহাবিদ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কলিকালে ইঁহাদের উপাসনা আশুফলপ্রদ "শীঘ্রং বিমুক্তিদা"—ইঁহারা সাধককে সত্বর মুক্তিদান করিয়া থাকেন।

মহাভাগবত পুরাণের অন্তর্গত "ভগবতী গীতায়" হিমালয় ভগবতীকে প্রশ্ন করিয়াছেন,—

মাতর্বহুবিধং রূপং স্থূলং তব মহেশ্বরি।
তেষু কিংরূপমাশ্রিত্য সহসা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ।
তন্মে ব্রূহি মহাদেবি যদি তে মযানুগ্রহঃ॥
(ভগবতী গীতা, ৪।১৯)

হে মাতঃ, আপনার স্থূলরূপ অনেক প্রকার, তাহার মধ্যে কোন্‌টি আশ্রয় করিলে লোক আশু মুক্তিলাভে সমর্থ হয়, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকে, হে মহাদেবি! তবে তাহা কীর্তন করুন।

হিমালয়ের প্রশ্নোত্তরে ভগবতী স্বয়ং দশ-মহাবিদ্যার উপাসনা-মাহাত্ম্য বিবৃত করিতেছেন :

দেব্যুবাচ

ময়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং স্থূলরূপেণ ভূধর।
তত্রারাধ্যতমা দেবী মূর্তিঃ শীঘ্রং বিমুক্তিদা॥
সাপি নানাবিধা তত্র মহাবিদ্যা মহামতে।
বিমুক্তিদা মহারাজ তাসাং নামানি মে শৃণু॥
(ভগবতী গীতা, ৪।২০-২১)

দেবী কহিলেন,—হে ভূধর! স্থূলরূপে আমি এই বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছি, তাহার মধ্যে দেবী-মূর্তিই আশু মুক্তি প্রদান করে, সুতরাং তাহাই আরাধ্যতমা। হে মহামতে! সেই দেবীমূর্তি-সমূহমধ্যে মুক্তিদায়িনী অনেক মহাবিদ্যা রহিয়াছেন; হে মহারাজ! আপনি তাঁহাদের নাম শ্রবণ করুন।

মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী বগলা ছিন্নমস্তা ত্রিপুরসুন্দরী॥
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণাং মোক্ষফলপ্রদা।
আশু কুর্বন্ পরাং ভক্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোত্য-সংশয়ম্॥ (ভগবতী গীতা, ৪।২২-২৩)

( ) মহাকালী, (২) তারা, (৩) ষোড়শী, (৪) ভুবনেশ্বরী, (৫) ভৈরবী, (৬) বগলা, (৭) ছিন্নমস্তা, (৮) ত্রিপুরসুন্দরী (কমলা), (৯) ধূমাবতী এবং (১০) মাতঙ্গী—ইঁহারা নরগণকে মোক্ষ প্রদান করেন। যে ব্যক্তি ইঁহাদের প্রতি শীঘ্র পরম ভক্তি প্রদর্শন করেন, তিনি নিঃসন্দেহে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।

আসাম্ অন্যতমাং তাত ক্রিয়াযোগেন চাশ্রয়।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্মামেবৈষ্যসি নিশ্চিতম্॥
(ঐ, ·৪)

পিতঃ! এই সকল মূর্তির যে কোন একটিকে ক্রিয়াযোগে আশ্রয় করুন। আমার প্রতি মন বুদ্ধি অর্পণ করিলে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবেন।

চামুণ্ডা ও মুণ্ডমালাতন্ত্রে দশমহাবিদ্যার যে নামতালিকা আছে, তাহাই সাধারণে প্রচলিত,—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

দশমহাবিদ্যা-মাহাত্ম্য : কুব্জিকাতন্ত্রের প্রথম পটলে দশমহাবিদ্যার মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
ধর্মার্থমোক্ষদা নিত্যং চতুর্বর্গফলপ্রদাঃ।
যেন তেন প্রকারেণ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ॥

এই দশমহাবিদ্যা 'সিদ্ধবিদ্যা' নামে কীর্তিতা হইয়া থাকেন; ইঁহারা সর্বদা সাধককে ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফল প্রদান করেন। কলিযুগে যে কোন প্রকারে ইঁহাদের

উপাসনা করিলেই ইঁহারা সাধককে পূর্ণফল প্রদান করিয়া থাকেন।

আসাঞ্চৈব সমানা হি নাস্তি ত্রিভুবনে ধ্রুবম্।
একোচ্চারণমাত্রেণ সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে।
স্মরণেনৈব দেবেশি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥

ত্রিভুবনে এই দশমহাবিদ্যার সমান আর কিছুই নাই, ইহা নিশ্চিত জানিবে। ইঁহাদের নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। দেবেশি, ইঁহাদের স্মরণ দ্বারাই সাধক সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

সিদ্ধবিদ্যা: কালীতারাদি মহাবিদ্যাকে "সিদ্ধবিদ্যা" বলা হয় কেন? ইঁহাদের সিদ্ধ-বিদ্যাত্ব সম্বন্ধে মুণ্ডমালাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নক্ষত্রাদিবিচারণা।
কালাদিশোধনং নাস্তি নারি-মিত্রাদি-দূষণম্॥
সিদ্ধবিদ্যাতয়া নাত্র যুগসেবা-পরিশ্রমঃ।
নাস্তি কিঞ্চিন্মহাদেবি দুঃখসাধ্যং কদাচন॥

এই দশমহাবিদ্যার মন্ত্রগ্রহণে সিদ্ধাদিবিচার, নক্ষত্রচক্রাদি বিচার, কালাদি শোধন ও অরি-মিত্রাদি বিচার করিতে হয় না। ইঁহারা 'সিদ্ধ-বিদ্যা' বলিয়া ইঁহাদের উপাসনায় কলিযুগঘটিত বিশেষ পরিশ্রম নাই। ইঁহাদিগকে উপাসনা করিলে কদাপি কিছুই দুঃসাধ্য থাকে না।

"কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণা"—এই শাস্ত্রবাক্য দ্বারা যে কলিকালে জপ ও পূজাদির চতুর্গুণ সংখ্যা নির্ধারিত আছে, দশমহাবিদ্যা সম্পর্কে তাহা প্রযোজ্য নহে।

মহাবিদ্যার নাম ও সংখ্যায় মতভেদ: চণ্ডীর টীকাকার চতুর্ধর মিশ্র "মহাবিদ্যা" নামের এইরূপ তাৎপর্য নিরূপণ করিয়াছেন,—

'মহদ্ ব্রহ্ম, তৎপ্রাপ্তিহেতুর্বিদ্যা, মহাবিদ্যা, উপনিষদ্-রূপা।' যে বিদ্যা দ্বারা মহৎ অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই 'মহাবিদ্যা' অর্থাৎ উপনিষৎ-প্রতিপাদিত ব্রহ্মবিদ্যা।

চণ্ডীর 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' টীকাকার গোপাল চক্রবর্তী 'মহাবিদ্যা' নামের তাৎপর্য নির্ধারণ করিয়া বলেন,—

'মহাবিদ্যা মুক্তিলক্ষণা, ব্রহ্মাভিন্নং জগদ্ ইতি অদ্বৈতভাবনা।' ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন—এই অদ্বৈতভাবনা দ্বারা জীবের মুক্তিলাভ হইয়া হইয়া থাকে। এই মুক্তিপ্রাপিকা বিদ্যাই 'মহাবিদ্যা'।

ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী কালীতারাদি মহাবিদ্যার নাম ও সংখ্যা সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে মতভেদ দৃষ্ট হয়। মালিনীবিজয়তন্ত্রে দ্বাদশ মহাবিদ্যার এইরূপ নামতালিকা দৃষ্ট হয়,—

অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা মহাবিদ্যা মহীতলে।
দোষজালৈরসংস্পৃষ্টা স্তাঃ সর্বা হি
ফলৈঃ সহ॥
কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা।
বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ॥
কামাখ্যাবাদিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা দেব্যঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ॥
সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবা-পরিশ্রমঃ।
তথা চৈতা মহাবিদ্যাঃ কলিদোষান্ন বাধিতাঃ॥
(তন্ত্রসার-ধৃত।)

যে যে মহাবিদ্যা পৃথিবীমণ্ডলে দোষরাশি-পরিশূন্যা, আমি ফলের সহিত সেই সকল মহাবিদ্যা সম্বন্ধে বলিতেছি,—(১) কালী, (২) নীলা (তারা), (৩) মহাদুর্গা, (৪) ত্বরিতা, (৫) ছিন্নমস্তা, (৬) বাগ্‌বাদিনী, (৭) অন্নপূর্ণা, (৮) প্রত্যঙ্গিরা, (৯) কামাখ্যাবাসিনী, (১০) বালা, (১১) মাতঙ্গী এবং (১২) শৈলবাসিনী।

এইসকল দেবী কলিকালে সাধককে পূর্ণফল প্রদান করিয়া থাকেন। এইসকল দেবতা সিদ্ধমন্ত্র, সুতরাং ইঁহাদিগের উপাসনায় কলিকালবশতঃ অধিক পরিশ্রম করিতে হয়

না। এই সমস্ত মহাবিদ্যা কলিদোষগ্রস্তা নহেন।

কালীকুল ও শ্রীকুল: কোনও কোনও তন্ত্রমতে মহাবিদ্যার সংখ্যা অষ্টাদশ। ইঁহারা 'কালীকুল' এবং 'শ্রীকুল'—এই দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

কালী তারা ছিন্নমস্তা ভুবনা মহিষমর্দিনী।
ত্রিপুটা ত্বরিতা দুর্গা বিদ্যা প্রত্যঙ্গিরা তথা।
কালীকুলং সমাখ্যাতং শ্রীকুলঞ্চ ততঃপরম্॥

'কালীকুলের' অন্তর্গত নয় মহাবিদ্যা যথা (১) কালী, (২) তারা, (৩) ছিন্নমস্তা, (৪) ভুবনেশ্বরী, (৫) মহিষমর্দিনী, (৬) ত্রিপুটা, (৭) ত্বরিতা, (৮) দুর্গা এবং (৯) প্রত্যঙ্গিরা। অতঃপর 'শ্রীকুলে'র কথা বলা হইতেছে।

সুন্দরী ভৈরবী বালা বগলা কমলাপি চ।
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী বিদ্যা স্বপ্নাবতী প্রিয়ে।
মধুমতী মহাবিদ্যা শ্রীকুলং পরিভাষিতম্॥

'শ্রীকুলে'র অন্তর্গত নয় মহাবিদ্যা যথা—(১) সুন্দরী, (২) ভৈরবী, (৩) বালা, (৪) বগলা, (৫) কমলা, (৬) ধূমাবতী, (৭) মাতঙ্গী, (৮) স্বপ্নাবতী এবং (৯) মধুমতী।

অরূপার রূপধারণ: যিনি বিশ্বাতিরিক্তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা নিরাকারা আদ্যা পরাশক্তি, তিনি কি কারণে কালী তারাদি সাকার বিগ্রহ ধারণ করিয়া বিশ্বজগতে অভিব্যক্তা হন সেই সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্র বলেন,—

ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥
উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ॥
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্ভুজাষ্টভুজা তথা।
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী।

(মহানির্বাণতন্ত্রম্, ৪।১৫-১৭)

মহাদেব পরমেশ্বরীকে বলিতেছেন,—তুমিই স্থূল, তুমিই সূক্ষ্ম, তুমিই ব্যক্ত-ও অব্যক্ত-স্বরূপিণী, তুমি নিরাকারা হইয়াও সাকারা। কে তোমার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারে? তুমি উপাসকগণের উপাসনাকার্যের নিমিত্ত, জগতের মঙ্গলসাধন এবং দানবগণের বিনাশের জন্য নানাবিধ মূর্তি ধারণ করিয়া থাক। তুমি বিশ্বরক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণপূর্বক কখনও দ্বিভুজা, কখনও চতুর্ভুজা, ষড়্ভুজা বা অষ্টভুজা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া থাক।

ভেদবুদ্ধি পরিত্যাজ্য: কালী, তারাদি যে কোন মহাবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া সাধনকালে সাধককে মহাবিদ্যার মধ্যে পরস্পর ভেদবুদ্ধি পরিহার করিয়া চলিতে হইবে, ইহা পুনঃ পুনঃ নির্দেশ করিয়াছেন। লীলাভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিলেও স্বরূপতঃ ইঁহারা এক ও অভিন্ন. এই অভেদজ্ঞানের উপর স্থির প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াই স্ব স্ব ইষ্টদেবীর আরাধনা করিতে হইবে।

যথা কালী তথা তারা তথা নীল-সরস্বতী।
সর্বাভীষ্টফলপ্রদা তথা ত্রিপুরসুন্দরী॥
অভেদমতমাস্থায় যঃ কশ্চিৎ সাধয়েন্নরঃ।
ত্রিলোকে স তু সংপূজ্যঃ স্যাৎ তারাসুত এব সঃ॥

(তারারহস্যম্, পটল ১)

যেমন কালী, তেমনি তারা, নীল-সরস্বতী এবং ত্রিপুরসুন্দরী সাধককে সকল বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। যে সাধক অভেদ বুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক ইঁহাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তিনিই ত্রিলোকে সকলের পূজনীয় হইয়া থাকেন এবং তিনিই তারার যথার্থ পুত্র হইবার যোগ্য।

ভেদং কৃত্বা যদা মন্ত্রী সাধয়েদত্র সাধনম্।
ন তস্য নিষ্কৃতি র্দেবি নিরয়ে পচ্যতে হি সঃ॥

(ঐ)

যে সাধক ভেদবুদ্ধিতে ইঁহাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, হে দেবি, তাহার নিষ্কৃতি নাই, তাহাকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে।

দশমহাবিদ্যার মূর্তিভেদ, উপাসক-সম্প্রদায় ও সাহিত্য ঃ

দশমহাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মহাবিদ্যার বহু মূর্তিভেদ রহিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে ইঁহাদের ধ্যান, উপাসনাবিধি, বিভিন্ন মন্ত্র, ঐ সকল মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত প্রাচীন সাধকমণ্ডলীর নাম ইত্যাদি উল্লিখিত আছে। প্রত্যেক মহাবিদ্যা বিষয়ে, বিশেষ করিয়া কালী, তারা এবং ষোড়শী বা শ্রীবিদ্যা বিষয়ে সম্প্রদায়গত বিরাট তান্ত্রিক সাহিত্য রহিয়াছে। ঐ বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারের কিয়দংশ মাত্র মুদ্রিত ও সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

যোগভ্রষ্ট জে. জে. গুডউইন স্মরণে

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

কহে সে ইংরাজ যোগী সম সম্পদে দারিদ্র্যে হাসিয়া নির্ভীক
“লও ফিরে বন্ধুগণ, ফিরে লও তোমাদের ও পারিশ্রমিক।”
স্বল্প-আয়ু জীবনের পুষ্পপাত্রে ধরা দুটি পুষ্পিত বছর
অঞ্জলি দিল সে যুবা নীলনেত্রে কৌতূহল, স্মিত ওষ্ঠাধর।
নহে ধনী, নহে জ্ঞানী, নহে সন্ন্যাসী বা যোগী অথবা ধার্মিক।
নাই যশ খ্যাতি অর্থ। শুধু এক লিপিকর— দ্রুত সাঙ্কেতিক।
শুনে নাই কভু ভক্তি জ্ঞান কর্ম রাজযোগ দর্শন কাহিনী।
শুধু অনুলিপিকর। নিমেষে নিমেষে লিখে ইঙ্গিত কাহিনী—
রেখায় রেখায় আঁকা এক রহস্যের ভাষা সঙ্কেত অক্ষরে
যেন কোন্ মহাভাষ্য মহাব্যাখ্যা মহা অর্থ করিবার তরে।
জন্মান্তের যোগভ্রষ্ট কেহ যেন অসমাপ্ত কর্মভার তার
সমাপ্ত করিল ফিরি, বিদেশীর দেহে পুণ্য স্বদেশে আবার!
“গুরু-আয়ু-রসে-সিক্ত দীপ যদি অনির্বাণ জ্বলে তাঁর নাম!
আমিও রাখিয়া যাই সেথা মোর আনন্দিত শ্রমের প্রণাম।”

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

১৭ই জানুআরি, সন্ধ্যায় ব্রঃ আদিচৈতন্য (Rudolf Ady *) অনেক ফল মিষ্টি লইয়া উপস্থিত। মাটিতে বসা—পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করে। বাবা আমাদের পরে বলিতেছেন, "দেখ, দেখ—ওদের কাছে শেখ। ভক্তি করতে শেখ। যা করবার ওরাই করে—ধ্যান ধারণা ত্যাগ তপস্যা। ওদের একটা জোর আছে, নইলে সব আসে আর সব দীক্ষা নিয়ে যায়! যায় তো যায়, আমিও পারি না। ওসব জিনিসের যত্ন ওরাই জানে। কি জানি বাপু—ও কি দেখেছে এর ভেতর। যে দিন ও বললে, 'বাবা, গঙ্গা নাইতে যাব!' বারণ করলাম, বললাম,—পাড়াগেঁয়ে রাস্তা, বোশেখ-জষ্টি মাস! শেষে বললাম যাও কাকেও নিয়ে। যার ভেতর গঙ্গাভক্তি এসেছে তার আর বাকী কি? ফিরে এল—দণ্ডকমণ্ডলুধারী গৌরবর্ণ ব্রহ্মচারী, প্রণাম করলে। চিনতে পারিনি মনে হল সাক্ষাৎ শিব।"

১৯শে জানুআরি। Miss Mc Leod (মিস্ ম্যাক্‌লাউড), Mr. & Mrs. Brewster (মিঃ ও মিসেস ব্রুষ্টার) আর্টিষ্টকে সঙ্গে লইয়া Ady (আদিচৈতন্য) আবার উপস্থিত। সেলুনটি রেললাইনে সাইডিং-এ আছে। মিস্ ম্যাক্‌লাউড কখনও সারগাছি দেখেন নাই, বহুদিন হইতেই দেখিবার ইচ্ছা, তাই আসিয়াছেন—নিজের খাবার সঙ্গেই আনিয়াছেন—বাবুর্চিও সঙ্গে আছে। আশ্রম হইতে শুধু দুধ চাই।

সকালের খাওয়ার পর দুজনে শ্রীশ্রীঠাকুর-মন্দিরের মেজের উপর বসিয়া গল্প করিতেছেন। মিস্ ম্যাক্‌লাউডের প্রশ্নের উত্তরে বাবা বলিতেছেন :

Sw. A.—Yes, I have seen Swamiji after his passing away as clearly as I see you now, otherwise I could not live. Separation was so painful! I was going to commit suicide but was prevented by Swamiji. He caught my hand when 1 was about to jump under the running tram.

[স্বামী অখণ্ডানন্দ—হাঁ, এখন তোমাকে যেমন দেখছি, দেহত্যাগের পর স্বামীজীকে তেমনি দেখেছি। তা না হ'লে আমি বাঁচতুম না। বিয়োগব্যথা এত হয়েছিল, আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম, স্বামীজী বাধা দিলেন। চলন্ত ট্রামগাড়ির নীচে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়েছিলাম, তিনি আমায় ধরে ফেললেন।]

Miss Mac L—Yes, he lives in you, in me, in all. He cannot die. He is Atman. They say Swamiji was a great teacher, but I and many others knew him to be a great learner. He learnt from all, so he conquered all. He would learn something always, so he was always fresh, never monotonous—never repeating the same thing.

[মিস ম্যাকলাউড—হাঁ, তিনি তোমার

* (জার্মান) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ছিল, পরে ইউরোপের উপর বিরক্ত হইয়া আমেরিকা যায়। সেখানে Vedanta Society (বেদান্ত সোসাইটি)-র সংস্পর্শে আসিয়া ভারতে আসে।

মধ্যে, আমার মধ্যে, সকলের মধ্যে বাস করেন। তিনি মরতে পারেন না—অমর। তিনি আত্মা। লোকে বলে, স্বামীজী একজন বড় শিক্ষক। কিন্তু আমি ও অনেকে তাঁকে একজন বড় 'শিক্ষার্থী' বলেই জানতাম। তিনি সকলের কাছ থেকেই শিখতেন। সেজন্যই তিনি সকলকে জয় করেছিলেন। সর্বদা তিনি কিছু না কিছু শিখতেন। তাই তিনি সর্বদাই ছিলেন নতুন। একঘেয়ে তিনি কখনও ছিলেন না—একই জিনিস একই ভাবে কখনও বলতেন না।]

Swami A.—Yes, that is the teaching of our Guru Maharaj On his death-bed, unable to speak because of throat-sore, he violently protested against somebody's saying 'I know'······He said, you know! What do you know of the Infinite? Don't say this again, say, 'Friend, so long as I live, I learn.' That is what he taught and what we learnt.

[স্বামী অ.—হাঁ, এই ছিল আমাদের গুরু মহারাজের শিক্ষা। তিনি মৃত্যুশয্যায় গলার ব্যথায় কথা বলতে পারছেন না, একজনকে বলেছে, 'আমি জানি'। তখখুনি ঠাকুর বলছেন, 'কি জানিস্? অনন্তের কতটুকু জানিস? একথা আর বলিস না, বলবি—'সখি, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।' তিনি এই ভাবই শেখাতেন এবং আমরাও তাই শিখেছি।]

Miss Mac L.—Give me your message for the coming Centenary. They want it.

[মিস ম্যাকলাউড—আগামী শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর জন্য আপনার বাণী দিন। ওরা চাইছে।]

Swami A.—I have no message of mine own, but I have got this message from the Lord—'I am Infinite and Eternal. What is my Centenary?'

[স্বামী অ.—আমার নিজের কোন বাণী নেই, কিন্তু প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী পেয়েছি—'আমি অনাদি অনন্ত। আমার আবার শতবার্ষিকী কিরে?']

Miss Mac L.—All right, I shall take this message with me.

[মিস্ ম্যাক্লাউড-আচ্ছা বেশ, এই বাণীই আমি নিয়ে যাব।]

সারাদিন থাকিয়া স্বামীজী সম্বন্ধে নানা গল্প করিয়া অশীতিপরা বৃদ্ধা তরুণীর উৎসাহে ও প্রীতিমুগ্ধ দৃষ্টিতে আশ্রমের সব কিছু দেখিতে লাগিলেন।

ঠাকুরঘরের বেদীতে স্বামীজীর একটি স্ফটিক মূর্তি (পরিব্রাজকবেশে) দেখিয়া খুব আনন্দিত, সেটি তাঁহারই নির্দেশে নির্মিত ও প্রদত্ত।

Miss Mac L.—Yes, nothing but crystal can represent Swamiji.

[মিস ম্যাকলাউড—হাঁ, স্ফটিক ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে স্বামীজীর মূর্তি গড়া যায় না।]

বোধ হয়, স্বামীজীর উজ্জ্বলতা ও স্বচ্ছতা লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছেন। এইরূপ আরও অনেক কথার পর সন্ধ্যার ট্রেনে সকলে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় Ady বলিয়া গেল, 'Sargachi is an oasis in the midst of a desert (মরুভূমির মাঝখানে সারগাছি একটি মরূদ্যান।)

প্রথম প্রসাদ

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থান বাংলাদেশের একটি শহর। কাল চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি। পাত্র একটি কিশোর, নীচু ক্লাসের ছাত্র। সে থাকত ওই শহরের কোন একটি স্কুলের হস্‌টেলে। একদিকে তাদের হস্‌টেল। মাঝখানে গ্রান্‌ড ট্রাংক রোড। আর তার উলটোদিকে, একটু এগোলেই রামকৃষ্ণ মিশন-এর স্থানীয় কেন্দ্র।

কিশোরটি এবং তার সহপাঠী আবাসিকরা কেউ কেউ অন্ততঃ বুঝত যে, প্রায় সকলেই তাদের একটু খাপছাড়া-গোছের মনে করত। তাদের দেখত হয় একটু বিরক্তির আর না-হয় একটু অনুকম্পার দৃষ্টিতে। দুটোতেই তারা মনে একটু দুঃখ পেত। ছোটরা যে কতটা তীব্র-অনুভূতিসম্পন্ন অনেকেই তা বোঝেন না। তবে সে দুঃখ তারা নীরবে বহন করত। কিছুটা অনাদর-অবহেলা তাদের পাওনা, একথা তারা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু কেন যে সেটা তাদের প্রাপ্য, সে কথা বুঝত না।

পরে বড় হয়ে ব্যাপারটা অবশ্য সে বুঝতে পেরেছে এবং বুঝতে পেরে তার হাসিই পেয়েছে। আসলে তাদের বয়স ছিল নিতান্ত কম। ওই বয়সী ছেলেরা বাড়িতে থাকলে তাদের মায়েরা বা দিদিরা তাদের যত্ন নেন। তাদের খাওয়া-পরা দেখাশোনা করেন। মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাকে তারা থাকে। মাঝে মাঝে গুরুজনদের সৌজন্যে একটু-আধটু লজেনস্‌ টফি চানাচুর আইসক্রীম জোটে তাদের। ওরা থাকত হস্‌টেলে। কে আর ওদের দেবে সাজিয়ে-গুজিয়ে? কে আর দেখবে যে, ওরা মাথায় তেল গায়ে সাবান মাখছে কিনা, খাচ্ছে কিনা ঠিক মতন। ফলে ওদের বেশ-ভূষা, হাবভাব একটু অনাথ-অনাথ গোছের ছিল বইকি। তদুপরি সাধুভাষায় এবং কাব্যমণ্ডিত করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, তরুণ গরুড় সম ক্ষুধার আবেশ তাদের সর্বদাই পীড়ন করত এবং সিধে ভাষায় বলতে গেলে অগত্যা না বলে উপায় থাকে না যে, তারা একটু ইয়ে, মানে একটু লোভী ছিল। যাই হোক, একটা গুণ ওদের ছিল। ওরা ছিল এক শ্রেণীহীন সমাজ। ওদের মধ্যে কে ধনী-সন্তান আর কে মধ্য-বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে তা বোঝা যেত না। পরস্পরের প্রতি ওদের প্রীতিতে খাদ ছিল না। লোকে তাদের অভিহিত করত—'হস্‌টেল' আর তারাও নিজেদের পরিচয় দিত 'হস্‌টেল' বলেই।

একদিন ওদেরই একজন আনল খবরটা।

—জানিস ভাই, রামকৃষ্ণ মিশনে আজ দরিদ্রনারায়ণসেবা হবে।

—তার মানে কী রে?

—মানে খুব ভালো। গেলেই খিচুড়ি খেতে পাওয়া যাবে। সময়টা হচ্ছে আমাদের ইসকুলের ছুটির পরে। বিকালের টিপিনের আগে। 'গ্র্যানড' হবে, নারে? (এখানে একটু টীকা প্রয়োজন। তাদের কষ্ট দিত এই ব্যাপারটা যে, তারা নীচু ক্লাসের ছাত্র বলে তাদের ছুটি হত আগে। ওপর ক্লাসের ছাত্রদের ছুটি হত দেরিতে। কিন্তু ওপর ক্লাসের ছেলেরা না ফেরা পর্যন্ত তাদের

বিকালের টিফিন মিলত না।)

ওরা কয়েকটি শিশু ভোলানাথ গুটি গুটি গিয়ে হাজির হল যথাসময়ে, যথাস্থানে। বসে পড়ল এক কোণে। এমন সময় একজন মহারাজ এসে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের,

—তোরা কারা ?

—আমরা হস্‌টেল।—কোরাসে উত্তর দিল তারা।

—তোরা এখানে কেন ? উঠে আয় আমার সঙ্গে।

অনাদরে-অবহেলায়-অভ্যস্ত তারা মনে করল যে, তাদের উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ' গোছের মুখ করে ওরা উঠে পড়ে চলে আসার উপক্রম করল। ভাবটা যেন কিছুই হয়নি। তুচ্ছ খিচুড়ি খেতে পাওয়া-না-পাওয়ায় কীই বা এসে যায়। ভিতরে ভিতরে কিন্তু তারা সকলেই চোখের জল চাপতে চেষ্টা করছে।

মহারাজ বললেন—তোরা চলে যাচ্ছিস কেন রে ?

—আপনি তো আমাদের চলে যেতেই বললেন।

—দূর বোকারা। আমি তোদের উঠে আমার সঙ্গে আসতে বলেছি। আয়।

—আমরা খিচুড়ি পাব তো ? মনের কথা আর চেপে রাখতে পারল না তারা।

—ঠাকুরের কাছে এসেছিস নিশ্চয়ই প্রসাদ পাবি। হেসে বললেন মহারাজ।

মহারাজ তাদের এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। তাঁর নির্দেশে তারা নিজেরা নিয়ে এল শালপাতা আর মাটির ভাঁড়। মহারাজ নিজের হাতে তাদের পরিবেশন করলেন খিচুড়ি, বেগুনভাজা, তরকারি আর চাটনি, আর—তাদের বিস্ময়কে চরমে তুলে দিয়ে—পায়েস। বললেন বারবার, 'পেট ভরে খা। আর কী নিবি বল্ ?'

সেই কিশোরটির পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তৃপ্তি হয়েছে তো রে ?'

কী যে হল ! চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরল কিশোরটির। অনাদর সহ্য করার শিক্ষা তার হয়েছে, কিন্তু অনভ্যস্ত স্নেহের, যত্নের, আদরের, ভালোবাসার সামনে সে যেন নিদারুণ অসহায় বোধ করল।

আসবার সময় মহারাজ বললেন, 'সময় পেলেই চলে আসবি তো ?' আবার আসবার অনুরোধ ! আবার আসবার প্রতিশ্রুতি পাওয়ার জন্য আগ্রহ !!

তার জীবনে প্রসাদ পাওয়ার পালা সেই থেকে শুরু।

প্রথম যে সাধুর সূত্রে কিশোরটি ঠাকুরের প্রসাদ পেয়েছিল তাঁর সঙ্গে সে তারপরে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিল এবং দুধকে যেমন ধবলত্ব ছাড়া ভাবা যায় না তেমনই সেই সাধুটিকেও সে তাঁর হাসি ছাড়া ভাবতে পারে না। তাঁর প্রসন্ন মূর্তিই তার হৃদয়ে চিরদিনের জন্য আঁকা রয়েছে।

ওই ঘটনার পর অনেক বছর অতিক্রান্ত। সেদিনের সেই কিশোর যে জীবনের পথের অনেকটা এগিয়ে এসেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই মানুষটির বিশ্বাস তথা অনুভূতিতে আজ এই প্রত্যয়টি অচল-প্রতিষ্ঠ যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসাদ তাঁরই পদাশ্রিত এক সাধুর ভালবাসার মাধ্যমে পাওয়া রামকৃষ্ণ-কৃপাভিখারীদের জীবনে একটি পরম গুরুত্ব- তথা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। প্রসাদের মহিমা সম্পর্কে সে নিঃসংশয়।

আর যখনই সে প্রসাদ পায় তখনই তার মনে পড়ে ঠাকুরের কথা আর প্রথম প্রসাদ পাওয়ার দিনটির স্মৃতির সঙ্গে ঠাকুরের আশ্রিত সেই সাধুটির স্নেহমাখা ব্যবহার। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলে মনে মনে, "হ্যাঁ, তৃপ্তি হয়েছে। জীবনে এত তৃপ্তি সম্ভব, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।"

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শন

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

কয়েকটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রশ্ন সম্পর্কে স্বামীজীর অভিমত

তাঁর সমাজদর্শনের ব্যাখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ, বিশেষ করে ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রশ্ন সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এখন সংক্ষেপে এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

ক। বিবাহ

বিবাহের প্রশ্নে দেখা যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দ চুক্তি, অপহরণ বা জবরদখল ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাঁর মতে, বিবাহ অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্ন নয়। "যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি সমাজে বাস করছে ততক্ষণ তার কার্যের ফলাফল সমাজের সকলকেই স্পর্শ করে। ফলে সমাজের অধিকার রয়েছে সে কাকে বিবাহ করবে না-করবে সে-নির্দেশ দেবার।"[১] যদি সমাজের প্রত্যেকের জীবন-সঙ্গী বা জীবন-সঙ্গিনী বেছে নেবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, "যদি ব্যক্তিগত সুখ, পশুপ্রবৃত্তি সমাজে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, তা হ'লে দানব-প্রকৃতির সন্তান-সন্ততিতে সমাজ ছেয়ে যাবে।...মনু বলেছেন, কামজাত সন্তানকে আর্যসন্তান বলে গ্রহণ করা চলে না।...দেশে এইরূপ আর্যসন্তানের সংখ্যা যত হ্রাস পাবে ততই অকল্যাণের বোঝা ভারী হ'য়ে কলিযুগের পথ প্রশস্ত হবে।"[২] অতএব, বিবাহ হবে সমাজ-নিয়ন্ত্রিত এবং সমাজোদ্দেশ্যে নিয়োজিত। "বিবাহ আত্মসুখের জন্য নয়, জাতি ও বর্ণের ('the nation and the caste') কল্যাণের জন্য।"[৩]

স্বামীজীর এই তত্ত্ব আধা-ইউজেনিক (quasi-ugenic) বলে অভিহিত করা চলে, এবং তত্ত্বটিকে স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত করেছেন মনুর অভিমতের উপর। কিন্তু মনুসংহিতা স্মৃতিশাস্ত্রেরই অঙ্গীভূত এবং স্মৃতিশাস্ত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর সত্য' ('second class of truths') প্রতিফলিত ক'রে স্থানীয় অবস্থারই নির্দেশ করে।[৪] এক্ষেত্রে অবশ্য স্বামীজীর মতে মনুর অভিমত শাশ্বত সত্যেরই দ্যোতক।

দ্বিতীয়ত, আর্যসন্তান-উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিবাহকে অবিচ্ছেদ্য ও পবিত্রীকৃত করে এবং স্বামী স্ত্রীর সমাধিকারের ভিত্তিতে গৃহস্থালী প্রতিষ্ঠিত করে মাতৃত্বের প্রতি প্রয়োজনীয় শ্রদ্ধা সৃষ্টি করতে হবে।[৫] এইভাবে বিবাহ যখন পবিত্র প্রতিষ্ঠানের রূপ গ্রহণ করবে মাত্র তখন পর্যন্ত অধিক সংখ্যায় অকলুষিত শক্তিশালী নরনারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

অতএব, স্বামীজীর মতে, বিবাহ অন্যতম

১ C. W. III, 408

২ Ibid., 409

৩ Notes of Some Wanderings, above, 95-96

৪ C. W. III, 120-21, 173-74

৫ C. W. V, 179; C. W. III, 491

অনুষ্ঠান নয়, অন্যতম আদর্শ। এবং এই আদর্শের বুনিয়াদের উপরই প্রকৃত সভ্যতা (real civilisation) গড়ে উঠতে পারে।

স্বামীজী ভারতীয় বিবাহের আদর্শের পক্ষপাতী হলেও বাল্যবিবাহকে মোটেই সমর্থন করেননি। সুযোগ পেলেই তিনি তাঁর মার্কিন শ্রোতৃবর্গকে জানিয়েছেন যে, ভারতে এই কুপ্রথা দূর করার বিরতিবিহীন প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।[৬] বিবাহকে পুণ্যভিত্তিক অংশীদারী ব্যবস্থা (a partnership in virtue) বলে বর্ণনা করা যায়। এই অংশীদারী ব্যবস্থায় স্বামী ও স্ত্রী তাদের পারস্পরিক অধিকার ভোগ করে পারস্পরিক কর্তব্য সম্পাদন করে যাবে। সুতরাং অংশীদারী ব্যবস্থা স্বেচ্ছাভিত্তিকও না হয়ে পারে না, এবং মাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাভিত্তিক অংশীদারী ব্যবস্থার কল্পনা করা যায়। উপরন্তু, বাল্যবিবাহ সেবাপ্রবৃত্তি পরিস্ফুট হবার পূর্বেই বালকবালিকাদের 'সংসারপঙ্কে নিমজ্জিত করে।' এদিক দিয়েও বাল্যবিবাহ অসমর্থনীয়।[৭]

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, স্বামী বিবেকানন্দ বিবাহ-ব্যাপারে ভারতীয় আদর্শের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করলেও প্রচলিত ব্যবস্থাকে আদর্শ বলে প্রমাণিত করবার কোন প্রচেষ্টাই করেননি। বিশ্বের বৃহদংশের সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞান তাঁকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত করেছিল যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় প্রকার বিবাহ-ব্যবস্থাতেই এমন কিছু উপাদান আছে যা সম্পূর্ণভাবে পরিহার একান্ত অযৌক্তিক। প্রতীচ্য গুরুত্ব আরোপ করেছে পত্নীত্বের উপর, আর ভারত মাতৃত্বের উপর। বিনিময়ের ফলে উভয়েই লাভবান হ'তে পারে।[৮] বিবাহ-ব্যবস্থায় সমন্বয়ের এই প্রয়োজনীয়তাই তাঁকে বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের নির্দেশ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন: "তিনি (স্বামীজী) স্বীকার করতেন, যেখানে অনুষ্ঠানগত বিবাহের দায় বহন করার অর্থ ভবিষ্যৎ মানবজাতিকে প্রতারণা করা, সেখানে বিচ্ছেদ (separation) হ'ল স্বামী ও স্ত্রীর পক্ষে সাহসিকতার সঙ্গে অবলম্বনীয় একমাত্র পন্থা।"[৯]

খ। পরিবার ও গৃহস্থ

পরিবারই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যোগসূত্র। সুতরাং ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গতা ও সামাজিক কল্যাণ উভয়ই পরিবারের উপর নির্ভরশীল স্বামীজী যে পরিবারের ধারণা করেছেন মোটামুটি তাকে পিতৃতান্ত্রিক প্রকৃতির (of patriarchal nature) বলে বর্ণনা করা যায়, যেখানে ব্যবস্থাপনার পূর্ণ কর্তৃত্ব গৃহস্বামীর হস্তে ন্যস্ত। তার স্ত্রী অবশ্যই স্বামীর অধিকারের অংশভাগিনী, এবং সমবায়িক ভিত্তিতে উভয়ে পারস্পরিক কর্তব্য সম্পাদন করে থাকে।

সমাজজীবনে স্বাধীনতা (freedom in society) প্রত্যেক ব্যক্তিরই লক্ষ্য। গৃহস্থের পক্ষে এই লক্ষ্যে পৌছোবার পথ হ'ল কর্মযোগ। গৃহস্থ হিসাবে তার কর্তব্য যথাযথ পালন করে ব্যক্তি সেই স্তরেই উন্নীত হতে

৬ C. W. III, 491 ff.

৭ Swami Nikhilananda: Swami Vivekananda, 122

৮ Nivedita: The Master, op. cit, 223, 315

৯ Ibid, 324

পারে বুদ্ধদেব যেখানে উপনীত হয়েছিলেন 'ধ্যানের' মাধ্যমে এবং যিশুখৃষ্ট প্রার্থনার দ্বারা। 'প্রত্যেকেই স্বস্থানে মহৎ ভূমিকার অধিকারী হ'তে পারে,'[১০] যদি স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত তার কর্তব্যে কোনরূপ বিচ্যুতি না থাকে। কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে প্রতিদানের আশা না করেই। কেবলমাত্র ভালবাসাই কর্তব্যচক্রে প্রয়োজনীয় তৈলসিঞ্চন করবে। যদি ফলের আশা পরিত্যাগ করা সম্ভব না হয় তবে অপরকে সেবা করার সুযোগকেই প্রতিদান বলে গ্রহণ করতে হবে।[১১]

তা হলে গৃহস্থ কি কেবল কর্তব্যের সমষ্টি, তার কি কোন অধিকার নেই? বেদান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে তার এক পরম অধিকার আছে: আত্মাকে উপলব্ধি করা। একে অন্যতম অপরিত্যাজ্য স্বাভাবিক অধিকার (inalienable natural right) আখ্যা দেওয়া যায়, এবং অধিকার উপলব্ধির জন্য গৃহস্থ সর্বদাই অপরকে সেবা করার সুযোগ অন্বেষণ করে বেড়াবে। এইভাবে ব্যাখ্যা করা হলে অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিসম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে দাঁড়ায়—ভাবের ক্ষেত্রে তারা অভিন্ন ধারণাই নির্দেশ করে।

গ। গৃহস্থের কর্তব্যসূচী

"গৃহস্থ সমাজ-ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু।" কিন্তু তার কর্তব্য মাত্র সমাজের সভ্য বা নাগরিক হিসাবে নয়, গৃহস্থ হিসাবেও বটে। যেহেতু পরিবারের অনেকেই তার উপর নির্ভরশীল সেহেতু গৃহস্থের প্রাথমিক কর্তব্য হল উপার্জন করা—অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু শঠতা বা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে এই কর্তব্য পালন করা চলবে না। "লক্ষ্য ও পন্থার মধ্যে সমন্বয়-সাধন ক'রতে হবে।" অন্যভাবে বলতে গেলে গৃহস্থকে 'রাজনৈতিক পন্থা' (political means) সম্পূর্ণ পরিহার ক'রে 'অর্থনৈতিক পন্থাতেই' (economic means) প্রয়োজনীয় উপার্জনের ব্যবস্থা ক'রতে হবে।[১৩] মাধ্যম বা পন্থার এই নির্বাচনও গৃহস্থের অন্যতম প্রধান কর্তব্য—সামগ্রিক সমাজের প্রতি কর্তব্য।

তারপর গৃহস্থের কর্তব্য হল পিতামাতার প্রতি, স্ত্রীর প্রতি, সন্তান-সন্ততির প্রতি, ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজনের প্রতি, বন্ধুবান্ধব ভৃত্য-বর্গের প্রতি। তালিকাটির সমাপ্তি অবশ্য এখানেই ঘটেনি। তালিকায় আছে প্রতিবেশী, দুস্থ দরিদ্র এবং সাহায্যপ্রার্থী।

স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক—উভয়ই। গৃহস্থ তার স্ত্রীকে সুখী করবার প্রচেষ্টা করবে 'অর্থ, পোশাক, পরিচ্ছদ, বিশ্বস্ততা এবং মিষ্টবাক্যের' দ্বারা। অপরদিকে সে এমন কিছু করবে না যাতে তার স্ত্রী বিচলিত হ'তে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সে অশালীন ভাষা ব্যবহার ও দম্ভপ্রকাশ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে।

সন্তান-প্রতিপালনে পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোনরূপ পৃথক আচরণ করা চলবে না। এখানে দেখা যায় যে, স্বামীজী মনুর নির্দেশ[১৪] মেনে চলেননি, কারণ সে নির্দেশ বৈদান্তিক নীতি সাম্যের বিরোধী।

নিজের জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও গৃহস্থের কর্তব্য

১০ Karma-yoga—II (C. W. I, 36)

১১ Ibid, ff.

১২ C. W. I, 71

১৩ শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি শ্রমলব্ধ উপার্জন এবং চুরিডাকাতির মধ্যে Frans Oppenheimer যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন তার কথা বলা হচ্ছে।

১৪ See Monier-Williams, Hinduism, 45

রয়েছে। গৃহস্থকে 'সংযত' জীবন যাপন করতে হবে—খাদ্য পোশাক-পরিচ্ছদ দৈহিক আরাম বা কেশচর্চা কোন ব্যাপারেই আধিক্যকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। পরিচ্ছন্ন দেহ ও শুদ্ধ মন নিয়ে কর্মমুখিতাই হবে তার বৈশিষ্ট্য। সমাজে বাৎসায়ন-বর্ণিত দৈহিক সুখানুসরণকারী নাগরিকের কোন স্থান থাকবে না—সমাজ গঠিত হবে মাত্র সংযত কর্মমুখী গৃহস্থ এবং সেবাকার্যে নিয়োজিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে নিয়ে।

ঘ। গৃহস্থের অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয়

অর্থোপার্জনকে ধনসঞ্চয় থেকে পৃথক করে দেখতে হবে, ধনসঞ্চয় 'সম্পত্তির অধিকারের' (property rights) সহিত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ধনসঞ্চয়ও গৃহস্থের অন্যতম কর্তব্য, যদি অবশ্য সঞ্চয় ব্যক্তিগত সুখভোগের পরিবর্তে সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে করা হয়। উপরন্তু, উপার্জনক্ষেত্রের মত সঞ্চয়ের পদ্ধতিও কাম্য হওয়া প্রয়োজন। গৃহস্থের পক্ষে সৎভাবে অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় ধর্মানুষ্ঠানের সামিল, কারণ এর ফলে গৃহস্থ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায়ই 'আত্মবিসর্জন ও আত্মত্যাগের' ('self-sacrifice and self-surrender') দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়। উভয়েরই পথ মোক্ষ অভিমুখে প্রসারিত।

সৎভাবে অর্থব্যয়ের মধ্যে দরিদ্র ও নির্ভর-শীল ব্যক্তিদের অর্থসাহায্য ছাড়াও আছে বৃহত্তর সমাজের জন্য সেবাপ্রকল্প (service-projects)। "পুষ্করিণী খনন করে, পথিপার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ করে, বিশ্রামাবাস স্থাপন করে··· সড়ক ও সেতু নির্মাণ করে গৃহস্থ যোগী পুরুষের লক্ষ্যাভিমুখেই চলে।"[১৫]

এখানে বলা প্রয়োজন যে প্রবর্তিত মতাদর্শ স্বাচ্ছন্দ্যনীতির (laissez-faire ideology) দরুন স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক উপরি-উক্ত সমাজসেবামূলক কর্তব্য-সম্পাদন নির্দেশ করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য স্পেন্সারের মতো তিনি এর বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর নিজের দেশে শোষণকারী বিদেশী সরকার যে এই সকল কর্তব্য সম্পাদন ক'রবে—এ আশাও তিনি করতে পারেননি। তাই তিনি গৃহস্থকেই এই কর্তব্যভার অর্পণ করেছেন, এবং এর ফলে তাঁর সমাজদর্শনে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। বোধহয় অনুধাবন করা অযৌক্তিক হবে না যে, রবীন্দ্র-নাথ তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪) রচনায় অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন সমাজ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা থেকে। //

উপরন্তু, স্বামীজী বোধ হয় গৃহস্থের উপর সেবামূলক কর্তব্যসম্পাদনের মধ্যে সম্পত্তির অধিকার-সংক্রান্ত বিরক্তিকর সমস্যার সমাধানও খুঁজে পেয়েছিলেন।

যাই হোক, স্বামীজী-পরিকল্পিত এই গার্হস্থ্যজীবন যোগাভ্যাসের সামিল। এই সমাজ-বিজ্ঞানের দিক থেকে যোগাভ্যাসের অন্তত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গুণ নির্দেশ করা যায়: সমাজ সম্বন্ধে চেতনা এবং নিয়মানুবর্তিতা (sense of community and discipline)। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিজনকে সাহায্য, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কার্য-সম্পাদন সমাজ-চেতনাই জাগ্রত করে। অপরদিকে পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি, স্ত্রীকে ভালবাসা, সন্তান-সন্ততির প্রতি স্নেহ, জীবনযাত্রায় আধিক্য-পরিহার, উপার্জন ও সঞ্চয়ের পথে দুর্নীতিকে দূরে রাখা নিয়মানুবর্তিতারই সূচক। গৃহস্থ নিয়মানুবর্তী হ'লে সমাজও নিয়মানুবর্তী না

১৫ C. W. I, 46

হয়ে পারে না। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজী গৃহস্থের কর্তব্যের সে সূচী প্রণয়ন করেছেন তা দশ-আদেশের (Ten Commandments) মতো নিয়মানুবর্তিতা-প্রতিষ্ঠার জন্যই।

অংশত এই কারণে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়মানুবর্তিতার দার্শনিক (philosopher of discipline) বলে অভিহিত করা চলে। তবে এ ব্যাপারে তাঁকে 'লেভায়াথানের' (Leviathan) লেখক হবসের সঙ্গে তুলনা করা যায় না, কারণ হবস অসমর্থ হলেও স্বামীজী 'পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও পূর্ণাঙ্গ কর্তৃত্বের' মধ্যে সমন্বয়সাধনের সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন।

ভাঙা নয়, সম্প্রসারণই (growth) স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনের মূলসূত্র। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সম্প্রসারণকে কিছুতেই নিশ্চিত করা যাবে না, যদি না ব্যক্তির আত্ম-কেন্দ্রিক ক্রিয়াকলাপের কুফলগুলিকে দূর করা যায়। সুতরাং তিনি সমাজের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করবার জন্যে গার্হস্থ্যজীবনকে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। (ক্রমশঃ)

শক্তিপূজা

'অবধূত চট্টোপাধ্যায়'

সবচেয়ে বড় পাপ,
সবচেয়ে বিধাতার তীব্র অভিশাপ
বলহীন হওয়া ; প্রতি পদে দীন প্রাণে
ক্ষত ও বিক্ষত করা আত্ম-অসম্মানে,
প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে প্রতিটি সন্ধ্যায়
নীরবে বহন করা আনত মাথায়
সবলের দুর্বহ পাদুকা, নির্বিবাদে,
কায়ক্লেশে ঔদ্ধত্যের ঘৃণিত প্রসাদে
ক্ষুধা তৃপ্ত করা, মিথ্যা চাটুবাক্যবলে
আপনারে রক্ষা করা নির্লজ্জ কৌশলে—
এর চেয়ে জগতের কোনো দুঃখ গ্লানি
আসে না অন্তরে বুঝি দণ্ডশূল হানি' !
দুর্বলের তরে শুধু আছে মৃত্যুভার।
নাই স্বাধীনতা, নাই ঐশ্বর্য আত্মার ॥

যোগবাসিষ্ঠসারঃ

[পূর্বানুবৃত্তি]

[অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ]

ভরিতাশেষদিক্‌কুঞ্জমনন্তাকাশনির্ভরম্ ।

একং বস্তু জগৎ সর্বং চিন্মাত্রং বারি বাম্বুধিঃ ॥ ১৩

সর্বদিক্‌সমূহ ও লতামণ্ডপাদিতে পরিব্যাপ্ত অনন্ত আকাশতুল্য ব্যাপক, সর্বভেদরহিত, এক অদ্বিতীয় চিন্মাত্র বস্তুই এই সর্ব জগৎ (অর্থাৎ জগৎ নামে আর ভিন্ন কিছুই নাই), যেমন সমুদ্র জলই, জল ভিন্ন আর কিছু নহে।

নিরংশত্বাৎ বিভুত্বাচ্চ তথাঽনশ্বরভাবতঃ ।

ব্রহ্মব্যোম্নো র্ন ভেদোঽস্তি চৈতন্যং ব্রহ্মণোঽধিকম্ ॥ ১৪

অবয়বরাহিত্য, ব্যাপকত্ব এবং অবিনাশিত্বহেতুবশতঃ ব্রহ্ম ও আকাশের কোন ভেদ নাই। কিন্তু ব্রহ্মের চৈতন্য অধিক রহিয়াছে (যাহা আকাশের নাই, কারণ আকাশ জড়।)

নিস্তরঙ্গোঽতিগম্ভীরঃ সান্দ্রানন্দসুধার্ণবঃ ।

মাধুর্যৈকরসাধার এক এবাস্তি সর্বতঃ ॥ ১৫

স্থির, অতি গম্ভীর, ঘন আনন্দরূপ সুধার সমুদ্র, সর্বমাধুর্য বা আনন্দরসের একমাত্র আধার এক অদ্বিতীয় বস্তুই সর্বত্র বিরাজমান !

সমস্তং খল্বিদং ব্রহ্ম সর্বমাত্মেদমাগতম্ ।

অহমন্য ইদং চান্যদিত্যখণ্ডং ন খণ্ডয় ॥ ১৬

দৃশ্যমান এই সমগ্র বিশ্বই ব্রহ্ম, সর্বতঃ বিস্তৃত এই সর্ব পদার্থ বস্তুতঃ আত্মাই। অতএব 'আমি ভিন্ন', 'বস্তুসমূহ আমা হইতে ভিন্ন'—এইরূপ ভাবনা দ্বারা এক অদ্বিতীয় অখণ্ড বস্তুকে খণ্ডিত করিও না।

যদৈব ব্রহ্মণো রূপং ততং বুদ্ধমখণ্ডিতম্ ।

তদা বিস্তীর্ণঃ সংসারঃ পরমেশ্বরতাং গতঃ ॥ ১৭

সর্বত্র পরিব্যাপ্ত অখণ্ডিত ব্রহ্মের রূপ যখনই অবগত হওয়া যায় তখনই এই বিশাল সংসার পরমাত্মারই রূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়। এক অখণ্ড ব্রহ্মই উপলব্ধ হয়।

সমস্তমেব ব্রহ্মেতি ভাবিতে ব্রহ্ম বৈ পুমান্ ।

পীতেঽমৃতেঽমৃতময়ঃ কো নাম ন ভবেদিতি ॥ ১৮

সমস্তই ব্রহ্ম, এইরূপ ভাবনার দৃঢ়তায় পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া যায়। অমৃত পান করিলে কে অমৃতময় অর্থাৎ অমর হয় না ? অর্থাৎ সকলেই অমর হয়।

ভব্যোঽসি চেত্তদেতস্মাৎ সর্বমাপ্নোষি নিশ্চয়াৎ ।

নো চেদ্ বহ্বপি সংপ্রোক্তং ত্বয়ি ভস্মনি হূয়তে ॥ ১৯

যদি তুমি যথার্থই ব্রহ্মজ্ঞ হও তাহা হইলে এই ব্রহ্মনিশ্চয়তা দ্বারাই তুমি সর্বাত্মকতা অর্থাৎ সর্বরূপতা প্রাপ্ত হইবে। নতুবা তোমার লব্ধ বহু উপদেশ অথবা বহু পুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত তোমার সব উপদেশ ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় মিথ্যা, বৃথাই হইবে।

অপি বিজ্ঞাততত্ত্বেন তথাঽভ্যস্তমিদং সদা।
ন নামমাত্রাৎ কতকফলমম্বুপ্রসাদকম্ ॥ ২০

তত্ত্ব যিনি অবগত হইয়াছেন তাঁহারও 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ চিন্তন সর্বদা অভ্যাস করা কর্তব্য। কতক ফলের নাম উচ্চারণ করিলেই তাহা জলের মালিন্য দূর করিয়া স্বচ্ছতা সম্পাদন করে না।

অহমেব পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্।
ইতি স্যান্নিশ্চিতো মুক্তো বদ্ধ এবান্যথা নরঃ। ২১

আমিই বাসুদেব নামক অব্যয় পরব্রহ্ম, এই দৃঢ়নিশ্চয়বান্ পুরুষই মুক্ত হইয়া থাকেন, এইরূপ নিশ্চয়ের অভাবে তিনি বদ্ধ ব্যতীত আর কিছু নহেন।

নেতি নেতীতি নেতীতি শেষিতং যৎ পরং পদম্।
নিরাকর্তুমশক্যত্বাৎ তদস্মীতি সুখী ভব ॥ ২২

মূর্তামূর্ত যাবতীয় পদার্থ 'ইহা ব্রহ্ম নহে', 'ইহা ব্রহ্ম নহে' এইরূপ বিচারদ্বারা নিষেধ-করতঃ, যাহা আর নিষেধ করা যায় না, এইরূপ সর্বনিষেধের অবধিরূপে যে পরমপদ অবশেষ থাকেন, তাহাই আমি, এই প্রকার জানিয়া সুখী হও।

আত্মানং সততং ব্রহ্ম বিদ্ধি চৈকং নিরন্তরম্।
অহং ধ্যাতা পরং ধ্যেয়মখণ্ডং খণ্ডসে কথম্ ॥ ২৩

আত্মাকে সর্বদা সর্বভেদরহিত এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে জান। আমি ধ্যাতা, পরব্রহ্ম ধ্যেয়—এইরূপে স্বীয় ভাবনা দ্বারা অখণ্ড ব্রহ্মকে কেন খণ্ডিত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন করিতেছ?

সোঽহং চিন্মাত্রমেবেতি চিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে।
ধ্যানস্যাবিস্মৃতিঃ সম্যক্ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ২৪

সেই পরমাত্মা আমিই যাহা চিন্মাত্র, ব্রহ্ম, এইপ্রকার চিন্তনকে ধ্যান বলে। এইরূপ চিন্তন নিরবচ্ছিন্ন হইলে তাহাই উত্তম সমাধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিপ্রবাহোঽহংকৃতিং বিনা।
সম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ স্যাৎ জ্ঞানাভ্যাসপ্রকর্ষতঃ ॥ ২৫

জ্ঞানাভ্যাস পরিপক্ব হইলে অহংকার বিনা ব্রহ্মাকার যে মনোবৃত্তিপ্রবাহ চলিতে থাকে তাহাকেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

কল্পান্তবায়বো বান্তু যান্তু চৈকত্বমর্ণবাঃ।
তপন্তু দ্বাদশাদিত্যা নাস্তি নির্মনসঃ ক্ষতিঃ ॥ ২৬

কল্পান্তকারী প্রলয়ংকর বায়ুই প্রবাহিত হউক, সমুদ্রসমূহ (বেলাভূমি অতিক্রম

করিয়া) একাকার প্রাপ্ত হউক অথবা দ্বাদশ আদিত্য একত্র হইয়া উত্তপ্ত কিরণরাশিদ্বারা অনলই বর্ষণ করুক—নির্মনস্ক ব্রহ্মবিদের তাহাতে কোনই ক্ষতি হয় না। অর্থাৎ তাঁহার বিকার হয় না।

যা চিতিঃ সর্বভূতানামুদয়ব্যয়সাক্ষিণী।
তাং চিতিং পশ্যতাবস্থাং পূর্ণানন্দঘনামৃতাম্ ॥ ২৭

সর্বভূতের উৎপত্তি ও বিনাশের সাক্ষিরূপা যে চিতি অর্থাৎ চিদ্রূপ বস্তু সদা বিদ্যমান, পূর্ণানন্দঘন অমৃতরূপ সেই চৈতন্যময় অবস্থা বিচার সহায়ে অবগত হও।

মনোদৃশ্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসো হ্যুন্মনীভাবাৎ দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥ ২৮

সচরাচর এই পরিদৃশ্যমান সর্ব জগৎ মনেরই বিলাসমাত্র। মন উন্মনীভাব প্রাপ্ত হইলে তখন আর দ্বৈত উপলব্ধই হয় না। (তখন আর জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জগৎ বলিয়া ভিন্ন কিছু থাকেই না।)

যদস্পন্দং শিবং শান্তং যস্যান্তর্জগতঃ স্থিতিঃ।
স্পন্দাস্পন্দবিলাসাত্মা স একোঽত্র চিদাকৃতিঃ ॥ ২৯

যিনি নিষ্কম্প, মঙ্গলময় বা আনন্দস্বরূপ, শান্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিরহিত এবং যাঁহার অন্তরে এই বিশ্ব অবস্থিত অর্থাৎ যাঁহাতে এই বিশ্ব কল্পিত, চরাচর যাঁহার বিলাসমাত্র, সেই চিদাত্মা একক স্বমহিমায় সদা বিরাজমান রহিয়াছেন।

অহিনির্ল্বয়নীমহিরাত্মতয়া
জগৃহে পরিমোক্ষণতস্তু পুরা।
পরিমুচ্যতু তামুরগঃ স্ববিলে
ন নিরীক্ষত আত্মতয়া তু পুনঃ ॥ ৩০

ত্বক্‌মোচনের পূর্বে সর্প তাহাতে আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু সেই ত্বক্ (কঞ্চুক) স্বীয় নিবাসস্থলে (গর্তে) পরিত্যাগের অনন্তর উহাতে পুনরায় আর আত্মবুদ্ধি করে না। (জ্ঞানীও তদ্রূপ জ্ঞানের অনন্তর আর দেহেতে আত্মবুদ্ধি করেন না।)

দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ততে।
গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ ॥ ৩১

(বিধিনিষেধাতীত ব্রহ্মস্বভাব জ্ঞানী স্বভাবতঃই কোন পাপাচরণ করেন না।) এই পাপাচরণ করা অনুচিত, এইরূপ দোষবুদ্ধিবশতঃ তিনি পাপাচরণ করেন না, তাহা নহে। পুনঃ স্নান সন্ধ্যাদি বিহিত কর্ম করা আবশ্যক, এইরূপ গুণবুদ্ধিপূর্বক তিনি বিহিত কর্ম করেন, তাহাও নহে। (কিন্তু স্বভাববশেই বিহিত কর্মানুষ্ঠান তাঁহার দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা হইয়া থাকে।) অবোধ শিশু যেমন বিধিনিষেধাতীত, জ্ঞানীও তদ্রূপ।

অনুৎকীর্ণা যথা স্তম্ভে সংস্থিতা শালভঞ্জিকা।

তথা বিশ্বং স্থিতং তত্র তেন শূন্যং ন তৎপদম্ ॥ ৩২

শালকাষ্ঠনির্মিত বেশ্যার মূর্তি অর্থাৎ শালপুত্তলী যেমন ক্ষোদিত বা চিত্রিত হইবার পূর্বে ঐ শালস্তম্ভেই সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে (কারণ উহা সেখানে না থাকিলে উৎকীর্ণ হইবে কি প্রকারে ?) তদ্রূপ অবিদ্যমান অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব অবস্থাতেও এই বিশ্ব ব্রহ্মেই স্থিত থাকে। ব্রহ্মপদ বিশ্বরহিত নহে।

যথা নু পুত্রিকাশূন্যঃ স্তম্ভোঽনুৎকীর্ণপুত্রিকঃ।

তথা ভাতং জগৎ ব্রহ্ম তেন শূন্যপদং গতম্ ॥ ৩৩

পুত্তলিকাকারবিহীন কাষ্ঠস্তম্ভকে যেমন অক্ষোদিতপুত্তলিক স্তম্ভমাত্র বলা হয়, এই প্রতীয়মান জগৎও সেইপ্রকার অব্যাকৃত ব্রহ্মরূপ। অতএব জগৎ আর জগৎরূপে নাই, উহা শূন্যপদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ বা ব্রহ্মরূপই।

সৌম্যাম্ভসি যথা বীচি র্ন চাস্তি ন চ নাস্তি চ।

তথা জগদ্ ব্রহ্মণীদং শূন্যাশূন্যপদং গতম্ ॥ ৩৪

ইতি যোগবাসিষ্ঠসারবিবরণে মহীধরকৃতে শূন্যাশূন্যপদং গতং নাম দশমপ্রকরণম্ সম্পূর্ণম্।

স্থির জলে যেরূপ তরঙ্গ নাই, কিন্তু একেবারেই নাই তাহাও বলা যায় না (কারণ একেবারে না থাকিলে তরঙ্গ আসিল কোথা হইতে ? সেইপ্রকার এই জগৎ ব্রহ্মে শূন্যাশূন্যপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মে আছেও আবার নাইও।) অর্থাৎ জগদ্ভাবসাহিত্য ও জগদ্ভাবরাহিত্য উভয়ই ব্রহ্মে বিদ্যমান। ব্যাবহারিক দশাতে ব্রহ্মে জগৎ প্রতীত হয়, কিন্তু তাত্ত্বিক বা পারমার্থিক দশাতে জগৎ নাই—ইহাই ভাবার্থ।

মহীধরকৃত যোগবাসিষ্ঠসার গ্রন্থের শূন্যাশূন্যপদ নামক দশম প্রকরণ সমাপ্ত।

হরি ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মার্পণমস্তু

'সে বড় চতুর'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

"যেইজন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর।" অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা কৃষ্ণের ভজনা করেন যিনি নিঃসন্দেহে তিনি একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। যিনি কৃষ্ণ-ভজনায় ডুবে আছেন তাঁকে বৈষ্ণব-শাস্ত্রে চতুর বলা হয়েছে কেন? কারণ বাসুদেব পরমানন্দঘনমূর্তি, অনন্ত এবং ষড়ৈশ্বর্যশালী। তাঁর মধ্যে আমাদের জীবনের সমস্ত আনন্দ রয়েছে; সেই আনন্দ এমন যা অফুরন্ত, অনির্বচনীয়, "সব আনন্দ ধুলায় ফেলে দিয়ে যে আনন্দে বচন নাহি ফুরে।"

আনন্দই তো সত্য। আর সব মায়া। জেনে বা না জেনে আনন্দের সন্ধানে আমরা বিত্তের পিছনে, খ্যাতির পিছনে, অমরত্বের পিছনে, আরও অনেক-কিছুর পিছনে ধাবমান। "সুখতরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর দুঃখে যার ভালবাসা?" স্ত্রী-পুত্রকে ঘিরে ঘিরে যার মন-ভোমরা গুঞ্জরণ করছে সেও যেমন আনন্দের কাঙাল, গৌতমবুদ্ধের মতো যিনি তরুণী ভার্যা ও নবজাত পুত্রকে ছেড়ে ত্যাগের শূন্যপাত্র হাতে তুলে নিয়েছেন, তিনিও তেমনি আনন্দের পিয়াসী। ভোগ্যবস্তু আহরণের জন্য যারা কোনো অন্যায় কাজ করতে কুণ্ঠিত নয়, তারা যেমন সুখতরে কাতর, বিত্তকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও যাঁরা সে রাস্তায় হাঁটলেন না, তাঁরাও সমভাবে সুখই কামনা করেছেন। এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, সুখতরে আমরা সবাই কাতর। দুঃখকে আমরা এড়াতে চাই। তবুও ফাঁসির মঞ্চে আমরা যে হাসিমুখে আরোহণ করি - সে মৃত্যুর মধ্যে অন্তহীন প্রাণ রয়েছে বলে। অধ্যাত্ম-সাধনার পথকে সকল শাস্ত্রেই দুর্গম বলা হয়েছে। তবুও আজ পর্যন্ত সেই দুঃখের দুর্গম রাস্তায় হাঁটবার মানুষ দুর্লভ হলেও নিশ্চিহ্ন নয়। যুগে যুগে সাধকদের এই যে দুঃসাহসিক আধ্যাত্মিক অভিযান—এর পিছনে তো আনন্দলোকে পৌঁছানোর প্রেরণা।

গীতায় ভগবান বলছেন, ভজস্ব মাম্। কিন্তু কেন? কারণ অনিত্যমসুখং লোকম্। যে-সংসার দিয়ে তোমার চেতনার অণু-পরমাণু ভরিয়ে রেখেছো—তা যেমন একদিকে নিত্য নয়, আর একদিকে তার মধ্যে সুখেরও লেশমাত্র নেই। ঠাকুরের বহু কথায় গীতার প্রতিধ্বনি। ঠাকুর বলতেন, "সংসার আমড়া, আঁটি আর চামড়া।"

বিত্তে খ্যাতিতে, পুত্র-কন্যা-ভার্যায় অথবা পাণ্ডিত্যে যদি শাশ্বত সুখ থাকতো, ঠাকুর টাকা কখনোই গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করতেন না, নচিকেতাও যমকে বলতেন না -"তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে।" ঠাকুর বলেছিলেন, "জগৎ নিত্য হ'লে আমি কামারপুকুর সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতাম।" কিন্তু তিনি তো বিত্তের রাস্তার ধার দিয়েও গেলেন না—চতুরের রাজা ছিলেন ব'লে। মানুষ যে-রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে ডুবেছে—যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ—সে রাস্তায় চতুরের শিরোমণি হ'য়ে তিনি হাঁটতে যাবেন কেন? তিনি ছিলেন সত্য-দ্রষ্টা। মানুষের মর্মমূলে গিয়ে পৌঁছাতো

তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বাহিরের হাসির ছটা দিয়ে ভিতরের আঁখির জল লুকানোর সাধ্য ছিল না কারও সেই অন্তর্যামী পরমপুরুষের শ্যেনদৃষ্টির সামনে। সংসারে যারা কামকাঞ্চন নিয়ে মেতে আছে, তাদের মনের আসল চেহারা তাঁর কাছে ছিলো দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। আহা! কি অতলস্পর্শী নৈরাশ্যের বোঝায় ওদের চিত্ত ভারাক্রান্ত! রবি ঠাকুরের 'রক্তকরবী'র রাজা সোনার পাহাড়ের চূড়া থেকে নন্দিনীকে বলেছে, "হায়রে, আর সবই বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না!" এই যে একটি গভীর হতাশার সুর এত ঐশ্বর্যের মধ্যেও রাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—এ সুর কামকাঞ্চনৈকলক্ষ্য কোন মানুষের মর্মমূল থেকে উৎসারিত হচ্ছে না? মার্কিন কবি ওয়াল্ট্ হুইটম্যান যাকে বলেছেন, "secret, silent loathing and despair" অর্থাৎ একটা প্রচ্ছন্ন মৌন আত্মগ্লানি এবং নৈরাশ্য—তা বাসা বেঁধে নেই কোন মানুষের মনের গভীরে? অথচ আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে একটা চেষ্টা চলেছে শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার। হৃদয়ের এই গভীর নৈরাশ্যের এবং প্রচ্ছন্ন আত্মগ্লানির কথা কোনো স্ত্রী কি তার স্বামীকে অথবা কোনো স্বামী কি তার স্ত্রীকে বলে? কোন্ বন্ধু তার বন্ধুর কাছে উদ্ঘাটিত করে তার মরমের গোপন হতাশাকে? গীতাঞ্জলির কবি যখন গানের মাধ্যমে প্রাণের এই প্রচ্ছন্ন কান্নার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখলেন:

"কী লয়ে বা গর্ব করি
ব্যর্থ জীবনে?
ভরা গৃহে শূন্য আমি
তোমা বিহনে।"

তখন তিনি কি শুধু নিজেরই বেদনার কাহিনী নিবেদন করছেন তাঁর প্রিয়তমের কাছে? গানের এই দুটি কলির মধ্যে কি সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের মর্মের বেদনার সুরটি বেজে ওঠেনি? নানা উপকরণের বিচিত্র সম্ভারে পরিপাটি ক'রে সাজানো গুছানো ঘরে যে মানুষটিকে দেখে মনে হচ্ছে 'সব পেয়েছি'র দেশে সে বাস করছে - তার ভিতরটা যদি আমরা উঁকি মেরে দেখতে পারতাম! অন্তরে কী দুর্বহ ক্লান্তির বোঝা সে নিঃশব্দে বহন ক'রে বেড়াচ্ছে! মার্কিন ঔপন্যাসিক Sinclair Lewis-এর 'ব্যাবিট্' উপন্যাসে আমেরিকান নাগরিকদের মানসিক এই ক্লান্তির এবং শূন্যতার কাহিনীই প্রাঞ্জল হয়ে ফুটে উঠেছে!

শুধু আমড়ার দৃষ্টান্ত দিয়েই কি ঠাকুর সংসারের বর্ণনা শেষ করেছেন? সংসারী লোকদের সঙ্গে উটের তুলনাটিও কতই না বাস্তবধর্মী! উট কাঁটা ঘাস খাচ্ছে আর দরদর ধারায় তার মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে! তবুও তা খাওয়ার বিরাম নেই তার! সংসার যে একটা সুখের জায়গা নয়—এ কি শুধু গীতারই কথা? বৌদ্ধধর্মেও দুঃখকে বলা হয়েছে প্রথম আর্য সত্য। খ্রীষ্টধর্মেও বলা হয়েছে ভগবান ক্রুস্ প্রত্যেকের পাশেই রেখে দিয়েছেন। সকলকেই ক্রুসের শয্যায় শুতে হবে। ক্রুস-কাষ্ঠগুলি সব একমাপের নয়। দুঃখী আমরা সকলেই। দুঃখের শুধু প্রকারভেদ। এমন যে যুক্তিবাদী বার্ট্রাণ্ড রাসেল, যিনি জীবনে ভোগের এবং প্রবৃত্তির দিকটাকে আদৌ অস্বীকার করেননি, যাঁর লেখায় ঈশ্বরপ্রেমের সার্থকতার কচিৎ কোথাও উল্লেখ থাকলেও ঈশ্বরীয় মহিমার বর্ণনার ছটা কোথাও নেই, যাঁকে নাস্তিক বলতে কুণ্ঠা থাকলেও আস্তিক্যবাদী বলা সহজ নয়—তিনিও কিন্তু 'Principles of Social Reconstruction' গ্রন্থের উপ-

সংহারে অকুণ্ঠ ভাষায় বলেছেন, ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। জৈব স্তরে একান্তভাবে সীমিত জীবন আদৌ সুখের নয়, সুখের হতে পারে না কখনো—এমন কথা রাসেলকে নিতান্ত যুক্তির খাতিরেই অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করতে হয়েছে। রাসেলের যুক্তি হোলো, মানুষের স্বভাবের মধ্যে আছে শ্রেয়ঃ আর প্রেয়ঃ—উভয়ের সংমিশ্রণ। নক্ষত্রখচিত আকাশ আর পৃথিবীর ধূলিমাটি—এ দুয়ের অদ্ভুত মিশেল মানবচরিত্রে। ইন্দ্রিয়সুখের মধ্যে নিতান্ত জৈব জীবন যাপনের আকর্ষণ মানুষের প্রকৃতিতে—অনন্তের জন্যে একটা অশান্ত ক্রন্দনও রয়েছে তার মর্মের গভীরে। স্বর্গ আর নরকের মধ্যে মানুষ যেন দোদুল্যমান ত্রিশঙ্কু ; তার স্বভাবের মধ্যে দেবাসুরের একটা অন্তহীন সংগ্রাম লেগেই আছে। শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ—মানুষের স্বভাবে শ্রেয় আর প্রেয় দুই-ই রয়েছে। কামকাঞ্চনের আকর্ষণ শিকড় গেড়ে আছে মানুষের একেবারে মর্মমূলে। মায়াকে দৈবী বলা হয়েছে। কিন্তু এটাই মানব-স্বভাবের শেষ কথা নয়। সেই স্বভাবের আরও গভীরে ঘুমিয়ে আছে স্বর্গলোকের দেবদূতেরা। সুদূর দিগন্তের একটা মৌন অথচ দুর্বার আবেদন রয়েছে তার গভীরতর একটা সত্তার কাছে। একটা অশরীরী বাণী কোন্ আকাশপার থেকে এসে ঘুমের মধ্যেও তাকে যেন বলছে: "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোন খানে।" বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিমা যাঁর আছে তিনি কখনও escapist হ'তে পারেন না, সত্যের রূপ যতই অবাঞ্ছিত হোক না কেন, তার কঠিন নির্মল মূর্তির সামনে দাঁড়াতে তিনি কখনও ভয় পান না। জীবন-সংগ্রামে উটপাখীর ভূমিকা বৈজ্ঞানিকের ভূমিকা নয়। শিকারীর তাড়া খেয়ে পলায়মান উটপাখী বালুতে মুখ গুঁজে ভাবে পিছনে ব্যাধ নেই। এই পলায়নী মনোবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে উটপাখী মৃত্যুকে এড়াতে পারে না। রাসেল নিবৃত্তিমার্গের পথিক নন, এ কথা নিসংশয়ে সত্য। জীবন থেকে প্রবৃত্তির দিকটাকে ছেঁটে ফেলে বৈরাগ্যের পথ নিতে কাউকে তিনি বলেননি। কিন্তু প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে জৈব স্তরে জীবনকে একান্তভাবে সীমিত করে রাখাও কি তাঁর কাছ থেকে আদৌ কোনো সমর্থন পেয়েছে? জীবনপূজারী এবং বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিসম্পন্ন ব'লেই প্রবৃত্তির চরিতার্থতার মধ্যে সমস্ত আনন্দ পাওয়ার প্রয়াসকে পণ্ডশ্রম বলতে দ্বিধা করেননি তিনি। ন বিত্তেন তর্পণীয়ঃ মনুষ্যঃ—এই মূলসুরের অনুরণন তাঁর Property প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, life of the instinct যেমন আমাদের জীবনের একটি অঙ্গ, life of the spiritও তেমন আমাদের জীবনের একটি অনস্বীকার্য অঙ্গ। তিনি বলেছেন, জীবনকে ভোগের মধ্যে একান্তভাবে সঙ্কুচিত ক'রে রাখার চেষ্টায় প্রজ্ঞার কোন পরিচয় থাকতে পারে না। তিক্ত অভিজ্ঞতার পর তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোয় একথা প্রবৃত্তিমার্গের পথিকের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রেয়কে একান্তভাবে স্বীকার করতে গিয়ে সে জীবনকে ক'রে ফেলেছে নিষ্প্রাণ আনন্দগুলির একটা কবর, অস্তিত্বকে ভরিয়ে তুলেছে নৈরাশ্য আর আত্মগ্লানিতে। আমাদের স্বভাবের মধ্যে যে শ্রেয় রয়েছে, যে একটি আধ্যাত্মিকতার নিবিড় স্পর্শ রয়েছে তাকে অস্বীকার ক'রে বাঁচতে গেলে সে জীবন হয় জান্তব জীবন আর জান্তব জীবনে পশুপাখীর সুখ থাকতে পারে, মানুষের নয়।

রাসেল তাই জোর দিয়েছেন একটি নূতন

জীবনদর্শনের উপরে। এই নূতন জীবনদর্শনে আমাদের স্বভাবের প্রবৃত্তির এবং বৌদ্ধিক দিকটার স্বীকৃতি থাকলেও তার মৌলসুরটি হবে 'Expansion is life, contraction is death,' বাঁচতে হবে বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়। গীতায় যাকে অসুর বলা হয়েছে সে তো আমাদের অহং এবং কামনা। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় ego and desire. মানবস্বভাবের এই অসুরটাকে প্রাধান্য দেবার আত্মঘাতিনী এই যে চেষ্টা—তার মূলে তো ভ্রান্ত একটা জীবন-দর্শন। গীতায় বলছে, শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ। প্রত্যেক মানুষেরই একটা না একটা জীবন-দর্শন আছে। জীবন আসুরিক হবে, না দিব্য হবে—সে তো নির্ভর করছে আমাদের জীবন-দর্শনের উপরে। ভারতীয় জীবনদর্শনেও আনন্দের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। ঐ জীবনদর্শনে শুধু বলা হয়েছে, নাল্পে সুখমস্তি। ভারতবর্ষে যুগের পর যুগ এসেছে কণ্ঠে বৈরাগ্যের বাণী নিয়ে। গীতার মূল কথা তো ত্যাগ। কিন্তু এই ত্যাগ তো ঈশ্বরলাভের জন্য, যিনি শুধু সৎ নন, শুধু চিদ্‌ঘন নন, যিনি পরমানন্দঘনও বটে। তাঁর মধ্যে আমাদের জীবনের সমস্ত আনন্দ আছে বলেই তো তাঁকে আমরা এমন গভীর করে চাই। বিত্তে যদি আমাদের শাশ্বত সুখ থাকতো তা হ'লে ঠাকুর টাকা কখনই গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করতেন না। কাশ্মীরী শালে কি সুখ আছে তা পরখ করে দেখবার জন্য সেই শাল পরলেন ঠিকই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সেই শাল অঙ্গ থেকে খুলে ফেললেন আর তাকে পা দিয়ে দলতে লাগলেন। কাশ্মীরী শাল আর কৃষ্ণ—এ দুয়ের একটাকেই আমাদের বেছে নিতে হয়। You cannot serve God and mammon at the same time. খ্রীষ্টের সেই কথা: ছুঁচের ছিদ্রপথে উট গ'লে যাবে, কিন্তু স্বর্গরাজ্যে ধনীরা কখনো যাবে না। এখন প্রশ্ন, কাশ্মীরী শাল আর কৃষ্ণ—কোন্‌টা বাছবো। যার শ্রদ্ধা যেমন, বিশ্বাস যেমন, জীবনদর্শন যেমন, তার বাছাইও তেমনি হবে। যাদের জীবনদর্শন eat, drink and be merry, হেসে নাও—দুদিন বইতো নয় তারা কাশ্মীরী শালের রাস্তাই বেছে নেবে। চতুর ব্যক্তিরা দেখেন, সংসার দুদিনের হোলেও দুঃখে ভরা। মৃত্যু তার দিগন্তবিস্তারী পক্ষের ছায়ায় জগৎটাকে ঢেকে রেখেছে। কি ছাই ভোগ করবে? সন্দেশ গলার নীচে গেলে আর মিষ্টত্ববোধ থাকে না। অল্পবুদ্ধি বালকেরা কামনা থেকে কামনার পিছনে দৌড়াচ্ছে, আর "তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।" সুতরাং চতুর জনেরা সংসারে সুখ খোঁজার পণ্ডশ্রম না করে যা সত্য যা শাশ্বত সুখের উৎস, যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ, যা পেলে মানুষ আর সব লাভকে সরিয়ে ফেলে তার সন্ধানে অকূলে তরী ভাসিয়ে দেন। মাঝ দরিয়ায় তরী ডুবে যায়, আমরা নিজেরা ডুবে যাই, সর্বস্ব ডুবে যায় তবুও কূলে ফেরা কিছুতেই নয়! সুখের ডাঙ্গায় এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেল সে তো চামড়া আর আঁটি, যা খেলে অম্লশূল হয়। দিনের পর দিন কেটে যায়, কিন্তু কোথায় সেই পরমানন্দঘন অনন্ত বাসুদেব? 'মা, আর একটা দিন চলে গেল, দেখা দিলি না', গঙ্গাবক্ষে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ভক্তের মর্মভেদী আর্তনাদে সন্ধ্যাগগন আকুল হয়ে ওঠে! নদ-নদী সরোবরে এত জল থাকতেও চাতক চঞ্চু দিয়ে তা স্পর্শ করে না। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে গেলেও বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য জল সে ছোঁবে না। শাস্ত্রবাক্যে

জলন্ত জীবন্ত বিশ্বাস নিয়ে সাধক নিত্য সুখের সন্ধানে এগিয়ে যান অধ্যাত্মসাধনার দুর্গম পথে, তার পর কঠিন পথে চলতে চলতে সাধক পৌঁছে যান সেই দিব্য উপলব্ধিতে যেখানে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে উপনিষদের ঋষি ঘোষণা করেছেন: বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্। সেই অবিনাশী অদিত্যবর্ণ পরম পুরুষকে আমি জেনেছি।

অতি সাবধানী প্রবীণ পাকা বলবেন, ঠকতে রাজী নই। যার অস্তিত্বের নিশ্চিত কোন প্রমাণ নেই, তার দিকে পাদমেকং ন গচ্ছামি। কৃষ্ণভজনায় ব্রতী এর উত্তরে বলবেন, ঠকতেই যদি হয় কাঁটাঘাস-খাওয়া উট হয়ে ঠকতে প্রস্তুত নই। সংসারের পরিচয় যে কী—তা যখন জানতে বাকী নেই তখন এর ফাঁদে আর পা দিচ্ছিনে। অজানার বুকে ঝাঁপ দিয়েও ঠকতে পারি। কিন্তু ঠকবোই এমন কথা জোর ক'রে কে বলবে? "জেনেছি তাঁহারে / মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে / জ্যোতির্ময়"—ঋষির এই 'মৃত্যুঞ্জয় পরম ঘোষণা'কে কল্পনার বিলাস বলার কি অধিকার আছে সেই ব্যক্তির যে অধ্যাত্ম-সাধনার পথে কোনদিনই পা বাড়ালো না? শাস্ত্রবাক্য অনেক শুনে, বেদ বহুবার প'ড়ে এবং ব্যাখ্যা ক'রে, মেধাকে অনবরত শাণিয়ে যা লাভ করা যায় না, যে বেদান্ত-তত্ত্ব উপলব্ধিতে প্রত্যক্ষ করবার বিষয়, সেই সত্যকে তো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করা যাবে না। ঈশ্বরীয় সেই আনন্দের অনুভূতি তো মূকাস্বাদনবৎ। ঠাকুর বলতেন, ঘি কেমন? না ঘি যেমন। আলো যে কী বস্তু—তা জন্মান্ধকে বোঝানো যাবে কোন্ ভাষায়?

জয়ের নিশ্চয়তা সম্পর্কে নিঃসংশয় না হওয়া পর্যন্ত রণাঙ্গনে নামবো না, এমন মনোভাব নিয়ে ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোনো সেনাপতি যুদ্ধজয় করেছে? বিজ্ঞানের রাজ্যেও সমস্ত চমকপ্রদ আবিষ্কারের উপরে সব পাওয়ার জন্য সব হারানোর দুঃসাহসিকতার ছাপ। অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রেও দেখতে পাই ঠাকুর যখন নৈরাশ্যের চরমে পৌঁছে মায়ের খড়্গে আত্মবলি দিতে উদ্যত—তখনই এলো বহু-বাঞ্ছিত দিব্য উপলব্ধি। বিফলতার ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে ইতিহাসের কলম্বাসেরা অজানা সমুদ্রের বক্ষে তরী ভাসিয়ে যদি মূঢ়তার পরিচয় না দিয়ে থাকেন তবে আধ্যাত্মিক অভিযানের দুঃসাহসিকতাই বা মূঢ়তার পরিচায়ক হবে কেন? চতুর জনেরাই বন্দরের চিরপরিচিত একঘেয়ে জীবনকে পিছনে ফেলে যুগে যুগে অজানায় ঝাঁপ দিয়েছে।

মহামায়ার পঞ্চাবতার

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ভূমিকা

শ্রীশ্রীচণ্ডীমুখে দেবী মহামায়া স্বীয় ভবিষ্য-অবতারগণের আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সপ্তসতী মূর্তি-রহস্যে তাঁর ঐ সকল ভাবী অবতারের স্বরূপ মাহাত্ম্য প্রভৃতি এবং তাঁদের আরাধনার ফলশ্রুতি বর্ণিত রয়েছে। লক্ষ্মীতন্ত্র প্রভৃতিতেও এ-বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। যা হোক, মহামায়ার অসংখ্য অবতরণের মধ্যে তিনি চণ্ডীতে মাত্র পাঁচটি দেবী-অবতারের নামোল্লেখ করেছেন। যথা—নন্দা, রক্তদন্তিকা, শাকম্ভরী, ভীমা ও ভ্রামরী। ঐ প্রসঙ্গে তিনি উপসংহারে সুস্পষ্টই ঘোষণা ক'রেছেন যে, যখন-যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাববশতঃ জগতে প্রবল বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হবে, তখন-তখনই তিনি তাদের নিধন ও জগৎপরিপালনের জন্য স্বয়ং আবির্ভূতা হবেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মহামায়া তাঁর ঐ প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন সত্যযুগে। ইতি-মধ্যে দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিতে জগতে তাঁর অবতার নন্দাদেবীর আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু উল্লিখিতগণের অবশিষ্ট তাঁর চারি অবতারের অবতরণ এখনও ঘটেনি। দেবীর উক্ত ঘোষণা অনুসারে তাঁদের আবির্ভাবের কাল এখনও অনাগত। প্রকৃষ্ট কাল সমুপস্থিত হ'লে তাঁরাও ত্রিলোকের কল্যাণে ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণা হবেন। যা হোক, আমরা এখন মহামায়ার উল্লিখিত পঞ্চাবতারের লীলা-মাহাত্ম্য ও প্রসঙ্গানুধ্যানে ধন্য হব।

(১) নন্দাদেবী

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে শুম্ভ-নিশুম্ভাদি মহাসুরগণের নিধনের পর দেবী মহামায়া প্রণত দেবগণকে বলেন—বৈবস্বত মনুর অধিকার-সময়ে সপ্তম মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি সংখ্যক চতুর্যুগে জগতে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অপর দুই মহাসুর উৎপন্ন হবে। সেই সময় তিনি গোকুলে নন্দগোপ-গৃহে যশোদার গর্ভসম্ভূতা হ'য়ে বিন্ধ্যাচলে অবস্থানপূর্বক উক্ত মহাসুরদ্বয়কে বধ করবেন। দেবীর ঐ অবতারে ইনি মহালক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা হবেন।

দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসের কারাগারে হন, সেই সময় মহামায়া গোকুলে নন্দদুহিতারূপে মূর্তি পরিগ্রহ করেন। এই জন্যই ইনি 'নন্দাদেবী' নামে প্রসিদ্ধা হন। অবশ্য, শ্রীমদ্ভাগবতে ইনি 'যোগমায়া' নামে অভিহিতা। যাহোক, শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর মহাত্মা বসুদেব এক দৈবী প্রেরণায় তাঁকে নন্দা-লয়ে শ্রীমতী যশোদার নিকট রেখে আসেন এবং সদ্য-আবির্ভূতা ঐ দেবী-কন্যাকে সেখান হ'তে দেবকীর নিকট আনয়ন করেন।

দুরাত্মা কংস মৃত্যু-ভয়ে দিশেহারা হ'য়ে স্বীয় কারাগারে সদ্যোজাত শ্রীহরিকে হত্যা ক'রতে আসেন। তিনি তখন তথায় দেবকীর ক্রোড়ে ঐ কন্যাকে দেখতে পান। কন্যা হলেও ক্রোধভরে তিনি তাকেই ছিনিয়ে নিয়ে বধ ক'রতে উদ্যত হন। ঐ অভিপ্রায়ে তিনি তাকে সজোরে বধ্যশিলায় নিক্ষেপ ক'রতে গেলে, কন্যা ভূতলে পতিতা না হয়ে, তৎক্ষণাৎ

আকাশমণ্ডলে উত্থিতা হন এবং নিজ মহিমান্বিত অপরূপ রূপ ধারণ করেন। অতঃপর ঐ দেবী দুরাচার কংসকে তাঁর অনিবার্য নিধনসূচক দৈববাণী শোনান। পরিশেষে, তিনি বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী হন এবং শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দুর্ধর্ষ মহাসুরদ্বয়কে বধ ক'রে ত্রিলোক রক্ষা করেন।

নন্দাদেবী অতি-উজ্জ্বল-সুবর্ণ-কান্তিযুক্তা। তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, হেমালঙ্কারভূষিতা এবং স্বর্ণোজ্জ্বল সুমনোহর বস্ত্রাদি পরিহিতা। তাঁর আয়ুধগুলিও স্বর্ণাভ। তিনি সুবর্ণ-কমলাসনা ও চতুর্ভুজা। তাঁর সুঠাম হস্তচতুষ্টয় কনকোজ্জ্বল পদ্ম-অঙ্কুশ-পাশ-শঙ্খ পরিশোভিত। অবশ্য, শ্রীমদ্ভাগবত-মতে যোগমায়া এই নন্দাদেবী অষ্টভুজা এবং অষ্টপ্রহরণধারিণী।

যাহোক, মহামায়ার অবতার এই নন্দাদেবী ইন্দিরা, কমলা, লক্ষ্মী ও শ্রী নামেও প্রসিদ্ধা। এই দেবীকে ভক্তিভরে ধ্যান, পূজা, প্রণাম ও স্তবাদি ক'রলে ত্রিলোক বশীভূত হয়।

(২) রক্তদন্তিকাদেবী

পুনরায় পৃথিবীতে বিপ্রচিত্তিবংশীয় দানবগণের অভ্যুত্থান ঘটবে। সেই সময় মহামায়া অত্যন্ত উগ্রমূর্তি ধারণ ক'রে অবতীর্ণা হবেন এবং ঐ উদ্ধত অসুরদের বিনাশ করবেন। তাদের ভক্ষণ করার সময়, তাদের রক্তে তাঁর তীক্ষ্ণ দন্তরাজি দাড়িম্বকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ হবে। এজন্য স্বর্গলোকে দেবগণ ও মর্ত্যলোকে মানবগণ তাঁর স্তব-স্তুতি করার সময় তাঁকে 'রক্তদন্তিকা' নামে অভিহিতা করবেন।

রক্তদন্তিকা দেবী রক্তবর্ণা, রক্তবসনা ও রক্তালঙ্কারভূষিতা। তাঁর নয়ন, জিহ্বা, নখ, কেশ প্রভৃতি এবং আয়ুধগুলিও রক্তবর্ণ। তিনি চতুর্ভুজা—তাঁর চারি হস্তে খড়্গ, মধুপাত্র, মুসল ও লাঙ্গল পরিশোভিত। ইনি মহাকালীর অংশ-সম্ভূতা এবং রক্তচামুণ্ডা ও যোগেশ্বরী নামেও প্রসিদ্ধা।

এঁর দেহ বসুন্ধরার ন্যায় সুবিশাল এবং সমগ্র জগৎ চরাচর পরিব্যাপ্ত। শরণাগতকে ইনি অত্যন্ত সোহাগ ও স্নেহভরে স্তন-সুধা পান করান। ঐ সুধা পানে ভক্তের সকল অভীষ্ট সুচরিতার্থ হয়। বস্তুতঃ আকৃতি ও প্রকৃতিতে ইনি অতিশয় ভীষণা হ'লেও অনুরাগিগণের প্রতি সর্বদাই অপার কৃপা-পরায়ণা ও অতীব করুণার্দ্রচিত্তা।

ভক্তিভরে এই দেবীর আরাধনা করলে মুমুক্ষু সাধকের সর্বব্যাপিত্বরূপ আত্মানুভূতি লাভ হয়। শরণাগত হ'য়ে যিনি এঁর ধ্যান স্তব পূজাদি করেন, তাঁকে ইনি সযত্নে পরিচর্যা করেন।

(৩) শাকম্ভরী দেবী

বৈবস্বত মন্বন্তরে চত্বারিংশত্তম (৪০তম) চতুর্যুগে শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির ফলে, সমগ্র বসুন্ধরা জলশূন্যা হবে। সেই সময় মুনিগণের আর্তি ও স্তবে মহামায়া অ-যোনি সম্ভবা হয়ে পৃথিবীতে পুনরায় আবির্ভূতা হবেন। তিনি স্তবকারী মুনিগণকে শত শত নয়নে নিরীক্ষণ করবেন। এইজন্য তিনি তাঁদের দ্বারা 'শতাক্ষী'[1] নামে পরিকীর্তিতা হবেন। যতদিন না বৃষ্টি হয়, ততদিন তিনি আত্মদেহজাত শাক-পল্লব-মূলাদি[2] দ্বারা সমগ্র বিশ্ব-চরাচর

*১ শতাক্ষী দেবী অনন্তনয়না। শত শব্দটি এখানে অনন্তবাচক।

*২ শাক দশ প্রকার। যথা—পত্র, মূল, করীর, অগ্র, ফল, কাণ্ড, অধিরূঢ়ক, ত্বক, পুষ্প ও কবক।

পালন করবেন। এইজন্য তিনি 'শাকম্ভরী' নামে বিখ্যাতা হবেন। এই দেবী পৃথিবীতে পার্বতীর অংশে সমুদ্ভূতা হবেন।

দেবীর এই শাকম্ভরী অবতারে পৃথিবীতে 'দুর্গম' নামক এক মহাসুর প্রচণ্ড দৌরাত্ম্য করবে। তিনি ঐ দুর্ধর্ষ দুর্গম অসুরকে বধ করবেন। এ জন্য তিনি 'দুর্গা' নামেও সুপ্রসিদ্ধা হবেন।

শাকম্ভরী দেবী অতি উজ্জ্বল কান্তিযুক্তা, নীলবর্ণা ও নীলোৎপলনয়না। তাঁর কেশ-দন্ত নখ এবং বসন ভূষণ-আয়ুধ সমস্তই নীলবর্ণ। তিনি নীলপদ্মাসনা। তাঁর নাভি-দেশ গভীর, কটিদেশ ক্ষীণ, উদর ত্রিবলীভূষিত। তিনি অষ্টভুজা। তাঁর হস্তসমূহ বাণ, ধনু, পদ্ম, পুষ্প পল্লব, মূল ও ফলাদিযুক্ত এবং শাকশোভিত।

এই দেবী অনন্ত কামা-রসযুক্তা এবং পিপাসা-ও জন্ম জরা-মৃত্যুনাশিনী। ইনি দুর্গা, উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, কালিকা, পার্বতী, বিশোকা দুষ্টদমনী, পাপনাশিনী এবং বিপত্তারিণী নামে অভিহিতা। এই দেবীকে ভক্তিভরে স্তব ধ্যান, প্রণাম পূজা প্রভৃতি করলে অক্ষয় অন্ন-পানরূপ অমৃত ফল এবং পরম ঐশ্বর্য-বিভূতি লাভ হয়।

(৪) ভীমাদেবী

বৈবস্বত মন্বন্তরে পঞ্চাশত্তম (৫০তম) চতুর্যুগে পৃথিবীতে পুনরায় দুর্ধর্ষ রাক্ষসদের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। তখন মুনিগণ ত্রিলোকের কল্যাণের জন্য হিমালয়ে মহামায়ার স্তব-স্তুতি করবেন। সেই সময় তিনি ভীমা অর্থাৎ ভয়ঙ্করা মূর্তি ধারণ করে মুনিগণের রক্ষার জন্য ঐ রাক্ষসদের বধ করবেন। ভীমা মূর্তিতে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে, এজন্য তিনি 'ভীমা দেবী' নামে বিখ্যাতা হবেন।

এই ভীমাদেবী নীলবর্ণা, উজ্জ্বলদশনা ও বিশাললোচনা। তাঁর স্তনদ্বয় অমৃতে পরিপূর্ণ। তিনি চতুর্ভুজা। তাঁর চারিহস্তে খড়্গ, ডমরু, মুণ্ড ও পানপাত্র পরিশোভিত। তিনি একবীরা এবং কালরাত্রি নামেও অভিহিতা। ভক্তিভরে তাঁর স্তব-স্তুতি ধ্যান-পূজাদি ক'রলে, তিনি সর্বাভীষ্টদাত্রী হন।

(৫) ভ্রামরীদেবী

বৈবস্বত মন্বন্তরে ষষ্টিতম (৬০তম) চতুর্যুগে দুর্দান্ত 'অরুণাসুর' ত্রিভুবনে মহাবিঘ্ন সৃষ্টি করবে। সেই সময় মহামায়া অসংখ্য ভ্রমরবিশিষ্ট রূপ ধারণ ক'রে ত্রিভুবনের মঙ্গল-হেতু ঐ মহাসুরকে বধ ক'রবেন। তাঁর ভ্রমর-সদৃশ মূর্তি দর্শন করে তখন সকলে তাঁকে 'ভ্রামরী দেবী' নামে স্তব-বন্দনা ক'রবেন।

ভ্রামরীদেবী মহাকালীর অংশে আবির্ভূতা হবেন। ইনি বিচিত্রবর্ণা, তেজোমণ্ডলদীপ্তা, নানা বর্ণানুলেপনে অনুলিপ্তা এবং মনোহর অলঙ্কারাদিতে বিভূষিতা। তিনি তাঁর হস্ত-সমূহে নানা বর্ণের ও নানা আকৃতির ভ্রমরপুঞ্জ ধারণ করেন। তিনি আকৃতি ও প্রকৃতিতে অত্যন্ত ভীষণা হ'য়েও, ভক্তগণের নিকট সর্বদাই অশেষ করুণাপরায়ণা ও বরদাত্রী। তিনি মহামারী নামেও অভিহিতা। এই দেবীর আরাধনায় মানবের জন্ম-মৃত্যু-বন্ধন-ভয় বিনষ্ট হয়। ইনি সর্বকামফলপ্রদা।

'সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে
বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যন্তঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা
ভুবম্ ॥'

কৌমারভৃত্য জীবক

স্বামী সুব্রানন্দ

নিশাবসান! বিহগকুল কূজনরত, বিটপী-শাখা কিন্তু এখনও ত্যাগ করেনি। নগরের লোকজনও কেহ পথে নামেনি। রাজকুমার অভয় প্রাতভ্রমণে বেরিয়ে ক্রন্দন শুনে পথিপার্শ্বে একটি পরিত্যক্ত শিশুকে দেখতে পেলেন এবং করুণার্দ্রহৃদয়ে তাকে নিয়ে গেলেন স্বীয় প্রাসাদে এবং শিশুটিকে অপত্য-স্নেহে লালন-পালন করলেন। আজকাল নয়—সে আড়াই হাজার বছরের উপর। কোন নগণ্য গ্রামে নয়—তৎকালীন সাধনা-সংস্কৃতি ও বৈভবের কেন্দ্রস্থল বিশাল মগধের রাজধানী রাজগৃহে।

তখন মগধাধিপতি বিখ্যাত বৌদ্ধধর্মানুগামী রাজা বিম্বিসার। রাজকুমার অভয় শিশুটির নামকরণ করলেন কৌমারভৃত্য জীবক। রাজবাড়ীতে শুক্লপক্ষের চন্দ্রমাসাদৃশ রূপে-গুণে বেড়ে উঠল।

একদিন ধী-শক্তিসম্পন্ন কৌমারভৃত্য জীবক রাজকুমার অভয়কে সলজ্জ ও বিনত ভাবে পিতা-মাতার পরিচয় জিজ্ঞেস করল। অভয়ও সঙ্কোচের সহিত উত্তর দিলেন—'এবিষয়ে আমি কিছুই জ্ঞাত নই; তবে জন্মাবধি তোমাকে আমিই প্রতিপালন করছি, তুমি আমাকেই পিতা বলে সম্বোধন ক'রো।' এই উত্তরের প্রত্যাশা করেনি জীবক। সে অত্যন্ত মর্মাহত হ'ল। সত্যকাম পিতৃ-পরিচয় দিতে না পারলেও মাতৃ-পরিচয় দিয়েছিল—এ অবলম্বন তার ছিল; কিন্তু জীবকের তাও নেই। সে ভগ্নমনোরথ হয়ে দিন দিন অশান্তির অনলে দগ্ধ হ'তে লাগল। রাজগৃহ যেন অগ্নিগৃহ মনে হ'ল। অবশেষে আকাশ পাতাল চিন্তা করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল যে, এখানে থাকলে তার অন্তরের প্রসুপ্ত শক্তি বিকশিত হবে না। কোন একটি বিষয়ে অভিজ্ঞ নিপুণ বিদ্বান না হতে পারলে এ জগতে স্থান নেই। তাই একদিন রাজকুমারের অজ্ঞাতসারে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে পড়ল নিরুদ্দেশের পথে।

সে কালেও নালন্দায় বিদ্বৎসমাবেশ হয়নি। তবে তক্ষশীলার নামডাক ছিল। সেখানে পীযূষপাণি নামে এক সর্বজনবিদিত বৈদ্য বাস করতেন। সত্যি তাঁর হাতে যেন ঔষধ নয়—থাকত অমৃত! যে রোগীকে ধরতেন সে-ই আরোগ্যলাভ করত। প্রতিটি দেশে পীযূষপাণির নাম ছিল লোকের মুখে মুখে। তাই জীবকও শুনেছিল। বহু আয়াসে সে সুদূর তক্ষশীলায় সেই যশস্বী বৈদ্যের পদপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হল। বৈদ্যজীও দেখলেন যে ছাত্রটি কেবল রূপে নয়, গুণে-জ্ঞানেও অতি উত্তম। সানন্দে তিনি তাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন। যেমনি গুরু তেমনি চেলা। পীযূষপাণি সর্বদা সঙ্গে রেখে ছাত্রকে নিজহাতে গড়ে তুললেন সর্ব বিষয়ে। জীবকও অভিপ্রেত কাজ পেয়ে ছায়ার ন্যায় সাথে সাথে থেকে বহুকাল গুরুসেবা করল এবং স্বীয় চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ত্ত করল।

বর্তমান জগতে এলোপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্র অত্যধিক উন্নতি লাভ করছে—বিশেষতঃ শল্য-বিষয়ে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ঐ শস্ত্রশাস্ত্রের এক একটি বিষয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করছে।

মাথার খুলি উন্মোচন করে ব্রেন-অপারেশন, লাঙ্‌স্‌ কেটে বাদ দেওয়া—আজকাল এসব হামেশা হচ্ছে; এমন কি হার্টের অপসারণ এবং সংস্থাপনও হচ্ছে।

যাক, আধুনিক বৈজ্ঞানিকের নিকট এসব কিছুই আর বিস্ময়ের বিষয় নয়; কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ৫৬৩—৪৮৩ অব্দেও বহুবিধ অস্ত্রোপচার এদেশে করা হত। এ-সম্বন্ধে বৌদ্ধযুগের দু'একটি ঘটনার এখানে অবতারণা করছি। এতে দেখতে পাব সে যুগেও আয়ুর্বেদীয় মতে শল্য-চিকিৎসাশাস্ত্র (সুশ্রুত-সংহিতা) ছিল কত উন্নত ধরণের। তবে লোপ পেল কি করে? অনেকের অনুমান—যখন বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মে পরিণত হয়, আসমুদ্র-হিমাচল এক 'অহিংসা পরম ধর্মে' দীক্ষিত হয়, রক্তপাত নিষিদ্ধ হয়, তখনই শস্ত্রপ্রয়োগ অবৈধ বলে আইন জারি হয়। কারণ ইতিহাস বলে, ভগবান বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায়ও শল্যচিকিৎসা প্রচলিত ছিল (বৌদ্ধ শাস্ত্র)।

এবার পূর্বকথায় ফিরে আসি। কৌমার-ভৃত্য জীবক যখন বুঝতে পারলেন যে, আয়ুর্বেদীয় অষ্টাঙ্গশাস্ত্র অধিগত হয়েছে, তখন একদিন গুরুর নিকট স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। পীযূষপাণি বললেন—হাঁ, অবশ্যই যাবে। তবে যাবার পূর্বে আর একটি পরীক্ষা তোমায় দিতে হবে। সেটিতে উত্তীর্ণ হ'লেই দেশে ফিরে যাবে। পরীক্ষার প্রশ্ন হ'ল—যাও, এমন একটি ওষধি অর্থাৎ বনস্পতি নিয়ে এসো, যা মানুষের কোন উপকারে আসে না। আদেশ পেয়ে জীবক সোৎসাহে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু বিফল-মনোরথ হ'লেন। দেশ-দেশান্তর অন্বেষণ করেও এমন একটি গাছ-গাছড়া পেলেন না, যা মানবসমাজের মঙ্গলজনক নয়। ফিরে এসে গুরুর নিকট অকৃতকার্যতার কথা নিবেদন করলেন। বৈদ্যজী স্মিতবদনে বললেন—হ্যাঁ, এতেই তুমি পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেছ। অতঃপর প্রচুর পাথেয় দিয়ে এবং অফুরন্ত আশীর্বাদ জানিয়ে প্রিয় ছাত্রকে বিদায় দিলেন।

জীবক তক্ষশীলা থেকে রওনা হয়ে, বেশ কিছুদিন পর অযোধ্যায় এসে উপস্থিত হলেন। সে সময় অযোধ্যায় এক বিত্তবান ব্যবসায়ীর সহধর্মিণী কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী রোগাক্রান্ত ছিলেন। দীর্ঘ ৭ বছর অজস্র টাকা ব্যয় করেও রোগমুক্ত হ'তে পারেননি—অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে থেকেও। কৌমারভৃত্য রোগিণীকে দেখামাত্রই বুঝতে পারলেন যে, এ রোগ স্বল্পারোগ্য। কিন্তু বৈদ্যের বয়স অতি স্বল্প বিধায় কর্তা-গিন্নী উভয়েই তাঁর উপর আস্থা স্থাপন করতে পারছেন না চিকিৎসা করাতে নারাজ। কত অভিজ্ঞ কবিরাজ বিফল হয়ে গেলেন! আর ও কি করবে? ছেলে মানুষ! কিন্তু জীবক এত সহজে পিছপা হ'বার পাত্র নন। তিনি বললেন—আমি চিকিৎসার মূল্য চাইনে; আরোগ্যলাভ করলে আপনাদের ইচ্ছা হয় কিছু দেবেন, না হয় না দেবেন। তখন ধনাধিপতি রাজী হলেন। জীবক ঘৃতদ্বারা প্রস্তুত ঔষধ বিশেষ প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করে, দু'চার দিনের মধ্যেই রোগিণীকে সুস্থ করে তুললেন। চারদিকে ধন্য ধন্য রব! এই প্রথম জয়যাত্রা কৌমারভৃত্য জীবকের জীবনে। এই সাফল্যে তাঁর আত্ম-বিশ্বাস—নিজের প্রতি শ্রদ্ধা বিশেষভাবে বর্ধিত হ'ল। ১৬ হাজার মোহর, ২টি দাস-দাসী ও ১টি রথ উপহার নিয়ে তিনি আসলেন রাজগৃহে। এসে রাজকুমার অভয়ের সমীপে

দান-সামগ্রী রেখে বিগত দিবসের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। রাজকুমার সমস্ত উপহার ফিরিয়ে দিয়ে সানন্দে বললেন—হে সৌম্য, তুমি অতীত ভুলে যাও ; এখন নবজীবন লাভ করেছ। আমি আশীর্বাদ করছি—আজকের সুনির্মল বালরবির ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠুক তোমার ভবিষ্যৎ জীবন, আর সেই স্নিগ্ধ আলোকে সঞ্জীবিত হয়ে উঠুক প্রাণিজগৎ। নব যাত্রাপথের পাথেয়স্বরূপ এ সব দ্রব্য-সামগ্রী তোমার প্রয়োজন—তোমারই কাছে থাক।

কৌমারভৃত্য জীবক রাজগৃহের উপকণ্ঠে গৃধ্রকূট পর্বতের পাদদেশে নূতন বাড়ী ও বাগান তৈরি করে মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। বাগানটির নামকরণ আম্রকানন হ'ল বটে, কিন্তু ওষধীর চাষই হ'ত বেশী। দিন যায়—একবার রাজা বিম্বিসারের হয় ভগন্দর রোগ। রোগ অত্যন্ত ভয়ানক আকার ধারণ করল। কোন চিকিৎসকই রোগের প্রকোপ নিবারণ করতে পারলেন না। অবশেষে রাজা এই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন। কুমার অভয় বৈদ্য জীবককে এনে মহারাজার চিকিৎসায় নিয়োগ করলেন। জীবকের যোগ্য চিকিৎসাপদ্ধতিতে তিনি শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করলেন। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে রাজবৈদ্যের পদে নিযুক্ত করলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, রাজগৃহ তখন মগধের রাজধানী, দেশ-বিদেশের ধনবানদের আবাস-ভূমি। এক শেঠজী মারাত্মক মস্তিষ্করোগে আক্রান্ত হলেন। খরচান্ত করে কোন চিকিৎসক রোগাপনয়ন করতে তো পারলেনই না, উপরন্তু একজন বললেন রোগী ৭ দিনের মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করবেন, অন্যজন বললেন ৫ দিনের মধ্যেই তিনি পরলোক গমন করবেন। যাক, শেঠজীর শুভানুধ্যায়ী সকলে পরামর্শ করে রাজানুগ্রহে বৈদ্য জীবকের দ্বারা চিকিৎসা করাতে সমর্থ হলেন। রোগী অঙ্গীকার করলেন—যদি এযাত্রা বেঁচে উঠি তাহলে, আমার প্রাসাদ সমেত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সমস্ত আপনার এবং আমি নিজেও আজীবন আপনার দাস হবে থাকব। বৈদ্য বললেন যে, আপনাকে ৭ মাস ধরে ক্রমান্বয়ে ডানপাশে, বাঁপাশে এবং চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। রোগী রাজী। যথাবিধি ব্যবস্থাদি করে জীবক শস্ত্রোপচার করলেন। মাথার খুলি উন্মোচন করে রোগের কারণ অপসারণ করে খুলি যথাস্থানে বসিয়ে সেলাই ও ঔষধ-পত্র প্রয়োগ করলেন। ৭ দিন একপাশে শায়িত থাকার পর রোগী বললেন, আর তো এভাবে পারছিনে, অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। জীবক বললেন—তথাস্তু ; এবার অন্য পাশে শুইয়ে দিই! এবারও ৭দিন পর অক্ষমতা প্রকাশ করায় চিৎভাবে রাখা হ'ল।

এভাবেও ৭দিন পর তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তখন তাকে মুক্ত করে দেয়া হ'ল—সম্পূর্ণ সুস্থ। বৈদ্য যুবক বিবৃতি দিলেন 'অন্য চিকিৎসকদ্বয় যে যথাক্রমে ৭ দিন ও ৫ দিন পরে মৃত্যু হবে বলেছিলেন, তা মিথ্যা নয়। আর আমি জানতাম আপনাকে নীরোগ করতে ২১ দিনের বেশী সময় লাগতে পারে না ; তবুও ৭ মাস এক এক ভাবে শুয়ে থাকতে বলেছিলাম, কারণ আমি নিজেই যদি ৭ দিন করে এক এক ভাবে থাকতে বলতাম, তাহলে আপনি ১২ দিন

থেকেই অস্থিরতা—অক্ষমতা প্রকাশ করতেন। ৭ দিন করে ধৈর্য ধরে এক পাশে পড়ে থাকতে পারতেন না। ৭ মাস করে বলাতেই তা সম্ভব হয়েছে। যাক, এখন কাজের কথা হ'ল—আমি আপনার যাবতীয় সম্পত্তি চাইনে, আপনাকে সেবকরূপেও নিতে পারিনে; তার বিনিময়ে যদি দিতে চান, তাহলে আমাকে একলক্ষ এবং মান্যবর মহারাজাকে এক লক্ষ মুদ্রা দিলেই যথেষ্ট হবে।' শেঠজী কৃতজ্ঞতার সহিত এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। এভাবে জীবকের হাতযশের সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। স্বদেশের তো কোন কথাই নেই, বিদেশ থেকেও ডাক আসতে লাগল।

কাশীর এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধনীর ছেলে অন্ত্রের রোগে ভুগছে। খেলা-ধূলা করতে নাড়ী-ভুঁড়ির মধ্যে কিভাবে গিঁট্ লেগে গিয়েছে। অখ্যাত-বিখ্যাত কোন চিকিৎসকই প্রকৃত রোগ ধরতে পারলেন না। অবশেষে সুদূর মগধের রাজবৈদ্য জীবকের ডাক পড়ল। জীবক দেখামাত্র রোগ নির্ণয় করলেন এবং উদর অপারেশন করলেন। নাড়ী-ভুঁড়ি বের করে কেটে আবার জোড়া লাগালেন ক্রমে। সে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠল। বৈদ্য জীবকের জীবনকাহিনীতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার আরো অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনার সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধ-বিস্তৃতির ভয়ে সে সব আর এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

একথা সত্যি বর্তমান যুগে এসব চিকিৎসা-পদ্ধতিতে চমৎকৃত হবার কিছু নেই, কিন্তু আড়াই হাজার বছর পূর্বেও যে এ-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা কি আমাদের কল্পনাতীত নয়! আর হয়েছিল এই বেদগর্ভা ভারতের মাটিতে।

কৌমারভৃত্য জীবক বিম্বিসারের দেহ-ত্যাগের পর রাজা অজাতশত্রুরও গৃহচিকিৎসক ছিলেন। এমনকি ভগবান বুদ্ধদেবেরও চিকিৎসা তিনি করেছেন। আর শুধু কি চিকিৎসা? বুদ্ধদেবের একজন প্রধান অনুচরের স্থানও তিনি দখল করেন। তিনি তাঁর সাজানো আম্রকাননটি বুদ্ধদেবকে অর্পণ করেন। সেখানে তথাগত বহুশিষ্য পরিবৃত হয়ে সাধন-ভজন ও উপদেশাদি প্রদান করেন। গৃধ্রকূট পর্বতের পাদদেশে এখনও সেই ঐতিহাসিক আম্রকাননের (চিকিৎসালয়ের) ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। পুরাতত্ত্ব বিভাগের খননকার্যে প্রাচীন ঔষধ-পত্র, শিশি-বোতল ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। স্থানটি সুরক্ষিত। কৌমারভৃত্য আম্রবনে যে বিভিন্ন প্রকার ভেষজ-গাছ-গাছড়ার চাষ করতেন, আজ কালও নাকি সেই দুষ্প্রাপ্য আয়ুর্বেদীয় জড়ী-বুটীর গাছ সে অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায় এবং কবিরাজগণ তা সংগ্রহ করে থাকেন।

ধর্মের গ্লানি

শিবদাস

১

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ধর্ম গ্লানিগ্রস্ত হলেই ভগবান মানুষ হয়ে আসেন ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করতে।

যেমন রামচন্দ্র এসেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন, বুদ্ধদেব শঙ্করাচার্য চৈতন্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন এলেন তখন শুধু ভারতে নয়, সারা জগতেই ধর্মের গ্লানি হয়েছিল।

ধর্মের গ্লানি জিনিসটা কি রকম?

সে অনেক রকম; তার একটা হল, ধর্মের আসল উদ্দেশ্যটাই ভুলে যাওয়া।

আসল উদ্দেশ্য আবার কি?

তাহলে আগে একটা গল্প বলতে হয়।

চারজন গুলিখোর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। গুলি খেলে নাকি, শোনা যায়, মনে যে চিন্তাটা ওঠে সেটা সহজে মন থেকে আর নড়তে চায় না। আর গুলিখোরদের প্রকৃতি একটু মৌন ধরণের হয়, অর্থাৎ স্তিমিত ভাব—যেন ধ্যান থেকে সদ্য উঠে এসেছে, ধ্যানের শান্ত সমাহিত ভাবের রেশ তখনও লেগে রয়েছে!

লোক চারজন যাচ্ছিল কলকাতার কোন অঞ্চলের একটা সরু গলি দিয়ে। যদিও সবে সন্ধ্যা হয়েছে, তবু গলিটা অনেকটা 'পথিকহীন পথের' মতোই হয়ে এসেছিল।

এমন সময় একজন সাধু তাদের পাশ দিয়ে চলে গেলেন।

সাধুটিকে দেখে প্রথম গুলিখোরের মনে একটা ভাবের উদয় হল। জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সে সঙ্গীদের বললে, দাদা, সাধুরা কেমন আনন্দে জীবনটা কাটিয়ে দেয়। সব সময় ভগবানের চিন্তা নিয়ে থাকে। কী সুন্দর, সার্থক জীবন! আর আমরা কি করছি?—সারা জীবন গুলি খেয়েই কাটিয়ে দিলাম! যে জন্য ভবে আসা, তার কিছুই করা হল না। ভগবানলাভ হল না। জীবনটা বৃথাই গেল।' বলে, আবার খুব জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লে।

তার কথা শুনে, তার দেখাদেখি বাকী তিনজনও পাঁচ মিনিট ধরে 'জীবনটা বৃথাই গেল' বলে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে চললো।

শেষে চতুর্থ লোকটি বললে, 'তা এভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হা হুতাশ করে তো আর কোন ফল হবে না। সত্যি যদি ভগবানলাভ করতে চাও তোমরা, আমি পথের সন্ধান দিতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ধ্যান করলেই ভগবানকে পাওয়া যাবে। তিনি নিজেও ছোটবেলা থেকে ধ্যান করে করে ভগবানলাভ করেছিলেন।'

সবাই ফিরে চাইলে তার মুখের দিকে। দ্বিতীয় লোকটি বললে 'তাহলে দাদা, আর দেরী করে লাভ নেই এখনি আমরা ধ্যান শুরু করি। কারণ শাস্ত্রে নাকি আছে, জীবন পদ্মপত্রে নীরের মতো এই আছে এই নেই, কাজেই কোন শুভ কাজ করার ইচ্ছা মনে জাগলে তক্ষুনি ত'তে লেগে পড়তে হয়।'

কথাটা মনঃপূত হল সবারই। কিন্তু মুস্কিল হল, ধ্যান কি করে করতে হয়, ত'

তো কেউ জানে না! চতুর্থ গুলিখোরটির ধর্মকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান দলের আর সবার চেয়ে একটু বেশী ছিল। সে বললে, 'আমি ধ্যান করতে দেখেছি অনেককে—আমিই শিখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের।'

তার নির্দেশমতো চারজনই সেখানে রাস্তার ওপর বসে পড়ল। বুদ্ধদেবের বসা ধ্যানমূর্তি যেমন দেখা যায়, সেভাবে চতুর্থ লোকটি সবাইকে বসিয়ে দিয়ে নিজেও সেভাবে বসে বললে, 'এইভাবে স্থির হয়ে বসে থাকতে হবে—একটুও নড়লে চলবে না। কথা বলতে পারবে না। আর, চোখ একেবারে বুজে থাকতে হবে, মিটমিট করেও চাওয়া চলবে না। তাহলেই ধ্যান হবে, ভগবানলাভ হবে।'

এ আর এমন কি কঠিন কাজ তাদের কাছে—এমনিতেই তো ঝিমিয়ে আছে, চোখ চাইছে তো পথচলার সময়ও মাঝে মাঝে! গুলিখোর চারজন পথের দুপাশ জুড়ে একটু ফাঁকা ফাঁকা হয়ে বুঁদ হয়ে বসে রইল চোখ বুজে। নড়ন-চড়ন নেই।

মিনিট কয়েক পরে একখানা গাড়ী ঢুকলো সে গলিতে। গলিটা খুবই সঙ্কীর্ণ, ওরা না উঠলে গাড়ী যেতে পারে না। ড্রাইভার হর্ন দিল। পরপর কয়েকবার। কিন্তু ওরা তো উঠতে পারে না—ধ্যান করছে যে! অনেকক্ষণ হর্ন দেবার পর বিষম বিরক্ত হয়ে ড্রাইভারটি নেমে এসে একজনকে একটু ধাক্কা দিয়েই বললে, 'কি হচ্ছে? শুনতে পাচ্ছেন না হর্ন দিচ্ছি! উঠে সরে যেতে পারছেন না? পথ কি ঘুমোবার জায়গা নাকি? গাড়ী যাবে কি করে?'

গুলিখোরটি চোখ বুজেই বললে, 'শুনতে আবার পাব না কেন? কিন্তু আমরা ধ্যান করছি যে, এখন ওঠা, চোখ খোলা, কথা বলা সবই নিষেধ। আপনি বরং ঘুরে অন্য রাস্তা যান'

তাকে কথা বলতে শুনে দ্বিতীয় গুলিখোরটি বলে উঠল, অবশ্য না নড়ে এবং চোখ বুজেই, 'দাদা, তুমি ড্রাইভারটিকে নির্দেশ দিতে গিয়ে কথা বলে ফেললে যে।'

শুনে তৃতীয় গুলিখোরটি বললে, 'আর ওকে উপদেশ দিতে গিয়ে তুমিও তো কথা বলে ফেললে!'

চতুর্থ গুলিখোরটি এদের কথা শুনে ততক্ষণে সাবধান হয়ে গেছে। সে বলে উঠলো, 'ভগবানের কৃপায় আমিই শুধু কো[ন] কথা বলিনি!'

আমাদের মন সাধারণতঃ বাইরের বিষয়েই ছড়িয়ে থাকে সর্বক্ষণ; সেই ছড়ানো মনকে গুটিয়ে এনে ভগবানের পাদপদ্মে ব[া] আত্মচিন্তায় একাগ্র করাই হল ধ্যানের আসল উদ্দেশ্য। গীতায় এই স্থির একাগ্র মনের উপমা দিয়েছে—'যথা দীপো নিবাতস্থঃ'—বায়ুপ্রবাহহীন স্থানে দীপশিখার মতো নিষ্কম্প ধ্যান করার মানে মনকে এরূপ স্থির করার চেষ্টা করা। এ চেষ্টায় যারা একটু অগ্রসর হয়েছে, কবির ভাষায় তারা বলতে পারে। 'উদয় শিখরে সূর্যের মতো সমস্ত প্রাণ মম চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত একটি নয়ন সম।'—আমার প্রাণ স্থির হয়েছে। প্রাণ স্থির হলেই মনও স্থির হয়, আবার মন স্থির হলে প্রাণও। ধ্যানের আসল উদ্দেশ্য হল মন প্রাণ সবকিছুকে গলিয়ে মিলিয়ে দিতে হবে শ্রীভগবানে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দুচারটে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করতেন কদাচিৎ। তার ভেতর একটা হল 'ডাইলিউট'; তিনি বলেছেন,

তাঁতে ডাইলিউট হয়ে যেতে হবে।

এই হল ধ্যানের আসল উদ্দেশ্য শুধু ধ্যানের নয়, সব ধর্মের সবরকম ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানেরই—জপ, পূজা, পাঠ, কীর্তন, যোগ, মন্দিরে মসজিদে গির্জায় প্রার্থনা প্রভৃতি সবকিছুরই আসল উদ্দেশ্য হল আমাদের ছড়ানো মনকে ভগবানের পাদপদ্মে বা আত্মচিন্তায় স্থির করানো। জপধ্যানপূজাদির প্রক্রিয়া এর সহায়ক মাত্র। এসব ধর্মের গৌণ বিষয়।

ধ্যান করার জন্য যে স্থির হয়ে বসে, মৌন থাকে, চোখ বুজে থাকে,—তার কারণ এসব মনকে স্থির করার সহায়ক। কিন্তু এগুলো তো ধ্যানের গৌণ অঙ্গ—এসব করাই তো আর ধ্যানের আসল উদ্দেশ্য নয়। এসব কিছু না করেও যদি মন স্থির হয়, তাহলেও ধ্যান হবে। দাঁড়িয়ে বা শুয়েও হতে পারে ; চোখ চেয়েও হতে পারে।

কিন্তু গুলিখোর চারজন যেমন ধ্যানের এই গৌণ অঙ্গকেই, বাহ্যানুষ্ঠানগুলিকেই ধ্যান বলে ভেবেছিল—যার জন্য এসব করা, যা না হলে ধ্যানই হল না, সেই মন স্থির করার কথা ভাবেইনি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন অবতীর্ণ হলেন সে সময় তেমনি সর্বত্র মানুষ ধর্মাচরণ বলতে ঠিক সেই জিনিসই করছিল—যেজন্য অনুষ্ঠান তা ভুলে গিয়ে অনুষ্ঠানকেই ধর্মের সর্বস্ব বলে ভাবছিল। আসনে বসে এতক্ষণ এত সংখ্যা জপ করতে পারলেই হল—তাহলেই ধর্ম হবে, মন সে সময় যা খুশি চিন্তা করুক না! এমন কি অপরের সর্বনাশের চিন্তা করলেও কিছু যাবে আসবে না তাতে। পূজো করতে বসে এতবার প্রদীপ ঘোরালাম, এতবার ঘণ্টা বাজালাম, এতবার মন্ত্র উচ্চারণ করে নৈবেদ্যাদি নিবেদন করলাম বিধিমতো—তাহলেই ধর্ম হবে, এসব ক্রিয়ার মাধ্যমে মন সে সময় উপাস্য দেবতার চিন্তায় একাগ্র করার চেষ্টা করি আর না করি! আর সর্বোপরি সকাল-সন্ধ্যায় হয়তো ঠিকমতো ধর্মাচরণের চেষ্টা করলাম—বাকী সময়টা মনকে ছেড়ে দিলাম অবাধে বিষয়ে বিচরণ করতে ; ন্যায়-অন্যায় সব উপায়ে ভোগ আহরণ করে চললাম, স্বার্থপরতাকে বাড়িয়েই চললাম, মনের রাশটানার কোন চেষ্টাই করলাম না। এতে যে ধর্মের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না, সে কথা ভুলেও ভাবলাম না।

এরই নাম ধর্মের গ্লানি--ধর্মের আসল উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া। এর ওপর আবার সজ্ঞানে ধর্মকে স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগালে তো কথাই নেই—গ্লানি চরমে উঠল তখন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে বললেন—নিজে করে দেখিয়ে দিলেন—ধর্মের মূল কথা হল মনকে ভগবানে একাগ্র করা, অনুষ্ঠান তার সহায়ক মাত্র। মন যখন স্বতই ভগবানের দিকে যাচ্ছে, তাঁর পাদপদ্মেই সংলগ্ন হয়ে থাকছে, ওসব অনুষ্ঠান-বিধানাদির কোন প্রয়োজনই আর থাকে না তখন। তাঁর নিজের যেমন মাকালীর দর্শনলাভের পর পূজোর সময় মন্ত্র-তন্ত্র বিধি-নিষেধ সব গোলমাল হয়ে যেতো ; লোকে দেখে মনে করতো পূজো তো নয়, যথেচ্ছাচার হচ্ছে। অথচ সে পূজোর মতো পূজো ক'জন করতে পারে? যে উদ্দেশ্যে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করে মন্ত্র পড়ে নৈবেদ্যাদি নিবেদন করা, সেসব করার আগেই তাই হচ্ছে তখন—পূজো করতে বসলেই মন মা ছাড়া আর কিছু ভাবছেই না, মন্ত্রপাঠের আগেই মা দেখা দিয়ে নিজেই নৈবেদ্য খেতে যাচ্ছেন, পূজক তাই দেখে বলছেন, 'রসো, আগে মন্ত্রটা

পড়ে নি !'—কি মূল্য তখন মন্ত্রের, বিধির ?

কতভাবে, গল্পচ্ছলে কথাটি বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। একজন সাধু এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে, পঞ্চবটীতলায় থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ওদিক দিয়ে যাওয়া-আসার পথে দেখেন, সাধুটি খুব মন দিয়ে শাস্ত্রপাঠ করেন। একদিন কৌতূহল হল, দেখি কি পড়েন এত মন দিয়ে! গিয়ে দেখেন খুব মোটা পুঁথি একখানি। কিন্তু তার পাতায় পাতায় শুধু লেখা 'ওঁ রাম',—এছাড়া আর কিছুই নেই! উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব, দর্শন-শাস্ত্রের বড় বড় কথা, পাতার পর পাতা জোড়া ব্যাখ্যা—কিছুই না। অথচ কেবল এই 'ওঁ রাম' পড়েই শাস্ত্রপাঠের চরম ফল পেয়েছেন সাধুটি পড়তে বসলেই তাঁর সব মন চলে যায় রামের চরণে, চোখ জলে ভেসে যায়।

আর একজনের কথা। তিনি গীতা পাঠ করতেন। তেমন ভাল জ্ঞান নেই সংস্কৃতের, উচ্চারণ সব ঠিক মতো হতো না, ভুল হত। পূর্বের গুলিখোরদের মতো মনোভাবাপন্ন ধর্মজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা তো আঁতকে উঠবেন—গীতাপাঠই তো হল না তাহলে! মানে বোঝে না, অশুদ্ধ উচ্চারণ—এ আবার কি রকম শাস্ত্রপাঠ! কিন্তু ঐ ব্যক্তির মতো গীতাপাঠের ফল ক'জন পান বিধিসম্মতভাবে, আনুষ্ঠানিকভাবে, শুদ্ধ উচ্চারণ ও অর্থবোধসহ (হয়তো সে অর্থবোধ পাঁচ-সাত-দশটা বিভিন্ন ভাষ্য ও দুরূহ ব্যাখ্যা-সাগর-সঞ্জাত) পাঠ করেও ? ঐ ব্যক্তি গীতা নিয়ে বসলেই সাক্ষাৎ দেখতে পেতেন অর্জ্জুন রথে বসে আছেন, আর সারথির আসনে বসে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ দিচ্ছেন।

জয়রামবাটীর ভানুপিসী শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর তাঁর ফটো পূজো করতেন নিত্যই। একদিন কি একটা কাজে বাইরে কোথায় যাবেন, একজনকে বললেন, 'তুমি আজ ঠাকুরের পূজো কোরো।' তিনি বললেন, 'আমি পূজা করতে জানি না যে!' ভানুপিসী বললেন, 'ও খুব সোজা, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।—দুটি তুলসীপাতা তুলে "তুলসীপত্রং রামকৃষ্ণায় নমঃ" বলে ঠাকুরের পাদপদ্মে দেবে।' এ কি আবার পূজো হল নাকি? ভানুপিসী কিন্তু জানতেন, মনেপ্রাণে জানতেন, পূজো ওতেই হবে, কারণ ভগবানকে অতি আপনজন বলে বোধ এসে গিয়েছিল তাঁর বহু পূর্বেই, শ্রীরামকৃষ্ণ স্থূলদেহে থাকার সময় হতেই।

সারা মন যখন ভগবান্‌কে চায়, তাঁতে একাগ্র হয়, অতি আপনার বলে মনে করে তাঁকে, তাঁকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়, তখনই তাঁকে পাওয়া যায়। এভাব আনাই ধর্মকর্মের আসল উদ্দেশ্য। এভাব আনাই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ভগবান অনুষ্ঠান দেখেন না, মন দেখেন, মনের টানেই আসেন—এ টান কিভাবে এল, এ টান আসার পদ্ধতি ঠিক ঠিক হল কি না, সেদিকে তাকানই না।

ভগবান মানুষ হয়ে এসে ধর্মের এই মুখ্য অঙ্গ সম্বন্ধে, ধর্মের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের সজাগ করে দিয়ে যান। এরই নাম ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করা। কালক্রমে আমরা আবার গুলিখোরদের মতো হয়ে যাই, তখন আবার আসেন তিনি ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করতে।

নদী পার হতে হবে অপর কূল পাবার জন্য। তার জন্য নৌকো চাই নিশ্চয়ই। এই ভবনদী পার হয়ে ভগবানের কাছে যেতে হলেও তেমনি জপ-ধ্যান হোক, পূজো-কীর্তন হোক—যোগ হোক, কর্ম হোক বা শুধু ব্যাকুলতা হোক,—যাই হোক না কেন নৌকো একটা চাই। কিন্তু কথা হল, মনটা যেন থাকে কূলে

পৌঁছানোর দিকে, শুধু নৌকোর দিকে নয়। কূল পাওয়ার কথা ভুলে নৌকোর সৌষ্ঠব বাড়াবার দিকে, নৌকো নিয়ে গর্ব করার দিকে—নৌকোর দিকেই পুরো নজরটা দেওয়াই ধর্মের একটা গ্লানি। অবতারগণ এসে এ গ্লানি মোচন করে ধর্মাচরণকারীদের মনেপ্রাণে বলতে শিখিয়ে যান, 'যদি কূল পাই, তরণী-গরব রাখিতে না চাহি কিছু!'

শুভঙ্করি, বাজাও শঙ্খ

শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

আজিও শরতে হেরি শুভ্রতা যে দিকে ফিরাই দৃষ্টি—
আকাশে বাতাসে অবনী-অঙ্কে সুখ-সুন্দর সৃষ্টি।
　　শুভ্রা শেফালী পড়ে ঝ'রে ঝ'রে
　　শ্বেত কাশ হাসে বনানীর ক্রোড়ে
তৃণেতে তুহিন হেরি ভোরে ভোরে বুঝিবা রজত-বৃষ্টি।

মোহিনী প্রকৃতি হর্ষে-দোদুল না জানি কি পূজানন্দে—
ভবানী-চরণ-পরশে ভুবন ভ'রেছে কুসুম-গন্ধে;
　　নীল নভতলে বলাকার মালা
　　লক্ষ তারার হেমদীপ জ্বালা:
পঙ্কজ-রেণু ছড়ায় পবন আকাশে বিমলানন্দে।

বিহগ গাহিছে বন্দনাগান, শঙ্খ বাজায় সিন্ধু,
দ্যুলোক-ভূলোক আলোকি তুলিছে সুচারু শারদ-ইন্দু;
　　জনমনে তবু কই আনন্দ?
　　কোথায় উজ্জীবনের ছন্দ?
কোথা দশভুজে, তোমার পূজার প্রসাদ অমৃত বিন্দু?

মঙ্গলময়ি! বাজাও তোমার শুভ মঙ্গল-শঙ্খ
হৃদয়ে হৃদয়ে জাগাও দেবতা টুটি মহা তমঃ-পঙ্ক।
　　মুছে যাক সব গ্লানির কালিমা
　　উজলি উঠুক নব অরুণিমা
জাতির জীবনে শুরু হোক পুনঃ মঙ্গল-নব-অঙ্ক!

মৃত্যুদর্শন

অধ্যাপক সুজয়গোপাল রায়পোদ্দার

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে', 'মরণেরে তুঁহু মম শ্যাম সমান'—এমন ধারা পরস্পরবিরোধী দ্বিমুখী মানসিকতা নিয়ে মানুষ এঁকে চলেছে মরণের ছবি। ভাষার রঙে তুলি দিয়ে যত সুন্দর করেই আঁকা হোক না কেন সেই ছবি, যথার্থ জিজ্ঞাসুর পিপাসা কিন্তু সে মেটাতে পারে না; উপরন্তু জিজ্ঞাসার প্রশ্নবোধক চিহ্নটি আরও বড় হয়ে ফুটে ওঠে সত্যানুসন্ধানীর মানসপটে।

একথা আজ সুধীসমাজে স্বীকৃত যে, 'সার্বিকতা' (universality) হলো বিচারের একটি অতি প্রয়োজনীয় অবশ্যস্বীকার্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ কোন একটি বিচার তখনই যাথার্থ্য দাবী করতে পারে যখন তা স্থান কাল ও পাত্র ভেদে সর্বত্র সমান স্বীকৃতি পায়। সার্বিকতার অভাবে 'বিচার' আপন চরিত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে ব্যক্তিগত 'মতামতে' (opinion) রূপান্তরিত হয়। এবং তর্কশাস্ত্রের বিচারে 'বিচার' ও মতামত সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি প্রত্যয়। 'বিচার' হলো জ্ঞান, কিন্তু 'মতামত' হলো জ্ঞানের সম্ভাবনা মাত্র

কোন কিছুকে নিয়ে বিচার করতে গিয়ে যদি পরস্পরবিরোধী উক্তি করা হয়, তাহলে সেই বিচারে বস্তুর আসল রূপটি ধরা পড়ে না, এতে যতটুকু জানা যায় তা হলো বিচারকারী মনের একান্ত নিজস্ব কিছু প্রতিক্রিয়া মাত্র, বস্তুজ্ঞানের দিক থেকে যা নিতান্তই বেসরকারী। মরণের বিচারক্ষেত্রেও এই যুক্তি প্রযোজ্য। মরণ কারুর কাছে অবাঞ্ছিত, আবার কারুর কাছে বা সে পরম প্রিয়। মরণকে নিয়ে এই বিরোধিতা ব্যক্তিমনের ভাবজীবনের স্বাতন্ত্র্যকেই শুধু তুলে ধরে। বিচারের জগতে মানুষ আপন খেয়ালে ভিন্নমুখী হতে পারে না। বিচারকালে ভাবাবেগ থাকে শৃঙ্খলিত এবং বুদ্ধি তার নিরপেক্ষ অনাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্রতী হয় বস্তুর চরিত্র-চিত্রণে। এই আলোচনার আলোকে এমন দাবী নিশ্চয়ই করা চলে যে, মরণের ছবি ঠিক ঠিক ফুটে ওঠেনি মরমিয়া কবির ওপরের ঐ কথা দুটিতে। অধিক ছবি আঁকা আছে অন্য কোথাও অন্য কোন ভাবে। সেই ছবি তুলে ধরার অনাড়ম্বর প্রয়াসেই এই নিবন্ধের অবতারণা।

মানুষের মন মৃত্যুপ্রসঙ্গকে সব সময়ই এড়িয়ে চলতে চায় নানা ভাবে নানা ছলে—কখনও বা ভয়ে, কখনও বা ঘৃণায়, আবার কখনও বা তথাকথিত সর্বনাশা দার্শনিক যুক্তিজালের অজুহাতে। এর কারণ বোধ হয়, সব মানুষই চায় শেষ পর্যন্ত বাঁচতে। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, যত চেষ্টাই আমরা করি না কেন, মরণশীল মানুষ আমরা কখনই পারব না শেষ পর্যন্ত বাঁচতে। মৃত্যুর সুশীতল স্পর্শ একদিন না একদিন আমরা পাবোই। কারণ, মৃত্যু হলো জীবনের সবচেয়ে নিশ্চিত ঘটনা। পৃথিবীর আর সব কিছুই যদি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, এমনকি আগামী জীবনও যদি অস্বীকৃত হয়, (জীবন্মুক্তির ক্ষেত্রে) তবু মৃত্যু ধ্রুব, চিরসত্য। এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ হলো অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি অভিজ্ঞতারও উল্লেখ নেই যা পার্থিব জীবনের অমরতাকে

সমর্থন জানায়। তাছাড়া বুদ্ধির বিচারেও দেখা যায় যে, যা একদিন ছিল না কিন্তু পরে কোন এক সময়ে কোন কারণে এসেছে, সেটি স্বাভাবিকভাবেই আবার কোন এক সময়ে সেই কারণের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে—অর্থাৎ তার মরণ ঘটবে। যুক্তির দাবীতেও তাহলে দেখছি সৃষ্ট কিছুকে শেষটায় বিনষ্ট হতেই হবে। তাই বলা হয়ে থাকে, জীবনের আসরে মৃত্যুর জয়গান অপরিহার্য - নইলে ঐ আসরের অঙ্গহানি শুধু নয়, অস্তিত্বই অস্বীকৃত হবে। তাই তো বাংলার কবি গেয়েছেন 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে।' সর্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান স্বয়ং বলেছেন—'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ'। কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে, মৃত্যু বলতে এখানে দেহের আত্যন্তিক বিনাশের ফলে জড়বস্তুতে রূপান্তরের অবস্থাকেই নির্দেশ করা হচ্ছে। এই মায়াময় অনিত্য সংসারে সবচেয়ে নিশ্চিত ব্যাপার যে মৃত্যু, তার সম্বন্ধে আজকের আধুনিক শিক্ষাসমৃদ্ধ সুধীসমাজ তথা সাধারণ জনসমাজ সবচেয়ে বেশী উদাসীন। জ্ঞানচর্চার দিক থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গী একটা বিরাট আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়—সুতরাং জীবনের একটা বড় ট্রেজেডিও বলা চলে একে। যে কারণেই হোক না কেন এই আত্মঘাতী উদাসীনতা আমাদের কাছে দুঃখকে আরও দ্রুত এবং আরও বড় আকারে ডেকে আনে। তাই তো পৃথিবীর কবি গেয়েছেন—

'এড়িয়ে তারে পালাস নারে, ধরা দিতে
হোস না কাতর
দীর্ঘ পথে ছুটে ছুটে দীর্ঘ করিস
দুঃখটা তোর।'

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাবো যে, জীবন ও মৃত্যু আসলে পরস্পরবিরুদ্ধ কিছু নয়। এ যেন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে যা সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হলো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী তথা মানসিকতার নবরূপায়ণ।

সুপ্রাচীন আর্য ঋষি সত্যদ্রষ্টা বেদবিদ্ প্রাচ্য মনীষীরা সেই কোন এক নাম-না-জানা কালে ঘোষণা করেছিলেন যে, আমরা এই মর্তের মানুষরা হচ্ছি অমৃতের সন্তান। আসল 'আমি' বা আত্মা কখনও মরে না। জন্মমৃত্যুর নাগরদোলায় আত্মাকে কখনও দুলতে হয় না। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥'

ভারতীয় দর্শনের আত্মতত্ত্ব প্রতিটি সত্যান্বেষীর অবশ্য পাঠ্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শরণাগত অর্জুনকে এই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে কথামৃত উপহার দিয়েছেন, তার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে সত্যসাধক আত্মার যথার্থ পরিচয় পাবেন। আমাদের দেহ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি কোন কিছুই আত্মা নয়; এসব হলো অজ্ঞান, অবিদ্যা, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া বা প্রকৃতির সন্তান। অর্থাৎ এরা সবাই মূলতঃ জড়ধর্মীয়। অতএব অন্যসব জাগতিক বস্তুর মতো আমাদের এই দেহমনেরও বিকার ঘটে। ক্রমাগত ক্ষয়ের ফলে বা অন্য কোন কারণে জীবদেহের একদিন চরম বিনাশ ঘটে। চিকিৎসা, সেবা, শুশ্রূষা, ঔষধ, পথ্য—প্রভৃতি কৃত্রিম ব্যবস্থা-প্রয়োগে দেহের জীবনকালকে কিছুটা দীর্ঘায়িত করা গেলেও তাকে কখনই অবিনাশী অমর করে তোলা সম্ভব নয়। সুতরাং নিতান্ত প্রাকৃতিক

নিয়মেই দেহের বিনাশ হবে—আবার ঐ নিয়মেই আত্মা থাকবে অবিনাশী। কারণ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হলো নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। সুতরাং মৃত্যুর জন্য দুঃখ বা শোক করা জ্ঞানী জনের পক্ষে অনুচিত কর্ম। এই যুক্তিতেই অর্জুনের বিষাদ দূর করে তাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করতে ভগবান বলছেন—

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত।

সত্যসন্ধানী বিচারবাদী মানুষের পক্ষে এই সনাতনী দিব্যবাণীর ধ্যান-অনুধ্যানের আজ বিশেষ প্রয়োজন। কারণ গোটা মনুষ্যজাতটাই যেন মিথ্যামুখী হয়ে ছুটে চলেছে নিশ্চিত ধ্বংসের কবলে। শাস্ত্রের ঐ পুরাতনী কথায় বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয় যখন কবির কথা স্মরণ করি—"ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না, ঋষির রসনা মিছে না কহে।" জীবন-মরণের এই সন্ধিক্ষণে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে গেলে সর্বপ্রথমেই চাই জীবনের ও মরণের যথার্থ পরিচয়। পার্থিব জগতের নশ্বরতা ও দৈহিক জীবনের ক্ষণ-স্থায়িত্বের কথা যত বেশী চিন্তা করতে পারবো তত দ্রুত আমরা আত্মমুখী হতে সক্ষম হবো আর ঠিক তেমন অবস্থাতেই আমরা অল্প সুখের মোহমায়াজাল ছিন্ন করে দিয়ে ভূমানন্দ-লাভে তৎপর হতে শিখবো। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগ (রাজযোগ)-আপন রুচিমত যে-কোন পথেই আমরা চলি না কেন, চলার পথে যদি কখনও কোন মঙ্গলমুহূর্তে আত্মতত্ত্ব আপন আলোয় উদ্ভাসিত হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ সমগ্র জগৎসংসার আমাদের কাছে নতুন রূপে দেখা দেবে। পরমানন্দে তখন আমরা বিভোর হয়ে যাবো। আমাদের সব চাওয়া পাওয়া তখন মিলে মিশে এক হয়ে, লীন হয়ে যাবে সেই আনন্দ-সাগরের বুকে।

মূলতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ মানুষ আমরা সব সময়েই আনন্দপিয়াসী। কান্না-ভরা, ঘেন্না-ধরা এই পৃথিবীর দুঃখ-জ্বালা, ব্যথা-বেদনায় আমরা আজ দিশেহারা; এমন অসহ্য অবস্থা থেকে আমরা মুক্তি চাই। আমরা চাই সেই আনন্দ যা কোনদিন ফুরিয়ে যাবে না, যে আনন্দ হবে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারের মতো আমাদের চিরদিনের অক্ষয় সম্পদ। জীবনের দুঃখক্লিষ্ট বেদনাহত অবস্থা থেকে মানবমনে যে অতৃপ্তি জেগেছে, সেই স্বর্গীয় অতৃপ্তিই হলো ভারতীয় দর্শনের জনক। ব্যথা-বেদনার পুঞ্জীভূত ঘন কালো মেঘে ঢাকা এই সুন্দর পৃথিবীকে আলো-ঝলমল করে তুলে ধরাই হলো ভারতীয় দর্শনের সংকল্প ও পুণ্যব্রত। তাইতো দেখি দুঃখের নরক থেকে জন্ম নিল সুখের স্বর্গ, বেদনার কুঁড়ি থেকে ফুটে উঠলো আনন্দের সুগন্ধি ফুল; ঠিক এই কথাই গানের সুরে বেজে উঠেছে কবিকণ্ঠে—

"আমার ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও,
ডাকো তারে।
... ...
আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায়
বাজি সুরে—
সেই গানের টানে পারো না আর
রইতে দূরে।

লুটিয়ে পড়ে সে গান মম
ঝড়ের রাতের পাখি সম
বাহির হয়ে এসো তুমি অন্ধকারে।"

এই ভাবে জীবনের দুঃখ কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা সম্বন্ধে যদি আমরা বিশেষভাবে মনোযোগী হই, যে কোন এক অনিশ্চিত মুহূর্তে চিরনিশ্চিত

মৃত্যুর কথা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি, এবং যদি নিষ্ঠা সহকারে এই মানসিক অনুশীলনে ব্যস্ত থাকি, তাহলে একথা জোরের সহিত বলা চলে যে, অনেকটা অস্পষ্ট হলেও এই উপলব্ধি আমাদের হবে—মৃত্যু ভয়ের ব্যাপার নয়; মৃত্যু হলো দেহের একটা বড় রকমের পরিবর্তন মাত্র। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে এই শিক্ষাই দিচ্ছেন—

'দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥'

দেহের বুকে মহাকাল যে চিহ্ন রেখে যায়—শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য ইত্যাদি সোপান বেয়ে, মৃত্যু তেমনি আর একটি নতুন চিহ্ন মাত্র। এই বিচারে বার্ধক্যের পরের অবস্থাকেই সাধারণভাবে মৃত্যু বলা হয়। জীবন ও মৃত্যু তাহলে মূলতঃ ভিন্ন ঘটনা নয়—একই ঘটনার দু'টো ভিন্ন রূপমাত্র। যৌবনে পা দিয়ে যদি ফেলে-আসা শৈশব ও কৈশোরকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিই এবং বার্ধক্যে পৌঁছে যদি হারিয়ে-যাওয়া যৌবনকে স্বীকার করে নিই, তাহলে একই যুক্তিতে বার্ধক্যের পরবর্তী অবস্থায় (যাকে সাধারণতঃ মৃত্যু বলা হয়) পেছনে-রেখে-আসা জীবনকেই বা মেনে নেবো না কেন? বার্ধক্যে এসে যদি পূর্বকার জীবনের জন্য হাহুতাশ না করি, তাহলে মৃত্যুর অবস্থাকে কল্পনা করে ফুরিয়ে-যাওয়া জীবনের জন্যই বা দুঃখ করি কেন? প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, অকাল মৃত্যুর ব্যাখ্যা ঠিক এই আলোকে করা যাবে না; এই ক্ষেত্রে মৃত্যুকে দেহের হঠাৎ-আসা একটা বড় রকমের রূপান্তর মনে করতে হবে। মৃত্যু যে শেষপর্যন্ত দুঃখের সাগরই হয়, তার কারণ মৃত্যুকে আমরা পরিবর্তন না ভেবে আমাদের সমাপ্তি মনে করি।

জীবন মৃত্যুর এই ধ্যান-ধারণায় আর কোন লাভ না হলেও এটুকু উপকার আমাদের হবে যে, মৃত্যু আমাদের আড়ষ্ট করে রাখতে পারবে না: জীবনের বন্ধুর পথে মাথা উঁচু করে চলতে গিয়ে মৃত্যু আমাদের ভয়ভীতির মোহজালে জড়িয়ে ফেলে পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হবে না;—এক কথায় আমরা হবো তখন মৃত্যুঞ্জয়। এবং একমাত্র মরণজয়ী মানুষের পক্ষেই খোলা মনে যে-কোন ঝুঁকি নিয়ে যে-কোন কঠিন কাজে নিজেকে নির্দ্বিধায় নিয়োগ করা সম্ভব। সকল প্রকার দুর্বলতা, কাপুরুষতার উর্ধ্বে উঠে, জন্ম-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে সে তখন একাই এগিয়ে যাবে এই পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিতে। দু'দিনের খেলাঘর এই পৃথিবীর যে কাজগুলোকে আমরা মহান পবিত্র ও সুকঠিন বলে মনে করি, সেই সব কর্মযজ্ঞে হাসিমুখে আত্মাহুতি দিতে পারেন এই সব ত্যাগব্রতী কর্মবীরের দল যাঁরা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে কেড়ে নিয়েছেন ঐ মৃত্যুরই চাবিকাঠি। ভগবান বুদ্ধের ধ্যান-লব্ধ সত্যের প্রথম কথাই হলো 'সর্বং দুঃখম্'। জগৎ দুঃখময়। মৃত্যু হলো সকল দুঃখের ঘনীভূত চরম অবস্থা। বাস্তবকে অস্বীকার করার মধ্যে কোন বাহাদুরি নেই, আছে শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা। জীবনে কোন দুঃখ নেই, কষ্ট নেই ভেবে যদি আমরা নির্লিপ্ত হতে চাই তখন জরা-মরণ-ব্যাধি কিন্তু আমাদের সে সাধের গুড়ে বালি ছিটোবে; একটি মুহূর্তের জন্যও ওরা আমাদের নিশ্চিন্ত থাকতে দেবে না। তাই তো দেখি ভগবান বুদ্ধ সহ সকল ভারতীয় সত্যদ্রষ্টাগণ যুগে যুগে এই উপদেশই করে গেছেন যে, বাস্তব দুঃখকে মেনে নিয়ে আমাদের এখন যত্নবান হতে হবে

কিভাবে ঐ দুঃখ-বৈতরণী পার হওয়া যায় সেই উপায়ের সন্ধানে;—ধর্মের পরিভাষায় এরই অন্য নাম 'সাধনা'। যুগে যুগে ভারত-পথিকরা আমাদের সেই পথের নিশানা দিয়ে গেছেন। শুধু মুখের কথায় নয়, জীবনের প্রত্যক্ষ আচরণের মধ্য দিয়ে। আমরা যদি এরপরও একটুখানি আয়াস স্বীকার করে সে পথে চলতে চেষ্টা না করি, তাহলে সেটা হবে প্রচণ্ড ভুল; আর এই ভুলের ফলস্বরূপ জন্মজন্মান্তরে আমাদিগকে এই সীমাহীন দুঃখ-সাগরে হাবুডুবু খেতে ফিরে ফিরে আসতে হবে। জীবনকালও কাটবে নিরানন্দে, ভয়ে। শাস্ত্রের ও এই দরদী সাবধানবাণী স্মরণে রেখে সকলের কণ্ঠে সমস্বরে ধ্বনিত হউক ভাগবতী ঐ বেদবাণী—

"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।"

সত্য

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ

দেহ-কারাগারে চিরবন্দী যে—সে কোন্ প্রাণী ?
চিরনির্বাক, ঘুমে কি সজাগ—কিছু না জানি।
পশু ও পক্ষী কতই ত দেখি পৃথ্বীতলে—
তারা কি মুক্ত ? তারাও মুগ্ধ মায়ার বলে !
মুক্ত আকাশে ভেসে চলে মেঘ আপন মনে,
সেও দেখি বাঁধা মায়া-ফাঁদে এই ধরার সনে !
নির্ঝর-জল ঝরে অবিরল—মুক্ত ধারা ?
চারিদিকে তার ঘেরা প্রকৃতির নিয়ম-কারা !
তড়িৎ মরুৎ এ-সবই বন্দী নিয়ম মাঝে,
সংসারে তারা হেরি নিবদ্ধ বিবিধ কাজে !
মুক্ত যাহারে ভেবেছি—মিথ্যা, সকলি ভুল,
গণ্ডির মাঝে বদ্ধ সবাই জেনেছি স্থূল।
ইটপ্রস্তরে তৈরী অনেক দুর্গ আছে,
পিঁজরাবদ্ধ বিহগী সেথায় অনেকই নাচে !
প্রাণ-বিহঙ্গ করে ছটফট বন্দিশালে ?
হবে কি মুক্ত দেহ-দানবের মৃত্যুকালে ?
অন্তর দিয়ে সত্যেরে যদি দেখিতে চাই
বন্দিশালায়, দেহ থাকিতেই দেখিতে পাই।
সৃষ্টির মাঝে আর কোন কিছু মুক্ত নয়—
মুক্ত কেবল আত্মা আমার—তাহারই জয়।

চিকাগো ধর্মমহাসভার ১১তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন

গত ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার চিকাগো ধর্মমহাসভার ১১তম বার্ষিকী উপলক্ষে অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের উদ্যোগে কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। অনুষ্ঠানে আটটি বিভিন্ন ধর্মের আটজন প্রতিনিধি ভাষণ দেন। কলিকাতা তথ্যকেন্দ্রের জনাকীর্ণ হলঘরটিতে সমবেত কণ্ঠে বেদমন্ত্র সহযোগে বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তারপর স্বাগত ভাষণ দেন মহামণ্ডল-সম্পাদক শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন স্বামী নিরাময়ানন্দ।

উদ্বোধনী ভাষণে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী মানুষে মানুষে সহযোগিতা ও সৌভ্রাত্রের যে বাণী স্বামীজী চিকাগোয় আমাদের শিক্ষা দিয়াছিলেন, বর্তমান সঙ্কটের দিনে নূতন করিয়া তাহা সকলকে গ্রহণ করিতে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধি অধ্যাপক অমিতাভ খাস্তগীর বলেন, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করার জন্য নয়—পূর্ণতাদানের জন্য, একটি সার্বিক অথচ জাতীয় ধর্মচেতনার পুনরুন্মেষের জন্যই উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

শিখধর্ম বিষয়ে ডঃ হীরালাল চোপড়া বলেন, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সৌহার্দ্য ও সমন্বয়ের বাণী আজ থেকে পাঁচশত বৎসর পূর্বে গুরুনানক আমাদের শিখাইয়া গিয়াছেন; মানুষে মানুষে সর্ববিধ ভেদাভেদ অবসানের পথিকৃৎ ছিলেন তিনি।

ইসলামধর্মের প্রতিনিধি শ্রী কে. এম. ইউসুফ বলেন, কোরানের শিক্ষা সকল যুগের সকল মানুষকে পথ দেখাইবে। তিনি বলেন, ইসলাম সাম্যের বাণী প্রচার করে এবং সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশ্বাস করে না, কারণ সকল সম্পদের মালিক একমাত্র ঈশ্বর।

বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধি অধ্যাপক তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, বৌদ্ধধর্ম কেবল একটি বিধিবদ্ধ ধর্মই নয়, এটি একটি জীবনের ধারা; যে-কেহই সত্য, ন্যায়নিষ্ঠা ও মানবতায় বিশ্বাসী, তিনিই একজন বৌদ্ধ।

জৈনধর্মের পক্ষে শ্রীশ্রীচাঁদ রামপুরিয়া বলেন, কোনও বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান নয়, অন্তরের শুচিতা ও পবিত্রতাই জৈনধর্মের মূলকথা; পবিত্র হৃদয়েই ধর্মের বাস।

খৃষ্টধর্মের পক্ষে ফাদার ফাঁলো বলেন, চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর ভাষণ শুধু হিন্দুদের কাছেই স্মরণীয় নয়, পৃথিবীর সকল ধর্মাবলম্বীদের বিশেষতঃ খৃষ্টানদের কাছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জোরোয়াস্ট্রিয়ান ধর্মের প্রতিনিধি ডঃ জে. কে. ওয়াদিয়া বলেন, সকল ধর্মের মহাপুরুষেরাই একটি সার্বিক ধর্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন—তাহা হইতেছে সত্যধর্ম। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে সেই সত্যধর্মই সারা পৃথিবীর মানুষ অনুশীলন করিবে।

হিন্দুধর্মের পক্ষে অধ্যক্ষ অমিয়কুমার

মজুমদার বলেন, বৈদান্তিক ধর্মের মূল কথা বিশ্বাস নয়—উপলব্ধি। হিন্দুগণ সব ধর্মকেই সমান না হইলেও সত্য বলিয়া মনে করেন এবং রুচির বিভিন্নতা অনুযায়ী ধর্মাচরণের পার্থক্যকে স্বাভাবিক বলিয়াই জানেন।

সভাপতি স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বলেন, 'এখানে আমরা সমবেত হইয়াছি প্রতিদ্বন্দ্বীর মনোভাব লইয়া নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে নয়—বন্ধুত্বের মনোভাব লইয়া প্রত্যেক ধর্মের মূলকথাগুলি একে অপরকে বুঝাইয়া বলিতে। বর্তমান যুগে যখন আমরা এক-বিশ্বের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি, তখন মানুষে-মানুষে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে মৈত্রী ও সম্প্রীতির মূল্য অনেক বেশী। আর এ-জাতীয় সভা অপরাপর ধর্ম সম্পর্কে আমাদের মনের ভুল ধারণাগুলি দূর করিয়া এই সম্প্রীতিই জাগাইতে সাহায্য করে।' তিনি বলেন, 'ধর্মের দুটি স্তর আছে—প্রথমটি ব্যবহারিক স্তর (practising stage) বা বাহ্যিক স্তর। এই স্তরে ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন আচরণবিধি, ভিন্ন ভিন্ন পূজাপদ্ধতি; সাধারণ মানুষ এগুলিকেই ধর্ম বলিয়া মনে করে। এই স্তরে প্রত্যেক ধর্মই পৃথক। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মেরই আরও একটি স্তর আছে—যাহাকে বলা যায় উচ্চতর স্তর (superior level)। এই উচ্চতর পর্যায়ে ধর্মে ধর্মে কোনও ভেদ নাই, আর মানুষকে সেই উচ্চতর ধর্মানুভূতির স্তরে পৌঁছাইয়া দিবার শক্তি প্রতিটি ধর্মেরই আছে। স্বামী বিবেকানন্দ চাহিয়াছিলেন, ধর্মের মূল কথা—আত্মজ্ঞান—প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করুক।' পরিশেষে তিনি বলেন, 'প্রতিটি ধর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের মন হইতে ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব দূর করিয়া মানুষে মানুষে মৈত্রী ও ঐক্যানুভূতির সঞ্চার করা।'

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীশঙ্কর বসু-মল্লিক চিকাগো ধর্মমহাসভায় গীত প্রার্থনা ও ধর্ম-মহাসভার উদ্বোধনী দিবসে অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী-প্রদত্ত ভাষণটি এবং অনুষ্ঠান-শেষে স্বামীজীর লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন বন্যাত্রাণকার্য

জনসাধারণ অবগত আছেন যে, সম্প্রতি বিধ্বংসী বন্যায় পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে অবর্ণনীয় ক্ষতি হইয়াছে। মানুষের দুঃখ-কষ্টের সীমা নাই।

গত এপ্রিল মাস হইতে রামকৃষ্ণ মিশন তিনটি রাজ্যে এগারটি শরণার্থী শিবিরে ১,৩০,০০০ শরণার্থীর মধ্যে সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকিলেও, বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে বিহারে পাটনার নিকটবর্তী চারটি গ্রামে ও মনিহারিতে, পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার সাতটি গ্রামে, মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং ময়না থানার বাকচা গ্রামে, মুর্শিদাবাদ জেলার সারগাছিতে, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর অঞ্চলে সিমুলগাছিতে এবং হাওড়া জেলার খিলা ও ডোমজুড়ে বন্যাসেবাকেন্দ্রস্থাপনে বাধ্য হইয়াছেন। গত আগষ্ট মাস হইতে এই সব কেন্দ্রে সেবাকার্য চলিতেছে। সহস্র সহস্র বন্যাপীড়িত শিশু ও নরনারী সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন লইয়া ত্রাণকেন্দ্রে আসিয়াছেন। ধুতি, শাড়ী, কম্বল, ঔষধপত্র, বাসন, শিশুখাদ্য প্রভৃতির একান্ত প্রয়োজন।

সহৃদয় দেশবাসীর নিকট এই ত্রাণকার্যে সাহায্যের জন্য আমরা সনির্বন্ধ আবেদন জানাইতেছি। এই উপলক্ষে যে-কোন সাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলিতে ধন্যবাদের সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। 'চেক' Ramakrishna Mission এই নামে লিখিবেন।

১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, (হাওড়া)
২। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩
৩। অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এন্টালী রোড, কলিকাতা-১৪
৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটুট অব কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা-২৯

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
বেলুড় মঠ [ফোন : ৬৬-২৩৯১]

১০ অক্টোবর,
১৯৭১

সমালোচনা

হিমবন্তের দেবদেউল—লে: কর্ণেল সত্যেন্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১০ নং ভৈরব মুখার্জি লেন, কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান: মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ২৩৯; মূল্য সাড়ে আট টাকা।

দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়ের তীর্থস্থানগুলির আকর্ষণ দুর্বার, তাই সেগুলি দর্শন করিবার জন্য ভক্তচিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠে। অজানাকে জানিবার, অচেনাকে চিনিবার আগ্রহ লইয়া সুধী লেখক তীর্থভ্রমণ করিয়াছেন এবং তীর্থক্ষেত্র-সমূহের খুঁটিনাটি বিবরণ, পৌরাণিক কাহিনী, পথের পরিচয়, ভৌগোলিক তথ্য যথোপযুক্ত আলোচনাসহ চমৎকার বর্ণনার মাধ্যমে আলোচ্য পুস্তকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। অধুনা-উপেক্ষিত তীর্থক্ষেত্রগুলিকেও সাধারণের গোচরে আনিবার জন্য লেখকের আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। একুশটি একরঙা চিত্র, একখানি তিনরঙা চিত্র, একটি দুইরঙা মানচিত্র সংযোজিত হওয়ায় পুস্তকটির মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে; প্রচ্ছদটিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সব দিক বিচার করিয়া দেখিলে 'হিমবন্তের দেবদেউল' নামটি সার্থক।

বিভিন্ন পরিচ্ছেদে পরিবেশিত রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, যোশীমঠ, পাণ্ডুকেশ্বর, বদরিকাশ্রম, রুদ্রগঙ্গা, রুদ্রনাথ, গোপেশ্বর, তুঙ্গনাথ, উখীমঠ, কালীমঠ, ত্রিযুগীনারায়ণ, গৌরীকুণ্ড, কেদারনাথ প্রভৃতির সরস মনোরম কাহিনী পাঠ করিলে তীর্থগুলির প্রতি অনুরাগ জাগিবে; কত ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মা সিদ্ধপুরুষ এইসকল পুণ্যতীর্থে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেও জানিতে বাসনা হইবে। আমাদের মনে হয়, পুস্তকখানি ভ্রমণসাহিত্যের আগ্রহশীল পাঠক, সাধুসন্ত ও সকল শ্রেণীর হিমালয়তীর্থপ্রেমী ভ্রমণরসিকদের নিকট সমাদর লাভ করিবে এবং নির্দেশক গ্রন্থ (Guide book) হিসাবেও কাজে লাগিবে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য সভ্যতা—শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত। প্রকাশক: বশিষ্ঠ বানপ্রস্থ আশ্রম কমিটি, পি-৭ রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২। পৃষ্ঠা-১৬৫; মূল্য দুই টাকা।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ যখন অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখনও ভারতবর্ষ অতি উন্নত ও সুসভ্য ছিল। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সঙ্গীত, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, ভাস্কর্য, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীনকালে ভারত উন্নতির শিখরে উঠিয়াছিল। আলোচ্য পুস্তকখানিতে বর্ণ-বিভাগ, চতুরাশ্রম এবং পরলোকতত্ত্ব বা জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে যে-সকল প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেগুলিতে গভীর চিন্তাশীলতা ও অনুধ্যানের পরিচয় বিদ্যমান। চতুরাশ্রম সম্বন্ধে সুধী লেখকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "সেই সময়কার মানুষের গড়পড়তা পরমায়ু একশত বৎসর ধরিয়া তাহাকে ৪ ভাগ করিয়া এক এক আশ্রমের জন্য ২৫ বৎসর নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। যথা, জন্ম হইতে ২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য আশ্রম। ২৬ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত গার্হস্থ্যাশ্রম, ৫১ হইতে ৭৫ বৎসর পর্যন্ত বানপ্রস্থ আশ্রম, এবং ৭৬ হইতে ১০০ বৎসর পর্যন্ত সন্ন্যাসাশ্রম।"

গ্রন্থখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহানন্দে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মহাষ্টমীর দিন দর্শনার্থীর সংখ্যা পূজার অন্যান্য দিন অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল, এইদিন ১৫,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে অন্নপ্রসাদ দেওয়া হয়। মহানবমীর দিন খুব ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল।

শাখাকেন্দ্রসমূহে দুর্গোৎসব

এই বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে: আসানসোল, করিমগঞ্জ, কামারপুকুর, কাঁথি, গৌহাটি, জয়-রামবাটী, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, পাটনা, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম), বোম্বাই, রহড়া, শিলং, শিলচর এবং শেলা (চেরাপুঞ্জী, খাসিহিল)

বেলুড় মঠে সাধু-সম্মেলন

বেলুড় মঠে গত ৭ই হইতে ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী সাধু-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং ভারতেতর দেশে অবস্থিত কেন্দ্রসমূহ হইতে বহু সাধু আসিয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

বেলুড় মঠে গত ১০ই অক্টোবর বিকাল সাড়ে তিনটায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সভা-পতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ৬২ তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়। মঙ্গলাচরণ প্রভৃতির পর রামকৃষ্ণ মিশনের সহসম্পাদক স্বামী ভূতেশানন্দ মিশনের ১৯৭০-'৭১ সালের কার্যবিষয়ক গভর্নিং বডির রিপোর্ট পাঠ করেন। (বিস্তৃত বিবরণ উদ্বোধনের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)। পরে অন্যান্য অনুষ্ঠানান্তে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ভক্তগণের মতো তাঁহার গৃহস্থ ভক্তগণকেও ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম সাধনার অঙ্গরূপে পূজা-জপ-ধ্যানাদির মতো ভগবান-জ্ঞানে দরিদ্র জনগণের সেবাকেও গ্রহণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্যে প্রচার সম্বন্ধে তিনি বলেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনুভূতি ও বাণীর আলোকে উদ্ভাসিত বেদান্তভিত্তিক ভারতের সনাতন ভাবধারা প্রচার এবং অধ্যাত্মজীবন গঠনেচ্ছু ব্যক্তিদের সহায়তা করিবার দিকেই সেখানকার রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসিগণ বিশেষ মনোযোগ দেন—চমকপ্রদ একটা কিছু করিবার দিকে নয়। তিনি বলেন, আমরা চেষ্টা করি আর নাই করি, শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবধারা সমগ্র জগতেই মানুষের মনে ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া চলিয়াছে। এ বিষয়ে কয়েকটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া তিনি স্বামী শিবানন্দের একটি কথা উদ্ধৃত করেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন'—ব্যক্তিবিশেষের নয়, সমগ্র জগতের মানুষের অন্তরস্থ মহাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। পরে শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য দেশের বর্তমান পরিস্থিতি-উদ্ভূত মিশনের সমস্যাগুলি এবং উহাদের সমাধানে মিশনের গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী সভ্য-

গণের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনায় বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় লইয়া অগ্রসর হইলে সব বাধা অতিক্রম করিয়া এগুলির সমাধান আমরা করিতে পারিবই। সাম্যের বাণীর জন্য বিদেশের দিকে আমাদের তাকাইয়া থাকিতে হইবে না, আমাদের বেদান্তেই চরম সাম্যের বাণী নিহিত, আমাদের প্রয়োজন শুধু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত পথ ধরিয়া আচরণে তাহা মূর্ত করিয়া তোলা। ব্যাপকতর গণশিক্ষার মাধ্যমে ভাবসম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

শেষে সভাপতি স্বামী বীরেশ্বরানন্দ বলেন, আজ প্রশ্ন জাগিতে পারে, ধর্মের গ্লানি মোচন করিয়া যথার্থ ধর্মকে জগতে স্থাপন করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইয়াছে কি? উত্তরে বলা যায়, তাঁহার কাজ নীরবে চলিতেছে, তাঁহার ভাবই জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। বর্তমান জগতে সর্বত্র মানুষের মনে একটা বিরাট শূন্যতা সৃষ্ট হইয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবই সে শূন্যতা পূরণ করিবে, তাঁহার বাণীই সে শূন্যতা পূরণের পথ দেখাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন-অনুসৃত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার বৈশিষ্ট্য এই যে, জাগতিক কর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্যকার ব্যবধানটুকু ইহা মুছিয়া দিয়াছে, জাগতিক কর্মকে রূপায়িত করিয়াছে ঈশ্বরলাভের সাধনায়, জাগতিক কর্মকে মন্দিরে পূজার মতোই ঈশ্বরের পূজারূপে, জীবসেবাকে নারায়ণের সেবারূপে বরণ করিয়া। কর্ম এখানে উদ্দেশ্য নয়, ঈশ্বরলাভের উপায়; জনহিত-সাধনের উদ্দেশ্য অপরকে ধন্য করা নয়, নিজেই ধন্য হওয়া। বর্তমান পরিস্থিতিতে মিশনকে যে সব বাধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে, সে বিষয়ে তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাস স্থির রাখিয়া তাঁহার আদর্শ আঁকড়াইয়া চলিলে এসব বাধা অতিক্রম করিয়া আমরা অগ্রসর হইব—ইহা নিঃসন্দেহ; বাধার সহিত এই সংঘর্ষ আমাদের অধিকতর শক্তিশালীই করিয়া তুলিবে। আমরা যাহাতে এভাবে চলিতে পারি তাহার জন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর নিকট সকলের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন। শ্রীহিমাংশু গঙ্গোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং শ্রীমৃগেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করিবার পর সভার কার্য শেষ হয়।

সেবাকার্য

উদ্বাস্তুসেবা: পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীদের সেবাকার্যে গত আগষ্ট মাসে (১৯৭১) বিতরিত দ্রব্যাদি:

চাল ৪,৮৫৯·৩৮ কুইন্টাল, গম ৯৬২·৫০ কুই., ডাল ৭৫০·৬৫ কুই, সবজি ১,০৬৬·১৬ কুই., গুঁড়া দুধ ২৫·৭৮ কুই., গুড় ও চিনি ৫·৩৮ কুই., বার্লি ১·০৭ কুই., কাপড় জামা ইত্যাদি ৭,৪৮৯ খানি, শিশুখাদ্য ১·৩৪ কুই., কম্বল ১৭টি, বাসনপত্র ১১৬টি, লণ্ঠন ২টি, বই ইত্যাদি ১,৩০৬ খানি, তৈল ১,০৯৭ গ্যালন।

মোট ১৭,৮১৮ জনকে চিকিৎসা-সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ডাউকী ও ইছামতীতে প্রাইমারী স্কুলে যথাক্রমে ৪৩৫ ও ৪৭৫টি শিশু পড়াশুনা করিতেছে। নরেন্দ্রপুর আশ্রম কর্তৃক গাইঘাটা শরণার্থী শিবিরে তিনটি প্রাইমারী স্কুল পরিচালিত হইতেছে

জলপাইগুড়ি সাকাটি কেন্দ্রে শরণার্থীরা প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করিয়াছেন।

বন্যার্তসেবা: বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য চলিতেছে। বিহারের পাটনায় ৪টি স্থানে ও মনিহারিতে, এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদহে ৭টি স্থানে ও শিমুলগাছি, বাগচা, কাঁথি, ডোমজুড়, খিলা ও সারগাছিতে বন্যার্ত-সেবাকার্য পরিচালিত হইতেছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

খড়গপুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র সংঘের উদ্যোগে খড়্গপুরের নাগরিকগণ কর্তৃক গত ২৩শে হইতে ২৬শে জুলাই চারিদিন স্থানীয় শ্রীশ্রীদুর্গামন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব কীর্তন, শোভাযাত্রা, পূজা, সভানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রায় তিন হাজার নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ২৩শে ও ২৬শে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ও অধ্যক্ষা ডক্টর সুশীলা মণ্ডল। এই দুই দিন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী বিশ্বদেবা-নন্দ, শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপ-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোপালচন্দ্র বিশ্বাস এবং প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা। সভান্তে ২৩শে স্বামীজীর জীবন ও ২৬শে 'নিমাইসন্ন্যাস' নাটক অভিনীত হয়। উৎসবে সংগৃহীত অর্থের এক চতুর্থাংশ, ৮০১৲ টাকা পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীদের সেবার জন্য বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণ-তহবিলে প্রদত্ত হইয়াছে।

পরলোকে

সুশীলকুমার ঘোষ

এটর্নী সুশীলকুমার ঘোষ গত ২১শে আগষ্ট ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। সুদীর্ঘকাল তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। মহাবোধি সোসাইটি, বিবেকানন্দ সোসাইটি, সিমলা সেবাসমিতি প্রভৃতি আরও বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল, বহুভাবে তিনি সে-সব প্রতিষ্ঠানের কার্যে হাসিমুখে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

রাসবিহারী সেন

প্রসিদ্ধ 'জবাকুসুম হাউস'-এর রাসবিহারী সেন গত ১.ই আগষ্ট ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। যৌবনকাল হইতেই বহুভাবে জনসেবায় লিপ্ত ছিলেন তিনি —মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান এবং কিছুকাল 'হিতবাদী' পত্রিকার পরিচালনাও করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত তিনি বহুদিন হইতে সংশ্লিষ্ট। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে তিনি নীরবে সাহায্য করিতেন। শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন তিনি।

যোগেন্দ্রনাথ মাইতি

গত ১৭.৮.৭১ যোগেন্দ্রনাথ মাইতি' পর-লোক গমন করেন। তাঁহার বয়স ৮০ বৎসরের বেশি হইয়াছিল। সাগর দ্বীপে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। কর্মনিষ্ঠ ও সেবাপরায়ণ মানুষ হিসাবে তিনি গ্রামাঞ্চলে পরিচিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের কাঁথি ও মনসাদ্বীপ কেন্দ্র দুইটির সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া আশ্রমের উন্নতির জন্য তিনি নানাভাবে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

অবনীকান্ত ঘোষরায়

গত ৭-৯-৭১ অবনীকান্ত ঘোষরায় ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ছাত্রজীবন হইতেই তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তিনি। জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির সহিত প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই বিশেষভাবে যুক্ত থাকিয়া তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে ইঁহাদের আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

১৩৭৮ সালের অনুষ্ঠান-সূচী

[বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে]

(অগ্রহায়ণ—ফাল্গুন)

তিথি-কৃত্য

১।	স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	১১ই অগ্রহায়ণ	শনিবার	২৭শে নভেম্বর
২।	শ্রীশ্রীমা	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	২৩শে „	বৃহস্পতিবার	৯ই ডিসেম্বর
৩।	স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	২৭শে „	সোমবার	১৩ই ডিসেম্বর
৪।	স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	৭ই পৌষ	বৃহস্পতিবার	২৩শে ডিসেম্বর
৫।	শ্রীযীশুখৃষ্ট	—	৮ই পৌষ	শুক্রবার	২৪শে ডিসেম্বর
৬।	স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	১৪ই পৌষ	বৃহস্পতিবার	৩০শে ডিসেম্বর
৭।	স্বামীজী	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	২২শে পৌষ	শুক্রবার	৭ই জানুয়ারী
৮।	স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	৪ঠা মাঘ	মঙ্গলবার	১৮ই জানুয়ারী
৯।	স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	৬ই মাঘ	বৃহস্পতিবার	২০শে জানুয়ারী
১০।	স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘ পূর্ণিমা	১৬ই মাঘ	রবিবার	৩০শে জানুয়ারী
১১।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	৩রা ফাল্গুন	বুধবার	১৬ই ফেব্রুয়ারী
	„	(আবির্ভাব মহোৎসব)	৭ই ফাল্গুন	রবিবার	২০শে ফেব্রুয়ারী
১২।	স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	২০শে ফাল্গুন	শনিবার	৪ঠা মার্চ

পূজা-কৃত্য

১।	শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	৭ই মাঘ	শুক্রবার	২১শে জানুয়ারী
২।	শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	৩০শে মাঘ	রবিবার	১৩ই ফেব্রুয়ারী

দিব্য বাণী

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৬
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৭
কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৮

—শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা, ১৮শ অঃ

অবশ্যকর্তব্য বলি যেই নিত্যকর্মগুলি রয়েছে বিহিত
চিত্ত শুদ্ধ করে তারা, সেই কর্ম ত্যাগ করা নহেক উচিত।
না বুঝে তাহার মর্ম মোহে কেহ সেই কর্ম ত্যাগ যদি করে,
সে-ত্যাগ তামস বলি, সে-ত্যাগ বিফল বলি জানিও অন্তরে ॥
কর্তব্য কি জানি মর্মে, শুধু ক্লেশ-ভয়ে কর্মে বিরত যে হয়,
রাজস সে ত্যাগ তার—ত্যাগ-ফলে অধিকার তারো নাহি রয় ॥
কেবল কর্তব্য-বোধে নিত্যকর্ম যেই সাধে অনাসক্ত চিতে,
ফল যদি না চাহে সে, (সুখ দুঃখ যাহা আসে সে কর্ম সাধিতে
সমভাবে বরি লয়, কিছুই যদি না চায় কর্ম-প্রতিদানে,)
সে ত্যাগ সাত্ত্বিক ত্যাগ, (সে ত্যাগই আসল ত্যাগ বলি সবে জানে)
মোর অভিমত ইহা, (ত্যাগের যে ফল তাহা পায় সেই জনে ॥)

কথাপ্রসঙ্গে

ত্যাগ ও সেবা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতভ্রমণ-কালে স্বামী বিবেকানন্দ একদা বলিয়াছিলেন, 'অদৃষ্টের কি পরিহাস, ভগবান শুকের জন্মভূমিতে ত্যাগ পাপ বলিয়া ধিক্কৃত হইতেছে!' ত্যাগের প্রতি এই মনোভাব, যাহা সাধারণতঃ আমরা সন্ন্যাস ও ধর্মজীবনের সহিতই সংযুক্ত বলিয়া ভাবিয়া থাকি, বর্তমান সময়ে জড়বাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে আরও উৎকট রূপ ধারণ করিয়াছে।

ত্যাগ মানে পলায়নী মনোবৃত্তি নয়, ত্যাগ মানে দুর্বলতা নয়। ত্যাগ হইল সত্যলাভের জন্য সর্বাধিক সবল মনের দৃঢ় পদক্ষেপ, অপরের কল্যাণের জন্য সবল হস্তে ধরিয়া নিজ 'অহং'-কারকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলা। ত্যাগ যে শুধু সন্ন্যাসীদের জন্যই নহে, বা কেবল বাহ্যবিষয় ত্যাগমাত্র নহে, গীতায় সেকথা স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে। আসল ত্যাগ হইল 'পূর্ণ আত্মত্যাগ—যেখানে কোন "আমি" নাই।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহাকে 'মনের ত্যাগ' বলিয়াছেন। মনে এই ত্যাগের ভাব না থাকিলে বাহ্যত্যাগেও যে কোন লাভ নাই, বরং উহা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র, গীতায় সেকথাও বলা হইয়াছে। আবার এই ত্যাগের অভ্যাস আমরা সংসারে থাকিয়াও, সর্ববিধ কর্তব্যে লিপ্ত থাকিয়াও করিতে পারি। করিতে পারি শুধু নয়, গীতায় তাহাই করার কথা বলা হইতেছে সকলকে, যুদ্ধ করিতে আগত অর্জুনকেও শোনানো হইতেছে এই ত্যাগের মাহাত্ম্য। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি এই ত্যাগের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। সর্ববিধ ধর্মসাধনার মূল লক্ষ্যও এই ত্যাগ—'পূর্ণ আত্মত্যাগ—যেখানে "আমি" নাই'। এই ত্যাগই, স্বার্থত্যাগই আবার সর্ববিধ সেবায় সাফল্যেরও মূলে—ব্যক্তির সেবা, সমাজসেবা, রাষ্ট্রসেবা প্রভৃতি সর্ববিধ সেবাতেই। ত্যাগ ছাড়া অপরের কল্যাণ করা যায় না, ত্যাগ ছাড়া অপরকে ভালবাসা যায় না। যে পরোপকার, যে ভালবাসা, যে সেবা স্বার্থ-বিজড়িত—আমাদের 'আমি'-র কোনরূপ চাহিদার সহিত জড়িত, তাহা দ্বারা আপাত-দৃষ্টিতে সাময়িক কোন কল্যাণ সাধিত হইতেছে বলিয়া মনে হইলেও কোন স্থায়ী বা যথার্থ কল্যাণ সাধিত হয় না—না ব্যক্তির, না সমষ্টির।

অতি নিম্ন হইতে অতি উচ্চ স্তরের জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত ক্রমবিকাশের সুদীর্ঘ পথের উপর আমরা যে যেখানে রহিয়াছি, সেখানে দাঁড়াইয়াই নিজ নিজ সামর্থ্যমতো আমরা এই ত্যাগের অভ্যাস করিতে পারি। ইহাই ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে উন্নত, অমৃতময় ও শান্তিপূর্ণ করিবার একমাত্র পথ 'ন ধনেন ন প্রজয়া'। কথাটি যে অমোঘ সত্য তাহা প্রমাণ করিতেছে বর্তমান জগতে অতিসমৃদ্ধিশালী দেশগুলিতেও ক্রমবর্ধমান মানসিক অশান্তি। মানসিক দৈন্যই সেখানে অশান্তির কারণ, আর্থিক দৈন্য নয়। কথাটিকে ঘুরাইয়া বলা চলে,—এই ত্যাগভাবের অভ্যাসের অভাবেই বর্তমান জগতে এত অসন্তোষ, এত উচ্ছৃঙ্খলতা এত অশান্তি; ইহার অভাবেই মানবপ্রেম এবং সাম্য এযুগের মূলমন্ত্রস্বরূপ হইলেও, 'এক

পৃথিবী'র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলেও কার্যক্ষেত্রে অপরের প্রতি সহানুভূতিপ্রকাশে এত বৈষম্য, অকপট সর্বজনীন সহানুভূতির এত অভাব।

সাধারণতঃ দেখা যায়, আমরা যে আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করিতে চাই তাহা রূপায়িত করিতে না পারিলেও যেন তাহা করিয়াছি—এরূপ ছাপই অপরের মনে ফেলিবার চেষ্টা করি; স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, 'আমাদের প্রাণশক্তির শতকরা নব্বই ভাগ খরচ হয় আমরা যাহা নই অপরের কাছে নিজেদের সেইভাবে তুলিয়া ধরিবার জন্য', যদিও 'আমরা যাহা হইতে চাই তাহারই চেষ্টায় ঐ শক্তির যোগ্য ব্যয় হওয়া উচিত।' এই জন্যই অপরের কাছে নিজেকে এভাবে স্বরূপ ঢাকিয়া দেখাইবার চেষ্টা সত্ত্বেও বহুক্ষেত্রে আমাদের আচরণে আমাদের নগ্ন রূপই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অবশ্য প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব সীমা আছে, যে পর্যন্ত সে ভিতরের ভাবকে চাপিয়া রাখিতে পারে। সে সীমা ছাড়াইয়া গেলেই এই চাপিয়া রাখা আর সম্ভব হয় না, ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয় ক্ষেত্রেই। আজ তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সাম্য মানবতা বিশ্বশান্তি প্রভৃতি উচ্চ আদর্শগুলির কর্ণধার আমাদের স্বার্থ; গায়ে যতক্ষণ না কোন আঁচ লাগিতেছে ততক্ষণ আমরা এইসব আদর্শের আবরণগুলিকে গায়ে জড়াইয়া রাখিতে পারি—কিন্তু স্বার্থে আঘাত লাগিলেই সে আবরণ টুটিয়া গিয়া জান্তব হিংস্রতাই আত্মপ্রকাশ করে। আজ ইহা স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে যে, এইসব আদর্শের নাম করিয়া যে শক্তিসঞ্চয়, যে সংগঠন তাহা শুধু স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে সুযোগের মুহূর্তে 'মানবতার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য একপাল নেকড়ের সংগঠন' ছাড়া আর কিছুই নয়।

কেন এমন হয়? মহান ধর্মনেতা, মানবপ্রেমিক সমাজনেতা, রাষ্ট্রনেতা প্রভৃতির উচ্চ আদর্শ উচ্চ ভাবগুলিকে বাস্তব জীবনে রূপায়ণের সময় আমরা এভাবে বিকৃত করিয়া ফেলি কেন? এই ভাবগুলিকে, এই আদর্শগুলিকে ভালবাসিয়াই তো আমরা সেগুলিকে গ্রহণ করি। কিন্তু চলার পথে সেগুলিকে বিকৃত করিয়া ফেলি কেন? ইহার একমাত্র উত্তর, আমাদের ত্যাগের ভাব বজায় থাকে না। ত্যাগ ও ভালবাসা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত—ভালবাসার মাপকাঠি হইল, যাহাকে ভালবাসিতেছি তাহার জন্য কতখানি ত্যাগস্বীকার করিতে পারি, তাহাই। ত্যাগের ভাবের যত অভাব বটে, ততই আমাদের ভালবাসা অপরের উপর হইতে ঘুরিয়া আমাদের নিজেদেরই অভিমুখী হয়, আমরা ততই জনসেবা, সমাজসেবা ও রাষ্ট্রসেবার নামে নিজেদেরই সেবা করিতে থাকি। 'মনের ত্যাগ' কমিতে থাকিলে বা লুপ্ত হইলে বাহিরের কোন আদর্শের, কোন ব্যবস্থাপনার সাধ্য নাই যে কার্যক্ষেত্রে অপরের নামে নিজেরই সেবা হইতে আমাদের নিবৃত্ত করে।

আজ আমাদের সময় আসিয়াছে আত্মবিশ্লেষণ করিবার, বিষয়টিকে তলাইয়া দেখিবার; সময় আসিয়াছে কেবল বুদ্ধিতে নয়, মানুষের মনে এই উচ্চ আদর্শগুলিকে কিভাবে প্রবিষ্ট ও স্থায়ী করানো যায় তাহার উপায় খুঁজিয়া বাহির করিয়া উহা করিতে সচেষ্ট হওয়ার। সাময়িক উত্তেজনার, উহা যথার্থ ত্যাগ- ও ভালবাসা-উদ্ভূত হইলেও, মূল্য বিশেষ কিছু নাই যদি পরে তাহা আবার

স্বার্থপরতায় ফিরিয়া আসে। ঐ উত্তেজনার শতাংশের একাংশও যদি মনে স্থায়িভাবে আজীবন আঁকড়াইয়া থাকিবার মতো করিয়া গাঁথিয়া দেওয়া যায়, তাহাই অধিকতর ফলপ্রসূ হয়।

কিভাবে মানুষকে আদর্শনিষ্ঠ করা যায়, কিভাবে মানুষকে জীবনের সর্বাবস্থায় সে-আদর্শ আঁকড়াইয়া থাকিবার মতো শক্তিমান করিয়া তোলা যায়, তাহা লইয়া আজ বহু মনীষী ভাবিতেছেন এদেশে এবং বিদেশেও। আমরা জানি, শিক্ষার মাধ্যমেই ইহা করা সম্ভব। কিন্তু সে শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা এখনো নিশ্চিতরূপে আমরা স্থির করিতেই পারিলাম না। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই যে যুব-উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে, তাহার কারণনির্ণয় ও প্রতিকারের জন্য বহু মনীষী আজ চিন্তা করিতেছেন। ইহার কারণ যে মানসিক অশান্তি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই কাহারও নাই—সে অশান্তি দারিদ্র্য বা সম্পদের আতিশয্য, অবসরের অভাব বা আতিশয্য, মাতাপিতার অত্যধিক স্নেহ বা সে-স্নেহ হইতে বঞ্চিত হওয়া, ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠিত-হইবার আশাহীনতা, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির আদর্শহীন জীবন এবং সিনেমা সাহিত্য বিজ্ঞাপন প্রভৃতির মাধ্যমে অত্যধিক ভোগলালসার উদ্রেক, ভোগ- ও অধিকার-অসাম্য প্রভৃতি যাহা কিছু দ্বারাই সৃষ্ট হউক না কেন। মনের এই অশান্ত ভাব প্রতিকারের জন্য নানাবিধ শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবা হইতেছে—কিন্তু তাহার কোনটিই ইতিবাচক নয়—সরাসরি মনের উপর ক্রিয়া করিবার মতো নয়; আজীবন আঁকড়াইয়া থাকিবার মতো আনন্দময় শান্তিপ্রদ একটি অবলম্বন মনকে দেওয়ার কোন চিন্তাই সেগুলিতে নাই। সে ব্যবস্থা কেবল পড়া-শুনার মাধ্যমে হয় না, উহার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি আচরণের মাধ্যমে সংযম ও একাগ্রতা সাধনার অভ্যাসও প্রয়োজন। ইহাও ত্যাগেরই অভ্যাস। একমাত্র এই অভ্যাসই মানুষকে স্বার্থত্যাগী করার জন্য জীবনে একটি স্থায়ী শান্তির অবলম্বন দিতে সমর্থ।

ভারতের সনাতন শিক্ষাপদ্ধতিতে ইহার ব্যবস্থা ছিল। সে শিক্ষা শুধু ব্রহ্মচর্য-আশ্রম-গুলিতেই নয়, বিধিনিষেধ আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে সমগ্র জাতীয় জীবনেই অনুপ্রবিষ্ট ছিল। সে শিক্ষারই যুগোপযোগী ব্যাপক প্রবর্তন ছাড়া মানুষকে ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করার দ্বিতীয় কোন পথে তো দেখা যাইতেছে না। ত্যাগ ও সেবার ভাবের ব্যাপক জীবন-রূপায়ণ ছাড়া সমস্যাগুলির সমাধান অন্য অন্য আর কিছুতেই হইবে না। এ পথে একদিন আমাদের নামিতেই হইবে; যতশীঘ্র এ বিষয়ে আমাদের হুঁস হয় ততই মঙ্গল।

মা

শ্রীভিখারীশঙ্কর রায়চৌধুরী

জননী সারদামণি, ওগো আমার মা,
ব্যাকুল হ'য়ে ডাকছি কত শুনতে কি পাওনা ?
নামের নেশায় 'মা' 'মা' বলি,—অবুঝ শিশু তোর !
"মা আছে মোর" এই ভরসাই বুক ভরেছে মোর।
ত্যাগ তপস্যা নাই মা আমার, নাইকো পুণ্যবল,
তবু আমার লক্ষ্য শুধু তোমার চরণতল।
তপের বলে মাগো তোমার চরণ দুটি পাওয়া
বামন হ'য়ে নয় কি শুধু চাঁদের পানে ধাওয়া ?
পুলিশ যেমন আঁধার রাতে আলোর দ্যুতি ফেলে
নেয় সে চিনে সকল জনে, তার দেখা না মেলে ;
যদি কভু সে কখনো নিজের মুখের পানে—
ফেরায় আলো, তখন সবাই চেনে এবং জানে।
তেমনি তুমি হও মা উদয়, সদয় যদি হও,
নইলে তোমায় কঠিন পাওয়া, সহজ তুমি নও ;
শিশু যেমন হাতের মোয়া দেয় না যেজন চায়—
আপন খেয়ালমতো আবার কাউকে দিতে ধায়।
মনের কোণে তাই রেখেছি অহৈতুকী সাধ—
'শরৎ' হবার সাধ্য তো নাই, দীন আমি 'আমজাদ'॥

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

(১)

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
লাক্সা, বারাণসী
১১ই মে, ১৯২০

প্রিয় বশী (বশীশ্বর সেন),

তোমার ৮ই মে তারিখের চিঠিখানি পেয়েছি। ভাণ্ডারা সত্যিই বেশ ভালভাবে হয়েছে। কিন্তু এ তো তোমাদেরই সাহায্যে—লাটুমহারাজকে যারা ভালবাসতে এবং এখনো আন্তরিকভাবে ভালবাসো তাদেরই সাহায্যে সফল হয়েছে। পাঁচশোর বেশী সাধুকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করানো হয়েছে, প্রায় দু'শো ভক্তও প্রসাদ গ্রহণ করেছেন। পরে শতাধিক নরনারীর মতো উপযোগী আহার্য বিতরিত হয়েছে, আরো পঞ্চাশ জনের মতো অবশিষ্ট ছিল। পরদিন দরিদ্রনারায়ণ-সেবা। সহস্রাধিক দরিদ্রনারায়ণকে সমাদর করে খাওয়ানো হয়েছে। পরিতৃপ্তি নিয়ে ভোজন করার পর চলে যাবার সময় তারা সন্তোষ ও আনন্দ প্রকাশ ক'রে গেছে। ভোজনান্তে তাদের প্রত্যেককে দুটি ক'রে লাড্ডু ও দুটি ক'রে পয়সা দেওয়া হয়েছিল। সত্যিই, আনন্দদায়ক দৃশ্য। ভাণ্ডারার জন্য যা টাকা পাওয়া গিয়েছিল, তা থেকে আমাদের মিশনের বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা যেত। লাটু মহারাজের ভক্ত ও বন্ধুদের ভালবাসা ও উৎসাহ কি বিপুল! ভাণ্ডারাটির পূর্ণ সাফল্যের জন্য অর্থ বা দ্রব্য-সামগ্রীর কোন অভাব হয়নি।

শ্রীশ্রীমায়ের অসুখের জন্য আমরা অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন আছি। আমাদের বহুজনের মঙ্গলের জন্য তিনি যেন আরও কিছুকাল স্থূলদেহে অবস্থান করেন। আমি আগের চেয়ে অনেক বেশী অসুস্থ বোধ করছি—হয়তো ভাণ্ডারার ব্যাপারে অত্যধিক খাটুনি প্রভৃতির জন্যই এটা হয়েছে। গরমও ক্রমশঃ বাড়ছে—এ-ও আর এক কারণ হতে পারে। রবিবাবু তাঁর বক্তৃতায় স্বামীজীর ভাবই ব্যক্ত করেছেন ব'লে তোমার ভাল লেগেছে জেনে আমি খুশী হয়েছি। আমি বহু পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, ঠাকুরপরিবার সর্বান্তঃকরণে স্বামীজীকে গ্রহণ করেছেন। হ'তে পারে তাঁরা স্বামীজীর নাম উল্লেখ করেন না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? তাঁরা স্বামীজীকে গ্রহণ করেছেন—এতে কোন সন্দেহ নেই এবং আমরা তাতেই খুব খুশী। স্বামীজী নিজে কখনো নামযশের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করতেন না—লোকে তাঁর ভাব ঠিকমতো বুঝতে পারলেই আনন্দিত হতেন। ব্যক্তিত্বের কোন প্রশ্নই আসা উচিত নয়; তত্ত্বই হ'ল আসল কথা, তত্ত্বকে শ্রদ্ধা করতে হবে। তুমি একথা ভালভাবেই জান,

* ইংরেজী হইতে অনুদিত

তোমাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। বরদা চন্দ্রকে যে চিঠি লিখেছে তা থেকেই শুনেছি, শ্রীশ্রীমা একটু ভাল বোধ করছেন। শুনে খুব আনন্দ হল। ভগবানের কৃপায় তিনি আরোগ্যলাভ করুন। এখানে উভয় আশ্রমের সকলেই ভাল আছে।

আশা করি তুমি কুশলে আছ। সতত শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জেনো। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

তুরীয়ানন্দ

স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[প্রতিভা দেবীকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

অদ্বৈতাশ্রম, ১৮২/এ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
১৬ই চৈত্র (১৯২৬ খৃঃ)

কল্যাণীয়া মায়ী—

কয়েক দিন হইল তোমার পত্র পাইয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি। মধ্যে আমার আমাশা অসুখ হইয়া শরীরটা কিছু দুর্বল করিয়াছে, এখন সব সারিয়াছে, দুর্বলতা যায় নাই। সেইজন্য বেশি লিখিতে পারি না। মধ্যে খুকী মায়ীর এক পত্র পাইয়াছিলাম, তাকে আলাদা আর কিছু পত্র লিখিলাম না। তুমি যখন তাকে পত্র দেবে সব জানাইবে। বেলুড় মঠে রোজ ২ বেড়াইতে যাই। ৭।৮ দিন ধরিয়া মঠের সমস্ত সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীর সভা ও বক্তৃতা হইবে। অনেক দেশ হইতে সাধুদের আগমন হইয়াছে। মঠে এখন সকলের স্থান হয় না। তিনটা আলাদা বাড়ী অন্য লোকের নিকট মাসখানেকের জন্য লওয়া হইয়াছে; মঠের সব সাধুরা ভাল আছে। গতকল্য দুপুর বেলায় ও রাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীমান মুকুল ভাল হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। আন্তরিক ভালবাসা, শুভ ইচ্ছা তোমরা সকলে জানিবে ও কুশল সংবাদে সুখী করিবে। এখন কলিকাতায় অসুখবিসুখ বড় নাই, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টির জন্য সব কমিয়াছে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীসুবোধানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

বেলুড় মঠ
মঙ্গলবার, ৭ই ভাদ্র
(১৯২৬ খৃঃ)

কল্যাণীয়া মায়ী—

গতকল্য তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। সকলে শারীরিক ভাল আছ ও তোমার ভাই এম. এ. পাস হইয়াছে জানিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলাম। এখন সে কি করিবে বি. এল. পড়িবে, না কোনো কাজকর্ম করিবে ?

আমি দুই বেলা রুটি খাই, আলু ও মিষ্টি জিনিস খাই না, সেই জন্য ভালই আছি। আর এখন আমার কোন অসুখ টের পাওয়া যায় না। মেদিনীপুর, কন্‌টাই, ঘাটাল, তমলুক, এই সব জায়গায় খুব বন্যা হইয়াছে, বেলুড় মঠ থেকে অনেক লোক সেই সব দেশে লোকেদের সাহায্য করিবার জন্য গিয়াছে ; আজকে ২০ মণ চিড়া ও গুড় পাঠান হইবে। সেখানকার লোকেরা ছেলেপুলে নিয়ে গাছের উপর, চালের উপর বসিয়া আছে শুনিলাম। সে দেশে ধান চাল সমস্ত জলে ডুবিয়াছে ও ভাসিয়া গিয়াছে। আরো শুনিলাম বন্যার জল ১৫।১৬ দিন থাকিবে বলিয়া সম্ভাবনা। কন্‌টায়ে এখান থেকে আরো লোক যাবে, ছোট ছোট নৌকা কিনে নিয়ে যাবে।

মায়ী, তুমি আজকাল শারীরিক কেমন আছ ? আজকাল গঙ্গার জল জোয়ারের সময় এত বাড়ে, সমস্ত সিঁড়ি ডুবে মঠের উপরে জল আসে ; বেশিক্ষণ থাকে না।

তোমরা সকলে আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভ ইচ্ছা জানিবে। তোমার দিদি ও খুকি মায়ীদের জানাইবে। মধ্যে মধ্যে কুশল সংবাদে সুখী করিবে। এখানকার সকলে ভাল আছেন। সকলে তাঁদের শুভাশীর্বাদ জানিবে।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের সুবোধানন্দ

বন্যায় সকল লোকের দুঃখকষ্ট শুনিয়া মনে খুব কষ্ট ও দুঃখ হইয়াছে ; তারপর মনে হইল ভগবান যাকে রক্ষা করেন সেই থাকে, তাঁর লীলা তিনি জানেন। ছেলেমেয়ে চেনাশুনা সকলকে আমার ভালবাসা শুভ ইচ্ছাদি জানাইবে। আমি আজকাল শারীরিক খুব ভালই বোধ করিতেছি।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

আমাদের মা

ব্রহ্মচারী কৃপাচৈতন্য

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর দৈব-জীবনগাথার প্রথম ও শেষ কথা, তিনি মা। বিশ্বমাতৃত্বের ভাবঘনমূর্তি তিনি। তিনি সতের মা, অসতের মা, ধনীর মা, নির্ধনের মা, পতিতের মা, অনাথ-কাঙালের মা।

তিনি স্বদেশের মা, বিদেশের মা। তিনি সর্বকালের সর্বজনের মা।

তিনি সতের মা, অসতের মা– জগজ্জননীর মাতৃস্নেহের কাছে সৎ-অসতের, সাধু-অসাধুর ভেদাভেদ নেই। তিনি বলেছিলেন, 'আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন আমার ছেলে, এই আমজাদও (ডাকাত) তেমন ছেলে।' বলেছিলেন যে, ছেলে যদি ধুলো কাদা মাখে তো মাকেই তা পরিষ্কার করে ছেলেকে কোলে তুলে নিতে হয়। তিনি মা, তাই ছেলের অন্তরের দুঃখ বুঝে, অভাব বুঝে, তা স্নেহসুধা দিয়ে মুছিয়ে দিতেন।

তিনি ধনীর মা, নির্ধনের মা—মা ভালবেসেছিলেন ধনীকে, কিন্তু তা ধনের জন্য নয়। তিনি দেখেছিলেন ধনীর ধনাকাঙ্ক্ষায় তৃপ্তি নেই। তাঁর কাছে যেসব ধনীরা আসত তারা চাইত এমন কিছু যা এ-জগতের ধন নয়, এ-জগতের দেনা-পাওনায় বিষাক্ত নয়। মা তাই এই সব ধনীর জীবন স্বর্গীয় স্নেহ-সুষমা দিয়ে ভ'রে তুলতেন। তার ফলে ধনীর জীবনে আসত পরিবর্তন। অন্তরে বইত মাতৃস্নেহের ফল্গুধারা। আর নির্ধনের তো কথাই নেই! মা তাদের পার্থিব কোন সম্পদ হয়তো দেননি, কিন্তু তার বদলে দিয়েছিলেন এমন কিছু, যা পার্থিব ধনের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে, যার ক্ষয় নেই, যা তাদের ইহকালে ছায়ার মতই সঙ্গে থাকত।

তিনি পতিতের মা, অনাথ কাঙালের মা—মা ভালবেসে সকলকে কাছে টেনেছিলেন। ভালবাসা দিয়েই সকলকে এনেছিলেন দেহাতীত চেতনায়। মা যেন পতিতপাবনী গঙ্গা—স্নিগ্ধা পাপহারিণী গঙ্গার মতোই মা সকলের পাপ-তাপকে ধুয়ে-মুছে আপন-অঙ্কে স্থাপন করেছিলেন সকলকে। এ-জগতের গোলকধাঁধায় পড়ে জীবন হয় ক্ষতবিক্ষত। কে দেয় এখানে শান্তি-সুধা? শাস্ত্রজালে জীবন-রহস্যের সমাধান সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব হয় না। বরঞ্চ বিভ্রান্ত হ'য়ে সে কখনও কখনও শোনে তোমার কৃত দুষ্কর্মের জন্য তুমি নরকগামী হবে। এ-হেন পরিস্থিতিতে সে যদি শোনে অভয়বাণী, 'বাছা, তুমি আমার ছেলে, আমি তোমাদের পাতানো মা নই, সত্যিকারের মা।' 'বিধির সাধ্য নাই আমার ছেলেকে রসাতলে পাঠায়!' তখন সে কি আর বিভ্রান্ত হয় কখনো? ভুলতে কি পারে যে, সে অমৃতের সন্তান? তখন সে বোঝে আমাদের এই মা, অমৃতদায়িনী। সে বোঝে বিশ্বের দুঃখমোচনের জন্যই মায়ের আবির্ভাব—তিনি কল্যাণময়ী জগজ্জননী।

তিনি স্বদেশের মা, বিদেশের মা—এই বিশ্বমাতৃত্ব কখনও দেশকালের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে না। তাই দেখি মা ভালবেসেছিলেন পাশ্চাত্যের নরনারীকে, যেমন ভালবেসেছিলেন প্রাচ্যের নরনারীকে। সাত-সমুদ্র তের-নদীর পারের লোকেরা এই মাতৃসুধার টানে তাঁর

কাছে সমস্ত বাধা ঠেলে এগিয়ে আসতেন। তাঁদের আচরণ, তাঁদের ভাষা, তাঁদের রুচি সবকিছুই যেন হার মানত এই বিশ্বপ্রসারিত মাতৃস্নেহের কাছে। সেখানে চলত অন্তরের ভাষার সংলাপ, যার কাছে লৌকিক ভাষার মূল্য অতি সামান্য। মা নিজ ঐশী শক্তিতে বুঝতে পেরেছিলেন, যে-যুগপ্রয়োজনে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব, তাতে তাঁকেই পূর্ণতা সম্পাদন করতে হবে। আর বিশ্বের সকল দুর্জয় শক্তি, অজ্ঞানের বিভীষিকা হয় মাতৃস্নেহের কাছে পরাভূত। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই মাকে একদিন বলেছিলেন যে, দায় কি শুধু তাঁর একার? মাকেও শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাঁর বিশ্বপ্লাবনী মাতৃস্নেহ-গঙ্গায় আচণ্ডাল উদ্ধার হ'য়ে যাবে—তাই তো এবার ঠাকুরের মাতৃভাব-প্রচার। ঠাকুর আর একদিন ভাবে দেখেছিলেন, যেন দূর দূরান্তের লোক, বিচিত্র তাদের ভাষা—তিনি যেন তাদের মধ্যে বিরাজ করছেন।

এইরকম যে বিশ্বমাতৃত্ব-মূর্তি—তা তো সাধারণ মানুষের মন-বুদ্ধিতে সহজে ধরা পড়ে না। কিন্তু ভক্তজন মাকে দেখেছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে। তাঁরা দেখেছেন মাকে জ্ঞানদায়িনীরূপে। তিনি যেন ছিলেন তাঁদের জীবনের এক আলোক-বর্তিকার মতো। যখনই তাঁদের জীবনে আসত কোন সমস্যা, তখনই তাঁরা ছুটে যেতেন মায়ের কাছে। মা স্নেহকরুণ হস্তে মোছাতেন তাঁদের সন্তাপিত হৃদয়ভার, দীক্ষিত করতেন ইষ্টমন্ত্রে। কোন-রকম ভেদাভেদ না রেখে, জাতি-কুল-মান ইত্যাদির কথা না জেনেই মা তাদের দিতেন ইষ্টমন্ত্র। শুধু কি তাই, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সুষ্ঠু পরিচালনে ও যথার্থ ভাবরূপায়ণে শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে তাঁরই স্থানে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। বিশ্ববরেণ্য স্বামীজীও মায়ের কাছে চাইতেন সঙ্ঘপরিচালনার অনুপ্রেরণা। তাঁর সিদ্ধান্তে স্বামীজী হ'তেন অনুপ্রাণিত। যে-কাজ মা অনুমোদন করতেন না, তা স্বামীজীও নতমস্তকে স্বীকার করতেন।

কি অসীম দৈবী ক্ষমতা নিয়ে ধরাতলে এসে অথচ মাতৃত্বের আবরণে সম্পূর্ণরূপে তা গোপন রেখে মা ঠাকুরের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন, তা মানুষ সহজে ধরতে পারত না। এখানে যেন মনে হয় মায়ের জীবনের বিভিন্ন ভাবের এক আলোছায়ার খেলা চলত। মা যখন স্বয়ং নিজের স্বরূপ প্রকটিত করতেন, তখনই মানুষ বুঝতে পারত এই দৈবী লীলার মাহাত্ম্য। গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জুন বিশ্বাস করেছিলেন তাঁর অবতারত্ব—'স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে।' মা-ও কখনও কখনও উদ্ঘাটিত করেছেন তাঁর আপন স্বরূপ। যেমন বাল্যকালে তিনি যখন সাধারণ মানুষের মতো গরুর জন্য দলঘাস কাটতে নামতেন একগলা জলে, তখন তিনি দেখেছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে বলেওছিলেন যে, একটি বালিকা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে সেই সময় কাজে সহায়তা করত। কোথা থেকে আসত কোথায় মিলিয়ে যেত আবার। কামার-পুকুরে থাকাকালীন স্নান করতে যাবার সময় আটজন তাঁর সমবয়সী মেয়ে আবির্ভূত হয়ে তার সঙ্গে গিয়ে, স্নান করে, তাঁকে আবার পৌঁছে দিয়ে অন্তর্হিত হত। পরবর্তীকালেও চকিতে মানুষ দেখতে পেত তাঁর আত্ম স্বরূপে অধিষ্ঠান। একবার জয়রামবাটীতে অবস্থানকালে এক অতিমানবীয়ভাবে মা হয়ে অট্টহাস্য করতে থাকেন, সে-হাসি মায়ের মতো কোমলপ্রাণা ও লজ্জাশীলা নারীর পক্ষে

অসম্ভব। ভক্তগণ সেই সময় হঠাৎ তাঁর মধ্যে দেখতে পান যেন এক অদ্ভুত দৈব আবেশ। আবার তিনি দু'বার শিবুদার কাছে স্বীকার করেছিলেন, তিনি 'কালী'। কিন্তু বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ভক্তের কাছে তিনি ধরা দিয়েছিলেন আর এক ভাবে। ভক্ত বলেন, "অনেকেই তো মাকে জগদম্বা বলেন, কিন্তু কার কত বিশ্বাস তা ঠাকুরই জানেন। অবিশ্বাসী আমাদের মুখে এই কথা যেন নিতান্ত মুখস্থ করার মতো শুনায়। মা যে সাক্ষাৎ ভগবতী, একথা মা যদি নিজে দয়া করে বুঝিয়ে না দেন, তা হলে আমাদের সাধ্য কি বুঝি! তবে মায়ের ঈশ্বরত্ব এইখানেই যে, মায়ের ভিতর আদৌ অহঙ্কার নেই। জীবমাত্রই অহং-ভরা। এই যে হাজার হাজার লোক মায়ের পায়ের কাছে 'তুমি লক্ষ্মী, তুমি জগদম্বা' বলে লুটিয়ে পড়ছে, মানুষ হলে মা অহঙ্কারে ফেঁপে ফুলে উঠতেন। অত মান হজম করা কি মানুষের শক্তি!" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা)

সুপ্রসন্ন হাসিতে মায়ের মুখে ফুটে ওঠে দৈব-ভাবের ইঙ্গিত!

এই যে সুষমা ও পবিত্রতা ও দেবত্বময় মায়ের জীবন, মায়ের মানবভাবের আড়ালে তা প্রায় আচ্ছাদিতই থাকত। মা স্বেচ্ছায় যেন মায়া স্বীকার করে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধারাণীকে অবলম্বন করেই এই মায়ার আবরণ দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছিলেন। সংসারের অন্য সকলের মতোই মা সুখে-দুঃখে দিন কাটিয়েছেন, আত্মীয়-শোকে বিভোর হয়েছেন 'বাগ্দী বৌ-'এর পুত্রশোকে বিহ্বল হয়ে তার সঙ্গে গলা ছেড়ে কেঁদেছেন! এই সব দেখে সাধারণ মানুষ একদিকে যেমন বিভ্রান্ত হয়েছে আবার অন্যদিকে অসাধারণ মানুষের কাছে তিনি ধরাও পড়ে গেছেন। স্বামী প্রেমানন্দ বলেছেন, "শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? ঐশ্বর্যের লেশ নাই। ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল; কিন্তু মার—তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত! এ কি মহাশক্তি! জয় মা! জয় মা!! জয় শক্তিময়ী মা!!! যে বিষ নিজেরা হজম করতে পাচ্ছিনে, সব মায়ের নিকট চালান দিচ্ছি। মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি—অপার করুণা! জয় মা!"

স্বামী প্রেমানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসিগণ মায়ের এই অদ্ভুত করুণারূপিণী মূর্তি দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। মাকে দেখা গেছে সাধারণ মানুষ যেমন সংসার করে, সেরূপ আত্মীয়-স্বজন-পরিবৃত অবস্থায়। তাঁকে ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন চিন্তাধারার ও সংস্কারের মানুষ। আছে রাধারাণী ও তার পাগলী-মা, শুচিবাইগ্রস্তা নলিনী। মাকে করছে তারা সর্বদা নিজ নিজ আচরণে জর্জরিত, কিন্তু মা আপন পবিত্রতার মহিমায় মহিমান্বিতা হয়ে এসব জাগতিক ভাবের উর্ধ্বে অতি সহজেই নিজেকে তুলে রাখতেন। আত্মীয়-অনাত্মীয় কারো দোষ তিনি দেখতেন না। বলেছিলেন—যদি শান্তি চাও কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার ক'রে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।

এইরকম যে মাতৃশক্তি, তাতে কি কখনো কোন অপবিত্রতা বা সাংসারিক মালিন্যের স্পর্শ-দোষ লাগে? সেইজন্য দেখা যায়, তিনি যখন শিষ্য নির্বাচন করতেন তখন থাকতো না কোন স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ও উচ্চনীচের ভেদাভেদ। যে যেখান থেকে আসতো, যে-কোন ভাবের লোকই হোক না সে, ব্যাকুলতা থাকলে ও শরণাগত হলে মা তাকে মন্ত্রদীক্ষা দিতেন। দেখা গেছে, সাধারণের চক্ষে যে হেয়, যার এত

পাপ যে, সে তার নিজের মুখে বলতে পারছে না, মা তাকে আপন শ্রীহস্তে আবেষ্টন করে ধরেছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন, সেই হতভাগ্য মানুষ মায়ের কাছে পেয়েছে তার সব যন্ত্রণা-অবসানের উপায়, দেখেছে মা যথার্থই দেবী, যিনি অতি সহজেই পাপতাপ থেকে মুক্ত করতে পারেন। আবার দেখা গেছে, সামান্য মজুর কী এক দৈবপ্রেরণায় মায়ের কাছে এসেছে মা তাকে যাত্রাপথে স্টেশনে দাঁড়িয়েই দীক্ষা দিয়েছেন। আবার রোগ-যাতনায় কাতর ব্যক্তিকে মা তার দেহ-যাতনা শ্রীহস্ত-প্রলেপে আরোগ্য করেছেন। যে যেভাবে এসে মায়ের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছে, মা তাকে তার অভাব বুঝে তাই দিয়েছেন, সেও তা লাভ করে তৃপ্ত হয়েছে, ধন্য হয়েছে।

মাকে আমরা কখনো দেখেছি লজ্জাশীলা বধূরূপে, তাঁকে দেখেছি নিষ্ঠাবতী গৃহিণীরূপে, দেখেছি এক বিশ্বপ্রসারিত মাতৃস্নেহের আধাররূপে,—ভক্তের দুঃখমোচনে—কখনো জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীরূপে—কখনো নিজভাবে আরূঢ়া মহাশক্তি কালিকারূপে—কখনো বা অযাচিতভাবে কৃপা করেছেন গুরুরূপে, কখনো বা দৈবাবেশে অভিভূতা দেবীরূপে, কখনো বা সাধারণ মানুষের কাছে লজ্জাপটাবৃতা মানবীরূপে।

কিন্তু সবার উপরে তিনি মা। যুগ-প্রয়োজনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আবির্ভূতা মহাশক্তি—পবিত্রতার মহিমায় উজ্জ্বল। স্নেহ-সুধাবিতরণী মা যেন পবিত্রতা, শান্তি, আনন্দ ও করুণার স্নিগ্ধ বিগলিত রূপ, একটি প্রবাহিণী,—যা সুরধুনীর মতোই দুষ্কৃতকারী মানুষের পাপতাপ ধুয়ে মুছে নেবার জন্য, তাপিতের তাপহরণের জন্য, ভক্তহৃদয়কে প্রেম ও শান্তির নীরে ভরিয়ে দেবার জন্য মনবুদ্ধির অতীত ভাবাতীত এক প্রদেশ থেকে নিঃসৃতা হয়ে ভাবজগৎ ও স্থূলজগতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিতা হয়েছে:

"প্রভুসঙ্গে এইবার, জগমাতা অবতার,
সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী।
কৃপাময়ী কলেবরে করুণার ধারা ঝরে,
শান্তিমূর্তি মঙ্গলরূপিণী॥"

—(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি)

কৌমারভৃত্য জীবক*

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী সুব্রানন্দ

অনেকের মতে আয়ুর্বেদ বেদের অংশ অর্থাৎ অথর্ববেদের অন্তর্গত। চরণব্যূহমতে ইহা ঋগ্বেদের এবং শস্ত্রশাস্ত্র অথর্ববেদের উপবেদ। প্রজাপতি এই শাস্ত্র সংগ্রহ করে সূর্যকে প্রদান করেন। সূর্য আবার তা ধন্বন্তরি প্রভৃতি ১৬ জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। তাঁরা ১৬টি গ্রন্থে এই আয়ুর্বেদ লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তী আচার্যগণ এই জ্ঞানসিন্ধুকে ৮ ভাগে বিভক্ত করেন। তার মধ্যে কৌমারভৃত্য একটি এবং বাকী ৭টি হ'ল শল্য, শালক্য, কায়চিকিৎসা, ভূত-বিদ্যা, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজিকরণতন্ত্র। এজন্য ইহা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ নামে প্রচলিত। আয়ুর্বেদ (অন্যমতে অথর্ববেদ পর্যন্ত) বেদের অন্তর্গত বলে অনেকে আবার স্বীকার করেন না, তবুও ইহা যে উপনিষদের যুগের বা প্রাগ্-বৌদ্ধযুগের, এ সম্বন্ধে কারো দ্বিমত নেই। কারণ শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থপ্রণেতা চরক ও সুশ্রুত ঋষি ছিলেন

ভগবান বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় (খ্রীঃ পূঃ ৫৬৩-৪৮৩ অব্দ) মগধের সিংহাসনে হর্যঙ্কবংশাবতংস তেজস্বী রাজা অজাতশত্রু অধিষ্ঠিত। তাঁর পিতা বিখ্যাত বিম্বিসারের আমল থেকে রাজবৈদ্য ছিলেন 'কৌমারভৃত্য জীবক' কবিরাজী চিকিৎসায় তিনি ছিলেন এত উন্নত প্রণালীর চিকিৎসা সে কালে আর কেহ করতে পারতেন কিনা জানা নেই। দেশ-বিদেশ থেকে দীর্ঘস্থায়ী দুরারোগ্য রোগ নিয়ে সঙ্গতি-সম্পন্ন রোগীরা আসতেন এঁর কাছে রোগাপনয়নের আশায়। কৌমারভৃত্য-জীবকের স্থান চিকিৎসা-জগতে অতি উচ্চে সত্যি, কিন্তু তাঁকে উচ্চ সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে একথা বলা যায় না যে, তাঁর নামানুযায়ীই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের এক অঙ্গ কৌমারভৃত্য হয়েছে। যেহেতু তিনি হ'লেন বৌদ্ধযুগের মানুষ এবং আয়ুর্বেদের অষ্টাঙ্গ হয়েছে "পরবর্তী বৈদিক যুগে"। আবার বৈদ্যরাজ জীবকের চিকিৎসার পারদর্শিতার জন্যে আয়ুর্বেদের অংশবিশেষের নামানুযায়ী তাঁর নাম রাখা হয়েছে, তাও ঠিক নয়। কারণ ঐ নামকরণ হয়েছে তাঁর শিশু-অবস্থায়—বিখ্যাত কবিরাজ হবার পরে নয়। তাঁর পালক-পিতা রাজকুমার অভয়ও আয়ুর্বেদবিদ্ ছিলেন না, কাজেই তিনি যে শাস্ত্রপ্রীতি থেকে তাঁর নামকরণ করেছেন, তাও নয়। অন্যদিকে দেখছি একটি ঔষধের নাম আছে জীবক। তাও এটি তাঁর গুণগ্রাহিতার বা কৃতিত্বের পরিচায়ক হতে পারে - যদি না ঔষধটি প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগে আবিষ্কৃত হয়ে থাকে।

ঐতিহাসিক ফা-হিয়ান্, হিউ-এন-চাঙ এবং অন্যান্য ইউরোপীয়ানদের লেখনীমুখে আমরা বৌদ্ধযুগের ভারতের সাধনা, সংস্কৃতি, বৈভব ও বিদ্যাবত্তার অনেক অধ্যায় জানতে পারি, কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু

* রাজগৃহদর্পণ, বুদ্ধের জীবন ও বাণী, রাজগৃহ ও নালন্দা, বঙ্গীয় শব্দকোশ, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

জানতে পারি না ; তবে বৌদ্ধ শাস্ত্রাদিতে কতকটা বিবরণ পাওয়া যায়

ভারতে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহে ষোড়শ মহাজনপদের আর অস্তিত্ব ছিল না। তখন আসমুদ্রহিমাচলে চারজন রাজার ছিল দুর্ধর্ষ প্রতাপ ; মগধরাজ, কোশল-রাজ, অবন্তীরাজ এবং বৎসরাজ। তাঁদের রাজধানীর মধ্যে কোথায় রাজগৃহ (মগধ) আর কোথায় উজ্জয়িনী (অবন্তী)! ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে দুটি নগর। বর্তমান যুগ নয় যে, জেট প্লেনে দু'চার ঘণ্টায় যাতায়াত করা সম্ভব। সে ছিল বৌদ্ধযুগ ; সে যুগে হাতি ঘোড়া ছাড়া যানবাহন বড় একটা ছিল না। তবু সুদূর উজ্জয়িনী পর্যন্ত রাজগৃহের রাজবৈদ্য কৌমারভৃত্য জীবকের সুযশ ছড়িয়ে পড়েছিল।

উজ্জয়িনীতে রাজা প্রদ্যোত পাণ্ডু-রোগাক্রান্ত। প্রতাপশালী রাজা অখ্যাত-বিখ্যাত বহু চিকিৎসকের দ্বারা বহুদিন যাবৎ আরোগ্যলাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। অবশেষে বৈদ্যশ্রেষ্ঠ জীবকের দ্বারস্থ হ'লেন রাজগৃহে। জীবক এসে রোগীকে পরীক্ষা করে ঔষধের বিধান দিলেন—ঘৃত-প্রস্তুত ঔষধ একমাত্রা পান করলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। এখানেই বাধল যত গণ্ডগোল। রাজা ঘি খেতে অস্বীকার করলেন। এর প্রতি ছিল তাঁর ভয়ানক বিদ্বেষ ; কারণ ঐ জিনিসটাকে তাঁর শরীর কখনও সহজে গ্রহণ করত না। ঘি ছাড়া আপনি আমাকে যা দেবেন তাই খাব—বললেন রাজা। ঘি খেলেই আমার একটা থেকে ১০টা রোগ হয়। কৌমারভৃত্য বললেন - ঘৃতে প্রস্তুত ঔষধ ছাড়া অন্য কিছুতেই আপনার রোগের উপশম হবে না। আর ঘৃতকে আমি এমনভাবে তৈরি করে দেব যে, এর বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ সবই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। কাজেই তাতে আপনার আপত্তি থাকার কথা নয়। অগত্যা রাজা রাজী হ'লেন। ঔষধে ঘিয়ের কোন চিহ্ন রইল না। তবুও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন কৌমারভৃত্য চিন্তা করলেন, যদি মনোবিকারগ্রস্ত তেজস্বী রাজার কষায়-রূপী ঔষধ খেয়ে ঘৃতভোজনেরই ন্যায় ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাহলে ক্রোধান্বিত হয়ে অনতি-বিলম্বে আমাকে শাস্তি দিতে পারেন। কাজেই তাঁর হাত থেকে রেহাই পাবার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজাকে বললেন—এ ঔষধ খাওয়াবার পর যদি প্রয়োজন মনে করি, তাহলে তৎক্ষণাৎ অন্য একটি ঔষধ এনে খাওয়াতে হবে। আপনি অশ্বশালার সবচেয়ে দ্রুতগামী অশ্বটি আমার জন্য প্রস্তুত রাখতে সহিসকে আদেশ দিন। তাই হ'ল। সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী অশ্ব ভদ্রবতিকা বৈদ্যের জন্য তৈরী থাকল। এর গতি ছিল দিনে ৫০ যোজন।

রাজা ঔষধ পান করার পরই বিজ্ঞ কবিরাজ ভদ্রবতিকায় চড়ে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এদিকে তাঁর অনুমানও সত্যে পরিণত হ'ল। ঔষধ পান করা মাত্র মানসিক প্রতিক্রিয়ায় রাজা প্রদ্যোত অস্থির হ'য়ে উঠলেন। ঘি খেলে যেমন হ'ত, তাঁর সমস্ত দেহে সেরূপ প্রতিক্রিয়াই দেখা দিল। তিনি আদেশ দিলেন—ডাক বৈদ্যকে, তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। ভৃত্য জানালে—তিনি তো ঘোড়ায় চড়ে উধাও ; আর তো পাওয়া যাবে না তাঁকে। একথা শুনে রাজার ক্রোধ চতুর্গুণ বেড়ে গেল। তিনি কাক নামক অশ্বচালককে আদেশ করলেন—যেখানে পাবে ঐ দুষ্ট বৈদ্যকে ধরে নিয়ে আসতে হবে। সে আমাকে প্রতারণা করেছে। তাকে আরো নির্দেশ দিলেন যে, বৈদ্যের দেওয়া কোন

খাবার তুমি কখনও গ্রহণ করবে না। কাক দিনে ৬০ যোজন অশ্বচালনা করতে পারত!

এদিকে সুদূর কৌশাম্বীনদীতীরে বসে কৌমারভৃত্য বিশ্রাম করছেন, এমন সময় কাক গিয়ে সেখানে উপস্থিত। বৈদ্য পূর্বেই কৌশলে নিজের একটি নখে ঔষধ লাগিয়ে নিশ্চিন্তে আমলকী খাচ্ছেন। ক্লান্ত কাক পিপাসিত হ'য়ে সেখানে উপস্থিত হ'তেই তিনি বললেন আসুন আমলকী খান; ক্লান্তি দূর হবে। বলেই নখলগ্ন ঔষধ-মিশ্রিত একটি আকলকী তার সম্মুখে ধরে দিলেন। কাক দেখলে বৈদ্য স্বয়ং খাচ্ছেন; কাজেই নির্দ্বিধায় সেও তা গ্রহণ করলে। আমলকী খেয়েই কাকের বমি ও উদ্গার আরম্ভ হ'ল। সে রাজার আদেশ পালন করবে কি—নিজের জীবন নিয়ে টানাটানি। প্রাণরক্ষার জন্যে বৈদ্যের নিকট সকরুণ আবেদন-নিবেদন করতে লাগল। জীবক তাকে আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন—আপনার এবং রাজার কারো জীবন-সংশয় তো নয়ই—কোন প্রকার ক্ষতি হবে না। এ শুধু সময়ক্ষেপের নিমিত্ত বিহিত ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হ'লেই দেখবেন আপনি এবং রাজা সম্পূর্ণ সুস্থ। ক্ষণিক বিশ্রামান্তে বললেন—যান এখন আপনি পূর্ববৎ নীরোগ। ফিরে যান, আমি পরে রাজার সহিত দেখা করছি। সত্যি, কাক উজ্জয়িনীতে ফিরে দেখলে রাজাও আরোগ্য লাভ করেছেন এবং নিরতিশয় আনন্দিত হয়ে কৌমারভৃত্য জীবকের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। জীবকও একদিন রাজসভায় উপস্থিত হ'লেন এবং প্রচুর ধন-দৌলত উপহারস্বরূপ গ্রহণ করে রাজগৃহে প্রত্যাগমন করলেন।

খ্রীঃ পূঃ ৫৪৩—৪৯১ অব্দে রাজা বিম্বিসার ছিলেন মগধের রাজা। তিনি ছিলেন বুদ্ধদেবের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। তাঁর জীবদ্দশায় তথাগত কয়েকবার রাজগৃহে আগমন করেন। গৃধ্রকূট পর্বত ছিল বুদ্ধদেবের একটি প্রিয় স্থান। তিনি যখন ঐ পর্বতে অবস্থান করতেন, তখন রাজা প্রায়ই তাঁর দর্শনলাভ করতেন ও উপদেশ গ্রহণ করতেন। এজন্য গভীর পাহাড়-জঙ্গল কেটে বহু আয়াসে একটি রাস্তা তৈরি করেন—মসৃণ প্রস্তরে আবৃত। ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ৬ লী (প্রায় ৪ মাইল) এবং প্রস্থ ১০ পা। সস্ত্রীক বিম্বিসারকে তথাগত করুণার চক্ষে দেখতেন। রাণী একবার দৈববাণী শুনেছিলেন—যদি তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণ করে তা'হলে রাজার মৃত্যু হবে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রাণীকে বুদ্ধদেব বর দেন, সন্তানের জন্মের পরও তাঁর পতি জীবিত থাকবেন। রাজার তখনই মৃত্যু হয়-নি, কিন্তু এই পুত্রের জন্য পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে অশেষ দুঃখ এসেছে। পুত্র অজাতশত্রু বড় হয়ে সিংহাসন অধিকার করে পিতাকে হাতকড়া দিয়ে কারাগারে আবদ্ধ করেন এবং মতান্তরে, প্রায় অনশনে রেখে সেখানে তাঁকে হত্যা করেন। তাছাড়া বুদ্ধদেব ও তাঁর মতবাদের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী।

কারারুদ্ধ অবস্থায় বিম্বিসার গুরু তথাগতের উদ্দেশ্যে গৃধ্রকূট পর্বতের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে অশ্রুবিসর্জন করতেন। পাথরের পুরু দেয়ালে ঘেরা ২০০ বর্গফুট বিস্তৃত বিম্বিসার-কারার ধ্বংসাবশেষ এখন সুরক্ষিত। লোহার হাতকড়াটি খননে আবিষ্কৃত হয়েছে—আছে নালান্দার মিউজিয়ামে।

সে যাই হোক, পিতার মৃত্যুর পর রাজা অজাতশত্রুর মনে স্বীয় কৃতকর্মের দরুন বেশ অনুতাপ হয় এবং ধর্মের দিকে মন যায়।

বুদ্ধদেবের দর্শন-মানসে তিনি বৈদ্য জীবকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সে সময় তথাগত আশ্রিত জীবকেরই আম্রবনে অবস্থান করছিলেন। যতদিন তিনি রাজগৃহে অবস্থান করতেন, জীবকেরই চিকিৎসাধীন থাকতেন। জীবক আগ্রহের সহিত যাবতীয় ব্যবস্থা ও হস্তিযূথ প্রস্তুত করলেন। রাজা সসাঙ্গোপাঙ্গ ৫০০ হস্তীর উপর আরোহণ করে রাণীদের নিয়ে রওনা হলেন। রাজার মনে কিন্তু দারুণ ভয়; যতই অগ্রসর হচ্ছেন ততই সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়ছেন। বলছেন হে সৌম্য জীবক, তুমি আমাকে মহাবিপদে নিয়ে ফেলছ না তো! আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে! জীবক বললেন—মহারাজ, আপনি বিশাল মগধের হর্তা-কর্তা-বিধাতা এবং আমার আশ্রয়দাতা। আমি আপনাকে বিপদে ফেলব? চলুন, কোন বিপদের আশঙ্কা তো নেই-ই বরং অশেষ কল্যাণ হবে আপনার। শেষপর্যন্ত সকলে কাননে উপস্থিত হলেন। কানন গৃধ্রকূট পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। ১২৫০ জন মহাভিক্ষুর অবস্থিতিতেও উদ্যানটি নীরব নিস্তব্ধ! মাত্র মৃদুমন্দ পবিত্র সমীরণপ্রবাহের মৃদু গুঞ্জন। অজাতশত্রু রোমাঞ্চিতকলেবর! বৈদ্য উৎসাহ দিলেন—মহারাজ, অগ্রসর হোন, নিশ্চিন্ত থাকুন—আশঙ্কার কিছু নেই। মহা পবিত্র হয়ে যাবেন—ধন্য হয়ে যাবে আপনার জীবন। তিনি মহাত্রাতা। আমাদের ত্রাণের জন্যই কৃপাপরবশ হয়ে এসেছেন এখানে।

এভাবে রাজবৈদ্য জীবক কেবল যে বহুজনের দেহরোগ নিরাময় করেছিলেন তা নয়—ভবরোগও দূর করতে সাহায্য করেছিলেন অজাতশত্রুর। এঁরই সহায়তায় রাজা জীব-দুঃখ-কাতর, ভক্তবৎসল ভগবান তথাগতের চরণাশ্রয় লাভ করে নির্ভয় হয়েছিলেন। এই রাজা অজাতশত্রুই আবার বহু স্তূপ, চৈত্য, গুহা, সঙ্ঘারাম প্রভৃতি তৈরি করেছিলেন। প্রথম বৌদ্ধ মহাসম্মেলন ...ত হয় তাঁরই নির্মিত গুহা সপ্তপর্ণীতে

জগদ্গুরু

শ্রীদুর্গাপদ বসু

তুমি প্রভু কল্পতরু
জগৎ-সংসারে,
পারের কাণ্ডারী তুমি
ভবপারাবারে।
কল্যাণে করুণা-সিন্ধু,
আশ্রিতজনের বন্ধু
তাই ডাকি, কর ত্রাণ
দীনেশ আমারে!

সুখে দুখে সর্বকালে
তোমারই চরণ
দ্বন্দ্বাতীত শান্তিলাভে
পরম শরণ।
যদি হৃদি-শতদলে
ও-মূরতি ঝলমলে
'আমি' হারাইয়া যাবে
'তুমি'র মাঝারে।

উপনিষদ্‌-যুগের সাধনা

শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে, বেদান্তবিনোদ

বর্তমান হিন্দুসমাজ যে-সকল ধর্মসাধনা-পদ্ধতির উত্তরাধিকারী হইয়াছে, সে সমুদয় যে কত সহস্র যুগযুগান্তের অভিজ্ঞতার ফল তাহা আমাদের কল্পনাতীত। তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করা দুঃসাধ্য, এবং তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আজ আমরা কেবলমাত্র উপনিষদ্‌-যুগের সাধনা-পদ্ধতির মোটামুটি একটি ধারণালাভের চেষ্টা করিব।

বর্তমান যুগে প্রচলিত মূর্তিপূজা এবং অবতার-উপাসনার প্রচারকর্তা মহামুনি বেদব্যাস; বেদোপনিষদ্‌-যুগের পরবর্তী পৌরাণিক যুগ হইতে আমরা ইহা পাইয়াছি। বৈদিক যুগ সর্বপ্রথমে কর্মপ্রধান ছিল। যাগ-যজ্ঞ-স্তোত্র-মন্ত্রাদির সাহায্যে ঐহিক অভীষ্টসিদ্ধিই সে সমুদয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমে ক্রমে মানবমনের প্রগতির ফলে, পারলৌকিক সুখের প্রতি যেমন যেমন তাহার দৃষ্টি প্রসারিত হইতে লাগিল, তেমনি তেমনি যাগযজ্ঞাদিও তদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তখন স্বর্গলোক প্রভৃতি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে জটিল হইতে জটিলতর, দীর্ঘকাল-অনুষ্ঠেয় এবং বহুব্যয়সাধ্য যজ্ঞাদির সৃষ্টি হইল।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে সাথে আর্য সাধকেরা যখন বুঝিতে পারিলেন যে, অনিত্য কর্ম দ্বারা কখনও নিত্য সুখ লাভ করা সম্ভব হয় না—অনিত্য কর্মের ফল যতই দীর্ঘকালস্থায়ী হউক না কেন, তাহার ক্ষয় আছেই, এবং সেই কর্মফলক্ষয় হইলে স্বর্গাদিলোক হইতে পুনরায় মর্ত্যলোকে অথবা তদপেক্ষা হীনতর লোকে প্রত্যাবর্তন অবশ্যম্ভাবী,—"ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ। নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি[১]॥"—তখন জ্ঞানবিরহিত কেবল কর্ম নিন্দিত হইল, এবং গোঁড়া যাজ্ঞিকদিগকে (fanatic ritual-mongers) মূঢ় অন্ধ বলিয়া নিন্দা করা হইল,—"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ[২]॥" অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়াও যাহারা আপনারাই আপনাদিগকে বিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া ভাবে, সেই সকল বক্রগতি মূঢ়গণ অন্ধ-পরিচালিত অন্ধের ন্যায় নানা লোকে ভ্রমণ করে, কখনও মোক্ষলাভে সক্ষম হয় না।

এইজন্য পরবর্তী যুগে, যজ্ঞাদির সহিত আধ্যাত্মিক জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য নানাবিধ উপাসনা-প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছিল। এই সকল উপাসনার লক্ষ্য ছিল অন্তর্বিশ্বের সহিত বহির্বিশ্বের সংযোগসাধন, এবং তদ্দ্বারা আত্মশক্তির ও আত্মজ্ঞানের প্রসার সাধন করিয়া সাধকের মনবুদ্ধিকে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপযোগী করা। সম্বর্গ-বিদ্যা,[৩] প্রাণোপাসনা,[৪] সম্পদুপাসনা,[৫]

১ মুণ্ডকোপনিষদ্‌ ১।২।১০

২ কঠোপনিষদ্‌ ১।২।৫

৩ ছান্দোগ্য উপ: ৪।৩

৪ বৃহদারণ্যক ৬।১ : ছান্দোগ্য ৫।১ : প্রশ্ন ২।৩

৫ বৃহদারণ্যক ৩।১।৬-১০

উদ্‌গীথোপাসনা,[৬] অশ্বমেধযজ্ঞাঙ্গোপাসনা[৭] প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত।

এই প্রকার কালক্রমে ধীরে ধীরে সাধনা-প্রণালী অধিকারিভেদে ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়াছিল :—(ক) **নিম্নাধিকারীদের** জন্য জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়,—"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে[৮] ॥" যাহারা বিদ্যা (দেবতা-চিন্তা) এবং অবিদ্যা (কর্মানুষ্ঠান) উভয়ই একত্র অনুষ্ঠান করে, তাহারা কর্মরূপ অবিদ্যা সাহায্যে মর্ত্যভাব অতিক্রম করিয়া দেবতা-চিন্তারূপ জ্ঞানানুষ্ঠানের ফলে অমৃত- (ক্রম-মুক্তি) লাভে সমর্থ হয়। (খ) **মধ্যমাধিকারীদের** জন্য—দহরোপাসনা,[৯] বৈশ্বানর-বিদ্যা[১০] ঈশ্বরে কর্মফলসমর্পণ[১১] প্রভৃতি সগুণ ব্রহ্মোপাসনা বিহিত হইয়াছিল। এবং **উত্তমাধিকারীদের** জন্য আত্মানুসন্ধান বা ব্রহ্মবিদ্যার বিধান দেওয়া হইয়াছিল। যথা—"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদ-মায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্[১২] ॥" জ্ঞানী কর্মফললভ্য লোক-সমূহের অনিত্য ফল অবধারণ করিয়া অনিত্য সুখে বৈরাগ্যবান্ হইবে; এবং সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণাপন্ন হইবে। "তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তং তত্ত্বতো ব্রহ্ম-বিদ্যাম্[১৩] ॥" তখন গুরু সেই উপসন্ন প্রশান্ত-চিত্ত এবং শমদমাদিগুণান্বিত শিষ্যকে যথা-বিধি অক্ষরব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিবেন।

বর্তমান যুগের তুলনায় তখনকার দিনে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সংখ্যা অধিক থাকিলেও যথেষ্ট বিরল[১৪] ছিল সন্দেহ নাই; এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যাপ্রার্থী ঋষিগণ বহু দূরদূরান্তর হইতে ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের নিকটে সমাগত হইতেন, এবং তাঁহারাও বহু ক্ষেত্রে যথেষ্টকাল গুরুগৃহে বাস, ব্রহ্মচর্যব্রতপালন ও গুরুসেবা দ্বারা মনবুদ্ধির পবিত্রতা-সম্পাদনান্তে ব্রহ্ম-বিদ্যার অধিকারী হইতে পারিতেন। সুকেশ; সত্যকাম, গার্গ্য, ভার্গব, কবন্ধী, প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদা-চার্য আশ্বলায়ন প্রভৃতি উত্তমাধিকারীদিগকেও বৎসরাবধিকাল গুরু পিপ্পলাদ-মুনির গৃহে বাস, ব্রহ্মচর্যপালন ও গুরুসেবাদি দ্বারা গুরূপদেশ-গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করিতে হইয়াছিল[১৫]; এমনকি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রকেও[১৬] শতাধিক-বর্ষকাল প্রজাপতির গৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য ও গুরুসেবা দ্বারা পরিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইতে হইয়াছিল। এই সমস্ত বিবরণ হইতে ব্রহ্মবিদ্যার মহত্ত্ব সহজেই অনুমেয় সেই সকল ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা ব্রহ্মো-পলব্ধির জন্য যে-সকল প্রণালীর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাহার আলোচনায় আসা যাক।

ব্রহ্ম কোথায়? এতদুত্তরে শ্রুতি বলেন—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্[১৭]।"—এই জগৎ-

৬ ছান্দোগ্য ১।১-৩
৭ বৃহদারণ্যক ১।১
৮ ঈশঃ উপঃ ১১
৯ ছান্দোগ্য ৮।১
১০ " ৫।১১-১৮
১১ শ্বেতাশ্বতর ৬।৪
১২ মুণ্ডক ১।২।১২
১৩ মুণ্ডক ১।২।১৩
১৪ কঠোপনিষদ্ ১।২.৭
১৫ প্রশ্ন : ১।১
১৬ ছান্দোগ্য ৮,৭-১২
১৭ " ৩।১৪।১

প্রপঞ্চ,—এই পরিদৃশ্যমান অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড, এ সমস্তই ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে। মহোর্মি, তরঙ্গ, বুদ্বুদ, ফেনা ইত্যাদি সবই যেমন সমুদ্রাতিরিক্ত আর কিছুই নহে,—সমুদ্র হইতেই তাহাদের উৎপত্তি, সমুদ্রেই স্থিতি এবং সমুদ্রেই তাহাদের লয় হয়, সেই প্রকার এই পরিদৃশ্যমান অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাধিষ্ঠানেই নামরূপের আকারে ভাসিয়া উঠিতেছে, ব্রহ্মাধিষ্ঠানেই তাহারা অবস্থিত আছে, এবং অন্তে ব্রহ্মবস্তুতেই তাহারা লয়প্রাপ্ত হইতেছে। যেমন বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রবারিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তরঙ্গাদির সৃষ্টি করে, সেইপ্রকার ব্রহ্মশক্তি (প্রাণ) প্রবহমানা (স্পন্দিত) হইবার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়,—"অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা[১৮]।" এইমাত্র তফাত যে বায়ুপ্রবাহ সমুদ্র-জলকেই বিকৃত করিয়া তরঙ্গাদিরূপে পরিবর্তিত করে, আর স্বীয় অধিষ্ঠান মরুভূমিকে অবিকৃত রাখিয়া তদুপরিস্থ স্পন্দনীভূত উত্তপ্ত বায়ুস্তর নিজেই বীচিবিক্ষুব্ধ জলাশয়বৎ প্রতীয়মান হওয়ার ন্যায়, ব্রহ্মশক্তি প্রাণ স্বীয় অধিষ্ঠান চৈতন্যকে অবিকৃত নির্বিকার রাখিয়া স্পন্দনফলে নিজেই জগৎ-প্রপঞ্চরূপে প্রতিভাসিত হন। উত্তাপের অবসান হইলে যখন মরুপরিস্থ বায়ুস্তরের স্পন্দন নিবৃত্তি ও শান্ততা প্রাপ্ত হয়, তখন যেমন মরীচিকা বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তদধিষ্ঠান মরুভূমিমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তেমনি প্রাণের স্পন্দন স্থিরীভূত হইলে পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ বিলয়প্রাপ্ত হয়, এবং তদধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্য ব্যতীত অন্য কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। ইহা যে আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় জগতেই তুল্যরূপে সত্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নির্বিকল্প সমাধির দৃষ্টান্তই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি যখন নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থান করিতেন, তখন তাঁহার প্রাণস্পন্দন সম্পূর্ণরূপে শান্ত থাকিত এবং জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান তাঁহার নির্বিশেষ জ্ঞানে বিলীন থাকিত, তখন তিনি কেবলমাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন ; পুনরায় প্রাণস্পন্দনের সাথে সাথে তিনি জগৎজ্ঞানের স্তরে নামিয়া আসিতেন। এই সর্বাধিষ্ঠান, সর্বানুপ্রবিষ্ট, সর্বব্যাপী সর্বাত্মাকে অন্তর্জগতের[১৯] মাধ্যমে অথবা বহির্জগতের,[২০] মাধ্যমে উপলব্ধি করিতে হইবে, 'নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে',[২১] এতদ্ব্যতীত মুক্তির দ্বিতীয় কোন পথ নাই,—ইহাই শ্রুতির অভ্রান্ত নির্দেশ।

এইপ্রকার উপনিষদের ঋষিগণ ব্রহ্মোপলব্ধির দুইটি পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন,—(ক) প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মাকে উপলব্ধি দ্বারা, এবং (খ) বহির্বিশ্বের অধিষ্ঠান চৈতন্য ব্রহ্মকে উপলব্ধি দ্বারা। এতন্মধ্যে প্রথম পথটি অপেক্ষাকৃত কঠিনতর, তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারবৎ দুর্গম,—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি,"[২২] ইহা ত্যাগী[২৩] ও যোগীর পথ, বান-

১৮ ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্ত, ৮

১৯ "একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।" কঠোপনিষদ্ ২।২।১২ :

২০ "একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে স এবাগ্নিঃ
সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা
বিদ্যতেঽয়নায়।" শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬।১৫

২১ স এব সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে।
—কৈবল্য উপঃ ৯

২২ কঠঃ উপঃ ১।৩।১৪

২৩ "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ," কৈবল্য উপঃ ২

দ্রষ্টা ও সন্ন্যাসী[২৪] ব্যতীত, বিষয়-কোলাহল-বিড়ম্বিতচিত্ত গৃহীর পক্ষে অগম্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। দ্বিতীয়টি কঠিন হইলেও অপেক্ষাকৃত সহজতর পথ, যাহা আগ্রহদীপ্ত গৃহস্থের চেষ্টা ও অভ্যাস দ্বারা অধিগম্য। এক্ষণে আমরা এতদুভয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(১) অন্তর্জগতের মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি দ্বারা

"অয়মাত্মাব্রহ্ম[২৫]।" অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যেরূপ জগৎপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, তেমনি তিনি জীব-চৈতন্যেরও অধিষ্ঠান ; তিনি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি সর্ব অবস্থাতেই স্বপ্রকাশ এবং তাঁহার আলোকেই জগৎপ্রপঞ্চ প্রকাশিত হয়, তিনিই আমার আত্মা বা ব্রহ্ম, ইহা উপলব্ধি করিয়া মোক্ষলাভ করিতে হইবে,—"জাগ্রৎস্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে। তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে[২৬]॥" সুতরাং জীব তাহার নিজের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিলে ব্রহ্মোপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। সাধনচতুষ্টয়[২৭] এই সাধনার প্রস্তর-ভিত্তি। এই মূলধন ব্যতীত আত্মোপলব্ধির পথে পদার্পণ করা আর মাটিতে দাঁড়াইয়া চন্দ্র স্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়ানো সমান। এই মূলধনে ধনবান সাধকের জন্য তিনটি প্রণালীর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে :—(ক) যোগমার্গে,—"অথ পরমাত্মা নাম যথাক্ষরমুপা-সনীয়ঃ স চ প্রাণায়ামপ্রত্যাহারসমাধিযোগানু-মানাধ্যাত্মচিন্তকং[২৮]॥" অর্থাৎ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে তিন প্রকারে,—(ক) যোগমার্গে (যাহা উপরে বলা হইয়াছে); (খ) অনুমান বা বিচার সাহায্যে, 'নেতি', 'নেতি' বিচারমুখে ; এবং (গ) অধ্যাত্মচিন্তা বা ব্রহ্মভাবনা সাহায্যে। ইহার মধ্যে যে-কোন একটি মার্গ সাহায্যে সাধক আত্মোপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন।

(ক) **যোগমার্গে :**—ক্ষুরিকোপনিষদে এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রুতিবহির্ভূত পাতঞ্জল যোগসূত্র, যাজ্ঞবল্ক্যযোগ সংহিতা প্রভৃতি অন্যান্য যোগসম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থে ইহার প্রণালী বিবৃত আছে।

(খ) **জ্ঞানমার্গে :**—মানব সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়াদিসমন্বিত দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্নই হইয়া থাকে। বিচারসাহায্যে কোষপঞ্চক পরিহার-পূর্বক আত্মজ্যোতির ধ্যানে তন্ময় হইতে হইবে। ইহাও অতীব দুরূহ মার্গ,—"দুঃসাধ্যঞ্চ দুরারাধ্যং দুষ্প্রেক্ষ্যঞ্চ দুরাশ্রয়ম্। দুর্লক্ষ্যং দুস্তরং ধ্যানং মুনীনাঞ্চ মনীষিণাম্[২৯]॥" ইহার প্রধান কথা, অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে হইলে সাধককে বহির্জগতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আবৃত্ত-চক্ষু হইয়া চিন্মাত্রসত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, "কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মান-মৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্[৩০]।" কি প্রকারে তাহা সাধ্য, তাহা যমরাজ রূপকের ভাষায় "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি" ইত্যাদি একাদশটি মন্ত্রে

২৪ "সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ" মুণ্ডক ৩।২।৬ "অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য" ইত্যাদি। কৈবল্য ৫

২৫ মাণ্ডুক্য ২

২৬ কৈবল্য উপঃ ১৭

২৭ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব ; ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা শারীরক ভাষ্যের প্রথম সূত্রভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

২৮ আত্মোপনিষদ্ ৩

২৯ তেজবিন্দু উপঃ ২

৩০ কঠঃ উপঃ ২।১।১

(কঠঃ ১।৩।৩-১৩) নচিকেতাকেও উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার শেষকথা হইল "যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেজ্‌ জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গকে মনে লীন করিবে, মনকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে কারণশরীরে[৩১] (ব্যষ্টি অস্মিতায়), এবং ব্যষ্টি অস্মিতা (বা জীব-চৈতন্যকে) শান্ত আত্মায় (সাক্ষিচৈতন্যে) লীন করিবে; ইহার মর্মার্থ এই যে 'নেতি' 'নেতি' বিচারসাহায্যে একে একে কোষপঞ্চক[৩২] পরিহারপূর্বক স্বীয় অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিবে এবং ধ্যানযোগে শান্ত আত্মাকে (নির্বিকার জ্যোতির্ময় আত্মচৈতন্যকে) উপলব্ধি করিবে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত ভৃগুবল্লীতে 'নেতি' মার্গের অন্যবিধ পদ্ধতিসাহায্যে ব্রহ্মোপলব্ধির বৃত্তান্ত বিবৃত আছে। তদ্ব্যতীত প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে তথা মাণ্ডুক্যোপনিষদে বর্ণিত প্রণবোপাসনাপদ্ধতিও জ্ঞানমার্গের সাধনা-পর্যায়ভুক্ত। যোগমার্গী ও জ্ঞানমার্গী সাধককে সর্বাবস্থাতেই সাক্ষীর উদাসীন দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। নচেৎ পথিমধ্যস্থ যোগমায়াগত বিভূতির আকর্ষণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়।

৩১ মহদাত্মা অর্থে আচার্য ভাষ্যকার মহত্তত্ত্ব (সমষ্টি অস্মিতা) বলিয়াছেন; এখানে আগাগোড়াই জীবাত্মার (রথীর) প্রসঙ্গ হইতেছে। জীব কি প্রকারে সমষ্টি অস্মিতাকে পরমাত্মাতে লীন করিবে? এই অর্থ লইলে পূর্বাপর সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। ভাষ্যান্তরে মহদাত্মা অর্থে জীব-চৈতন্য (কারণশরীর) গৃহীত হইয়াছে, তাহাই অধিকতর যুক্তিসহ বিবেচনায় এখানে দেওয়া হইয়াছে।

৩২ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ।

(গ) অহংগ্রহোপাসনা বা ব্রহ্ম-ভাবনা সাহায্যে :—তত্ত্বমসি[৩৩], "অহং ব্রহ্মাস্মি[৩৪]", এই সকল মহাবাক্যের স্মরণ, মনন নিদিধ্যাসন (ব্রহ্মের সহিত ঐক্যধ্যান) দ্বারা। প্রায় সমস্ত উপনিষদ্ শাস্ত্রই এই পথের উপদেশে পরিপূর্ণ, এবং তাহার বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নহে; সে-সকল উপদেশের সারমর্ম এই যে, বহির্বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া নিরাধার আত্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্যধ্যানে মগ্ন থাকিতে হইবে। ইহার শ্রুত্যুপদিষ্ট পদ্ধতি হইল, "ধনুর্গৃহীত্বৌ-পনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত। আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥ প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ[৩৫]॥" হে প্রিয়দর্শন! উপনিষদ্‌বেদ্য মহাস্ত্র গ্রহণ করিয়া (অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি', পূর্ণশ্রদ্ধার সহিত এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া) তাহাতে উপাসনা দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত শরসন্ধান কর; এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয়সমূহ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ব্রহ্মে তন্ময়চিত্ত হইয়া সেই অক্ষর পুরুষকে বিদ্ধ কর। প্রণব ধনু শর, এবং ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য অন্য প্রকার যথা,—"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণ-বঞ্চোত্তরারণিম্। ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ[৩৬]॥" যেরূপ নিম্ন অরণিকে উপরের অরণি কাষ্ঠদ্বারা মন্থন করিয়া সেই কাষ্ঠাভ্যন্তরস্থ নিগূঢ় অগ্নিকে পাইতে হয়, সেইরূপ মনকে নিম্নারণি এবং প্রণবকে উত্তরারণি কল্পনা করিয়া ধ্যানরূপ মথনের

৩৩ ছান্দোগ্য উপঃ ৬।৮-১৬
৩৪ বৃহদারণ্যক উপঃ ১।৪।১০
৩৫ মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।২।৩-৪
৩৬ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ১।১৪

সাহায্যে নিগূঢ় ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবে। নিদিধ্যাসন (ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার ঐক্য-ধ্যান) যত প্রগাঢ় ও সুতীব্র হইবে, আত্মোপলব্ধিও তত শীঘ্র ও সহজসাধ্য হইবে, একথা বেদান্তশাস্ত্র 'ভ্রমরকীটে'র উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়াছেন। একটি কাঁচপোকা যখন একটি আরশোলাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার নিজ আবাসে বন্দী করিয়া রাখে এবং সময়ে সময়ে আরশোলাটির গাত্রে হুল বিদ্ধ করিতে থাকে, তখন আরশোলাটি ভয়ে ব্রহ্মাণ্ডময় কেবল কাঁচপোকাই দেখিতে থাকে; এবং এই অবস্থায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেটি কাচ-পোকাতেই রূপান্তরিত (metamorphosed) হইয়া যায়। সেইরূপ নিরাধার জীবাত্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্যধ্যানের ফলে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়.—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥" "তং যথা যথা উপাসতে, ইতঃ প্রেত্য তথা তথা ভবতি॥"[৩৭]

(২) বহির্জগতের মাধ্যমে বিষয়ে ব্রহ্মদৃষ্টি সাধন দ্বারা

বাস্তবিক পক্ষে উপনিষদ্-যুগের সাধনার আরম্ভ এই বিষয়ে ব্রহ্মদৃষ্টি থেকে। স্বামীজী বলিয়াছেন, "আমরা জগদ্রূপে যা দেখছি, তা ঈশ্বরই প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন[৩৮]।" দেখিতেও পাওয়া যায় যে, সমস্ত উপনিষদ্গুলিই ব্রহ্মের সর্বাত্মকতাপ্রতিপাদক মন্ত্রে পরিপূর্ণ; পাঠকের ধারণাসৌকর্যার্থে নিম্নে সেইরূপ পাঁচটি মাত্র মন্ত্র উদ্ধৃত হইল।—"বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ[৩৯]॥" একই বায়ু যেপ্রকার সমস্ত বস্তুর ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সেই বস্তুর অনুরূপ আকৃতিমান্ হইয়াছে, সেইপ্রকার সর্বপ্রাণীর এবং সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক হইয়াও প্রত্যেক দেহানুসারে তদনুরূপ হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তথাপি তিনি অবিকৃত থাকিয়া প্রতিটি পদার্থের বহির্দেশেও ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। "এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ[৪০]॥" একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মাই সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত আছেন; তিনি এক এবং অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রবৎ অসংখ্য নামরূপের উপাধিহেতু বহু রূপে দৃষ্ট হন। "ব্রহ্মাদ্যং স্থাবরান্তঞ্চ পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ। তমেকমেব পশ্যন্তি পরিশুভ্রং বিভুং দ্বিজাঃ[৪১]॥" জ্ঞানচক্ষুষ্মান্ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মা হইতে স্থাবর প্রস্তরাদির মধ্যে পর্যন্ত এক অদ্বিতীয় জ্যোতির্ময় ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন "অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি[৪২]" ব্রহ্মকে সৃষ্টজগৎপ্রপঞ্চের যাবতীয় প্রাণী ও পদার্থের মধ্যে (immanent in all) সোপাধিকভাবে, তথা নিরুপাধিকতত্ত্বভাবে, উভয়ভাবেই উপলব্ধি করিতে হইবে; যিনি এইরূপ জগতের সর্বত্র এবং সর্বপদার্থে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারেন, অপরিণামী নির্গুণ ব্রহ্ম তাঁহার উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকেন। "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা

৩৭ শতপথ ব্রাহ্মণ ১০।৫।২।২০
৩৮ দেববাণী
৩৯ কঠোপনিষদ্ ২।২।১০
৪০ অমৃতবিন্দু উপনিষদ্ ১২
৪১ মন্ত্রিকোপনিষদ্ ১৬
৪২ কঠোপনিষদ্ ২।৩।১৩

ভবন্তি[৪৩]॥" জীব যদি ইহলোকে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে তাহা হইলে মঙ্গল; আর যদি তাহা না পারে তবে তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুচক্রে আবর্তিত হইয়া অশেষ কষ্ট পাইতে হইবে। জ্ঞানিগণ প্রত্যেক ভূতে একমাত্র ব্রহ্মভাব অবগত হইয়া (একমাত্র ব্রহ্মসত্তা সাক্ষাৎকার করিয়া) ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এইহেতু বর্তমান জীবনেই প্রতিটি প্রাণীতে এবং প্রতি পদার্থে ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে।

এক্ষণে এই সনাতন ব্রহ্মোপলব্ধির তথ্য আমরা বিশদরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। মানবমন নিয়ত বিষয়াহরণে ব্যস্ত থাকাতে মন অহর্নিশ বিষয়াকারেই তরঙ্গায়িত হইতেছে; তাহার ফলে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র যেরূপ চন্দ্রাকারে দৃষ্ট না হইয়া তরঙ্গাকারে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত আত্মা, আত্মারূপে পরিদৃষ্ট না হইয়া বিষয়াকারে প্রতিভাত হন। সেইজন্য শ্রুতির উপদেশ এই যে, তোমার চিরাভ্যস্ত বিষয়দৃষ্টিকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে। "বস্তন্তরপ্রত্যুপস্থাপিকা অবিদ্যা,"—ব্রহ্ম হইতে বিষয়ের পার্থক্যজ্ঞানই অবিদ্যা; এই অবিদ্যা এবং বিষয়বাসনাই আত্মজ্ঞানলাভের প্রবল অন্তরায় এইজন্য তুমি বিষয়ভোগ করিতে থাক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সাথে সাথে বিষয়ের অন্তর্নিহিত ব্রহ্মসত্তাদর্শনেও অভ্যস্ত হও; সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের অন্তর্নিহিত চৈতন্যসত্তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে অভ্যাস কর। প্রাণিজগতের, উদ্ভিদ্‌জগতের,[৪৪] তথা জড়জগতের[৪৫] অন্তরালে যে চৈতন্যসত্তা বিদ্যমান্—"চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নং এতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ[৪৬],"—তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপরায়ণ হইতে অভ্যাস কর; তাহা হইলে তুমি তোমার ভোগ্য বিষয়ের মাধ্যমেই সর্বব্যাপী আত্মার সহিত পরিচিত হইতে সমর্থ হইবে। অভ্যাসের দ্বারা তোমার দৃষ্টি ক্রমশঃ বিষয়-বস্তুকে দেখিবামাত্র যেমন যেমন তাহার অন্তর্নিহিত চৈতন্যসত্তায় চলিয়া যাইতে থাকিবে, তেমনি তেমনি তোমার চিত্ত সেই চৈতন্যসত্তাতেই তন্ময়তাপ্রাপ্ত হইতে থাকিবে। তখন বিষয়ের স্থূল বিষয়রূপ তোমার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়া, তাহার চৈতন্যময় সত্তাই তোমার চিত্তে স্ফূর্তি পাইতে থাকিবে; তোমার অন্তঃকরণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে একটা দিব্য জ্যোতিতে,—ভাস্বর ব্রহ্মদীপ্তিতে। এইভাবে বিষয়ের মধ্য দিয়া তুমি ব্রহ্মসংস্পর্শ অনুভব করিবে; তোমার চৈতন্য-দৃষ্টিকোণ-প্রসূত তন্ময়তা তোমাকে সমাধি-সুখ আনিয়া দিবে। তখন নামরূপাত্মক জগৎটাকে ঠিক ঠিক মিথ্যা-বোধ হইবে, একটা চৈতন্যঘন আকাশ তোমার দৃষ্টিপথে ভাসিয়া উঠিবে,—এই চৈতন্যঘন আকাশই ব্রহ্মের স্বরূপ,—"ব্রহ্মব্যোম্নোর্ন ভেদোঽস্তি চৈতন্যং ব্রহ্মণোঽধিকম্॥" এই ভাবে তুমি বিষয়ে ব্রহ্মদৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে। সত্যদ্রষ্টাগণ বলিয়াছেন—ইহা কল্পনা নহে, সত্য

৪৩ কেনোপনিষদ্ ২।১৩

৪৪ প্রাণী ও উদ্ভিদ্ জগতের অন্তর্নিহিত চৈতন্যসত্তার আলোচনা ১৩৭৩ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা উদ্বোধনে প্রকাশিত "প্রাণের পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধে করা হইয়াছে।

৪৫ চৈতন্যসত্তা বিদ্যমান না থাকিলে জড় পদার্থের সূক্ষ্মতম উপাদান—ইলেক্‌ট্রন প্রভৃতির মধ্যে স্পন্দন এবং অভ্রান্ত নিয়মানুসারে আবর্তনাদি হইতে পারিত না। এ সকলের মধ্যে স্পন্দন প্রাণের পরিচায়ক এবং mathematical accuracy-র সহিত আবর্তন জ্ঞানের নিদর্শন।

৪৬ শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫।৮০

এই প্রকার বিষয়ে ব্রহ্মদৃষ্টির ন্যায় বিশ্বের যাবতীয় শক্তিকে,—আধিভৌতিক আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সূর্য প্রভৃতি এবং আধ্যাত্মিক প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে,—ব্রহ্মরূপে দর্শন করাও ব্রহ্মবোধের সহায়ক হয় এবং পরিণামে সাধককে ব্রহ্মানুভূতি আনিয়া দেয়[৪৭]।

যাবৎকাল জগতের সর্ববিষয়ে এই অদ্বৈত ব্রহ্মোপলব্ধি না হয়, যাবৎকাল জীবের নানাত্ব-বোধ থাকে, তাবৎকাল জীবকে জন্মমৃত্যুর হস্তে ক্রীড়নক হইয়া থাকিতে হয়,—"মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি[৪৮]॥" তদ্বিপরীতে যখন এই ব্রহ্মদীপ্তি দ্বারা জীবের অন্তর পূর্ণ হইবে, তখন সে শাশ্বত শান্তির অধিকারী হইতে পারিবে,—"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্[৪৯]॥" ইহাই শ্রুতির অনুশাসন।

৪৭ জনকযাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ, বৃহদারণ্যক উপঃ ৪।১

৪৮ বৃহদারণ্যক উপঃ ৪।৪।১৯

৪৯ কঠোপনিষদ্ ২।২।১৩

দুর্দিনে

'অবধূত চট্টোপাধ্যায়'

রক্ষা কর রক্ষা কর
রক্ষা কর মোরে, হে রুদ্র শঙ্কর! হর,
মোর যত মিথ্যা মোহ, মোর দুর্বলতা,
শীর্ণ এ প্রাণের মোর সঙ্কীর্ণ দীনতা।
তোমার প্রসাদে মোরে কর বলীয়ান্
কর ওজস্বান্; তব মৃত্যুঞ্জয়ী গান
দাও মোর ক্ষীণ কণ্ঠে; তোমার শক্তিতে
নির্বিকার চিত্তে যেন পারি হে সহিতে
জগতের সর্ব দুঃখভোগ; সর্ব লাজ ভয়,
অশান্তির মরুশ্বাস, যত পরাজয়,
তোমার পরম গর্বে খর্ব ক'রে যেন
চ'লে যাই বীরদর্পে, শক্তি দিয়ো হেন।
হে ভূমা ভৈরব তব তেজোদ্দীপ্ত নামে
আমি যেন হই জয়ী সকল সংগ্রামে॥

শ্রীচৈতন্যগতপ্রাণ হরিদাস

শ্রীমতী ইন্দ্রাণী দেবী

ভক্ত হরিদাস, ঠাকুর হরিদাস, যবন হরিদাস—অনেক ভাবেই তাঁর নামটির উল্লেখ রয়েছে বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যে। কিন্তু আর একটি রাজসম্মানজনক উপাধিও তাঁকে ভূষিত করেছিল,—সেটি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রদত্ত 'পৃথিবীর শিরোমণি'। মহাপ্রভুর লীলা-পার্ষদদের মধ্যে হরিদাস নামটি যেন এক দ্যুতিময় ব্যঞ্জনা।

অপূর্ব—অদ্ভুত জীবনবেদ হরিদাসের। তিনি অতি নিকট জন আমাদের। পশ্চিমবাংলার বনগ্রাম মহকুমার বুঢ়ন গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হয়ে এক মুসলমান পরিবারে লালিত-পালিত হয়েছিলেন বলে হরিদাস নামটির সঙ্গে 'যবন' শব্দটি যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। বেনাপোলের গভীর অরণ্যে উচ্চৈঃস্বরে তিনি নামজপ করতেন,—হরিনাম—হরেকৃষ্ণনাম। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, হরিনামশ্রবণে জীবমাত্রেই ভগবৎপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠবে নামরসের মহিমায়। হরিদাসের মৃত্তিকা-নির্মিত ভজন-কুটিরে একটি বিষধর সর্পও বাস করতো, হয়তো হরিদাস তা জানতেনও না। কিন্তু তাঁর অনুরাগী ভক্তজনেরা গোফার কাছে যেতে খুবই ভয় পেত। বিষয়টি জানা মাত্র কুটিরটি ছেড়ে দিয়ে তিনি অন্যত্র যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, সর্পটিই গোফার আস্তানা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল বনান্তরালে। হরিদাসকে কেন্দ্র ক'রে ছোট বড় বহু অলৌকিক ঘটনার কথা শুনা যায়। রামচন্দ্র খান নামে এক দুষ্টপ্রকৃতির জমিদার হরিদাস সত্যিই 'সাধু' কিনা পরীক্ষা করবার জন্য এক বারাঙ্গনাকে পাঠিয়েছিলেন ছলাকলায় তাঁর তপোভঙ্গ করবার জন্য। ছলনাময়ী নারী তার অভিলাষ ব্যক্ত করলে হরিদাস তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর নামজপ শেষ হলে নারীর অভিলাষ পূর্ণ করবেন। এক রাত, দু'রাত ক'রে তিন তিন রাত্রি ভজন-কুটিরের দ্বারে বসে বসে নামকীর্তন শুনলো পতিতা নারী। অদ্ভুত রূপান্তর ঘটে গেল। অনুতাপের বেদনায়, লজ্জায়, আত্মধিক্কারে অধীর হয়ে বারবনিতা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়লো হরিদাস ঠাকুরের চরণতলে। করুণা ক'রে নাম দিলেন তিনি সেই ভূলুণ্ঠিতা নারীকে।

ভারত—তথা বাংলায় তখন মুসলমানী আমল। নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-যুগের অরুণোদয়। মুসলমান কাজী মুলুকপতির কর্ণগোচর হলো—যবন হরিদাস হিন্দু হয়ে গেছে, মুখে অবিরাম হরিনাম। কাজীসাহেব সহ্য করতে পারলেন না এ ঘোরতর অপরাধ। ধরে আনা হলো অপরাধীকে শাস্তির জন্য। অনেক ক'রে তাঁকে বোঝানো হলো, হরিনাম পরিত্যাগ ক'রে 'কলমা' পড়লেই শাস্তি তাঁকে দেওয়া হবে না,—এমনকি রাজসরকারে সম্মানজনক পদও দেওয়া হবে। কথা না শুনলে এক ভয়াবহ চরমদণ্ড পেতে হবে তাঁকে। মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে একবারে খতম করা নয়,—তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যুদণ্ড। বেত্রদণ্ড-প্রকাশ্য দিবালোকে বাজারে বাজারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেতমারা হবে তাঁকে। এক নয়, দুই নয়,—বাইশটি বাজারে

চলবে এই অত্যাচার। কিন্তু হরিনামের চেতননামাবলীটি দিয়ে তাঁর তনু-মন আচ্ছাদিত, কঠোর মৃত্যুদণ্ডের হুমকি অর্থহীন তাঁর কাছে। কাজীর কথা অমান্য ক'রে উদাত্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন—

খণ্ড খণ্ড হয়ে যদি যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥ চৈ. চ.

অতএব শাস্তির জন্য বাজারে নিয়ে যাওয়া হলো হরিদাসকে। সাপের ছোবলের মতো বেত পড়তে লাগলো তাঁর পিঠের উপর; রক্তাক্ত হয়ে ফেটে ফেটে যেতে লাগলো পৃষ্ঠ-চর্ম। হরিদাস বিভোর হয়ে নাম করছেন,—হরেকৃষ্ণনাম। তাঁর ব্যথাবোধ নেই, যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নেই মুখমণ্ডলে। নামের নেশায় বুঁদ হয়ে চলেছেন ঘাতকদের সঙ্গে সঙ্গে। ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যীশুখৃষ্ট অপরাধীদের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন—অবিস্মরণীয় সে কাহিনী। হরিদাসের কাহিনীও অত্যদ্ভুত—চিরস্মরণীয়। বেত্রাঘাতে জর্জরিত অবস্থায় শ্রীহরির কাছে প্রাণের আর্তি জানিয়ে বলেছিলেন তিনি,—"আমি তো এদের কাছে কোন অপরাধ করিনি, তবু কেন ওরা নিষ্ঠুরের মতো বেত্রাঘাত ক'রে মহাপাপের ভাগী হচ্ছে! আমিই ওদের কুকর্মের লক্ষ্যস্থল হলাম। তোমায় ভজনা ক'রে এ কা ফল হলো? ওদের অপরাধ নিও না। ত্রাণ করো ওদের, ত্রাণ করো, শ্রীহরি।" এইরূপ আর্তি শুনে জনবহুল বাজার স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ কি মানুষের উক্তি! বাইশ বাজারে মার খেতে খেতে রক্তাক্তকলেবর হরিদাস এক সময় অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। ঘাতকরা দেখলো দেহে প্রাণ নেই, তাই গঙ্গায় টেনে ফেলে দিল। গঙ্গাগর্ভে ক্রমশঃ চেতনা পেয়ে তিনি নবদ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সমাদরে গ্রহণ করলেন তাঁকে। হরিদাসের নামকীর্তনের মহিমা তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীনিমাইয়ের ভক্তগণ একদিন তাঁকে নিয়ে গেলেন সেই ভুবনমোহনের কাছে। হরিদাসের সেই প্রথম দর্শন। বড় আদর করে গোরাচাঁদ বসতে আসন এগিয়ে দিলেন হরিদাসকে। কিন্তু হরিদাস বসলেন না; মস্তকে ধারণ করলেন সেই আসন। অতি পরিতোষের সঙ্গে নিমাই ভোজন করালেন হরিদাসকে। তারপর শ্রীহস্তে সেই হরিনামময় ভক্ত-অঙ্গ সজ্জিত করলেন মালা-চন্দনে। হরিদাস ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন সেই দেবদুর্লভ মূর্তির চরণতলে। নিমাইচরণে বিক্রীত হয়ে ধন্য হলেন হরিদাস। বিভোর হয়ে উপলব্ধি করলেন—'ইনিই সেই।'

সেই যুগে নবদ্বীপের কুখ্যাত জগাই-মাধাই-এর উদ্ধারসাধন, পথে ঘাটে লোকের দ্বারে দ্বারে হরিনাম-তরঙ্গের ঢেউতোলা—সবকিছুর সঙ্গেই জড়িত ছিলেন হরিদাস। মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত নিত্যানন্দের মতো তিনিও শ্রীগৌরাঙ্গের ছায়া হয়েই ছিলেন। তারপর একদিন নদীয়ার আনন্দের হাট ভেঙ্গে গেল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তখন নীলাচলে যাবার জন্য প্রেমবিহ্বল—চিরদিনের মতো প্রিয় পরিজন, আপন জননীর কাছ হতে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, ঈষৎ হেসে সকলের দিকে তাকালেন,—দুটি চোখ ছলছল। অমনি হরিদাস কেঁদে উঠলেন—চরণের কাছে ভেঙ্গে পড়ে বললেন—

নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন্ গতি।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥
মুঞি অধম না পাইয়া তোমার দর্শন।
কেমনে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥

প্রভু বিচলিত হয়ে তাঁকে দৈন্য সংবরণ করতে

বললেন। প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন তাঁকে—

তোমার লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥

সে-সময় মুসলমান রাজার সঙ্গে পুরীর রাজার বিরোধ লেগেই থাকতো, আর সেই কারণে মুসলমানের জগন্নাথক্ষেত্রে প্রবেশ ছিল একেবারেই নিষিদ্ধ। প্রভু নীলাচলবাসী হলেন। বিরহকাতর গৌরভক্তরা প্রতি বছর রথযাত্রার পূর্বে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছতেন। অশেষ কষ্টকর ছিল সে-যুগের পথযাত্রা। অদর্শনব্যথায় ব্যথিত হরিদাস প্রভুপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতিটুকু বুকে ক'রে প্রায় চারিশত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে পথের সকল বিধি-নিষেধ অতিক্রম ক'রে সত্যিই একদিন পুরীধামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশমাত্র গৌরজনদের নামকীর্তনের উত্তাল তরঙ্গ উঠলো। রাজা প্রতাপরুদ্র হতে সুরু করে মন্ত্রী, রাজপুরোহিত, অমাত্যবর্গ সাময়িকভাবে বিহ্বল হয়ে পড়লেও সকলের বাসস্থান ও আহার্যের নিমিত্ত সাজ সাজ রব পড়ে গেল চতুর্দিকে। রাজার আদেশ,—মহাপ্রভুর 'গণ' এসেছে, তাদের আদর-যত্নের যেন ত্রুটি না হয়। কিন্তু হরিদাসের কি হলো এই ডামাডোলের মধ্যে? তিনি যে যবন! শ্রীমন্দিরে বিগ্রহ-দর্শন তো দূরের কথা,—যাঁর বিরহে ব্যাকুল হয়ে মস্ত ঝুঁকি মাথায় নিয়ে ছুটে এসেছেন এখানে, সেই গৌরাঙ্গসুন্দরের দর্শনে যেতেই তো সাহস পাচ্ছেন না! রাজপথের ধুলোয় এক কোণে বসে নামজপ করতে লাগলেন। মহাপ্রভু হরিদাসের খোঁজ করা মাত্র ভক্তজনেরা কেউ কেউ নিতে এলো হরিদাসকে, জানালো প্রভুর আহ্বানের কথা। একে তো ভক্তিরসে বিগলিত তনু,—তদুপরি মহাপ্রভুর আহ্বান, নিজকে যেন ধরে রাখতে পারছিলেন না। কিন্তু তক্ষুনি মনে হলো, হায়! আমি যে অচ্ছুত মুসলমান! তাই গভীর আর্তির সঙ্গে বলে উঠলেন—

হরিদাস কহে মুঞি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার ॥
নিভৃত টোটার মধ্যে কিছু স্থান পাঙ্।
তাহা পড়ি রহি একা একাল গোঞাঙ্

ভক্তদের ফিরিয়ে দিলেন হরিদাস। মহাপ্রভু কিন্তু সব শুনে আনন্দিতই হলেন, কারণ তিনি যে দৈন্য বড় ভালোবাসেন। আর তাঁর হরিদাস যে একটি ব্যক্তিত্বময় পরম দীনতা! তাই দেখা যায় মহাপ্রভু এক সময় বড় আদর ও সম্মানের সঙ্গে হরিদাসকে আখ্যা দিয়েছিলেন—'পৃথিবীর শিরোমণি'। এদিকে সদ্য আগত ভক্তজনেরা তো নিজেদের বাসস্থান পেয়ে যে যার সমুদ্রস্নানে যাত্রা করলেন, মহাপ্রভু গেলেন না। শ্রীমন্দিরের প্রধান পুরোহিত কাশী মিশ্রের নিকট দীনের মতো একটি ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন। কাশীমিশ্র তো তটস্থ; করজোড়ে কেবলি বলতে লাগলেন—সবই তো প্রভুচরণে বিক্রীত হয়ে রয়েছে! তখন মহাপ্রভু তাঁর নিজবাসস্থানের অল্পদূরে পুষ্প-উদ্যানের মধ্যে একটি ঘর ভিক্ষা চাইলেন। মিশ্র মহাশয় কৃতকৃতার্থ হয়ে বিদায় নিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তখন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন রাজপথের ধুলোয়,—যেখানে নামজপে বিভোর হয়ে রয়েছেন হরিদাস। প্রভুকে দর্শনমাত্র চরণে দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন তিনি। তারপরই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে পিছু হটে হটে যেতে লাগলেন,—প্রভু যে দু'বাহু বাড়িয়ে তাঁর আদরের হরিদাসকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত! হরিদাস বড় বিপন্ন হয়েই বলছেন তখন—আমি অস্পৃশ্য পামর, আমায় ছোঁবেন না। প্রভু, আমি যে আপনার

স্পর্শের অযোগ্য। চৈতন্য প্রভু তখন গদগদ স্বরে বলছেন—"আমি পবিত্র হবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করতে বাঞ্ছা করি!" কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়—

'প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে ॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান ॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ জ্ঞানী হইতে তুমি পরম পাবন ॥'

মহাপ্রভু নিমেষে সেই ধূলিধূসরিত অশ্রু-বিগলিত হরিদাসকে বক্ষে ধারণ ক'রে রোদন করতে লাগলেন। অবশেষে হরিদাসকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন সেই পুষ্পকাননে, যেখানে নতুন ঘর ভিক্ষা নিয়েছেন কিছুক্ষণ আগে কাশী মিশ্রের কাছ হতে। তারপর বড় আদরের সঙ্গেই হরিদাসকে বললেন—"এই তোমার ঘর, এখানে তুমি থাকবে। নামকীর্তন করবে। আমি প্রতিদিন এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হবো। প্রতিদিন তোমার জন্য মহাপ্রসাদ আসবে এখানে। মন্দিরের চক্র দেখে প্রণাম করো।" বহিরঙ্গ জনের মুসলমানে আপত্তি থাকা স্বাভাবিক, তাই তিনি হরিদাসের ইচ্ছানুযায়ী মন্দিরে যেতে আর বললেন না।

প্রতিদিন তিনলক্ষ নামজপ করতেন হরিদাস। আর প্রতিদিন সমুদ্রস্নানের পথে মহাপ্রভু গিয়ে মিলিত হতেন সেই ঘরটিতে তাঁর ভক্তের সঙ্গে; ইষ্টগোষ্ঠী করতেন পারিষদবর্গ নিয়ে। চারমাস নীলাচল-বাসের পর গৌরজনেরা যখন দেশে চলে যেত তখন শুধু হরিদাস আর প্রভুর মিলন হতো প্রতিদিন। সেবক ভক্ত গোবিন্দের হাতে প্রতিদিন নিয়মিত মহাপ্রসাদ পাঠাতেন মহাপ্রভু। আনন্দে আছেন হরিদাস। প্রতিদিন তিনলক্ষ নামজপ, মহাপ্রভুর মধুর সঙ্গলাভ,—এর চেয়ে আর কী পরম বস্তু থাকতে পারে হরিদাসঠাকুরের জীবনে! কিন্তু তিনি যে আরও ঊর্ধ্বলোকের বস্তু! তাঁর মর্মস্থলে যে প্রার্থনাটি অহরহ উঠছে পড়ছে, সেটিই তাঁর পরম প্রিয়ের কাছে ব্যক্ত করবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। অনেক বছর কাটলো প্রভুর সুধাসঙ্গে। মনে মনে ভাবছেন তিনি—এ লীলারঙ্গ আর কতদিন? বুঝতেই পারছি তোমার লীলাসংবরণের আর বেশী বিলম্ব নেই। তোমার বিরহযন্ত্রণা বহন করবার জন্য এই হাড়মাসের খাঁচাটাকে আর রাখতে চাইনে, ছেড়ে দেওয়াই ভালো। একদিন মনের সঙ্কল্প নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন, নিত্যকার মতো গোবিন্দ এলেন প্রসাদ নিয়ে। হরিদাস নীরব। গোবিন্দ বললেন—"উঠ, প্রসাদ গ্রহণ করো।" শয়ন ছেড়ে উঠে বসেই হরিদাস বললেন—"আজ আমি প্রসাদ লঙ্ঘন করবো, কেননা তিনলক্ষ নামজপ এখনো আমার সম্পূর্ণ হয়নি, অথচ মহাপ্রসাদ তো উপেক্ষা করতে নেই, কী করি।"—এই বলে মহাপ্রসাদকে বন্দনা ক'রে একটি অন্নদানা গ্রহণ করলেন। গোবিন্দের মুখে বৃত্তান্ত শুনে পরদিন প্রভু গেলেন হরিদাসকে দেখতে। সাষ্টাঙ্গ প্রণামের পর নীরব হয়ে আছেন হরিদাস। উদ্বিগ্নস্বরে মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করছেন তখন, "কী হয়েছে হরিদাসের? কী তার ব্যাধি?" হরিদাস জানালেন—মনটাই তাঁর ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, দেহ নয়। তিনলক্ষ নামজপ আর হয়ে উঠছে না, তাই মন পীড়িত। শুনে চৈতন্য-দেব বলে উঠলেন—"আমি তো পূর্বেও

বলেছি, আর আজও বলছি, এ বয়সে নাম-জপে তোমার এ কঠোর আগ্রহ কেন? সংখ্যা কমিয়ে দাও। জগতে নামমাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য তোমার আবির্ভাব, তাতো সফল হয়েছে, আর কেন! তোমার দেহ পবিত্র, তোমাকে দেখলে কৃষ্ণদর্শনসুখ অনুভূত হয়, তোমার আর কিসের জন্য এ কঠোরতা! দেহটাকে আর অনর্থক দুঃখ দিও না।" হরিদাস তো ঠিক এই রকম একটি মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন! কাজ যখন তাঁর হয়ে গেছে তখন কেন আর এই দেহ বিড়ম্বনা? এবার হরিদাস করজোড়ে করুণ আর্তির সঙ্গে বললেন—"আমাকে একটি বর দিতে হবে, প্রভু। আমি বুঝতে পেরেছি লীলাসংবরণের আর অধিক বিলম্ব নেই তোমার, আর সেটি যেন আমার দেখতে না হয়। আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় দাও, প্রভু। দোহাই, প্রভু, আমি বিদায়-প্রার্থী হয়ে বর চাইছি, তুমি অনুমতি দাও।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বুঝলেন সব, তাঁর কমল-আঁখি ছলছল ক'রে উঠল। আর্দ্রকণ্ঠে বললেন—"হরিদাস, তুমি এ কী বলছো? তুমি কেন নিষ্ঠুরের মতো আমাকে ছেড়ে যেতে চাও? তোমার সঙ্গসুখ হতে বঞ্চিত হয়ে কাকে নিয়ে থাকবো, কে আর আছে তোমার মতো আমার?" হরিদাস ভুললেন না এ কথায়। প্রভুকে একপলক দর্শনের জন্য, সুধাসঙ্গলাভের জন্য লক্ষ কোটি মানুষের অভাব নেই, হরিদাস তো সেখানে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র কীটের মতো। হরিদাস ভুললেন না। প্রভুকে নীরব দেখে অবশেষে চরণে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে শেষ বাঞ্ছা নিবেদন করলেন—"আমার যাবার বেলায় যেন তোমার শ্রীপাদপদ্ম থাকে আমার বুকের ওপর, দু'নয়ন-ভরে তোমার ওই কমলমুখ দেখতে দেখতে, তোমার নাম করতে করতে যেন চলে যাই। বলো—বলো, দেবে আমায় এই বর?" অবশেষে শ্রীচৈতন্যকে বলতে হলো—"তুমি যা ইচ্ছে কর, কৃষ্ণ তাই পালন করবেন।"

পরদিন প্রভাত হতেই মহাপ্রভু এলেন পারিষদগণ সহ হরিদাসের কুটিরে। হরিদাস প্রস্তুত হয়েই ছিলেন যেন; তাই "হরিদাস সমাচার বলো"—পরমপ্রিয় এই কণ্ঠস্বর শোনামাত্র বলে উঠলেন—"তোমার যে আজ্ঞা, তাই হোক, প্রভু।" কুটির ছেড়ে প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন হরিদাস ঠাকুর। তারপর ভুলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন সপারিষদ মহাপ্রভুকে। বড় যত্ন ক'রে আঙিনায় বসিয়ে দিলেন হরিদাসকে প্রভু নিজেই। অন্তরঙ্গ পারিষদদের নিয়ে হরিদাসকে প্রদক্ষিণ ক'রে ক'রে নামকীর্তন করতে লাগলেন মহাপ্রভু। নৃত্য করছিলেন স্বরূপ ও বক্রেশ্বর, গীত গাইছিলেন রামরায় ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কিছুক্ষণ পর সবাইকে নীরব ক'রে স্বয়ং মহাপ্রভু গুণকীর্তন করতে লাগলেন—হরিদাসের লীলাকীর্তন। শ্রীমুখ হতে হরিদাসের লীলা-কীর্তন শুনতে শুনতে বিহ্বল হয়ে পড়লেন ভক্তগণ। তখন যেন হরিদাসময় হয়ে গেল চতুর্দিক; প্রণাম করতে লাগলেন ভক্তগণ হরিদাস ঠাকুরের চরণে পড়ে। আস্তে আস্তে শয়ন করলেন হরিদাস। প্রভু বসলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়ে। অমনি হরিদাস দু'হাতে চরণ জড়িয়ে ধরে নিজ বক্ষে তুলে নিলেন; মুখে মৃদু মৃদু নাম স্ফুরিত হচ্ছে। কিছু বলতে পারছেন না চৈতন্য ঠাকুর,—তিনিই যে বর দিয়েছেন তাঁর হরিদাসকে। নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে আছেন হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর পদ্ম-মুখপানে; প্রেমাশ্রুতে দু'নয়ন ভেসে যেতে

লাগলো। ভক্তজনেরা চরম কিছু ভাবতেই পারেননি, তাঁদের মনে হলো, আহা! ভক্ত ও প্রভুতে চলছে কী অপূর্ব লীলাবিলাস! অবশেষে দেখা গেল হরিদাস ঠাকুর—'নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রমণ,' (চৈ. চ.) আশ্চর্য মৃত্যু,—এক অভিনব মহাপ্রয়াণ ঘটে গেল! চৈতন্যদেবের কত শ্রদ্ধা ও আদরের বস্তু ছিলেন হরিদাস,—ত্রিভুবনে তার তুলনা কোথায়! পূত দেহটি কোলে তুলে নিয়ে নৃত্য করতে লাগলেন মহাপ্রভু এতক্ষণে যেন সকলের চমক ভাঙ্গলো; আনন্দবিহ্বল ভক্তগণ উচ্চরোলে হরিধ্বনি করতে লাগলেন,—'জয় জয়, হরিদাসের জয়' রব উঠলো চতুর্দিকে। ভক্ত হরিদাস, যবন হরিদাস, সেই বাইশ বাজারে নির্যাতিত হরিদাস জয়যুক্ত হয়ে চলে গেলেন তাঁর ঈপ্সিত লোকে। প্রভুর তন্ময়তা কাটতেই স্বরূপ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। একটি শকটে ক'রে হরিদাসের ভাগবতী তনু নামকীর্তন করতে করতে সমুদ্রতীরে নিয়ে যাওয়া হলো। শেষ স্নান করানো হলো। ভাবাকুল কণ্ঠে মহাপ্রভু বলে উঠলেন—"অদ্যাবধি সমুদ্র মহাতীর্থ হইল।" হরিদাসের দিব্যদেহ মাল্যচন্দনে ভূষিত করা হলে ভক্তগণ তাঁর পাদোদক পান করলেন। বালুতে খোঁড়া কবরে শয়ন করানো হলো দেহ। মহাপ্রভুই সর্বপ্রথম কবরে বালু ছড়িয়ে দিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়—

"চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্তন॥
হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিলেন তাঁহার গায়॥"

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। স্নানান্তে সকলে কবর প্রদক্ষিণ করলেন। প্রভু বাসায় না গিয়ে মন্দিরের পথে গেলেন আপন উত্তরীয়-খণ্ড পসারীদের কাছে মেলে ধরে বলতে লাগলেন—"আমার হরিদাসের মহোৎসবের নিমিত্ত আমাকে ভিক্ষা দাও।" এ দৃশ্যে ভক্তগণ প্রভুকে নিবারণ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় নিয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে হরিদাসের মহাপ্রয়াণের বার্তা ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। থরে বিথরে খাদ্যসামগ্রী আসতে লাগলো প্রভুর বাসায়। শ্রীমন্দিরের প্রধান কাশী মিশ্র, রামানন্দের ভাই বাণীনাথ মহাপ্রসাদ নিয়ে এলেন পর্যাপ্ত। সাধু-সন্তরা এলেন হরিদাসের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। পঙ্‌ক্তিভোজে বসলেন তাঁরা ভক্তবৃন্দের সঙ্গে। মহাপ্রভু নিজহস্তে লেগে গেলেন পরিবেশন করতে; এ যেন তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধ। হরিদাসের মহোৎসব শেষ হলো। সবাইকে নিজহস্তে মাল্যচন্দন পরালেন মহাপ্রভু। অবশেষে গদগদ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলতে লাগলেন—

"হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হইল মেদিনী॥
জয় হরিদাস বলি কর হরিধ্বনি।
ইহা বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥"—চৈ. চ.

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

২৩ ফেব্রুআরি, ১৯৩৬, বেলা ৪টা। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি ও শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে পূঃ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ একটু আগে সারগাছি হইতে বেলুড় মঠে আসিয়াছেন, বহু ভক্ত ইতিমধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে।

পূঃ মহারাজ চেয়ারে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ মাটিতে বসিয়া, একজন ভক্ত ভক্তির আতিশয্যে বাতাস করিতেছে, মহারাজ বলিতেছেন, "এলুম তাঁর ইচ্ছায়। আসব ব'লে একবারও ভাবিনি।"

২৪শে ফেব্রুআরি তিথিপূজা ও শত-বার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন। ভক্তের ইচ্ছা আজ সারাটা দিন সে মঠে থাকিবে, 'বাবা'কে দেখিবে এবং সম্ভব ও সুবিধা হইলে একটু সেবা করিবে।

চারিদিকে কত কি হইতেছে! দ্বিতলে শ্রীমন্দিরে সারাদিন পূজা—ওদিকে লাউড স্পীকারে গানের পর গান, অগণিত ভক্ত নরনারীর সমাগমে মঠ-প্রাঙ্গণ মুখরিত। ভক্তবন্যা উজান বহিয়া উপরে উঠিতেছে, পূজনীয় মহারাজকে দর্শন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিতেছে। কি জানি কোন্ ফাঁকে একজন সেবক ভক্তের হাতে পাখাটি দিয়া চলিয়া গেল, বলিয়া গেল 'আপনি একটু থাকুন, আমি আসছি এখনি।' ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ঘরে আর কেহ নাই, কিছুক্ষণের জন্য ভক্তসমাগম বন্ধ। বাবা ছেলে-মানুষের মতো বিছানায় শুইয়া 'উদ্বোধন' ও 'বসুমতী'র শতবার্ষিকী সংখ্যাগুলি দেখিতে-ছেন—ঐ উপলক্ষে প্রকাশিত নিজের লেখাটি বারবার দেখিতেছেন। ভক্তের একটু হাসি পাইল।

একটু পরে বাবা বাথরুমে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে কি করিতে হইবে ভক্ত বুঝিতে পারিল না। সেবক এখনও অনুপস্থিত, মহা মুশকিল!

একটি ভক্ত-মেয়ে ব্যাকুলভাবে 'বাবা বাবা' বলিয়া ছুটিয়া ঘরে ঢুকিলেন। বাবা তখন ভক্তকে বলিতেছেন, 'ঘুরে-ঘারে এলুম—কোথায় ভাল ক'রে একটু বাতাস করবে, তা না আমাকে দেখছে। ভক্ত!'

ভক্ত তো কোনরকমে সামলাইয়া লইয়া খুব জোরে জোরে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। দু-একবার বোধ হয় খাটের ছত্রীতে পাখাটা লাগিয়া গেল। ভক্ত-মহিলাটি বলিলেন, 'আমায় দাও। আমি একটু বাতাস করি।' ভক্ত তাড়াতাড়ি তাঁহার হাতে পাখাটি দিয়া সেবকের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে ভিড় কমিতে শুরু করিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মন্দিরে গম্ গম্ স্বরে 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন' গান চলিতেছে।

একজন প্রবীণ সাধুর অনুরোধে এবং আদেশে ভক্তের সেইদিন প্রথম মঠে রাত্রিবাস করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হইল। তিনি বলিলেন, "কি হয়েছে? একটু না হয় ভাববে বাড়িতে—ভাবতে ভাবতে তারাও ঠাকুরের

কথাই ভাববে। তিথিপূজার রাত, আজ অতি পুণ্যরাত্রি—কালীপূজা হবে, তারপর বিরজা-হোম, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য। আজ মঠের হাওয়া গায়ে লাগলে বিবেক বৈরাগ্য আপনি হবে, সংসার-বন্ধন সব কেটে যাবে। আজ মঠে থাকো, যেখানে হয় একটু শুয়ে পড়। তা ব'লে সারারাত যেন ঘুমিয়ে কাটিও না।"

ভোরের আলো-আঁধারে ভক্ত দেখিল, বাবা ঘর হইতে ঠাকুরঘরে যাইতেছেন; 'সন্ন্যাস', 'ব্রহ্মচর্য' হইবে—সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ভক্ত বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল, যতটুকু দেখা যায়। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে দেখিল কয়েকটি সগ্নোজাত নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী নবলব্ধ 'আনন্দ' ও 'চৈতন্যে' মঠ মুখরিত ও প্রদীপ্ত করিতেছে। আর একটু বেলা হইলে সামান্য প্রসাদ লইয়া কি জানি কি ভাবিতে ভাবিতে ভক্ত কলিকাতা ফিরিল।

ইতিমধ্যে একদিন সকালে মঠে আসিয়া ভক্ত দেখিল বহুসাধু-পরিবেষ্টিত স্বামী অভেদানন্দ পশ্চিমের বারান্দায় বসিয়া অপেক্ষমাণ, হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, 'গঙ্গাধরকে খবর দাও—আমি এসেছি।' অল্প পরে উপরের ঘরে দুইজনের মিলন-আলিঙ্গনের দৃশ্য সত্যই স্বর্গীয়, উপভোগ্য। ভেজানো ঘরে কথাবার্তা হইল। আধ ঘণ্টা পরে পূঃ কালী মহারাজ ফিরিয়া গেলেন।

১লা মার্চ, রবিবার। আজ সাধারণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব। ভক্ত একজন বন্ধু সহ সকালবেলাই মঠে আসিয়াছে—সারাদিন ঘোরাঘুরি করিয়াছে। আজ বাবার ঘরে যাতায়াত বন্ধ। তাহার একান্ত ইচ্ছা বন্ধুটিকে একবার লইয়া যায়।

সাড়ে পাঁচটার সময় দর্শন হইল। বাবা বলিতেছেন, "দেখ দিকি কি গোলমাল—হই চই কাণ্ড! আমাকে এরা এখানে আটকে রাখতে চায়। সারগাছি কেমন জায়গা বলো দেখি—কেমন শান্ত! তবে ঠাকুরের কাজ—যখন যেখানে রাখেন, যা করান।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাবাকে প্রণাম করিয়া ভক্ত বিদায় লইল; নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল—উজ্জ্বল মহান্ দিব্যমূর্তি, শ্রান্ত ক্লান্ত তবু কি শান্ত সুন্দর!

৫ই মার্চ। একজন ভক্ত ভক্তির আতিশয্যে অন্য কোন প্রশ্ন না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিয়াছে, 'কবে যাবেন?' (অর্থাৎ সারগাছি ফিরে যাবেন?) বাবা একটু চমকিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, "কে হে তুমি, যাবার কথা জিজ্ঞেস করছ? এসেছি—দুদিন থাকতে দাও। তা না, কবে যাবেন?" খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কোমলকণ্ঠে বলিতেছেন, "কবে যাওয়া হবে তা আমি কিছু জানি না। তাঁর ইচ্ছেয় আসা, তাঁর ইচ্ছেয় যাওয়া; তবে প্রভুর দোলপূর্ণিমার আগে বোধহয় আর যেতে হ'ল না।"

সকলে বিদায় লইতেছে। বাবা বলিলেন, "আজ একাদশী, রামনাম শুনে যেও।"

দোলপূর্ণিমা, সন্ধ্যা। "দাও, আবীর দাও। যারা যারা এসেছে সবাইকে ডাকো, আবীর দিই।" একজন আবীর না লইয়াই চলিয়া গিয়াছে। বাবা বলিতেছেন, "আচ্ছা আহাম্মক তো, চলে গেল! ডাকো ডাকো।" আর একদিন সন্ধ্যায় লালবাবা-আশ্রমের উদাসী

সাধু বাবাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। বাবা তাঁহাকে সযত্নে ও সসম্মানে নিজের ঘরে একটি চেয়ারে বসাইয়া নিজেও অপর একটি চেয়ারে বসিয়া হিন্দিতে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। কিছু পরে তাঁহার ইঙ্গিতে সেবক কিছু ফল আনিয়া উদাসী সাধুর সামনে ধরিলেন। সাধু শুধু একটি কলা লইলেন। আরো কিছু আলোচনার পর সাধু চলিয়া গেলে বাবা তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "দেখ কি সংযমী! রাত্রে একটু দুধ, একটি কলা ছাড়া কিছু খায় না, সঙ্গে কিছু নিলে না। আমাদের অনেকে এসব সাধুদের আমল দেয় না, একরাত থাকতে চাইলে থাকতে দেয় না। আমরা যখন ভ্রমণ করেছি, তখন কত রাত কত জায়গায় আশ্রয় নিয়েছি। বাইরে বেরুলে এসব বোঝা যায়, সাধুর দরদ সাধুরাই বোঝে। সাধু সহজে গৃহস্থের বাড়িতে রাত্রে থাকতে চায় না।"

দু-একদিন পরে সন্ধ্যারতির পর মঠবাটীর দ্বিতলের গঙ্গার দিকের বারান্দায় একটি চেয়ার আনা হইল। কোন্ দিকে মুখ করিয়া দিতে হইবে সেবক বুঝিতে পারিতেছিল না। বাবা বলিলেন, "দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ ক'রে দাও না!—এটাও ব'লে দিতে হবে?"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ইতিমধ্যে তিনচার জন সাধু ও ভক্ত আসিয়া মাটিতে বসিলেন। বাবা বলিতেছেন, "আহা! এই গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে যেতে কি সুন্দর! একটা idea (ভাব) ছিল, হয়ে ওঠেনি। মাঝপথে মুর্শিদাবাদেই আটকে গেলাম। গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে যাব—বরাবর—সেই গঙ্গাসাগর থেকে গঙ্গোত্তরী—পশ্চিম কূল ধরে ধরে—কেউ যাক্ না—দেখেও সুখ। এখন আর সে শক্তি নেই। কালই পাঁচজন বেরিয়ে যাক্ না—আমাদের মঠের সাধু। 'মিশনের সাধু' বোলো না—মঠের সাধু, মিশনের কর্মী। মিশন হচ্ছে রিলিফের কাজ, সেবাকার্য—এইসব।

"বেলুড় থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে দেখবে—ওধারে দক্ষিণেশ্বর, তারপর সব কলকারখানা—চিমনী, ধোঁয়া—চলল কতদূর। এধারে শ্রীরামপুর, তারপর ওধারে নৈহাটি। অনেকদূর যেতে যেতে কালনা, নবদ্বীপ। আরও ছাড়িয়ে ওধারে পলাশী, মুর্শিদাবাদ পড়বে। আরও উত্তরে ডানদিকে পদ্মা বেরিয়ে গেল।—গঙ্গার ধারে ধারে যাবে, ভাঁটার সময় চলবে, একটু আশে পাশে গ্রামে ঢুকবে ভিক্ষার জন্য। সাথে একটি পয়সাও নেবে না। সেই তো মজা। সম্পূর্ণ ঈশ্বরনির্ভর। টাকাপয়সা নিয়ে, কি রেলগাড়িতে ভ্রমণ করা কি সুখের? দেশই দেখা হয় না। ৪০০ মাইল রাস্তা চলে গেলে একরাতে—কি মরি ভ্রমণ করা!

"আর প্রচার, প্রভুর নাম করবে—গুণ-কীর্তন করবে যেখানে যাবে। আর গঙ্গার ধারে ধারে কত সাধুদর্শন! যথার্থ সাধু—যাঁরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন—এমন সব ভক্ত মহাপুরুষ!

"পয়সা ছুঁতুম না ব'লে স্বামীজী কত ভালবাসতেন। ভ্রমণের সময় গুজরাটে একবার ডাকাতের হাতে প্রাণ যেত। বেঁচে গেলুম—পয়সাকড়ি কিছু ছিল না ব'লে। আহা! সে-একটা কেমন অবস্থা! সর্বদা নির্ভর, সর্বদা তাঁর চিন্তা!

"টাকাই তো ভগবানকে ভুলিয়ে দেয়। ভগবন্নির্ভরতাই আত্মনির্ভরতা, টাকায় নির্ভরতা আত্মনির্ভরতা নয়। দেখ না যারা চাকরি করে, টাকা রোজগার করে! তারা ঠিক ঠিক

ভগবানে বিশ্বাস করতে পারে না, ঠিক ঠিক নির্ভর করতে পারে না। ও-দুটো একসঙ্গে হয় না, দু'নৌকায় পা বড় ভীষণ।"

কয়েকদিন পরে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে চেয়ারে উপবিষ্ট বাবা। কয়েকজন সেবক ও ভক্ত উপস্থিত। বাবা বলিতেছেন; "খাগড়ার ছানাবড়া—দেখলে চক্ষু ছানাবড়া! খাগড়ার কাছে বিষ্ণুপুর—সেখানে দয়াময়ী কালী বড় জাগ্রত। সাধারণতঃ কিছু মুখে রোচে না, কিন্তু ওখানে বেলা তিনটার সময় প্রসাদ পেলুম—ছোলার ডাল যেন অমৃত। খাগড়ার ছানাবড়া ঠাকুর খেতে চাইলেন—আনিয়ে দিলুম।"

তারপর বিশ্রাম করিতে করিতে কয়েকটি অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির গল্প বলিলেন: "ত্রিবেণীতে তর্কপঞ্চাননের বাড়ি গেলাম। সব দেখালে, কত তাঁর গল্প বললে। দুজন গোরা ঝগড়া করছিল—তর্কপঞ্চানন গঙ্গায় চান করতে করতে শুনেছিলেন, সাক্ষ্য দেবার সময় সব মুখস্থ ব'লে দিলেন। বর্ধমান যাবার পথে রাস্তার দুধারে যা যা দেখেছেন—সব খুঁটিনাটি ব'লে দিলেন—Sir William Jones তাঁর ছাত্র।

"মুর্শিদাবাদের এক artist (চিত্রকর) নবাবের procession (শোভাযাত্রা) দেখে হুবহু ছবি আঁকলে, এঁকে নবাবকে উপহার। ছবির শেষে রয়েছে দুটো শূয়োর ছুটে পালাচ্ছে। নবাব তো চটে লাল—'হারাম, হারাম'। Artist-কে পয়সা দিতে চায় না। সে বেচারী কেঁদে ফেলে বলছে—যেমন যেমন দেখেছি ঠিক তেমন তেমন এঁকেছি, শেষে দুটো শূয়োর দেখেছিলাম তাই এঁকেছি। নবাব বললেন—আচ্ছা দাঁড়াও। আবার procession বেরুল—এবার সব list (তালিকা) করে রাখা হ'ল—কটা হাতি, কটা ঘোড়া, কত পদাতিক, কি কি রং-এর পতাকা। কি রকম, কি কাপড়—সব। ছবি আঁকা হ'লে দেখা গেল—অবিকল ঠিক ঠিক।

"শতাভিধানী—যা শুনবে তাই মনে রাখবে তা যে ভাষারই হোক—একবার শুনেছে কি মুখস্থ ব'লে দেবে। দেখতে গেলুম, ঠাকুরের স্তব বললুম—'বিশুদ্ধবিজ্ঞানমগাধসৌখ্যম্...'। তখনই মুখস্থ ব'লে দিলে- ভাবিনি এ-রকম পারবে ব'লে।"

একদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। মঠ-বাড়ির উপরের ঘরে। উপস্থিত মঠের কয়েকজন বিশিষ্ট সাধু বাবা ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। স্বামী মাধবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ! (শতবার্ষিকী উপলক্ষে) ঐ যে লিখেছেন—'বোরোধানের বীজ...', অনেকে জিজ্ঞেস করেছে—ওর মানে কি?' মহারাজ বলিতেছেন: "লিখেছি কি আমার ইচ্ছেয়? একদিন ভোরবেলা, ঠাকুর বলছেন—'লেখ্, এই এই লেখ্'। শুনলাম। পাছে ভুলে যাই তাই ভাবলাম তাড়াতাড়ি লিখে রাখি। ঝোঁক চেপে গেল। একে ডাকছি, তাকে ডাকছি কালিকলম কাগজের জন্যে। কাউকে ডেকে পেলুম না। শেষে চোখে মুখে জল দিয়ে মোমবাতি জেলে নিজেই বসে গেলুম। আপনি লেখা হয়ে গেল, পরে মানে ঠিক করেছি।

"অনেক ছেলে-ছোকরারা এসে বলে—'রামকেষ্ট' যদি ভগবান তো ভারত স্বাধীন হচ্ছে না কেন? আরে বাপু! তিনি নিরপেক্ষ হয়ে তাঁর ভাবের বীজ চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন—যেখানে যেমন মাটি, আর যেমন

লোকদের চেষ্টা, সেই রকম ফসল হবে তো?

"ভারতকে—বাংলাকে যা দিয়েছেন—যথেষ্ট। এই ভাবই ধারণ করতে পারছে না। ৮০০ বছরের গোলামের জাত! কি করবে? না আছে শক্তি—না আছে কিছু। Spirit of adventure, determination, discipline (সাহসিকতার ভাব, দৃঢ় সংকল্প, নিয়মানুবর্তিতা) কিছুই তো দেখি না। সত্যি বলছি আমার কোন আস্থা নেই এদের ওপর। আর দেখ, স্বাধীন দেশের মাটিতে ঠাকুরের ভাব কিরকম ফুটে উঠছে ও উঠবে! ওদের একটা শক্তি আছে, আগ্রহ আছে—উপযুক্ত আধার।

"এই দেখ না ঠাকুরেরই ভাব—সবার ভেতরে, তবে যে যেমন আধার, তার ভেতর তেমন প্রকাশ। স্বামীজী অনন্ত আধার, তাই তাঁর ভেতর অনন্ত ভাবের প্রকাশ। আর যে যেমনটুকু তার ভেতর তেমনি। সত্যি বলছি, আমি যতটুকু পেয়েছি, তাতেই ধন্য হয়ে গেছি। যাও আরতি দেখগে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।"

*

একদিন দুপুরে—খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রামের পূর্বে। সেদিন নতুন দাঁতের পাটি আসিয়াছে—ডাক্তারবাবুও উপস্থিত।

মহারাজ—এবার দাঁত দিয়ে রক্ত পড়লে দেখে নোবো আপনাকে।

ডাক্তার—না, না, আর রক্ত পড়বে না। পড়লে আবার ঠিক ক'রে দেবো।

মহারাজ—আরে থোৎ, ইয়ার্কিও বোঝ না। বাঁধানো দাঁত দিয়ে আবার রক্ত পড়ে নাকি? (ঘরশুদ্ধ লোক একচোট খুব হাসিয়া উঠিল। আর কি হবে দাঁত টাঁত? বয়সও তো হ'ল আর কিছু ইচ্ছে নেই। শুধু একটি ইচ্ছে—যেন ঠাকুরকে দেখতে দেখতে যেতে পারি। (ডাক্তারকে) আম হলে একবার সারগাছি যাবেন। কেমন?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ইজিচেয়ারে বাবা বিশ্রামরত।

কানাই একটি ভক্তবালক—বাগবাজারে বাড়ি, বলরাম-মন্দিরে ছেলেবেলা থেকে মহারাজদের সহিত পরিচিত, মঠে আসিতে ও থাকিতে চায়, কিন্তু কাজের ভয়ে একটু গা ঢাকা দিয়া ফেরে। একজন মহারাজ একটু বকিয়াছেন! সরল কানাই বাবাকে সব কথা বলিয়া ফেলিয়াছে। বাবা কানাইকে বলিতেছেন, "ভয় করবি কেন? স্বামীজী বলতেন—ভয়ই মহাপাপ। Coward (ভীরু) কোথাকার, যা গিয়ে অনঙ্গ মহারাজের পায়ে ধরে প্রণাম ক'রে আয়। সাধুর রাগকে ভয় করতে নেই। সাধুর রাগও তোর মঙ্গল করবে। আর মানুষকেই যদি ভয় করবি, জোর ক'রে একজন মানুষের সামনে দাঁড়াতে না পারবি তো যমের সামনে দাঁড়াবি কি ক'রে? যমের তো আর সময় নেই, এখনি হতে পারে। উপনিষদে আছে—নচিকেতা যমের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছে—মৃত্যুর পরে কি? যম বলছে—এ প্রশ্ন ছাড়া অন্য কিছু প্রশ্ন কর, বর নাও। নচিকেতা বলছে—বর চাই না। অন্য প্রশ্নও আমার নেই। ঐটুকু ছেলের কি সাহস! যমের সামনে দাঁড়িয়ে এই কথা! স্বামীজীর একটা কিছু আবৃত্তি কর্। ছেলেবেলায় করতিস্ তো 'নাচুক তাহাতে শ্যামা'। মুখস্থ আছে?"

কানাই আবৃত্তি করিল:

'জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?

চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥'

বাবা—(উপস্থিত সকলের প্রতি) দেখছ, কি জোর! আহা, স্বামীজী অভয়ের প্রতিমূর্তি।

রেঙ্গুন হইয়া পূঃ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ দু-এক দিন মঠে ছিলেন। যেদিন আসিলেন সেদিন সন্ধ্যায় দুই বৃদ্ধ-শিশুর মিলনদৃশ্য বড়ই মনোরম। বিজ্ঞান মহারাজ বাবার ঘরে ঢুকিতেই বাবা তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। তারপর দুইজনে দুইটি চেয়ারে বসিয়া শিশুর মতো আলাপ করিতে লাগিলেন—"তোমার কটা ফাউন্টেন পেন? আমায় একটা দাও।"

"বা রে, দেবো কেন? তোমারও তো অতগুলো রয়েছে।" "আচ্ছা, হাতির দাঁতের pen (কলম) হয়?"

মুর্শিদাবাদে আইভরির অনেক সূক্ষ্ম কাজ হয়—কিছুক্ষণ সেই বিষয়ে আলাপ হইল। তারপর পূঃ বিজ্ঞান মঃ পাশেই নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

চ। সমাজে নারীর স্থান এবং ভারতীয় আদর্শ :

বলা যেতে পারে, স্বামী-স্ত্রীর সমানাধিকার ও সম কর্তব্যের ভিত্তি স্বামী বিবেকানন্দের সমবায়িক গৃহস্থালীর পরিকল্পনা নারীর অধিকারের আধুনিক দাবির প্রতিধ্বনি মাত্র। অর্থাৎ, এই পরিকল্পনাকে বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে ভারতীয় আদর্শের প্রতিফলন হিসাবে গ্রহণ করা যায় না ; প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনাটি হল নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য-অপসারণের দাবি, যে দাবি উনিশ শতকের শেষভাগে সমগ্র উদারনৈতিক জগতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এ ধরনের অভিমত ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতারই পরিচায়ক, অন্তত স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চ ধারণার নির্দেশক নয়। স্বামীজী ছিলেন ভারতের সামাজিক ইতিহাসের একজন একনিষ্ঠ ছাত্র। প্রয়োজন হলে এই ইতিহাসের পাতা থেকেই উদ্ধৃত করে তিনি দেখাতে পারতেন যে, বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভারতীয় আদর্শেরই পুনরুদ্ধার মাত্র। এই পুনরুদ্ধারকার্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ শাশ্বত বলে আদর্শটি আধুনিক সমাজের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণন লিখেছেন, "হিন্দু আদর্শ বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিকের উপরই সম-গুরুত্ব আরোপ করে। পুরুষ কোন অত্যাচারী মালিক এবং স্ত্রী তার ক্রীতদাসী নয় ; উভয়কেই উচ্চ আদর্শের দাসদাসী বলে অভিহিত করা যায়, ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও স্বার্থ সে আদর্শের সম্পূর্ণ অনুগত। এই কারণে এই প্রকার বিবাহে ইন্দ্রিয়সুখকে শুদ্ধীকৃত করে আত্মবিলোপকারী আনুগত্যে পরিণত করা হয়।"[১] এবং মাত্র এই আদর্শই স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক স্বার্থের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন করে 'দৈবাৎ-নির্বাচিত সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে (chance-mate) জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী করে তুলতে পারে।'[২] একদিক দিয়ে এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে অবশ্যই আদর্শের অনুবর্তী করে তোলে, অন্য দিক দিয়ে কিন্তু সে আবার ত্যাগ ও সেবার মধ্যে তার প্রকৃত সত্তা খুঁজে পায়।

কালক্রমে বিবাহিত জীবনের এই আদর্শের বিকৃতির দরুন ভারতীয় সমাজে নারীর মর্যাদারও অবনতি ঘটে। আবার ডক্টর রাধাকৃষ্ণনকে উদ্ধৃত করে বলা যায়, "সমাজে নারীর মর্যাদা সম্বন্ধে হিন্দু সমাজ-দর্শন মূলত অতি উচ্চ ধারণাই পোষণ করে। এই ধারণা অনুসারে নারী হ'ল পুরুষের সহধর্মিণী। ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সায়নাচার্য বলেছেন, 'স্ত্রী এবং স্বামী একই বস্তুর দুটি সমান অংশ হওয়াতে সকল দিক দিয়ে তারা পরস্পরের সমান। সুতরাং তারা ধর্মানুষ্ঠান ও প্রাত্যহিক কর্মসম্পাদন—সকল ব্যাপারেই সমান অংশ গ্রহণ করবে।' মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের কোন কোন অনুচ্ছেদে অবশ্য

১ The Hindu View of Life, 60-61

২ Ibid

এই উচ্চ আদর্শের কিছুটা অবনতি ঘটেছে দেখা যায়।"[৩]

ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের এই বক্তব্যে একটি বিষয় লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন যে, 'মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের কোন কোন অনুচ্ছেদে'—অর্থাৎ, মোটামুটিভাবে হিন্দু ন্যায়শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ সমাজে নারীর জন্য উচ্চ স্থানই নির্দেশ করেছেন।

উপরন্তু ন্যায়শাস্ত্র হ'ল আঞ্চলিক অবস্থা-ব্যবস্থার ভিত্তিতে রচিত স্মৃতিশাস্ত্র; এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতে শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে শাশ্বত আদর্শের পুনরুদ্ধারের জন্য স্মৃতিকে পরিত্যাগ করে শ্রুতিকেই অনুসরণ করতে হবে। স্বামীজী দেখেছিলেন যে, পাশ্চাত্য জগৎ, বিশেষ করে আমেরিকা, সম্পূর্ণ সচেতনভাবে না হলেও, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সাম্যের আদর্শের পুনরুদ্ধার করে চলেছে। আত্মার ঐক্যে আস্থাবান, বেদান্তে বিশ্বাসী স্বামীজী এই গতিকে স্বাগতই জানিয়েছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাতৃ-ভূমির ক্ষেত্রে এই সাম্যপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বেদান্তের দৃষ্টিতে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রভেদের—পুরুষের চেয়ে নারীকে ন্যূন করে দেখার যুক্তি কোথায়?—এই ছিল তাঁর প্রশ্ন। অবশ্য এ-সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন যে, 'সাম্য সূচনামাত্র, পরিণতি নয়।'[৪] পরিণতি নির্ভর করে সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি কিভাবে তার সাম্য-মর্যাদার ব্যবহার করে আত্মোপলব্ধির দিকে অগ্রসর হয়—তার উপর। অতএব, স্বীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমেই নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমতালে চলতে হবে; শুধু সাম্যের আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় কোন কাজ হবে না। নারীগণকে শক্তি-সামর্থ্যে উন্নত হতে হবে, কোনমতে অবনতি ঘটলে চলবে না ('They must rise in capacity, no fall'.)। সংক্ষেপে বলা যায়, স্বামীজীর আদর্শ ছিল নারীত্বের সম্প্রসারণ (growth of womanhood), এবং তাঁর আশা ছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের নারী জগতের নারী-সমাজে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে।[৫] এই কারণে তিনি পুরুষ কর্তৃক নারীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়তার (chivalry) পাশ্চাত্য আদর্শকে নারীজাতির প্রতি অবমাননা বলেই মনে করতেন।[৬]

ছ। বৈধব্য-সমস্যা :

ওপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে স্ত্রীজাতির সমস্যা-সমাধানে স্বামীজী কেন আইনগত ব্যবস্থাকে সমর্থন করতেন না। বৈধব্য-সমস্যার কথাই ধরা যাক। স্বামীজীর মতে, বিধবা-বিবাহ বৈধব্য-সংক্রান্ত সমস্যার কোন সমাধানই করতে পারে না। কোন্ জাতি কতটা উন্নত তার উত্তর ঐ জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ কি পরিমাণ প্রচলিত তা দিয়ে বিচার করলে চলবে না;[৭] বিচার করতে হবে ঐ জনগোষ্ঠিভুক্ত নারীরা নিজেদের সমস্যা কতটা নিজেরাই সমাধান করতে পেরেছে তা দিয়ে। বস্তুত ব্যক্তিত্ববিকাশের মাধ্যমে স্ত্রীজাতিকেই তাদের নিজস্ব সমস্যার সমাধান করতে হবে। এই

৩ Ibid, 63

৪ "Equality is the beginning, not the end."—Burke

৫ The Master as I saw Him, 314.

৬ Ibid. 316 ; এবং Sister Christine's Reminiscences, 214-15

৭ C. W., III, 196

উদ্দেশ্যে যা প্রয়োজন তা হ'ল মুক্তি বা স্বাধীনতা —অর্থাৎ পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার-প্রতিষ্ঠা— পুরুষের পৃষ্ঠপোষকতা নয়। কারণ, পৃষ্ঠপোষকতা বৈষম্যের নির্দেশ করে বলে তা বন্ধনেরই সূচক। যেহেতু অন্তর্নিহিত ঐশীশক্তি প্রত্যেক আত্মারই বৈশিষ্ট্য, সেইহেতু পৃষ্ঠপোষকতার ধারণা সম্পূর্ণভাবে বেদান্ত-বিরোধী।

স্বামীজীর আশা ছিল যে, প্রকৃত নারীত্বের সম্প্রসারণ নারীর বিবাহের সম্ভাবনাকে ব্যাপক করে তুলবে, এবং অন্য কোন ব্যবস্থা অপেক্ষা এই ব্যাপারই বাল্য-বৈধব্যের সমস্যার সমাধানে অধিক ফলপ্রসূ হবে।[৮]

ঙ। নিরামিষ-ভোজন :

নবজাগরণের যুগে বোধ হয় স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম খাদ্যাখাদ্যের প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ ব্যাপারেও তিনি অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, যে-কোন জনসমাজের খাদ্য-স্বভাব (food-habits) যুক্তি-বিচারের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠা উচিত। উদাহরণ-স্বরূপ, আমাদের দেশে নিরামিষ-ভোজনের ব্যাপকতার কথা ধরা যেতে পারে। স্বামীজীর মতে, নিরামিষ-আহার-ব্যবস্থা প্রবর্তিত রাখার সপক্ষে বিশেষ কোন যুক্তি নেই। নিরামিষ আহারের প্রবর্তন করেছিলেন সম্রাট অশোক। পরবর্তীকালে গতানুগতিকতার ফলে এই ব্যবস্থা অন্ধ অনুকরণেই পরিণত হয়। এই বিবর্তনে সমাজের ওপর নিরামিষ-আহারের ফলাফলের বিচার মোটেই করা হয়নি। প্রকৃতিতে এই অনুকরণ বিদেশীদের অন্ধ অনুকরণে বিচারহীন ভাবে খাদ্যাখাদ্যগ্রহণ থেকে মোটেই পৃথক নয়। নিরামিষ-আহার সাত্ত্বিক জীবনের অনুপন্থী সন্দেহ নেই, কিন্তু রাজসিক জীবনের জন্যে মাংসভোজন অপরিহার্য। অবশ্য যদি কোন দিন রসায়নশাস্ত্রের উন্নতির দ্বারা নিরামিষ-খাদ্যকে কায়িক পরিশ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপযোগী করে তোলা যায়, সেদিন আমিষ-আহারের পরিবর্তে নিরামিষ-খাদ্যগ্রহণের নির্দেশ স্বচ্ছন্দেই দেওয়া যেতে পারে। ততদিন পর্যন্ত "বরং সমাজের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা—যাঁদের কায়িক পরিশ্রম করতে হয় না—মাংসভোজন থেকে বিরত থাকতে পারেন" কিন্তু তাঁরা যেন এই নিষেধাজ্ঞা জোর করে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের দুর্বল করে না তোলেন। কয়েকটি ছাগহত্যা নিশ্চয়ই নিজের স্ত্রী কন্যার সম্মান-রক্ষায় অসামর্থ্য এবং নিজের পুত্রকন্যার মুখের গ্রাসহরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অক্ষমতার চেয়ে বেশী পাপের নয়।[৮]

আরও মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দ মাংস-ভোজনের বিরুদ্ধাচরণের মধ্যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের অন্যতম প্রতিবন্ধকের সন্ধান পেয়েছিলেন। ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু ছাত্র হিসাবে তাঁর নিশ্চয়ই জানা ছিল যে, গুপ্ত যুগেই ভারতে অস্পৃশ্যতা নিরামিষ-ভোজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। ফাহিয়েন দেখেছিলেন, উচ্চবর্ণের সকল লোকই নিরামিষাশী; মাংসাহার মাত্র নিম্নবর্ণ-সমূহ ও অস্পৃশ্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।[৯] অতএব, সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে নিরামিষ-ভোজন

৮ The Master, 283

৮ C. W., IV, 486-87

৯ Basam : Wonder That Was India, 213

একই সমাজকে দুই পৃথক সমাজে বিভক্ত করে।[১০] এর থেকে এ অনুমান করা কি অযৌক্তিক হবে যে অর্থশাস্ত্র-প্রণেতা এই কারণেই মাংসভোজনকে স্বাভাবিক বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১]

ঝ। জাতিভেদ-প্রথার চূড়ান্ত বিশ্লেষণ:

এইবার আমরা জাতিভেদপ্রথা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণার চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অগ্রসর হতে পারি। স্বামীজীর মতে, জাতিভেদপ্রথা অন্যতম সামাজিক আদর্শ, স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠানমাত্র নয়। এই অভিমত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং হিন্দুশাস্ত্রের অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। গীতায় সমাজে সংহতি-আনয়ন এবং ঐ সংহতি রক্ষার জন্য স্বধর্মপালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই ব্যবস্থাকে সংহতি বা ঐক্যপ্রকল্প বলে বর্ণনা করা যায়, যার লক্ষ্য হল সম্প্রসারণ।

কিন্তু এর ফলে অবশ্যম্ভাবিরূপে সামাজিক মূল্যায়নের প্রশ্ন ওঠে। সমাজের পক্ষে যে দ্রব্যাদি অধিক প্রয়োজন সমাজ কি তাদের অধিক মূল্য নির্ধারণ করবে? সমাজ সম্বন্ধে জৈব ধারণা (organic conception) এবং সাম্যনীতিকে মেনে নিলে অধিক মূল্য-নির্ধারণের সপক্ষে যে-কোন যুক্তিকে অস্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। জীবদেহের কোন অঙ্গকে যেমন অন্য কোন অঙ্গ অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় মনে করা যায় না, সমাজের ক্ষেত্রেও তেমনি কোন পেশা বা কর্মকে অধিক মূল্যবান বলে গ্রহণ করা চলে না, "সমাজ-জীবনে আমি এক কর্তব্য সম্পাদন করি, আর তুমি সম্পাদন কর অন্য এক কর্তব্য। তুমি হয়তো দেশ শাসন কর, আর আমি জুতো সারিয়ে বেড়াই। কিন্তু তুমি আমার চেয়ে বড় কিসে? আমি হয়তো দেশ শাসন করতে পারি না, কিন্তু তুমিও কি জুতো সারাতে পার? আমি জুতো সারাতে দক্ষ, আর তুমি না হয় বেদপাঠে পটু। কিন্তু এটা কোন যুক্তি নয় যে, তুমি আমাকে তোমার পায়ের তলায় রাখবে।"[১২]

অতএব, জাতিভেদপ্রথা সমর্থনীয়; নিন্দনীয় হল অযৌক্তিক সামাজিক মূল্যায়নের ফলে সৃষ্ট বৈষম্য।

অবশ্য জাতিভেদপ্রথার বিকৃতির ফলে অস্পৃশ্যতা, সংকীর্ণতা প্রভৃতি সামাজিক পাপ মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে। এর ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সামাজিক ঐক্য উভয়ই বিনষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, বেদান্তের নীতিও অস্বীকৃত থেকে যায়। কিন্তু এর প্রতিকার হ'ল আদর্শের পুনরুজ্জীবন বা পুনর্নবীকরণ, জাতিভেদপ্রথার বিলোপসাধন নয়। এই প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, স্বামী বিবেকানন্দ কখনও জাতিভেদপ্রথার বিলোপসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন না; তিনি কেবল 'সংস্কারের' মাধ্যমে জাতিভেদপ্রথার পুনর্নবীকরণেরই নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে পরিশোধিতরূপে আদর্শটি আবার সমাজের ঐক্যসাধনে সমর্থ হয়। জাতিভেদপ্রথার বিলোপসাধন বলতে অভিন্নতা—প্রকারভেদহীনতা (uniformity) বোঝায়। অভিন্নতা নির্দিষ্টতারই (fixity) নামান্তর। সুতরাং একে আর এক বন্ধন বলে

১০ ডিসরেইলী একই সমাজে ধনী-দরিদ্রের অস্তিত্বকে দুটি পৃথক সমাজের লক্ষণ বলে অভিহিত করেছিলেন।

১১ Arthashastra, Shyamasastri, Tr., 135-36

১২ C. W., III, 245

গণ্য করতে হবে। বন্ধনমুক্তির উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে আর এক বন্ধন নির্দেশ করা সম্ভব ছিল না। যা সম্ভব ছিল তা হ'ল জাতিভেদপ্রথার যুক্তিসিদ্ধকরণের সমর্থনে অভিমত প্রচার করা, এবং তিনি তাই করেছিলেন।

এই উদ্দেশ্যে তিনি আন্তঃবর্ণ বিবাহ, আন্তঃবর্ণ-ভোজন, সমাজশিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১৩] এবং সর্বোপরি উপদেশ দিয়েছিলেন সেবাকে জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে, কারণ মাত্র এর ফলেই সমাজ-রথচক্রে প্রয়োজনমত তৈল সিঞ্চিত হতে পারে। দরিদ্র ও হতভাগ্য ব্যক্তিদের শিব বলে গণ্য করে তাদের উপাসনা করতে হবে খাদ্য বস্ত্র ও বিদ্যাদান ছাড়াও মানবাত্মার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তাদের অবহিত করতে হবে।

এই প্রকার উপাসনা উপাসক ও আরাধ্য-দেবতা উভয়েরই ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। উপাসক উপলব্ধি করে যে, গ্রহণ অপেক্ষা দানই শ্রেয়ঃ, এবং এর মাধ্যমে তার মধ্যে গড়ে ওঠে প্রকৃত 'সামাজিক মন' (true social mind), যাকে সামাজিক ঐক্যের পথে এক বিশেষ পদক্ষেপ বলে গণ্য করা যায়। আরাধ্যদেবতা হিসাবে গ্রহীতাও অনুভব করতে থাকে যে, সে কোন অদৃশ্য শক্তি কর্তৃক চিরকালের জন্য অত্যাচারের কবলে নিক্ষিপ্ত হয়নি। সে অনুভব করে যে, সমাজেও 'ন্যায়' (justice) আছে। ফলে তার মধ্যেও সামাজিক মন শিকড় গাড়তে থাকে। এই দুই সামাজিক মনের সমন্বয়েই সৃষ্টি হয় সমাজ-সংহতি, যা প্রথমে ক্ষুদ্র সংকীর্ণ পথাকারে থাকলেও শীঘ্রই প্রশস্ত রাজপথে পরিণত হয়। ফলে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাকে সৌভ্রাত্র বলেই অভিহিত করা যায়। এই অবস্থায় যা প্রয়োজন তা হল সংগঠন (organisation)

৫। বংশবৈশিষ্ট্য :

বংশবৈশিষ্ট্য (heredity) সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকার হিসাবে আর্য-সন্তানোৎপাদন তাঁর আধা-ইউজেনিক (quasi-eugenic) নীতির সঙ্গে ঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলেই মনে হয়

স্বামীজী স্পষ্টতই বংশবৈশিষ্ট্যতত্ত্বের (theory of heredity) বিরোধী। কারণ তাঁর ধর্মবিশ্বাস দ্বারা একতত্ত্ব কখনই সমর্থিত হতে পারে না। বেদান্তে বিশ্বাস করলে বংশবৈশিষ্ট্যতত্ত্বকে স্বীকার করা যায় কি করে?[১৪] "প্রকৃতপক্ষে কেহই দুর্বল নয়; আত্মা হল অপরিমেয় সম্ভাবনাপূর্ণ, সর্বজ্ঞা এবং সর্বকর্মক্ষম।" বুদ্ধ বা যিশুর মত বিরাট শক্তির আবির্ভাব এক জীবনে সম্ভব নয়, কারণ আমরা জানি তাঁদের পিতারা কে ছিলেন। সূত্রধর ও তার পুত্রের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান তার ব্যাখ্যা কিভাবে করা যাবে? বংশবৈশিষ্ট্য বা পিতৃগুণতত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা মোটেই সম্ভব নয়।[১৫]

তাঁর ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞানও স্বামীজীকে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত করেছিল। আফ্রিকার নরমাংসভোজী কোন উপজাতি থেকে এক নিগ্রো যুবক শিকাগোর ধর্মসভার প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করে এক সুন্দর বক্তৃতা

১৩ Swami Nikhilananda : Swami Vivekananda, 132

১৪ C. W. I, 30

১৫ Ibid

প্রদান করেছিল। একমাত্র এই দৃষ্টান্তই কি বংশবৈশিষ্ট্যতত্ত্বকে শূন্যগর্ভ বলে উড়িয়ে দেবার জন্যে যথেষ্ট নয়?

সুতরাং মানুষে মানুষে যে পার্থক্য তার উৎস হ'ল অবিদ্যা, বংশগত গুণাগুণ নয়।

গাত্রবর্ণ ও অন্যান্য কারণে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে আত্মশ্লাঘা তাকে স্বামীজী তাচ্ছিল্য করেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন, এবং ঘোষণা করেছিলেন: "আমার শ্বেতবর্ণের আর্য পূর্বপুরুষদের নিকট আমি নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ, কিন্তু তার চেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ হরিদ্রা-গাত্রবর্ণের মঙ্গোলীয় পূর্বপুরুষদের কাছে এবং সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ আমার কৃষ্ণবর্ণের নিগ্রো পূর্বপুরুষদের কাছে।" ("If I am grateful to my white-skinned Aryan ancestor, I am more so to my yellow-skinned Mongolian ancestor, and most of all, to the black-skinned Negrotoid.")[১৬]

এখন প্রশ্ন: তাহ'লে আর্য-সন্তানোৎপাদনের জন্যে বিবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন কি? এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত সমাজশিক্ষাকে কার্যকর করাই ত' যথেষ্ট। সোজাসুজি বলতে গেলে, আর্যগুণবিশিষ্ট সন্তানোৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যেই বংশবৈশিষ্ট্যতত্ত্বের একরকম স্বীকৃতি রয়েছে, যে তত্ত্বকে বেদান্ত অস্বীকার করতে বাধ্য। স্বামীজী এই তত্ত্বসংঘর্ষ সম্বন্ধে ঠিক সচেতন ছিলেন কিনা, তা জানা যায় না। তবে আর্যগুণসম্পন্ন সন্তানোৎপাদনের জন্য মনুকে উদ্ধৃত করা যে বংশবৈশিষ্ট্যতত্ত্বকে একরকম স্বীকার করা, তাতে তর্কের বিশেষ অবকাশ নেই।

অবশ্য বংশবৈশিষ্ট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে উপরি-উক্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি—অর্থাৎ ঐ তত্ত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যে সমাজদর্শনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, সে-সম্বন্ধে স্বামীজী সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। বংশবৈশিষ্ট্যের ভূয়োবহিঃপ্রকাশকে অনেকে অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে যে বিশেষাধিকারকে (special privileges) আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে, এ বিষয়ে স্বামীজী বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন। "বংশ-বৈশিষ্ট্যের দরুন ব্রাহ্মণের যদি অন্ত্যজ অপেক্ষা শিক্ষালাভের অধিক ক্ষমতা থাকে, তবে ব্রাহ্মণের শিক্ষার জন্য কোন অর্থ ব্যয় না করে অন্ত্যজের শিক্ষার জন্যই সব অর্থ ব্যয় করা উচিত। ব্রাহ্মণ যদি জন্মসূত্রে বিচক্ষণ হন তবে তিনি নিজেই শিক্ষালাভ করতে পারবেন, তাঁর পক্ষে কোন সহায়তার প্রয়োজন হবে না। অপর সকলে যদি জন্মসূত্রে বিচক্ষণ না হয় তবে তাদের জন্যই সকল শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে—সকল শিক্ষককে তাদের জন্যই নিযুক্ত করতে হবে।"[১৭]

এই হ'ল 'ন্যায় এবং যুক্তি' (justice and reason); একে আবার 'কল্যাণ' বলেও অভিহিত করা যায়। স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেছিলেন, "অভিজ্ঞতার ফলে আমি দেখেছি যে, শাস্ত্রের কথাই সত্য—সমস্ত অকল্যাণ আসে বৈষম্য থেকে এবং সমস্ত কল্যাণ প্রসূত হয় সাম্যে বিশ্বাস থেকে—অন্তর্নিহিত ঐক্যের ধারণা থেকে। এই হ'ল বেদান্তের আদর্শ।"[১৮]

বেদান্তের এই আদর্শকে দৈনন্দিন জীবনে উপলব্ধি করা যাবে কিভাবে? স্বামী

১৬ The Master as I saw Him, op. cit., 219-20

১৭ C. W., III, 193

১৮ Ibid, 194

বিবেকানন্দের উত্তর হ'ল: এর জন্যে প্রত্যেককে আদর্শ ব্রাহ্মণে পরিণত করার প্রচেষ্টা করতে হবে। অতএব "নির্দেশ হ'ল, বিশ্রাম পরিহার করে সকলকেই এগিয়ে যেতে হবে। উচ্চতম জাতি থেকে অন্ত্যজ পর্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হতে হবে। বেদান্তের এই আদর্শ শুধু এখানে নয়, সর্বত্রই প্রযোজ্য।"[১১]

এই বিশ্বজনীন আদর্শ-রূপায়ণ প্রধানত গৃহীর (householder) উপরই নির্ভরশীল, কারণ গৃহীই সমাজসৌধের স্তম্ভ। (ক্রমশঃ)

১১ Ibid, 198

ঈশ্বর-বিশ্বাস ও যুক্তি

শিবদাস

ভগবান আছেন যে. তার প্রমাণ কি? কত তর্ক হয়েছে, কত যুক্তি দেখানো হয়েছে এ নিয়ে, এখনো হচ্ছে। কিন্তু নিশ্চিত কোন সমাধান এখনো এদিক থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। একদল যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন, ভগবান আছেন। আর একদল যুক্তি দিয়েই বোঝাচ্ছেন যে ভগবান নেই।

ঈশ্বর নেই বা আছেন, এ নিয়ে যুক্তির লড়াই আজকের নাকি? এমন যে ভারতবর্ষ, যেখানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের শোয়া বসা খাওয়া সবই ধর্মকে আঁকড়ে চলে, সেখানেও ভগবানের নাস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছে অতি প্রাচীনকাল থেকেই। রামায়ণের যুগেও, কিংবা তারও আগে থেকে নাস্তিকাবাদ যে এদেশে ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে। রামচন্দ্রকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভরত যখন তাঁর কাছে গিয়ে সদলবলে হাজির হলেন, তখন সে-দলে বশিষ্ঠ প্রভৃতির সহিত জাবালিও ছিলেন। ভরত যখন হাল ছেড়ে দিলেন, বশিষ্ঠও যখন ধর্মের কথা শুনিয়ে রামচন্দ্রকে বুঝিয়ে উঠতে পারলেন না, জাবালি তখন মুখ খুললেন। যুক্তির তোড়ে ভগবান, ধর্ম, পিতার প্রতি শ্রদ্ধা—এসব উড়িয়ে দিয়ে জড়বাদে বিশ্বাসী করতে চাইলেন স্বয়ং রামচন্দ্রকেই। বললেন: 'ঈশ্বর বলে কিছু নেই। ধর্ম বলেও কিছু নেই। ঈশ্বর যদি থাকতেন, তাহলে জগতের আর পাঁচটা জিনিস আমরা যেমন ইন্দ্রিয়সহায়ে দেখতে পাই, তাঁকেও তেমনি দেখতে পেতাম সবাই। পরকালও নেই। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি করা বৃথা অর্থব্যয়। মরে যাবার পর মানুষ আবার থাকে নাকি, খায় নাকি? লোক ঠকিয়ে দান-টান আদায় করার জন্যই একশ্রেণীর লোক শ্রাদ্ধ, দীক্ষা ইত্যাদির প্রচলন করেছে। আর পিতৃসত্যপালনের জন্য এত কষ্টস্বীকার করাও অর্থহীন; মা-বাপের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তো সাময়িক—তাঁরা তো আমাদের জন্মের নিমিত্ত-কারণ মাত্র! কাজেই মা-বাপের প্রতি যারা (শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতির জন্য) আসক্ত হয়, তারা পাগল ছাড়া আর কি?'

এইসব যুক্তি চার্বাক-দর্শনে দেখানো হয়েছে। চার্বাক প্রভৃতি এই কথাই বলেছেন—'দেহ পুড়ে গেলেই মানুষের সব ফুরিয়ে গেল—পরলোক বলে কিছু নেই। কতকগুলি ধূর্ত, ভণ্ড, রাক্ষসতুল্য মানুষ লোক-

ঠকিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য শাস্ত্রাদি রচনা করেছে। ঈশ্বর নেই, কারণ তাঁকে দেখা যায় না। জগতের সৃষ্টি প্রকৃতির নিয়মে চারটে ভূতের (পদার্থের মূল উপাদান) সংযোগের ফলেই হয়েছে, জগৎ-সৃষ্টির জন্য ঈশ্বর বলে কাউকে কল্পনা করবার কোন প্রয়োজনই নেই। আমাদের মন চেতনা ইত্যাদিও এই সংযোগের ফলে উদ্ভূত—আত্মা বলে পৃথক কিছু নেই। কাজেই যে কদিন বেঁচে আছ, ধর্ম ঈশ্বর আত্মা পরলোক—এসব কাল্পনিক জিনিস নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে যে-কোন উপায়ে হোক ভোগ্যবস্তু যোগাড় করে চুটিয়ে ভোগ করে নেওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ। স্ত্রীসম্ভোগেই জীবনের পরম পুরুষার্থ; এ বিষয়ে "যথেচ্ছং বিহরেৎ নরঃ", কোন নীতি মেনে চলা বোকামি, মন যা চাইবে তাই করবে।'

ঈশ্বর, ধর্ম, পবিত্রতা, নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে আধুনিক যুগেও এইসব পুরনো যুক্তিই আমরা শুনতে পাচ্ছি, নতুন কিছু নেই। একই যুক্তি, ভাষা একটু পালটে বলা, আধুনিক বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতি জ্ঞানের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে অধিকতর জমকালো করে বলা মাত্র। মূল যুক্তি একই—ঈশ্বর নেই, কারণ তাঁকে দেখা যায় না; সৃষ্টির ব্যাখ্যা ঈশ্বর ছাড়াই দেওয়া যায়; মানুষের দেহাতীত কোন সত্তা নেই, চেতনা পদার্থের সংমিশ্রণের 'বাই-প্রোডাকট' মাত্র—আত্মা বা পরকাল বলে কিছু নেই; ধর্মকর্ম, পবিত্রতা, সতীত্ব—এসব লোককে দাবিয়ে রাখার, লোক ঠকিয়ে স্বার্থ সিদ্ধি করার ফিকির মাত্র, যারা বোকা তারাই এসবে বিশ্বাসী, ইত্যাদি।

যুক্তিগুলি কিন্তু গভীর নয়। সাধারণ মানুষকে হয়ত এসব বলে বোঝানো যায়, কিন্তু যুক্তিরই একটু গভীরে গেলে আর টেকে না।

একটা গল্প বলছি:

বছর চল্লিশ আগেকার কথা। পল্লীগ্রামের একটা স্কুলে ইনস্পেক্টার আসবেন। খবরটা আসা মাত্র শিক্ষকগণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। অভ্যর্থনার আয়োজন চলতে লাগল। ছেলেদের পই পই করে বলে দেওয়া হল, ইনস্পেক্টার এসে কোন প্রশ্ন করলে—প্রশ্ন দু-একটা করবেনই—যেন ভালভাবে ভেবে সঠিক উত্তর দেওয়া হয়, স্কুলের যেন কোন বদনাম না হয়।

যথাদিনে এলেন ইনস্পেক্টার। আফিসে বসে গতানুগতিক কাজ সেরে বেরুলেন ছেলেদের দেখতে; প্রধান শিক্ষক এবং আরো কয়েকজন শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন। একটি ক্লাসে ঢুকে প্রশ্ন করলেন, 'বল তো, আমি ছ'বছর বিলেতে ছিলাম—উচ্চতর শিক্ষার জন্য। সেখান থেকে ফিরে এসে কাজ করছি ছ'বছর। আমার বয়স কত?'

প্রশ্ন শুনে ছেলেদের মাথা ঘুরতে লাগল—কিভাবে উত্তর বের করবে তার কোন হদিশই পেল না। শিক্ষকরাও হতভম্ব—এ আবার কি রকম প্রশ্ন!

ইনস্পেক্টার একের পর এক ছেলেদের জিজ্ঞেস করে চললেন, 'তুমি? তুমি? তুমি বলতে পার?' কিন্তু কেউ-ই উত্তর দিতে পারল না। দেবে কি করে? হিসেব করবে কি করে? কোন গাণিতিক যুক্তি আছে নাকি প্রশ্নটিতে?

ক্লাসের সব ছেলেরাই একে একে নিরুত্তর হয়ে মাথা হেঁট করে বসে রইল। একজন তখনও বাকী ছিল। সে পিছনের বেঞ্চে বসে এতক্ষণ একমনে একখানা গল্পের বই পড়ছিল।

প্রশ্ন শোনেই নি।

ইনস্‌পেক্‌টার সব শেষে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। কয়েকবার ডাকাডাকির পর সে মাথা তুলে চাইল—'কি বলছেন, স্যর ?'

ইনস্‌পেক্‌টার প্রশ্নটি আবার বললেন, 'ছ'বছর বিলেতে ছিলাম। ফিরে এসে ছ'বছর কাজ করছি। বয়স কত আমার ?'

ছেলেটি কিছুক্ষণ হাঁ করে, অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'চল্লিশ বছর।'

সঠিক উত্তরই দিয়েছে। খুশী হয়ে ইনস্‌পেক্‌টার অন্য ক্লাসে গেলেন।

শিক্ষকরা কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলেন—ছেলেটা হিসেব করল কি করে? অথচ মিলে তো গেছে দেখা গেল। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লো নাকি—লেগে গেছে ঠিক মতো?

যতক্ষণ ইনস্‌পেক্‌টার ছিলেন, শিক্ষকরা মনে মনে উস্‌খুস করতে লাগলেন। তিনি চলে যাবার পরই ছেলেটিকে ডেকে পাঠানো হল প্রধান শিক্ষকের ঘরে। আসা মাত্রই প্রধান শিক্ষক প্রশ্ন করলেন :

'উত্তরটা তো মিলে গেল দেখলাম। আন্দাজে একটা বলে দিলি নাকি?'

ছেলেটি বলল, 'আন্দাজে বলব কেন, স্যর? হিসেব করেই বলেছি।'

প্রধান শিক্ষক বললেন, 'হিসেব তুই করলি কি করে? প্রশ্নের তো কোন মাথামুণ্ডু নেই—গাণিতিক কোন যুক্তি নেই এ প্রশ্নে—'

ছেলেটি আবার বলল, 'যুক্তি আছে বইকি, স্যর, হিসেব করেই বলেছি। আমার মেজদা আধ-পাগলা। তার বয়স কুড়ি বছর। ইনস্‌পেক্‌টার সাহেবের প্রশ্ন শুনে বুঝলাম, ইনি বদ্ধ পাগল—পুরো পাগল। কাজেই দাদার বয়সকে দ্বিগুণ করে চল্লিশ বছর বললাম। অর্ধেককে দুই দিয়ে গুণ করলে পুরো হবে, এতো অঙ্কেরই হিসেব, স্যর।'

নিশ্চয়ই এটা একটা যুক্তি—গাণিতিক যুক্তি অকাট্য। কিন্তু তবুও, ছেলেটির কাছে যুক্তি বলে মনে হলেও, এক্ষেত্রে এটা যুক্তিই নয়। এ ধরণের যুক্তির দার্শনিক নাম 'যুক্ত্যাভাস।' আপাতদৃষ্টিতে যুক্তি বলে মনে হয় কারো কারো কাছে, অথচ যুক্তি নয়। ফাঁক আছে, ত্রুটি আছে অনেক তার ভেতর। এই ধরণের যুক্তি দিয়ে সাধারণ লোককে হয়ত বোঝানো চলে, কিন্তু ধোপে টেকে না এসব।

ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে-সব যুক্তি সচরাচর আমরা শুনতে পাই আজকাল, সে সবের অনেকগুলো প্রায় এই ধরণেরই। যেমন একটা হল—'ঈশ্বরকে সবাই দেখতে পাই না। কাজেই তিনি নেই।' যা আছে, যে-সব জিনিসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরাই নিঃসন্দেহ, তার সবই কি আমরা দেখতে পাই? অসংখ্য বিদ্যুৎচুম্বক-তরঙ্গ সব সময় খেলে বেড়াচ্ছে আমাদের চারিদিকে। সেগুলি আছে—আধুনিক যুগে যা বেদবাক্য-তুল্য সেই বিজ্ঞানেরই কথা, আছে। অথচ তার ক'টাকে আমরা দেখতে পাই? অতি অল্পসংখ্যক কয়েকটিকে আলোকরূপে দেখি, আর কয়েকটিকে তাপরূপে অনুভব করি। বাকীগুলির অস্তিত্বে বিশ্বাস করি বেতার প্রভৃতি যন্ত্রের মাধ্যমে তার ফল দেখে, আর বিজ্ঞানীদের কথায়। 'ঈশ্বরকে দেখা যায় না বলে তিনি নেই'—এই যুক্তির উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যা বলেছিলেন তা খণ্ডন করবো কেমন করে? : দিনের বেলা তারা দেখা যায় না ব'লে কি বলতে হবে তখন আকাশে তারা

থাকে না ?

তাছাড়া দেখা যায় না, একথাই বা ওঠে কেমন করে? অধিকাংশ লোক দেখতে না পেলেও হাজার হাজার লোক তো যুগে যুগে তাঁকে দেখে হেঁকে ডেকে বলে গেছেন, 'ঈশ্বরকে দেখেছি।' এ লোকগুলিকে মানুষ বলে ধরবো না কেন? তাঁদের কথা বিশ্বাস করবো না কেন? তাঁরা সংখ্যায় কম ব'লে? এটা কি যুক্তি হল নাকি? একটা অতি সামান্য জিনিস—আমাদের মাথার চুলগুলো সব পেঁপের ডাঁটার মতো ফাঁপা, নিরেট নয়। এটি সত্য, বহু ব্যক্তি অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে তা দেখেছেন। কিন্তু সবাই দেখেছে কি? অনুপাত কষলে দেখা যাবে, লক্ষের মধ্যে একজনও বোধ হয় দেখেনি। তাহলে এ সত্যটাকে মিথ্যা বলতে হবে নাকি? এই মাত্র সবে বছর দেড়েক হয়ত হ'ল একজন বিজ্ঞানী ইলেকট্রন-মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে এ্যাটমের ছবি তুলেছেন। তার আগে পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানীও এ্যাটম 'দেখেন'নি। কিন্তু তার অস্তিত্ব অস্বীকৃত ছিল কি?

এসব তো হালকা যুক্তি। কোন গভীর সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, ঈশ্বর নেই। যুক্তি দিয়ে এই নাস্তিক্যবাদ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আদিমকাল থেকেই হয়ে আসছে ভারতে, এটা নতুন কিছু নয়, কিন্তু ভারতে আসন গেড়ে জাঁকিয়ে বসতে পারেনি তা কোন দিনই। পারবেও না কখনো।

কেন? ভারতে যুগে যুগে ধর্মবীরেরা এসে যুক্তি দিয়ে আস্তিক্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বলে?

মোটেই তা নয়। যুক্তিতে যেমন ঈশ্বর নেই—একথা প্রমাণ করা যায় না, তেমনি তিনি আছেন—একথাও প্রমাণ করা যায় না। অমন যে অতি-তীক্ষ্ণধী শঙ্করাচার্য, তিনিও করতে পারেননি। যুক্তি দিয়ে বোঝাবার সময় চরম প্রমাণ হিসেবে তাঁকেও মানতে হয়েছে বেদকে—যাঁরা ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে নিজেদের অনুভূতির কথা বলে গেছেন, সেই ঋষিদের কথাকে। ঋষিরা নিজে যা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই-ই বলেছেন। আধুনিক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলেছেন। কাশী ঘুরে এসে কেউ যেমন কাশীর বর্ণনা দেয় তেমনি; অপরের ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে বা অনুমান করে নয়। এই প্রত্যক্ষই প্রমাণ। তবে বেদাদি শাস্ত্রে কি যুক্তি নেই? আছে বইকি, দুর্দান্ত সব যুক্তি আছে। তবে সে যুক্তির অবতারণা যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য নয়; সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ থেকে লব্ধ। যাকে বলা হচ্ছে, তার তো তখনো প্রত্যক্ষ হয়নি, সে যাতে বুদ্ধিতে পাকা করে বিষয়টি ধরতে পারে, নিজে প্রত্যক্ষ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়, সেজন্যই যুক্তির অবতারণা। তা নইলে তাঁরা বেদকে পর্যন্ত 'অবিদ্যা'-র ভেতর ফেলতে পারেন? প্রত্যক্ষই প্রমাণ। আমি যা দেখছি, সে সত্যকে কি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হয় নাকি?—'দেখছি তিনিই সব হয়ে রয়েছেন, বিচার আর কি করবো?'

কিন্তু এখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। বাপু হে, তুমি বলছো বলেই তোমার কথা মেনে নেব কেন? ঋষিরা বলেছেন, যীশু, মহম্মদ, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি বহু ব্যক্তি বলেছেন বটে যে, তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন ভগবান আছেন। তা, বললেই তো আর হল না। 'মাথার খেয়ালে', হ্যালুসিনেশন দেখেও তো সেটাকে সত্যি ভেবে 'ঈশ্বরকে দেখেছি' বলতে পারেন

তাঁরা ? কেউ বলছে বলেই, সে যেই-ই হোক, তার কথা মেনে নেবো, এযুগের মানুষ আমরা অত বোকা নই। আধুনিক চিন্তার, ঈশ্বর সম্বন্ধে আধুনিক সর্ববিধ সংশয়ের প্রতিনিধিরূপে নরেন্দ্রনাথও একদিন ভেবেছিলেন একথা—শ্রীরামকৃষ্ণই হন আর যেই হন, বলেছেন বলেই কোন কথা মেনে নেয়া চলবে না। শ্রীরামকৃষ্ণকে এমন কথা বলতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি, 'মা দেখিয়ে দিলেন, না মাথার খেয়ালে দেখলেন তা বুঝলেন কেমন করে ?' বলেছিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন প্রমাণ করে দিয়েছে যে, পদে পদে আমরা ভুল দেখি।

তা মানতেই হবে কেন কারো কথা। নিশ্চয়ই, কেউ বলছেন বলেই মানতে হবে না কিছু। তবে, আমাদের যুক্তিতে যেন ফাঁকি বা পক্ষপাতিত্ব না থাকে, বিশ্বাসকেই যেন বলে ভুল না করি। যীশু, কৃষ্ণ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ 'ভগবান আছেন' বলেছেন বলেই তা মানবো না, কিন্তু মার্কস বা রাসেল বা অন্য কেউ 'ভগবান নেই' বলামাত্রই তা চোখ-কান বুজে মেনে নেবো—এ যদি হয়, তাহলে আর নিজেদের আধুনিকও বলা চলে না, বুদ্ধিমানও না, যুক্তিবাদীও না, বৈজ্ঞানিক-মনোবৃত্তি-সম্পন্নও না। এরূপ হলে যারা যীশু প্রভৃতির কথা বিশ্বাস করেন তাদের যদি কুসংস্কারগ্রস্ত বলি, তাহলে বলতে হবে আমরাও সমভাবে কুসংস্কারগ্রস্ত ; আমরা যুক্তির দোহাই দিই, কিন্তু যুক্তিবাদী নই—আমাদেরও অবলম্বন বিশ্বাস। এখানে মনে রাখা দরকার, 'অন্ধবিশ্বাস' ব'লে কিছু থাকতে পারে না ; হয় বিশ্বাস, না হয় যুক্তি।

সে ছিলেন আমাদের যুগের নরেন্দ্রনাথ। তিনি আস্তিক্যবাদ নাস্তিক্যবাদ সব ঘেঁটে শেষে বুঝেছিলেন যুক্তির দৌড় কতখানি। বলেছিলেন, যুক্তি দিয়ে ঈশ্বর আছেন একথাও প্রমাণ করা যায় না, তিনি নেই একথাও না। আর কারো কথা শুনেই তা মেনে নেবার মতো ছেলেই ছিলেন না তিনি। তা নইলে মাকালী-গতপ্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের ওপর বলতে পারতেন—মাকালী 'পুত্তলিকা' ? বলতে পারতেন, তাঁর ঈশ্বরদর্শন 'হ্যালুসিনেশন' ? শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে কখনো বলেননি—আমি বলছি বলেই মানো।

তাহলে ঈশ্বর আছেন, কি নেই তার সিদ্ধান্ত হবে কি করে ? যুক্তি যদি বিষয়টা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে অপারগ হয়, যাঁরা বলছেন 'আমি ঈশ্বরকে দেখেছি, ঈশ্বর আছেন', তাঁদের কথাও যদি মেনে না নিই, তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বা নাস্তিত্বের প্রমাণ কি ?

প্রমাণ, আগেই বলেছি, একটাই আছে, যা শুধু এ বিষয়ে নয়, সব জ্ঞানেরই একমাত্র প্রমাণ—প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই বিজ্ঞান প্রভৃতি সব জ্ঞানই যুক্তি-অনুমানাদির হাত ছড়িয়ে জ্ঞানের পরিসর আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারে মাত্র। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু না থাকলে সবই ফাঁকা।

ঈশ্বরের প্রত্যক্ষদর্শীরা তো সেই কথাই বলছেন – আমি প্রত্যক্ষ করেছি বলে মানবে কেন—নিজে যাচিয়ে বাজিয়ে নাও, নিজে প্রত্যক্ষ কর। আমি যে পথে প্রত্যক্ষ করেছি, সে পথ তো বলে দিচ্ছি। তুমি চলো, নিজে দেখো আমি পথের শেষে যা দেখেছি তা সত্য কিনা। যদি না দেখতে পাও তখন বো'লো আমার কথা সত্য নয়। নিজে গিয়ে, যাচাই করে আসার আগে এ সম্বন্ধে কোন মতামত দেবার অধিকার আমাদের আছে কি ?

যুক্তির দিক থেকে 'নেই' বলা ছাড়া

গত্যন্তর নেই। ঠিক এই কথাটাই নরেন্দ্রনাথের মনে দাগ কেটেছিল মাকালীকে প্রথম প্রত্যক্ষ করার পর। ভেবেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনাদি সত্য কি না, শাস্ত্রের কথা সত্য কি না, সে সম্বন্ধে কোন মতামত দেবার অধিকারই তাঁর নেই, কারুরই নেই, যতক্ষণ না নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনে তা যাচাই করে তার সত্যাসত্য নিজে পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে। নরেন্দ্রনাথ যথার্থই যুক্তিবাদী ছিলেন, 'খাপখোলা তলোয়ার' ছিলেন, আমাদের মতো যুক্তির দোহাই দিয়ে একটা কুসংস্কার ছেড়ে নিজের পছন্দমতো আর একটা কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরতেন না, তাই নিজের এতদিনের ধারণাকে অযৌক্তিক বলে বোঝামাত্রই তৎক্ষণাৎ সেটা ত্যাগ করতে পেরেছিলেন

বুদ্ধির, যুক্তির সীমা আর কতটুকু? সত্যের কতটুকু সে ধরতে পারে? সে হল 'একসের ঘটি'; তাতে 'চারসের দুধ' কি ধরানো যায় কখনো? যুক্তি, শাস্ত্রবাক্য, সত্যদ্রষ্টাদের কথা—এসবই হল পথের নির্দেশ পাবার জন্য, পথ চেনার জন্য, পথ চলতে প্রেরণা পাবার জন্য। এর প্রয়োজনও যথেষ্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু ভগবান আছেন কি নেই, তার প্রমাণ পথে চলে নিজে না দেখলে পাওয়া যাবে কোথায়? পথে চলার জন্য যেটুকু প্রাথমিক বিশ্বাসের প্রয়োজন, সেটুকু না হলে তো কোন জ্ঞানলাভের পথেই, জীবনেরই পথে আমরা চলতে পারি না।

ভারতে যুগযুগান্তর ধরে অসংখ্য তীর্থযাত্রী প্রত্যক্ষলাভের পথ ধরে চলেছেন, যুগে যুগে অসংখ্য ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষও করেছেন। আজও করছেন। এই চলাটাই ধর্ম, কেবল কোন মতবাদ বা শাস্ত্র বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করা মাত্র নয়। 'বিশ্বাস' আনার জন্য তো আর পথের শেষ পর্যন্ত যেতে হয় না। চলার সময় সত্যদ্রষ্টা-কথিত বর্ণনার সঙ্গে পথের দৃশ্য মিললেই, অল্পস্বল্প প্রত্যক্ষ অনুভূতি হতে থাকলেই বিশ্বাস এসে যায়। যুক্তির সাধ্য কি, সে বিশ্বাস টলায়।

যারা পথেই নামবে না, অথচ বলবে 'আমি যুক্তিবাদী, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না' (এই 'বিশ্বাস করি না'টাও আবার হয়তো নিজের নয়, অপরের কথায় 'বিশ্বাস' করে পাওয়া), তাদের কথার মূল্য যুক্তির দিক থেকে কতটুকু? আদৌ কিছু আছে কি?

ভারতে সুদূর অতীত হতেই তীর্থযাত্রীরা চলেছেন ঈশ্বর-প্রত্যক্ষের মহাতীর্থের পথ ধরে। নাস্তিক্যবাদ তাঁদের পথের পাশে দাঁড়িয়ে যত জোর গলায় যুক্তির দোহাই দিয়ে আওয়াজ তুলুক না কেন, পথ থেকে তারা ফিরবে না কোন দিনই। প্রত্যক্ষকে যুক্তি নাকচ করবে কেমন ক'রে?

সমালোচনা

নিদ্রা বা সুষুপ্তি—শ্রীরামশঙ্কর ভট্টাচার্য। দি অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ হল, ৩০।১৩৪ হৌজ কটরা; বারাণসী ১ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০; মূল্য এক টাকা।

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান এবং ভারতীয় অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের উপর গবেষণা করিয়া নিদ্রা ও সুষুপ্তি বিষয়ে সুধী লেখকের প্রাঞ্জল হিন্দী ভাষায় রচিত মনোজ্ঞ পুস্তকখানি পাঠ করিলে আগ্রহশীল পাঠকমাত্রই উপকৃত হইবেন। গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্যপূর্ণ বিষয়সমূহের কয়েকটি: নিদ্রার প্রভাব ও উপাদেয়তা, নিদ্রাবিচার, নিদ্রার পরিচয়, নিদ্রাকালীন সুখবোধ, নিদ্রা ও শরীর, নিদ্রাতীত অবস্থা।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টি এবং দার্শনিক প্রজ্ঞার অপূর্ব সামঞ্জস্য প্রবন্ধগুলিতে রহিয়াছে।

তন্মাত্র তথা বিশ্ব কা মনোময় মূল—শ্রীরামশঙ্কর ভট্টাচার্য। প্রকাশক: দি অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল রিসার্চ হল, ১৩৪ হৌজ কটরা, বারাণসী। পৃষ্ঠা ৬৪; মূল্য এক টাকা।

পুস্তকটিকে পঞ্চভূত এবং পঞ্চতন্মাত্র সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়া বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ২৭টি প্রবন্ধে তন্মাত্র সম্বন্ধে নানা দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যে চিন্তা প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাতে দুর্বোধ্য বিষয়টি সহজবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সহজ সরল হিন্দী ভাষায় লিখিত বলিয়া গ্রন্থখানি পাঠকসমাজে সমাদৃত হইবে, ইহাই আমাদের ধারণা।

বিবেক-জ্যোতি (বার্ষিক স্মারক গ্রন্থ, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৯৭১)—দক্ষিণ কলিকাতা বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডল, ১২ গিরিশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা ২৫ হইতে প্রকাশিত। ৭-৬০।

পত্রিকাখানিতে স্বামীজীর ভাবধারা ও আদর্শ লইয়া লিখিবার আগ্রহ দেখিয়া আমরা আনন্দিত। বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকটি পড়িবার মতো। দক্ষিণ কলিকাতা যুব-মহামণ্ডলের সভ্যবৃন্দ স্বামীজীর শিক্ষা ও আদর্শের আলোকে নিজেদের গড়িয়া তুলুন—এই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগীতা ও সনাতন ধর্ম—সম্পাদক: শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার; প্রকাশক: শ্রীতমাল গঙ্গোপাধ্যায় পক্ষে রথীন্দ্র গীতাপ্রচার প্রতিষ্ঠান ১নং রথীন ব্যানার্জী লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা ৩১। পৃষ্ঠা-১৩৫; মূল্য দুই টাকা।

পুস্তকখানি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে গীতা ভাগবত রামায়ণ প্রভৃতি শাস্ত্র অবলম্বনে সনাতন ধর্মের মর্মকথা কয়েকটি সুচিন্তিত ও বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধে সংকলিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির নাম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, গীতা-সাধনার স্তর, গীতার ভূমিকা, শিষ্য অর্জুন, গীতার মর্মকথা, বিষাদ-যোগ, সনাতন ধর্ম, কেবা শুনাইল রামনাম, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা। চিন্তাশীল প্রবন্ধলেখকগণ অধ্যাপক, শাস্ত্রজ্ঞ ও প্রচারক।

দ্বিতীয় ভাগে প্রধানত: রথীন্দ্র গীতাপ্রচার প্রতিষ্ঠান ও রথীন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং রথীন্দ্র স্মৃতিকথা বিবৃত। বাইশবৎসরবয়স্ক উদীয়মান চিকিৎসাবিদ্যার্থী ধর্মপ্রাণ সেবাব্রতী তরুণ রথীন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই দুইটি সেবা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ গীতাধর্মপ্রচার ও আর্তনারায়ণ-সেবায় ব্যয়িত হইবে—প্রকাশকের নিবেদনে জানা যায়।

রমণীকুমার দত্তগুপ্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৭০-'৭১ সালের কার্যবিবরণী

[গত ১০ই আক্টোবর রামকৃষ্ণ মিশনের ৬২তম সাধারণ বার্ষিক সভায় উপস্থাপিত গভর্নিং বডি-র রিপোর্ট]

বন্ধুগণ, কর্মী-ও ছাত্র আন্দোলন জনিত উদ্বেগময় পরিস্থিতির মধ্যে আরও এক বৎসর তাঁহার কাজ চালাইয়া যাইতে শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাদের সহায়তা করিয়াছেন। সমসাময়িক সমাজের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলিয়া সে-সমাজের শুভাশুভের সে অংশীদার। আলোচ্য বর্ষে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে আমাদের প্রায় সব প্রতিষ্ঠানকেই বহু সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; সেগুলি এখনো সম্পূর্ণ সঙ্কটমুক্ত হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলিকেই সর্বাধিক ভুগিতে হইয়াছে; এই সব প্রতিষ্ঠানে জীবনেরই নিরাপত্তা ছিল না, কাজ কর্ম বারংবার ব্যাহত হইয়াছে। অগ্নিসংযোগ, হত্যা, বোমানিক্ষেপ, সম্পত্তি নষ্ট করা প্রভৃতি জনিত দুর্ভোগের অভিজ্ঞতা আমাদের হইয়াছে; কোন কোন প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল বন্ধ করিয়াই রাখিতে হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ মিশন রাজনীতির সহিত সংশ্রবহীন প্রতিষ্ঠান; কাজেই আশা করা গিয়াছিল যে, এ ধরণের কঠোর পরীক্ষা হইতে তাহাকে রেহাই দেওয়া হইবে। কিন্তু আমরা জানি, বর্তমান আন্দোলন সব কিছু প্রাচীন মূল্যবোধকেই বিনষ্ট করিতে চায়, আর রামকৃষ্ণ মিশন যুগ-যুগ-আগত আদর্শের ধারক এবং ক্রম-উন্নতিতে বিশ্বাসী, কাজেই হিংসাত্মক বিপ্লবের বিরোধী; সেজন্য স্বাভাবিক কারণেই সমাজ-বিরোধী প্রকোপ তাহার উপর পড়িয়াছে।

১৯৭০-এর জুন-জুলাই মাসে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান ও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে উৎকট কর্মী-হরতালের ফলে কয়েকজন অনুগত কর্মচারী আহত হন, প্রতিষ্ঠানগুলির কয়েকটি বিভাগও বন্ধ রাখিতে হয়। জুলাই মাসে পুরুলিয়া ও বরাহনগরে ছাত্রবিক্ষোভের ফলে সে প্রতিষ্ঠান দুটির কাজকর্মও বন্ধ হইয়া যায়। সেবাপ্রতিষ্ঠান ও নরেন্দ্রপুর আশ্রমের অবস্থা ক্রমে স্বাভাবিক হইয়া আসে। কিন্তু আগষ্ট মাসে রহড়া বালকাশ্রম বন্ধ করিতে হয়, এবং পুরুলিয়ায় অবস্থা তখনো অনিশ্চিত। অক্টোবর মাসে এ প্রতিষ্ঠানগুলিতে মোটামুটিভাবে কাজ চালানোর মত অবস্থা ফিরিয়া আসিত। ইতিমধ্যে বরানগর আশ্রমের স্কুলগুলিতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা চলিতেছিল; শেষে অগ্নিসংযোগ, বোমা-ফাটানো, ব্যক্তিগত অনিষ্টসাধন, জীবননাশের আশঙ্কা প্রভৃতির দরুণ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্কুলগুলি বন্ধই করিয়া দিতে হয়। কয়েকমাস পরে বরানগরের এই স্কুলগুলি আবার খোলা হইয়াছে, কিন্তু ছাত্রাবাস বন্ধ রহিয়াছে; গভর্নিং বডি উহা বন্ধই রাখিতে চান। ইতিমধ্যে বেলুড় বিদ্যামন্দিরেও ছাত্রবিক্ষোভ শুরু হয়, বোমাফাটানো অগ্নিসংযোগ প্রভৃতিও চলিতে থাকে। টাকী আশ্রমের স্কুলেও অনুরূপ বিধ্বংসী কাজ বারংবার ঘটিতে থাকে; এদিকে রহড়া, আসানসোল, সরিষা প্রভৃতি

আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়া উত্তেজনাপূর্ণই রহিয়া যায়।

জঘন্যতম ঘটনা ঘটে বেলুড় সারদাপীঠের শিল্পমন্দিরে—১৯৭১-এর ১২ই জানুআরি। সেখানে ক্লাসের ভিতরেই একজন শিক্ষক নিহত হন। এই মাসেই জয়রামবাটী আশ্রমের স্কুলের আপিস-ঘরে পূর্বরক্ষিত গোটা বারো বোমা ফাটায় চারিদিকে আগুন ছড়াইয়া পড়ে এবং বহু দরকারী কাগজ, আসবাব, জানালা প্রভৃতি পুড়িয়া যায়।

বন্ধুগণ, সব অমঙ্গলের সময়ই কিছু না কিছু মঙ্গলও থাকে। আপনারা যেন এই ধারণা লইয়া ফিরিয়া যাইবেন না যে, আলোচ্য বর্ষে আমাদের কাজ শুধু বাধাবিক্ষুব্ধই হইয়াছে; উন্নতির পথেও উহা কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে। ১০ই এপ্রিল কনখলে নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কোইম্বাটোরের পেরিয়ানাইকেন্‌পালায়ামে মে মাসে শিক্ষা সম্বন্ধে পর্যালোচনার জন্য সম্মেলন আহূত হইয়াছিল, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কেন্দ্রগুলি হইতে বহু সাধু উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন; মাদ্রাজে আগস্ট মাসে বিবেকানন্দ কলেজের 'বোটানি-ব্লক'-এর এবং সেপ্টেম্বরে টেকনিক্যাল ইনস্টিটুট্-এর একটি গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হইয়াছে। নভেম্বর মাসে এলাহাবাদ আশ্রমে একটি নূতন ডিসপেন্সারী ভবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৯৭১-এর জানুআরীতে গৌহাটিতে নবনির্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং জামসেদপুরে একটি নূতন ছাত্রাবাসের ও পাটনায় ডিসপেন্সারী-সংযুক্ত একটি গৃহের উদ্বোধন হইয়াছে। কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান এ-বছর কিছু জমি কিনিয়া এবং নূতন বাড়ী তৈরি করিয়া সম্প্রসারণের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত ছিল; জমি কিনিবার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে।

স্বামীজীর পৈতৃক ভবনের স্বল্পাংশ উহার বর্তমান মালিকদের সহিত আলোচনার মাধ্যমে কিনিয়া লইবার জন্য মিশন দীর্ঘকাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সে চেষ্টা এখনো চলিতেছে, কিন্তু উহা আইন-আদালতের ব্যাপারে দীর্ঘসময়সাপেক্ষ বলিয়া মিশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট পাঁচটি প্লট দখল করিয়া দিবার জন্য (acquisition) আবেদন করিয়াছে; এই প্লটগুলির ভিতর স্বামীজীর জন্মস্থল এবং আপসে যে দুটি প্লট কেনার চেষ্টা চলিতেছে তাহাও অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য বর্ষে মিশনের পূর্ববঙ্গের কেন্দ্রগুলি সীমিতসাধ্যমত কাজ করিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের ফলে এখন সেগুলি সবই বন্ধ রহিয়াছে।

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যাবলী

প্রধান কেন্দ্র (বেলুড়) ব্যতীত ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে রামকৃষ্ণ মিশনের ৭৩টি শাখাকেন্দ্র ছিল; তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গে ছিল ৭টি এবং ব্রহ্ম, ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে একটি করিয়া; অবশিষ্ট ৬০টি ভারতে। মিশনের এই কেন্দ্রগুলি ছাড়া ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রধান কেন্দ্র ব্যতীত ৬৫টি মঠকেন্দ্র আছে, সেগুলির কার্যবিবরণী এখানে দেওয়া হইতেছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যাহা আচরিত ও তৎকর্তৃক প্রচারিত, স্বামী বিবেকানন্দ যাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া এবং কাজে করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই বৈদান্তিক-সত্য-ভিত্তিক নিঃস্বার্থ সেবাই রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মের ক্ষেত্র। মিশনের এই আদর্শানুগ বহুমুখী কর্মধারার প্রধানতঃ ৫টি বিভাগ : (১) সেবাকার্য (Relief), (২)

চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রচার, (৫) গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনকল্যাণকর কার্য।

(১) সেবাকার্য: আলোচ্য বর্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান দুটি সেবাকার্য পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট ও হাসনাবাদ অঞ্চলে গত ১২.৪.৭০ হইতে ৪.১.৭১ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীদের জন্য সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হয়। ৪০,২৪৩ পরিবারের মোট ১,৭১,৭১৯ জন শরণার্থীর সেবা করা হয়। ইহাতে ব্যয়িত হইয়াছে ২,৭৩,৩২৬'৯৪ টাকা; এই টাকার মধ্যে জনসাধারণ ও গবর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত দানসামগ্রী ও খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য ধরা হয় নাই। গত ৩.৯.৭০ হইতে ২৭.১০.৭০ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বন্যার্তসেবা কলিকাতায় এবং ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলী জেলায় পরিচালিত হইয়াছিল; এই সেবাকার্যে খরচ হয় ১,২০,৬২৪'৭৮ টাকা।

উপরি-উক্ত দুইটি সেবাকার্যে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক বিতরিত হইয়াছে: চাল গম হত্যাদি ১৯,১৭৮ কুইণ্ট্যাল, গুঁড়া দুধ ৮,০১৫ পাউণ্ড, পাঁউরুটি ২,০৯০ পাউণ্ড, নূতন ধুতি ও শাড়ি ৫,৭১৫ খানি, শিশুদের নূতন পোশাক ১,০৩২, নূতন কম্বল ৮২০টি, ত্রিপল ও টেণ্ট ৪৭৬টি, লণ্ঠন ২৫০টি; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যও

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, মঠ ও মিশনের বহু স্থায়ী কেন্দ্র নিজ নিজ অঞ্চলে স্থানীয় দরিদ্র জনগণকে অর্থ ও জিনিসপত্র দ্বারা নিয়মিতভাবে সাহায্য করিয়াছে। এইরূপ সেবাকার্যে প্রধান কেন্দ্রও অংশ গ্রহণ করিয়াছে। প্রধান কেন্দ্র হইতে নিয়মিতভাবে ১২৪টি দুঃস্থ পরিবারকে ও ২২১ জন দরিদ্র ছাত্রকে এবং সাময়িকভাবে ৮৯টি পরিবারকে ও ১০ জন বিদ্যার্থীকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে; এই সাহায্যে মোট ব্যয় হয় ২৭,০০৮'৫৮ টাকা। এতদ্ব্যতীত ১৫৮টি কম্বল, ১৫৭ খানি ধুতি ও শাড়ি এবং ৩৮৫ খানি অন্যান্য পরিচ্ছদ প্রদত্ত হইয়াছিল।

(২) চিকিৎসা: জাতিধর্মনির্বিশেষে রোগগ্রস্ত জনসাধারণের সেবাকল্পে ভারতে ও পাকিস্তানে রামকৃষ্ণ মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্র কর্তৃক অনেকগুলি ইনডোর হাসপাতাল ও আউটডোর ডিসপেন্সারী পরিচালিত হয়। আলোচ্য বর্ষে মিশনের হাসপাতালগুলিতে অন্তর্বিভাগে শয্যা-সংখ্যা ছিল ১,০৮৭। এইগুলিতে ১৯,৬৩১ জন রোগী চিকিৎসার্থে ছিলেন। ৫০টি আউটডোর ডিসপেন্সারীতে পুরাতন রোগী সহ ৩২,৯৮,২২০ জন চিকিৎসিত হয়। রাঁচির ডুগরি হাসপাতাল এবং দিল্লীর ক্যারল-বাগে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার্থ শয্যাগুলি কেবল যক্ষ্মারোগীদের জন্যই। কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠানে অন্যান্য বিভাগ ছাড়াও একটি নার্স ট্রেনিং স্কুল পরিচালিত হয়। এই স্কুলের দুইটি বিভাগ: জুনিয়র ও সিনিয়র।

মঠ ও মিশন কেন্দ্রগুলিতে সাধারণতঃ অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে; কোন কোন কেন্দ্রে আয়ুর্বেদিক মতেও চিকিৎসা-ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। মঠকেন্দ্রগুলির ইনডোর ও আউট-ডোরে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা—৫,২৮,১৮৪।

(৩) শিক্ষা: আলোচ্য বর্ষে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত শিক্ষায়তনগুলি পরিচালিত হইয়াছে:

৫টি মহাবিদ্যালয়, ২টি বি. টি. কলেজ, ১টি স্নাতকোত্তর বেসিক ট্রেনিং কলেজ, ৪টি জুনিয়র

বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটুট, ২টি বেসিক ট্রেনিং স্কুল, ১টি শরীরশিক্ষা কলেজ, ১টি উচ্চতর গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ, ১টি কৃষি-শিক্ষা কলেজ ৪টি ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল, ১০টি জুনিয়র টেকনিক্যাল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, ৭৬টি ছাত্রাবাস, হস্টেল, অনাথাশ্রম, ২টি চতুষ্পাঠী, ৩৪টি বহুমুখী, উচ্চতর মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩৮টি অন্যান্য গ্রেডের স্কুল, ৫৯টি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র অথবা কম্যুনিটি সেণ্টার, ১টি পরিষেবিকা শিক্ষণ স্কুল, অন্ধছাত্রদের ১টি বিদ্যালয় ১টি দিবা-ছাত্রাবাস এবং ১টি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার স্কুল। এইসব শিক্ষায়তনে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬৯,৭৬০, তন্মধ্যে ছাত্র ৫০,৮০২ এবং ছাত্রী ১৮,৯৫৮।

মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫,৫৬১, তন্মধ্যে ছাত্র ও ছাত্রী যথাক্রমে ৩,৭৭০ ও ১,৭৯১।

(৪) **সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রসার**: এই কর্মবিভাগে বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার, পাঠাগার, সাময়িক প্রদর্শনী, উৎসবাদি, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র ও ম্যাজিক ল্যান্‌টার্ন সহযোগে বক্তৃতা, নিয়মিত ধর্মবিষয়ক ক্লাস বক্তৃতা ও সেমিনারের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ বিস্তার করা হয়। কয়েকটি কেন্দ্রে পুস্তক পত্রিকা প্রভৃতি প্রকাশনের মাধ্যমেও ইহা করা হইয়া থাকে। এই বিষয়ে কলিকাতা ইনস্টিটুট অব কালচারের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শবিস্তারের যে বিপুল পরিমাণ কার্য মঠকেন্দ্রগুলি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে, এখানে তাহা উল্লিখিত হইল না, কারণ প্রধানতঃ এই কর্মেই মঠ-কেন্দ্রগুলি নিরত। এই উদ্দেশ্যে বক্তৃতা-সফর, ধর্মালোচনা, শাস্ত্রক্লাস প্রভৃতি ছাড়াও অনেকগুলি বৃহৎ পুস্তক-প্রকাশন বিভাগ ও মন্দির প্রভৃতি পরিচালিত হইয়া থাকে।

(৫) গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে জনকল্যাণকার্য

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা অনুসারে মিশন সর্বদাই সমাজের দরিদ্র ও অনুন্নত জনগণের সেবা করিতে আগ্রহী। আলোচ্য সময়ে গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে মিশন কর্তৃক যে সেবামূলক জনহিতকর কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা চমকপ্রদ না হইলেও কমও নয়; আশানুরূপ যে করিতে পারা যায় নাই, তাহার কারণ উৎসাহের অভাব নয়, উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের অভাব। মিশনের চিকিৎসাকেন্দ্র-সমূহ এবং শিক্ষায়তনগুলি লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের সেবায় নিরত। মিশন কর্তৃক একটির পর একটি করিয়া যে সকল সেবাকার্য (relief) অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেগুলি কেবল দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই করা হইয়াছে। বার্ষিক উৎসবানুষ্ঠানের সময়ও সহস্র সহস্র সাধারণ মানুষকে উচ্চতর ভাব ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে, যাহাতে তাঁহারা জীবনের পরীক্ষার ক্ষেত্রে এবং দুঃখদুর্দশার সময়েও সুদৃঢ় থাকিতে পারেন। গ্রামাঞ্চলে কাজের কথায় বলা যাইতে পারে, রামকৃষ্ণ মিশনের অন্ততঃ ৯টি প্রধান কেন্দ্র গ্রামে এবং উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত। এইসকল গ্রামীণ কেন্দ্র তথা শহরাঞ্চলের কেন্দ্রগুলির পরিচালনাধীন বহু কেন্দ্র দরিদ্র ও অনুন্নত গ্রাম্য জনসাধারণের সেবায় নিরত থাকিয়া ১৪০টি স্কুল পরিচালনা করিয়াছে; তন্মধ্যে ৭টি বহুমুখী বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক, ৪০টি সিনিয়র বেসিক, জুনিয়র বেসিক

ও মধ্য ইংরেজী, ৪ টি প্রাইমারি এবং ৫০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। ১২টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ২টি ভ্রাম্যমাণ ইউনিট সহ ২৩টি গ্রন্থাগার, ১৭০টি দুগ্ধবিতরণকেন্দ্র, ৭টি অডিও-ভিসুয়্যাল ইউনিট, ৯টি কম্যুনিটি সেণ্টার, ৯টি বৃত্তিমূলক শিক্ষা-কেন্দ্রও দরিদ্র গ্রামবাসিগণের জন্যই পরিচালিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শিলং কেন্দ্রে একটি ভ্রাম্যমাণ দাতব্য অ্যালোপ্যাথিক ডিসপেন্সারীর মাধ্যমে খাসি পাহাড় অঞ্চলে নিয়মিতভাবে ৩০টি গ্রাম জুড়িয়া ১৬,০৯১ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে। রাঁচি-মোরাবাদী আশ্রমের পরিচালনাধীন অনুরূপ একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় ২৫টি গ্রামে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রদান করিয়া অসুস্থ ও দরিদ্র গ্রামবাসিগণের সেবা করিয়াছে। নেফায় আলং কেন্দ্র কর্তৃক সোৎসাহে শিক্ষাবিষয়ক ও সংস্কৃতিকমূলক কার্য শুরু করা হইয়াছে; এই কার্য স্থানীয় উপজাতি-সম্প্রদায়ের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে।

বিদেশে কার্য

সিঙ্গাপুর, ফিজি, মরিশাস এবং সিংহলে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলিতে প্রধানতঃ শিক্ষা-ও সংস্কৃতিমূলক কার্য অনুষ্ঠিত হয়। ব্রহ্ম ও ফ্রান্সে অবস্থিত মিশনের কেন্দ্র-দুইটি সংস্কৃতিমূলক ও অধ্যাত্মবিষয়ক ভাবধারা-প্রচারে নিরত।

উপসংহার

বন্ধুগণ, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক নানা বাধাবিপত্তি (যাহা এখনো লাগিয়া রহিয়াছে) সত্ত্বেও দৃঢ়বিশ্বাস ও সাহসের সহিত মিশন তাহার কার্যধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, ইহা ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় এবং গভর্নমেণ্ট ও জনগণের সক্রিয় সহানুভূতির ফলেই সম্ভব হইয়াছে, মিশনকর্তৃক একটি বাঞ্ছিত প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে—চতুর্দিকে সঞ্জাত এই বিশ্বাসের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। আপনাদের সক্রিয় সহানুভূতি বরাবরই আমাদের সহায়তা করিয়াছে, সেজন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমরা ভালভাবেই কাজ করিয়াছি; আশা রাখি ভবিষ্যতে আরো ভালভাবে করিব। সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর আমাদের পরিচালনা করুন, পথ প্রদর্শন করুন এই প্রার্থনা!

পরলোকে স্বামী ত্যাগানন্দ

দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ৬ই নভেম্বর, ১৯৭১, সকাল সাতটার সময় বেলুড় মঠে স্বামী ত্যাগানন্দ ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কয়েকদিন হইতে তাঁহার শরীর একটু খারাপ যাইতেছিল; ঐদিন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেখাইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

স্বামী শিবানন্দের নিকট ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি মন্ত্রদীক্ষা এবং স্বামী বিরজানন্দের নিকট ১৯৩৭-এ ব্রহ্মচর্য ও ১৯৪১-এ সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

১৯০৪-এর ১৭ই জুলাই সিলেটে তাঁহার জন্ম হয়। ১৯৩১-এ তিনি সিলেট আশ্রমে যোগদান করিয়া কয়েকমাস সেখানে কাজ করিবার পর বেলুড় মঠে চলিয়া আসেন এবং সেখান হইতে ঐ বৎসরই দেওঘরে কর্মিরূপে প্রেরিত হন; ১৯৪১ পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। ঐ বৎসরই তিনি মহীশূর 'স্টাডি সার্কেল'-এ যান। সেখান হইতে ১৯৪৩-এ

রাজকোট আশ্রমে যাইয়া ১৯৪৫ পর্যন্ত সেখানে কাজ করেন। ১৯৪৭ হইতে শেষদিন পর্যন্ত, দীর্ঘ পঁচিশ বছর তিনি বেলুড় মঠের লাইব্রেরিয়ানরূপে একনিষ্ঠভাবে সংঘের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বিনম্র, অনাড়ম্বর, সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

শ্যামপুকুরে (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাধামে ও বরেন্দ্রস্মৃতি-ভবনে গত ১৯শে অক্টোবর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বরাভয় উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ১৮৮৫খৃষ্টাব্দে শ্যামপুকুর-বাটীতে চিকিৎসার্থ অবস্থানকালে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্যামাপূজার রাত্রিতে বরাভয়-মূর্তি ধারণপূর্বক গিরিশচন্দ্রপ্রমুখ ভক্তগণের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই পুণ্য লীলার অনুধ্যানকল্পে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শ্যামপুকুরে উল্লিখিত স্থানদ্বয়ে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ, পৌরোহিত্য করেন স্বামী জীবানন্দ। স্বামী সুশান্তানন্দ এবং শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ভজন-কীর্তন, পূজাপাঠাদি উৎসবের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল।

পরলোকে কর্নাটকুমার চৌধুরী

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭০, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য কর্নাটকুমার চৌধুরী ৮৬ বৎসর বয়সে জপ করিতে করিতে সজ্ঞানে পরলোকগমন করিয়াছেন।

তাঁহার পিতৃভূমি শ্রীহট্ট জেলার ব্রাহ্মণডুরা গ্রামে। সেখানে তাঁহাদের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা ছিল। আইনপড়া ছাড়িয়া দিয়া তিনি হোমিও-প্যাথিক শিক্ষা করেন এবং দেশে থাকিয়া জীবনের অধিকাংশকাল এই স্কুলে শিক্ষকতা ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মাধ্যমে জনসেবায় কাটাইয়া যান।

এক সময় অনুশীলন সমিতির কাপ্তেন ছিলেন তিনি। এজন্য পুলিশের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইবার পর রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতায় ব্রতী হন। সেখানেও পুলিশের দৃষ্টি পড়িলে পুনরায় দেশে ফেরেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের বহু সন্ন্যাসী তাঁহার বাড়িতে যাইতেন। তাঁহার দুই ভগ্নী চপলাদেবী ও মীরাদেবী সন্ন্যাসজীবন বরণ করিয়াছিলেন। কর্নাটকুমার শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা- ও স্বামীজী-বিষয়ক কয়েকখানি পুস্তক এবং গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার বিদেহী আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

পরলোকে বিনয়ভূষণ ঘোষ

দুঃখের সহিত জানাইতেছি, ভারতের শিল্পপুনর্গঠন করপোরেশন এবং সি. এম. ডি-র চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের প্রাক্তন মুখ্য উপদেষ্টা বিনয়ভূষণ ঘোষ গত ২৭শে

অক্টোবর বিকাল ৪-৪৫ মিঃ সময় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। পরদিন কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে তাঁহার মরদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর ঢাকা বিক্রম-পুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বরিশাল ও পরে কলিকাতায় তাঁহার ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। বাল্যকালেই তিনি অশ্বিনীকুমার দত্ত ও জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। আজীবন এই আদর্শের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা অবিচল ছিল। তিনি অকৃতদার ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন এবং আরও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রতি মাসেই উপার্জনের একটা অংশ তিনি জনহিতে ব্যয় করিতেন। দেশবাসীর প্রতি তাঁহার ভাল-বাসা ছিল অকৃত্রিম। আদর্শনিষ্ঠ, অকপট, অক্লান্তকর্মী বিনয়ভূষণের হৃদয় দেশবাসীর দুঃখ যে কতখানি দরদ দিয়া অনুভব করিত, তাহার পরিচয় মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বোম্বাই হইতে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রেই পাওয়া যায়: "...এখানকার affluence মনকে শান্তি দেয় না, কলিকাতা ও বাংলার দরিদ্রদের কথাই মনে পড়ে ও তাহাদের সেবায়-ই জীবন ধন্য হউক, এই ইচ্ছা।"

শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার বিদেহী আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

পরলোকে প্রাণশঙ্কর রায়চৌধুরী

দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ১১ই অক্টোবর প্রাণশঙ্কর রায়চৌধুরী ৬৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ময়মনসিংহের এক বিখ্যাত জমিদার বংশে তাঁহার জন্ম; ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় কলিকাতায় ও গ্লাসগো-তে। রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত তাঁহার সংস্পর্শ ছেলেবেলা হইতেই। স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তিনি। সহকারী সম্পাদক রূপে নরেন্দ্রপুর আশ্রমের কাজে তিনি দীর্ঘকাল সহায়তা করিয়াছেন। উদারহৃদয়, সদাপ্রফুল্ল ছিলেন তিনি।

ভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

ভ্রম-সংশোধন

গত কার্তিক সংখ্যা উদ্বোধনে ৫৯১ পৃষ্ঠা, ১ম কলম, ২৩শ ও ২৪শ লাইনে যথাক্রমে '২১শে' স্থলে '১৮ই' এবং '৭১' স্থলে '৭২' পড়িবেন।

আবেদন

ওড়িশার কটক জেলার পট্টমুন্দাই পঞ্চায়েৎ অঞ্চলে সাম্প্রতিক আকস্মিক প্রবল ঘূর্ণিবাত্যায় বিধ্বস্ত জনগণের সেবায় রামকৃষ্ণ মিশন ব্রতী হইয়াছে। এই সেবাকার্যে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য দান করিবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছেন। (১) সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া, এবং (২) প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মঠ, ভুবনেশ্বর-২, ওড়িশা—এই ঠিকানায় প্রেরিত সর্ববিধ সাহায্য কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

উদ্বোধন, ৭৪তম বর্ষ, ১৩৭৮-৭৯

নিবেদন

বর্তমান বৎসরের পৌষ মাসে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৭৩তম বর্ষ শেষ হইল। আগামী মাঘ (১৩৭৮) মাসে পত্রিকা ৭৪তম বর্ষে পদার্পণ করিবে। পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে জানানো যাইতেছে, তাঁহারা যেন আগামী ২৫শে পৌষের (১০ই জানুয়ারির) মধ্যে তাঁহাদের পুরা নাম-ঠিকানা এবং গ্রাহক-সংখ্যা সহ বার্ষিক চাঁদা ৮ টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। তৎপূর্বে, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সংলগ্ন কার্ডখানি যদি ইতিমধ্যে পূরণ করিয়া না পাঠাইয়া থাকেন তাহা হইলে অবিলম্বে ইহা পূরণ করিয়া জানাইবেন—মনিঅর্ডার-যোগে বা লোক মারফত টাকা পাঠাইবেন অথবা মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে গ্রহণ করিতে চান; কার্ডটিতে ১০ পয়সার ডাকটিকিট আঁটিয়া পোস্ট করিবেন। ভি. পি. পি.-তে লইলে ৯ টাকা ২৫ পয়সা লাগিবে।

অনিবার্য কারণে কাহারও পক্ষে আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকা সম্ভব না হইলে তাহা উক্ত কার্ডেই জানাইয়া দিবেন।

উক্ত তারিখের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ৮ টাকা না আসিলে অথবা কোন পত্র না পাইলে মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে পাঠানো হইবে। ভি. পি. পি. ফেরত দিলে আমাদের অযথা ক্ষতি হয়।

সুদীর্ঘ ৭৩ বর্ষ ধরিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের কাজে আপনাদের সহায়তা আমরা পাইয়া আসিতেছি। আশা করি উহা অব্যাহত থাকিবে।

অফিসে চাঁদা জমা দিবার সময়: সকাল ৭॥—১১টা
বিকাল ২॥—৫টা
[রবিবার বিকাল ৩টা হইতে ৫টা]

কার্যাধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয় *
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

---

* উদ্বোধন কার্যালয় ১নং উদ্বোধন লেন-এর নিকটেই নূতন ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। চিঠিপত্রাদি পূর্বের ঠিকানাতেই পাঠাইবেন।

দিব্য বাণী

ভাগদ্বয়বতী যস্মাৎ সৃজামি সকলং জগৎ।
তত্রৈকভাগঃ সম্প্রোক্তঃ সচ্চিদানন্দনামকঃ॥ ৬৫
মায়াপ্রকৃতিসংজ্ঞস্তু দ্বিতীয়ো ভাগ ঈরিতঃ।
সা চ মায়া পরাশক্তিঃ শক্তিমত্যহমীশ্বরী॥ ৬৬
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমাভিন্নত্বমাগতা। ৬৭
নির্গুণং মায়য়া হীনং সগুণং মায়য়া যুতম্। ৭৫

—দেবীভাগবতম্, ১২।৮

(আমিই নির্গুণ ব্রহ্ম, আমিই ঈশ্বরী—
সগুণা হইয়া যবে বিশ্ব সৃষ্টি করি।
আমাতেই লীন মায়া-শক্তি বিকাশিয়া)
নিজেকেই নিজে যেন দু-ভাগ করিয়া
সচ্চিদ্-আনন্দ আর প্রকৃতি—এ দুই
নামে আমি সৃষ্টিকালে কথিত যে হই।
পরাশক্তি নাম এই মায়াপ্রকৃতির-ই,
এই শক্তিমতী হয়ে হই মহেশ্বরী।
আমি আর শক্তি মোর ভিন্ন কভু নয়
চন্দ্র ও চন্দ্রিমা যথা অভিন্ন সদাই।
মায়াশক্তিমতী যবে, আমিই সগুণ;
মায়ার বিকাশহীনা আমিই নির্গুণ।

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ।...সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।"

"কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী! একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি।" —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।২।৪

কথাপ্রসঙ্গে

ভালবাসা

প্রচার-প্রসঙ্গে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, মানুষের মন চিন্তা-বিন্যাসের পারিপাট্য, বাক্‌চাতুর্য ইত্যাদি কিছুই দেখে না, যাহাকে তাহার ভাল লাগে তাহারই কথা একাগ্র হইয়া শোনে। আবার বলিয়াছেন অপরের ভিতর স্থায়িভাবে ভাব-সংক্রমণের ব্যাপারে সর্বাধিক কার্যকরী হইল বক্তার জীবন; চিন্তাবিন্যাসের নৈপুণ্য, ভাষার মাধুর্য প্রভৃতির মূল্য একাজে অতি সামান্যই। দেখাই যায়, একজন আসিয়া ঘণ্টাখানেক ধরিয়া অনর্গল বক্তৃতা করিয়া গেলেন, খুব ভাল ভাল আদর্শের কথা বলিলেন সুন্দর সুললিত ভাষায়, সুন্দরভাবে চিন্তাগুলিকে সাজাইয়া, কিন্তু লোকের মনে উহা দাগ কাটিতে পারিল না; আর একজন হয়তো দশমিনিট কথা বলিলেন, চিন্তাগুলিকে খুব ভালভাবে যে সাজাইতে পারিলেন তাহাও হয়তো নয়, হয়তো ভাষার ভুলও রহিয়াছে কথায়, কিন্তু তাঁহার কথাগুলি লোকের মনে গভীর রেখাপাত করিল।

উচ্চ আদর্শে, উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তদনুসারে জীবনগঠনের কাজে অপরকে ব্রতী করাইবার জন্য এই দুইটিই অবশ্যপ্রয়োজনীয়; বক্তৃতাদির মাধ্যমে বহুজনের মধ্যে প্রচারের ক্ষেত্রেও, আলাপ-আলোচনাদির মাধ্যমে স্বল্প কয়েকজনের জীবনগঠনের ক্ষেত্রেও।

এই জন্যই দেখা যায়, উচ্চ ভাব ও উচ্চ আদর্শের কথা শুনাইবার লোকের অভাব হয় না, কিন্তু যাঁহাদের কথা তদনুসারে জীবনগঠনে আমাদের ব্রতী করায়, সেরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম।

উচ্চভাব প্রচারের জন্য জীবন তো থাকা চাই-ই, সেই সঙ্গে হওয়া চাই অপরের ভাল লাগার—অপরের ভালবাসার, শ্রদ্ধার পাত্র। অপরকে ভালবাসিতে পারিলে তবেই তাহার ভালবাসা পাওয়া যায়। মানুষ ভালবাসার কাঙাল; যাহার নিকট সে তাহা পায়, তাহারই প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হয়, তাহাকেই তাহার ভাল লাগে। একবার এই ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তখন ভালবাসার পাত্রের সব কিছুই তাহার ভাল লাগে—তাহার ভাব, তাহার আচরণ, সবই। উচ্চ জীবনের সহিত ভালবাসার সংযোগ তাই সহজেই অপরের হৃদয়ে উচ্চ ভাব সংক্রমিত করে। অবশ্য সকলের প্রতি ভালবাসা উচ্চ জীবনে, বিশেষ করিয়া উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনে স্বাভাবিক ভাবেই স্ফুরিত হয়; কিন্তু উহার প্রকাশেরও প্রয়োজন।

ধর্মের গ্লানি চরমে উঠিলে ভগবান যখন মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া আমাদের ভগবানলাভের পথ দেখাইবার জন্য অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহাকে ভাবজগতে একটা বিরাট রকমের ওলট-পালট করিতে হয়।

সেজন্য বিপুল শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় অবতার-জীবনে। তাঁহাদের জীবন সম্বন্ধে তো প্রশ্নই উঠে না—তাঁহাদের জীবনই আদর্শ, তাঁহাদের বাণীই বেদ। বিপুল আকর্ষণী শক্তিও লইয়া আসেন তাঁহারা। সব চেয়ে বড় কথা, ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের ইচ্ছা অভিন্ন বলিয়া তাঁহাদের ইচ্ছাই বাস্তবের রূপ ধারণ করে। তথাপি দেখা যায়, যাঁহাদের

মাধ্যমে তাঁহারা ভাব-সম্প্রসারণ করেন, জগতের সাধারণ নিয়মানুসারে তাঁহাদের ভালবাসিয়া আপন করিয়া নেওয়ার পথেই তাহা করিয়া থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁহাদের হৃদয় নিজ ভাবধারায় যথাযথভাবে নিষ্ণাত করাইয়া জগতে সে ভাব প্রচার করিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এই ভাবগ্রহণ-ব্যাপারে শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বাগ্রে তাহাদের ভালবাসিয়া আপন করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভালবাসা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ তৎকালে এতদূর পর্যন্ত বলিয়াছিলেন যে, একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই ভালবাসিতে জানেন—আর সবাই ভালবাসার ভানমাত্র করিয়া থাকে। এই ভালবাসা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি নরেন্দ্রনাথের ভালবাসাকেও কত গভীর করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা আমাদের অবিদিত নয়। একবার তো মাসখানেক ধরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাই বলেন নাই, দক্ষিণেশ্বরে তিনি আসিলে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইতেন। তথাপি নরেন্দ্রনাথের যাওয়া-আসা সমানে চলিতে থাকে। শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আচ্ছা, আমি তো তোর সঙ্গে একটা কথাও বলিনা, তবু তুই এখানে আসিস কেন?' উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'আমি আপনাকে ভালবাসি, দেখতে ইচ্ছা হয়, তাই আসি।' আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, এ ঘটনা যখন ঘটে তখন শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া মানা তো দূরের কথা নরেন্দ্রনাথ তখন তাঁহার ঈশ্বরীয় দর্শনাদি সম্বন্ধেও সন্দিহান; তাঁহার মা-কালীকে 'পুত্তলিকা' বলিতেছেন; তাঁহার টাকা ছুঁইলে শরীরে যন্ত্রণাবোধ, অপবিত্রহৃদয় ব্যক্তির স্পৃষ্ট আহার্য-পানীয়াদি গ্রহণ করিতে না পারা প্রভৃতি যথার্থ না ভান—ইহাও তখন নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ তাঁহার ভাবধারার ধারক ও প্রচারক রূপে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ গঠনকালে সেখানেও ভালবাসাকেই সঙ্ঘের সংহতি-রজ্জুরূপে স্থান দিয়াছেন। তাঁহার দিক্‌পালতুল্য গুরুভাইদেরও তিনি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন পরস্পরের প্রতি এই ভালবাসার ডোরেই। পরবর্তীকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভালবাসা-প্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যাঁহার কাছে মানুষ হইয়াছিলেন তিনি শাসন কাহাকে বলে জানিতেন না। বলিয়াছিলেন, ভালবাসিতে পারিলে মানুষকে দিয়া সব কিছু করাইয়া লওয়া যায়, কেবল শাসন মানুষকে দূরে সরাইয়া দেয়। বেলুড় মঠে প্রথম দিকে যাঁহারা আসিতেন এবং যাঁহারা মঠে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বহু জন সেখানে চির-আকৃষ্ট হইয়াছিলেন স্বামী প্রেমানন্দের ভালবাসায়। বিপথগামী বহু জন প্রথমে ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান-গণের ঘনিষ্ঠ হইয়াছেন, পরে তাঁহাদের ভাব গ্রহণ করিয়া জীবনকে সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়াছেন—ভক্তগণের মধ্যে এরূপ উদাহরণ বহু রহিয়াছে।

বাহ্য ঘটনার মাধ্যমে এই ভালবাসার প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের চেয়েও অধিক পরিমাণে দেখা যায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে। তাহার কারণ বোধ হয়, ভাবসম্প্রসারণের যন্ত্ররূপে গড়িবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে আপন করিয়া লইতে হইয়াছিল বাছাবাছা কয়েকজনকে —'কত রকম পরীক্ষা ক'রে তবে তিনি নিতেন', আর শ্রীশ্রীমাকে দিয়া গিয়াছিলেন নির্বিচারে মুক্তিবিতরণের কাজ—'কলকাতার লোকদের

দেখো।' তাই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দুয়ার ছিল সবার জন্য সমভাবে অবারিত—'আমার কাছে ছেড়ে দিয়েছেন, পিঁপড়ের সার।' তাই দেখা যায়, তিনি তাঁহার 'নরেন', 'রাখাল', 'শরৎ' প্রভৃতিকেও যেমন আপন করিয়া লইয়াছিলেন, তেমনি আপন করিয়া লইয়াছিলেন আমজদকেও, তাঁহার 'ডাকাত বাবা'-কেও। তবে তাঁহার স্নেহের এই বাধাবন্ধহীন প্রকাশের সব চেয়ে বড় কারণ, তিনি যে 'মা'—যে মায়ের ভালবাসা 'সন্তানকে নরকে পর্যন্ত অনুসরণ করতে কুণ্ঠিত হয় না।'

'আমি মা'

তাঁহার ভিতর এই মাতৃত্বের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই, তাঁহাকে সাক্ষাৎ জগন্মাতা জ্ঞানে যথাবিধি পূজা করিয়া। এই মাতৃস্নেহের বলেই শ্রীশ্রীমা যুগাবতারের আদেশকেও অগ্রাহ্য করিতে দ্বিধা করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের কোন কোন সন্তানকে (যাঁহারা পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন) খাওয়ানোর ব্যাপারে মা শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ মানেন নাই। জনৈকা অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোককে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে বলিলে মা তাহাকে নিজের কাছে ডাকিয়া সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। জনৈকা স্ত্রীভক্ত একদা শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের খাবার আনিয়া দেন। পরে শ্রীশ্রীমা আসিলে শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ স্ত্রীভক্তটির হাত দিয়া খাবার পাঠাইতে নিষেধ করেন; বলেন, উহার স্পর্শ-করা খাবার খাইতে তাঁহার কষ্ট হয়। মা উত্তরে বলেন, সে চাহিল তাই দিয়াছেন। তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণ আবার নিষেধ করায় মা করজোড়ে বলিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট কেহ কিছু চাহিলে তিনি না করিতে পারিবেন না। তিনি যে মা! পরবর্তী কালে তিনি বলিয়াছেন, 'মা বলে কেউ কিছু চাইলে আমি না করতে পারি না, যে যার যোগ্য নয় তাকে তাই দিয়ে দিই।'

আপন মা

জনৈক মঠাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীমাকে একবার বলিয়াছিলেন যে, সেখানকার আশ্রম হইতে যে সব ব্রহ্মচারীরা কয়েকদিনের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যায় এবং গেলে স্বামী সারদানন্দ এবং মা তাহাদের খুব ভালবাসেন, আদর করিয়া খাওয়ান ইত্যাদি, তাহারা সে জন্য আর তাঁহাদের ছাড়িয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে চায় না, আশ্রমের কাজের ক্ষতি হয়। ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছিল, এরূপ না করাই ভাল। শ্রীশ্রীমা উত্তরে বলিয়াছিলেন, ভালবাসার বন্ধনই সঙ্ঘকে ধরিয়া রাখিয়াছে, কাজেই এ কি কথা হইল! সব শেষে বলিয়াছিলেন, 'আমি মা, আমার কাছে কি করে তুমি ছেলেদের খাওয়ার খোঁটা দিলে?'

উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে মাঝে মাঝে বেলুড় মঠ হইতে সাধু-ব্রহ্মচারীদের অসময়ে আসিয়া উঠিতে হইত, কলিকাতায় কাজের জন্য কখনো কখনো একটু দেরী হইয়া যাইত, প্রসাদ পাওয়ার কথা হয়তো পূর্বে জানানো সম্ভব হইত না। এমনি একটি ঘটনায় একদিন একজন দেরী করিয়া আসিয়াছেন, প্রসাদ পাইবেন দুপুরে, আগে জানানো হয় নাই। গোলাপ-মা তাঁহাকে সেজন্য একটু বকিতেছেন—এরূপ করিলে যে খুব অসুবিধা হয় তাহাই বুঝাইতেছেন। মা উহা শুনিয়া ঘরে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাহিরে আসিয়া গোলাপ-মাকে তাঁহার ছেলেদের বকিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

বেলুড় মঠের একজন সাধু কি একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাকে

অপর কেহ বলিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে মঠ হইতে সরাইয়া দেওয়া হইবে। সাধুটি সন্ত্রস্ত হইয়া জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে গিয়া হাজির। মা তাঁহাকে অভয় দিয়া স্বামী শিবানন্দকে পত্র লিখিলেন: বাবা তারক, ······ কি অপরাধ করেছে, তুমি নাকি তাকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেবে। তা বাবা, মায়ের কাছে কি ছেলের কোন অপরাধ হয়?—ওকে কিছু ব'লো না।

একজন স্ত্রীলোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন মায়ের দুয়ারে। নিজ কৃত দুষ্কর্মের, নিজ অপবিত্রতার কথা ভাবিয়া ভয়ে ঘরে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না—পাছে মায়ের ঘর অপবিত্র হয়। মা বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন, 'ভয় কি মা, ···আমি তোমাকে দীক্ষা দেবো।'

দুষ্কৃতকারীকেও এভাবে ভালবাসায় আপনার করিয়া লওয়ার ঘটনা মায়ের জীবনে একটি নয়, বহু রহিয়াছে। বেলুড় মঠে একবার তিনজন আসিয়াছেন দীক্ষার জন্য। এমন অশুদ্ধচিত্ত তাঁহারা, স্বামী ব্রহ্মানন্দও তাঁহাদিগকে দীক্ষা দিতে ইতস্ততঃ করিলেন। অথচ ঠাকুরের দ্বারে আসিয়াছে কৃপা চাহিতে, কি করা যায়? শেষে তাঁহাদের পাঠাইয়া দেওয়া হইল শ্রীশ্রীমায়ের কাছে, জয়রামবাটীতে। মা তাঁহাদের দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, 'বিদেশ থেকে ছেলেরা মায়ের কাছে ভাল ভাল জিনিস পাঠায়, আর রাখাল কি পাঠিয়েছে দেখ!' কিন্তু তিনি যে মা, কৃপা চাহিতে আসিয়াছে, না করিবেন কিরূপে? তাই তাঁহাদেরও কৃপা করিলেন, সানন্দে নিজে গ্রহণ করিলেন তাঁহাদের সব পাপ। স্বামী প্রেমানন্দ একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না, মার কাছে চালান দিচ্ছি, মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন।'

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের থাকাকালীন সেখানকার একটি বাগ্দীর ছেলের দীক্ষার জন্য মাকে ধরিয়া বসে। মা স্থানকাল বিবেচনা করিয়া, জয়রামবাটী-অঞ্চলের তৎকালীন সামাজিক গোঁড়ামির কথা চিন্তা করিয়া তাহাকে বলেন যে, তিনি যখন কলিকাতায় যাইবেন, সেখানে গেলে তাহাকে দীক্ষা দিবেন। ছেলেটি বুদ্ধিমান, মা কেন একথা বলিতেছেন বুঝিয়া তাঁহার মাতৃস্নেহের উৎস-মুখে আঘাত করিল—'মা বাগ্দীর মেয়ে হ'তে পেরেছিলে, আর বাগ্দীর মা হতে ভয় পাচ্ছ?' পরদিনই মা তাহাকে দীক্ষা দেন।

এই যে বাধাবন্ধহীন ভালবাসা—ইহার জন্য তাঁহাকে ভুগিতে হইতও কম না। শিষ্যের সব পাপতাপ গ্রহণ তো করিতেনই, (নিজমুখেই সেকথা বলিয়াছেন), এমনিতেও তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবার সময় কাহারো কাহারো স্পর্শেই তাঁহার দেহে অসহ্য যন্ত্রণা-বোধ হইত—'যেন বোলতায় হুল ফুটিয়ে দিলে!' শ্রীরামকৃষ্ণেরও অনুরূপ যন্ত্রণা হইত, তিনি তখন যাহা করিতেন, শ্রীশ্রীমাও তাহাই করিতেন—গঙ্গাজলে পা ধুইয়া ফেলিতেন। কিন্তু তথাপি কাহাকেও নিষেধ করিতে পারিতেন না। প্রায়ই হইত বহু জন আসিয়া নিজ দুঃখের কাহিনী, সংসারের জ্বালার কথা বহুক্ষণ ধরিয়া বলিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতেছেন; তিনি নিজের অসুবিধায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মন দিয়া সব শুনিতেছেন। তিনি যে মা!—তিনি বিরক্ত হইলে ছেলেরা আর কাহার কাছে প্রাণের কথা জানাইবে, দুঃখের কথা জানাইয়া একটু জুড়াইবে? এরূপ ঘটনায় মায়ের কষ্ট হয় অথচ মা কাহাকেও

নিষেধ করেন না দেখিয়া জনৈক সেবক একবার এই ধরণের ভক্তদের উপর খুবই বিরক্ত হন, মাকে সেকথা বলেনও। মা তাহাতে প্রথমে তাহাদের এরূপ করার সপক্ষে কিছু কারণ দর্শাইয়া পরে আসল কথাটি বলিয়াছিলেন, ওদের দুঃখ 'তুমি কি বুঝবে? তুমি তো মা নও!'

জন্মজন্মান্তরের মা

তিনি মা। 'কথার কথা' মা নয়, একজন্মের মা নয়, জন্মজন্মান্তরের মা! মহাভারতের শেষের দিকে 'ভারত-সাবিত্রী'তে আছে, 'পূর্ব পূর্ব জন্মে আমরা হাজার হাজার মা-বাপ পাইয়াছিলাম, শত শত আত্মীয় স্বজন পাইয়াছিলাম; এজন্মেও পাইয়াছি, পরজন্মেও পাইব। এসবই অনিত্য, আমাদের দেহও অনিত্য কিন্তু আমরা (দেহী, জীব) নিত্য।' প্রতি জন্মেই আমরা একটি করিয়া গর্ভ-ধারিণী 'মা' পাইয়াছি, তাঁহাদের নিকট হইতে মাতৃস্নেহও পাইয়াছি। কিন্তু তাঁহারা কেহই আমাদের চিরকালের মা নন—একটি জীবনের মা। কিন্তু যিনি জগজ্জননী, যিনি সৃষ্টির অন্তর্গত সকলেরই, কীটপতঙ্গ পশু পক্ষী মানব দেবতা, এমনকি অবতারেও, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহে-শ্বরেরও মা, তিনি আমাদের চিরদিনের মা, জন্ম-জন্মান্তরের মা। প্রতি জন্মেই সে-জন্মের মায়ের মাধ্যমে—পশুপক্ষিরূপিণী মা, মানবী মা, দেবী মা, যে মা-ই হোন না তিনি—এই জগন্মাতারই স্নেহের আংশিক স্পর্শ আমরা পাইয়াছি। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী যে সেই জগন্মাতা, আমাদের সকলেরই জন্মজন্মান্তরের মা, একথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়া গিয়াছেন; মা নিজেই বলিয়াছেন বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন সময়ে; শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসিসন্তানগণও তাহা উপলব্ধি করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। অবতারের সঙ্গে এবারের মতো পূর্ব পূর্ব বারেও তিনি যে দেহধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও মা নিজে বলিয়াছেন; বলিয়াছেন, তিনিই সীতা-রূপে, রাধারূপে আসিয়াছিলেন। মানবদেহ ধারণ করিয়া থাকিলেও নিজ জগন্মাতৃত্ব তিনি যে বিস্মৃত নন, তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছেন—শ্রীরাম-কৃষ্ণকে 'সন্তানভাবে দেখি,' 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সবাই আমার সন্তান', আমি 'এই পিপড়েটিরও মা।' তিনি যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও জননী—সাকারা, বিশ্বরূপিণী, আবার নিরাকার চরম সত্তাও—'সাকারাঽপি নিরাকারা অস্মাকমপি জন্মভূঃ'—তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছেন: শেষে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। ·· মা মা—শেষে দেখে মা আমার জগৎ জুড়ে।' এখানে স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেছেন—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত সব মতেই যাহাকেচরম সত্য বলে, তিনি তাহাই।

তিনি জগন্মাতা; তিনি আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের মা, তাই তিনি ছোট-বড়, শুদ্ধ-অশুদ্ধ সকলকেই সমভাবে ভালবাসিয়াছেন, সকলকেই সমভাবে অভয় দিয়াছেন, সব ছেলের সব অপরাধ সমভাবে ক্ষমা করিয়াছেন। আর তাহা না হইলে, তিনি নিজে এভাবে কোলে টানিয়া না লইলে তাঁহার নিকট যাইতে পারিত কয়জন? তিনি রুষ্টা হইলে আর কেহই রক্ষা করিতে পারিত না। শ্রীরামকৃষ্ণ এবিষয়েও হৃদয়কে একবার সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন; স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে 'ওর ভেতর যে আছে সে ফোঁস করলে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও তোকে রক্ষা করতে পারবে না।' অসীম শক্তিমতী জগন্মাতা, তাই ক্ষমাই তাঁহার স্বভাব। একবার কর্মফল ও তাহা ভোগ করার অনিবার্যতা-প্রসঙ্গে জনৈক ব্যক্তি মাকে বলিয়াছিলেন, 'তাহলে

মা, ক্ষমা বলে কি কিছু নেই?' করুণাপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া মা বলিয়াছিলেন: 'না থাকলে এখানে থাকতে পারছ কি ক'রে, বাবা!'

কিন্তু ক্ষমাও তাঁহার কাছে ছোট কথা—তিনি যে মা! ছেলেরাই মায়ের কাছে অপরাধের কথা ভাবে, মায়ের ক্ষমার কথা ভাবে। আচার্য শঙ্করও বলিয়াছেন, 'সর্বদা যদি কেউ অপরাধ করে, তবুও ত্রিভুবনজননী সে সমস্ত অপরাধই পুত্রজ্ঞানে ক্ষমা করেন।' কিন্তু যিনি মা, জন্মজন্মান্তরের মা, ত্রিভুবনজননী, তিনি নিজে কি বলেন? তিনি বলিতেছেন,—শ্রীশ্রীমা বলিতেছেন—মায়ের কাছে ছেলের কোন অপরাধই হয় না! সন্তানের কাছে এর চেয়ে বড় আশ্বাসবাণী আর কি হইতে পারে?

'বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী' মা

তাহা হইলে, মায়ের কাছে ছেলের যখন অপরাধ হয় না, আমরা কি চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা ছাড়িয়া, সাধনভজন ছাড়িয়া বেপরোয়াভাবে চলিব? চলিতে পারি, যদি শ্রীশ্রীমাকে আমাদের আপনার মা বলিয়া, জন্মজন্মান্তরের মা বলিয়া, জগন্মাতা বলিয়া ঠিক ঠিক বোধ সর্বদা সজাগ থাকে।

এই ভাব রক্ষার জন্যই সাধনভজন প্রয়োজন। অন্য প্রসঙ্গে, সেবার প্রসঙ্গে মা এই কথাই বলিয়াছিলেন। একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'মা, ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করলেই তো সব হবে, জপধ্যানের আর প্রয়োজন কি?' মা বলিয়াছিলেন, ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করিলে নিশ্চয়ই সব হইবে, কিন্তু জপধ্যান না করিলে ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ করিতেছি—এভাব রাখিতে পারা যায় না।

তাঁহাকে আপন মা বলিয়া, জন্মজন্মান্তরের মা বলিয়া জানার জন্যই সাধনা। অনুক্ষণ তাঁহার চিন্তাই মনে এ বোধ জাগাইতে পারে। কিন্তু চব্বিশঘণ্টা তাঁহার ধ্যানে মগ্ন থাকিতে পারি আমরা কয়জন? কিন্তু কাজ আমরা সবাই করিতে পারি, করিতে চাই ও, করিতে হয়ও। তাই, নিয়মিতভাবে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহার চরণে মন একাগ্র করিবার চেষ্টার সঙ্গে দৈনন্দিন সব কাজের মধ্যেও কোন-না-কোন আকারে তাঁহার চিন্তাকে জড়াইয়া রাখাই আমাদের সর্বসাধারণের পক্ষে সহজ সাধনা। সর্বসাধারণের জন্য, বিশেষ করিয়া সংসারে থাকিয়া যাঁহারা ভগবানলাভ করিতে চান, তাঁদের জন্য এই সাধনার কথাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীমা আমাদের প্রতি অসীম ভালবাসায়, যাহাকে অতি অশান্তির সংসার বলি আমরা, রাধুদি প্রভৃতিকে লইয়া সেরূপ একটি সংসারে থাকিয়া নিজে বহু যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আমাদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্ত আদর্শটি নিজ জীবনে মূর্ত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। জ্ঞানরূপিণী, জ্ঞানদাত্রী তিনি। জ্ঞানলাভের, ভগবানলাভের পথ নিজ জীবন-দীপ জ্বালাইয়া তিনি আলোকিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, সন্তানদের জন্য ভালবাসায় ভরপুর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহার আবহাওয়া; তিনি না দেখাইলে আর দেখাইবেই বা কে? তিনি যে মা!

লহ মা প্রণাম

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

এসেছ জননী বিশ্বদুলালী
আজি এ পুণ্য ক্ষণে,
আকাশ বাতাস হ'ল মুখরিত
তব জয়-বন্দনে।
এসেছ লক্ষ্মী, পরমা প্রকৃতি
সারদা শুভঙ্করী !
প্রণমি চরণে জগত-ধাত্রী
অভয়া ক্ষেমঙ্করী।

আজি ধরণীর গ্লানি, দ্বন্দ্ব-বিভেদ
দুঃখবেদনা নাশি
দাও সাম্যের শান্তি-অমিয়—
ধরণী উঠুক হাসি।
তব কল্যাণ-আলোকের পথে
করো মা সবারে যাত্রী,
দাও মা সবারে বরাভয়-কৃপা
কল্যাণী ! শুভদাত্রী !

স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[প্রতিভা দেবীকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

বেলুড় মঠ
সোমবার, ৩রা আশ্বিন
[১৯২৬ খৃঃ]

কল্যাণীয়া মায়ী,—

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত ও সুখী হইলাম। মঠের সকলে ও আমি ভাল আছি। আহারাদি পূর্বের মতনই চলিতেছে, দুই বেলা রুটি। সীলেট থেকে তোমার দিদির একখানা পত্র পাইয়াছি, তাহারা ভাল আছে, আজ তাকে লিখিব। খুকীমায়ীর পত্র অনেক দিন পাই নাই, তোমার পত্রেই তার মঙ্গলসংবাদ পাই। ঢাকা মিশনের একজন ডাক্তার এখানে আসিয়াছিল, তার কাছে মিশনের ও ঢাকার সংবাদ শুনিলাম। এখানকার সব সাধুদের শুভ আশীর্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। আজকাল এখানকার ঝড় বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে। মেদিনীপুরের দিকে বন্যার জলও কমিয়াছে, এখন সেই সব জায়গায় বোরো ধান লাগাইতেছে। এখানকার মঠের লোক সেই সব দেশে চাল ও কাপড় দিতেছে। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক ভালবাসা, শুভ ইচ্ছা জানিবে। তোমার পরীক্ষার পড়া হইতেছে তো ?

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
তোমাদের শ্রীসুবোধানন্দ

যোগ ও বিচারমার্গ

স্বামী ধীরেশানন্দ

'মনীষাপঞ্চক' স্তোত্রে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—

'যৎ সৌখ্যাম্বুধিলেশলেশত ইমে
শক্রাদয়ো নির্বৃতা,
যশ্চিত্তে নিতরাং প্রশান্তকলনে
লব্ধ্বা মুনির্নির্বৃতঃ।
যস্মিন্নিত্যসুখাম্বুধৌ গলিতধী-
র্ব্রহ্মৈব ন ব্রহ্মবিৎ,
যঃ কশ্চিৎ স সুরেন্দ্রবন্দিতপদো
নূনং মনীষা মম॥' ৯॥

যে আনন্দ-সাগরের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ লাভ করিয়াই ইন্দ্রাদিদেবগণ পরিতুষ্ট; নির্বৃত্তিক অন্তঃকরণে যে আনন্দরাশি সাক্ষাৎকার করিয়া মুনিগণ কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন; সেই নিত্য সুখসাগরে যাঁহার চিত্ত সদা তদাকার হইয়া বিদ্যমান থাকে তিনি শুধু ব্রহ্মবিৎ নহেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মই, ইন্দ্রাদিদেবগণও তাঁহার শ্রীপাদ বন্দনা করিয়া থাকেন—ইহাই আমার সুদৃঢ় নিশ্চয়।

এই শ্লোকে ভাষ্যকার বলিলেন 'প্রশান্তকলনে চিত্তে'—অর্থাৎ চিত্তের যাবতীয় কলনা, বিকল্পজাল যখন শান্ত হয় তখনই মুনিগণ সেই ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। চিত্ত সম্পূর্ণ নির্বিকল্প না হইলে ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয় না। সমুদ্রের তরঙ্গরাশি যেমন অফুরন্ত, চিত্তের বিকল্পসমূহেরও তদ্রূপ যেন আর শেষ নাই। একটির পর একটি অনবরত কত কল্পনাই না চিত্তে জাগিতেছে! সুষুপ্তি-অবস্থায় সর্ববিকল্পের উপশম হয় বটে, কিন্তু তাহা তো কাহারও যত্নসাধ্য নহে, নিতান্ত অবশ হইয়াই যেন জীব সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিজের সত্তা হারাইয়া ফেলে। সুতরাং সে অবস্থায় কি থাকে তাহা সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। জাগ্রতে ঐ বিকল্পজাল নিজের চেষ্টা দ্বারা শান্ত করিতে পারিলে তবেই ব্রহ্মানন্দানুভব সম্ভবপর—ইহাই আচার্য এখানে ইঙ্গিত করিলেন।

ইন্দ্রিয়াদি সহায়েই আমরা সদা বিষয়ানুভব করিয়া থাকি, কিন্তু চিত্তের নির্বৃত্তিক অবস্থায় কোন ইন্দ্রিয়াদিও স্ব-ব্যাপার করে না; তখন ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয় কি করিয়া? এই শঙ্কার উত্তর এই যে, কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়তা বিনাই প্রশান্ত অন্তঃকরণে নিত্য স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের যে অভিব্যক্তি তাহাকেই অপরোক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বলে। এই অনুভবের যে আনন্দ তাহা ইন্দ্রিয়াদি সহায়ে অনুভূত আনন্দ হইতেও অনন্তগুণ অধিক। জগতে যত আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা ঐ আনন্দেরই অতি ক্ষুদ্রতম অংশ বা আভাসমাত্র। নির্বিষয়, নির্বৃত্তিক হইয়া যাঁহার চিত্ত ঐ আনন্দে বিলীন হয়, তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মই, ব্রহ্মবিৎ-মাত্র নহেন। ব্রহ্মবিৎ বলিলে যেন জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটির একটু ভেদলেশগন্ধ থাকে, তাহাও সেখানে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়—তাই তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ। সর্বদা এরূপ স্থিতি বিরল কাহারও হয়। যাঁহার হয়, স্বয়ং দেবেন্দ্রও তাঁহার পাদার্চনা করিয়া নিজেকে ধন্য বোধ করেন।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, দুরন্ত অশান্ত চিত্তকে কি করিয়া শান্ত করা যায়। ইহা যেন চঞ্চল বায়ুকে হাতে ধরিয়া বদ্ধ করিবার সুকঠিন

প্রয়াস। শ্রীবশিষ্ঠ প্রিয় শিষ্য শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছেন—

'অপ্যব্ধিপানান্মহতঃ সুমেরূন্মূলনাদপি।
অপি বহ্ন্যশনাৎ সাধো বিষমশ্চিত্তনিগ্রহঃ॥'

—হে রাম! সমুদ্রপান, সুমেরু পর্বত উৎপাটন এবং অগ্নিভক্ষণ করা অপেক্ষাও চিত্তনিগ্রহ-সম্পাদন সুকঠিন।

মহর্ষি অগস্ত্যের সাগরপান, প্রলয়াগ্নিতে সুবিশাল সুমেরুর উৎসাদন, এবং শ্রীকৃষ্ণের দাবানলপান প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং পূর্বোক্ত অসংভাব্য বিষয়সকলও বরং সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু চিত্তনিগ্রহ তদপেক্ষাও কঠিন। তাহা হইলে এই চিত্তনিরোধের উপায় কি?

যোগমার্গ: উক্ত প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—উপায় যোগাভ্যাস। চঞ্চল চিত্তে আত্মার ভান হয় না। তাই দ্রষ্টা চেতন পুরুষের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য চিত্তকে নিরোধ করিবার আবশ্যকতা আছে। মনে জোর করিয়া এই চিত্তনিরোধ অভ্যাস করিতে হয়। যম-নিয়ম-আসনাদি যোগাঙ্গের অভ্যাস, আরাধ্য দেবতাবিশেষে নিষ্ঠা ভক্তি ইত্যাদি উপায়ে চিত্তের ক্রমশঃ নিরোধ হইয়া থাকে। ইহাকে 'ক্রমনিগ্রহ' বলা হয়। প্রাণায়াম-সহায়ে 'হঠ' অর্থাৎ জোর করিয়া প্রাণনিরোধ-পূর্বকও চিত্তের নিরোধ হইতে পারে, কারণ চিত্ত এবং প্রাণবায়ুর গতি ও উপরতি পরস্পর-সাপেক্ষ। ইহাই 'হঠনিগ্রহ' নামে প্রসিদ্ধ।

বিচারমার্গ: চিত্তজয়ের অপর মুখ্য ও সহজসাধ্য উপায় হইতেছে 'বিচার' অর্থাৎ অধ্যাত্মবিদ্যাধিগম, সাধুসঙ্গ ও বাসনাপরিত্যাগ। এই সকল সরল উপায় বিদ্যমান থাকিতে জোর করিয়া প্রাণায়ামদ্বারা চিত্ত-নিয়মনের প্রয়াস অকর্তব্য।

সুষুপ্তি হইতে যখন আমরা স্বপ্ন বা জাগ্রৎ অবস্থায় আসি, তখনই চিত্ত ভাসিয়া উঠে এবং সেই চিত্ত তখন বিচিত্র সংসার কল্পনা করে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাতে সমভাবে বিদ্যমান আমাতে এই চিত্ত ও সংসার আগন্তুক। সুষুপ্তিকালে উহারা থাকে না। যাহা কোন অবস্থায় থাকে ও অপর অবস্থায় থাকে না, তাহাকে কল্পনা ব্যতীত আর কি বলিব? ঘটের উৎপত্তি-, স্থিতি- ও লয়কালে এক মৃত্তিকাই বিদ্যমান। মধ্যকালে অর্থাৎ একমাত্র স্থিতিকালেই আমরা ঘট দেখি। অতএব ঘটের নাম-রূপ মৃত্তিকাতে কল্পিত, ইহাই বলিতে হয়। তদ্রূপ চিত্ত আত্মাতে কল্পিত, পুনঃ চিত্ত সংসার কল্পনা করে এবং সেই সংসার মৃত্তিকাতে ঘটভানের ন্যায় আত্মাতে ভান হয়।

মনে করা যাউক একটি শুভ্র স্বচ্ছ কাঁচের পাত্রে রং-মিশানো জল ভরা হইয়াছে। যে-রং মিশানো হইয়াছে তাহা দ্বারা জলের রংও তদ্রূপ হইয়াছে এবং জলের রং-এ শুভ্র কাঁচ-পাত্রটিও সেইরূপ রংবিশিষ্ট মনে হইতেছে। এখন পাত্রটির স্বাভাবিক রং জানিতে হইলে জল ফেলিয়া দিতে হইবে। তখন পাত্রের শুভ্র স্বচ্ছ রূপটি প্রতিভাত হইবে। বর্তমান ক্ষেত্রেও এইরূপ। চিত্তের কল্পনা এই সংসার—অর্থাৎ চিত্তের নানা বৃত্তি—শান্ত করিতে পারিলেই চিত্ত তখন অচিত্ত হইয়া যায় এবং তখনই এক স্বপ্রকাশ আত্মা স্বমহিমায় প্রতিভাত হন।

অধ্যাত্মবিদ্যাধিগম: অর্থাৎ বিচার দ্বারা দৃশ্য মিথ্যা ও দ্রষ্টা চিদ্‌বস্তুই একমাত্র সত্য, এইরূপ বোধ হইলে স্বগোচর ও কল্পিত দৃশ্যবস্তুতে প্রয়োজনাভাববশতঃ চিত্ত আর ধাবিত হয় না এবং স্বপ্রকাশ আত্মাও চিত্তের বিষয় নহেন, ইহা জানিয়া ইন্ধনশূন্য অগ্নির ন্যায়

চিত্ত স্বয়ংই উপশান্ত হইয়া যায়। গুরুর উপদেশে বোধিত হইয়াও বিস্মৃতি-আদিবশতঃ যাহাদের ঐরূপ হয় না, তাহাদের জন্য সাধুসঙ্গ বিহিত। সৎসঙ্গে পুনঃপুনঃ তত্ত্ববোধন ও স্মরণপ্রভাবে চিত্তের জড়তা ধীরে ধীরে ক্ষীণতা লাভ করে। কিন্তু দুর্বাসনা প্রবল হইলে তাহাও করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। তখন বিবেকাদি সহায়ে বাসনা পরিত্যাগ করিবার প্রচেষ্টাই কর্তব্য। কাহারও অতি প্রবল দুষ্ট বাসনা থাকিলে তখন প্রাণায়ামাদির সহায় অবলম্বন ব্যতীত আর উপায় থাকে না। (গীতা, মধুঃ টীকা ৬।৩৫)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, 'বিচার করিতে করিতেই মন আপনি স্থির হয় ও একাগ্র হইয়া ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে স্থিত বা সমাহিত হইয়া পড়ে। ইহাই সমাধি।'

পূর্বোক্ত উপায় অবলম্বনেই চিত্ত অচিত্ত অর্থাৎ নির্বৃত্তিক হয় ও তখন অসঙ্গ আত্মার বোধ হয় ; শ্রুতিবর্ণিত 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'—এই তত্ত্ব ঠিক ঠিক অনুভূত হয়। তখন সাধক জানিতে পারেন যে, তিনি নিত্য মুক্ত আত্মা এবং বন্ধন তাঁহার কোন কালেই ছিল না, বর্তমানেও নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। বন্ধন যাহার নাই, তাহার মোক্ষও নাই। বন্ধন মোক্ষ, এই সকলই অবিদ্যার কল্পনামাত্র। আচার্যও বলিয়াছেন—'মায়াকৢপ্তৌ বন্ধমোক্ষৌ'—বন্ধন মোক্ষ, এসবই মায়ার কল্পনা মাত্র।

রজ্জুদৃষ্টিতে যেমন তাহাতে (ভ্রান্তিদৃষ্ট) সর্পও নাই এবং তাহার নিবৃত্তিও নাই, আত্মাতেও তদ্রূপ বন্ধ মোক্ষ বলিয়া কিছু বস্তুতঃ নাই। মায়াবশতঃ বন্ধনভ্রান্তি প্রতীত হয় মাত্র। জ্ঞান হইলে সেই মিথ্যা প্রতীতি দূর হয় মাত্র। মায়িক পদার্থের কখনও নাশ হয় না। শঙ্কা হইতে পারে যে, তবে জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞাননাশ হয়, এরূপ বলা হয় কেন? উত্তরে বলা যায় যে, অজ্ঞান তিরোহিত হইয়া স্থানান্তরে যায় বা অগ্নিদগ্ধ বস্তুর ন্যায় অভাব-অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে। অজ্ঞানের কোন সত্তাই নাই, উহা পূর্বেও ছিল না এবং জ্ঞানানন্তর কোথাও যায়ও না। ভ্রান্তি মাত্র ছিল। ভ্রান্তিপ্রতীতি না হওয়াকেই উহার নিবৃত্তি বা নাশ বলা হয়। বন্ধনপ্রতীতি না হওয়াই বন্ধননিবৃত্তি বা মোক্ষ। অবিদ্যা-নিবৃত্তি বা -নাশ মুষল-প্রহার দ্বারা ঘটাদি নাশের ন্যায় নহে। বস্তুতঃ অবিদ্যা আসেও না, যায়ও না।

নিষ্প্রপঞ্চ আত্মাই সর্ববেদান্তবিজ্ঞেয়। চিত্তের নানা বিকল্পনারাশিই যেন তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। মনের কল্পনাই আত্মাতে ভাসে ও নিত্যমুক্ত আত্মাকে যেন সংসারী ও বদ্ধ করিয়া ফেলে। দ্বৈত সবই মনঃসমকালীন, অতএব মনোময়, মনঃ-কল্পনামাত্র।

'মনোমাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ', 'মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে।'—দ্বৈত মনোমাত্র, এক অদ্বৈত তত্ত্বই পারমার্থিক সত্য। মন অমনীভাব অর্থাৎ সর্ববিকল্পরহিত হইলে আর কোন দ্বৈত দৃষ্টি-গোচর হয় না।

দ্বৈত সুষুপ্তি-অবস্থাতেও থাকে না। সর্ব দ্বৈত তখন মন সহ অজ্ঞানে বিলীন হইয়া যায়। সমাধিতে মন থাকে কিন্তু দ্বৈত-প্রতীতি থাকে না। তৎকালে নির্বিকল্প মন বা চিত্ত ব্রহ্মাকার হইয়া থাকে। সুতরাং নিদ্রামূর্ছার ন্যায় সমাধি কোন জড় অবস্থাবিশেষ নহে।

'মোহেন বিস্মৃতে দৃশ্যে সুষুপ্তিরনুভূয়তে।

বোধেন বিস্মৃতে দৃশ্যে তুরীয়মবশিষ্যতে ॥'

—বোধসার

—মোহ বা জড়তাবশতঃ দ্বৈতবিস্মৃতিই সুষুপ্তি, আর বোধসহায়ে দ্বৈতবিস্মৃতিই সমাধি। তখন এক তুরীয়ই অবশেষ থাকে।

উভয় মার্গের পার্থক্য : যোগসহায়ে যে মনকে নির্বিকল্প করা হয়, তাহা স্থায়ী হয় না, কারণ তাহাতেও জগতের সত্যতাবুদ্ধি থাকিয়াই যায়। উহা কালান্তরে আবার দ্বৈতকল্পনার হেতু হইয়া থাকে। কিন্তু বিচার দ্বারা অর্থাৎ দৃশ্য মিথ্যা ও চিদ্রূপ আত্মাই একমাত্র সত্য, এই চিন্তনে দ্বৈতের মূল বা জড় নষ্ট হইয়া যায়। 'অধ্যাত্মবিদ্যাধিগম'—অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-মনন দ্বারা দ্বৈতের জড় শিথিল হইয়া পড়ে। সংসার-কল্পনা আর পূর্বের ন্যায় দৃঢ় থাকে না, উহা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইতে থাকে। দীর্ঘভাবনা দ্বারা বেদান্ত-সিদ্ধান্ত চিত্তে দৃঢ়তা লাভ করে।

এক ব্রাহ্মণ একটি গোবৎস দক্ষিণাস্বরূপ পাইয়া উহা স্বগৃহে লইয়া যাইতেছিল। পাঁচটি ঠগ সরল ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করিবার মানসে সে-রাস্তার পাশে কিছু দূরে দূরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রথম ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তিনি গাধার বাচ্চাটি কোথায় পাইলেন। ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন যে, উহা গোবৎস। দ্বিতীয় ব্যক্তিও অনুরূপ প্রশ্ন করিলে তাহাকেও ব্রাহ্মণ একই উত্তর দিলেন। তৃতীয় ব্যক্তিও যখন একই প্রশ্ন করিল তখন ব্রাহ্মণের মনে একটু সন্দেহ হইল, তিনি গোবৎসটিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ও একটু সন্দিগ্ধ চিত্তেই পুনরায় অগ্রসর হইলেন। চতুর্থ ব্যক্তি যখন ঐ প্রশ্নই করিল তখন ব্রাহ্মণের সন্দেহ গভীরতর হইল। তথাপি গোবৎসটিকে লইয়া দোমনাভাবে ব্রাহ্মণ পথ চলিতে লাগিলেন। অবশেষে পঞ্চম ব্যক্তিও যখন ঐ একই প্রশ্ন করিল তখন ব্রাহ্মণের নিঃসন্দেহ ধারণা হইল যে, ইহা গোবৎস নহে, দাতা তাহাকে ঠকাইবার জন্য একটি গর্দভশিশুই দিয়াছে। ব্রাহ্মণ গোবৎসটিকে সেখানেই পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহাভিমুখে গমন করিল। —ইহাই শব্দশক্তির অপূর্ব মহিমা! শব্দশক্তি অচিন্তনীয়। মিথ্যা কথাও বারবার শ্রবণ করিতে থাকিলে লোকের তাহা সত্য বলিয়া ধারণা হয়। সত্য অপৌরুষেয় বেদান্তবাক্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিলেও অনুরূপ ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে। বেদান্তবাক্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-প্রভাবে বহুজন্মার্জিত জগৎসত্যত্ববুদ্ধি শিথিল হইতে থাকে। তখন ক্রমশঃ এই দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, জগৎ মিথ্যা, জগৎ-নামীয় কোন বস্তু পরমার্থতঃ নাই, উহা সত্তাহীন একটা প্রতীতি মাত্র। সত্যবস্তু সর্বকালস্থায়ী। যদি জগৎ সত্য হইত তবে সুষুপ্তি-সমাধি-আদি কালে উহা থাকে না কেন? ব্যুত্থান-দশায় মনের স্ফুরণ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে চিত্তপটে জগৎ ভাসিয়া উঠে। অতএব ইহা নিঃসন্দেহ যে, জগৎ মনোময়। স্বামী বিবেকানন্দও আপন এই অনুভব অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন :

This world is a dream / Though true it seems / And only Truth is He, the living. / The real me is none but He And never never matter changing!

But this I say, Remember pray; That God is true, all else is nothing.—

এইরূপ চিন্তাসহায়েই চিত্ত শনৈঃ শনৈঃ আত্মাতে নিবিষ্ট হয়। উহা সম্পূর্ণ আত্মাকার হইলে তাহাই পূর্ণজ্ঞান নামে অভিহিত

হইয়া থাকে।

জ্ঞান দ্বারা দ্বৈত বাসনার সংস্কার দগ্ধ হইয়া যায়। যোগের দ্বারা সেরূপ হয় না। যোগসহায়ে চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেও দ্বৈতসংস্কার থাকিয়াই যায়। 'বিচারেণ বিনান্যসাধনৈর্ন' —বেদান্ত-বিচার বিনা অন্য সাধন দ্বারা দ্বৈত-সংস্কার ক্ষীণ হয় না।

নির্বিষয় মন অর্থ কি? : শ্রুতি বলিয়াছেন :

'মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্' ॥

ব্রহ্মবিন্দু উপঃ ২

—মনই মনুষ্যদিগের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয়াসক্ত মন বন্ধনহেতু ও নির্বিষয় মন মুক্তি-হেতু হইয়া থাকে। নির্বিষয় মনকে মুক্তিহেতু বলা হইল। এই '**নির্বিষয় মন**' অর্থ কি? মন নির্বিষয় তখনই হয় যখন বিষয়ে সত্যত্ববুদ্ধি অর্থাৎ অর্থবুদ্ধি থাকে না। বিষয় কেবল একটা প্রতীতি বা প্রতিভাস মাত্র, এই ধারণা হইলে তখনই মন নির্বিষয় হয়, নির্বৃত্তিক হয়। পুনঃ ব্যবহারকালেও বিষয় বস্তুতঃ নাই—এই জ্ঞান থাকিলে, মন নির্বিষয়। কেবল নিরোধ বা সমাধিকালে মনের যে নির্বিষয়তা তাহা তাৎকালিক। অর্থবুদ্ধিরাহিত্য হইলে মনের যে নির্বিষয়তা, তাহা স্থায়ী (কারণ বিষয়ই তো বস্তুতঃ নাই)।

'**বাসনাক্ষয়**' অর্থও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। সত্য বিষয় থাকিলে তৎপ্রতি বাসনার উদ্রেক তো হইবেই। বিষয়ে সত্যত্ববুদ্ধি ত্যাগ করিলেই ঠিক ঠিক বাসনাক্ষয় হয়। কারণ বিষয় মিথ্যা, কেবল একটা প্রতীতি মাত্র, সুতরাং বাসনা হইবে কিসের? জগৎ মিথ্যা, উহা স্বপ্নবৎ একটা প্রতীতি মাত্র—এই বোধ থাকিলে তাহাতে বাসনোদ্রেক হইতে পারে না। সিনেমার প্রতীতিমাত্র চিত্রদর্শনে কাহারও ঐ দৃষ্ট বস্তুর প্রতি বাসনার উদয় হয় কি? জ্ঞানী তাই কেবল মজা দেখেন। সিনেমা দেখিয়া লোকে যেমন আনন্দ পায়, তদ্রূপ জ্ঞানীও এই জগচ্চিত্রদর্শনে কেবল আনন্দই পান। অজ্ঞের পক্ষেই জগৎ দুঃখময়, কারণ তাহার বিষয়ে সত্যত্ববুদ্ধি রহিয়াছে। এই কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন :

'অজ্ঞস্য দুঃখৌঘময়ং জ্ঞস্যানন্দময়ং জগৎ।
অন্ধং ভুবনমন্ধস্য প্রকাশং তু সুচক্ষুষাম্ ॥'—

বরাহ উপঃ ২।২২

—অন্ধের নিকট জগৎ অন্ধকার, কিন্তু চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির নিকট জগৎ প্রকাশময়; তদ্রূপ অজ্ঞের নিকট জগৎ দুঃখময়, কিন্তু জ্ঞানীর নিকট উহা ব্রহ্মানন্দরসসিঞ্চিত প্রতিভাত হইয়া থাকে।

(**বিচারসহকৃত যোগমার্গ**) : বিচার সহকৃত যোগাভ্যাস অধিকাংশ সাধকের পক্ষে অতি উত্তম পন্থা। 'অপরোক্ষানুভূতি' গ্রন্থে ভগবান্ ভাষ্যকার এই কথাই বলিয়াছেন :

'পরিপক্বকষায়াণাং কেবলোঽয়ং চ সিদ্ধিদঃ।
কিঞ্চিৎপক্ককষায়াণাং হঠযোগেন
সংযুতঃ ॥' ৪৩, ৪৪

—পরিপক্বকষায় অর্থাৎ মার্জিতচিত্ত উত্তম অধিকারীর পক্ষে কেবল বিচারমার্গই জ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভের হেতু। তাহার জন্য আর যোগাভ্যাস অপেক্ষিত নহে। কিঞ্চিৎপক্ককষায় অর্থাৎ চিত্তগত মলবিক্ষেপাদিদোষ যাহাদের উপাসনাদি সাধনানুষ্ঠান দ্বারা কিছুটা মাত্র মার্জিত হইয়াছে, সেই নিম্ন অধিকারিগণের পক্ষে 'হঠযোগ' অর্থাৎ পাতঞ্জল অষ্টাঙ্গ যোগসহ ব্রহ্মবিচার অভ্যাস করিলেই তদ্দ্বারা তাহাদের জ্ঞানলাভ হইবে।

'নিম্ন অধিকারী'—এই কথায় কাহারও বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। উহা

হেয়তাপ্রতিপাদনার্থ বলা হয় না। জগতে নিম্ন অধিকারীর সংখ্যাই অধিক, আমরা প্রায় সকলেই। সম্পূর্ণ মলবিক্ষেপরহিত কেবল আবরণমাত্রাবশিষ্ট উত্তম অধিকারী জগতে কয়টি? মুষ্টিমেয় দু'চারজনই হয়তো হইয়া থাকেন। তাঁহারাই শুদ্ধ বিচারমার্গের যোগ্য পথিক। বাহ্যদৃষ্টিতে এই মার্গ বড়ই আকর্ষণীয়। অনেকেই নিজের স্থিতি, যোগ্যতা বা অধিকার বিষয়ে একটা অতিরিক্ত উচ্চ ধারণা করিয়া উত্তম অধিকারীর জন্য নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করেন ও পথভ্রষ্ট হন। তাহাদের কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

'কুশলাঃ ব্রহ্মবার্তায়াং বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিণঃ।
তেঽপ্যজ্ঞানতয়া নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ॥'

—তেজবিন্দুঃ উপঃ ১।৪৬

—ঘোর বিষয়াসক্ত, ব্রহ্মাকারাবৃত্তিবিহীন কিন্তু ব্রহ্মবার্তাতে অতি কুশল ব্যক্তিগণ অজ্ঞানাবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যোগাভ্যাস-সহকৃতই হউক বা কেবল ব্রহ্মবিচারই হউক—ব্রহ্মবিচারই মুখ্য সাধন। যোগসহকৃত হইলেও তাহাতে বিচারেরই প্রাধান্য থাকে। সাধুসঙ্গ ইহার সহায়ক। সৎসঙ্গে সৎচর্চাশ্রবণে মহালাভ হয়; কত জটিল সমস্যা, শংকার সমাধান হইয়া যায় এবং বিষয়-ভোগবাসনা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইতে থাকে।

যোগমার্গ ও বিচারমার্গের মূলতঃ পার্থক্য এই যে, যোগাভ্যাসকালে প্রাণায়াম-প্রত্যাহারাদি সহায়ে চিত্তকে জোর করিয়া নিরোধ করিতে হয় বলিয়া চিত্তের সেই শান্ত অবস্থা স্থায়ী হয় না। যোগমতে জগৎ অনিত্য, দুঃখরূপ বটে কিন্তু উহার স্বতন্ত্র সত্তা আছে ও তাহা নিত্য। সেই জন্যই তাহাতে পূর্ণ বৈরাগ্য সহজে আসে না। বিচার কিন্তু বস্তুর দোষ সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেয়। সংসারে দোষবুদ্ধি হইলে উহা স্বতই ত্যাগ হইয়া যায়। জোর করিয়া আর তাহা ত্যাগ করিতে হয় না। অবোধ বালক ফটকিরিকে মিছরি মনে করিয়া খাইতে চায়। নিষেধ শুনিতে চায় না। কিন্তু একবার মুখে দিয়া উহার বিস্বাদ-অনুভবে যখন সে নিজেই তাহা ত্যাগ করে তখন আর তাহাকে নিষেধ করিতে হয় না। সেই প্রকার বিচারসহায়ে জগতের দোষরূপতা নিশ্চিত হইলে এবং জগৎ মিথ্যা, বস্তুতঃ জগৎ নাই, উহা একটা সত্তাহীন প্রতীতিমাত্র—এই ধারণা হইলে জগতে আসক্তি চলিয়া যায় ও বিষয়ে পূর্ণ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। বিচারাভ্যাসের গভীরতায় চিত্ত ক্রমে আপনিই শান্ত স্থির হয় ও নির্বৃত্তিক হইয়া আত্মাতে সমাহিত হয়। ইহাই বিচারমার্গের সুগমতা।

বিচারের দ্বারা যে মনোনিরোধ তাহাই 'রাজযোগ', এবং পাতঞ্জল যোগের দ্বারা যে মনোনিরোধ তাহাই 'হঠযোগ' নামে খ্যাত। বিচার দ্বারা মনোনিরোধই স্থায়ী। উহার অভ্যাসে চিত্ত পূর্ণরূপে স্বরূপস্থিত হইলেই সেই পরমানন্দসাগরে সাধক মগ্ন হইয়া থাকেন, যাহার উল্লেখ ভগবান ভাষ্যকার 'মনীষাপঞ্চক' স্তোত্রে করিয়াছেন॥

এই স্বল্পকায় স্তোত্রটিতে আচার্যের স্বকীয় অনুপম প্রসন্ন গম্ভীর ভাষায় ব্রহ্মচিন্তনবর্ণন-প্রসঙ্গও বড়ই হৃদয়গ্রাহী।

যীশুখৃষ্ট*

সুব্রহ্মণ্য ভারতী

[অনুবাদ : শ্রীমতী বিভা সরকার]

ক্রুশে প্রাণ হারালেন যীশু
পুনরুত্থানের লাগি তিনটি দিনের অবসানে
প্রেমময়ী মেরী মাগদালিন
দেখিলেন এ সত্য-প্রকাশ আপনার ধন্য দুনয়ানে।
শোন বন্ধুগণ ! এর সত্য সমাচার
দেবতারা জাগিবেন মোদের অন্তরে—
রক্ষিবেন চিরকাল সকল অন্যায়ে,
আমিত্বেরে যদি মোরা পারি ধ্বংসিবারে।
মূর্তিমতী প্রেম সে যে মেরী মাগদালিন।
মহাপ্রাণ পবিত্রাত্মা যীশুখৃষ্ট নিজে,
জীবনের তমোমূর্তি যদি ধ্বংস করি,
তিনদিনে শুভ আত্মা ফিরে আসিবে যে।
প্রেমময়ী মাগদালিন অন্তর-বিশ্বাসে
প্রত্যক্ষ করিবে সেই জ্যোতির্ময় রূপ,
পুজিবে সে মহাপ্রাণে ; ধন্যা সেই নারী,
মধুময় এ আনন্দ স্বর্গীয় অরূপ !
সত্য-ক্রুশে বাঁধি যদি মোদের ইচ্ছায়—
ধ্যান-শঙ্কু দিয়ে রচি সুকঠিন পাশ,
শক্তিমান, মহাপ্রাণ যীশুখৃষ্ট যিনি
প্রত্যক্ষ করিব তাঁরে ব্যাপী মহাকাশ।
(সতীত্বের) নারীত্বের মূর্ত ছবি মেরী মাগদালিন
মূর্তিমান সত্যরক্ষী যীশুখৃষ্ট নিজে,
ক্ষুরধার অপরূপ মহাশিক্ষা এই
ইচ্ছা করিলেই পার শিখিতে সহজে।

---

* মূল তামিল হইতে অনূদিত।

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়

[পূর্বানুবৃত্তি]

['ভক্তে'র ডায়েরি হইতে]

১৯৩৬ খৃঃ মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ। প্রায় মাসখানেক হইল স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। আগামী সপ্তাহে যাইবার কথা হইতেছে, তাই ভক্ত দেখা করিতে আসিয়াছে।

মঠের দ্বিতলের ঘরে মহারাজ ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট। মাটিতে কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী বসিয়া আছেন, কয়েকজন দাঁড়াইয়া। মহারাজ বিহার ভূমিকম্পের কথা বলিতেছেন: "সেবার গেলুম বিহার (ভূমিকম্পে) রিলিফ দেখতে। দেখে বুকটা ফেটে গেল—যত না লোকের কষ্ট দেখে, তার চেয়ে বেশী রিলিফের বহর দেখে। যা করছে কাজের কাজ, তাও সামান্যভাবে, আমাদের ছেলেরাই। আর সব তো দেখলাম একটা মজা পেয়ে গেছে। এরাই বা আর কি করবে বলো—যৎসামান্য ফাণ্ড—ঐ যা মেয়র দিয়েছিলেন ৬০,০০০৲ (ষাট হাজার টাকা)। তাও সব ইঞ্জিনিয়র কণ্ট্রাক্টর ওদের জানাশুনোকে দিতে হবে।

"Viceroy's Fund (ভাইসরয়ের তহবিল), যাতে সবচেয়ে বেশী টাকা উঠেছে, তার টাকায় শুনলাম অফিস কোয়ার্টার হবে। তা সেগুলোও তো নষ্ট হয়েছে। সেগুলোও তো করতে হবে। আর Central Relief Fund (কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিল) কংগ্রেস-এর। তাঁরা দেড় লাখ টাকা নিয়ে বসে আছেন। আবার এ বিপদের সময় গান্ধীজীর কথা বাজের মতো প্রাণে লাগল, বললেন কিনা—অস্পৃশ্যতার জন্য ভূমিকম্প। এটা বলা ঠিক হয়নি। কি জন্যে কি হয়—কেউ কি বলতে পারে?"

* * *

দুই-তিন দিন পর বাবা সারগাছি যাইবেন। আবার কবে কোথায় দেখা হইবে কে জানে? তাই আজ ভক্ত একা প্রণাম করিতে আসিয়াছে। বাবা বলিলেন, "আমি গেলে এবার একবার সারগাছি যাবি, কি বল্? বেশী দিন থাকার ব্যবস্থা ক'রে। এখানে ভিড় গোলমাল, সেখানে আপন জন।"

* * *

২৫শে এপ্রিল—১৯৩৬। অক্ষয় তৃতীয়া. সন্ধ্যার ট্রেনে ভক্ত একজন পরিচিত সন্ন্যাসীকে সঙ্গে লইয়া সারগাছি উপস্থিত। এই প্রাচীন সাধুটি যে কয়দিন ছিলেন, নানা সদ্‌ভাবদ্যোতক কথা অতি সরল জোরালো ভাষায় বলিতেন। বাবার কাছে আসা ও থাকা সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়াছিলেন, 'যখন তখন এক একবার কাছে যাবি, বেশীক্ষণ ছাড়া থাকিস্ না। ওঁদের স্নেহদৃষ্টিতেও কল্যাণ।' বাবাও বলিলেন, "যেন কত দিনের আপন! বহুদিন ছেড়ে ছিল —ভুলে দূরে ছিল—এতদিনে যথাস্থানে এল।"

পরদিন সকালে বাবা বলিতেছেন, "একটা usefulness (উপযোগিতা) থাকা চাই, যেখানেই যখন থাকবে একটা useful, responsible (উপযোগী, দায়িত্বপূর্ণ) কাজ নিয়ে থাকবে, তবে তোমারও শান্তি, অপরেরও শান্তি; নতুবা তোমারও মনে হবে, কি করছি, অপরেও ভাববে মিছামিছি আছে। এই নাও চাবি, টাকাকড়ির হিসাব রাখবে।

যখন যাকে যা দরকার ব'লব, দেবে। বেশ কাজ হ'ল—কি বলো? এই ঘরেই থাক। যখন ডাকব, আসবে। দূরে দূরে থেক না। আমার কাছে এসেছ, আমার কাজে থাকবে। ঠিক আটটার সময় এদিকে চলে আসবে।"

পরদিন সকালে—মিনিট পনের-কুড়ি দেরী হইয়া গিয়াছে। বাবা বকিতেছেন, "এত দেরী কেন? ওপরে? ঠাকুরঘরে? কাজ করবে—সব সময় জপভাব থাকবে।" একজন ব্রহ্মচারী বলিল—'গীতা পড়ছিল। বেশ পড়ে।' অমনি বাবা বলিলেন, "গীতা পড়ছিলে? কি গীতা পড়বে? পড়তে জানো? একদিন আমি পড়ে দেব—শিখে নিয়ে পড়বে, গীতাতেও তো ঐ এক কথাই—যা বললাম।"

পরে এক সময় বলিতেছেন, "এতদিন আসো, আর চলে যাও। এবার আসা ঘর করতে। দু-দিনেই বোঝা যাবে কে কি রকম! বনবে কি বনবে না। অনেক সময় অনেক কিছু ব'লব, দেখব—কতটা লঙ্কা-ফোড়ন সহ্য হয়, বুঝলে?"

অন্য এক সময় common sense (সাধারণ বুদ্ধি) সম্বন্ধে বলিতেছেন, "স্বামীজী পাশ্চাত্য-কে জয় করেছিলেন—নিবেদিতার মতো প্রখরবুদ্ধিমতী মেয়েকে জয় করেছিলেন—বেদান্ত দিয়ে নয়, common snene (সাধারণ বুদ্ধি) দিয়ে। নিবেদিতার প্রশ্নের পর প্রশ্ন, আর স্বামীজীর শান্তভাবে সহজ সরল উত্তর। আজকাল common sense (সাধারণ বুদ্ধি)-এর বড় অভাব। Universityতে (বিশ্ববিদ্যালয়ে) ওটি নষ্ট করা হয়, ফোটানো তো দূরের কথা। সত্যি বলছি—এ আমি দেখেছি M. A., B. A. পাশকরা ছোকরা আহাম্মকের মতো কথা বলে, আর দেখবে পাড়াগেঁয়ে লোকেরা কেমন common sense (সাধারণ বুদ্ধি) নিয়ে কথা বলে।"

সন্ধ্যায় বাহিরে ক্যাম্পখাটে বসিয়া আলগা গায়ে গলা ছাড়িয়া বাবা গান গাহিতেছেন:

"য্যাক রটত বেদ—শিব শুক নারদ।
রটত যুগ যুগ, পার নেহি পাওয়ত॥

হরিদ্বার-হৃষীকেশের সাধুদের এইসব গান। কি গভীর ভাব, আর কি গম্ভীর সুর! আমি গান গাইতে ভাল পারতাম না, তাই স্বামীজী বলেছিলেন,—তোর স্বর-উচ্চারণ ভাল। স্তোত্র পাঠ করবি। কোথাও হয়তো স্বামীজী গান গাইলেন, আমাকে বললেন সুর ক'রে একটা স্তোত্র পাঠ কর।"

ভোরে ওঠা সম্বন্ধে বাবা বলিতেছেন:

"খেতড়ির মহারাজা দেরী ক'রে উঠতেন। একদিন বললাম, 'যারা বেশী খায়, আর যারা দেরী ক'রে ওঠে, তাদের লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।' সেই থেকে তাঁর ভোরে ওঠা—আমারও আগে। উঠে দেখি মহারাজা হাসছেন, কোনদিন ছাদে বেড়াচ্ছেন, কোনদিন বা আলো জেলে পড়ছেন—প্রকাণ্ড লাইব্রেরী।

"ঠাকুর ও ঠাকুরের ছেলেদের সব ভোরে ওঠা। একদিন মঠে শরৎ মহারাজ ও আমি একঘরে শুয়েছি। মঙ্গলারতি হয়ে গেল। ঠাকুর উঠে পড়েছেন, আমি ঘুমোব? ছি ছি! তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। একটু পরেই শরৎ মহারাজ উঠেছেন, ভেবেছেন আমি ঘুমিয়ে! জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই খড়খড়ি নাড়িয়ে মজা ক'রে জানিয়ে দিই—আমি উঠেছি। পাছে ভোর ভোর উঠতে না পারি, তাই শোবার সময় ব'লে শুয়েছি—'এই অখণ্ডানন্দ, ঠিক তিনটের সময় উঠবি।' ঠিক তিনটের সময় কে যেন ডেকে তুলে দিচ্ছে—'এই অখণ্ডানন্দ,

ওঠ, তিনটে বাজে।' ঠাকুর কখন ঘুমোতেন, জানি না। স্বামীজীও তাই; রাত্রে যখন ডেকেছি—সাড়া পেয়েছি।

"উন্নত জীবনে ঘুম কম। শরীরটা শক্ত সবল চাই। ভোর ভোর উঠবে। বিছানাতেই একটু চিন্তা—তখন শান্ত মন। তারপর বিছানা তুলে ঘরদোর ঝাঁট দেবে, পরিষ্কার করবে, চৌকাঠে জল দেবে। সব কাজে একটা ভাব চাই।"

* * *

কেনাকাটার ব্যাপারে, একজনকে বাবা বলিতেছেন: "ফাউ নিবি। যে এখানে ঠকে, সে সেখানে ঠকে। যার এখানে আছে, তার সেখানে আছে। ধর্ম করবি তো ঠকবি কেন? ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন? যে ঠকে, যে ঠকায়— দু-জনেই সমান। ঠাকুরের 'ফাউ' নেবার কথা খুব মেনে চলি। শালের ফাউ নিয়েছি কম্ফর্টার। কাশ্মীরে শাল কিনেছি, বললাম—ফাউ দেবে তো নেব, নইলে নেব না। তারা বলে—এ আবার কি কথা? শালের আবার কি ফাউ দেব? আমি বললাম—কেন, কম্ফর্টার? তারা বলে—ওর দামও ৩৷৪ টাকা। তখন বলি বেশ, তবে রইল; গুরুকা হুকুম—ফাউ দিতে হবে। শেষে দিল একটা কম্ফর্টার। বহরমপুরের রাখাল ওটি শিখে নিয়েছে। সিল্কের কাপড়ের সঙ্গে রুমাল ফাউ নিয়েছে।"

বৈশাখের দুপুরবেলা—১২-১২॥ বাজিয়াছে, খুব রোদ। বাবা ভক্তকে ডাকিয়াছেন কাঁকুড়ওয়ালাকে পয়সা দিবার জন্য। সে বেচারা বাহিরে দাঁড়াইয়া দর করিতেছে—সে চাহিয়াছে সাড়ে পাঁচ আনা। বাবা বলিয়াছেন —পাঁচ আনা। দুইজনেই নাছোড়বান্দা। বাবা স্নান করিয়া ঘরে ফিরিতেছিলেন, মাথায় ভিজে গামছা, দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দর করিতেছেন।

ভক্তের একটু রাগ ও বিরক্তি হইয়াছে—কি সামান্য দুই পয়সার জন্য বাবা নিজেও কষ্ট পাইতেছেন, লোকটাকেও কষ্ট দিতেছেন! ভক্ত হাতে সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। শেষে সোয়া পাঁচ আনায় রফা হইল। লোকটি কাঁকুড় রাখিয়া পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। বাবাও মাথায় গামছা দিয়া একজনকে বলিলেন, "যা কাঁকুড়গুলো নিয়ে যা।"

পরে ভক্তকে বলিতেছেন, "তোমরা সব শহরের লোক—এসব কি বুঝবে? যা ব'লল দিয়ে দিলে। ও এখন বাড়ি ফিরছে। এগুলো কি আর বাড়ি বয়ে নিয়ে যাবে? ঠিক পাঁচ আনাতেই দিত আর একটু দরাদরি করলেই। তা দেখলুম—তুমি আর পারছ না, কেবলি পয়সা গুনছ।

"যখন পাহাড়ে বনে জঙ্গলে ঘুরেছি, তখন টাকা পয়সা ছুঁইনি, কোনও সম্পর্ক ছিল না। এখানে যখন ঠাকুর সংসার পাতিয়েছেন, তখন সব দেখতে হবে—কম খরচ, বেশী আয়, তা ছাড়া public money (সাধারণের দেওয়া টাকা)—ভক্তদের রক্ত জল করা পয়সা। তারা ঠাকুরের নামে দিচ্ছে—তোমাকে আমাকে দেখে তো দিচ্ছে না। অতএব আমাদের কর্তব্য—কি ক'রে একটা পয়সা বাঁচাতে পারি।"

স্বামী অভেদানন্দের একটি শিষ্য বহরমপুরে পূর্বাশ্রমে কি কাজে আসিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে সারগাছিতে একবার 'বাবা'কে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গ হইতেছে। বাবা বলিতেছেন, "ঠাকুরের দেহ

যখন কাশীপুরের বাগানবাটী থেকে ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়, আমি খাট ধরেছিলাম মাত্র, ছোট ছিলাম কিনা! যেতে যেতে গান হয়েছিল : যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ। হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ॥ খুব ঘি-মাখানো ছিল—দাউ দাউ ক'রে জ্বলে গেল। আগের রাতে সমাধি হয়েছিল—সমাধি ভাঙবার জন্যে কাপ্তেনের কথায় ঘি মাখানো হয়েছিল—পিঠে—আমি সারারাত ঘসেছি, কনুই দিয়ে ঘি গড়িয়ে পড়ছিল।"

শিষ্যটি প্রশ্ন করিলেন, 'ঠাকুরই কি আপনাকে গেরুয়া দেন? বই-এ প্রকাশিত বারো জনের মধ্যে আপনার নাম নেই, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

মহারাজ বলিলেন, "হ্যাঁ, তিনিই আমায় গেরুয়া দেন—স্বামীজী শুধু বিরজা হোম করেন ও নাম দেন—সে অনেক পরে। গেরুয়া দিয়ে ঠাকুর বললেন, 'তুই পারবি—পতন হবে না।' তাঁর আশীর্বাদের জোরেই এ-জীবন কেটে গেল। বই-এ যে আছে কি জানো? বুড়ো গোপালদা কাশীপুরে বারোখানা কাপড় গেরুয়া রং ক'রে নিয়ে আসেন এবং ঠাকুরকে বলেন—গঙ্গাসাগরযাত্রী সাধুদের দিতে যাচ্ছি। ঠাকুর বলেন, 'কোথায় যাবি—এইখানে ভাল ভাল সাধু আছে।' এই ব'লে যাঁরা যাঁরা সেখানে ছিলেন তাঁদের দেন। একখানা গিরিশবাবুর জন্য রেখে দেন। আমাদের অন্য একদিন দিয়েছিলেন। এসব গেরুয়া তোলা ছিল।, তখন কেউ প'রত না, বরানগর মঠে পরা হয়। তোমাদের কি জানো? যেহেতু যীশুখৃষ্টের বারো জন শিষ্য ছিল, অতএব ঠাকুরেরও তাই থাকতে হবে—কম হলেও হবে না, বেশী হলেও চলবে না।"*

মাঝে মাঝে ডাকের চিঠি পড়িয়া বাবাকে শুনাইতে হয়। প্রথম চিঠির লেখক লিখিয়াছে: মনে বৈরাগ্যের উদয় হইতেছে। কি করিবে—উপদেশ চাহিয়াছে।

বাবা শুনিয়াই বলিতেছেন, "ওর বৈরাগ্য-টৈরাগ্য বাজে কথা—ঠিক ঠিক হ'লে আবার কেউ লেখে নাকি? চুপচাপ বেরিয়ে পড়ে। জান তো ঠাকুরের সেই চাষার গল্প—যেই বৈরাগ্য হ'ল, কাঁধে গামছা নিয়ে বেরিয়ে প'ড়ল। তার স্ত্রী বলেছিল - তার দাদা একটু একটু ক'রে সংসার ত্যাগ করছে। চাষা বললে—পাগলী, যার বৈরাগ্য হয়, সে কি আর একটু একটু ক'রে সংসার ছাড়ে? সে একেবারে বেরিয়ে পড়ে এই এমনি ক'রে!

"এক চাষা রাত্রে স্বপ্ন দেখেছে—তার সাত ছেলে। ঘুম ভেঙে দেখে কোথায় কি? এদিকে সেদিনেই জাগ্রতের এক ছেলে মারা গেছে! কার জন্যে কাঁদবে?—এই এক ছেলের জন্যে, না ঐ সাত ছেলের জন্যে? স্বপ্ন সত্য, না জাগ্রৎ সত্য? স্বপ্নের সাত ছেলে যদি মিথ্যা হয়, জাগ্রতের এক ছেলেও মিথ্যা হোক—ভাবতে ভাবতে বৈরাগ্য এল, বেরিয়ে প'ড়ল।"

আর একজন লিখিয়াছে: বিয়ে করবে কিনা?

"বেটা! আমি যেন ব'লব—তুমি বিয়ে কর! 'মা বলছে, দাদা বলছে'—ওর যেন একটুও ইচ্ছে নেই। ও ঠিক বিয়ে করবে, নইলে

* এই কথোপকথনকালে আমিও উপস্থিত ছিলাম। —নিরাময়ানন্দ

আবার লেখে! আমায় লেখা কেন? আমি 'না' বললেই যেন উনি আর বিয়ে করবেন না।"

* * *

উৎসব সমাগত, বাবা সর্বদা চিন্তা করিতেছেন, ঠাকুরের উৎসবটি কিভাবে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়; বলিতেছেন –

"ভাবছিলাম, কি করি? সু-কে কিসের ভার দিই। ঠাকুর যেন গরগর ক'রে ভেতর থেকে বললেন, 'মহোৎসবের কেনাকাটা'; সত্যি বলছি, প্রথমটা মনে হয়—নিজেই ভাবছি, নিজেই বলছি—কতকটা soliloquy (স্বগত উক্তি)-র মতো। শেষটা স্পষ্ট শুনছি—ঠাকুর বলছেন।

"ঠাকুরকে বড় একটা স্বপন দেখি না। স্বামীজীকে, মহারাজকে মাঝে মাঝে দেখি। যখন খুব ভেবে পড়ি, তখন কিন্তু (ঠাকুরকে) দেখি। ভাবছিলাম মঙ্গলারতির কথা—কে করবে, কি ক'রে করবে? স্বপ্নে ঠাকুর ব'লে দিলেন—'বেশি কিছু করতে হবে না, একটি ধূপকাঠি জেলে দিলেই হবে।'

"বেশ দেখছি সেই মূর্তি—সেই দক্ষিণেশ্বরের ঘর, খাট, সব। তাঁর জিনিস তিনি জোগাড় ক'রে নেন। এই দেখনা—আজ মিষ্টি ছিল না। ভাবছিলাম—কি হবে, কি হবে? এমন তো কখনো হয় না। হঠাৎ দেখি–কোথা থেকে এসে গেল! সব ভাল ভাল মিষ্টি। এ আমি অনেকবার দেখেছি।"

* *

বেলা নয়টা। একজন কর্মী সেইমাত্র মঠে চলিয়া গেলেন—কিছুদিন হইতেই যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিবর্তে কর্মী আসিবার পরই তিনি চলিয়া গেলেন। বাবা অনেক করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের মহোৎসব পর্যন্ত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিছু করিতে হইবে না, শুধু থাকিবেন—আর আট-দশ দিন মাত্র। তিনি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে বাবা অত্যন্ত আহতচিত্তে বিছানায় শুইতে গেলেন এবং একজনকে বাতাস করিতে বলিলেন। অত্যন্ত ব্যথিতভাবে বলিতেছেন, "আমার মনে ভারি কষ্ট দিয়ে গেল—বুকটায় ভারি লেগেছে, ঠাকুরের নামে থাকতে বললাম উৎসব পর্যন্ত। তাও থাকল না। শহর ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে থাকতে কষ্ট হয়।"

* * *

একজন সেবককে বাবা বলিতেছেন—"ভাবছ কিছুই হচ্ছে না। সত্যি বলছি ওতেই আমার অনেক সেবা করা হচ্ছে—আসল সেবা। আর তোমারও অনেক কিছু হয়ে যাচ্ছে। এই কাজটি তুমি না করলে ঐ চিন্তার ভার আমার ওপর প'ড়ত। তোমার ওপর ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত—অন্ততঃ এই বিষয়ে। কেউ আমার দিকে চায় না, যে যার নিজের নিয়েই ব্যস্ত। শুধু শরীরের সেবাই কি সেবা? মনের সেবাও সেবা—বরং বেশী।"

বৈশাখ সংক্রান্তি। একটি ভক্ত সেবকের ভ্রাতার আজ 'দীক্ষা' হইয়াছে। সন্ধ্যাবেলা বাবা দুই ভাইকে দুই পাশে ডাকিয়া তাঁহার দুই হাতে বাতের ঔষধ মালিশ করিতে বলিলেন। তাহারা মহা আনন্দে এই সেবা করিতেছে। বাবা চুপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া আছেন হেলান দিয়া।

খানিকক্ষণ পরে বলিতেছেন, "এতদিন ছিলে শুধু blood brother (রক্তের সম্পর্কে ভাই), আজ থেকে হ'লে spiritual brother (আধ্যাত্মিক ভাই)। এর আর ছাড়াছাড়ি নেই। আমারও ভারি আনন্দ হচ্ছে, বেশ।"

গীতাপ্রসঙ্গে

স্বামী জীবানন্দ

গীতামাহাত্ম্যে আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অতি প্রিয় সখা অর্জুনকে বলেছেন, 'হে পার্থ! গীতা আমার হৃদয়স্বরূপ, গীতা আমার সার সর্বস্ব, গীতা আমার অত্যুগ্র ও অব্যয় জ্ঞান, গীতা আমার পরম স্থান ও পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য সম্পদ, গীতা আমার পরম গুরু, গীতার আশ্রয়েই আমি অবস্থান করি, গীতা আমার পরম গৃহ, গীতার জ্ঞান আশ্রয় ক'রে আমি ত্রিলোক পালন করি।'

"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্॥
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ॥
গীতাশ্রয়োঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং
পালয়াম্যহম্॥"

যে গীতা সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান এত প্রশংসা করেছেন, তাঁর হৃদয়স্বরূপ বলেছেন, সে গীতা যে অতি সুন্দর তা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

উপনিষৎসমূহ জ্ঞানের ভাণ্ডার, তার সার হ'ল গীতা। গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ, বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, শরণাগতি – যা কিছু সাধকের জীবনে পরম সম্বল, চলার পথে অবলম্বন তারই আধার গীতা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, জীবনের সর্ববিধ কর্মক্ষেত্রেও গীতার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য। তাই বলা হয়, 'কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ'—নানা শাস্ত্রের কি প্রয়োজন? একমাত্র গীতার দ্বারাই সমস্ত প্রয়োজন সাধিত হয়, গীতার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অধিগত করতে পারলেই জীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল সমস্যার সমাধান হয়।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ। গীতার সার্বভৌম উদার ভাবে সমগ্র জগৎ আকৃষ্ট। বিভিন্ন ভাষায় গীতা অনূদিত। গীতায় সঙ্কীর্ণতার লেশ নেই, সমন্বয়ের ভাব ওতপ্রোত। অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিকটও গীতার অত্যন্ত সমাদর। গীতার আরও অপূর্বত্ব হ'ল, গীতাকে যে দিক দিয়ে দেখা যাবে পরমকল্যাণময়ী জননীস্বরূপা গীতা সেই দিক দিয়েই সন্তানের দৃষ্টি খুলে দেন; তাই দেখা যায়, জ্ঞান কর্ম ভক্তি প্রভৃতি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গীতার বহু ব্যাখ্যা টীকা সুপ্রচলিত।

গীতা প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম বলে আচার্যগণ নিজেদের মত সুদৃঢ় করবার জন্য অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও বিভিন্ন দ্বৈত মতবাদ অনুযায়ী গীতার ভাষ্য করেছেন। গীতা হচ্ছে স্মৃতি-প্রস্থান। গীতা মহাভারতের অন্তর্ভূত। মহাভারত স্মৃতিশাস্ত্র তাই গীতাও স্মৃতিশাস্ত্র। আমাদের নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দিয়ে তাতে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি এনে দেয় তাই প্রস্থান--জীবনের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপা গীতা আমাদের স্বরূপের উদ্বোধন করে, সর্বদুঃখের নিবৃত্তি ঘটায় ও পরমানন্দ প্রদান করে।

যাঁদের জ্ঞানের ভাব, যাঁরা বিচারপ্রবণ, তাঁদের চরম জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য জ্ঞানযোগ; কর্মী যাঁরা, যাঁরা কর্মপ্রবণ তাঁদের জন্য কর্মযোগ, নিষ্কাম কর্মের উপদেশ; যাঁদের ভক্তিভাব, তাঁদের ভক্তিতে আপ্লুত করবার

জন্য ভক্তিযোগ গীতাতে অনবদ্যভাবে পরিবেশিত।

যখন মানুষের চিত্ত শোকে আকুল হয়, মোহে আবিষ্ট হয়ে পড়ে, মানুষকে ক্লীবতা কাপুরুষতা আশ্রয় করে, তখন গীতার অপূর্ব আত্মতত্ত্ব তাকে উদ্বুদ্ধ করে, তার শোক-মোহের অবসান ঘটায়। যখন জ্ঞানের পথ ভাল, কি কর্মের পথ ভাল ব'লে মনে সংশয় জাগে, তখন গীতায় প্রকৃত আলোর সন্ধান মেলে। কর্ম করা আর কর্মত্যাগের প্রকৃত রহস্য কি তা গীতায় পরিস্ফুট। আধ্যাত্মিক ভাব সুদৃঢ় করবার জন্য ধ্যানের প্রণালীও গীতায় সুবিন্যস্ত; ঈশ্বরের আবির্ভাবতত্ত্ব ও তাঁর মহিমা উদ্‌ঘাটিত, তাঁর বিভূতি ও বিশ্বরূপ এমন ভাবে প্রকাশিত যা অন্যত্র দেখা যায় না। ঈশ্বরের বিভূতির অনুধ্যানে সাধকের সর্বভূতে ভগবদ্‌দৃষ্টি প্রসারিত হয়। শ্রীভগবানই সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় করছেন, বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, একথা অতি সুন্দরভাবে গীতায় বিবৃত। আসুরিক বৃত্তিসমূহ ত্যাগ ক'রে দৈবীসম্পৎ সহায়ে ঠিক ঠিক সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা লাভ করতে পারলে তত্ত্বজ্ঞান হয়, একথা গীতায় বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে।

গীতার ১৮টি অধ্যায়ের প্রত্যেকটি 'যোগ' নামে অভিহিত। 'যোগ' শব্দের অর্থ—যে-উপায়ের দ্বারা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। প্রথম অধ্যায়ের নাম 'বিষাদযোগ'। বিষাদ আবার যোগ হয় কেমন ক'রে? মানুষের মন যখন বিষাদে ভ'রে যায়, তখনই তো সে জগতের অনিত্যতা বোধ করতে চায়। ভাবে পরিচালিত হ'লে মন তখন ভগব হয়। তাই 'বিষাদ'কে যোগ বলা হয়েছে। গীতারূপ অমৃতপ্রাপ্তির মূলে অর্জুনের বিষাদ। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও দেখা যায়, নৃপতি সুরথ ও বৈশ্য সমাধির বিষাদই আদ্যাশক্তি জগজ্জননীর কৃপালাভের মূলে।

দেহেরই মৃত্যু। মৃত্যু আত্মার নয়। জীবের পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশে যাওয়াই মৃত্যু। শীর্ণ হয়ে যায় বলে 'শরীর' নাম। আবার ত্রিতাপ দ্বারা দগ্ধ হয় ব'লে 'দেহ'। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন,

'দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং
যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥'

—যেমন দেহীর এই দেহে কৌমার যৌবন জরা ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয়, দেহীর কোনও পরিবর্তন হয় না, দেহান্তরপ্রাপ্তিতেও তেমনি দেহী অর্থাৎ আত্মা অবিকৃত থাকেন। মৃত্যু দৈহিক বিকারমাত্র। এজন্য দেহান্তরপ্রাপ্তি-বিষয়ে জ্ঞানীরা মোহগ্রস্ত হন না।

জীবের যখন মৃত্যু অর্থাৎ স্থূল শরীর ত্যাগ হয় তখন আত্মা (জীবাত্মা) স্থূল দেহ যা পঞ্চমহাভূতে (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) গঠিত, তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করেন। বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি—এই সপ্তদশ অবয়ব সূক্ষ্ম শরীরের। সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থানের সময় গমনাগমন, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি কার্য ব্যাহত হয় না। জীব যখন শরীর ত্যাগ করেন তখন বায়ু যেমন পুষ্পাদি থেকে গন্ধ গ্রহণ ক'রে ধাবিত হয়, সেইরূপ পূর্বদেহ থেকে তিনি ইন্দ্রিয়সমূহ গ্রহণ ক'রে থাকেন এবং চক্ষু কর্ণ নাসিকা রসনা ত্বক্ ও মনের সাহায্যে বিষয় ভোগ করেন। সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থানকালে প্রারব্ধ কর্মের মানসিক ফলভোগ ক'রে আবার স্থূলদেহ ধারণ করেন। এই স্থূলদেহগ্রহণই নবজন্মলাভ। পাঞ্চ-ভৌতিক জড় পদার্থের দেহ পঞ্চভূতে মিলতে বাধ্য। তাই দেহেরই মৃত্যু, আত্মার নয়।

আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করলে মানুষ জীবন্মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হয়। গীতায় জীবন্মুক্ত পুরুষকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়েছে।

গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষাংশের ১৮টি শ্লোকে (৫৫-৭২) স্থিতপ্রজ্ঞের প্রসঙ্গই বিবৃত। যখন যোগী মনোগত সকল কামনাবাসনা পরিত্যাগ করতে সমর্থ হন, আপনার দ্বারা আপনাতেই তুষ্ট থাকেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হন। তখন তিনি বাহ্যবস্তুলাভে নিরপেক্ষ ও পরমাত্মার দর্শনে পরিতৃপ্ত, আপ্তকাম, আত্মারাম। শ্রীভগবান বলেছেন :

'দুঃখেম্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী
মুর্নিরুচ্যতে ॥' ২।৫৬

দুঃখে অবিচলিতহৃদয়, অক্ষুব্ধ, সুখে স্পৃহাহীন, অনাসক্ত, নির্ভীক, অক্রোধ মুনি স্থিতধী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ব'লে অভিহিত।

জ্ঞানের সাধনপ্রসঙ্গে গীতায় বলা হয়েছে—আত্মশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভহীনতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, শুচিতা, চিত্তস্থৈর্য, আত্মসংযম, জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধিতে দুঃখদর্শন, অনাসক্তি, আত্মীয়বর্গে মমত্ব-পরিহার, চিত্তের সাম্যভাব, ঈশ্বরে ঐকান্তিক অনুরাগ, নির্জনে বাস প্রভৃতি জ্ঞানলাভের পথে অত্যন্ত অনুকূল। প্রণিপাত, সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসা ও সেবা দ্বারা প্রসন্ন হয়ে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ হৃদয়ে জ্ঞানের দীপ জ্বেলে দেন। জ্ঞানলাভ হ'লে অবিদ্যার নাশ হয়, অজ্ঞানের অন্ধকার চিরতরে বিলুপ্ত হয়। জ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছুই নেই। 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।' প্রজ্বলিত পাবক যেমন কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, তেমনি উদ্দীপিত জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মই ভস্মসাৎ করে।

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত কর্ম ভগবদ্‌বুদ্ধিতে করতে নির্দেশ দিয়েছেন। Work and worship—কর্ম এবং উপাসনা, ঈশ্বরের উপাসনা করছি বলে যে-কোন কর্ম করা যায়, আর ঠিক ঠিক করতে পারলে কর্ম উপাসনায় পরিণত হয়, তখন work is worship—একথা স্বামীজী বলেছেন। গীতাতেও এবিষয়ে প্রসিদ্ধ শ্লোক রয়েছে :

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব
মদর্পণম্ ॥' ৯।২৭

এখানে যা বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য হ'ল, যে কর্ম করা হবে, আহারস্বরূপ যে খাদ্য গ্রহণ করা যাবে যা হোম, দান এবং তপস্যা করা হবে, সবই শ্রীভগবানকে নিবেদন করতে হবে।

যাঁরা ভগবানের প্রিয় হন তাঁরা সর্বদা তাঁর চিন্তাতেই নিরত থাকেন, এ সম্বন্ধে যে কয়টি সুন্দর শ্লোক আছে, তার মধ্যে একটি :

'যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো
লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে
প্রিয়ঃ ॥' ১২।১৫

অর্থাৎ যিনি কাকেও উদ্বিগ্ন করেন না, যিনি কারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ বিষাদ ভয় ও চাঞ্চল্য থেকে মুক্ত, তিনি ভগবানের প্রিয়। ভগবানের সেই প্রিয় ভক্ত কখনো কারও উদ্বেগের কারণ হন না, নিজেকেও তিনি সর্বদা উদ্বেগহীন বিষাদশূন্য ভয়রহিত অবস্থায় রাখতে সমর্থ।

কর্ম না ক'রে ক্ষণকালও থাকা যায় না; তাই ভক্ত ভগবদ্‌বুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করেন; আর যিনি জ্ঞানী তিনি কেমনভাবে কর্ম করেন, সে কথাও গীতায় আছে :

পরমার্থদর্শী জ্ঞানী দেখা, শোনা, চলা,

শোওয়া, নিশ্বাস নেওয়া, কথা বলা, ত্যাগ বা গ্রহণ করা ইত্যাদি কর্ম ক'রেও মনে করেন, কিছুই করছি না, এ সমস্তই ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আত্মা অকর্তা—তিনি কিছুই করেন না, এই উপলব্ধিতে তত্ত্বদর্শী সদা ভরপুর থেকে ত্রিগুণাতীত অবস্থায় অবস্থান করেন।

এই অনিত্য সংসারে মানুষের সর্বপ্রধান কর্তব্য হ'ল ঈশ্বরের আরাধনা। শ্রীভগবানের প্রসিদ্ধ উক্তি: 'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।' ঈশ্বর সকলের হৃদয়েই অবস্থান করছেন, সকল প্রাণীকে মায়া দ্বারা যন্ত্রবৎ পরিচালিত করছেন। তাঁর শরণাগত হলেই এই দুস্তর মায়াসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

স্বামীজীর মতে বুদ্ধদেব ধ্যানের দ্বারা ও যীশুখৃষ্ট প্রার্থনার দ্বারা যে দিব্য ভাব ও আধ্যাত্মিকতা লাভ করেছিলেন, অনাসক্ত কর্মীও নিষ্কাম কর্মের দ্বারা সেইরূপ উচ্চ অবস্থা-লাভে সমর্থ। এই ভাবটি গীতায় সুপরিস্ফুট:

'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি
পূরুষঃ॥ ৩।১৯

স্বামীজীর মতে—পার্থসারথির পূজায়, পাঞ্চজন্য-নিনাদকারী গীতাপ্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় ঘুচে যাবে জাতির ক্লৈব্য ও নির্বীর্যতা, আসবে সিংহসাহসিকতা ও ভগবন্নির্ভরতা

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলাপার্ষদ স্বামী তুরীয়ানন্দজী গীতার প্রত্যেকটি শ্লোকের উপর ধ্যান করতেন এবং অনেককেও সেই নির্দেশ দিতেন। গীতার অনুধ্যান সব মলিনতা গঙ্গাজলের মতো ধুয়ে দেয়। নিত্য নব নব আলোকবর্ষী গীতা। গীতার স্বাধ্যায় নিত্যই প্রয়োজন।

কতদিন পূর্বে কী কর্মকোলাহলের মধ্যে মহাসমরের পরিবেশে গীতা পরিবেশিত হয়েছিল! গীতার কালনির্ণয় বিতর্কের বিষয় এবং অতি কঠিন। প্রখ্যাত পণ্ডিতের মতে খৃষ্ট-পূর্ব তিন হাজার বছরেরও আগে অগ্রহায়ণ শুক্লা একাদশী তিথিতে গীতা উপদিষ্ট হয়। অনন্ত কর্মশীলতার মধ্যে যিনি অনন্ত নীরবতা অনুভব করতে পারেন, তিনিই মহাযোগী। সমুদ্রের উপরে উত্তাল তরঙ্গ, ভিতরে কিন্তু পূর্ণ শান্তি বিরাজমান। গীতার আদর্শ হ'ল তাই। সংসারের কর্মমুখর জীবনে কিংবা নির্জন তপোবনে গীতার আদর্শ সমভাবে অনুসরণীয়। তাই কি গৃহী, কি যোগা, সকলেরই জীবনে গীতার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। গীতায় কর্ম-জ্ঞান-যোগ-ও ভক্তিপথে সাধনের যেমনভাবে স্বতন্ত্র ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তেমনি আবার একটির সঙ্গে অপরটির বা অন্যগুলির সামঞ্জস্য ক'রেও সাধনরহস্যের কথা আছে। কোন কোন স্থলে দেখা যায় কর্মের কথায় কর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, জ্ঞানের প্রসঙ্গে জ্ঞানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব আরোপিত হয়েছে, যোগের প্রশ্নে যোগকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে; কিন্তু মূল বিষয়টি সর্বত্রই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে: জীবনের উদ্দেশ্য যে পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা, চরম উপলব্ধি—সে কথা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব গীতামূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনে টাকা মাটি, মাটি টাকা, এই ভাবের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি মানুষকে এই কথাই জানিয়ে দেয় যে, গীতোক্ত মহাযোগী সত্যই সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন। অনেকেই গীতা সম্বন্ধে অনেক সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন, এখনও ক'রে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছোট্ট একটি কথায়, একটি সংক্ষিপ্ত উক্তিতে সমগ্র গীতার ভাবটি পূর্ণভাবে প্রতিফলিত। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব বলেছেন: "দশবার 'গীতা গীতা'

বললে যা হয় তা-ই গীতার সার—অর্থাৎ 'ত্যাগী'। হে জীব, সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের আরাধনা কর।" প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীও তাই: 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'

উপসংহারে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সঞ্জয়ের উক্তি সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য। মহামতি সঞ্জয় বলেছেন:

'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি র্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥ ১৮।৭৮

—'যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং ধনুর্ধর পার্থ সেখানে শ্রী বিজয় অভ্যুদয় ও ন্যায় বিদ্যমান—এই আমার মত।' অর্থাৎ যেখানে দৈব এবং পুরুষকারের মিলন, যথার্থ ভগবদ্‌বিশ্বাসের সঙ্গে প্রচণ্ড কর্মশীলতা দেখা যাবে, সেখানে সর্ববিষয়ে উন্নতি, জয়, অভ্যুদয় ও ন্যায়-পরায়ণতা বিদ্যমান থাকবেই।

শরণাগতি

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

কতগুলো কুকুর দেখনি?
এই থাকে এইখানে, কি ভাবিয়া আবার এখনি
অন্য দিকে চলে যায়; নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে খায়।
খেতে নাহি দেয় কিছু, ভালবাসে নাকো কেহ সেগুলোকে হায়

আর আমাদের ভুলো?
বকিলেও কানে দেয় তুলো,
মারিলেও সয়ে নেয়, কিছু দিলে তবে খায়,
পড়ে থাকে দোর গোড়ে। তাই মমতায়
বাবা দুটো ভাত দেন, গায়ে পিঠে বুলাইয়া হাত
আদর করেন তারে।

এই দেখে, সারা দিনরাত
প্রভু-দ্বারে পড়ে থাকি পেতে তাঁর করুণা-প্রসাদ
কবীরের মনে বড় জেগেছিল সাধ!
অনন্যশরণ এই নিষ্ঠা ও শরণাগতি অতি অনুপম—
জ্ঞান, যোগ যেথা নেয়, এও সেথা নিয়ে যায়—
ভগবৎ-স্বরূপেতে চরম পরম।

মহাযাত্রায় প্রভু যীশু

শ্রীমতী ইন্দ্রাণী দেবী

প্রভু যীশু কি তাঁর মর্মান্তিক মহাযাত্রার মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে গেছেন অথবা তাঁর যাত্রা শেষ হয়ে গেছে? কিন্তু না, মানুষের ইতিহাস সে কথা বলে না। মহামানবের মহাযাত্রা কখনও শেষ হয় না, তিনি ফুরিয়ে যান না।

চরম দুঃখ ও বেদনার মধ্যেই পরম আনন্দের সহস্রদল পদ্মটি প্রস্ফুটিত হয়; সে পদ্মদল ফোটে অন্তর্লোকে, তার সৌন্দর্য নির্মল, সুরভি অক্ষয়। মধ্যযুগে পৃথিবীর ইতিহাসে যীশুর সময়ে, যীশুকে নিয়েও যে নারকীয় মর্মন্তুদ ঘটনাগুলো ঘটে গেছে তার তুলনা কোথায়! প্যালেস্টাইনের নাজারথ—ইহুদী-অধ্যুষিত দেশ। বিভিন্ন সময়ে এই প্যালেস্টাইন গ্রীক, পারসিক, রোমান প্রভৃতি বিদেশী শক্তিগুলিদ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিধ্বস্ত অগ্নিদগ্ধ হয়েছে বারবার। যীশুর সময়ে তা ছিল রোমানদের অধীন। এক প্রচণ্ড শীতের রাত্রিতে এক শোকাকুল পরিবেশের মধ্যে বেথেলহামে একটা আস্তাবলের মধ্যে তাঁর জন্ম। মাতা মেরী, পিতা যোজেফ। যীশুর আবির্ভাব হতে তিরোভাব পর্যন্ত দেখা যায়,—সত্যের পথ, আলোকের পথ, ঈশ্বরকে প্রেমের কথা দিয়ে লাভ করার পথ,—এসবের জন্য সংগ্রাম করে করে জুটেছিল তাঁর ভাগ্যে—দুঃখ, বেদনা, বিদ্রূপ, প্রতারণা, প্রত্যাখ্যান। তবু যীশু আজও যীশুই রয়ে গেছেন; যীশু অমর। মহামানব ফুরিয়ে যান না। যীশুকে কেবলমাত্র একজন ঐশ্বরিক-শক্তিবিশিষ্ট ধর্মগুরু বললেই শেষ হয় না তাঁর পরিচয়। সরল অশিক্ষিত ইহুদীরা সে সময় নানারূপ অন্ধ কুসংস্কারে ছিল আচ্ছন্ন। মহাযাজক-ও পুরোহিতশ্রেণীর লোকেরাই ছিলেন দেশের সর্বেসর্বা। তাঁদের ধনবল তো ছিলই—অস্ত্রবলও ছিল প্রবল। এরূপ পরিবেশের মধ্যে যীশুর আবির্ভাব যেন একটি মূর্তিমান বিদ্রোহ। রাজা বা রাজ্যের বিরুদ্ধে ছিল না এ বিদ্রোহ, কুসংস্কারজনিত মানুষের অন্ধকার হৃদয়কে আলোকের পথ, সত্যের পথ দেখিয়ে উদ্ভাসিত করাই ছিল তাঁর ব্রত বা বিদ্রোহ। তাঁর অন্তরের স্বর্গীয় সত্তার মধ্য দিয়েই তিনি উপলব্ধি করলেন—হিংসা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে আসে না চিরস্থায়ী শান্তি। রাজা রাজত্ব তো ক্ষণস্থায়ী! মনুষ্যহৃদয়ের স্বর্গীয় বস্তুই আনতে পারে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ। দরিদ্র, নিপীড়িত, অবহেলিতদের মধ্যে এই অনাস্বাদিত বস্তুই গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে, পানশালায় প্রচার করতে গিয়ে তিনি হয়ে দাঁড়ালেন শুধু একজন ধর্মদ্রোহীই নয়, শেষ পর্যন্ত একজন রাষ্ট্রদ্রোহীও বটে;—যার ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল চরম রাজদণ্ড।

নাজারথ যীশুর শৈশবের লীলাভূমি। দ্রাক্ষাকুঞ্জশোভিত পার্বত্য দেশ, প্রখর নীল আকাশ যেন অনন্ত দিগন্তে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। পাড়াপ্রতিবেশীরা সরল, অতি সহজ জীবনযাত্রা তাদের; ঐশ্বর্যের কথা, তার আস্বাদের কথা তাদের তেমন জানা নেই। শুধু পরাধীনতাই নয়, লাঞ্ছিত নিপীড়িত জীবন-যাত্রার মধ্যে তারা এমন একটা কিছু

চাইছিল যার ভাষা ছিল না, ব্যাকুলতা ছিল। এই ব্যাকুল হৃদয়ের আর্তির মধ্যেই ঈশ্বরের করুণা মূর্ত হয়ে ওঠে। বিস্ময়ে চমৎকৃত হয়ে আমরা দেখতে পাই অবতার

এতদিনকার আশ্বাসবাণী সম্মুখে মূর্ত ; সবাইকে ডেকে বললেন, এই তোমাদের ত্রাণকর্তা যীশু। পরমেশ্বর পিতার বাণীপ্রচারে ইনি যে একজন পরম সহায়ক, প্রথম দর্শনেই যীশু

লীলাপ্রসারের জন্য চলতে থাকে ক্ষেত্রের প্রস্তুতি। লীলাপার্ষদ বা শিষ্যসেবক তিনি না আসা পর্যন্ত প্রচ্ছন্নই থাকেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণী—"ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" শুধু ভারতের জন্য নয়, সমস্ত পৃথিবীর জন্যই ; তিনিই জগৎপতি। যীশুর জন্মলগ্নে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা পূর্ব গগনে জ্যোতির্ময় তারকার ইঙ্গিতে বুঝেছিলেন "রাজার রাজা" হয়ে একজন কেউ আসছেন। যীশু জনসমাজে প্রকাশিত হবার পূর্বেই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছিলেন জন্ ব্যাপটিস্ট (John the Baptist)। জর্ডন নদীর তীরে ধীবরপল্লীতে সৎ কথা, সৎ আচরণ গ্রামীণ লোকদের মধ্যে প্রচার করে, ওই নদীর জলকে অত্যন্ত পবিত্র জ্ঞান করে জন তাদের অবগাহন করিয়ে শুচি শুদ্ধ করে তুলছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে আশার বাণী শোনাতেন: তোমরা দেহমনে প্রস্তুত হতে থাকো, পরিত্রাতা একজন আসছেন আমাদের ত্রাণ করতে। তোমরা পবিত্রভাবে প্রার্থনা করো। যীশু তখন গ্যালিলীতে। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর সরল সত্য ভাষণ: প্রেমের মধ্য দিয়ে আপামর সবাইকে কাছে টেনে নিতে পারলেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায়। এসব অশ্রুতপূর্ব বাণী শুনে কী এক আকর্ষণী শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে অনুরাগিগোষ্ঠী গড়ে উঠতে লাগলো এখানে সেখানে! জন্ এবং যীশু উভয়েই লোকপরম্পরায় পরিচিত ছিলেন, তারপর এক শুভমুহূর্তে দু'জনের মিলন ঘটলো জর্ডনের তীরে সেই ধীবরপল্লীতে। জনের

ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী যীশুর অলৌকিক ক্ষমতার প্রভাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল, জেরুজালেমের মুকুটহীন রাজগোষ্ঠী বা যাজক-গোষ্ঠীর কাছেও তা আর অজ্ঞাত রইলো না। তিনি অবশেষে ধর্মধাম বা মন্দিরপ্রাঙ্গণ হতে জনগণের মধ্যে প্রচার করতে লাগলেন ঈশ্বরের প্রেমধর্মের বাণী। ধর্মধাম বা মন্দিরগুলো সে সময় ইহুদীদের পর্ব-বিশেষে পশুমেধ, পক্ষিমেধ যজ্ঞে পরিণত হতো। বলিদানের রক্তে ভেসে যেত চতুর্দিক। ব্যবসায়ীরা কাতার দিয়ে বসে বলির পশু পক্ষী বিক্রী করে হতো প্রচুর লাভবান। দেখা যায় এই দৃশ্যে যীশু একসময় এমনই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন যে, চাবুকহস্তে ব্যবসায়ীদের তাড়া করেন, আর তাঁর অনুগামী জনেরা সব তছনছ করে দিয়ে তখনকার মতো সবাইকে হটিয়ে দিয়েছিলেন। পুরোহিতরা দেখলেন যীশুর পক্ষে প্রবল জনতা, তাই ইতস্ততঃ করে নীরব রইলেন, চরম একটা কিছু করবার আশায়। যীশু তখন পল্লীতে পান্থশালায় একজন গ্রাম্য কথকই নন, তিনি প্রকাশ্যে জনসমাজে তাঁর বাণীপ্রচারের ব্রতে সরল-হৃদয় এক নির্ভীক ধর্মগুরু। ধর্মধাম হতে তিনি বলে চলেছেন—রক্তপাত আর হিংসা ঈশ্বর-বিরোধী কর্ম। ভণ্ড যাজকেরা ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে তোমাদের তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক অন্ধকার গহ্বরে। আমিই ঈশ্বরের বাণী বহন করে এনেছি তোমাদের কাছে। আমার যা কিছু অলৌকিক কাজ—যেমন মৃত ব্যক্তিকে

জীবন্ত করে তোলা, জন্মান্ধের দৃষ্টিদান, রোগগ্রস্ত পঙ্গু বা কুষ্ঠরোগীর নিরাময়—এসব কেবলমাত্র তোমাদের বিশ্বাসের জন্য। আমি নিজে কিছুই করছি না, কিছু বলছি না; আমার পিতা পরমেশ্বর যেমন করাচ্ছেন করছি, যেমন বলাচ্ছেন বলছি। পিতাই আমি, আবার আমিই পিতা, কোন প্রভেদ নেই। তোমরা বংশপরম্পরায় বন্যজাত মধুরস পান করে কত দিন জীবিত থাকতে পার? মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু হে আমার ভক্ত, হে আমার আত্মার আত্মীয়, তোমরা ঈশ্বরপ্রেমে সিক্ত হলে অমৃতরস পান করে অমরত্ব লাভ করবে। সেই অমৃতলোকের বাণী নিয়ে আমি এসেছি, আমার কাছে এসে যাচ্ঞা করো, বিশ্বাস করো, জীবনের সকল তৃষ্ণা মিটে যাবে।

এ যে দেখছি মহা বিভ্রান্তিকর বাক্য বলছে লোকটা! সেই যোশেফ ছুতোরের ছেলেটা ধর্মযাজকদের অগ্রাহ্য করে নিজেকে বলে কিনা ঈশ্বরপুত্র! কিছু ভেল্কি দেখিয়ে বলে কিনা আমি ঈশ্বর! নানাদিকে নানা মত—জনগণের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন। ধর্ম-যাজকদের প্রবল প্রতিষ্ঠা-ক্ষমতায় যেন বিদ্যুতের চাবুক পড়লো। এই ধর্মদ্রোহীর শাস্তি না হ'লে আমরা, এই ধর্মযাজকেরা হবো যে অপরাধী! পাল্টা তাঁরাও প্রচার-কার্য চালালেন। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, সপক্ষে বিপক্ষে—নানারকম দল গড়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু রাজশক্তি—বিচারক্ষমতা যাদের প্রভাবে চালিত, সেই যাজকগোষ্ঠীই হয়ে দাঁড়ালেন যীশুর প্রবল শত্রু। যীশু-পক্ষীয়দের শক্তি ক্ষমতা সেখানে নিতান্তই নগন্য, শুধু আত্মশক্তিতে ঈশ্বরে বিশ্বাস. এ নিয়ে চলছিল যীশুশিষ্যদের অভিযান। যীশুর বহু শিষ্যসেবকের মধ্যে বারোজন শিষ্য ছিলেন সে সময় বিশেষ খ্যাত। তার মধ্যে কুখ্যাত হিসেবে যার নাম বিখ্যাত হয়ে রয়েছে, তিনি কেরিয়থ শহরের (Kerioth) সাইমনের পুত্র ঈস্‌কেরিয়থ জুডাস। যীশুর বিশ্বাসী এবং ভক্তিমান শিষ্যদের মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রম। প্রভু যীশু ঠিক কি চান, কী তাঁর আসল রূপ বুঝতে না পেরে জুডাস একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দোলায় দুলতেন। অর্থলালসা ছিল তাঁর; তার ফলে পুরোহিতদের চর জুডাসকে হস্তগত করে যীশুর গোপন বিশ্রামস্থল কোথায়, কখন তাঁকে বন্দী করতে সুবিধা সব জেনে নিতে পেরেছিল। যীশু তাঁর ভবিতব্য কি তা জানতেন। পরম বিস্ময়ের কথা হলেও একথা সত্য যে, ঐশ্বরিক শক্তি বা মহিমা নিয়ে আবির্ভূত হন যেসব মহামানব, ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পান তারা, প্রয়োজনমত তার বর্ণনা দেন লোকসমাজে। লোকে ভাবে কী অদ্ভুত কথা বলছে লোকটা। কিন্তু যখন সেই ছবির বর্ণনা সত্যরূপে প্রতিফলিত হতে থাকে তখন ভক্ত শিষ্যদের বিশ্বাস ও নির্ভরতা হয় দৃঢ়তর, অবিশ্বাসীরাও ক্রমে হার মানতে থাকে। যীশু অনেকবার তাঁর শিষ্যদের বলেছেন—মহালগ্ন যখন আসবে আমার জীবনে, তোমরা হবে পলাতক, বহু লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে, কত মর্মান্তিক বেদনা ভোগ করতে হবে, আর তারই মধ্যে পাবে আমাকে, আমার পিতাকে। তোমাদের ও আমার মধ্যে কোন ভেদ-বোধ আর থাকবে না। ভোজসভায় বসে বলেছেন—এই রুটি আমার মাংস, এই দ্রাক্ষা-রস আমার রক্ত। সব কিছুর মধ্যে আমি, আমাতে একাত্ম হয়ে যাও। আমি শীঘ্রই যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে যেতে পার

না, পরে যাবে। সরল শিষ্যরা একবাক্যে প্রতিবাদ করে বলে উঠেছেন, তোমার সঙ্গছাড়া আমরা হবো না, প্রাণ দিতে পারি। এই প্রাণ দেওয়ার কথায় এক সময় পীটারকে তিনি বলেছিলেন—প্রাণ দিতে পার না। এমন একটি রাত্রি আসছে যে, নিজের জীবনের ভয়ে আমাকে চেন বলেই তুমি স্বীকার করবে না। একবার নয়, তিনবার একথা উচ্চারণ না করা পর্যন্ত প্রভাতকালীন মোরগের ডাক কখনই শোনা যাবে না। যীশুর বন্দী হবার রাত্রিতে এ ঘটনা ঘটেছিল, এবং পীটার অনুতাপের বেদনায় দগ্ধ হয়ে অঝোরে ক্রন্দন করেছিলেন। প্যালেস্টাইনের নানাস্থানে পরিক্রমা করে করে যীশু সত্যধর্মের বাণী প্রচার করে চলেছেন, "ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ হও, একমাত্র প্রভুরই দাসত্ব কর, যারা তাড়না করে তাদের আশীর্বাদ করো, আশীর্বাদ করো—অভিশাপ দিও না। যারা আনন্দ করে তাদের সঙ্গে আনন্দ করো, ক্রন্দনশীলদের সঙ্গে ক্রন্দন করো, তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তাকে ভোজন করাও।" চিত্ত-উন্মেষকারী এমনি কত কথা — শুধু কথাই নয়, নিজে আচরণ করে জনগণের মধ্যে হয়ে দাঁড়ালেন একজন রাব্বি (গুরু)। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলে তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে সর্বক্ষণ। এবার বহুদিন পর জেরুজালেমে যাত্রা করবার জন্য তাঁকে প্রস্তুত হতে হলো। জেরুজালেমে তখন এক বিশেষ আনন্দপর্ব বা বসন্ত-উৎসব (Passover) আসন্ন। নানা দেশ বিদেশ হতে তীর্থযাত্রীরা গিয়ে জমায়েত হচ্ছে সেখানে। যীশুর আমন্ত্রণ এলো সেখানকার অনুরাগী ভক্তদের কাছ হতে। অন্তরঙ্গ জনদের অনেকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাত্রা শুরু করলেন বহু যাত্রীর মধ্যেই একজন হয়ে। উত্তর জেরুজালেমের প্রস্তরময় পথ ধরে শিষ্য ও অনুগামীদের সঙ্গে এক সময় বেথানীতে (Bethany) এসে পৌঁছলেন, প্রিয়শিষ্যগৃহ—মার্থা ও মেরীর বাড়ি। বাড়ির কর্তা সাইমন লেপার (Simon the leper) যীশুর বিশিষ্ট ভক্ত, নিজ জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ। বাড়িতে প্রবেশ করতেই নূতন রাব্বি'ক (গুরুকে) দর্শন করবার জন্য লোকের ভীড় জমে গেল। বিশেষত: মার্থা মেরীর ভাই লাজারাস (Lazarus), যাকে চারদিন পর্যন্ত মৃতাবস্থায় কবরস্থ থাকার পর যীশু প্রাণদান করে ফিরিয়ে এনেছিলেন, সেই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিল। প্রভুর সম্মানে সেই গৃহে একটি মনোহর ভোজের আয়োজন করা হলো। মেরী প্রায় আধসের বহুমূল্যবান আতর দিয়ে যীশুর চরণ ধুইয়ে দিয়ে বন্দনা করলেন। তারপর ভক্তিতে লুটিয়ে পড়ে নিজের দীর্ঘ কেশজালে যুগল চরণ মুছিয়ে দিলেন। আতরের সুগন্ধ ঘর যখন সুরভিত করছে, জুডাস সহসা বলে উঠলো, এই আতর তিনশত সিকিতে বিক্রী করে সেই টাকাটা গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেই তো হতো। অনেকেই বিস্মিত, ব্যথিত। যীশুই উত্তর দিলেন, "Ye have the poor always with you, but me ye have not always."— দরিদ্রেরা তোমাদের কাছে সর্বদাই আছে কিন্তু আমাকে সর্বদা পাচ্ছ না। জুডাসের স্বভাব অনুযায়ী কথাই উচ্চারিত হয়েছিল, গরীবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে নয় বিক্রীর টাকাটা যদি তাঁর থলেতে আসতো একান্তই তাঁর নিজস্ব হয়ে,—এই তার মনের ইচ্ছা ছিল। পরদিন রবিবার, (ইস্রায়েলী হিসাবে Sunday, 9th of Nisan) যীশু খাস জেরুজালেম নগরীর উপকণ্ঠে গিয়ে পৌঁছলেন। অলিভ পর্বতের উপর থেকে

দেখলেন প্রিয় জেরুজালেমকে, তাঁর শেষ শয্যার নির্মম ছবিখানিকে। কথিত আছে, সেই নগরীর পানে চেয়ে চেয়ে তিনি রোদন করেছিলেন। চতুর্দিকে বার্তা রটে গেল—যীশু আসছেন, যীশু আসছেন। উৎসব উপলক্ষ্যে আগত অনুরাগী গ্যালেলীয়ানরা ও অন্যত্র হতে আগত যাত্রারা, জেরুজালেমবাসী সবাই মিলে প্রভুকে জানাতে গেল সম্মান—সম্ভাষণ। তাদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী একটি গর্দভকে বহুমূল্যবান পরিচ্ছদে সজ্জিত করে তার উপর বসিয়ে দিল প্রভু যীশুকে। পথের উপর বিছিয়ে দিল নিজেদের পরিচ্ছদ। কাতারে কাতারে লোক অনুগামী হলো খর্জুরপত্র হস্তে, জয়োল্লাসে ধ্বনি দিতে লাগলো—"হোশান্না, প্রভুর নামে যিনি এসেছেন তিনি ধন্য, ইনি ইস্রায়েলের রাজা।" লোকারণ্যের মধ্যে প্রভুর এই রাজসম্মান দেখে শিষ্যকুল হয়তো আশান্বিত হয়েছিল, কিন্তু যা ঘটবার তা অবশেষে ঘটলোই। দিনমানে তিনি জনতার মাঝে বললেন তাঁর শেষ কথা, ঈশ্বরের কথা, স্বর্গরাজ্যের কথা।

শেষ নৈশভোজের (Last supper) রাত্রি, শিষ্যকুলবেষ্টিত যীশু। শেষ বারের মত প্রবোধ দিলেন শিষ্যদের। কিছুটা যেন বিষাদগ্রস্ত, অন্তর্মুখীন। সহসা উঠে একে একে শিষ্যদের পা ধুইয়ে আপন বস্ত্রখণ্ড দিয়ে মুছিয়ে দিতে লাগলেন। বিস্ময়ব্যথিত পীটার বলে উঠলেন—প্রভু, আপনি আমার পা ধুইয়ে দেবেন? না—কিছুতেই আপনি আমার পা ধুইয়ে দেবেন না। যীশু বললেন, তুমি আমারই অংশ, তাই পা ধুইয়ে দিচ্ছি। পীটার বললেন, তাহলে প্রভু, আমার হাত, মাথা, সব ধুইয়ে দিন। প্রভু বললেন—যে শুচিস্নাত, তার চরণ ছাড়া আর কিছু ধোবার থাকে না। অবশ্য তোমরা সকলেই কিন্তু শুচিস্নাত নও। শিষ্যেরা একের পর এক উঠে প্রভুর আদর্শ অনুযায়ী তাঁর চরণ ধুইয়ে মুছিয়ে দিতে লাগলেন। যীশু দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠলেন—সত্য, সত্য, আমি তোমাদের বলছি—এই তোমাদের মধ্যেই একজন আমাকে ধরিয়ে দেবে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শিষ্যেরা পরস্পর নীরব জিজ্ঞাসায় ইসারা-ইঙ্গিতে বলতে লাগলেন,—কে, কে সেই ব্যক্তি? একজন যীশুর বুকের কাছে হেলে পড়ে গভীর স্বরে বললেন, কে, কে প্রভু? সহসা জুডাস বলে উঠলেন—"Is it I?" সকলে বিচলিত, যীশু নীরব। তারপর পরিষ্কারভাবেই বললেন—যাকে প্রথম রুটি ভিজিয়ে পরিবেশন করবো সেই। জুডাসকেই অবশ্য তা দিয়েছিলেন। শিষ্যরা যেন বুঝেও বুঝে উঠতে পারছিলেন না। যীশু তখন জুডাসকে বললেন, যা করবার তাড়াতাড়ি করো অনেকে মনে করলেন পর্ব উপলক্ষে কোন আয়োজন ব্যবস্থার কথা বলছেন। ভোজ শেষ হতেই জুডাস ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন। যীশু তাঁর অভ্যাসমত সঙ্গীদের নিয়ে কেদ্রন (Valley of Kedran) অতিক্রম করে অলিভ পর্বতের পাদদেশে গেথসিমানি নামক বাগানে (Garden of Gethsemane) প্রবেশ করলেন। গভীরতর হল রাত্রি। বার কয়েক প্রার্থনার পর যীশু দেখলেন সঙ্গীরা ঘুমিয়ে পড়েছে! বুঝতে পারলেন যীশু সময় হয়ে গেছে, তাই আশঙ্কা সত্ত্বেও ওদের এই কালনিদ্রা। সহসা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত মহাযাজকদের সৈন্যসামন্ত মশাল নিয়ে বাগানে প্রবেশ করলো। সঙ্গীরা জেগে উঠে ভয়চকিত হয়ে সবই বুঝতে পারলেন। শত্রু-পক্ষীয়েরা হয়তো ভেবেছিল, যাঁকে ইস্রায়েলীরা বলে রাজা, তাঁকে ধরতে গেলে বাধা আসতে

পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু নিশীথের এই বিশ্রামস্থলে সে প্রশ্নই আর রইলো না। যীশুই অগ্রসর হয়ে বললেন,— তোমরা কাকে চাও? নাজারথের যীশুকে চাই? আমিই সেই যীশু। প্রথমে তারা বিশ্বাস করতে পারলো না, নিজকে কি কেউ শত্রুহস্তে সমর্পণ করে? পথপ্রদর্শক হয়ে নির্লজ্জের মত জুডাস যীশুর মুখচুম্বন করে শত্রুদের নিশ্চিন্ত করেছিলেন, ইনিই সেই। তারা যখন বন্দী করতে উদ্যত, পীটার সেই মুহূর্তে তাঁর তরবারি উন্মুক্ত করে প্রধান পুরোহিতের ভৃত্য মালচুসের (Malchus) কর্ণচ্ছেদ করে দিলেন। যীশু সংযত করলেন পীটারকে। শিষ্যদের ক্ষুদ্রশক্তি তছনছ হয়ে গেল, আত্মগোপন করলেন তাঁরা। বন্দী করে প্রথম যীশুকে নিয়ে যাওয়া হলো প্রধান যাজক হ্যানান ও কায়দার কাছে। সেখানে বিচারের নামে লাঞ্ছনা আর অপমানের পর শেষ বিচারের ভার দেওয়া হলো রোম সম্রাটের প্রতিনিধি দেশাধ্যক্ষ পন্টিয়াস পাইলেটের হাতে (Pontius Pilate)। পুরোহিত, ফ্যারিসী ও অন্যান্য প্রভাবশালীদের প্রচার-প্ররোচনায় ইহুদীরা ক্ষেপে উঠেছে সব। যে লোক বলে আমি ঈশ্বরপুত্র, আমিই ঈশ্বর, ধর্মধাম, পুরোহিতদের পূজা-অর্চনা সব মিথ্যা, তার চরম দণ্ড অবশ্যই প্রাপ্য। রাজভবনে পাইলেট যীশুর বিচার করলেন। নিভৃত হয়ে যীশুকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রথমে তিনি বিচলিত, পরে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন; তিনি যে কোন দোষই খুঁজে পাচ্ছেন না! প্রভাবশালী ব্যক্তিরা, তাদের পদাতিকেরা সে কথা মানতে রাজি নয়। যীশু পাইলেটকে বলেছিলেন,— আপনি কিছু করছেন না, আমার পিতাই আপনাকে দিয়ে সব করিয়ে নিচ্ছেন, আপনি তো নিমিত্তমাত্র! তবু শেষ চেষ্টা করে পাইলেট জনতার উদ্দেশে বলেছিলেন—এই নিস্তারপর্ব উপলক্ষ্যে একজন করে বন্দীর মুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে। আজ সেই পর্ব উপলক্ষ্যে তোমাদের এই রাজাকে মুক্তি দিই? গর্জে উঠলো ক্ষিপ্ত জনতা: তার চেয়ে বরং বারব্বা দস্যুকে মুক্ত করে দিন, ওকে নয়। সে সময় চরম দণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর শাস্তি ছিল ক্রুশবিদ্ধ করে তিলে তিলে শেষ করে দেওয়া। সমাজে দুষ্কৃতকারী, নরাধম, নরঘাতক যারা, একমাত্র তাদের জন্যই ছিল এই ভয়াবহ শাস্তি। তারা এতই ঘৃণ্য বলে বিবেচিত হতো যে, তরবারি দ্বারা হত্যা করলে যেন তরবারিকেই অসম্মান করা হতো। চতুর্দিকে যখন রব উঠলো—ওকে দূর করো, দূর করো, ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও, পাইলেট রীতি অনুযায়ী কোড়া প্রহার করিয়ে যাজক-গোষ্ঠীর পদাতিকদের হাতে যীশুকে সমর্পণ করে দিলেন। সৈনিকেরা তার আগেই কাঁটার মুকুট গেঁথে পরিয়ে দিল মস্তকে, বেগুনে রঙের পরিচ্ছদ পরিয়ে হাতে রাজদণ্ডস্বরূপ একটি নল দিয়ে সাজিয়ে দিল, যেন একটি জীবন্ত বিদ্রূপ! 'রাজার রাজা' হয়ে যার আবির্ভাব, সৈনিকেরা তাঁকে রাজপ্রাঙ্গণ থেকে টেনে নামালো পথের ধুলোয় ক্ষিপ্ত জনতার মাঝে। পালা করে প্রহার। শুধু কি তাই? হাঁটু গেড়ে তাঁর সম্মুখে বসে সৈনিকেরা ধ্বনি দিয়ে উঠলো—"জয়, ইহুদী রাজার জয়।" সমস্ত ক্ষণের এই নিষ্ঠুর প্রহসনের সময় যীশুশিষ্যরা পলাতক। কেউ কেউ ধারে কাছে থাকলেও প্রচ্ছন্নভাবেই ছিলেন। দ্বিপ্রহরের দিকে, যে অপরূপ প্রহসনের সজ্জায় সজ্জিত করেছিল সৈনিকেরা, যীশুর অঙ্গ হতে এবার তা খুলে নিল। জেরুজালেম নগরীর বাইরে গলগোথা নামক স্থানে এই বধ্যভূমি

নির্দিষ্ট ছিল। গলগোথা কথাটির অর্থ মাথার খুলি। আরও দু'জন দাগী তস্কর সেইদিন যীশুর দু'পাশে থেকে ক্রুশবিদ্ধ হবে বলে স্থির হলো। নিষ্ঠুর প্রথার যেন আর শেষ ছিল না। ক্রুশ বহন করে নিয়ে যাওয়ার রীতিও ছিল অপরাধীদেরই। যীশু কায়িক বলে বলীয়ান না থাকায় ক্রুশ বইতে পারলেন না। একজন গ্রামীণ লোককে দিয়ে এই মৃত্যুযন্ত্রটি বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। ক্রুশে তোলার পূর্ব মুহূর্তে অপরাধীদের এক প্রকার কড়া পানীয় দেবার বিধি ছিল, পেরেক-বিদ্ধ অবস্থায় যাতে যাতনাবোধ কম হয়। সৈন্যরা পানীয় দিল। যীশু পানপাত্রে ওষ্ঠই স্পর্শ করলেন, পান করতে অসম্মতি জানালেন। অসাধারণ যীশু, মহামানব যীশু, সর্বোপরি ঈশ্বরপুত্র যীশু—সৌম্য শান্ত হৃদয়ে মৃত্যু-যন্ত্রণাকে আলিঙ্গন করে ক্রুশবিদ্ধ হলেন। নিষ্ঠুর প্রহসনের আর একটি ছবি,—ক্রুশের শীর্ষদেশে হিব্রু, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় একটি বিজ্ঞাপন ঝুলছিল, তাতে লেখা ছিল "ইহুদীদের রাজা"। পুরোহিত যাজকেরা আবার তাতে আপত্তি জানিয়ে পাইলেটকে অনুরোধ করে বলেছিলেন—আমরা তো রাজা বলি না, যীশু নিজেই রাজা বলে জাহির করেছে, শুধরে দিন লেখাটা। পাইলেট অবশ্য তা আর গ্রাহ্য করেননি। যীশুর অঙ্গের পরিচ্ছদ ভাগ-বাটোয়ারা করে নিল সৈনিকরা। পায়ের কাছে খ্রীভক্তদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মুহ্যমান শোকস্তব্ধ। দিব্য বিভাময় যীশু সমাধিতে ডুবে যেতে লাগলেন ধীরে ধীরে! তাঁর অন্তরের অন্তঃস্তলের শেষবাণীটির মর্মার্থ—হে আমার পিতঃ, আমার প্রভু, ওদের ক্ষমা করো, ওরা জানে না যে ওরা কী করলো!

যীশু নামটিই এক দিব্য দ্যুতিময় প্রেরণা—প্রেম, মৈত্রী, করুণা। যুগে যুগে যীশুরা আসেন, বিশ্বমানবের ঘরে ঘরে আর্তিভরে ডাক দিয়ে দিয়ে চলে যান। তাঁরা কখনই ফুরিয়ে যান না; মহাযাত্রারও শেষ নেই।

"মহাপুরুষেরা ধর্মপ্রচার ক'রে যান, কিন্তু যীশু, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় অবতারেরা ধর্ম দিতে পারেন। তাঁরা কটাক্ষে বা স্পর্শমাত্রে অপরের মধ্যে ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করতে পারেন। খৃষ্টধর্মে একেই পবিত্রাত্মার (Holy Ghost) শক্তি বলেছে—এই ব্যাপারকে লক্ষ্য ক'রেই 'হস্তস্পর্শে'র (The laying-on of hands) কথা বাইবেলে কথিত হয়েছে। আচার্য (খ্রীষ্ট) প্রকৃতপক্ষেই শিষ্য-গণের ভিতর শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। একেই 'গুরুপরম্পরাগত শক্তি' বলে।"

— স্বামী বিবেকানন্দ

ধর্মযাজকের আত্মবলিদান

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

ঈশদূত যীশু তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছিলেন, 'He that findeth his life shall lose it and he that loseth his life for my sake shall find it.···He that taketh not his cross and followeth not after me, is not worthy of me. ·Heal the sick, cleanse the lepers. Freely ye have received, freely give.'—যে ব্যক্তি নিজের জীবনের দিকে তাকাবে সে তা হারাবে, আর যে আমার জন্য জীবন বিসর্জন দিবে সে প্রকৃত জীবন লাভ করবে।··যে ব্যক্তি দুঃখকষ্ট স্বীকার ক'রে আমার অনুগামী না হয় সে আমার উপযুক্ত শিষ্য নয়।···পীড়িতের রোগ দূর কর. কুষ্ঠীদের সেবা কর। অযাচিতভাবে তুমি যা পেয়েছ তা মুক্তহস্তে দান কর। যীশুর শিষ্যমণ্ডলী ও পরবর্তী অনুগামিগণের মধ্যে যাঁরা তাঁর এই বাণী অনুসরণ ক'রে বহুজনের হিত ও বহুজনের সুখের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সেবাব্রতী ফাদার ড্যামিয়েনের নাম খৃষ্টধর্মের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। 'Cleanse the lepers'—কুষ্ঠীদের সেবা কর। যীশুর এই উপদেশটি জীবনের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ ক'রে সে উদ্দেশ্যে জীবন বিসর্জন দিতেই যেন ড্যামিয়েন জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ইউরোপে বেলজিয়ামের অন্তর্গত এক পল্লীগ্রামে যোশেফ ডি. ভিয়াস্টার নামে এক ব্যক্তি বাস করতেন। নিজের অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি নানা বিষয়ে প্রভুত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারী, শিক্ষক, চিত্রকর, সূত্রধর, গৃহনির্মাতা, পাচক ও উদ্যানরক্ষক।

বাল্যকালেই যোশেফ তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা পেম্পিলাস ছিলেন প্রসিদ্ধ লুভেইন মঠের (monastery) ধর্মযাজক। উনিশ বৎসর বয়সেই বালক যোশেফ জ্যেষ্ঠভ্রাতার কাছে থেকে ধর্মপ্রচারের কাজ শিক্ষা করবার জন্য পিতার অনুমতি চাইলেন। পুত্রের দৃঢ়সংকল্প দেখে পিতা সানন্দে সম্মতি দিলেন। লুভেইন মঠে ধর্মপ্রচারের শিক্ষা পেয়ে যোশেফ ফাদার ড্যামিয়েন নামে পরিচিত হন।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা পেম্পিলাসের বিদেশে ধর্মপ্রচারকার্যে যাবার কথা স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, যথাসময় আরোগ্যলাভ ক'রে জাহাজে রওনা হবার কোন সম্ভাবনাই তাঁর রইল না। এতে পেম্পিলাস খুবই মর্মাহত হলেন।

জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বিষণ্ণ দেখে ড্যামিয়েন বললেন, 'প্রিয় ভ্রাতা, আপনার বদলে আমি যাব—এতে কি আপনার মনে শান্তি ও সুখ হবে?' পীড়িত ভ্রাতা সানন্দে ব'লে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই সুখী হব। তুমি যদি আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ধর্মপ্রচারের জন্য বিদেশে যাও তাহ'লে আমি মনে করব যে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।'

ড্যামিয়েন একাজে অনুমতি প্রার্থনা ক'রে সঙ্ঘনায়ককে (Head of the Order) চিঠি লিখলেন। অনুমতি দেয়া হ'ল। ড্যামিয়েন

পীড়িত ভ্রাতা ও বাড়ির আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে চিরদিনের জন্য বেলজিয়ম পরিত্যাগ ক'রে দক্ষিণ সমুদ্রের (South seas) উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘ পাঁচ মাসের সমুদ্রযাত্রা করলেন।

প্রশান্ত মহাসাগরে কতকগুলি দ্বীপ আছে—দ্বীপশ্রেণী অতি মনোরম ও বিচিত্রপুষ্প-রাজিতে সুশোভিত। অসংখ্য নারিকেল গাছ তীরভূমিতে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এ স্থানেই ফাদার ড্যামিয়েন ধর্ম-প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন এবং সুদীর্ঘ নয় বৎসর কুষ্ঠরোগীদের সেবায় ব্রতী থেকে জীবন বিসর্জন দেন। এসকল দ্বীপের অধিবাসিগণ খৃষ্টধর্মাবলম্বী। প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপশ্রেণী দেখতে মনোরম হলেও একটা দোষে এরা কলঙ্কিত, অভিশপ্ত এবং ভীতির কারণ-স্বরূপ হয়েছে। দ্বীপগুলির অধিবাসীরা কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অমানুষিক যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ ক'রে থাকে। এই ভীষণ ব্যাধি এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, গবর্নমেণ্ট এর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার মানসে রোগীদের বাসের জন্য একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ পৃথক্‌রূপে নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন। ঘনকৃষ্ণ অত্যুচ্চ গিরিশ্রেণীর দ্বারা অন্যান্য দ্বীপগুলি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের দুই পল্লীতে এই হতভাগ্য কুষ্ঠিগণ নিঃসহায় অবস্থায় নিরানন্দ জীবন যাপন করত। এই
নাম মোলোকাই। তাদের সঙ্গে কোন চিকিৎসক ও ধর্মযাজক বাস করতেন না। অন্যান্য দ্বীপবাসীদের নিরাময় ও নিরাপত্তার জন্য কুষ্ঠীদের নির্জন দ্বীপে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত করা হ'ত।

দ্বীপগুলির প্রধান ধর্মযাজক মাঝে মাঝে কুষ্ঠরোগীদের দেখতে যেতেন। হতভাগ্যদিগকে নিঃসহায় অবস্থায় নির্জন দ্বীপে ফেলে আসতে তাঁর প্রাণে দুঃখ হ'ত। রোগীদের সঙ্গে বাস করবার জন্য কাকেও পাঠালে তিনি নিশ্চয়ই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হবেন—এ আশঙ্কাও ছিল। কাজেই বিশপ গুরুতর সমস্যায় পড়লেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, হতভাগ্যদের জন্য ড্যামিয়েনের হৃদয় করুণায় বিগলিত হ'ল।

ড্যামিয়েন তখন তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক বলিষ্ঠ ও কর্মিৎকর্মা যুবক। তিনি বিশপের কাছে গিয়ে বললেন, 'আমাকে মোলোকাই দ্বীপে গিয়ে হতভাগ্য কুষ্ঠরোগীদের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করতে অনুমতি দিন।' বিশপ তরুণ ড্যামিয়েনের অসাধারণ সাহস ও আত্মত্যাগের ভাব দেখে বিস্মিত হন এবং মোলোকাই দ্বীপে যেতে তাঁকে অনুমতি দিলেন। কুষ্ঠ যে কী ভীষণ ব্যাধি এবং কুষ্ঠিপল্লীতে গেলেই যে ড্যামিয়েন এ রোগে আক্রান্ত হবেন, তা তিনি ভালরূপেই জানতেন। তথাপি এ কাজ হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হবার চিন্তা তাঁর মনে উদিত হ'ল না। যাবার জন্য ড্যামিয়েন এত ব্যস্ত হন যে, কারও কাছ থেকে যথোচিত বিদায় গ্রহণ এবং কোনও নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহ না ক'রে সে-দিনই মোলোকাই দ্বীপে রওনা হন।

একটি ক্ষুদ্র নৌকা ড্যামিয়েনকে জাহাজ থেকে সমুদ্রতীরে নিয়ে গেলে তিনি অসংখ্য নিঃসহায় কুষ্ঠরোগীকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন। এতে তিনি বিচলিত হননি, মনে মনে নিজেকে বলতে লাগলেন, 'যোশেফ, এ-ই তোমার জীবনের প্রধান ব্রত; এদের সেবাতেই তোমার জীবন উৎসর্গ করতে হবে।'

ড্যামিয়েন যখন মোলোকাই দ্বীপে প্রথম উপনীত হন তখন তাঁর বাসস্থানের কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। এক প্রকাণ্ড গাছের নীচে

খোলা জায়গায় তিনি নিদ্রা যেতেন। প্রায় আটশত কুষ্ঠরোগী নিজেদের হাতে তৈরী জীর্ণ কুটীরে নিরানন্দ জীবন যাপন করত। ড্যামিয়েন কালবিলম্ব না ক'রে তাদের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ কুটীর তৈরি করতে আরম্ভ করেন। কাষ্ঠাদি পাঠাবার জন্য গবর্নমেণ্টকে লিখলেন। তিনি শুধু গৃহনির্মাণের পরিকল্পনাই করেননি, প্রধানকর্মকর্তারূপে গৃহ তৈরি করার কাজেও নিযুক্ত হলেন। রোগীরা সাময়িকভাবে কতকটা দুঃখযন্ত্রণা ভুলবার জন্য মদ্যপান ক'রে সময় কাটাত। ড্যামিয়েন এসে তাদের এ কু-অভ্যাস দূর করেন এবং তারা তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে কুঠার করাত প্রভৃতি যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিজেদের বাসোপযোগী কুটীর তৈরি করতে লাগল। দেখতে দেখতে সারি সারি সুন্দর স্বাস্থ্যপ্রদ কুটীর তৈরী হয়ে গেল।

কুষ্ঠিপল্লীতে জলের অভাব ছিল বেশী। জলসরবরাহের জন্য ড্যামিয়েন উপত্যকার উপরিভাগে অবস্থিত একটি ঝরণা থেকে নলসংযোগে অফুরন্ত জল আনবার সুবন্দোবস্ত করেন।

ড্যামিয়েনের দৈনন্দিন কর্মসূচী ছিল অতি সুন্দর। প্রতিদিন প্রাতে ক্ষুদ্র গির্জায় উপাসনা শেষ ক'রে তিনি কাজে নিযুক্ত হ'তেন। এই দৈনন্দিন উপাসনাই তাঁকে প্রতি কাজে অপূর্ব প্রেরণা ও শক্তি দিত। প্রথমতঃ তিনি মোলোকাই-এর পিতৃমাতৃহীন শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত অনাথ-ভবনে (Orphanage) যেতেন; পরে বালকবালিকাদের বিদ্যালয়ে গিয়ে তাদের শিক্ষা দিতেন; তারপর কুটীরগুলিতে ও হাসপাতালে রোগীদের দেখতেন। এসকল নির্দিষ্ট কাজ শেষ ক'রে ড্যামিয়েন মিস্ত্রীর কাজও করতেন। বলবান কুষ্ঠরোগীদের সাহায্যে তিনি ক্ষুদ্র গির্জাটির পরিসর আরও বাড়ালেন। দু'টি নতুন গির্জাও তৈরী হ'ল। ধর্মযাজকরূপে ড্যামিয়েনকে দীক্ষা, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও যোগদান করতে হ'ত। প্রকৃতপক্ষে, ফাদার ড্যামিয়েন মোলোকাই দ্বীপে কুষ্ঠীদের বিচারক, পিতা, শাসক ও ত্রাণ-কর্তা ছিলেন। 'Come unto me, all ye that labour and heavy-laden, and I will give you rest.' অর্থাৎ তোমরা যারা দুঃখকষ্টে অতিশয় জর্জ্জরিত আছ, আমার কাছে এস; আমি তোমাদের শান্তি দেব।—যীশুর এ আশ্বাসবাণীকে সম্বল ক'রেই ড্যামিয়েন হতভাগ্য কুষ্ঠীদের কাছে যেতেন, তাদের দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করতেন এবং ভগবানের কথা শুনিয়ে তাদের নিরানন্দ জীবনে আনন্দ, আশা ও শান্তি দিতেন। বহু বৎসর কুষ্ঠিপল্লীতে বাস ক'রে রোগীদের সেবায় তিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর এই অলোক-সামান্য নিঃস্বার্থ সেবার ফলে মোলোকাই দ্বীপের কুষ্ঠীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এগার বছর একনিষ্ঠ সেবার পরও কুষ্ঠব্যাধি ড্যামিয়েনের শরীরে সংক্রমিত হয়নি। কিন্তু তিনি বেশীদিন এই সংক্রমণ হ'তে নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি। পীড়িত ও মৃত কুষ্ঠীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর নিজ শরীরে এই দুরারোগ্য ব্যাধির সংক্রমণ ছিল অবশ্যম্ভাবী। একজন ডাক্তার মোলো-কাইতে চিকিৎসার জন্য এসে ড্যামিয়েনের শরীরে ব্যাধির আক্রমণ দেখে বললেন, 'ড্যামিয়েন, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তোমার শরীরে দুষ্ট কুষ্ঠ সংক্রমিত হয়েছে।'

ড্যামিয়েন হেসে উত্তর দিলেন, 'আমি অনেক পূর্বেই এটা আশা করেছিলাম। তুমি যদি বলতে—এখানকার কাজ ছেড়ে অন্যত্র

চলে গেলে আমার এ ব্যাধি সেরে যাবে, তা হলেও আমি এ স্থান ছেড়ে যেতাম না। এই হতভাগ্যদের সেবার ভার আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছি, এদের সেবাতেই প্রাণ বিসর্জন করব।'

'কুষ্ঠীদের সেবা কর'—যীশুর এ উপদেশ ড্যামিয়েন তাঁর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তাঁর জীবনের ব্রত (mission) উদ্‌যাপিত হ'ল। তিনি যে কাজের সূচনা করেন, তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে পরবর্তী ধর্মযাজকগণ তা পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর ভ্রাতা ও অন্যান্য ধর্মযাজকগণ স্বেচ্ছায় এ কাজে যোগদান করেন। ড্যামিয়েন যখন প্রথম একাজে আত্মনিয়োগ করেন তখন কেউই তাঁকে উৎসাহ দেননি, কোনও সহানুভূতি দেখাননি। বহির্জগৎ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন ছিল। ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইউরোপ এই মহাত্মার আত্মত্যাগের কথা জানতে পারে।

ড্যামিয়েন তাঁর জীবৎকালেই কুষ্ঠীদের সেবাকার্যে ইউরোপীয়দের সহানুভূতি ও অর্থানুকূল্যের কথা জানতে পেরে পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন। ইংলণ্ড থেকে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন, মানচিত্র, কলের গান, চিত্র প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য উপহারস্বরূপ ড্যামিয়েনের নিকট প্রেরিত হয়েছিল। এসকল দ্রব্যের মধ্যে একটি মূল্যবান উপহার ড্যামিয়েন সযত্নে ও পরম প্রীতির সঙ্গে নিজের কুটীরে রক্ষা করেছিলেন—সেটি হচ্ছে সন্ত ফ্রান্সিসের নিকট প্রভু যীশুর আবির্ভাবের ক্ষুদ্র চিত্রখানি। এই চিত্রখানি ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত চিত্রকরের অঙ্কিত। ফাদার ড্যামিয়েন নিজের কুটীরে শয্যার প্রান্তে দেয়ালে এ চিত্রখানি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, তিনি সব সময়েই তন্ময় হয়ে চিত্রখানি দেখতেন; দেখতে দেখতে বোধ হয় ভাবতেন—সাধু ফ্রান্সিসের নিকট প্রভু যীশু যেমন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর নিকটও তেমনি প্রভু একদিন কৃপা ক'রে আবির্ভূত হয়ে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

পৃথিবীতে যতদিন সেবাধর্মের মহিমা থাকবে ততদিন ধর্মযাজক ড্যামিয়েনের নিষ্কাম সেবা ও আত্মোৎসর্গের কাহিনী পরিকীর্তিত হবে।

ভারতের নবজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে শাশ্বত উপাদান

"A foolish consistency is the hobgbolin of little minds."—Emerson.

প্লেটো সম্বন্ধে ক্রসম্যান বলেছেন, "যতদিন ধরেই আমরা প্লেটোর লেখা পড়ি না কেন, প্লেটোকে ঠিক বুঝতে পেরেছি বলে দাবি করতে পারি না"।[১] উক্তিটি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও বহুলাংশে প্রযোজ্য স্বামীজীর ক্ষেত্রেও আমাদের খোঁজ সম্পূর্ণ সার্থক হয় না। এর কারণ হলো তাঁর উক্তি ও বাণীর মধ্যে আপাতসংগতির (formal consistency) অভাব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক স্থানে তিনি ভারতীয় জাতিভেদপ্রথার তীব্র সমালোচনা করেছেন, আর এক স্থানে সমস্ত যুক্তিতর্ক দিয়ে এই প্রথাকে সমর্থনই করেছেন। আবার এক স্থানে তিনি ভারতীয় জীবন-পদ্ধতিকে সমুচ্চ বলে বর্ণনা করেছেন, আর এক স্থানে একে কোনো মানদণ্ড দ্বারাই সমর্থন করা যায় না বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ভারতের সন্ন্যাস-আদর্শের বেলাতেও অনুরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। একস্থানে তিনি এই সন্ন্যাস-আদর্শকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং আদর্শের সমর্থনে শঙ্করাচার্যের বাণী উদ্ধৃত করেছেন।[২] আর এক স্থানে কিন্তু যে-ভারতে লক্ষ লক্ষ সাধু ও কোটী কোটী ব্রাহ্মণ মহুয়া ফুল খেয়ে বেঁচে আছে এইরকম দরিদ্র ও হতভাগ্য ব্যক্তিদের রক্ত শোষণ করছে, সেই ভারতকে তিনি নরক বলেই বর্ণনা করেছেন।[৩]

এইভাবে আপাতসংগতির অভাবের দরুণ স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে স্ব-অভিমত-বিরোধিতার (self-contradiction) অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে। এই কারণে আবার তাঁকে এরূপ এক প্রতিক্রিয়াশীল বলে অভিহিত করা হয়েছে যিনি হিন্দুধর্ম ও সমাজের সব কিছুকে অকুণ্ঠ সমর্থন করে সংস্কার-আন্দোলনের প্রতিবন্ধকতা করেছেন।[৪]

নিরপেক্ষ সমালোচকের কাছে কিন্তু স্বামীজীর উক্তি ও বাণীতে আপাতসামঞ্জস্যের অভাব কোনোরূপেই তাঁর শিক্ষার মূল্য হ্রাস করে না। প্লেটোর মতো স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব কখনো দ্বিধাবিভক্ত ছিল না। ক্রিস্টোফার ইশারউড এবং অন্যান্য লেখক এই কারণেই সতর্ক করে দিয়েছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা পাঠ করবার সময় এমারসনের বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ রাখতে হবে: A foolish consistency is the hobgoblin of little minds. ইশারউড আরও বলেছেন, সত্যদ্রষ্টা বিবেকানন্দ জানতেন যে বাক্যবিন্যাসের মধ্যেই সত্য নিহিত থাকে না।[৫]

এই যে সত্য, যা স্বামীজী প্রচার করেছেন

১ R. H. S. Crossman : Plato Today, p. 61

২ C. W. vii, pp 251-52, 409-10, etc.

৩ C. W. VI, 253-54

৪ Farquhar : Crown of Hinduism, pp 281, 334-35

৫ What Religion is in the Works of Vivekananda, p. XXI

তা হলো তাঁর দর্শনের শাশ্বত উপাদান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা বন্ধনমুক্তির মন্ত্র, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা নূতন বন্ধনের সূচক হিসেবেই দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে বন্ধনমুক্তির উদ্গাতা অনেক সময়েই নূতন বন্ধনের সূচনা করেন। স্বামী বিবেকানন্দও তাই করেছেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা—দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন শাশ্বত জীবনবেদের এবং ফলে নূতন বন্ধনেরও সূচনা করেছিলেন। স্বাধীনতাকে অন্যান্য চিরন্তন উপাদান বা সত্যের সহিত অভিন্ন করে জগৎকে তিনি সুন্দরতর করে তুলতে চেয়েছিলেন—যে সুন্দরতর জগৎ হবে প্রকৃতপক্ষে যুক্তিসিদ্ধতার দিক দিয়ে গতিশীল ('truly and rationally dynamic')। যেহেতু সত্য ব্যক্তি বা সমাজ কারোও কাছে নতি স্বীকার করে না, সেই হেতু সত্যপ্রচারকের অবদান মাত্র ব্যাখ্যা ও সামঞ্জস্যবিধানের মধ্যেই নিহিত থাকে। মাত্র এর দ্বারাই তিনি নবদর্শনের সৃষ্টি করে মানুষের চিন্তার অভিধানকে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

এখন দেখা যাক, স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনের শাশ্বত উপাদান কি কি

১। সম্প্রসারণ-মন্ত্র :

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনে মৌলিক শাশ্বত উপাদান হলো সম্প্রসারণের অপরিমেয় সম্ভাবনা। স্বামীজীর মতে, সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রসারণই হলো জীবনের লক্ষণ[৬]—ব্যক্তি-জীবন, সামাজিক জীবন, জাতীয় জীবন বা বৃহত্তর মানবজীবন, যে জীবনই হোক না কেন। অতএব জীবনকে উপলব্ধি করার অর্থ হলো এর পূর্ণ সম্প্রসারণসাধন করা। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এর দ্বারা বোঝায় আত্মসম্পূর্ণতাসাধন (self-completion)।

২। সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা :

যদিও সম্প্রসারণ জীবনের স্বাভাবিক গতি, স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষোভ হলো যে, এই গতি অব্যাহত নয়। এর কারণ মানুষ সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত নয়। এই বন্ধনমুক্তির মন্ত্রই তাঁর সমস্ত সমাজ দর্শনে প্রতিধ্বনিত। স্বামীজী পাণিনির সঙ্গে একমত যে, মুক্ত-অবস্থাই মানব-আত্মার স্বরূপ, তবে সামাজিক রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান মানুষকে অনেক সময় আবদ্ধই রাখে। এর দরুণ মানুষ ধীরে ধীরে—অতি ধীরে ধীরে সম্প্রসারণের পথে চলে। অতএব সম্প্রসারণের পথে এই সকল বাধা অপসারিত করা যখন সম্ভব হবে, তখনই সৃষ্ট হবে পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবেশ, মাত্র যে পরিবেশেই অব্যাহত-সম্প্রসারণ সম্ভব হতে পারে।

৩। অভ্যন্তর থেকে সম্প্রসারণ :

স্বাধীনতার পরিবেশের আরও প্রয়োজন, কারণ স্বামীজীর মতে সম্প্রসারণ সকল সময়েই হবে আভ্যন্তরীণ—বহিরাগত নয়—এবং নিজস্ব সম্প্রসারণধারায়। সমাজ-জীবনে প্রকারভেদ-হীনতা যে সভ্যতার সূচক নয়, সে সম্বন্ধে যুগে যুগে দার্শনিকগণ সচেতন করে দিয়েছেন। বিশেষ করে ক্যাথলিক দর্শনের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হলো প্রকারভেদহীনতার বিরুদ্ধে অভিযান এবং ম্যাটসিনির লেখায় এই অভিযান বিশেষ রূপ ধারণ করেছে দেখা যায়। এই নির্দেশকে অবশ্য বিশেষ মেনে চলা হয়নি। তবুও কিন্তু, স্বামীজীর মতে, তথাকথিত সভ্য জাতিরা সভ্যতার গর্ব করতে

৬ Life, p. 219 ; also Prophets of the New India, p, 234

কুণ্ঠিত হয় না।[৭] এর দ্বারা তারা নিজেদের-কেই প্রবঞ্চিত করে। অতএব, প্রয়োজন হলো মানবজীবনের বৈচিত্র্যের উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা, যে বৈচিত্র্য প্রকৃতির অবস্থা-ব্যবস্থার (plan of nature) অন্যতম অংশ।

৪। একত্ব :

অপর অংশটি হলো একত্ব (unity), অতএব অপর সকলের সঙ্গে একাত্মানুভূতির জন্যও স্বাধীনতার প্রয়োজন। বস্তুত, স্বামী বিবেকানন্দের মতে বৈচিত্র্যানুভূতি ও একাত্মানুভূতি—একই বস্তুর দুটি দিক মাত্র। একাত্মানু-ব্যক্তি অপর সকলকে নিজের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্ক-স্থাপনে অগ্রসর হয়।

৫। সাম্য :

এইভাবে স্বাধীনতা হ'তে সরাসরি উদ্ভূত হয় সাম্য। এবং ফলে সাম্যের সঙ্গেও অন্যান্য শাশ্বত উপাদানের অভিন্নতা কল্পনা করা যায়

৬। সৌভ্রাত্র :

স্বাধীন ও সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিসমূদয়ের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক তাকেই সৌভ্রাত্র (fraternity) বলে অভিহিত করা হয়। বৈপ্লবিক অধিকারের যুগে (Age of Revolutionary Rights) এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল অধিকারের উপলব্ধির মাধ্যমে। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু সৌভ্রাত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন অধিকার-উপলব্ধির দ্বারা নয়—কর্তব্যসম্পাদনের মাধ্যমে।

৭ The East and the West (C. W. V, p 531)

৭। মানুষ-গড়া :

প্লেটোর মত স্বামী বিবেকানন্দেরও ধারণা ছিল যে, বাইরের কোনো কিছুর মাধ্যমে কর্তব্যজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ফলে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন আসল মানুষ-গড়ার (man-making) উপর। স্বামীজীর এই ব্যবস্থা আবার প্লেটোর পরিকল্পনাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ন্যায়বোধ (the spirit of justice) প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রকৃতিগত করে তুলতে হবে।

৮। ত্যাগ ও সেবা :

স্বামীজীর দর্শনে ত্যাগ ও সেবা দুটা আলাদা উপাদান নয়; তাঁর নিজের ভাষায় এরা হলো একই ধাতব মুদ্রার দুইটি দিক। স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনে ত্যাগ সূচনামাত্র। ত্যাগ পরিণতি লাভ করবে যখন আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করে জগতের সকলকে সমান ভালবাসতে পারবো।

উপনিষদের ঋষি বলেছেন, 'ত্যাগের মাধ্যমে উপভোগ কর। স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশও সম্পূর্ণ অভিন্ন। সেবার মাধ্যমে ত্যাগের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। সেবা বলতে দয়া বা দান বোঝায় না—বোঝায় স্বার্থহীন নিখাদ ভালবাসাপ্রসূত কর্মসম্পাদন। এরও উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই মুক্তির পথ প্রশস্ত করা।

৯। বিজ্ঞান ও ধর্মের সংযুক্তিসাধন :

এই মুক্তিকে পুনরুদ্ধার বলে অভিহিত করা যেতে পারে। স্বামীজীর মতে ব্যক্তির ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধার বলতে তার অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃ-প্রকৃতি (both the external and the internal nature) উভয়কেই জয় করা বোঝায়। এই দুই প্রকৃতিকে জয় করবার জন্য

প্রয়োজন হলো যথাক্রমে ধর্মের ও বিজ্ঞানের।[৮]

রেনেশাঁর শুরু থেকেই বিজ্ঞান ও ধর্ম-পরস্পরবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে এবং বলা হয় আধুনিক যুগের সূচনা হয় তখনই যখন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-নীতির (religious dogmas) উপর প্রাধান্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মতে ধর্ম বলতে কোনো নীতি বা তত্ত্ব বোঝায় না—বোঝায় মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করা, তার মনের ভেতরে যে-সব শক্তি সূক্ষ্মভাবে কাজ করে চলেছে তাদের মৌলিক প্রকৃতি অনুধাবন করা। অপরদিকে তাঁর মতে, বিজ্ঞান বলতে বোঝায় "যে বিধিনিয়ম আমাদের মনের বাইরের জড় জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের প্রকৃতি অনুধাবন করা।" অতএব বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরবিরোধী নয়; তারা সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের পরিপূরক। "সমস্ত প্রকার জ্ঞান ধর্মের অংশমাত্র।" এবং বিজ্ঞান একত্বের সন্ধানে অভিযান ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ই হলো মানুষকে বন্য অবস্থা থেকে পরিত্রাণ করার প্রচেষ্টা মাত্র।[৯]

বিজ্ঞান ও ধর্মের এই যে সঙ্গতিসাধন, এ স্বামীজীর সমন্বয়-দর্শনের অংশমাত্র। তাঁর মতে, এই সমন্বয়কার্য প্রত্যেক জাতির কর্তব্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত।

১০। জাতীয় ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়:

স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন, "আমি যতটা ভারতের ততটাই সমগ্র বিশ্বের।" এই ঘোষণা মার্কাস অরিলিয়াসের (Marcus Aurilius) একটি বিখ্যাত উক্তিরই প্রতিধ্বনি। উক্তিটি হলো: এ্যান্টোনিয়াস হিসাবে আমার নগরী ও দেশ হলো রোম, কিন্তু মানুষ হিসাবে নগরী ও দেশ হলো সমগ্র বিশ্ব। ("My city and country so far as I am Antonius is Rome, but so far as I am a man, it is the world")।[১০] এই আদর্শকে বলা হয় বিশ্বমানবের আদর্শ (the ideal of the universal man)। স্বামী বিবেকানন্দ শুধু এই আদর্শের প্রচারই করেননি, কার্যক্ষেত্রে আদর্শটিকে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের আদর্শের (the ideal of true Brahminhood) সঙ্গে অভিন্ন বলেই কল্পনা করেছেন।

১১। স্বামীজীর দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণত্ব:

স্বামীজীর দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ বলতে কোনো জাতি বা বর্ণ বোঝায় না, বোঝায় একটি আদর্শ—যে-আদর্শ হলো ভারতের সনাতন আদর্শ। প্রকৃত বা আদর্শ ব্রাহ্মণ হলেন ত্যাগ ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। মহত্তর লক্ষ্যের সন্ধানে তিনি সর্বদাই ক্ষুদ্রতর সবকিছুকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। বেদান্ত অনুসারে এই মহত্তর লক্ষ্য হলো সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ঐক্যানুভূতি (perception of the unity of existence)। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে বেদান্তের ব্যাখ্যার পার্থক্য হলো যে, স্বামীজী অপর সকল মনুষ্যের সঙ্গেই একাত্মানুভূতির উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

অপর সকল মনুষ্যের সঙ্গে একাত্মানুভূতির

৮ C. W. II, p, 63

৯ C. V, p, 249

১০ Meditations, as quoted by Russell in his History of Western Philosophy, p, 459

জন্য নিজের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে (cultural outlook) সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন হয়। এই কাজ ত্যাগের (renunciation) একটি দিক। যে এই কাজ সম্পাদন করতে সমর্থ হয় তার কাছে "গ্রীক ও বর্বর" বা "ইহুদী ও অ-ইহুদী" (gentiles) বলে কিছু নেই।

এর দ্বারা অবশ্যই আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেওয়া বোঝায় না, বোঝায় আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ করা—যে আত্মম্ভরিতা সম্পূর্ণ অবিদ্যাপ্রসূত। বস্তুত, আত্মমর্যাদার অনুশীলন স্বামীজীর জীবনদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

১২। সমষ্টি-জীবনে ত্যাগ :

সমষ্টি-জীবন বা জাতীয় জীবনে ত্যাগের জন্য প্রয়োজন হয় নির্ভীকতার। নির্ভীক ব্যক্তির মতই নির্ভীক জনসমাজকে সমস্ত স্বার্থপরতাকে ত্যাগ করতে হবে। "আমাদের স্বার্থপরতাই আমাদের কাপুরুষ করে তোলে। আমাদের স্বার্থপরতাই যতকিছু ভয় ও কাপুরুষতার মূল।"[১১] অতএব, ভয়শূন্য হওয়ার জন্য ভোগের ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে, এইভাবেই জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলা যায়। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর একটি উক্তি মনে আসে : "যদি অপরিমেয় আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পার তবেই অপরিমেয় উচ্চতায় আসীন হতে পারবে।" গান্ধীজী এই উক্তি করেছিলেন ভারতবাসী সম্পর্কে। ভারতবাসীর প্রতি স্বামী বিবেকানন্দেরও নির্দেশ হলো : জাতীয় সমৃদ্ধিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সেবায় নিয়োজিত হও।

১৩। ব্যক্তিত্ববিকাশ :

অবশ্য স্বামীজীর সমাজদর্শনের—যে দর্শনকে সম্প্রসারণ-দর্শন বলে অভিহিত করা হয়েছে—মৌল উপাদান হলো ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গতা (individual perfection) এখানে তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে, "ক্ষুদ্র মানুষ দ্বারা কোন মহৎ কার্য সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নয় ('With small men, no great thing can really be accomplished.')।[১২] 'আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা ততদূরই উঠতে পারে যতদূর আমাদের জনগণ একে উত্তোলন করতে সমর্থ। স্বাধীনতা সম্প্রসারণের প্রধান সর্ত হলে ব্যক্তির পক্ষে তার পূর্ণাঙ্গতার জন্য প্রয়োজন হয় সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার। এই প্রত্যয় স্বামীজীকে সমাজ সম্বন্ধে তাঁর জৈব মতবাদকে (organic conception) কিছুটা পরিবর্তিত করতে বাধ্য করেছিল। সমাজ সম্বন্ধে মোটামুটি জৈব ধারণা পোষণ করলেও ব্যক্তির ইচ্ছা যে সম্প্রদায়ের ইচ্ছার অঙ্গীভূত এই অভিমতের প্রচার তিনি কখনও করেননি।'[১৩] কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর ওপর হেগেলের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা গেলেও এর ফলে তিনি হেগেল থেকে দূরে সরে এসে মিলের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, "বিশ্ব-ইতিহাস হলো মাত্র কয়েক জনেরই ইতিহাস যাদের নিজেদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ছিল।" পরবর্তী যুগে গান্ধীজীর মুখেও আমরা অনুরূপ কথা শুনি

১৪। আশাবাদ

ব্যক্তিত্বের উপর এই গুরুত্ব-আরোপ দ্বারাই স্বামীজী পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাকে নাড়া দিয়েছিলেন। অমৃতের পুত্রগণ, মর্তে অবস্থিত

১১ C. V. p xxxvii

১২ On Liberty, ch, v

১৩ C. W. I, pp, 41, 47 etc,

১৪ "Strength of number is the delight of the timid."—Gandhi

দেবগণ কি পাপী বলে অভিহিত হতে পারে ? এই প্রশ্ন রেখেছিলেন শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে। প্রশ্নটি সাধারণ মানুষের মূল্যবত্তার ধারণার উপর প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য জগৎ ভাবতে শুরু করে পাপী কে ?

এইভাবে তাঁর আশাবাদ শুরু হয়ে পরিণতি লাভ করে সেই ঘোষণায় যে, "মানুষের যাত্রা অসত্য থেকে সত্যে নয়—নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে।" অতএব, পাপ বলে কিছু নেই, যদিও বা কিছু থাকে তবে কর্মের দ্বারা তার শুদ্ধীকরণ সম্পূর্ণ সম্ভব। আশাবাদের আর কি উপসংহার প্রয়োজন ? ওয়াল্ট হুইট-ম্যানের হৃদয়ও কি একথা শুনে আন্দোলিত হতো না ?

১৫। আত্ম-সম্প্রসারণের পদ্ধতি :

আবার যে শাশ্বত উপাদানটি এর থেকে উদ্ভূত হয়, তা হলো আত্ম-সম্প্রসারণের পদ্ধতি। মানুষের যাত্রা যদি এক সত্য থেকে অন্য সত্যে হয় তবে শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 'পুনর্গঠনের মাধ্যমে সংরক্ষণ (preservation by reconstitution) নীতিকে অনুসরণ করেই অভিযানের পথে চলতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, সম্প্রসারণ হবে অভ্যন্তর থেকে এবং নিজস্ব সম্প্রসারণ-ধারায়।

১৬। সমাজ ও রাষ্ট্র :

এর ফলে প্রয়োজন হয় নির্বাচন ও সামঞ্জস্য-বিধানের—একই সঙ্গে এই দুই নীতির অনুসরণের। কিন্তু কোন্‌টি নির্বাচন করবো এবং নির্বাচিত উপাদানগুলির মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব ? —এই প্রশ্ন সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক-নির্ধারণের সমস্যার সূচনা করে। সমাজ কি রাষ্ট্রের অনুবর্তী হয়ে চলবে, না সমাজই রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করবে ? প্রাচীনকালে এ সমস্যা ছিল না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অধীনে এ-সমস্যা যখন বর্তমান থাকে তখন তার সমাধানও অপরিহার্য। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, সমাজই সংস্থা—এর উদ্দেশ্য ব্যক্তির এবং নিজের সম্প্রসারণ সম্ভব করা। এই উদ্দেশ্যে সমাজ সরকার গঠন করে। সরকার যদি বিকৃত হয় তবে তাকে উপেক্ষা করেই সমাজের উদ্দেশ্য সাধন করতে অগ্রসর হতে হবে। অতএব সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য স্বামীজীর দর্শনের শুধু অঙ্গীভূতই নয়, এই পার্থক্যকে তিনি অনুসরণীয় নীতিরও রূপদান করেছেন।

উপসংহার :

সমাজ ও রাষ্ট্রের পার্থক্যই যথেষ্ট নয়। স্বতন্ত্র সমাজ বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'স্বদেশী সমাজ'কে এমন সব ব্যক্তির সৃষ্টি করতে হবে যারা সমাজে আলোড়ন এনে সমাজ-সম্প্রসারণের গতিকে ত্বরান্বিত করবে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রত্যেক আশাবাদী সমাজ-দর্শনের মূল কথা হলো এইরূপ ব্যক্তিসমুদয়ের সৃষ্টি। রুশোও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন যে, সমস্ত তন্ত্র মন্ত্র পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে যদি না মানুষের নৈতিক চরিত্র ঠিকমত গঠিত হয়।

(সমাপ্ত)

বিপ্লব কোন্ ধারায়

অধ্যাপক পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এমন অনেক কথা আছে যেগুলো শোনা মাত্র অনেকের মনে আনে উত্তেজনা, জাগায় উন্মাদনা, দেয় কর্মের উদ্দীপনা ও প্রেরণা। উদ্বেল চঞ্চলতা মনের সীমানা পার হয়ে দেহের বন্ধ দুয়ারে হানে বারবার প্রচণ্ড আঘাত। খুলে যায় দরজা। বিক্ষুব্ধ মন প্রবেশ করে অপর এক দেহের দুয়ার দিয়ে—অন্য আর এক মনে। এইভাবে প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয় মন হতে মনান্তরে এবং তা চলতে থাকে বেশ কিছুকাল ধরে সংক্রামক রোগের মতই! সৌর ব্যাটারী যেমন 'লুনা খোদ'কে চালু রেখে চাঁদের রাজ্যে দিগ্‌বিদিকে পাড়ি জমাতে সাহায্য করেছে, মনের ব্যাটারীও তেমনি দেহযন্ত্রকে সচল রেখে নানা কাজে প্রেরণা দিচ্ছে। গতানুগতিকতায় মানুষের মন সত্যই হাঁফিয়ে ওঠে। যা কিছু পুরাতন তাকে ভেঙ্গেচুরে একটা নতুন কিছু করার তাগিদ অনেকেই অনুভব করে। সকল ব্যবস্থাকে অচল করে নিত্য নতুন ব্যবস্থার প্রচলন করাই অনেকের দৃষ্টিতে বিপ্লবের সাধনা।

কোন ব্যবস্থায় যদি সমাজের মুষ্টিমেয়ের সুবিধা এবং অধিকাংশের অসুবিধা হয়, তবে তার সংশোধন বা পরিবর্তন যে একান্ত প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তা করতে হবে কোন্ ভাবে?

কথায় বলে, 'দুষ্টের দলন ও শিষ্টের পালন'। কিন্তু দুষ্টদলনের অধিকারী কে? অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দুষ্টরা দলিত না হয়ে শিষ্টদেরই যথেচ্ছ শাসন করে। মানুষ ও অন্যান্য জীবের ক্ষেত্রে 'জোর যার, মুলুক তার' —এই নীতিগত প্রবণতা আদিম যুগ থেকেই চলে আসছে, তবে মনুষ্যেতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে "যোগ্যতমের উদ্বর্তন" নীতি কতকটা খাটলেও মানুষদের বেলায় যে খাটে না, তা যোগ্যতমের পাশাপাশি যোগ্যতর, যোগ্য এবং অযোগ্যদের সহাবস্থানের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। মানুষের সমাজে সবল অথচ দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা মাঝে মাঝে প্রবল হয়ে দুর্বল ও শিষ্টদের ওপর অত্যাচার ও প্রভুত্ব করলেও বরাবরের জন্য তাদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। যুগে যুগে নানা জাতের বিপ্লবের ইতিহাস এ কথার সত্যতা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে।

দুর্বলদের ওপর যখনই মুষ্টিমেয় প্রবল স্বার্থান্বেষীদের অত্যাচার ও শোষণ শুরু হয়ে যায়, তখনই তাদের মনে অসন্তোষের চাপা আগুন ধূমায়িত হতে আরম্ভ করে। কিছুকাল পরে তা দাবানলে পরিণত হয়ে অত্যাচারী শোষকদের পুড়িয়ে মারে। এটা হল অসন্তোষ-ও রোষজনিত জনতার বিপ্লববহ্নি।

পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে, যুগে যুগে নানাজাতের শত সহস্র বিপ্লব ঘটে গেছে ধরণীর বুকে। শত সহস্র মানুষকে শহিত হতে হয়েছে সেই সবে, আর শহীদের মর্যাদাও পেয়েছে অনেকে। যখনই কোন রাষ্ট্রে বা সমাজে অত্যাচারী ও শোষকদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে, তখনই সেখানে দেখা দিয়েছে প্রবল মাৎস্য ন্যায়। কিন্তু কালচক্রের আবর্তনে অত্যাচারিত ও শোষিতরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একদিন মাথা চাড়া দেয়, তাদের তর্জন-গর্জনের যোগ্য প্রত্যুত্তর

দেয় তারা। দৈবের অলঙ্ঘ্য বিধানে একটা মুমূর্ষু রাষ্ট্রে বা সমাজে কোথা হতে যেন আবির্ভূত হন যোগ্য জননেতা বা প্রতিনিধি। তিনি হন তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। তাঁকে আশ্রয় করেই জনগণ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে, যুগের দাবীকে সফল করে তোলে। এইভাবে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সমাজে সমাজে যুগে যুগে এসেছে কত বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে বহু রাষ্ট্রিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিপ্লব ঘটে গেছে। উপযুক্ত নেতাদের আবির্ভাবে জনগণ সেই সবে সাড়া দিয়েছে। রাষ্ট্র, সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের কত নতুন নতুন ছাঁচ ও কাঠামো তৈরী হয়েছে। নানা ছোট-বড় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অর্থনীতির কাঠামোও বহুবার পালটে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়।

ফরাসী দেশে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জন্য, আমেরিকায় ক্রীতদাসপ্রথা-উচ্ছেদ, স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং শ্বেত- ও কৃষ্ণবর্ণ-বৈষম্য দূরীকরণের জন্য, ইংলণ্ডে শ্রমিকদের অবস্থা-উন্নয়নের জন্য, রাশিয়ায় জারতন্ত্র-উচ্ছেদ ও সাম্যবাদী লালদল-প্রতিষ্ঠার জন্য, লাল চীনে মার্ক্সীয় ও লেলিনী পদ্ধতির সমন্বয়ে নয়া 'মাও'-বাদ প্রতিষ্ঠার জন্য, ইন্দোচীন ইন্দোনেশিয়া উত্তর-ভিয়েৎনাম প্রভৃতি স্থানে স্ব-স্ব দাবী আদায়ের জন্য প্রচণ্ড গণবিপ্লব এবং বাংলা ও বর্তমান ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গণতন্ত্র ও সমাজবাদ-প্রতিষ্ঠায় নানাদলে বিভক্ত জনতার সমর্থনপুষ্ট নেতাদের বহুমুখী প্রচেষ্টা সারা দুনিয়ায় বঞ্চিত রুষ্ট অসন্তুষ্ট মানুষদের মানসিকতার বিভিন্ন বিচিত্র দিক্ উদ্‌ঘাটিত করেছে।

এখন চিন্তার বিষয় এই যে, নানা দল ও উপদলে বিভক্ত ভারতে যে-ভাবে বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলি চলছে তাতে জনগণের ইষ্ট-সিদ্ধি ও সামগ্রিক কল্যাণলাভ হবে কি? পদমর্যাদার লোভ, নাম-যশ-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, অস্বাভাবিক বিত্ত-লিপ্সা প্রভৃতির জন্য সকল স্তরের মানুষের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন, সাম্যবাদী শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণ তো বহু দূরের কথা! আজ 'মহতী বিনষ্টি'র যে বিরাট গহ্বরের মুখের সামনে ভারতবাসীরা, বিশেষতঃ পশ্চিম-বাংলার লোকেরা এসে উপস্থিত হয়েছে, সেই মুখে প্রবেশ ক'রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পূর্বে একবার অন্ততঃ তাদের সকলের, বিশেষতঃ ওপরতলার মানুষদের, ভাবা উচিত স্বাধীনতা-লাভের পর এমন চরম দুর্দশা কেন ও কেমন ক'রে হ'ল এবং বাঁচবার ও বাঁচাবার সত্যই কোন পথ আছে কিনা।

পরাধীন ভারতবাসীর নানা দোষের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের মনোবৃত্তি এবং পরানুবাদ ও পরানুকরণের উৎকট আগ্রহ! স্বাধীনতালাভের পর উচ্ছৃঙ্খল জনজীবনে ঐ দোষগুলি সুতীব্র আকারে দেখা দিয়েছে। তারই ফলশ্রুতি হ'ল আজকের এই চরম দুর্দশা।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের সকল দুর্দশাদূরীকরণের ও সকল সমস্যা-মীমাংসার উপায় ও ইঙ্গিত আমাদের দেশের মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের মধ্যেই নিহিত আছে। নেতারা তাঁদের জনগণকে সেই সম্পর্কে যতটা সচেতন ও শ্রদ্ধালু ক'রে তুলতে পারবেন এবং নিজেরাও যতটা মর্যাদা দিতে পারবেন ততটাই দেশের কল্যাণ।

কল্যাণকামী দেশমাত্রই নিজ ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের ভিত্তির ওপরই তার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেই ভিত্তির মূলোচ্ছেদ করে নয়। স্থিতধী মনস্বীরা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না যে, বর্তমান বিশ্বের সকল সমস্যা-সমাধানের চাবিকাঠিটি দক্ষিণেশ্বরের মহাসাধক দেবমানব লোকোত্তর পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা উপলব্ধ ও প্রচারিত উদার বিশ্বজনীন ধর্মমতের মাধ্যমে নিজের এবং অপরের মধ্যে ঈশ্বরদর্শনের বা নিজস্বরূপ-দর্শনের ঐকান্তিক চেষ্টার মধ্যেই রয়েছে। তা মনের বন্ধ কারাগারের দরজা খুলে হিংসা ঈর্ষা স্বার্থপরতা সঙ্কীর্ণতা ও কাম-ক্রোধ-লোভ প্রভৃতি রিপুর স্তূপীকৃত আবর্জনাকে ঝাঁটিয়ে বিদায় করবার দুর্জয় সঙ্কল্প ও বজ্রকঠোর প্রতিজ্ঞাসকল দেশের, বিশেষতঃ আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের জনগণ, শাসক ও শাসিত, ধনিক ও শ্রমিক, শিক্ষক ও ছাত্র, পুরুষ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক, প্রৌঢ় ও যুবা নির্বিশেষে সব মানুষকেই করতে হবে।

সারা দুনিয়ার মানুষকে যদি সর্বরোগহর, সর্বশুভকর, সর্বশ্রেয়স্কর, সর্বশান্তির আগার, সর্বকল্যাণের আকর কোন আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থাকে রূপায়িত করতে হয়,—যা মার্কসীয় দর্শনের ব্যাখ্যাত সাম্যবাদের পরম ও চরম অভীপ্সা এবং ফলশ্রুতি -তবে তা হিংসার মাধ্যমে বিপ্লবকে সেই পথে পরিচালনের দ্বারা স্থায়িত্বের মর্যাদা কখনই পেতে পারে না। কারণ হিংসাত্মক আসুরিক প্রবৃত্তির তাণ্ডব যদি চলতেই থাকে, তবে তার অর্জিত ফলগুলিতে "কারণগুণের কার্যে অনুপ্রবেশ" এই নীতি অনুসারে বিপ্লবোত্তর অর্জিত নয়া সমাজ-ব্যবস্থায় আসুরী সম্পদেরই প্রাচুর্য ও প্রাবল্য দেখা দেবে এবং আদর্শ সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা কোন কালেই প্রতিষ্ঠিত হবে না।

লোকোত্তর মহাপুরুষদের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ ও অনুসরণ ক'রে এখন বক্তব্য এই যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে দৈবী সম্পদের বিবরণ রয়েছে তার অধিকারী হবার সাধনাই হ'ল যথার্থ বিপ্লবের সাধনা। সেই বিপ্লবের সাদর নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘকালের চর্যাই যথার্থ সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহুধর্মমতসাধনরূপ পরীক্ষায় যে উদার বিশ্বজনীন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী জন্মলাভ করেছে, তার অকপট অনুশীলনই সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শনের সাধনার মাধ্যমে ভাবী সাম্যবাদী শ্রেণীহীন "যত্র বিশ্বং ভবত্যেক-নীড়ম্"—এমন আদর্শ সমাজ গড়তে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় পুণ্য অবগাহনে বিশ্বজনের ত্রিতাপজ্বালা যাতে নিবারিত হয়, তার জন্য বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদগণ অনুপম ত্যাগমহিমোজ্জ্বল "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"-রূপ মহাব্রত এই বিংশ শতকেই উদ্‌যাপন ক'রে গেছেন। কিভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল দেশের মানুষ প্রথমতঃ প্রেয়ঃ-অনুশীলনের মাধ্যমে শেষপর্যন্ত পরম শ্রেয়ঃ 'সত্য শিব সুন্দরের' মণিকোঠায় চির বিশ্রাম লাভ করতে পারবে, তার অভ্রান্ত পথনির্দেশ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবনবেদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য-কার কম্বুকণ্ঠ আচার্য-বরিষ্ঠ নবযুগবার্তাবহ মহানায়ক স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অননুকরণীয় উদাত্ত আহ্বানে—

'ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ
ঈশ্বর ?

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে
ঈশ্বর।"

সকল জীবে প্রেমময় ঈশ্বর বিরাজ করছেন, তিনি বহুরূপে আমাদের সকলের সামনে সদাই বর্তমান। ঈশ্বরসেবাই শ্রেষ্ঠ সেবা এবং তা জীবমাত্রেই ঈশ্বরদৃষ্টি ক'রে সকল মানুষের প্রতি প্রেম-পরিচর্যার দ্বারা করতে হবে। এই হল যুগধর্ম। এটাই হ'ল সত্যদ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র বিবেকানন্দ-প্রদত্ত বর্তমান ও অনাগত বিশ্ববাসীর 'মহতী বিনষ্টিঃ'-রূপ ভয়াল পরিণামের করাল গ্রাস হ'তে নিস্তার পাবার অমোঘ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানসম্মত মহৌষধ।

রাশিয়ার মনীষী চেলীশেভ বিবেকানন্দের এই নয়া মানবতাবাদ (new humanism)-কে স্বাগত জানিয়েছেন, যদিও মনীষী মার্ক্সের ঐতিহাসিক-বৈজ্ঞানিক-দ্বান্দ্বিক-জড়বাদীয়-মতবাদে (historical-scientific-dialectical materialism-এ) জড়ের পূর্বভাবী ও স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বর-চৈতন্যের এবং সকল জীবের মধ্যে প্রেমময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না! বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখছি ভেবে মানুষ অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকেও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ব'লে মনে করতে পারে। তারই প্রতিকারকল্পে বোধ হয় শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের আধ্যাত্মিক বীক্ষণাগারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নানা ধর্মমত পরীক্ষা ক'রে পরীক্ষান্তে, সাধনান্তে সংশয়াতীত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন, "ঈশ্বর আছেন, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায় এই যেমন তোমাদের সঙ্গে বলছি।" খেদ ক'রে বলেছিলেন, "ঈশ্বর আছেন, একথা কাকেই বা বলি, কেই বা শোনে।" আরও বলেছিলেন তিনি, "ঈশ্বরলাভই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।" আর "যত মত তত পথ" তাঁর যুগভাবপ্রচারের শ্রেষ্ঠ বাহন, শ্রেষ্ঠ শিষ্য, আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথকে যোগ্যতম পাত্রবোধে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করিয়েও দিয়েছিলেন।

মোট কথা, দৈবী-সম্পদ-অর্জনের দ্বারা নিখিল মানবকে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীবন্ত প্রতীক-জ্ঞানে সামর্থ্য অনুযায়ী সেবা করবার দৃঢ় ব্রত প্রতি দেশের প্রতি মানুষেরই গ্রহণ করা কর্তব্য। নইলে আমাদের চিন্তা বাক্য কর্ম এক হবে না, স্বার্থপরতা জনকল্যাণের পথরোধ ক'রে দাঁড়াবে। বিবেকানন্দ এই যুগধর্ম-পালনের দ্বারা ইষ্টসিদ্ধির অমোঘ নির্দেশ দিয়েছেন। নিষ্ঠার সঙ্গে পূর্বোক্ত অনুশীলন চলতে থাকলে প্রতি মানুষের নিজ জৈব জীবনের রূপান্তর ঘটিয়ে দিব্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নয়। শিবজ্ঞানে জীবসেবার মাধ্যমে এই দিব্য ভাগবত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সাধনাই হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারাপুষ্ট অভিনব বিপ্লবসাধনার অব্যর্থ পথনির্দেশ। একমাত্র এই পথেই মানবজীবন ধন্য ও কৃতকৃত্য হ'তে পারে, আবার যে আদর্শ সমাজ আমাদের সকলেরই কাম্য, যথাযথরূপে তা গড়ে তোলার সহায়কও হ'তে পারে। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'।

লোকমাতা নিবেদিতা

শ্রীশান্তশীল দাশ

প্রতীচ্যের বুক হ'তে এলে তুমি প্রাচ্যভূমি'পরে
গুরুর নির্দেশে ; গুরুভার নিলে তুলে সেবিকার ;
অজ্ঞতায় সমাচ্ছন্ন, নানা গ্লানিভারে অবনত
এ ভূমি তোমাকে বুকে ঠাঁই দিল সংশয়ে বিস্ময়ে।

ভারতভূমির সেবা—কী দুশ্চর সাধনা তোমার !
কত বাধা, কত বিঘ্ন ; সব সয়ে প্রসন্ন অন্তরে
গুরু-আশীর্বাদ শিরে, নিয়োজিলে অক্লান্ত সেবায়
আপন জীবনখানি—সে ব্রত কী দুঃসাধ্য সাধন !

আপনার সর্বসুখ বিসর্জন দিয়ে অকাতরে
গুরুদত্ত সেবাব্রতে আত্মলীন দিবসে নিশীথে ;
তোমার সে তপস্বিনী মূর্তিখানি আজো কী উজ্জ্বল !
প্রাচ্যকে আপন করে নিলে তুমি আত্মনিবেদনে।

'লোকমাতা নিবেদিতা'—সত্যই তুমি যে লোকমাতা ;
জননীর মত তুমি স্নেহ দিয়ে পালন করেছ,
এক হাতে গ্লানিভার দূর করে অক্লান্ত নিষ্ঠায়,
অন্যহাতে জ্বেলে গেছ কল্যাণের শুভ্র দীপশিখা।

গুরু নিবেদন ক'রে দিল যে তোমায় জননীরে,
সে-ভারতজননীর পদে তুমি সত্য নিবেদিতা ;
সার্থক ও নামখানি, সেবার কী অখণ্ড প্রতিমা !
শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়ে ধন্য হই সেই প্রতিমায়।

বেলুড় মঠ

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর

কোন্ কৈশোরে প'শেছিল কাণে
　　তোমার মধুর নাম
চির জীবনের অমৃত তীর্থ
　　হে বৈকুণ্ঠধাম !
কত সাধনার সুগভীর ধারা,
　　তোমার ভিতরে মিলায়েছে তারা ;
যার আছে আঁখি, নিরখি' নিরখি'
　　সে লভে চিতে আরাম।
যেদিন প্রভাতে বুকে ধরেছিলে
　　যুগাবতারের স্মৃতি,
ঝরেছিল কত অমর লোকের
　　শুভ বন্দনা-গীতি।
সেদিন হইতে জাহ্নবী নীচে
　　চরণ ধৌত করিয়া ফিরিছে,
ছল্ ছল্ জল-লহরী উতল
　　কত বিচিত্র গতি।

সংসার-মরুপ্রান্তর হ'তে
　　হেথা ফেরে কত পান্থ,
দুর্লভ ধন পরশ রতন
　　বৃথা খুঁজে খুঁজে শ্রান্ত।
তোমার পরশে সকল ক্লান্তি
　　মুছে দাও তারে পরম শান্তি,
গেছে যার দিন হ'য়ে উদাসীন
　　পথভোলা দিগ্‌ভ্রান্ত।
ধরণীর চির ভাঙ্গাগড়া মাঝে
　　তব শাশ্বত নীতি
তমসাবৃত বিশ্বাম্বরে
　　চির উজ্জ্বল দ্যুতি।
করি প্রার্থনা আমি দীনজন
　　তোমার বুকে যে অরূপ রতন
ব্যাপিয়া আমার জীবন মরণ
　　হৃদয়েতে হোক স্থিতি।

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

জনসাধারণ অবগত আছেন, গত এপ্রিল মাস হইতে রামকৃষ্ণ মিশন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরায় ১৩টি শিবিরে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীদের সেবা করিয়া আসিতেছে; আসামে করিমগঞ্জ (২টি শিবির) ও শিলচর (৩টি শিবির), মেঘালয়ে মদনবৈঠা ও টুরা, ত্রিপুরায় জোলাইবাড়ী এবং পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি ও ২৪ পরগণা (নরেন্দ্রপুর-পরিচালিত ৪টি কেন্দ্র)—এই কয়টি শিবিরে সেবাকার্য এখনো চলিতেছে। ইহার সঙ্গে গত অক্টোবর মাসে বন্যার্তদের সেবার জন্য বিহারে ৫টি ও পশ্চিমবঙ্গে ১২টি স্থানে মিশনকে বন্যার্তদের সেবায় ব্রতী হইতে হইয়াছিল, যাহার মধ্যে মালদহ জেলার কাজ এখনো চলিতেছে। সম্প্রতি, গত নভেম্বর মাস হইতে ওড়িশার কটক জেলায় ঘূর্ণিবাত্যা- ও বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে পট্টমুন্দাই-এর নিকটবর্তী আউলেও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছে।

সহৃদয় জনগণ বরাবরই অর্থাদি সাহায্যদানে সর্ববিধ সেবাকার্যে রামকৃষ্ণ মিশনকে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন; এই সব ত্রাণকার্যে সাহায্যের জন্য তাঁহাদের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, (হাওড়া)—এই ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইবেন। ওড়িশার ঘূর্ণিবাত্যা-ও বন্যা-বিধ্বস্ত জনগণের সেবাকল্পে প্রেরিত সাহায্য এই ঠিকানাতেও পাঠাইতে পারেন: প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ভুবনেশ্বর-২।

চেক 'RAMAKRISHNA MISSION' এই নামে লিখিবেন। শরণার্থিসেবা অথবা ওড়িশার ঘূর্ণিবাত্যা- ও বন্যা-বিধ্বস্ত জনগণের সেবা—কোন্ সেবাকার্যের জন্য সাহায্য পাঠাইতেছেন, পাঠাইবার সময় তাহা উল্লেখ করিবেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন
বেলুড় মঠ [ফোন: ৬৬-২৩৯১]

২রা ডিসেম্বর, ১৯৭১

সমালোচনা

শ্রীশ্রীগুরুগীতা (বঙ্গানুবাদসহ)—প্রকাশক: স্বামী রঘুবরানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বারাণসী ১। পৃষ্ঠা ৫২+১২। মূল্য: সশ্রদ্ধ পাঠ।

সর্ববিদ্যাই গুরুমুখী, বিশেষ করিয়া অধ্যাত্মবিদ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন: 'সচ্চিদানন্দই গুরু। যদি মানুষ গুরুরূপে চৈতন্য করে তো জানবে যে সচ্চিদানন্দই ঐ রূপ ধারণ করেছেন।'

শ্রীশ্রীগুরুগীতা অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। দেবী পার্বতীর প্রশ্নে জগতের কল্যাণকল্পে দেবাদিদেব মহেশ্বরের শ্রীমুখ হইতে গুরুতত্ত্ব নিঃসৃত। মূল গুরুগীতায় মোট ১১৩টি সংস্কৃত শ্লোক আছে। এই শ্লোকগুলিতে গুরুশব্দের তাৎপর্য, গুরুভক্তি, গুরুভক্তিলাভের উপায় প্রভৃতি বিষয় অতি সুন্দরভাবে বিবৃত।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে প্রত্যেকটি শ্লোকের মূলানুগ সহজবোধ্য বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ভূমিকাটি সুলিখিত এবং জ্ঞানগর্ভ। পুস্তকের শেষাংশে গুরুস্তব, গুরুকবচ, স্ত্রী-গুরুগীতা এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত শ্রীগুরুতত্ত্ব (সংগৃহীত) প্রদত্ত হওয়ায় পুস্তকের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রারম্ভে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের সুন্দর প্রতিকৃতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এই সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ-বিরচিত বহুমূল্য 'গুরু'-শীর্ষক প্রবন্ধটি সন্নিবেশিত হইলে আরও ভাল হইত। উল্লেখযোগ্য যে, ২৫ পয়সার ডাক টিকিট প্রকাশকের নিকট পাঠাইলেই পুস্তকখানি প্রত্যেকেই পাইতে পারেন।

গীতার গল্প—লেখক ও প্রকাশক: শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায়, ১৩১ আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-১৪, Whitehall Clinic. পৃষ্ঠা-১০৪৮৮। এই সংস্করণ বিক্রয়ের জন্য নহে।

গল্পের মাধ্যমে সর্বশাস্ত্রময়ী গীতার কথা সর্বশ্রেণীর পাঠকেরই মনোরঞ্জনে সমর্থ। গীতার মূল শ্লোকগুলি উদ্ধৃত না হইলেও পুস্তকখানিতে প্রত্যেক অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য মনোজ্ঞভাবে পরিবেশিত। গীতাপাঠের নিয়ম, গীতার ধ্যান, যুদ্ধের সূচনা প্রভৃতি বিবৃত করিয়া প্রত্যেক অধ্যায় সম্বন্ধে বিভিন্ন আচার্যগণের অভিমত এবং মহাপুরুষগণের বাণী উপযুক্ত স্থানে নিপুণতা সহকারে প্রদত্ত হওয়ায় পাঠকচিত্তে গীতা-অনুশীলনের প্রকৃত আগ্রহ জাগিবে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে পরিশিষ্টের মাধ্যমে অধ্যায়ের সারাংশ সংলাপের শৈলীতে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থসমাপ্তিতে লেখকের বক্তব্য: 'গীতার শেষ নেই। বই শেষ হলেও গীতা শেষ হয় না। শ্রীগীতা রহস্যময়ী। দুর্বোধ্য শ্লোকের অবগুণ্ঠনে লুকিয়ে রেখেছেন স্বরূপ। কঠিন-সাধন-সাপেক্ষ তাঁর অন্তরের কথা বোঝা। দীর্ঘকাল সাধনা করতে হয়। আর. শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা করতে হয়। প্রয়োজন হয় অভ্যাস ও বৈরাগ্যের।'—এই উক্তির সহিত সুধীজনমাত্রেই একমত।

গ্রন্থখানির পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ ও বাঁধাই আকর্ষণীয়।

ব্রহ্মবিদ্ বলরাম—শ্রীবিজ্ঞানকিঙ্কর সুরেশ দাস। **প্রকাশক:** শ্রীবলরাম ধর্মসোপান,

খড়দহ, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা—১১২; মূল্য—দুই টাকা।

নিরন্তর ভগবদ্‌ভাবে বিভোর জীবন সাধারণ মানুষের জীবন হইতে কত স্বতন্ত্র, ভোগ-বিলাসের পথ হইতে কত দূরে অবস্থিত, ব্রহ্মবিদ্ বলরামের জীবনীপাঠে তাহাই ধারণা হইবে। মাত্র একাদশ বৎসরের কিশোর বালক বিষ্ণুদেব স্বীয় গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া নিঃসম্বল অবস্থায় কিভাবে পদব্রজে দুর্গম তীর্থসমূহ পরিক্রমা, বদরীনারায়ণ দর্শন এবং শ্রীবৃন্দাবনে সদ্‌গুরু শ্রীরঙ্গদেশিক স্বামীর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন তাহার আশ্চর্য বিবরণ পাঠককে বিস্ময়ে অভিভূত করিবে। বিষ্ণু-দেবেরই দীক্ষান্ত নাম শ্রীবলরাম রামানুজদাস। গ্রন্থখানিতে শ্রীবলরামের কঠোর তপস্যা, গুরুভাবের বর্ণনা, আশ্রম ও মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা ভক্তিসহকারে বর্ণিত। পরিশেষে প্রদত্ত বাণীগুলি সাধনভজনের সহায়ক। ৮ খানি আলোকচিত্রে পুস্তকখানি অলঙ্কৃত। এই পুস্তক খড়দহস্থিত শ্রীবলরাম ধর্মসোপানের রজত-জয়ন্তী গ্রন্থমালার অন্যতম হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

কঠোপনিষৎ - ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক: কিঙ্কর বিমলানন্দ, ১১/বি, চেতলা সেণ্ট্রাল রোড, কলিকাতা-২৭। পকেট সাইজ, পৃষ্ঠা ২৩৬+৪৮; মূল্য দুই টাকা।

কঠোপনিষৎ ভারতের অমূল্য অধ্যাত্ম-সম্পদ। ভাব ও ভাষার অপূর্ব সমন্বয় এই উপনিষদে। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ কঠোপনিষদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে নচিকেতার মতো শ্রদ্ধাশীল হইতে বলিয়াছেন। নচিকেতার আদর্শ যুবসমাজ গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইলে যথার্থ কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে প্রত্যেকটি সংস্কৃত মূল শ্লোক, তাহার নীচে অন্বয় ও শব্দার্থ, তৎপরে মূলানুগ প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ এবং শ্লোকটির তাৎপর্যমূলক অনুধ্যান সন্নিবেশিত। গ্রন্থখানি সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট পরম আদরের বস্তুরূপে গৃহীত হইবে। পকেট সাইজ বলিয়া সঙ্গে লইবার অসুবিধা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ: গত ২৩শে অগ্রহায়ণ (৯.১২.৭১) বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১১৯তম জন্মতিথি-উৎসব সারাদিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে ভজন, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ এবং শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরে (নাটমন্দিরে) পূর্বাহ্ণে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ ও পরে কালীকীর্তন হইয়াছিল। অপরাহ্ণে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (সভাপতি) ও স্বামী কৈলাসানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সন্ধ্যারতির পর নাটমন্দিরে ভজন হইয়াছিল।

এই উৎসব উপলক্ষে বহু ভক্ত নরনারী বেলুড় মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় ৬.০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী: কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর ১নং উদ্বোধন লেনে শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসবে শ্রীশ্রীমায়ের ১১৯তম জন্মতিথি পালিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত এই ভবনে পূর্বাহ্ণে বিশেষ-পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভজন এবং ইচ্ছাময়ী কীর্তন সম্প্রদায় কর্তৃক কালীকীর্তন গীত হইয়াছিল; সন্ধ্যারতির পর স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন আলোচনা করেন। উদ্বোধন কার্যালয়ের নূতন ভবনের সভাগৃহে আয়োজিত জনসভায় বেলা নয়টায় স্বামী নিরাময়ানন্দের উদ্বোধনী ভাষণ এবং স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দের শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ ও আলোচনার পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (সভাপতি) শ্রীশ্রীমায়ের জীবন সম্বন্ধে ভাষণ দেন। পরে সওয়া দশটায় নরেন্দ্রপুর আশ্রমের ছাত্রগণ কর্তৃক 'শ্রীশ্রীসারদালীলাগীতি পরিবেশিত' হয়।

ভোরে মঙ্গলারতির সময় হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার ভক্ত নরনারী এইদিন এখানে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে ভক্তি-নিবেদন করিতে আসিয়াছিলেন। সকলকেই হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল।

সেবাকার্য

উদ্বাস্তুসেবা: পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীদের সেবাকার্য বর্তমানে ১৮টি শিবিরে পরিচালিত হইতেছে। বর্তমানে এই কয়টি শিবিরে শরণার্থীর সংখ্যা – ১,৭৮,০০০।

বন্যার্তসেবা: মালদহে বন্যাক্লিষ্টদের জন্য সেবাকার্য এখনও চলিতেছে।

ঘূর্ণিবাত্যার্তসেবা: ওড়িশায় কটক জেলার পট্টমুণ্ডাই অঞ্চলে আউল (Aul) নামক স্থানে ঘূর্ণিবাত্যাপীড়িত ও বন্যাক্লিষ্ট জনগণের সেবাকার্য চলিতেছে।

ভিত্তিস্থাপন

গত ২৫. ১১. ৭১. শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে দিব্যায়ন ছাত্রনিবাসের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন।

কার্যবিবরণী

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোম (মায়লাপুর, মাদ্রাজ ৪)-এর ৬৬তম বর্ষের কার্যবিবরণী (১৯৭০-৭১) প্রকাশিত হইয়াছে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম লীলা-পার্ষদ পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৭টি ছাত্র লইয়া আদর্শ মানুষ তৈরি করিবার উদ্দেশ্যে এই স্টুডেন্টস্ হোম

আরম্ভ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইহা নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রধানতঃ ৩টি বিভাগ: (১) বিবেকানন্দ কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস, (২) আবাসিক শিল্প-বিদ্যালয় (Technical Institute), (৩) আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়।

কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে, ৩১. ৩. ৭১ তারিখে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংখ্যা ২৯৯; তন্মধ্যে হাইস্কুলের ১৫৭, ওরিয়েণ্টাল স্কুলের ১২, পি. ইউ. জি. ও ডিগ্রী কোর্সের ৫০, পলিটেকনিকের ৮০ জন ছাত্র ছিল। মোট ছাত্রসংখ্যার ৮৬ জন অনুন্নত সম্প্রদায়ের।

উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণী—মোট ৪টি ক্লাস; শিক্ষার মাধ্যম তামিল ভাষা। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। আলোচ্য বর্ষে ৬৪ জন বিদ্যার্থীকে ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে।

ছাত্রাবাসের কলেজ বিভাগের ৫০ জন ছাত্রের মধ্যে ডিগ্রী কোর্সের ৩৪ জন এবং এম্-এ ক্লাসের ১ জন।

আবাসিক শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং এবং অটোমোবাইল ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করে। আলোচ্যবর্ষে ফাইন্যাল এল. এম. ই. পরীক্ষায় ৪৭ জনের মধ্যে ৪৫ জন উত্তীর্ণ হয় এবং ৪০ জন ফার্স্ট ক্লাস পায়।

স্টুডেণ্টস্ হোম কমিটি কর্তৃক দুইটি বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। ইহাদের মধ্যে একটি মায়লাপুরে অবস্থিত—নাম শ্রীরামকৃষ্ণ সেন্‌টিনারী এলিমেণ্টারি স্কুল। অপরটি চিঙ্গেলপুট জেলায় মল্লিয়ানুকারানাই গ্রামে অবস্থিত। বিদ্যালয় দুইটিতে ৬২০ জন ছাত্র-ছাত্রী (ছাত্রী-২৩০) শিক্ষালাভ করিতেছে।

ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এপ্রিল, ১৯৬৯ হইতে মার্চ, ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

মঠ বিভাগ: ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে নিয়মিত পূজা, প্রার্থনা, ভজনাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামীজী এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব, শ্রীশ্রীকালীপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতি মঠ-বিভাগের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। অন্যান্য মহাপুরুষের আবির্ভাব-দিবসও সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

মিশন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান:

(১) ১টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়—১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২২১ (ছাত্রী-৯৯)।

(২) ১টি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়—১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ছাত্রসংখ্যা ৭৪।

(৩) বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার: গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৯,৬০০; গ্রাহক-সংখ্যা ৬৪০। পাঠাগারে ৮টি দৈনিক ও ৮৩টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। পাঠাগারে দৈনিক ৭৮ জন পাঠক সমবেত হন।

(৪) অ্যালোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়: প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই এই চিকিৎসালয়টি সর্ব-শ্রেণীর আর্তনারায়ণের সেবারত। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের দরিদ্র জনসাধারণ এখানে চিকিৎসিত হইয়া থাকেন। প্রতিদিন গড়ে ১৫০ জন রোগীর সমাগম হয়। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ২৯,৬৩৯ ও ৩৭,০৪০।

কার্যবিবরণী

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ৬৪তম বর্ষের কার্যবিবরণী (১৯৭০-৭১) প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সেবাশ্রম বৃন্দাবন মহাতীর্থে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া আর্ত-নারায়ণের সেবায় নিরত।

বর্তমানে এখানে মেডিক্যাল, সার্জিক্যাল, এক্স-রে, রেডিওলজি, ফিজিওথেরাপি প্রভৃতি সুষ্ঠভাবে পরিচালিত। বিভাগগুলিতে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ কর্তৃক অসংখ্য রোগী চিকিৎসিত হইতেছেন।

ইনডোর হাসপাতাল: অন্তর্বিভাগে ১০৩টি শয্যা আছে। আলোচ্য বর্ষে ২,৯১০ জন রোগী ভরতি হইয়াছিল। চক্ষু-অস্ত্রোপচার সহ মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ১,৫১৬।

১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে ৮টি শয্যা পৃথক করিয়া একটি ক্যান্সার-ওয়ার্ড করা হইয়াছে; এখানে ইনডোরে ৬২ জন রোগী চিকিৎসিত হন।

আউটডোর ডিস্পেন্সারী: আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে ১,৭০,০৬৯ (নূতন ৩১,১৪৭) জন রোগী চিকিৎসিত হন এবং চক্ষুরোগীসহ মোট ১,৩৮৩ জনের অস্ত্রোপচার করা হয়। আউট-ডোরে গড়ে দৈনিক চিকিৎসিতের সংখ্যা ৪৫৮।

আলোচ্য বর্ষে এক্স-রে বিভাগে ২,৬৬০টি এক্স-রে ফটো তোলা হয় এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ২৪,৬৭২টি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। ফিজিওথেরাপি বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩৭৫।

আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথিক বিভাগে নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩,৪৭২ ও ১৬,৪৮৩।

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের চক্ষুবিভাগটিতে সহস্র সহস্র চক্ষুরোগী সুচিকিৎসা লাভ করিতেছেন।

রোগীদের জন্য সেবাশ্রম কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হয়। এখানে উপযুক্ত পুস্তকাবলী এবং পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়। একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র মেডিক্যাল লাইব্রেরীও আছে। রোগীদের আনন্দ-বিধানের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ডগুলিতে রেডিও শোনাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; স্বাস্থ্য-বিষয়ক অডিওভিজুয়্যাল প্রোগ্রামগুলি বিশেষ-ভাবে শোনানো হইয়া থাকে।

চণ্ডীগড় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আশ্রমের এপ্রিল, ১৯৬৯ হইতে মার্চ, ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত। চণ্ডীগড়, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ এবং পঞ্জাবে রামকৃষ্ণ মিশনের আর কোন কেন্দ্র না থাকায় বিরাট অঞ্চল জুড়িয়া এই আশ্রমটি (সেকটর ১৫-বি চণ্ডীগড় ১৭) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা-প্রচারে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

আলোচ্য সময়ে আশ্রমের কার্যধারা:

(১) প্রতি শনি-রবিবারে নিয়মিত ধর্মালোচনা, পাক্ষিক রামায়ণসঙ্কীর্তন, আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে সাময়িক ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা।

(২) গ্রন্থাগার-পরিচালনা; লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা ১,৪৪০।

(৩) শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য মহাপুরুষের জন্মতিথি-উদ্‌যাপন।

(৪) মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য ছাত্রা-বাস পরিচালনা। ১৯৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ষ্টুডেন্টস্ হোমের ছাত্রসংখ্যা ৩৪।

(৬) হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়, আলোচ্য সময়ে চিকিৎসিতের সংখ্যা—৫,৮৩০, নূতন রোগী ১,৯২০।

দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে তিন জন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

স্বামী ঈশাত্মানন্দ

স্বামী ঈশাত্মানন্দ (হরিলাল মহারাজ) গত ১৫.১১.৭১ বারাণসী সেবাশ্রমে বৈকাল ২টা ৪৫ মিনিটের সময় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বিকল হওয়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের নিকট তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়। বহু বৎসর যাবৎ তিনি বারাণসী ও কনখল সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অক্লান্ত কঠোর শ্রমপরায়ণ সন্ন্যাসী।

স্বামী গদাধরানন্দ

গত ২১. ১১. ৭১ বেলা ১২টায় স্বামী গদাধরানন্দ ৬৪ বৎসর বয়সে রাঁচি-মোরাবাদী আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি পীড়াজনিত নানা উপসর্গে ভুগিতে-ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন তিনি। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট হইতেই তিনি সন্ন্যাস লাভ করেন।

বিভিন্ন সময়ে তিনি দিনাজপুর, কামারপুকুর ও কাটিহার আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং অন্যান্য কেন্দ্রেও শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। মধুর স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেরই প্রিয় ছিলেন তিনি।

স্বামী পুণ্যানন্দ

গত ২৪.১১.৭১ রাত্রি ৮টা ১৭ মিনিটে কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্বামী পুণ্যানন্দ ৬৮ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তিন বৎসর যাবৎ তিনি কঠিন ব্যাধিতে (Lympho Sarcoma) ভুগিতে-ছিলেন। কলিকাতা ও বোম্বাই এর অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না। তাঁহার নশ্বর দেহ সেই রাত্রেই রহড়া বালকাশ্রমে লইয়া যাওয়া হয় এবং পরদিন সেখান হইতে কাশীপুর মহাশ্মশানে লইয়া আসিয়া শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

স্বামী পুণ্যানন্দ সঙ্ঘে যোগদান করেন ১৯২২ খৃষ্টাব্দে, কাঁথি আশ্রমে। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং তাঁহারই নিকট ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। ১৯৩২ হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত রেঙ্গুন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ থাকাকালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিবিধানে অসাধারণ কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশের শরণার্থী রিলিফ, বাংলা দুর্ভিক্ষ রিলিফ এবং পূর্ববঙ্গ উদ্বাস্তু রিলিফ পরিচালনা-কালেও তাঁহার বিশেষ কর্মদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে রহড়া বালকাশ্রমের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ইহার সেক্রেটারী ছিলেন এবং সুযোগ্য পরিচালনায় একটি ক্ষুদ্র অনাথ আশ্রম হইতে এই বালকাশ্রমটিকে রামকৃষ্ণ মিশনের বৃহত্তম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতমরূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যরূপেও কয়েকবৎসর তিনি সঙ্ঘের সেবা করিয়াছেন।

স্বামী পুণ্যানন্দের মধ্যে ছিল অক্লান্ত কর্মোদ্দীপনা, অদম্য সাহসিকতা, অসামান্য পরিচালন-ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ সাধারণ জ্ঞান এবং প্রেমপূর্ণ হৃদয়। সঙ্গীত এবং বাগ্মিতার জন্যও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

বাগবাজার সিস্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ও সারদা মন্দিরের কার্যবিবরণী (১৯৬৯-৭১) প্রকাশিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন কর্তৃক পরিচালিত নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ও সারদা মন্দির বিরাট ঐতিহ্য ও আদর্শের অনুপ্রেরণা বক্ষে ধারণ করিয়া বিদ্যমান এবং অনুকূল প্রতিকূল নানা অবস্থার মধ্যে অবিচল থাকিয়া আদর্শরূপায়ণে সতত সচেষ্ট।

বিদ্যালয়ের দুইটি বিভাগ: প্রাইমারী এবং হায়ার সেকেণ্ডারী (বহুমুখী)। প্রাথমিক বিভাগে ১৯৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে ছাত্রীসংখ্যা ২১৪ এবং মাধ্যমিক বিভাগে ৫৭৭। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। ছাত্রীদের শরীর ও মনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। সারদা মন্দির ছাত্রীনিবাসে শিবরাত্রি, বুদ্ধপূর্ণিমা প্রভৃতি উদ্‌যাপন করা হয়।

আলোচ্য সময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং ভগিনী নিবেদিতার জন্মোৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হইয়াছিল।

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (৪, নস্করপাড়া লেন, কাসুন্দিয়া, হাওড়া ১) ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘকাল ধরিয়া আশ্রমটি হাওড়া অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারে ও সমাজকল্যাণে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে। আশ্রম-পরিচালিত গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন, নৈশ বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ব্যায়ামাগার প্রভৃতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ প্রতি সপ্তাহে ধর্মালোচনা, পূজা ও উৎসবের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

উৎসব-সংবাদ

আগরতলা রামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী মঠে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে দিবসত্রয় মায়ের পূজা যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিদিনই হাজার হাজার লোক পূজায় যোগদান ও প্রসাদগ্রহণ করেন; প্রথম দিন ফল মিষ্টান্ন, দ্বিতীয় দিন খিচুড়ি ও তৃতীয় দিন লুচি ও হালুয়া বিতরিত হয়।

চন্দননগর শ্রীরামকৃষ্ণ-সেবকসঙ্ঘের উদ্যোগে চন্দননগর বাগবাজার পল্লীতে গত ৭ই নভেম্বর সন্ধ্যায় একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ। স্তোত্রপাঠ, আবৃত্তি, ভজন অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল।

পরলোকে মহামায়া সরকার

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, মহামায়া সরকার গত ১লা নভেম্বর সকাল ৮টা ১০ মিনিটে ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসিদ্ধ গৃহী ভক্ত বলরাম বসুর পৌত্রী, এবং সেজন্য শৈশব হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তানদের পুণ্য সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য লাভ করেন। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছে মন্ত্র-দীক্ষা পান।

গত দশ বৎসর যাবৎ তিনি রাঁচিতে স্থায়িভাবে বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি রাঁচির মহিলাদের শ্রীশ্রীমায়ের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করিবার জন্য শ্রীসারদা-সঙ্ঘ স্থাপন করেন।

তাঁহার ব্যক্তিত্ব, সারল্য ও অনাবিল স্নেহধারায় প্রত্যেককে তিনি আপনার করিয়া লইতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে তাঁহার আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করুক।

৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাষ্টীগণের পক্ষে স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—**স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ**